মুক্তির সন্ধানে ভারত

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

অশোক পুস্তকালয়
প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা
৬৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

তৃতীয় সংস্করণ : ১৩৬৭

মূল্য দশ টাকা মাত্র

৬৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯, অশোক পুস্তকালয়ের পক্ষ হইতে শ্রীঅশোককুমার
বাণিক কর্তৃক প্রকাশিত এবং ২/১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬, নিউ শ্রীদুর্গা
প্রেস হইতে শ্রীগৌরচন্দ্র পাল কর্তৃক মুদ্রিত।

পিতৃদেবের চরণে

ভূমিকা

শ্রীমান যোগেশচন্দ্র বাগল তাঁহার 'মুক্তির সন্ধানে ভারত বা ভারতের নব-জাগরণের ইতিবৃত্ত' নামক পুস্তকখানির ভূমিকা লিখিয়া দিতে আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন। যোগেশচন্দ্র খ্যাতনামা সাহিত্যিক। কাব্য ও উপন্যাস-প্লাবিত বাংলা সাহিত্যের হাটে সামান্য যে কয়জন সাহিত্যিক অপেক্ষাকৃত চিন্তাশীল প্রবন্ধের বেসাতি করেন যোগেশচন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে একজন। সুতরাং বাঙালী পাঠক সমাজে তাঁহাকে পরিচিত করিয়া দিবার উদ্দেশ্য লইয়া কোন ভূমিকার অবতারণা করা নিষ্প্রয়োজন।

'মুক্তির সন্ধানে ভারত' ভারতবর্ষের বিগত একশত বৎসরের ইতিহাসের একটি কাঠামো মাত্র। জাতির জীবনে একশত বৎসর কিছুই না একথা ঠিক, কিন্তু প্রগতির পথে অবিরাম চলিতে হইলে মাঝে মাঝে এমনি ভাবে আলোচনা করিয়া পরবর্ত্তী পথ স্থির করা প্রয়োজন। এই হিসাবে এ ধরনের পুস্তকের মূল্য যথেষ্ট। বিগত একশত বৎসরে শিক্ষায়, সাহিত্যে, রাষ্ট্র-ব্যবস্থায়, ধর্ম্মে, লোকাচারে এক কথায় জাতির সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গীতে যে একটা গুরুতর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহা আজ কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। এই যে পরিবর্ত্তন ইহারও একটা সুনির্দ্দিষ্ট ধারা আছে, যাহাকে অস্বীকার করিলে জাতির অগ্রগতি ব্যাহত হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। সুতরাং বাংলাদেশের যাঁহারা বর্ত্তমান নাগরিক এবং যাঁহারা হইবেন ভবিষ্যৎ নাগরিক তাঁহাদের পক্ষে এই পরিবর্ত্তনের মূলতত্ত্ব বুঝিতে হইবে। যোগেশচন্দ্র এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পড়িয়া আমার এই ধারণাই জন্মিয়াছে।

যে একশত বৎসরের ইতিহাস এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহা ভারতের নব-জাগরণ বা রেনেসাঁর ইতিহাস। এই রেনেসাঁর মূল উপাদান প্রতীচ্যের অবদান এবং ইংরেজী শিক্ষাই ইহার বাহন। সুতরাং আমাদের সমস্ত অগ্রগতি যদি আজ প্রতীচ্যপন্থী হইয়াই থাকে তবে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। মোগল রাজত্বের গৌরবময় যুগে আমরা অনেকাংশেই আপন আপন গণ্ডী ছাড়াইয়া বাহিরে আসিয়া মুখ্যতঃ অনেক মুসলমানী আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলাম —ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিবে। বর্ত্তমান নব-জাগরণের পূর্ব্বে মোগল বাদশাহ আকবরের রাজত্বেও ভারতবর্ষে আর একটি নব-জাগরণের সূত্রপাত হইয়াছিল,

কিন্তু তাহা কতখানি বিপুল এবং ব্যাপকভাবে দেশের মাটিতে শিকড় গাড়িয়া ছিল তাহা আজ নিশ্চিত করিয়া বলিবার উপায় নাই, কেননা সমালোচকের দৃষ্টি লইয়া অপক্ষপাত ঐতিহাসিক তাহার কোন ধারাবাহিক বিবরণ রাখেন নাই। এ সম্বন্ধে সমস্ত তথ্যই সমসাময়িক কাগজপত্রের মধ্যে ছড়াইয়া রহিয়াছে। সে সময় রাজা বা দেশের শাসনকর্ত্তার জীবনীই ছিল দেশের ইতিহাস। ইহাতে অবশ্য সাধারণভাবে দেশের তৎকালীন ইতিহাসের সব কিছুই পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু কোন বিশেষ ভাবধারার গতি-প্রগতি ইহা হইতে পরিপূর্ণ ভাবে নির্ণয় করা যায় না। ইহা হইতেই বোঝা যায় যে, কোন একজন রাজা বা শাসনকর্ত্তার জীবন ইতিহাস যেমন মূল্যবান্, কোন একটি ভাবধারার প্রসারের অপক্ষপাত বিবরণও ঠিক ততখানিই মূল্যবান্।

আমাদের দেশে 'রাষ্ট্র-বিজ্ঞান' এখনও পূরাপুরি বিজ্ঞান হিসাবে আলোচিত হয় না—এখনও ইহার প্রয়োগক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ। কিন্তু ব্যাপক ভাবে দেখিতে গেলে সমাজ, ধর্ম্ম, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান সব কিছুব সমন্বয়ে রাষ্ট্র-বিজ্ঞান গঠিত। কোন একটি বিশেষ সময়ের রাষ্ট্রীয় তথ্য আলোচনা কবিতে হইলে এগুলি বাদ দিয়া যদি শুধু বাজনৈতিক বিষয় সমূহেরই অবতারণা করা হয় তবে আলোচনা পূর্ণাঙ্গ হইল বলা চলে না। কারণ জীবনের সকল প্রচেষ্টার উপরই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার একটা প্রত্যক্ষ প্রভাব বিত্তমান। যোগেশচন্দ্র এই কথা বিস্মৃত হন নাই দেখিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। এইখানে একটি কথা বলিয়া রাখা ভাল যে, ভারতের মুক্তি সাধনার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস ইহা নহে। ইহা ভারতীয় নব-জাগরণের বৈচিত্র্যবহুল ইতিহাসের পথ-নির্দ্দেশক মাত্র। এই নব-জাগরণের যুগ এখনও অতীত হইয়া যায় নাই, এখনও ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্নতর সমাজে এই নব-জাগরণের পূর্ণতম বিকাশ দেখা যায় নাই। তবে সকল সমাজেই এই ভাবধারার একটা সুস্পষ্ট ছাপ পড়িয়াছে। যে সব সমাজ ইতি-মধ্যেই অনেকদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে তাহারা একটা যুগসন্ধিক্ষণে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, আর যে সব সমাজ সবে মাত্র এই ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়াছে তাহারাও সমাজ মনে একটা গুরুতর আলোড়নের ফলে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। এ সময়ে সমগ্রভাবে এই রেনেসাঁ বা নব-জাগরণের একটা সংক্ষিপ্ত ও সুবিস্তৃত বিবরণ সময়োপযোগী সন্দেহ নাই।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর প্রাঙ্গণে বাঙালী যে পাপ করিয়াছিল তাহারই পরোক্ষ অবদান এই রেনেসাঁ। বাঙালী রামমোহন ইহার প্রবর্ত্তক ও হিন্দু কলেজের ছাত্রবৃন্দ ইহার পতাকাবাহী। যখন এই যুগের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হইবে তখন দেখা যাইবে বর্ত্তমান ভারত গঠনে ইঁহাদের সত্যকারের দান কতখানি।

আমি এখন অশীতিবর্ষে পদার্পণ করিয়াছি। যোগেশচন্দ্র যে সময়ের ইতিহাস এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহার অধিকাংশই আমার চোখের উপর ঘটিয়াছে এবং এই সময়ের অনেক আন্দোলনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যোগ দিবারও আমার সৌভাগ্য ঘটিয়াছে। এইজন্ম আমি স্বভাবতঃই যথেষ্ট কৌতূহল ও আনন্দের সহিত পুস্তকখানি পাঠ করিয়াছি। সর্ব্বজনগ্রাহ্য সরল-ভাষায় লিখিত এই পুস্তকখানি বাংলা দেশের পাঠক-সমাজে আদৃত হইবে এ বিশ্বাস আমার আছে। বাঙালী পাঠক সমাজ উপন্যাসপ্রিয় এ কথা অনেককেই বলিতে শুনিয়াছি। হয়ত ইহার মধ্যে কতকটা সত্যও নিহিত আছে। কিন্তু চিন্তাশীল মৌলিক আলোচনা বাংলা দেশে অচল এ ধারণা আমি পোষণ করি না। সাহিত্যের প্রতি বাঙালীর একটা সহজাত আকর্ষণ আছে। বিভিন্ন দেশের ইতিহাসের সহিত তুলনা করিলে বুঝা যায়—ইহা নব-জাগরণের ফল। ইংলণ্ডের রেনেসাঁর ইতিহাস পড়িলে দেখা যায় যে, ইংরেজ জনসাধারণ এই সময়ে অতিমাত্রায় সাহিত্যপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীর ইংলণ্ডে একজন সাধারণ কসাইও পশুহত্যা করিবার সময় একটা নাতিদীর্ঘ সাহিত্যিক বক্তৃতা দিয়া তবে হত্যা কার্য্যে হাত দিত। বাংলায় অবশ্য সে অবস্থা এখনও হয় নাই, সাহিত্য-চর্চ্চা আপামর জনসাধারণের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু এই প্রদেশেও সাহিত্যরসিক এমন অনেক আছেন—যাঁহাদের নিকট 'মুক্তির সন্ধানে ভারত বা ভারতের নব-জাগরণের ইতিবৃত্ত' যথাযোগ্য সমাদর লাভ করিবে।

সায়ান্স কলেজ, কলিকাতা
২৫শে ভাদ্র, ১৩৪৭

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

নিবেদন

"মুক্তির সন্ধানে ভারত"-এর দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশকাল মহালয়া, ১৩৫২। প্রকাশের তিন-চার বৎসরের মধ্যেই পুস্তকখানি নিঃশেষ হ'য়ে যায়। তদবধি আজ বার বৎসর কাল এখানি অপ্রাপ্য রয়ে গেছে। এর কারণ বিশ্লেষণ ক'রে এখন আর লাভ নেই। পুস্তকখানি আজিও যে লোকের মানসিক চাহিদা মেটাবার পক্ষে প্রয়োজন, নানাক্ষেত্রে তার প্রমাণ পেয়েছি। একারণ এখানির একটি নূতন সংস্করণ বার করতে অগ্রসর হয়েছি। এ কার্য্যে প্রধান সহায় হয়েছেন 'অশোক পুস্তকালয়'-এর পক্ষে অশোককুমার বারিক। বস্তুতঃ, তাঁর আন্তরিক আগ্রহ হেতুই বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে একক প্রযত্নে এরূপ বৃহদাকার পুস্তক প্রকাশ সম্ভবপর হয়েছে।

পুস্তকখানি প্রথম প্রকাশিত হয় কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে। এই সময়ের মধ্যে স্বদেশে ও বিদেশে কত পরিবর্ত্তন-ই না সংঘটিত হয়েছে! বহুতর আন্দোলন-আলোড়নের চড়াই-উৎরাইয়ের পর আমরা ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্ট ভারত-বিভাগের ভিত্তিতে স্বাধীনতা অর্জ্জন করেছি। এই সময় পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার কাহিনী এখানিতে বিবৃত হয়েছে। একারণ পুস্তকখানির কলেবরও অনেকটা বেড়ে গিয়েছে। শেষের দিকের ঘটনাগুলি একাধিক অধ্যায়ে বর্ণনা করেছি। স্বাধীনতা প্রাপ্তির শুভ দিনটি পর্য্যন্ত কত ঘটনাই অতি দ্রুত সংঘটিত হয়েছিল তার কি ইয়ত্তা আছে! আমাদের চোখের সামনে এসব ঘটনা ঘটে গেল। পুস্তকের শেষে এসবের আভাস মাত্র দেওয়া সম্ভব হয়েছে। আগামীকালের পাঠক এ থেকে স্বাধীনতা আহবের মর্ম্মান্তিক গুরুত্বও খানিকটা হয়ত বুঝতে পারবেন।

পুস্তকখানি দ্বিতীয়বার মুদ্রণের অল্পকাল পরেই যখন নিঃশেষ হ'য়ে যাবার উপক্রম হয়, তখন বিস্তৃতরূপে, সম্ভব হ'লে দু'খণ্ডে, এখানি প্রকাশের জল্পনা-কল্পনা চলেছিল। কিন্তু বিধি বাম, স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পূর্ব্বেকার এবং পরবর্ত্তী সময়ে এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটল যার দরুণ নূতন ক'রে প্রকাশ করা দুঃসাধ্য হ'য়ে উঠল। দীর্ঘকাল পরে এখানি যে পুনরায় আত্মপ্রকাশ [illegible]

প্রথম সংস্করণের নিবেদন

'মুক্তির সন্ধানে ভারত বা ভারতের নব-জাগরণের ইতিবৃত্ত' প্রকাশিত হ'ল। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে (প্রতিষ্ঠাকাল ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ) ভারতবাসী প্রথম ঘনিষ্ঠভাবে ইংরেজের সংস্পর্শে আসে। এই সময়েই ভারতবর্ষে রেনেসাঁ বা নবজাগরণের সূচনা হয়। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার ঠিক সতের বছর পরে কলকাতায় প্রসিদ্ধ হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়, (১৮১৭, ২০শে জানুয়ারী)। ইংরেজী ও বাঙালী-মনীষী এখানে এক সূত্রে গ্রথিত হ'ল। ইংরেজী শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, ইতিহাস—এক কথায় ইংরেজ-জীবনের সঙ্গে বঙ্গ-সন্তানগণ সুষ্ঠুরূপে পরিচিত হবার প্রথম সুযোগ পেল এই হিন্দু কলেজে। এখানে শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদল প্রথম খানিকটা উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ করলেও নবজীবন বা রেনেসাঁর পতাকাবাহী সৈনিকরূপে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ভারতভূমে কর্ম্মতৎপর ছিলেন। ইংরেজের সংস্কৃতি প্রধানতঃ রাজনীতিকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠেছে। তার অনুকারী ভারত-সন্তানগণও এই রাজনীতিকেই সর্ব্ব উন্নতির মূল উৎস ব'লে বরণ ক'রে নিয়েছেন। দীর্ঘ পঁচাশী বৎসর যাবৎ ভারতবাসী, বিশেষ ক'রে বাঙালী, যে একনিষ্ঠ ও ঐকান্তিক সাধনা ক'রেছিল তার একদিক মাত্র প্রথমে কংগ্রেসে রূপ পেল। সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, ললিতকলা প্রভৃতি নানা বিষয়ে তখন নূতন জীবন-স্পন্দন অনুভূত হয়। রাজা রামমোহন রায় থেকে সার্ সৈয়দ আহ্‌মদ খাঁ পর্য্যন্ত সকল মনীষীই এতে বিশেষ সহায়তা করেন। রাষ্ট্রীয় উন্নতির প্রেরণাও এ সকলের মূলে কম রস জোগায় নি। প্রথম ভাগে আমি এই কথাই বলতে চেষ্টা করেছি।

পুস্তকখানির দ্বিতীয় অংশকে 'কংগ্রেস-যুগ' আখ্যা দিয়েছি। কংগ্রেস মুখ্যতঃ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। দ্বিতীয় অধিবেশনে দাদাভাই নৌরজী এ কথা স্পষ্ট ক'রে উল্লেখ করেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ অন্যান্য নেতারাও পরে এ উদ্দেশ্যের উপর জোর দিয়েছেন। কিন্তু বক্তা ও প্রাবন

কোন বিশেষ ভূমি বা প্রাঙ্গণ প্লাবিত করে না, দিগ্দিগন্তকে প্লাবিত ও সিক্ত ক'রে তোলে। কংগ্রেস রাজনীতিও জীবনের ও কর্ম্মের সকল ক্ষেত্রে, ব্যক্তি বিশেষ বা নেতা বিশেষের বিপরীত নির্দ্দেশ সত্ত্বেও ব্যাপ্তিলাভ করেছে এবং শিক্ষা, সাহিত্য ও সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করতে চাইছে। কাজেই কংগ্রেসের ইতিহাসকে কোন প্রতিষ্ঠান বিশেষের ইতিহাস বললে ভুলই হবে।

কংগ্রেস ভারতের নব-জাগরণেরই প্রতীক। কংগ্রেসের এই সর্ব্বব্যাপক সমাজ-সেবার আদর্শে ভারতবর্ষে অন্যান্য বহু সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে ও প্রকারান্তরে কংগ্রেসেরই ব্যাপক আদর্শ, কখনও জ্ঞাতসারে কখনও বা অজ্ঞাতসারে প্রচার করছে। এদিক দিয়ে ভারত ক্ষেত্রে সকল প্রতিষ্ঠানেরই সমান সার্থকতা। এখনও ভারতের নব-জাগরণ বা রেনেসাঁ পরিপূর্ত্তি লাভ করে নি। রাণী এলিজাবেথের আমলে ইংরেজ-সমাজ যে নব-প্রেরণা লাভ করে তা কর্ম্মে রূপায়িত হ'তে তিন শ' বছর কেটে যায়। সুতরাং ভারতবাসীরও হতাশ হবার কারণ নেই। বর্ত্তমান যুগে তা দ্রুতই সংশোধিত হ'তে পারে।

কিন্তু 'দ্রুত' কথাটির সঙ্গে এমন একটি বিষয় মনে উদিত হয়, যে জন্য আজ স্বস্তি লাভ করা খুবই কঠিন। বিজ্ঞান সকলকেই দ্রুত কাম্যলাভে সহায়তা করে। কিন্তু বর্ত্তমানে এ আসল উদ্দেশ্য পরিত্যাগ ক'রে যে প্রলয়-কাণ্ড সুরু করে দিয়েছে, তাতে মনুষ্য মাত্রই আজ চিন্তাকুল। কত কর্ম্মবীর ও চিন্তাবীরের হাজার হাজার বছরের চেষ্টা ও সাধনার ফল এক-একটা বোমা বিস্ফোরণেই ধূলিসাৎ হ'য়ে যাচ্ছে।

বিজ্ঞানের পরম স্নিগ্ধ সৃষ্টি কার্য্যের পরিবর্ত্তে প্রলয় তাণ্ডব সুরু হলে মনুষ্য সমাজের অস্তিত্বের মূলেই আঘাত করা হয়। ভারতের নব-জাগরণের গতিও সুতরাং পদে পদে ব্যাহত হওয়া নিশ্চিত। এ সময়ে যা কিছুই মানুষের মনে আশা-উদ্দীপনার উদ্রেক করবে তা-ই সাদরে বরণীয়। আমরা যেন আত্মরক্ষায় সর্ব্বাগ্রে উদ্‌যুক্ত হই।

এ পুস্তকে ১৯৩৯ সন পর্য্যন্ত প্রধান প্রধান ঘটনা ও ভাবধারা সন্নিবিষ্ট করতে চেষ্টা করেছি। পুস্তকখানি বহুদিনের পরিশ্রমের ফল। ঊনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁ বা নব-জাগরণ সম্বন্ধে আমি ইতিপূর্ব্বে কিছু কিছু

অনুসন্ধান ও আলোচনা করেছি। তার খানিকটা পুস্তকের প্রথম অংশে প্রদত্ত হয়েছে। পুস্তক-রচনায় আমাকে বহু বই থেকে সাহায্য নিতে হয়েছে। পরিশিষ্টে প্রদত্ত তালিকায় তার অধিকাংশের উল্লেখ করেছি।······

বহু হিতৈষী বন্ধু ও প্রতিষ্ঠান আমাকে পুস্তকাদি দিয়ে সাহায্য করেছেন। তাঁদের সকলকে আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।···পরমশ্রদ্ধাভাজন আচার্য্য সার্ প্রফুল্লচন্দ্র রায় পুস্তকের ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। তাঁর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ আমি বাহুল্য ব'লে মনে করি।

কলিকাতা
১লা আশ্বিন, ১৩৪১

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

সূচীপত্র

কংগ্রেস পূর্ব্ব-যুগ

কংগ্রেস যুগ

সূচনা

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বলেছেন, কোন জাতির ইতিহাসে পঞ্চাশ কি একশ' বছর একরূপ কর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। 'অনন্ত কালের প্রবাহে এ একটি বিন্দু মাত্র।' ভারতবাসীর জাতীয় ইতিহাসে এ কথাটা যেমন প্রযোজ্য এমনটি আর কোন জাতি সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। হাজার হাজার বছর ধ'রে হিন্দুস্থানের অধিবাসীরা জীবনতরী বেয়ে চলেছে অবিরত। কালবৈশাখীর প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত, শ্রাবণের অবিরাম বারিবর্ষণ, শরতের সুমধুর আলোক-ছটা, বা বসন্তের মৃদুমন্দ হাওয়া—হিন্দুস্থান কতকাল ধ'রে যে এসবের সম্মুখীন হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। তার জীবনেও বছরের ষড়ঋতুর মত এক এক অবস্থার উদয় হয়েছে, এক অবস্থা বিলুপ্ত হ'য়ে নূতন অবস্থা দেখা দিয়েছে। তাই তার দর্শন, সাহিত্য, পুরাণ নশ্বর ঐহিক বিষয়ের মধ্যে আত্মবিলোপ না ক'রে পরম রস পরমার্থ তত্ত্বের মধ্যে নিজ নিজ সার্থকতা লাভ করেছে। এর ভিতরে নৈরাশ্যবাদ স্থান পায় নি, আশা ও আনন্দ এসবের মূল উপজীব্য ও লক্ষ্য। ভারত-কাহিনীর এই হ'ল মূল কথা।

ভারতবর্ষের গত একশ' বা ততোধিক কালের ইতিহাস অনন্ত কাল থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখলে বড় রকমের ভুল করা হবে। পশ্চিমের দেশগুলির কাজ পরিচালিত হচ্ছে রাজনীতিকে কেন্দ্র ক'রে। পূর্ব্ব দেশগুলি এত কাল ধর্ম্মকে কেন্দ্র ক'রেই নিজ নিজ কাজ নির্ব্বাহ করেছে। তবে এখন পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে এসে রাজনীতির চর্চ্চা পাশ্চাত্যের আদর্শেই সুরু ক'রে দিয়েছে তারা। একেও কিন্তু তারা ধর্ম্মের পর্য্যায়ে উন্নীত ক'রে নিয়েছে। রাজনীতি আজ

জীবনের সকল কর্ম্মে সকল ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত,—নিছক রাষ্ট্র সম্পর্কেই এ সীমাবদ্ধ হ'য়ে নেই। ধর্ম্ম ও রাজনীতি একারণ সমার্থবোধক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে ভারতবাসীর কাছে। এদেশে আধুনিক কালে সুষ্ঠুভাবে রাজনীতি চর্চ্চা আরম্ভ হবার পূর্ব্বে ধর্ম্ম নিয়েই প্রথম খুব বিচার-বিতর্ক সুরু হয়। এতে যে পদ্ধতি অনুসৃত হয় তা-ও পশ্চিমের অনুকরণে। এই নব পদ্ধতিই ক্রমে রাজনীতি-চর্চ্চায় অনুক্রামিত হয়েছে।

স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতবর্ষ হয়েছে বহু জাতির মিলনক্ষেত্র। আর্য্য-পূর্ব্ব যুগে ভারতবর্ষে একটি উৎকৃষ্ট ধরণের সভ্যতা বিদ্যমান ছিল। মোহেন-জো-দড়ো ও হরাপ্পার আবিষ্কৃত নিদর্শন থেকে একথা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হ'য়ে গেছে। আর্য্য ও আর্য্য-পূর্ব্ব সংস্কৃতির সংমিশ্রণে যে সভ্যতার সৃষ্টি—তা-ই পরবর্ত্তী কালে আর্য্য-সভ্যতা নামে অভিহিত হয়েছে। এর সঙ্গে মিলিত হয়েছে শক, হূন, তাতার, আসীরিয় ও যবন (গ্রীক) সভ্যতা। এরা একে একে আর্য্যত্বে নিজেদের মিশিয়ে দিয়ে ধন্য হ'ল। যারা এসবের ধারক, সেই জাতিগুলিও ভারতীয়দের সঙ্গে মিলে গিয়ে হিন্দু ব'লে পরিচিত হ'ল। রাজপুতানার রাজপুত্গণ দেশী-বিদেশী রণপ্রিয় জাতিদের মিশ্রণে সৃষ্ট, কারো কারো কাছে শুনতে কটু হ'লেও একথার মধ্যে সত্য অনেকখানি রয়েছে। এর পরে এল মহম্মদীয় সভ্যতা ও ধর্ম্ম। ভারতবর্ষে পৌঁছবার পূর্ব্বেই এ প্রকৃষ্ট আকার ধারণ করেছিল। হিন্দুরা তখন দুর্ব্বল, আত্মরক্ষার চেষ্টায় ইতিমধ্যেই ক্লান্ত। এ সময় ইস্‌লামের আবির্ভাব ভারতীয় সংহতিকে প্রবলভাবে ধাক্কা দিলে। কিন্তু যে-সব মুসলমান সম্প্রদায় এখানে রাজ্য বিস্তার করেছিল, স্বদেশে তাদের সমাজ তখনও পুষ্ট ও বলিষ্ঠ ছিল না। কাজেই ভারতবর্ষে এসে এখানকার লোকের সঙ্গে সমাজবদ্ধ হ'য়ে বাস করতে অনায়াসেই তারা সক্ষম হ'ল। ধর্ম্মে স্বতন্ত্র হ'লেও মুসলমানেরা হিন্দুর মত ভারতবর্ষের অধিবাসী হ'ল, উভয়ের স্বার্থ একই সূত্রে গ্রথিত হ'য়ে পড়ল। ক্রমে বহু ক্ষেত্রে ধর্ম্মের চেয়ে সমাজ নিজ প্রাধান্য স্থাপন করলে। ইংরেজকে যারা এদেশের কর্তৃত্ব দিয়ে দেয় তাদের ভিতরে হিন্দু মুসলমান দুই-ই ছিল। সামাজিক বোধই এ কর্ম্মে তখন তাদের উদ্‌বুদ্ধ করে। ইংরেজের স্বদেশে কিন্তু বিশিষ্ট সমাজ ও রাষ্ট্রবিধি গ'ড়ে উঠেছিল ভারতবর্ষে পদার্পণ করবার বহু পূর্ব্বে। এই বৈশিষ্ট্য বুদ্ধি

তাদের সর্ব্বকর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত করেছে। তবু, ভারতবর্ষের জলমাটি প্রবাসী ইংরেজদের ভারতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত করতে যদি-বা কতকটা প্রথমে সক্ষম হয়েছিল, কিন্তু বিজ্ঞান এসে অবিলম্বে এর পথে বিঘ্ন জন্মাল। বিজ্ঞান জানিয়ে দিলে, এদেশের অর্থ এখানে বসেই ভোগ করায় কোন সার্থকতা নেই, বাষ্পীয় পোতে স্বল্প সময়ে স্বদেশে পোঁছে স্ব-সমাজে তা ব্যয় করলে চতুর্ব্বর্গ ফল লাভের সম্ভাবনা। তাই ইংরেজ ভারতবর্ষীয় সমাজ হ'তে আলাদাই রয়ে গেছে। ভারতবর্ষ শাসন ও শোষণে এই জাতিগত বৈষম্য ক্রমে প্রকট হ'য়ে পড়ল।

পলাশীর যুদ্ধের বহু পূর্ব্বেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ব্যবসায় করতে আরম্ভ করে। কিন্তু তারা যে এদেশে একটি রাজ্য বিস্তার করতে পারবে এ বোধ ঐ সময় থেকেই তাদের মনে বদ্ধমূল হয়। তাদের পরবর্ত্তী কার্য্যগুলি এই বোধ দ্বারাই পরিচালিত। ব্যবসায় করতে এসে রাজ্যলাভ ক'জনের ভাগ্যে ঘটে? ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভাগ্যে কিন্তু এ-ই ঘটেছিল। কোম্পানীর সুনির্দ্দিষ্ট শাসনবিধি নেই, নিয়মকানুন নেই, উপরওয়ালা মালিক—সে-ও সাত সমুদ্র তের নদীর পারে। কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের তখন একচ্ছত্র আধিপত্য, আর এদের নেতৃপদে সমাসীন লর্ড ক্লাইভ। লবণ, তামাক প্রভৃতি বাংলার প্রধান ও নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির ব্যবসায়ে একচেটিয়া অধিকারী সে। ওদিকে শাসনভার হাতে নিয়ে খাজনা আদায় করতে মাত্রাজ্ঞানও হারিয়ে ফেললে। বাঙালী হ'য়ে পড়ল অর্থের কাঙাল। এর ফলে হ'ল ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। আনন্দমঠের গোড়ায় এই মন্বন্তরের চিত্র দেওয়া হয়েছে। এক কোটি বাঙালী দুর্ভিক্ষে মারা গেল! বাংলা দেশের লোকসংখ্যা তখন মাত্র তিন কোটি। খাজনা আদায় কিন্তু বন্ধ হয় নি। ইংরেজী ১৭৬৮ সাল থেকে ১৭৭২ সাল পর্য্যন্ত সমানে আদায় কার্য্য চলেছিল। ওয়ারেন হেষ্টিংস তখন গবর্ণর। তিনি এর কৈফিয়ৎ স্বরূপ বিলাতে লিখলেন যে, যারা এখনও জীবিত আছে তাদের নিকট থেকে জোরপূর্ব্বক কর আদায় ক'রে অঙ্কের পরিমাণ সমান রাখা হয়েছে! এ হ'ল ১৭৭২ সালের কথা। ক্লাইভ ইতিপূর্ব্বে বিলাতে গিয়ে যখন বসবাস আরম্ভ করেছেন, তখন তিনি কোটি কোটি টাকার মালিক। বিলাতে তাঁর দুর্নাম হয়েছিল খুব। তাঁর বিরুদ্ধে মোকদ্দমাও হয়। মোকদ্দমায় তাঁকে এই ব'লে

অব্যাহতি দেওয়া হ'ল যে, গর্হিত উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করলেও রাষ্ট্রের তিনি যথেষ্ট উপকার করেছেন। তিনি কিন্তু মনে শান্তি পেলেন না, আত্মহত্যা ক'রে ভবলীলা সাঙ্গ করলেন। ওয়ারেন হেষ্টিংসের সময়ও অজস্র অর্থ বিলাতে নীত হয়েছিল। তিনিও প্রচুর ধনসম্পত্তির অধিকারী হন। নানা অপকর্ম্মের জন্য বিলাতে তাঁরও বিচার হয়। ভারতবাসীদের উপর অকথ্য অত্যাচার ও নির্য্যাতনের কথা উল্লেখ ক'রে এডমাণ্ড বার্ক হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে হাউস অফ লর্ডসের সমক্ষে যে বক্তৃতা করেছিলেন, তাতে বিলাতে ভীষণ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। সাত বছর ধ'রে বিচার চলবার পর হেষ্টিংস মুক্তিলাভ করেন। ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জ্জ স্বয়ং ছিলেন হেষ্টিংসের পক্ষে। বিচার আরম্ভে একশ' ষাট জন লর্ড উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু সাত বছর পরে ১৭৯৫ সালে রায় দেবার সময় উপস্থিত ছিলেন মাত্র উনত্রিশ জন লর্ড। এঁদের অধিকাংশের মতে হেষ্টিংস নিরপরাধ সাব্যস্ত হন। হেষ্টিংস কিন্তু দীর্ঘকালব্যাপী মোকদ্দমা পরিচালনার ফলে সর্ব্বস্বান্ত হয়েছিলেন।

১৮০৭ সালে হিসাব ক'রে দেখা যায়, এদেশ থেকে পূর্ব্ববর্ত্তী ত্রিশ বছরে এক হাজার পঁচাশি কোটি টাকা বিলাতে চলে গিয়েছে। তখন ভারতবর্ষের অতি সামান্য অংশই ইংরেজের অধীন ছিল। ভারতের অর্থে ইংরেজ ধনী হচ্ছে, আর সাধারণ ভারতবাসী ক্রমশঃ নিঃস্ব হ'য়ে পড়ছে। এ অবস্থা প্রতিকারের কোন উপায় ছিল না। বিলাতের জনসাধারণ কোম্পানীর দুষ্কার্য্যের বিরোধী ছিল বটে, কিন্তু কুড়ি বছর অন্তর অন্তর সনন্দ দানের কালেই তাদের প্রতিনিধিরা পার্লামেণ্টে এসব বিষয় আলোচনার অবকাশ পেত। তখন নানারূপ আলোচনা চলত, বাদ-বিতণ্ডা হ'ত, কিন্তু কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের নিরস্ত করবার বিশেষ কোন পন্থাই আবিষ্কৃত হয় নি। এদেশেও যে-সব ইংরেজ স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করত, তাদের চোখে কোম্পানীর অপকর্ম্মগুলি বিসদৃশ ঠেকত। তাদের সংখ্যা খুবই কম। তারা কেউ কেউ সংবাদপত্র পরিচালনা করত ও কোম্পানীর যথেচ্ছ কার্য্যের সমালোচনায় রত থাকত। কর্ত্তৃপক্ষ আইন বিধিবদ্ধ ক'রে তাদের স্বাধীন মতপ্রকাশের পথ বন্ধ ক'রে দেয়। তারা নিজেরা এরূপে নিরঙ্কুশ হ'য়ে রইল। এদেশীয়দের ভিতরে শিক্ষা-বিস্তারেও কোম্পানী উদ্যোগী হয় নি। বারাণসীতে সংস্কৃত কলেজ ও কলকাতায়

মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বটে, কিন্তু তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এমন সব পণ্ডিত ও মৌলবী সৃষ্টি করা, যারা ইংরেজকে নিজেদের আইন বুঝিয়ে দিতে পারবে। ইংরেজী শিক্ষাদানে কর্তৃপক্ষ মোটেই আগ্রহ প্রকাশ করত না। তারা হয়ত ভাবত, পাশ্চাত্য শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হ'লে তাদের যথেচ্ছ শাসন অচল হ'য়ে যাবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমেও বিলাতে যখন এই বিশ্বাস ছিল যে, জনসাধারণ শিক্ষালাভ করলে রাজদ্রোহী হ'য়ে উঠবে, তখন কোম্পানীর লোকেরা যে ওরূপ মনে করবে তাতে আর আশ্চর্য কি? তখন ফরাসী বিপ্লবের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বাণী ইউরোপকে মথিত ক'রে তুলেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসার লাভ করলে ভারতবাসীরাও ঐ সব মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠবে—এ আশঙ্কাও হয়ত তাদের মনে ছিল। যাই হোক, ১৮১৩ সালে নূতন ক'রে সনন্দ প্রাপ্তির সময় বিলাতের কর্তারা স্থির করলেন—প্রতি বছর কোম্পানীকে ভারতবাসীদের শিক্ষার জন্য অনূন এক লক্ষ টাকা ব্যয় করতে হবে। সংস্কৃত, আরবি, ফারসি না ইংরেজী—কিরূপ শিক্ষার জন্য এই টাকা ব্যয় করা হবে, তার কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম ক'রে দেওয়া হ'ল না। আর প্রকৃত প্রস্তাবে ১৮২৩ সালের পূর্ব্বে এ অনুযায়ী কাজও কিছু করা হয় নি। এই সাল থেকে প্রাচ্য ভাষা ও সাহিত্য-শিক্ষার উপরই জোর দেওয়া হ'তে থাকে। কোম্পানীর সদিচ্ছা কিরূপ ছিল, এ থেকেই তা বেশ বোঝা যায়।

দেশের শিল্প-বাণিজ্য কোম্পানী প্রায় একচেটিয়া ক'রে ফেলেছে। বস্ত্র-শিল্পের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হ'ল একটি কারণে। কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা টাকা দাদন দিয়ে তাঁতীদের দ্বারা কাপড় বোনাত। তাদের চাহিদা যত বাড়তে লাগল তাঁতীদের উপর অত্যাচারের মাত্রাও তত বেড়ে চললো। প্রবাদ আছে, তাঁতীরা এতই উৎপীড়িত হয়েছিল যে, নিজেরাই নিজেদের বুড়ো আঙ্গুল কেটে ফেললে! ওদিকে ইংলণ্ডের বাজারে বাংলার বস্ত্রের আমদানী বেড়ে গেল। বাংলার ঢাকাই মস্‌লিন আজ গল্পের বস্তু। তখন কিন্তু মস্‌লিন দেখে ইউরোপবাসীরা বিস্ময়-বিমুগ্ধ হ'য়ে যেত। বিলাতে এসময় নূতন ধরণের চরকা ও তাঁত আবিষ্কৃত হয় ও বস্ত্র-শিল্পের যাদুমন্ত্রও সে-দেশবাসী শিখতে থাকে। ধনিকগণ সরকারের অনুমতি নিয়ে বস্ত্র-শিল্প চালু করতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু ভারত থেকে আমদানী-করা কাপড়ের তুলনায় এ যে খুবই নিকৃষ্ট। কি

দামে কি সৌষ্ঠবে কোন দিক দিয়েই প্রতিযোগিতায় এর টিঁকে ওঠা ভার। তখন বিলাতের কর্ত্তারা ভারতীয় বস্ত্রের উপর অত্যুচ্চ হারে শুল্ক বসালেন। এই শুল্ক ক্রমে এত চড়ে গেল যে, প্রতিখণ্ড কাপড়ের দাম নীট্ মূল্যের চেয়ে বেড়ে দ্বিগুণ তিন গুণ পর্য্যন্ত হয়েছিল। এরূপ গর্হিত উপায়ে ভারতের বস্ত্র-শিল্পের টুঁটি চেপে মারা হয় তখন। ১৮৩০ সালে একজন দুঃখ ক'রে সংবাদপত্রে লিখলেন, ত্রিশ বছরের মধ্যে বাংলার বস্ত্র-শিল্পের এমন দুর্দ্দিন উপস্থিত হয়েছে যে, বাংলায় প্রচুর পরিমাণ বিলাতি বস্ত্র আমদানী হ'তে সুরু হয়েছে! তাদেরই স্বদেশবাসীর চেষ্টায় এই উন্নতিশীল বস্ত্র-ব্যবসায়টি যখন মাটি হবার উপক্রম হ'ল তখন কোম্পানীর লোকেরা কিন্তু বসে রইল না, তারা এদেশ থেকে প্রচুর তুলা বিলাতে রপ্তানি করতে লাগল। নীল চাষও তখন তারা ব্যাপকভাবে আরম্ভ করলে এখানে। প্রসিদ্ধ পাদ্রী উইলিয়ম কেরী স্ত্রীপুত্রসহ এদেশে এসে মালদহের অন্তর্গত মদ্‌নাবতীর নীলকুঠিতে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে চাকরি নিয়েছিলেন। শ্রীরামপুর ছাপাখানার জন্ম এই মদ্‌নাবতীতে।

উইলিয়ম কেরীর কথা থেকে আর একটি বিষয় এখানে এসে পড়ল। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশে যে প্রভুত্ব স্থাপন করেছে তার কোন ভাগীদার সে যেমন সহ্য করতে পারত না, তেমনি এদেশীয় লোকদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতিতে কেউ কোন রকম ব্যত্যয় ঘটাবার চেষ্টা করে এ-ও সে চাইত না। কারণ কোম্পানীর স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের ধারণা ছিল, এরূপ কার্য্যে জনসাধারণ তাদের উপর বিরূপ হ'য়ে পড়বে। তাদের ক্ষমতা তখনও এতটা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নি যে, তারা নির্বিচারে এরূপ করতে দিতে পারে। ইংরেজী শিক্ষাদানে কোম্পানীর বিমুখতার মূলেও প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কারণ ছাড়া এরূপ পরোক্ষ সামাজিক কারণও যে না ছিল, এমন নয়। কোম্পানী সে যুগে খ্রীষ্টান পাদ্রীদের এদেশে প্রবেশ নিষিদ্ধ ক'রে দিয়েছিল। তাদের বিশ্বাস, পাদ্রীরা খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করলে তাদের সদ্যপ্রতিষ্ঠিত রাজ্যের ভীষণ ক্ষতি হবে। কিন্তু পাদ্রীরা নাচার। নানা ছল ক'রে তারা এদেশে আসত। কোম্পানী টের পেলেই কিন্তু জাহাজে ক'রে তাদের স্বদেশে চালান ক'রে দিত। উইলিয়ম কেরী খুব কৌশল ক'রে দিনেমার জাহাজে স্ত্রীপুত্রসহ কলকাতায় এসে পৌঁছেন ১৭৯৩ সালে। নানারূপ

ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পরে তিনি শ্রীরামপুরে মিশন প্রতিষ্ঠা করেন এর দু'বছর পরে। কলকাতার গীর্জ্জায় ধর্ম্মোপদেশ দেবার অনুমতিও তাঁকে নিতে হয়েছিল সরকারের কাছ থেকে! যাই হোক, পাদ্রীদের উপর কোম্পানীর বিরাগ শক্তি-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে কমে যায়।

কলকাতার মাদ্রাসা ও কাশীর সংস্কৃত কলেজের কথা আগে উল্লেখ করেছি। রাজনৈতিক কারণে এ দুটির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বটে, কিন্তু প্রাচ্য বিদ্যা শিক্ষার কেন্দ্ররূপেও এ দুটি পরে পরিণত হ'ল। সার্ উইলিয়ম জোন্স ইংরেজী ১৭৮৪ সালের জানুয়ারী মাসে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। সোসাইটির মুখপত্র হ'ল 'এশিয়াটিক রিসার্চেস'। এর বিশ খণ্ড পর পর বের হয়। এ পত্র পরে 'এশিয়াটিক সোসাইটি জার্ন্যাল' নাম গ্রহণ করে। এশিয়ার বিভিন্ন দেশসমূহের, বিশেষ ক'রে ভারতবর্ষের, ধর্ম্ম, সংস্কৃতি, ইতিহাস, সাহিত্য, সভ্যতা সম্বন্ধে গবেষণা পরিচালন এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্দেশ্য। 'এশিয়াটিক রিসার্চেস' পত্রিকায় এসব গবেষণা প্রকাশিত হ'ত। সার্ উইলিয়ম জোন্সের নেতৃত্বে একদল ইংরেজ এই গবেষণা কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। জোন্স বাদে গ্ল্যাডউইন, উইনফ্রেড, উইলকিন্স, প্রিন্সেপ, কোলব্রুক, হর্টন, উইলসন প্রমুখ প্রাচ্য ভাষাবিদ্ পণ্ডিতগণ এই বিষয়ে ক্রমে আত্মনিয়োগ করেন। 'এশিয়াটিক রিসার্চেস্' পাঠ করলে এঁদের অনুসন্ধান কতটা সুদূরপ্রসারী ছিল তা বেশ বোঝা যায়। বহু দুষ্কৃতির জন্য হেষ্টিংসের শাসন কলঙ্ক-কালিমায় লিপ্ত, কিন্তু তাঁর একটি সুকৃতির কথা আমাদের অবশ্যস্বীকার্য্য। তিনি সার্ চার্লস্ উইলকিন্সকে গীতার ইংরেজী অনুবাদে সহায়তা করেছিলেন। এইরূপে গীতার মহিমা বিদেশে প্রথম প্রচারিত হ'তে পায়। সংস্কৃত সাহিত্যের উপর তাঁর খুব দরদ ছিল। জার্ম্মান-কবি গ্যেটে শকুন্তলার অনুবাদের অনুবাদ প'ড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তখনও সাধারণ ইংরেজের মনে বিজেতা-বিজিতবোধ বা সাম্রাজ্যবোধ জাগে নি। কাজেই তাঁরা অকুণ্ঠচিত্তে সংস্কৃত সাহিত্যের মহিমা স্বীকার করতে পেরেছিলেন, এবং তাঁদের কেউ কেউ শ্রদ্ধান্বিত হ'য়ে এর চর্চ্চায় এমনিভাবে মনঃসংযোগ করতেও সক্ষম হয়েছিলেন।

এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না। কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠাতা তারাই। লর্ড ওয়েলেস্লীর

আগ্রহাতিশয়ে ১৮০০ সালে এ কলেজটি স্থাপিত হয়। এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যে-সব যুবক সিবিলিয়ান বিলাত থেকে নিযুক্ত হ'য়ে ভারতবর্ষে আসত—আরবি, ফার্সি ও সংস্কৃত এবং এদেশীয় ভাষাসমূহের সঙ্গে তাদের ওয়াকিবহাল করা। কিন্তু এর একটি ফল হয়েছিল খুবই শুভ। ওদিকে দেশের নানা স্থান থেকে পণ্ডিত সংগ্রহ ক'রে অধ্যাপনা-কার্য্যে নিয়োজিত করা হ'ল। বাংলা, মরাঠী, উড়িয়া, হিন্দুস্তানী নানা ভাষাভাষী পণ্ডিতদের সমাবেশ হ'ল কলকাতায়। সরকারী সাহায্যে দেশী ভাষায় নানা পুস্তক প্রকাশিত হ'তে লাগল। সংস্কৃত ও বাংলার অধ্যাপক হলেন পূর্ব্বোল্লিখিত পাদ্রী উইলিয়ম কেরী। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রমুখ বহু বিদ্বজ্জন ছিলেন তাঁর সহকারী। বাংলা সাহিত্যে এঁদের দান আজ সর্ব্বজনবিদিত। এঁদের কেউ কেউ বাংলা গদ্যের প্রথম লেখক ব'লেও পরিচিত। উইলিয়ম কেরী ছিলেন আবার শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশনেরও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। এখানেও প্রাচ্য ভাষার আলোচনা চলত খুব। একদিকে যেমন এইরূপ, অন্যদিকে ইংরেজ সিবিলিয়ান-গণ প্রাচ্য ভাষাসমূহের মহিমা অনুভব করতে সক্ষম হলেন। রাজ-কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে কেউ কেউ সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ্চাও অটুট রেখেছিলেন। সুপণ্ডিত সার্ জন কোলব্রুক এইরূপ একজন সিবিলিয়ান। পাশ্চাত্যের পক্ষে প্রাচ্যের জ্ঞানগরিমা উপলব্ধি করা এঁদের মারফত বিশেষ ক'রে সম্ভব হ'ল। আত্মবিস্মৃত ভারতবাসীর নিকটও তার নিজস্ব সম্পদ অতুল ঐশ্বর্য্য নিয়ে উদ্ভাসিত হ'ল।

নানা দিক থেকে বাংলা ভাষারও বনিয়াদ পাকা হয় এ সময়ে। উইলকিন্স সাহেব হুগলীতে সীসার পাতে ছেনি কেটে বাংলা হরফে বই ছাপবার সুবিধা ক'রে দেন। এ বিষয়ে তাঁর সহকারী হলেন পঞ্চানন কর্ম্মকার। হালহেড ইংরেজী ভাষায় প্রথম বাংলা ব্যাকরণ লিখলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিশের নির্দ্দেশে হেনরি পিট্স ফরষ্টার সর্ব্বপ্রথম বাংলায় দেশীয় আইন সঙ্কলিত করেন। এ আইন কর্ণওয়ালিশ কোড নামে অভিহিত। উইলকিন্সের সহকারী পঞ্চানন কর্ম্মকার শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের বাংলা হরফের ছেনি কাটাতেও নিযুক্ত হয়েছিলেন। বাংলার ছাপাখানার ইতিহাসে উইলকিন্স ও কেরীর সঙ্গে পঞ্চাননকেও আমাদের স্মরণ করতে হয়।

পলাশীর যুদ্ধের পর প্রথম পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাকে ভিত্তি ক'রে ভারতবর্ষের নানা দিকে তারা অভিযান চালায়। মাদ্রাজ তাদের করতলে। দক্ষিণে মহীশূরের টিপু সুলতান তখন ইংরেজের ঘোর বিরোধী। টিপুর বিরোধিতা তখন এমনই চরমে ওঠে যে, নেপোলিয়ন তাঁকে ইংরেজের যোগ্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী জ্ঞানে 'বাদার টিপু' বা 'ভাই টিপু' সম্বোধন ক'রে পত্র লিখেছিলেন।' দক্ষিণ-পশ্চিমে মরাঠা শক্তিও প্রায় অস্তমিত। কোম্পানী পেশোয়ার পক্ষ নিয়ে মরাঠা শক্তির মূলে কঠোর আঘাত দিচ্ছে। ১৮১৭-১৮ সালের শেষ মরাঠা যুদ্ধে মরাঠা শক্তি বিলুপ্ত হ'ল এবং সমগ্র দক্ষিণ ভারত পুরোপুরি ইংরেজের অধীন হ'য়ে পড়ল। পাঞ্জাবে রণজিৎ সিংহ শিখ শক্তি সংহত ক'রে খুবই প্রবল হয়েছিলেন বটে, কিন্তু তিনি বরাবর ইংরেজের বন্ধুই ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর দশ বছর পরে ১৮৪৯ সালে পাঞ্জাব ইংরেজের অধীন হয়।

কিন্তু এ পরবর্ত্তী কালের কথা। নিজামের সাহায্যে টিপু সুলতানকে পরাজিত ক'রেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রকৃত প্রস্তাবে দাক্ষিণাত্যের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত তার আধিপত্য বিস্তার করে। বাংলায় কিন্তু এর বহু পূর্ব্বেই ইংরেজ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যে সমাজ-সংরক্ষণের তাগিদে বাংলার জনকয়েক ধনী-মানী, হিন্দু-মুসলমান একযোগে কোম্পানীর হস্তে দেশ-শাসনের ভার তুলে দিয়েছিলেন, পঞ্চাশ বছরের অবিরাম চেষ্টার ফলে তা অনেকটা সুসিদ্ধ হয়েছে। ধন-প্রাণ, মান-সম্মান বজায় রেখে সমাজে শান্তিতে বসবাস করবার এই যে বাঙালীর আগ্রহ তার জন্য তাকে কম ত্যাগ স্বীকার করতে হয় নি। স্বদেশের শাসনভার বিদেশীর হাতে তুলে দিতে হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে তার শিল্প-বাণিজ্যও বিলুপ্ত হ'ল। বিদেশীর নির্ম্মম কর আদায়ে শেষ শক্তিটুকু পর্য্যন্ত চলে গেল। শান্তি-শৃঙ্খলার কতখানি ব্যাঘাত ঘটলে, স্ত্রী-পুত্র-পরিবার ও ধনপ্রাণ নিয়ে বসবাসের অধিকার থেকে কতখানি বঞ্চিত হ'লে লোকে এতটা ত্যাগ স্বীকার করতে পারে, আজকার দিনে তা কল্পনারও অতীত। কোম্পানীর ভুজাশ্রয়ে বহুকাল-ঈপ্সিত, বহুজন-বাঞ্ছিত শান্তি বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হ'ল। ভূমির বন্দোবস্ত আগে পাঁচশালা, পরে দশশালা ও শেষে চিরস্থায়ী ব্যবস্থায় এসে পাকা হ'য়ে গেল। এই পঞ্চাশ বছরে কত ভূস্বামীর উত্থান হ'ল, কত ভূস্বামীর পতন

হ'ল তার ইয়ত্তা নেই। পরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এক শ্রেণীর স্থায়ী ভূস্বামীর সৃষ্টি হয়। লর্ড কর্ণওয়ালিশ ১৭৯৩ সালে এই ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন ক'রে বাংলা দেশে স্থায়ী শৃঙ্খলা স্থাপন করলেন। সেকালে যত বড়লোক উদ্ভূত হয়েছিল তার অধিকাংশই এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফল। ইংরেজের আশ্রয়ে এক শ্রেণীর বাঙালী আগেই বর্দ্ধিত হ'য়ে উঠেছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফল তারাও অনেকটা ভোগ করতে পেয়েছিল। এই শ্রেণীর বাঙালী বড়লোকদের সঙ্গে কোম্পানীর বড় বড় চাকরেদের বেশ দহরম-মহরম ছিল। সামাজিক মেলামেশা এদের দৈনন্দিন ব্যাপার ছিল। ইংরেজরা কোন কোন ভারতীয় রীতি গ্রহণেও বাধা বা সঙ্কোচ বোধ করত না। লর্ড ক্লাইভ মহারাজা নবকৃষ্ণের বাড়ী হামেশা যেতেন। সাম্প্রতিক কালে লর্ড লিন্‌লিথ্‌গোর বা ওয়াভেলের পক্ষে কলকাতার বা দিল্লীর কোন বড়লোকের বাড়ীতে হামেশা যাতায়াত কল্পনায়ও আসে নি।

ইংরেজ-অধিকৃত অঞ্চলে, বিশেষতঃ বাংলায় যে শ্রেণীর বড়লোকের সৃষ্টি হ'ল, তারা ইংরেজকে পরিত্রাতা ব'লেই গণ্য করতে লাগল। কোনদিন ইংরেজের স্বার্থে ও তাদের স্বার্থে যে সংঘাত উপস্থিত হ'তে পারে, এটা তারা তখন ধারণাই করতে পারে নি। তখন কিন্তু বাঙালী মধ্যবিত্তদের মধ্যেও এক দল নূতন বড়লোকের আবির্ভাব হ'ল। তারা সরকারে ও সওদাগরী আপিসে চাকরি ক'রে সম্পত্তি করলে। ইংরেজদের সম্পর্কে এসে ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার মহিমাও কিছু কিছু বুঝলে। রাজা রামমোহন রায় ভূস্বামীর সন্তান হ'লেও ক্রমে এ শ্রেণীরই মুখপাত্র হ'য়ে পড়েন।

মুক্তিকামী রামমোহন

যে সমাজে রামমোহন রায়ের জন্ম তাকে আমরা সে-যুগের মধ্যবিত্ত সমাজ বলতে পারি। তাঁর জন্ম হয় ১৭৭৪ সালে। এর ত্রিশ বছরের মধ্যে দীর্ঘকাল অনাচার-অত্যাচার সহ্য করার পর এই সমাজ আবার দৃঢ়ীভূত হবার সুযোগ পায়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে ভূমির মালেকানা স্বত্ব স্থির হ'লে মধ্যবিত্ত বাঙালীরা তা থেকে লাভবান হ'তে থাকে। জমিদার-সরকারে ও সওদাগরী অাপিসে চাকরি ক'রেও এরা বেশ দু' পয়সা রোজগার করে। কোম্পানীর নিমক মহালে এজেন্টের পদ নিয়ে বহু মধ্যবিত্ত বাঙালী লক্ষপতি হয়। দ্বারকানাথ ঠাকুর নিমক মহালে চাকরি ক'রে প্রচুর ধনসম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলেন। ১৮১৪ সালের প্রথম ভাগ পর্যন্ত ঢাকা-জালালপুর, রামগড, রংপুর প্রভৃতি স্থানে সেরেস্তাদারী ক'রে রামমোহন এবছরের জুলাই-আগষ্ট মাসে যখন কলকাতায় স্থায়ী বসতি স্থাপন করলেন, তখন তিনি প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী। দেশী-বিদেশী উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে তাঁর খুবই প্রতিপত্তি। তিনি ইতিমধ্যে শ্রীরামপুরের কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ডের সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে তাঁদের সাহায্যে গ্রীক, লাটিন, হিব্রু শিখে নিয়েছেন। বলা বাহুল্য, ইংরেজী ভাষায় এর মধ্যে তাঁর ব্যুৎপত্তি জন্মেছে। ফার্সি ও সংস্কৃত যৌবনেই তিনি আয়ত্ত করেন।

কলকাতায় বসতি-স্থাপনের অনেককাল পূর্ব্বে ১৮১৪ সালের ১০ই এপ্রিল ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনন্দের মেয়াদ ফুরোবার কথা ছিল। এজন্য ১৮১৩ সালে কোম্পানীকে নূতন সনন্দ-দান সম্বন্ধে বিলাতে আলোচনা চলে ও আইন পাস হ'য়ে যায়। রাজ্য-শাসনে ও ব্যবসায়-পরিচালনায় কোম্পানীর এতদিন একচেটিয়া অধিকার ছিল। এবারে কতকগুলি শর্ত্তে অন্যকেও ভারতবর্ষে ব্যবসায় করবার অধিকার দেওয়া হ'ল। উচ্চপদস্থ

কর্ম্মচারী নিয়োগ ব্যতিরেকে দেশ-শাসনের যাবতীয় ভারই কোম্পানীর হস্তে রইল। আর দুটি বিষয় যা স্থির হ'ল তার সঙ্গে ছিল আমাদের শুভাশুভের ঘনিষ্ঠ যোগ। এতদিন কোম্পানীর অধিকৃত রাজ্যে পাদ্রীদের খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারে কোনরূপ উৎসাহ দেওয়া হ'ত না। বরং তাদের এ কার্য্যে নানারূপ বাধারই সৃষ্টি করা হয়েছিল। এবারে ভারতবাসীদের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচারের সমস্ত বাধা প্রকাশ্যভাবে তুলে দেওয়া হ'ল। সরকারী যাজক-বিভাগ খুলে একজন বিশপ ও দু'জন আর্চ্চডিকন সরকারী অর্থে পোষণেরও ব্যবস্থা হ'ল। দ্বিতীয় বিষয়টি হ'ল, ভারতবাসীদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য বাৎসরিক লক্ষ টাকার ব্যয় বরাদ্দ। এ দুটি ব্যাপারে আজ হয়ত মোটেই বিস্ময়ের উদ্রেক হবে না। কিন্তু তখনকার দিনে এ খুব নূতন কার্য্য ব'লেই সাধারণের নিকট অনুভূত হয়েছিল। ধর্ম্ম ও শিক্ষা-বিস্তারের জন্য এদেশে আগমনেচ্ছু লোকদের উপর কোম্পানীর বাধা-নিষেধ রহিত হ'যে গেল।

হিন্দু সমাজ ঘোর সনাতনপন্থী, নূতনের আহ্বান তার কর্ণকুহরে প্রথমে প্রবেশ করে নি। নূতনকে নিজের ক'রে নেবার শক্তি সে বহু দিন হারিয়েছে। ওদিকে খ্রীষ্টান মিশনরীরা গঙ্গাসাগরে সন্তান-বিসর্জ্জন, সতীদাহ-প্রথা প্রভৃতি বহু কুরীতি আর বহু দেবদেবীর পূজার্চ্চনা-বিধি দেখে হিন্দুধর্ম্মের নিকৃষ্টতা প্রচারে কায়মনে লিপ্ত হলেন। তাঁদের মূল উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের অন্ধকার থেকে খ্রীষ্টতত্ত্বের আলোতে সকলকে নিয়ে যাওয়া। শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশন কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ডের নেতৃত্বে এই কার্য্যভার পরিচালনা করে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কেরীর শিক্ষার ফলে সিবিলিয়ানদের ভিতরেও উক্ত মনোভাব বদ্ধমূল হ'তে লাগল। পূর্ব্ব শতাব্দীতে ইংরেজ কর্ম্মচারীরা যেমন এদেশীয়দের আপন ক'রে নিতে পেরেছিল, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে শিক্ষালব্ধ সিবিলিয়ানদের পক্ষে এরূপ করা সম্ভব হ'ল না। ইংরেজ ও ভারতবাসী এ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিচ্ছেদের ভাব এ সময় থেকে সুরু হয় বলা চলে। নূতন সনন্দে যখন স্পষ্ট ক'রে ধর্ম্মপ্রচারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হ'ল, তখন খ্রীষ্টান মিশনরীদের আর কোন বাধাই রইল না। তাদের কার্য্য এর পর পূর্ণোদ্যমে আরম্ভ হ'ল। রামমোহন রায় সুশিক্ষিত। নানা শাস্ত্র আলোচনা ক'রে হিন্দু ধর্ম্মের মূল কথা জেনে নিয়েছেন। স্বদেশবাসীদের গোঁড়ামি ও দৈন্যদশা তাঁকে

যেমন ব্যথিত করলে, খ্রীষ্টান মিশনরীদের অযথা আক্রমণ তাঁকে তার চেয়ে কম পীড়া দিলে না।

কয়েক বছর পূর্ব্বেই ১৮০৪ সালে রাজা রামমোহন একেশ্বরবাদ সমর্থন ক'রে 'তুহ্‌ফাৎ-উল্‌-মুয়াহ্‌দিন' নামে একখানা ফার্সি পুস্তক লেখেন। এবারে কলকাতায় বসবাস আরম্ভ ক'রেই (১৮১৪ সালের মাঝামাঝি) তিনি বেদান্তের ভাষ্য লিখতে প্রবৃত্ত হলেন। হিন্দুশাস্ত্রের সারতত্ত্ব বেদান্ত গ্রন্থ। বেদান্ত একেশ্বরবাদের সম্পূর্ণ পরিপোষক। হিন্দুধর্ম্মের উচ্চতম সাধন এই একেশ্বরবাদ। পৌত্তলিকতার স্থান এতে নেই। সনাতনী হিন্দুগণ তাঁর এ মতবাদের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করলেন। খ্রীষ্টান সম্প্রদায় বহু দেবতার পূজার জন্য হিন্দুধর্ম্মের নিন্দায় পঞ্চমুখ হ'য়ে উঠেছিল। এবারে রামমোহন রায়ের শাস্ত্রব্যাখ্যায় তারাও অনেকটা নিরস্ত হ'তে বাধ্য হ'ল। বস্তুতঃ রামমোহন খ্রীষ্টানদের ত্রিত্ব বা তিন ভগবানের উপাসনার ঘোর সমালোচনা ক'রে তারা যে হিন্দু পৌত্তলিকতার নিন্দাবাদের অনধিকারী তাই প্রমাণ ক'রে দিলেন। একদিকে সনাতনী হিন্দুরা ও অন্যদিকে খ্রীষ্টান পাদ্রীরা তাঁর উপর খড়্গহস্ত হ'ল, কিন্তু কিছুতেই তিনি দমবার পাত্র নন। তিনি পূর্ণ স্বাদেশিক। হিন্দুত্বের দৃঢ় ভিত্তির উপরে দাঁড়িয়ে সকলের সঙ্গে লড়লেন। ১৮১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত রামমোহন রায়ের 'আত্মীয় সভা' উচ্চতর হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজ সংক্রান্ত আলোচনার নিমিত্ত সর্ব্বপ্রথম সংঘবদ্ধ অনুষ্ঠান। এই আত্মীয় সভার অনুক্রম হ'ল ১৮২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মসভা বা ব্রাহ্মসমাজ। পাদ্রীদের আর এক দফা আক্রমণ ছিল হিন্দুদের সামাজিক কুরীতিগুলির উপরে। রামমোহন সতীদাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে দেখিয়ে দিলেন, প্রগতিশীল হিন্দুগণ আত্মসংগঠন ও শুদ্ধিতে সম্পূর্ণ অবহিত। মধ্যযুগের কুসংস্কার সমাজদেহকে কলুষিত করলেও তা একেবারে অস্থি-মজ্জার সঙ্গে মিশে যায় নি। রামমোহন রায়ের ঘোর প্রতিবাদে প্রগতিশীল সম্প্রদায়েরও সমর্থন পেয়ে লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক ১৮২৯ সালে সতীদাহ-প্রথা রহিত করেন। ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কার সংক্রান্ত আন্দোলনে সাহিত্যেরও বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হ'ল।

রামমোহনের কলকাতায় বসতি-স্থাপনের সাত-আট বছরের মধ্যেই এখানে সংস্কৃতিমূলক নানা প্রচেষ্টার সূত্রপাত হয়। এসময়কার দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য

ঘটনা—ভারতবাসীদের চেষ্টায় ইংরেজী শিক্ষা-প্রবর্ত্তন ও দেশীয় ভাষাসমূহে সংবাদপত্র প্রকাশ। দ্বিতীয়টি, অর্থাৎ সংবাদপত্রকে কেন্দ্র ক'রেই রামমোহনের রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন সুরু হয় এবং তাঁর স্বাধীনতা-প্রীতি সাধারণের গোচরে আসে। ১৮১৮ সালের মে-জুন মাসে বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রথম দুখানা বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশ করেন শ্রীরামপুর মিশনের তত্ত্বাবধানে পাদ্রী মার্শম্যানের পুত্র জন ক্লার্ক মার্শম্যান, 'বাংলা গেজেট' প্রকাশিত হয় কলকাতায় গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য ও হরচন্দ্র রায়ের সহযোগে বাংলা গেজেট ছাপাখানা হ'তে। রামমোহনের বন্ধু সিল্ক বাকিংহামের ইংরেজী 'ক্যালকাটা জার্ন্যাল' ১৮১৮ সালের ২রা অক্টোবর প্রকাশিত হ'ল। রামমোহন রায়ের তত্ত্বাবধানে 'সম্বাদ কৌমুদী' বের হয় ১৮২১ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর। তিনি এতে নিয়মিতভাবে প্রবন্ধ লিখতেন। এ প্রবন্ধগুলির ইংরেজী অনুবাদ ক্যালকাটা জার্ন্যালে প্রকাশ করা হ'ত। তখন ফার্সি সমগ্র ভারতের আদালতের ও শিক্ষিত জনের ভাষা। রামমোহন রায় 'মিরাৎ-উল্-আখ্বার' নামক ফার্সী সংবাদপত্র সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ করেন ১৮২২ সালের ১২ই এপ্রিল তারিখে। বাংলা 'সম্বাদ কৌমুদী' ও ফার্সী 'মিরাৎ-উল্-আখবার'-এ রামমোহন নানা বিষয়ে তাঁর স্বাধীন মতামত নির্ভীকভাবে প্রচার করতে লাগলেন।

কিন্তু এরূপ স্বাধীন মতামত প্রকাশ গবর্ণমেণ্টের বেশীদিন বরদাস্ত হ'ল না। তারা সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করতে মনস্থ করল। তাদের এ চেষ্টা নূতন নয়। এদেশের প্রথম সংবাদপত্র, অবশ্য ইংরেজী, ১৭৮০ সালের ২৯শে জানুয়ারী জেম্স আগষ্টাস হিকি সাহেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'বেঙ্গল গেজেট'। প্রকাশের পর দু'বছর যেতে না যেতেই এ কাগজখানাকে কোম্পানী বন্ধ ক'রে দেয়। কারণ, সরকারের মতে হেষ্টিংসের স্ত্রী ও পদস্থ ব্যক্তিদের সম্বন্ধে মানহানিকর মন্তব্য এতে স্থান পেয়েছিল। এর পর ইণ্ডিয়া গেজেট, ক্যালকাটা গেজেট, হরকরা প্রভৃতি আরও কয়েকখানা কাগজ প্রকাশিত হয়। কর্ত্তৃপক্ষ কিন্তু এসব কাগজের উপর মোটেই প্রসন্ন ছিলেন না। কেননা, এসবে শাসন-ব্যবস্থার ও রাজ্যজয়ের গর্হিত উপায়গুলির বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করা হ'ত। একারণে ১৭৯৯ সালের মে মাসে লর্ড ওয়েলেস্লী সর্ব্বপ্রথম এদেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করলেন। নিয়ম হ'ল, গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারীর

দ্বারা পরীক্ষিত না হ'য়ে কোন সংবাদ এমন কি বিজ্ঞাপন পর্য্যন্ত সংবাদপত্রে প্রকাশ করা চলবে না। সতর বছর চলবার পর বড়লাট লর্ড হেষ্টিংস ১৮১৮ সালের ১৯শে আগষ্ট এ আইন তুলে দিলেন। তিনি এর পরিবর্ত্তে এমন কতকগুলি নিয়ম বেঁধে দিলেন যা অমান্য করলে সম্পাদকদের জবাবদিহি করতে হ'ত। কিন্তু কোম্পানীর শাসন-পদ্ধতি ছিল এরূপ যে, নিরপেক্ষ সাংবাদিক তার কঠোর সমালোচনা না ক'রেই পারতেন না। ক্যালকাটা জার্ন্যালের সম্পাদক সিল্ক বাকিংহাম বিরুদ্ধ সমালোচনা ক'রে সরকারের কুনজরে পড়লেন। অস্থায়ী বড়লাট জন এডাম সুপ্রীম কোর্টের সম্মতি নিয়ে ১৮২৩ সালের ৪ঠা এপ্রিল এক কড়া প্রেস আইন জারি করেন। তখন কোন আইন বিধিবদ্ধ করতে হ'লে সুপ্রীম কোর্টেরও সম্মতি নিতে হ'ত। এর পরে বাকিংহামকে জোরপূর্ব্বক স্বদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। আইনে এই নিয়ম হ'ল যে, কাগজ বের করার পূর্ব্বে স্বত্বাধিকারী, মুদ্রাকর ও প্রকাশককে সরকারের নিকট হ'তে লাইসেন্স বা অনুমতি নিতে হবে। ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হলফ ক'রে সেই হলফনামা গবর্ণমেণ্টের চীফ সেক্রেটারীর নিকট পাঠালে তবে লাইসেন্স মিলবে। কোন্ কোন্ বিষয়ের আলোচনা নিষিদ্ধ তার মুদ্রিত বিবরণ পূর্ব্ব হ'তেই সম্পাদককে দিয়ে রাখা হ'ত। এসব সত্ত্বেও আইনবিরুদ্ধ বিষয়ের আলোচনা থাকলে কাগজ বন্ধ ক'রে দেওয়ারও ব্যবস্থা হ'ল।

রামমোহন এরূপ আইন মেনে নিয়ে সংবাদপত্র সম্পাদনা করতে রাজী হলেন না। তিনি এর প্রতিবাদে মিরাৎ-উল্-আখ্বার প্রকাশ বন্ধ ক'রে দিলেন। ১৮২৩ সালের ৪ঠা এপ্রিল তারিখের অতিরিক্ত-সংখ্যায় এই মর্ম্মে লিখলেন,—

"......এ অবস্থায়·কতকগুলি বিশেষ বাধার জন্য, মনুষ্যসমাজে সর্ব্বাপেক্ষা নগণ্য হ'লেও আমি অত্যন্ত অনিচ্ছা ও দুঃখের সঙ্গে এই পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ করলাম। বাধাগুলি এই—

"প্রথমতঃ, প্রধান সেক্রেটারীর সহিত যে সকল ইউরোপীয় ভদ্রলোকের পরিচয় আছে,·তাঁদের পক্ষে যথারীতি লাইসেন্স গ্রহণ অতিশয় সহজ হ'লেও আমার মত সামান্য ব্যক্তির পক্ষে দারোয়ান ও ভৃত্যদের মধ্য দিয়ে এরূপ উচ্চপদস্থ ব্যক্তির নিকট যাওয়া দুরূহ; এবং আমার বিবেচনায় যা নিষ্প্রয়োজন সে কাজের জন্য নানা জাতীয় লোকে পরিপূর্ণ পুলিশ-আদালতের দুয়ার পার

হওয়াও আমার পক্ষে কঠিন। কথায় আছে,—'যে-সম্মান হৃদয়ের শত রক্তবিন্দুর বিনিময়ে ক্রীত, কোন অনুগ্রহের আশায় তাকে দারোয়ানের নিকট বিক্রয় করিও না।'

"দ্বিতীয়তঃ, প্রকাশ্য আদালতে বিচারকদের সমক্ষে স্বেচ্ছায় হলফ করা সমাজে অত্যন্ত নীচ ও নিন্দার্হ ব'লে বিবেচিত হ'য়ে থাকে। তা ছাড়া, সংবাদপত্র-প্রকাশের জন্য এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই যার জন্য কাল্পনিক স্বত্বাধিকারী প্রমাণ করবার মত বে-আইনী ও গর্হিত কাজ করতে হবে।

"তৃতীয়তঃ, অনুগ্রহ প্রার্থনার অখ্যাতি ও হলফ করবার অসম্মানভাজন হবার পরও গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক লাইসেন্স প্রত্যাহৃত হ'তে পারে এ আশঙ্কার ' ন্য সে ব্যক্তিকে অপদস্থ হ'তে হবে, আর এই কারণে তার মানসিক শান্তি বিনষ্ট হবে। কারণ মানুষ স্বভাবতঃই ভ্রমশীল; সত্য কথা বলতে গিয়ে তাকে হয়ত এরূপ ভাষা প্রয়োগ করতে হবে যা গবর্ণমেণ্টের নিকট অপ্রীতিকর হ'তে পারে। সুতরাং আমি কিছু বলা অপেক্ষা মৌন অবলম্বন করাই শ্রেয় বিবেচনা করলাম। —'হাফিজ! তুমি কোণঘেঁষা ভিখারী মাত্র, চুপ ক'রে থাক। নিজ রাজনীতির নিগূঢ় তত্ত্ব রাজারাই জানেন'।"

রামমোহন রায় এই ব'লে পারস্য ও হিন্দুস্থানের পাঠকদের নিকট হ'তে বিদায় নিলেন বটে, কিন্তু এতেই তিনি নিরস্ত হন নি। তিনি এ আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু ক'রে দিলেন। তিনি সুপ্রীম কোর্ট ও বিলাতে রাজ-দরবারে প্রতিবাদ-পত্র প্রেরণ করেন। প্রথমটিতে তাঁর সঙ্গে স্বাক্ষর করেছিলেন চন্দ্রকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, হরচন্দ্র ঘোষ, গৌরীচরণ চট্টোপাধ্যায় ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর। রাজ-দরবারে যে পত্র পাঠিয়েছিলেন তাতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছিলেন যে, মুসলমান আমলে যথেষ্ট সম্মান ও কর্তৃত্ব লাভ করলেও সমাজে নির্বিঘ্নে ও শান্তিতে স্বাধীন মানুষের মত জীবন যাপন করা তখন সম্ভবপর ছিল না। ইংরেজ রাজত্বে তা সম্ভব হচ্ছে ব'লে এ জনপ্রিয়ও হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু এরূপ বিধি-নিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ হ'লে স্বাধীনতার মূলেই কুঠারাঘাত করা হবে। রামমোহনের জীবিতকালে তাঁর চেষ্টা সফল হয় নি। তবে বেণ্টিঙ্ক বড়লাট হ'য়ে এ আইনের বন্ধন অনেকটা শিথিল ক'রে দেন।

রামমোহনের স্বাদেশিকতা ও স্বজাতি-প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায় ১৮২৮

সালের ১৮ই আগষ্ট জে. ক্রফোর্ডকে লিখিত একখানা পত্রে। হিন্দু-মুসলমান স্বাক্ষরিত এক অভিযোগপত্র পূর্ব্ববছর বিধিবদ্ধ জুরি আইনের বিরুদ্ধে ক্রফোর্ডের মারফত পার্লামেণ্টে পেশ করা হয়। এই সঙ্গে ক্রফোর্ডকে লিখিত পত্রে রামমোহন বলেন যে, যে আইন পাস হয়েছে তাতে খ্রীষ্টান জুরিগণ হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকদের বিচারে নিয়োজিত হ'তে পারবেন, কিন্তু হিন্দু ও মুসলমান জুরিরা খ্রীষ্টানদের (এদেশীয় খ্রীষ্টানদেরও) বিচারে নিয়োজিত হ'তে পারবেন না। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে বৈষম্য হিন্দু ও মুসলমানদের পক্ষে মেনে নেওয়া অসম্ভব। এরূপ বৈষম্য যদি চলতে থাকে, তবে ইউরোপীয় জ্ঞানলাভের ফলে শতবর্ষ পরে হ'লেও এমন একদিন উপস্থিত হওয়া অসম্ভব নয় যখন তারা একযোগে অন্যায় ও গর্হিত আইনগুলির বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে লড়বে ও ল'ড়ে তাতে জয়যুক্ত হবে। ভারতবর্ষ আয়ার্লণ্ড নয় যে, দু'চারখানা রণতরীতে সৈন্য পাঠিয়ে তাকে সহজেই সায়েস্তা করা যাবে। ভারতবর্ষ যদি আয়ার্লণ্ডের এক-চতুর্থাংশও উদ্যম ও আগ্রহ দেখায় তা হ'লে, সুদূরবর্ত্তী হ'লেও, তার ধনসম্পদ ও বিরাট্ জনবল নিয়ে সে যেমন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অনুকূল হ'য়ে থাকতে পারে, তেমনি আবার দৃঢ়চিত্ত শত্রু হ'য়েও তার ভীষণ ক্ষতির কারণ হ'তে পারবে।

রামমোহন কিন্তু ভারতের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে ইউরোপীয়দের সহযোগিতা মর্ম্মে মর্ম্মে কামনা করতেন। ১৮১৩ সালের সনন্দবলে বহু ইংরেজ স্বাধীনভাবে ব্যবসায় করতে এদেশে আস্তে থাকে, খ্রীষ্টান পাদ্রীদের উপর থেকে বাধানিষেধও তুলে দেওয়া হ'ল। এদেশীয়দের মধ্যে ধর্ম্ম ও শিক্ষা-বিস্তারের উদ্দেশ্যে বহু লোক এখানে আসতে আরম্ভ করলে। কিন্তু ভারতবাসী ও ইউরোপীয় এ দুই সমাজের মধ্যে যে সহযোগিতা বিদ্যমান ছিল ও যার একান্ত প্রয়োজন, সরকারের অবিবেচনার ফলে তাতে ভাটা পড়বার উপক্রম হ'ল। ইউরোপীয়েরা এদেশে স্থায়িভাবে বসবাস না করায় ভারতবাসীর স্বার্থরক্ষায় আগ্রহশীল হওয়াও তাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। উপরন্তু, সরকারী ব্যবস্থায় প্রতিবছর কর্ম্মচারীদের বেতন, ভাতা, পেন্সন ও ব্যবসায়াদির জন্য বহু কোটি টাকা ভারতবর্ষের বাইরে চলে যেত। এর ফলভোগেও ভারতবাসীরা সম্পূর্ণ বঞ্চিত হ'ত। এ কারণ তখন ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দের স্থায়ী বসবাসের জন্য কলকাতায়

আন্দোলন উপস্থিত হয়। রাজা রামমোহন রায় এ আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুরও তাঁর সহযোগী হন।

দিল্লীর বাদ্‌শার কাছ থেকে রাজা উপাধিতে ভূষিত হ'য়ে রামমোহন ১৮৩০ সালের শেষে বিলাত যাত্রা করেন। তাঁর ইংলণ্ড গমনের উদ্দেশ্য যদিও ভিন্ন প্রকার ছিল তথাপি এ সময়ে তাঁর উপস্থিতি ভারতবর্ষের পক্ষে বড়ই শুভ হয়েছিল। স্বাধীন দেশে বসে তাঁর স্বাধীন মতামত প্রকাশে যেমন সুবিধা হয়েছিল, এদেশে বসে ততটা সুবিধা নিশ্চয়ই হ'ত না। তিনি সর্ব্বদেশের পূর্ণ-স্বাধীনতার পক্ষপাতী। ফরাসী বিপ্লবের ফলে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার বাণী জগতের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। উত্তমাশা অন্তরীপে পৌঁছে স্বাধীন ফ্রান্সের ত্রিবর্ণ পতাকাকে প্রথম সুযোগেই সম্মান দেখাতে রামমোহন ব্যগ্র হয়েছিলেন। এ সময়ে তিনি পায়ে যে আঘাত পান জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তার জের তাঁকে ভোগ করতে হয়। ফরাসী বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতা-প্রচেষ্টা, ইউরোপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির স্বাধীনতা-লাভ, খাস ইংলণ্ড থেকে ধর্ম্মগত বৈষম্য বিদূরণের চেষ্টা—সকল ব্যাপার সম্বন্ধেই তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন, এবং স্বদেশের স্বাধীনতার লক্ষ্য সম্মুখে রেখে সকল কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন। এখানে প্রসঙ্গতঃ ব'লে রাখি যে, ইংলণ্ডে তখন সবে মাত্র রোমান ক্যাথলিকদের নাগরিক অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। তারা এর কিছু আগেও পার্লামেণ্টের বা মিউনিসিপ্যালিটির সভ্য হবার অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। সরকারে চাকরি করতেও তারা পারত না। এ সময় ইংলণ্ডে ক্রীতদাস-প্রথা নিরোধক আইন, ধর্ম্মগত বৈষম্য বিদূরণ আইন যেমন বিধিবদ্ধ হয়, ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীও তেমনি নূতন ক'রে সনন্দ লাভ করে। প্রথমোক্ত কারণ দুটিতে ইংরেজ জাতির উপর শ্রদ্ধা রামমোহনের হয়ত বেড়ে থাকবে, কিন্তু স্বদেশের ও স্বজাতির প্রতি কর্ত্তব্যপালনে যথোচিত আগ্রহ প্রকাশ করতে তিনি কসুর করলেন না।

রামমোহন স্বদেশে খুবই খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন। বিলাত-যাত্রার পূর্ব্বেই ওখানকার শিক্ষিত জনও তাঁর সম্বন্ধে অনেক কিছু জেনে নিয়েছিলেন। তিনি বিলাতে পৌঁছে নানা সভা-সমিতিতে যোগ দিলেন ও বিস্তর সম্মান লাভ করলেন। সনন্দ সম্বন্ধে পার্লামেণ্টারী কমিটি রামমোহনকে সাক্ষ্য দিতে আহ্বান করেন। যে কারণেই হোক, তিনি স্বয়ং উপস্থিত হ'য়ে স্বাক্ষ্য না দিয়ে

বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর মতামত লিখে পাঠালেন। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন-ব্যবস্থা ও ভারতবাসীদের যাবতীয় সমস্যার কথা তিনি এতে উল্লেখ করেছিলেন। তিনি লিখলেন, ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হবার ফলে চল্লিশ বছরের মধ্যে জমিদার-শ্রেণী সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠেছে বটে, কিন্তু প্রজাদের করদান-ব্যবস্থা সুনির্দ্দিষ্ট না হওয়ায় তাদের কোন উপকারই হয় নি। প্রজাসাধারণের উপকারের জন্য জমিদারের করভার লাঘব ক'রে তাদেরও দেয় খাজনা হ্রাস ক'রে দেবার ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। এজন্য সরকারের রাজস্বের যে ঘাটতি হবে তা, বিলাস-দ্রব্যের উপর ট্যাক্স বসিয়ে ও রাজস্ব আদায়ের জন্য উচ্চ বেতনে ইউরোপীয় নিযুক্ত না ক'রে অল্প বেতনে ভারতীয় নিযুক্ত ক'রে পূরণ করা যাবে। আদালতে ও আপিসে ফার্সির পরিবর্ত্তে ইংরেজী ভাষার প্রবর্ত্তন, জুরি দ্বারা বিচার, দেওয়ানী আদালতে এসেসর নিয়োগ, জজ ও রেভিনিউ কমিশনারের পদ এবং জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য স্বতন্ত্র করা, ভারতে ফৌজদারী আইন প্রণয়ন, আইন প্রণয়নকালে গণ্যমান্য ভারতীয়দের পরামর্শ গ্রহণ প্রভৃতি বিষয়-সমূহ সম্পর্কে তিনি অনুকূল মত প্রকাশ করলেন। পার্লামেণ্টে রামমোহনের এসব মত কিছু কিছু গৃহীতও হ'ল।

রামমোহন ১৮৩৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর ইংলণ্ডের ব্রিষ্টল নগরে দেহত্যাগ করেন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদনের জন্য ১৮৩৪ সালের ৫ই এপ্রিল কলকাতার টাউন হলে যে জনসভা হয় তাতে নব্যদলের মুখপাত্র-স্বরূপ রসিককৃষ্ণ মল্লিক মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে, নূতন চার্টার বা সনন্দ বহু বিষয়ে জঘন্য হ'লেও এতে ভারতের পক্ষে যা-কিছু শুভকর বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে তা রামমোহন রায়ের চেষ্টাতেই সম্ভব হয়েছে। রামমোহন ইংলণ্ডবাসীদের বুঝিয়ে দিয়েছেন—ভারতীয়েরা নিজেদের বিষয় ভাববার ও নিজেদের কাজ করবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। রামমোহনের চেষ্টা ও কার্য্য যাচাই ক'রে দেখলে তাঁকে ভারতের মুক্তিসাধনায় অগ্রদূতের সম্মান অবশ্যই দিতে হবে।

ইংরেজী শিক্ষা ও বাঙালীর রাষ্ট্র-চেতনা

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে বহু ইংরেজ মিশনরী ও হিতৈষী ব্যক্তি প্রকাশ্যভাবে এদেশে আগমন করতে সুরু করেন,—পাশ্চাত্য রীতিতে শিক্ষা-বিস্তারেও তাঁরা মন দেন। ১৮১৪ সালে রবার্ট মে নামে জনৈক পাদ্রী এদেশে এসে চুঁচুড়া অঞ্চলে বহু স্কুল-পাঠশালা স্থাপন করেন। বঙ্গদেশে দেশীয়দের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য টোল, বাংলা শিক্ষার জন্য পাঠশালা ও ফার্সি-চর্চ্চারও নানা আয়োজন ছিল। ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও বাঙালীরা তখন অনুভব করতে থাকে। কাজে-কর্ম্মে নিয়ত ইংরেজের সংস্পর্শে তাদের আসতে হ'ত। কাজেই চলনসই রকমের ইংরেজী জানা তখন খুবই দরকার হ'য়ে পড়ে।

কিন্তু আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হ'তে হ'লে ইংরেজী ভাষা শেখা একান্ত প্রয়োজন—মহাত্মা ডেভিড হেয়ারের মনে একথা প্রথম জাগে। তাঁর ও রামমোহনের উপদেশে দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় (বিচারপতি অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পিতামহ) সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সার্ এড্ওয়াড্ হাইড ঈষ্টের নিকট এইরূপ প্রস্তাব করেন। ইষ্ট মহোদয় অতঃপর ১৮১৬ সালের ১৪ই মে নিজ ভবনে মান্যগণ্য হিন্দুদের এক সভা আহ্বান করলেন। বহু সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতও এ সভায় উপস্থিত হলেন। পণ্ডিতদের মুখপাত্র হ'য়ে একজন সার্ ঈষ্টকে শাস্ত্র ও সাহিত্যের প্রতীকস্বরূপ একটি পুষ্প উপহার দেন। তাঁরা একবাক্যে ইংরেজী শিক্ষার জন্য একটি কলেজের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলেন। তাঁরা কিন্তু রামমোহন রায়ের উপর ভয়ানক চটা। এ সম্পর্কে তাঁর নাম উল্লিখিত হ'লে তাঁরা তাঁর সঙ্গে কোন সংশ্রব রাখতেই রাজী হলেন না। কিন্তু তাঁরা তখন বোঝেন নি, তাঁরা যে কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন তার শিক্ষায় পনর বছরের মধ্যে এমন সমাজবিপ্লব আরম্ভ

হবে যা দেখে স্বয়ং রামমোহন রায়ও বিচলিত হবেন। পরবর্ত্তী সভায় (২১শে মে) কুড়ি জন ভারতীয় ও দশ জন ইউরোপীয়কে নিয়ে কলেজ স্থাপনের জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করা হ'ল এবং স্থির হ'ল যে, সার্ হাইড ঈষ্ট বড়লাট লর্ড হেষ্টিংসকে এ প্রস্তাব অবিলম্বে জ্ঞাপন করবেন। কিন্তু পরে প্রকাশ, সরকারের ইচ্ছানুসারে রাজকর্ম্মচারীরা এ ব্যাপারে প্রত্যক্ষ যোগ রাখতে পারবেন না! ঈষ্ট প্রমুখ ব্যক্তিগণ তথাপি ব্যক্তিগত-ভাবে কমিটিকে পরামর্শ দিতে সম্মত হলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তখনও এদেশবাসীদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষাদানে কিন্তু কিন্তু করছিলেন। যা হোক্, কয়েক মাসাবধি হিন্দুদের অবিরত চেষ্টায় এবং কলকাতার বিখ্যাত হিন্দু পরিবারগণের প্রচুর অর্থসাহায্যে ১৮১৭ সালের ২০শে জানুয়ারী ৩০৪নং চিৎপুর রোডস্থ গোরাচাঁদ বসাকের গৃহে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হ'ল। ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষা শেখারই ব্যবস্থা হ'ল এখানে।

রাজা রামমোহন রায় কিন্তু এর কিছু পরেই নিজে একটা ইংরেজী স্কুল পরিচালনা করতে সুরু করেন। তিনি যে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিক্ষার পূর্ণ পক্ষপাতী ছিলেন তার প্রমাণ আমরা আগেই পেয়েছি। ১৮২৩ সালে যখন নূতন সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের আয়োজন হয় তখন তিনি ভারতীয়দের পক্ষে পাশ্চাত্য রীতিতে ইউরোপীয় সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন ক'রে বড়লাট লর্ড আমহার্ষ্টকে একখানা পত্র লেখেন। রামমোহনের প্রস্তাব তখন গ্রাহ্য হয় নি বটে, কিন্তু বার বছর যেতে না যেতেই ১৮৩৫ সালে গবর্ণমেণ্ট ইংরেজী শিক্ষাপ্রবর্ত্তনে বিশেষ মনোযোগী হন। কিন্তু এর পূর্ব্বেই বাংলায় এমন একদল যুবকের আবির্ভাব হ'ল যাঁরা সর্ব্বপ্রথম নিয়মিতভাবে ইংরেজী শিক্ষা লাভ ক'রে ধর্ম্ম ও সমাজের প্রচলিত বিধির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। তাঁদের মতবাদের সম্মুখে রামমোহনের প্রগতিশীল কার্য্যাবলীও যেন ম্লান হ'য়ে গেল। সত্য কথা বলতে কি, রামমোহনও বিপ্লবী কার্য্যকলাপের জন্য তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হ'তে পারেন নি। রামমোহন ধর্ম্মকে ভিত্তি ক'রে সব কাজ করতে চেষ্টা করেছেন, আর এই নব্যদল ধর্ম্মকেই অগ্রাহ্য ক'রে চলেছেন। কিন্তু একমাত্র দেশপ্রীতিই সর্ব্বকর্ম্মে উদ্‌বুদ্ধ করেছিল তাঁদের। আর এই নব-লব্ধ ইংরেজী শিক্ষাই ছিল এর মূলে দায়ী।

১৮১৭-১৮ সালের মধ্যে কলকাতায় স্কুল বুক সোসাইটি ও স্কুল সোসাইটি নামে আরও দুটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। প্রথমটি পাঠ্য পুস্তক প্রকাশ করত। দ্বিতীয়টি কলকাতার পুরাণো স্কুলগুলি সংস্কার ও নূতন স্কুল স্থাপন করতে উদ্যোগী হয়। এর ফলে ইংরেজী শিক্ষাপ্রসারের পথও পরিষ্কার হ'য়ে গেল। এ দুটি ব্যাপারে কিন্তু হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান সমাজের গণ্যমান্য সুশিক্ষিত লোকেরা একযোগে কার্য্য করেছেন। সরকারী কর্ম্মচারীদেরও এসবে যোগদান করতে আপত্তি হ'ল না। স্কুল সোসাইটির অন্তর্গত পাঠশালায় কুড়ি থেকে ত্রিশ জন মেধাবী ছাত্রকে মাসিক বৃত্তি দিয়ে হিন্দু কলেজে পাঠানো হ'ত। বর্দ্ধমানের মহারাজা তেজচাঁদ বাহাদুর, গোপীমোহন ঠাকুর প্রভৃতির দান হ'তে কলেজের সেরা ছাত্রদের আবার মাসিক ষোল টাকা ক'রে বৃত্তি দেওয়া হ'ত। হিন্দু সমাজের যে-সব ছাত্র পরে বিভিন্ন কার্য্যে নেতৃত্বভার গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের অধিকাংশই মেধাবী, অথচ দরিদ্র পরিবারের সন্তান। ওরূপ সাহায্য পেয়েই তবে তাঁদের উচ্চ শিক্ষালাভ সম্ভব হয়েছে।

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পনর বছরের মধ্যেই ইংরেজী শিক্ষার ফল সাধারণে প্রকৃষ্টরূপে অনুভব করতে পায়। কলেজের প্রথম দলের বিখ্যাত ছাত্রদের মধ্যে প্রসন্নকুমার ঠাকুর, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, শিবচরণ ঠাকুর ও কাশীপ্রসাদ ঘোষের নাম করতে হয়। এঁদের ভেতরে তারাচাঁদ ১৮২২ সালে দারিদ্র্যবশতঃ শিক্ষা অসমাপ্ত রেখেই কলেজ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। কাশীপ্রসাদ ১৮২৯ সালে কলেজী শিক্ষা সমাপ্ত করেন। উভয়েই ইংরেজী সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। কাশীপ্রসাদ ইংরেজীতে কবিতা লিখে সে যুগে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন। তাঁর কবিতার মধ্যে দেশপ্রেম সুব্যক্ত। কাশীপ্রসাদ নব্যদলের মত উগ্রপন্থী ছিলেন না। তিনি ১৮৪৬ সালে 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার' নামে একখানা ইংরেজী সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। ১৮৫৭ সালে সিপাহী যুদ্ধের সময় প্রেস আইন বিধিবদ্ধ হ'লে কাশীপ্রসাদ কাগজখানি বন্ধ ক'রে দেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের কৃতির কথা আমরা ক্রমে জানতে পারব।

তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী কাশীপ্রসাদ ঘোষের অগ্রগামী ছিলেন বটে, কিন্তু পরবর্ত্তী

ছাত্রদলের সঙ্গেই ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ। ডিরোজিও অপেক্ষা তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন ও তাঁর কর্ম্মগ্রহণের বহু পূর্ব্বে কলেজ ত্যাগ করেন। তাঁর শিক্ষা সুতরাং তারাচাঁদের উপর কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। তথাপি তাঁর ছাত্রদের মতই তিনিও ঘোর সংস্কারপন্থী ছিলেন, এবং রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে তাঁদের নেতৃত্ব করতেন। তারাচাঁদ রামমোহনের নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় মতবাদের যোগ্য শিষ্য। তিনি কৈশোরে ও যৌবনে রামমোহনের অনুগ্রহ ও সাহায্য লাভ করেন। ১৮২৮ সালে যখন রামমোহন ব্রহ্মসভা বা ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন, তখন তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীই সর্ব্বপ্রথম এর সম্পাদক নিযুক্ত হন। তিনি প্রথম যৌবনে নানা স্থানে কর্ম্ম ক'রে সরকারের অধীনে হুগলী-জাহানাবাদে মুন্সেফী চাকুরি গ্রহণ করেন। এ চাকুরি করবার সময়ই সরকারী বিভাগগুলিতে, বিশেষতঃ আইন-আদালতে প্রচলিত দুর্নীতিগুলির সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ করেন। একজন মিথ্যা সাক্ষ্যদাতাকে মোকদ্দমায় সোপর্দ্দ করবার জন্য তিনি মুন্সেফী চাকুরিতে ইস্তফা দিতে বাধ্য হন। এ ব্যাপারে তাঁর বিপক্ষে প্রধান উদ্যোগী হয়েছিলেন হুগলীর ইউরোপীয় ম্যাজিষ্ট্রেট। এই ম্যাজিষ্ট্রেট-পুঙ্গবের প্ররোচনায় উক্ত সাক্ষী আদালতে হয়রানির জন্য তারাচাঁদের বিরুদ্ধে জজ আদালতে মোকদ্দমা করলে। জজ সাহেব তারাচাঁদের কুড়ি টাকা মাত্র জরিমানা করলেন। এরূপ অল্প জরিমানায় সুপ্রীম কোর্টে আপীল করারও উপায় রইল না। তারাচাঁদ অতঃপর কলকাতায় এসে হিন্দু কলেজের নব্যদলের সঙ্গে প্রগতিমূলক আন্দোলন-সমূহে একান্তভাবে যোগ দিলেন। তিনি সরকারে চাকুরি গ্রহণ করবার পূর্ব্বে ১৮২৭ সালে নূতন শিক্ষার্থীদের জন্য একখানা ইংরেজী-বাংলা অভিধান সঙ্কলন করেন ও তাঁর অন্যতম পৃষ্ঠপোষক রামমোহন-বন্ধু উইলিয়ম এডামের নামে উৎসর্গ করেন। তারাচাঁদের উল্লেখ পরে আমরা আরও পাব। তবে এখানে বলা আবশ্যক, পরবর্ত্তী যুগে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সিবিলিয়ানি চাকুরি থেকে অপসৃত হ'য়ে যেমন স্বদেশসেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তারাচাঁদের জীবনেও আমরা অনুরূপ কার্য্যক্রম লক্ষ্য ক'রে থাকি।

হিন্দু কলেজের শিক্ষায় সত্যিকার দেশপ্রেমে উদ্‌বুদ্ধ হয়েছিলেন এর পরবর্ত্তী যুবক ছাত্রগণ এবং এই ধারা বহু বছর পর্য্যন্ত অব্যাহত ছিল। এই

দেশপ্রেম-শিক্ষায় প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেন একজন যুবক শিক্ষক। তিনি জাতিতে ফিরিঙ্গি, নাম—হেন্‌রি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। ফিরিঙ্গি হ'লেও তিনি জন্মভূমি ভারতবর্ষকেই স্বদেশ ব'লে মনে করতেন। তিনি ছিলেন স্বভাবকবি। ১৮২৬ সালের মে মাসে হিন্দু কলেজে কর্ম্মগ্রহণকালেই, মাত্র সতর বছর বয়সের হ'লেও, তিনি বহু কবিতা লিখেছিলেন এবং কলকাতার 'ইণ্ডিয়া গেজেট' নামক প্রগতিপন্থী সংবাদপত্র তা প্রকাশও করেছিল। ১৮২৭ সালে তাঁর প্রথম কবিতা-পুস্তক বের হয়। তাঁর স্বদেশপ্রেমব্যঞ্জক কবিতা 'ফকির অফ জাংঘিরা' নামক কাব্যের মুখবন্ধ। এই কবিতাই স্বদেশ-প্রেমের প্রথম কবিতা। কবিতাটি এই—

My country ! in thy days of glory past
A beautious halo circled round thy brow,
And worshipped as a deity thou wast—
Where is thy glory, where that reverence now ?
Thy eagle pinion is chained down at last,
And grovelling in the lowly dust art thou,
Thy minstrel hath no wreath to weave for thee
Save the sad story of thy misery !
Well—let me dive into the depths of time,
And bring from out the ages that have rolled
A few small fragments of those wrecks sublime,
Which human eye may never more behold ;
And let the guerdon of my labour be,
My fallen country ! one kind wish for thee !

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এর এরূপ অনুবাদ করেছেন,—

স্বদেশ আমার ! কিবা জ্যোতির মণ্ডলী
ভূষিত ললাট তব ; অস্তে গেছে চলি
সে দিন তোমার ; হায় ! সেই দিন যবে
দেবতা সমান পূজ্য ছিলে এই ভবে !

কোথায় সে বন্দ্যপদ ! মহিমা কোথায় !
গগনবিহারী পক্ষী ভূমিতে লুটায়।
বন্দীগণ বিরচিত গীত উপহার
দুঃখের কাহিনী বিনা কিবা আছে আর ?
দেখি দেখি কালার্ণবে হইয়া মগন
অন্বেষিয়া পাই যদি বিলুপ্ত রতন।
কিছু যদি পাই তার ভগ্ন অবশেষ
আর কিছু পরে যার না রহিবে লেশ।
এ শ্রমের এই মাত্র পুরস্কার গণি ;
তব শুভ ধ্যায় লোকে, অভাগা জননী !

শিক্ষাদানের সুযোগ পেয়ে যুবক ডিরোজিও ছাত্রদের মনে দেশপ্রেমের বীজ প্রথমেই বপন করেছিলেন। স্বাধীনতা হ'ল তাঁর জীবনের মূল মন্ত্র। ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্র সর্ব্ব বিষয়ে ছাত্রদল যাতে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শেখে ডিরোজিও এই শিক্ষাই তাঁদের দিতেন। কলেজে ইংরেজী সাহিত্য ও দর্শনের মূল কথা তাদের অন্তরে গেঁথে দিলেন। কিন্তু এমন অনেক বিষয় আছে যার শিক্ষাদান কলেজ-গৃহে বসে সম্ভব নয়। এজন্য তাঁর নেতৃত্বে একাডেমিক এসোসিয়েশন নামে এক বিতর্ক সভার সৃষ্টি হ'ল। ডিরো-জিও-র সভপতিত্বে ছাত্রগণ সাহিত্য, দর্শন, কাব্য প্রভৃতি বিষয়ক আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রমূলক নানা প্রশ্ন, যেমন পৌত্তলিকতা, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, নাস্তিক্যবাদ, সত্যবাদিতা, জাতিভেদ, স্বদেশপ্রেম প্রভৃতি সম্বন্ধেও প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতাদি করতেন। ডিরোজিও হেয়ার সাহেবের পটলডাঙ্গা স্কুলেও প্রতি সপ্তাহে নীতি ও সাহিত্য-বিষয়ক ধারাবাহিক বক্তৃতা দিতেন। আর এ সবের শ্রোতাও অধিকাংশই তাঁর ছাত্রদল। তাঁর এই ছাত্রদলের মধ্যে রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, রামতনু লাহিড়ী, প্যারীচাঁদ মিত্র, শিবচন্দ্র দেব, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, আর যাঁরা তাঁর নিকট কলেজে পড়েন নি অথচ তাঁর নিকট হ'তে প্রেরণা লাভ করেছিলেন তাঁদের ভিতরে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, হরচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি দেশের নানা কার্য্যে

পরবর্ত্তী কালে নেতৃত্ব ক'রে গেছেন। বাঙালীকে স্বদেশপ্রেম শেখাবার কৃতিত্ব বঙ্কিমচন্দ্র যে দু'জনকে অর্পণ করেছেন তাঁদের মধ্যে ডিরোজিও-শিষ্য রামগোপাল ঘোষ একজন।

নূতন শিক্ষার প্রেরণা পেয়ে ছাত্রদল সমাজের ও ধর্ম্মের প্রচলিত সকল বিধির উপর বিরূপ তো হলেনই, উপরন্তু তা ভঙ্গ করতেও লেগে গেলেন। সে-যুগে বিজাতীয়ের নিকট হ'তে আহার্য্য-গ্রহণ, গো-মাংস-ভক্ষণ প্রভৃতি কর্ম্ম কতখানি সাহসের বিষয় ছিল আজ হয়ত আমরা তা কল্পনাও করতে পারব না। এই নব্যদলের ধর্ম্মহীনতা প্রগতিপন্থী রামমোহনের প্রাণেও ব্যথা দিয়েছিল।

প্রাচীন হিন্দু সমাজ এ সব অনাচার দেখে কেঁপে উঠল। যে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্ত্তনে হিন্দু-প্রধানগণ একদিন অগ্রণী হয়েছিলেন তার ফল দেখে তাঁরা চম্‌কে উঠলেন। কলেজ কমিটির অধিকাংশ হিন্দু সভ্যরা এজন্য ডিরোজিও-কে দোষী সাব্যস্ত করলেন। হিন্দু কলেজ থেকে ডিরোজিও ১৮৩১ সালের ২৫শে এপ্রিল অপসৃতও হলেন। তখনকার দিনের হিন্দু-প্রধানেরা ডিরোজিও-র শিক্ষার সুদূরপ্রসারী ফল কল্পনাও করতে পারেন নি। হিন্দু যুবকগণ ইংরেজী সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও রাষ্ট্রনীতি চর্চ্চা ক'রে সকল বিষয়ে স্বাধীন মতামত গঠন করলেন। এ সবের নিরিখে স্ব-সমাজের হীন দশা যাচাই ক'রে তার উন্নতি করতেও তাঁরা তৎপর হয়েছিলেন খুব। আর এ সকলেরই মূলে ছিল ডিরোজিও-র শিক্ষা। রাধানাথ শিকদার তাঁর আত্মচরিতে যথার্থই লিখেছেন,—

"ডিরোজিও দয়ালু ও স্নেহশীল শিক্ষক ছিলেন। তিনি প্রথমতঃ জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের উপদেশ দিতেন। এ শিক্ষা অমূল্য। তাঁর শিক্ষাগুণে সাহিত্যিক যশোলাভের আকাঙ্ক্ষা আমার মনে এমনিভাবে নিবদ্ধ হয়েছে যে, তা আজও আমার সকল কর্ম্মকে নিয়মিত ও অনুপ্রাণিত করছে। তাঁরই নির্দ্দেশে আমি দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে আরম্ভ করি। তাঁর নিকট হ'তে এমন কতকগুলি উদার ও নীতিমূলক ধারণা লাভ করেছি, যা চিরকাল আমার সকল কর্ম্ম প্রভাবিত করবে। বড়ই দুঃখের বিষয়, ভারতবর্ষের উন্নতির নানারূপ জল্পনা-কল্পনার মধ্যে যৌবনে পদার্পণ করতেই

তিনি প্রাণত্যাগ করেন। নিশ্চিত বলতে পারি, সত্যানুসন্ধিৎসা ও পাপের প্রতি ঘৃণা—যা সমাজের শিক্ষিত জনের মধ্যে এখন এত অধিক দেখা যায় এবং যা ভারতবাসীর পক্ষে হিতকর না হ'য়েই যায় না—এ সকলের মূলে ছিলেন একমাত্র তিনিই।"

কর্ম্ম থেকে অপসৃত হবার পর ডিরোজিও স্ব-সমাজের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। ১৮৩১ সালের ১লা জুন তিনি 'ঈষ্ট ইণ্ডিয়া' নামক দৈনিক কাগজ প্রকাশ করেন। কিন্তু এ কাজ তিনি বেশীদিন করতে পারেন নি। ঐ সালের ২৬শে ডিসেম্বর তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন।

ডিরোজিও-র শিষ্য-দলের যে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখে হিন্দু সমাজ এতটা বিচলিত হয়েছিল তা কিন্তু বেশীদিন স্থায়ী হয় নি। আলেকজাণ্ডার ডাফ প্রমুখ খ্রীষ্টান পাদ্রীগণ এই সুযোগে তাঁদের খ্রীষ্টান করবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু একমাত্র কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া আর কেউ খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণও করেন নি। এতদিন পরে আজ একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, কৃষ্ণমোহনের উপরে হিন্দু সমাজ অযথা খড়্গহস্ত না হ'লে তিনিও স্ব-ধর্ম্ম ত্যাগ করতেন না। অন্যান্য সকলে সমাজে রয়ে গেলেও তাঁদের বিপ্লবী মন কিন্তু বহুদিন সক্রিয় ছিল। কৃষ্ণমোহন 'দি পারসিকিউটেড' নামে পঞ্চাঙ্ক ইংরেজী নাটক লিখে হিন্দু-সমাজে প্রচলিত ভণ্ডামি জনসমক্ষে ধ'রে দিলেন।

তাঁর 'এন্‌কোয়ারার' সাপ্তাহিক হিন্দু সমাজের দোষ-ত্রুটি উদ্‌ঘাটন ক'রে দেখাতে কসুর করত না। দক্ষিণারঞ্জন ও রসিককৃষ্ণ পর পর 'জ্ঞানান্বেষণ' নামে—প্রথমে বাংলা, ও পরে ইংরেজী-বাংলা—দো-ভাষী একখানা সাপ্তাহিক প্রকাশ করলেন। এ কাগজখানিরও অন্যতম মূল উদ্দেশ্য ছিল সমাজসংস্কার। তবে এ ক্রমে নব্যদলের রাজনৈতিক মুখপত্রে পরিণত হয়। তাঁদের প্রগতিশীল মতামতই এতে স্থান পেত। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে এ কাগজখানির সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। জ্ঞানান্বেষণ পত্রের মটো বা শিরোভূষণ ছিল—

এহি জ্ঞান মনুষ্যানামজ্ঞানতিমির হর।
দয়া সত্যঞ্চ সংস্থাপ্য শঠতামপি সংহর॥

কবিতার বঙ্গানুবাদ ছিল এই—

বাঞ্ছা হয় জ্ঞান তুমি কর আগমন।
দয়া সত্য উভয়কে করিয়া স্থাপন॥
লোকের অজ্ঞানরূপ হর অন্ধকার।
একেবারে শঠতারে করহ সংহার॥

জ্ঞানান্বেষণের কর্ম্মি-সম্পাদক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য (গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্য) তাঁদের নির্দ্দেশে এই মটোটি ও তার বাংলা লিখে দেন। এই গৌরীশঙ্কর 'সম্বাদ ভাস্করের' সম্পাদকরূপে পরে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। তিনিও ছিলেন প্রগতিপন্থী।

ডিরোজিও-শিষ্যদল এই আদর্শ সম্মুখে রেখে সমাজ ও স্বদেশ সেবায় উদ্‌বুদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁদের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, তাঁরা নিজেরা দরিদ্র হ'লেও যে জ্ঞান অর্জ্জন করেছেন, স্বদেশবাসীদের ভিতর সেইরূপ জ্ঞান বিতরণ করা। ছাত্রাবস্থা থেকেই তাঁরা এ কার্য্যে ব্রতী হন। ১৮৩০ সাল থেকে ১৮৪০ সাল পর্য্যন্ত কলকাতায় ও কলকাতার আশেপাশে বহু অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। আর এ কার্য্যের প্রধান উদ্যোক্তা ও পথপ্রদর্শক ছিলেন এই ডিরোজিও-শিষ্যদল। তাঁদের অনেকেই এই সময়ে বিস্তর স্কুল-পাঠশালা প্রতিষ্ঠা ক'রে স্বয়ং ছেলেদের শিক্ষাদান করতেন।

নব্যদল ১৮৩৩ সালের পূর্ব্বেই একে একে হিন্দু কলেজের শিক্ষা সম্পন্ন ক'রে বের হ'য়ে পড়লেন। বয়োজ্যেষ্ঠদের ভিতর কৃষ্ণমোহন ও রসিককৃষ্ণ প্রথমে হেয়ার সাহেবের স্কুলে শিক্ষকতা করেন। পরে সমাজবিরোধী কার্য্যের জন্য তাঁরা স্কুল ত্যাগ করতে বাধ্য হন। অতঃপর কিছুকাল তাঁরা সংবাদপত্র-সেবায় ব্যাপৃত হ'য়ে পড়েন, একটু আগেই তা বলা হয়েছে। এসময় থেকেই কেউ কেউ সাংসারিক প্রয়োজনবশে সরকারী চাকরি নিতে বাধ্য হন। রাধানাথ শিকদার জর্জ্জ এভারেষ্টের অধীনে সার্ভে বিভাগে মাত্র ত্রিশ টাকা মাসিক বেতনে ঢুকেছিলেন, পরে ছ-শ টাকা পর্য্যন্ত তাঁর বেতন হয়। অঙ্কশাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। বহু বিদেশী বিদ্বজ্জনমণ্ডলী থেকে তিনি সম্মান লাভ করেছিলেন। তিনি খুব তেজস্বী ও নির্ভীকচিত্ত পুরুষ ছিলেন। সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত থেকেও উচ্চ-নীচ সকল শ্রেণীর লোকের

নিকটই ছিলেন তিনি পরম শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁর চেষ্টায় সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে বিনা পারিশ্রমিকে কুলি খাটানো অর্থাৎ বেগার-প্রথা রহিত হ'য়ে যায়। নব্যদলের আরও অনেকে অবশ্য সরকারী কার্য্যে পরে লিপ্ত হয়েছিলেন।

ইংরেজী শিক্ষার ফলে ভারতীয়দের মনে যে একদা স্বাধীনতা-স্পৃহা প্রবল হ'য়ে উঠবে রামমোহন ছাড়া আরও অনেকের মনে একথা তখন উদয় হয়েছিল। হিন্দু কলেজের মত একটি বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে (পরে কিঞ্চিৎ সরকারী অর্থও এর ভাগ্যে জুটেছিল) যে ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া হ'ত তার ফলাফল দেখে ভারতহিতৈষী ইংরেজগণ যেমন আনন্দিত হয়েছিলেন, তেমনি অন্য এক-দল ইংরেজ শঙ্কান্বিতও হয়েছিলেন খুব। এজন্যই বোধ হয়, ১৮৩৩ সালে প্রদত্ত সনন্দে—শিক্ষা বাবদে ব্যয়ের কোন বরাদ্দ হয় নি। তবে সনন্দ দানের পূর্ব্বে ইংরেজী শিক্ষার আবশ্যকতা ও ফলাফল সম্বন্ধে বহু সরকারী, বে-সরকারী ইংরেজের সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছিল। মেজর জেনারল সার্ লায়ওনেল স্মিথ নামে একজন ইংরেজ কর্ম্মচারী ১৮৩১ সালের ৬ই অক্টোবর পার্লামেণ্টারী কমিটির সম্মুখে সাক্ষ্যদান-কালে ইংরেজী শিক্ষার ফল সম্পর্কে যা বলেন তা আজকের দিনেও খুবই শিক্ষাপ্রদ। তিনি এই মর্ম্মে বলেন, "ইংরেজী শিক্ষার ফলে ভারতবাসীর মনে একদিন আত্মকর্ত্তৃত্ব লাভের বাসনা জাগবে, এবং তখন আমাদের ভারতবর্ষ থেকে চলে আসতে হবে। এতে আমাদের ক্ষতির কোন আশঙ্কা নাই ই বরং কিছু লাভেরই আশা করা যেতে পারে। আমেরিকা যখন ব্রিটেনের অধীন একটি উপনিবেশমাত্র ছিল তখনকার চেয়ে সে এখন স্বাধীন অবস্থাতেই আমাদের বেশী উপকারে আসছে। ভারতবাসীরা স্বভাবতঃই স্বাধীন হ'তে চাইবে। মুসলমান আমলে যে তারা স্বাধীন হ'তে চায় নি তার কারণ, তখন তাদের শিক্ষার কোনরূপ ব্যবস্থা ছিল না। ইংরেজী শিক্ষার ফলে সুতরাং তারা তা চাইবেই। নিজেদের শক্তি সম্বন্ধেও তারা সচেতন হবে ও নিজ শক্তির পরিমাণ বুঝতে পারবে। এর ফল হবে এই যে তারা স্বদেশ থেকে প্রত্যেক শ্বেতকায় ব্যক্তিকে বের ক'রে দিতেও স্বভাবতঃই দ্বিধাবোধ করবে না।"

নব্যদলের রাজনীতি

ডিরোজিও-শিষ্যদল বিপ্লবী মতবাদের জন্য হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান নির্ব্বিশেষে সকলেরই নিকট আতঙ্কের কারণ হ'য়ে উঠেছিলেন। তাঁরা সামাজিক আচার-ব্যবহার যেরূপ ভঙ্গ করতে লাগলেন, তাতে হিন্দু সমাজের শঙ্কার অবধি রইল না। কিন্তু ক্রমে এ দল জনসেবায় মন দিলেন, সমাজও তাঁদের কর্ম্মপ্রণালীকে তেমন সন্দেহের চক্ষে দেখলে না। দশ বৎসরের মধ্যেই সবরকম বিরুদ্ধতা থেমে গিয়ে লোকে তাঁদের কর্ম্মপদ্ধতির হিতকারিতা উপলব্ধি করতে লাগল—ও-যুগের ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেবে।

নব্যদলের দেশাত্মবোধ-প্রকাশের বাহন হ'ল প্রথম থেকেই সংবাদপত্র। হিন্দু কলেজে শিক্ষাকালেই 'পার্থেনন' নামক যে কাগজ এঁরা বের করেছিলেন, তার প্রথম সংখ্যায় স্ত্রী-শিক্ষা ও ইংরেজদের ভারতবর্ষে বাসস্থান সম্বন্ধে প্রস্তাব এবং হিন্দুধর্ম্ম ও সরকারী আইন-আদালতে ব্যয়বাহুল্যের প্রতি দোষারোপ করা হয়েছিল। কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষের বিরোধিতার জন্য এ কাগজখানা দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশ না হ'তেই বন্ধ হ'য়ে যায়। তবে কলেজের কিশোর ও যুবক ছাত্রদের ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতি আলোচনার প্রথম নিদর্শন এতেই পাওয়া গেল। 'এন্‌কোয়ারার' ও 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রের কথা আগে উল্লেখ করেছি। রাজনীতি-চর্চ্চার ধারা এরাই অব্যাহত রাখল। ভারতবর্ষে ইংরেজদের স্থায়িভাবে বসতি-স্থাপনের আন্দোলন রামমোহন রায় কি কারণে সমর্থন করেছিলেন তা আগে বলা হয়েছে। নব্যদল প্রথমে এর সমর্থন করলেও পরে দেখা যায় তাঁদের কেউ কেউ মত পরিবর্ত্তন করেছেন। ইউরোপীয় জাতিগুলির বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ-স্থাপনের ফলে তথাকার আদিম অধিবাসীদের চরম দুর্দ্দশা তাঁদের এই মত পরিবর্ত্তনের কারণ হ'য়ে থাকবে। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কিন্তু অন্য কারণে এদেশে বে-সরকারী

ইংরেজদের আগমন মোটেই পছন্দ করত না। ১৮১৩ সালে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে সনন্দদানের আবেদনে তারা বলেছিল যে, ভারতবর্ষে ইংরেজ বাহুল্য হ'লে আমেরিকা যেমন তাদের হাতছাড়া হ'য়ে গেছে, এ-ও তেমনি তাদের হাতছাড়া হ'য়ে যাবে। যা হোক নব্যদল দেশ-বিদেশের সাহিত্য, ইতিহাস ও দর্শন অধ্যয়ন ক'রে নিজেদের স্বাধীন মত গঠন করেছিলেন, এবং ধর্ম্ম ও সমাজে, এমন কি রাষ্ট্রনীতিতেও তা প্রয়োগ করতে লাগলেন।

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক সনাতন হিন্দু সমাজের প্রবল বাধা সত্ত্বেও সতীদাহ-প্রথা রহিত ক'রে দেন। তিনি সংবাদপত্রের শৃঙ্খল মোচন করেন নি বটে, তবে তিনি সংবাদপত্র আইনের-প্রয়োগও করেন নি। এজন্য তাঁর শাসনকালে (জুলাই ১৮২৮—মার্চ্চ ১৮৩৫) নানা শ্রেণীর বহু কাগজ প্রকাশিত হয়। 'সমাচার চন্দ্রিকা' গোঁড়াপন্থী, সতীদাহ-নিবারক আইনের প্রতিবাদে প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মসভার মুখপত্র। রামমোহন রায়ের 'সম্বাদ কৌমুদী' তখন সতীদাহ-নিবারক আইনের সমর্থক হ'লেও নব্যদলের মতে ছিল ধর্ম্ম ও রাজনীতিক্ষেত্রে মধ্যপন্থী ("Coming as far as half the way on religion and politics" —*Enquirer*)। এ সময়েই ইংরেজী 'রিফর্ম্মার' ও বাংলা 'সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশিত হয়। দেশাত্মবোধের উন্মেষে 'সংবাদ প্রভাকরে'র দান অনন্য-সাধারণ। এর সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখেছিলেন,—

"ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে দেখ দেশবাসিগণে,
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া॥"

এ দুখানা কাগজ সংস্কারবাদী হ'লেও ছিল মধ্যপন্থী এবং নব্যদলের ঘোর বিরোধী। কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে প্রগতিশীল পত্রিকা ছিল 'এন্‌কোয়ারার' ও 'জ্ঞানা-ন্বেষণ'। এ সময়কার উন্নতিমূলক প্রচেষ্টাসমূহের সঙ্গে এরা ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিল।

ইংরেজী ১৮৩৩ সালে আবার কোম্পানীকে নূতন ক'রে সনন্দ দেওয়া হ'ল। ১৮১৩ সালে কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকারে যে সঙ্কোচ

সাধন করা হয়েছিল, কুড়ি বছর পরে তা একেবারে বিলুপ্ত হ'ল। ভারতবর্ষ শাসনের কর্তৃত্বই শুধু কোম্পানীর রইল। ব্যবসায়ের জন্য কোম্পানীর যত ঋণ হয়েছিল, এ সময়ে তা সবই ভারতবর্ষের ঘাড়ে চাপানো হয়। ভারতবর্ষের দ্বার এখন থেকে সকলের নিকটই মুক্ত হ'য়ে গেল। ব্যবসায়-বাণিজ্যে ইংরেজ সাধারণভাবে যোগ দিতে সুরু করলে। তবে লবণ ও আফিম এ দুটি জিনিসের ব্যবসায় গবর্ণমেণ্টের হস্তেই রাখা হয়। গবর্ণমেণ্টের বিনা অনুমতিতে ভারত-বাসীর পক্ষে লবণ উৎপাদন বহু দিন পূর্ব্বেই বে-আইনী ঘোষিত হয়েছিল। ব্যক্তিস্বাধীনতা নষ্ট ক'রে প্রেস আইন, সভা বন্ধ আইন প্রভৃতি যে-সব আইন বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল সনন্দে সে-সব প্রত্যাহারের কোন নির্দ্দেশই ছিল না। ভারতবাসীর শিক্ষা সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা এতে করা হয় নি, পরন্তু ভারতবর্ষে সভ্যতা-বিস্তারের অছিলায় বিভিন্ন খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের হস্তে টাকা দেওয়ারই নির্দ্দেশ ছিল। তবে এ সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্বীকৃত হয়—ভারত-শাসনে ইংরেজদের ন্যায় ভারতবাসীরও সমান অধিকার। জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে যোগ্য বিবেচিত হ'লেই সকলে সরকারী কর্ম্মে নিয়োজিত হ'তে পারবে—সনন্দে এরূপ স্পষ্ট নির্দ্দেশ থাকে। কোম্পানীর যথেচ্ছ শাসনকে সংযত করবার একটি উপায় ছিল সুপ্রীম কোর্ট। কোন আইন পাস করাতে হ'লে এরও সম্মতি নিতে হ'ত কোম্পানীকে। এবারে সুপ্রীম কোর্টের এ ক্ষমতা বিলুপ্ত ক'রে দিয়ে একে তারই অধীন করা হ'ল। কোম্পানীর এই নূতন সনন্দ ভারতে পৌঁছলে দেশী ও বিদেশী (ইংরেজ) গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ এর প্রতিবাদে কলকাতার টাউনহলে ১৮৩৫ সালের ৫ই জানুয়ারী শেরিফ ডব্‌লিউ হিকির সভাপতিত্বে জনসভার অনুষ্ঠান করেন। এ সভার উদ্দেশ্য ছিল কোম্পানীর চার্টার বা সনন্দ সম্বন্ধে ব্রিটিশ সরকারকে পুনর্বিবেচনা করতে অনুরোধ-জ্ঞাপন।

এসময়কার একটি বিষয় কিন্তু খুবই লক্ষ্য করবার মত। এ বিষয়টির উল্লেখ এখানে আরও প্রয়োজন এই কারণে যে, পরবর্ত্তী যুগে ভারতবর্ষ শাসনে ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা যতই প্রকাশ পেতে থাকে, ততই ইংরেজরা ভারতবাসীদের থেকে দূরে সরে পড়তে আরম্ভ করে। কোম্পানীর হস্ত থেকে ইংলণ্ডের রাজার ভারত-শাসন ভার-গ্রহণ উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদকে পূর্ণ ক'রে দেয়। কারণ তখন ভারত-শাসনের স্বার্থ একটা কোম্পানী বিশেষের না হ'য়ে

একেবারে সমগ্র ইংরেজ জাতিরই হ'য়ে যায়। আর ইংলণ্ডেশ্বরের শাসন মানেই তো সমগ্র ইংরেজ জাতিরই শাসন! বে-সরকারী ইংরেজদের উপর কোম্পানীর মনোভাব যে মোটেই প্রসন্ন ছিল না তা তাদের এদেশে অবাধ বাণিজ্য ও বসতিস্থাপনে প্রবল বাধা দেওয়ায় ও প্রেস আইন প্রভৃতি বাহাল রাখায় খুবই প্রতিপন্ন হয়েছে। অতঃপর ব্যবসায়ে ইংরেজ জনসাধারণের অবাধ অধিকার স্বীকৃত হ'লেও দেশ-শাসনে কোম্পানীরই সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব র'য়ে গেল। কাজেই শাসনসংক্রান্ত বিষয়ে ইংরেজ, ভারতবাসী উভয়েই মিলিত হ'য়ে কোম্পানীর কার্য্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাত। এ সময়কার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভাগুলির এই বৈশিষ্ট্য আমরা খুবই লক্ষ্য করি। পরে ইংরেজের স্বার্থ যখন এদেশে বদ্ধমূল হ'য়ে পড়ে তখন তারা ভারতবাসী থেকে নিজেদের আলাদা ক'রে ভাবতে শেখে। এসময়কার ইংরেজদের পরিচালিত সংবাদপত্রগুলিও দু দলে বিভক্ত ছিল। এক দলের কাগজ কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের নির্দ্দেশে পরিচালিত হ'ত। এরা সর্ব্ব-বিষয়ে তাদের স্বার্থ-সংরক্ষণে ব্যাপৃত থাকত। 'জন বুল' (পরে 'ইংলিশ-ম্যানে' পরিণত) কাগজ ছিল এ শ্রেণীর মধ্যে প্রধান। বে-সরকারী ইংরেজরা আইনের নির্দ্দেশ লঙ্ঘন না ক'রে স্বাধীন মতামত প্রকাশ করবার জন্য আর-এক শ্রেণীর কাগজ বার করে। এদেশীয়েরাও এ শ্রেণীর কাগজের পৃষ্ঠপোষকতা করত। 'ইণ্ডিয়া গেজেট' (পরে 'বেঙ্গল হরকরা'য় পরিণত) ছিল এই দলের মুখপত্র। এছাড়া 'গবর্ণমেণ্ট গেজেট', 'ক্যালকাটা কুরিয়র' প্রভৃতি কতকগুলি মধ্যপন্থী কাগজও ছিল।

যে কথা বলছিলাম। সনন্দের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-সভায় বে-সরকারী গণ্যমান্য ইংরেজগণ ও ভারতবাসীরা যোগদান করেছিলেন। এ সভায় প্রগতিপন্থীদের অগ্রণী 'জ্ঞানান্বেষণ' সম্পাদক রসিককৃষ্ণ মল্লিকই ভারত-বাসীদের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করলেন। এ সনন্দ ভারতবাসীদের পক্ষে কতখানি অশুভকর, রসিককৃষ্ণ তা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করতে দ্বিধা করেন নি। থিওডোর ডিকেন্স নামে একজন ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে প্রদত্ত সনন্দ সংশোধন ও পুনর্বিবেচনা করতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ জানিয়ে

সভায় যে প্রস্তাব উপস্থিত করেন তাঁর সমর্থনে রসিককৃষ্ণ মল্লিক নিম্ন মর্ম্মে বক্তৃতা করেছিলেন,—

"মিঃ ডিকেন্স পার্লামেন্টের নূতন আইনের গুরুতর দোষক্রটিগুলির উল্লেখ ক'রে বক্তৃতা করেছেন। আমি খুব যত্নসহকারে এ আইন পাঠ করেছি এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, ভারতের অধিকৃত অঞ্চলগুলির সুশাসনের জন্য ধার্য্য হ'লেও এর ধারাগুলি দ্বারা মোটেই ও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। আমি যতই পাঠ করছি ততই এই কথাটি আমার নিকট প্রতিভাত হচ্ছে যে, এ আইনের মূলগত উদ্দেশ্যই হচ্ছে—'স্বার্থ'। এ আইন ভারতবর্ষের উপকারের জন্য বিধিবদ্ধ হয় নি ; কোম্পানীর অংশীদারদের এবং ইংরেজ জাতির উপকারের জন্যই এরূপ আইন করা হয়েছে। কোটি কোটি ভারতবাসীর মঙ্গলের কথা মোটেই আইন-কর্ত্তাদের মনে স্থান পায় নি। মিঃ ডিকেন্স কোম্পানীর ব্যবসাগত ঋণের বোঝা ভারতীয় রাজস্বের উপর চাপাবার বিষয় উল্লেখ করেছেন। আমি এ কার্য্যকে সম্পূর্ণ অসঙ্গত মনে করি, আর এতেই বোঝা গেছে—ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অংশীদারদের স্বার্থই দেখেছেন, আমার স্বদেশবাসীর স্বার্থ মোটেই দেখেন নি। আমরা একেই অত্যধিক ঋণভারে প্রপীড়িত, এর উপর পার্লামেন্ট আবার এই অতিরিক্ত ব্যবসাগত ঋণের বোঝা আমাদের স্কন্ধে চাপিয়েছেন। এ কথা বিবেচনা করা উচিত ছিল যে, ভারতবর্ষের রাজস্বকে এই ঋণের দায়ে আবদ্ধ করা আদৌ যুক্তিযুক্ত কি-না। কারণ যদি কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের বোকামি ও অব্যবস্থার জন্য এ ঋণ হ'য়ে থাকে তাহ'লে এ ভার তাদেরই স্কন্ধে পতিত হওয়া উচিত ছিল, আমাদের স্কন্ধে নয়।

"ডিকেন্স মহোদয় যে-সব বিষয়ের উল্লেখ করেছেন সে সম্বন্ধে কিছু না ব'লে যে দু-একটি বিষয় উল্লেখ করেন নি সে সম্বন্ধে কিছু বলব। আমি জানি, অনেকে হয়ত মনে করেন, সামরিক ও বে-সামরিক খ্রীষ্টান কর্ম্মচারীদের জন্য ধর্ম্মযাজক নিয়োগ যুক্তিযুক্ত। এ কথার যুক্তিযুক্ততা আমিও অস্বীকার করি না। কিন্তু সামান্য অন্নবস্ত্রেরও কাঙ্গাল দুর্গত ভারতবাসীদের কষ্টার্জ্জিত অর্থ—ভারতীয় রাজস্ব কেন তাদের ভিতরে এমন একটি ধর্ম্মপ্রচারের জন্য ব্যয়িত হবে

যা তারা ঐহিক ও পারত্রিক সুখের পরিপন্থী বলে মনে করে? খ্রীষ্টান সামরিক ও বে-সামরিক কর্ম্মচারীদের জন্যই যদি শুধু এ ব্যবস্থা হ'ত তাহ'লে হয়ত বিশেষ কিছু বলবার থাকত না। কিন্তু এখানে এর চেয়ে অধিক কিছু করা হয়েছে। আইনে এই মর্ম্মে বলা হয়েছে যে, বড়লাট ইচ্ছা করলে বিলাতের কর্ত্তাদের অনুমতি নিয়ে চার্চ্চ অফ্ ইংলণ্ড এণ্ড আয়ার্লণ্ড ও চার্চ্চ অফ্ স্কটল্যাণ্ড ব্যতিরেকে অন্যান্য যাজক-সম্প্রদায়কেও এদেশীয়দের খ্রীষ্টতত্ত্ব শেখাবার জন্যে এবং গীর্জ্জাদি নির্ম্মাণের জন্যে অর্থ সাহায্য করতে পারবেন। এ দ্বারা কি এ কথাই স্পষ্টই বুঝায় না যে, ভারতবাসীদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তা তাদের এমন একটি ধর্ম্মে দীক্ষাদানে ব্যয়িত হবে, যে ধর্ম্মকে তারা মোক্ষলাভের পক্ষে সম্পূর্ণ ক্ষতিকর ব'লে মনে করে? এ কি ন্যায্য?—এ কি সঙ্গত? যে ধর্ম্ম নিয়ে ওঁরা এত গর্ব্ব করেন তার শিক্ষা কি এই? আমি তাঁদের ধর্ম্মপুস্তকে এমন কোন শব্দ পাই নি যার মানে এই হয় যে, অনিচ্ছুক লোকের নিকট থেকে অর্থ আদায় ক'রে যে ধর্ম্মকে তারা অধর্ম্ম ব'লে মনে করে তাদের মধ্যে সে ধর্ম্ম প্রচার করতে হবে!

"অন্য কোন কোন বিষয়েও ভারতবাসী হিসাবে আমার কিছু বলা আবশ্যক। জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেককেই গবর্ণমেণ্টের সকল রকম কার্য্য করবার অধিকার দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন হয়েছে, এ ব্যাপারে ভারতবাসীদের কোন আপত্তি থাকতে পারে কি-না। আমিও বলি, নিশ্চয়ই কোন আপত্তি থাকতে পারে না। কিন্তু এ বিষয়টি একটু গভীরভাবে আলোচনা করলে আমরা বুঝব, যদিও সনন্দে এরূপ একটা ধারা রয়েছে তথাপি একে ব্যর্থ করবারও যথেষ্ট উপায় করা হয়েছে। আমি (বিলাতের) হেলিবেরি কলেজে অধ্যয়নের অনাবশ্যকতার কথাই বলছি। আমি এ কলেজের কথা অনেক শুনেছি, এবং শুনে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, যত শীঘ্র এর বিলোপ ঘটে ততই সকলের পক্ষে মঙ্গল। ভারতবর্ষে যারা কার্য্য করবে, ভারতবর্ষই তাদের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিদ্যালয়। তারা হেলিবেরিতে যে-সব পাঠ শিক্ষা থাকে তাতে ভারতবাসীদের অভাব-অভিযোগ ও মনোবৃত্তি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মান মোটেই সম্ভব নয়। ভারতবাসীদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ক'রে, কথা ব'লে, তাদের নিকৃষ্টতম কুটীরে গমন ক'রে তবে এরূপ জ্ঞান লাভ

করা সম্ভব। এ ছাড়া ব্যক্তিবিশেষের যতই সদিচ্ছা থাকুক না কেন, সবই বিফল হবে। সাধারণভাবে কলেজ সম্পর্কে আমার এই আপত্তি। কিন্তু আমি অন্য কারণও দেখাচ্ছি যাতে ক'রে ভারতবাসীদের সরকারী কর্ম্মে যোগদানের সুযোগ একেবারে ব্যর্থ হ'য়ে যাবে। যতই দুঃখ করি না কেন, একথা ঠিক যে, সমুদ্রপারে যাওয়া ভারতবাসীরা এখন পাপের কাজ ব'লে মনে করে। শিক্ষার জন্য বছরের পর বছর বিলাতে থাকা—সে ত আরও পাপের কর্ম্ম। ব্যাপার যখন এই, তখন ভারতবাসী কিরূপে ও কাজের যোগ্যতা অর্জ্জন করতে পারবে? হয় তাকে ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতে হবে, নয় তাকে ঐহিক সুখ-সুবিধা ত্যাগ করতে হবে। হিন্দুরা এসব উচ্চ পদের যোগ্য কি-না সে প্রশ্ন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কিন্তু যতদিন তাদের মধ্যে এ সংস্কার থাকবে ততদিন পার্লামেণ্টের এমন কোন ধারা নির্দ্ধারণ করা উচিত ছিল যদ্দ্বারা ভারতবাসীরা সিবিল সার্ভিসে প্রবেশ করতে পারে।

"আমি যতই এ আইন পাঠ করছি ততই বুঝতে পারছি যে, এতে ইংলণ্ডবাসীর ষোল আনা স্বার্থই রক্ষিত হয়েছে। বলা হয়েছে, চা-এর উপর কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার বিলুপ্ত করা হয়েছে, কিন্তু এতে আপত্তির কি কারণ থাকতে পারে? আপত্তির কোনই কারণ নেই, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এ অধিকার বিলুপ্ত করা হয়েছে কেন? ভারতবাসীদের মঙ্গলের জন্য? না। ইংলণ্ডবাসীদের মঙ্গলের জন্যই এ কাজ করা হয়েছে। যদি আমাদের শুভই বিবেচনা করা হ'ত তাহ'লে লবণ ও আফিমের ব্যবসায়ে কোম্পানীর একচ্ছত্র অধিকার বিলুপ্ত হ'ল না কেন? সার্ চার্লস্ গ্রাণ্ট এ সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বটে, কিন্তু কবে যে তা কার্য্যে প্রতিফলিত হবে সে আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

"বড়লাটের অবাধ ক্ষমতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মিঃ ডিকেন্স আপনাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন, ইংলণ্ডের আগেকার দিনের সর্ব্বাপেক্ষা স্বেচ্ছাচারী রাজার চেয়েও ইনি ক্ষমতাশালী। তাঁর ক্ষমতা সংযত করবার উপায় কি? এ আবেদন সাফল্যমণ্ডিত হ'লে অবশ্য একটা উপায় হবে; কিন্তু যে উপায়টি এতদিন বলবৎ ছিল পার্লামেণ্ট তা কেড়ে নিয়েছেন। সুপ্রিম কোর্ট সর্ব্বদা বড়লাটের ক্ষমতার রাশ টেনে রাখত, কিন্তু এখন আর তা হবার জো নেই।

সুপ্রিম কোর্ট এখন বড়লাটের অধীন করা হয়েছে, এবং সম্প্রতি কলকাতার একখানা সংবাদপত্র এরূপ মন্তব্য করেছেন—'যে ইংরেজ জজেরা নিজ স্বাধীনতার জন্য এতদিন আমাদের পরম গর্ব্ব ও গৌরবের বস্তু ছিল, তাঁদের ক্ষমতা অতঃপর বিধিবদ্ধ আইন অনুসারে বিচারকার্য্য পরিচালনায়ই পর্য্যবসিত হবে।'

"মিঃ ডিকেন্স ভারতবর্ষের বাণিজ্য-স্বার্থের কথাও উল্লেখ করেছেন। আমি এ আইনে এরূপ কোন ধারা খুঁজে পাচ্ছি না যার ফলে ব্যবসাগত বাধাগুলি নিরাকৃত হতে পারে। আমার স্মরণ হয়, মিঃ গ্রাণ্ট বলেছেন, ব্রিটিশ বণিকগণ এতই কর্ম্মকুশল যে, তাদের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে তিনি পারেন নি, তাই তিনি চা-এর উপর একচেটিয়া অধিকার তুলে দিয়েছেন। কলকাতার বণিকগণ কতখানি কর্ম্মকুশল বলতে পারি না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ভারতীয় ব্যবসার পক্ষে যে-সব বাধা বলবৎ রয়েছে তা বিদূরিত হ'লে এদেশ অর্থ ও শক্তিসম্পদে আরও অধিক শ্রীসম্পন্ন হতে পারত কি-না?

"আর-একটি বিষয় সম্বন্ধেও আমরা আশা করেছিলাম, ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কিঞ্চিৎ অবহিত হবেন, কিন্তু সে আশা বৃথাই হয়েছে। এ আইনে শিক্ষা সম্বন্ধে একটি কথাও সংযোজিত হয় নি। সামরিক ও বে-সামরিক কর্ম্মচারীদের জন্য দুটি বিশপের পদ সৃষ্টি করা হ'ল, কিন্তু ভারতবাসীর শিক্ষার জন্য কোন ব্যবস্থাই করা হ'ল না! এ অবস্থায় আমরা কি সিদ্ধান্তে উপনীত হই? আইনটি বারবার পাঠ করুন, তাহ'লে আমার কথার সত্যতা বুঝতে পারবেন, কতখানি কুৎসিত আকারে এ আইনটি বিধিবদ্ধ হয়েছে। আমার নিবেদন, আইনের কুৎসিত ধারাগুলির পরিবর্ত্তনের জন্য ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে আবেদন করা হোক। এ আইন ভারতবর্ষে ইংরেজের নাম ও শক্তিকে মসীলিপ্ত করেছে।"

নব্যদলের রাজনীতিক চিন্তা কতখানি ব্যাপক ও কার্য্যকরী ছিল তা পাঠক-পাঠিকা এখন বেশ বুঝতে পারছেন। অদম্য স্বজাতিপ্রীতির মনোভাব নিয়েই যে তাঁরা অতঃপর দেশসেবায় মন দিয়েছেন, রসিককৃষ্ণের বক্তৃতাই তার দ্যোতক।

এখানে আর-একটি বিষয় বলা প্রয়োজন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সঙ্গে ভারতবাসীর রাজনীতিক আন্দোলনের সম্বন্ধ অতীব ঘনিষ্ঠ। রামমোহন রায় থেকেই এর সূত্রপাত হয়। ১৮৩৫ সালের এপ্রিল মাসে স্যার চার্লস মেটকাফ

ভারতের বড়লাট হ'য়েই মুদ্রাযন্ত্রের শৃঙ্খল-মোচনে অবহিত হন এবং পরবর্ত্তী ১৫ই সেপ্টেম্বর আইন জারি করে মুদ্রাযন্ত্রকে স্বাধীনতা দেন। মেটকাফের এই সাধু অভিপ্রায় জেনে কলকাতার দেশী ও বিদেশী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ঐ সালের ৮ই জুন তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাপ্রকাশের উদ্দেশ্যে টাউন হলে এক জনসভা আহ্বান করেন। এখানে তাঁকে এক অভিনন্দন-পত্র দেওয়ার বিষয়ও স্থির হয়। সভায় বাঙালীদের মধ্যে বক্তৃতা করেছিলেন নব্যদলের রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। দক্ষিণারঞ্জনের কথা আমরা পরে আরও জানতে পারব। এসভায় অস্‌বোর্ণ নামে এক সাহেব দেশী সংবাদপত্রগুলির শৃঙ্খলমোচন অনাবশ্যক বলে এক বক্তৃতা করেন। রসিককৃষ্ণ এর একটি চমৎকার মুখরোচক জবাব দেন। তিনি বলেন,—

"অস্‌বোর্ণ স্বীকার করেছেন তিনি দেশীয় সংবাদপত্র বুঝেন না, এমন কি তার নামগুলিও পড়তে পারেন না, অথচ তিনি তাদের দূষছেন ভয়ানক ভাবে! দেশীয় সংবাদপত্রসমূহের বিরুদ্ধে এরূপ মন্তব্যপ্রকাশের পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে আরও কিছু জ্ঞান থাকা তাঁর উচিত ছিল। 'সমাচার দর্পণের' প্রচার বিভিন্ন জেলায়। নানারূপ জ্ঞাতব্য তথ্যে এ কাগজখানি পূর্ণ থাকে। মহাশয় নিশ্চয়ই সংবাদপত্রের আলোচ্য বিষয়গুলি দেখে ঐ সিদ্ধান্ত করেন নি। দেশীয় ও ইউরোপীয় সংবাদপত্রের মধ্যে পার্থক্য করার চেষ্টা এর পূর্ব্বেও হয়েছে, কিন্তু সুখের বিষয়, কর্ত্তৃপক্ষ এতে কর্ণপাত করেন নি। কি দেশীয় কি ইউরোপীয় কোন সংবাদপত্রই উচ্ছৃঙ্খলতা প্রচার করতে পারে না, এবং ইংরেজীর ন্যায় দেশীয় সংবাদপত্র একই আইন দ্বারা শাসিত হ'তে পারে। এদেশীয়দের উপর এরূপ অবিশ্বাস কেন? ভাল মন্দ সকল জাতের মধ্যেই আছে।"

দক্ষিণারঞ্জনের বক্তৃতাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি এই মর্ম্মে বললেন,—"মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার আবশ্যকতা সম্পর্কে সভায় দ্বিমত নাই। তথাপি আমি কিছু বলতে উদ্যত হয়েছি এই জন্য যে, প্রস্তাবিত আইন ভারতবাসীদের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। সার চার্লস মেটকাফ আমাদের সর্ব্বপ্রকারেই ধন্যবাদের পাত্র। মিঃ টার্টনের সঙ্গে আমি একমত যে, আমরা যে স্বাধীনতা চাই তা সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা নয়, তা দায়িত্বপূর্ণ অথচ অবাধ স্বাধীনতা। দোষী

ব্যক্তি আইনের অধীন নিশ্চয়ই হবে। সে যদি দণ্ডার্হ হয় বিচারালয় নিশ্চয়ই তাকে দণ্ড দেবে। আমি এজন্য দুঃখিত যে, প্রস্তাবিত আইন বিধিবদ্ধ না করার জন্য লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের বিরুদ্ধে অভিযোগের যথেষ্ট কারণ র'য়ে গেছে। যদি তিনি এ আইন ভাল বিবেচনা করতেন তবে তাঁর উচিত ছিল এ আইন প্রয়োগ করা, যদি ভাল বিবেচনা না করতেন তবে উচিত ছিল আইনটি তুলে দেওয়া। এর কোনটিই না করা নিছক ভণ্ডামী মাত্র।..."

দক্ষিণারঞ্জন এজন্য বেণ্টিঙ্কের উপর কটূক্তি বর্ষণ করলেও নব্যদল অন্য একটি ব্যাপারে তাঁকে পুরোপুরি সমর্থনই করেছিলেন। বেণ্টিঙ্কই প্রথম ইংরেজী শিক্ষাকে রাষ্ট্রব্যবস্থার একটি প্রধান অঙ্গে পরিণত করেন। পূর্ব্বে কোম্পানী এদেশে ইংরেজী শিক্ষা-প্রচলনের পক্ষপাতী ছিল না। ১৮২৩ সালেও তারা ইংরেজীর বদলে সংস্কৃত, আরবি ও ফার্সি শিক্ষার জন্যই অর্থব্যয়ের ব্যবস্থা করেন। এর বার বছর পরে ভারতবর্ষ ত্যাগের প্রাক্কালে বেণ্টিঙ্ক মহোদয় শিক্ষার ধারা একেবারে বদলে দিয়ে যান। তাঁর একাজে প্রধান সহায় হন আইনসচিব লর্ড মেকলে। তখন 'জেনারল কমিটি অফ পাব্লিক ইনষ্ট্রাকশ্যন' নামে এক শিক্ষা-কমিটি শিক্ষার সব ব্যবস্থা করতেন। এ কমিটিতে একদল ছিলেন প্রাচ্য প্রাচীন ভাষাসমূহ চর্চ্চার পক্ষপাতী, আর-এক দল ছিলেন ইংরেজীর সপক্ষে। বেণ্টিঙ্ক এই দ্বিতীয় দলের মত গ্রহণ ক'রে ১৮৩৫ সালের প্রথমে সরকারী অর্থ প্রধানতঃ ইংরেজী শিক্ষার জন্যই ব্যয়িত হবে স্থির করলেন। নব্যদল তখন তাঁর এ ব্যবস্থা সমর্থন করেন এই আশায় যে, এভাবে শিক্ষা প্রসার লাভ করলে দেশীয় ভাষাগুলি অচিরে সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠবে এবং তখন এসবই শিক্ষার বাহন হবার উপযুক্ত হবে। ভারতের রাষ্ট্রীয় ঐক্যসাধনে বেণ্টিঙ্কের শিক্ষাব্যবস্থা অনেকখানি কার্য্যকরী হয়েছে।

সঙ্ঘবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলন

প্রথম যুগ

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতালাভের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীদের ভিতর রাষ্ট্রীয় আন্দোলনও একটি নির্দ্দিষ্ট ধারায় চলতে সুরু হয়। এত দিন কোন নির্দ্দিষ্ট বিধি বা আইন সম্পর্কে প্রতিবাদ-সভা ক'রে কর্ত্তৃপক্ষকে স্মারকলিপি ও আবেদন-পত্র পাঠান হয়েছে, কিন্তু রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্য নিয়ে কোন রাজনৈতিক সঙ্ঘ বা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় নি। এবারে ১৮৩৬ সালের মাঝামাঝি এরূপ চেষ্টার সূত্রপাত হয়। আর এতে অগ্রণী হয়েছেন দেখতে পাই রামমোহন-সঙ্গিগণ। হিন্দু কলেজের নব্যশিক্ষিত দল উগ্রপন্থী রাজনীতিক। তাঁদের মতে রামমোহন-সঙ্গীরা তখন মধ্যপন্থী হ'য়ে পড়েছেন। নব্যদলের প্রভাব-প্রতিপত্তি তখনও সমাজে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে নি। তাঁরা তখনও কি সনাতনী কি রামমোহন-পন্থী সকলের নিকট হতেই দূরে সরে রয়েছেন। বস্তুতঃ রামমোহন রায়ের বিলাত যাত্রার পর থেকে পাঁচ-ছ বছর পর্য্যন্ত তাঁর সঙ্গিগণ—প্রধানতঃ প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও দ্বারকানাথ ঠাকুর শিক্ষিত সমাজের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। প্রসন্নকুমারের সাপ্তাহিক 'রিফর্ম্মার'-এর কাটতি তখন কলকাতার প্রত্যেকটি সংবাদপত্রের চেয়ে বেশী। এতে প্রকাশিত রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক মতামতের জনপ্রিয়তার এই হ'ল সুতরাং কষ্টিপাথর।

১৮৩৬ সনে ব্রহ্মসভা ও ধর্ম্মসভার দ্বন্দ্ব যদিও অনেকটা হ্রাস পেয়েছে তথাপি, এ সময় রাষ্ট্রীয় আলোচনার জন্য যে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান গড়বার চেষ্টা হয় তাতে ধর্ম্মসভা-পন্থীদের তেমন যোগ দিতে দেখি না। টাকীর জমিদার কালীনাথ রায়চৌধুরী দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, রামলোচন ঘোষ প্রভৃতি রামমোহনের সহচর ও অনুচরগণ অগ্রণী হ'য়ে এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। 'সংবাদ প্রভাকর'-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়'-সম্পাদক হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মুন্‌শী আমীর

প্রমুখ আরও অনেকে এ সঙ্ঘে যোগদান করেছিলেন। এ সঙ্ঘের নাম ছিল 'বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা'। নামে হয়ত একে রাজনৈতিক সভা ব'লে ধারণা হবে না, কিন্তু এ-ই বাঙালী তথা ভারতবাসীদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এর একটি নিয়মে স্পষ্ট উল্লেখ ছিল যে, ধর্ম্ম বিষয়ের বিচার-আলোচনা এখানে হবে না। যে-সব রাজকার্য্যাদির সঙ্গে ভারতবাসীর ইষ্টানিষ্টের ঘনিষ্ঠ যোগ তারই আলোচনা ও বিবেচনা এ সভার মূল উদ্দেশ্য। ১৮৩৬ সালের এই সভা সংগঠিত হয়। ১৮২৮ সালের আইন অনুসারে নিষ্কর ভূমির কর গ্রহণ আরম্ভ হ'লে তার প্রতিবাদে এ সঙ্ঘ একটি জনসভা আহ্বানের চেষ্টা করেন। অন্যতম সভ্য ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বলেন যে, ব্রহ্মসভা ও ধর্মসভার সভ্যগণের মধ্যে তখনও দলাদলি থাকায় এ সঙ্ঘ বেশী দিন স্থায়ী হতে পারে নি।

এ সময়ে সরকার পক্ষ থেকে শাসনের কোন কোন বিভাগে শিক্ষিত ভারতবাসীর নিয়োগ সুরু হয়। ১৮৩৩ সালের সনন্দে জাতি-ধর্ম্ম-নির্বিশেষে দেশ-শাসনে যোগ্য ব্যক্তিদের সমান অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল বটে, কিন্তু এবারেই তা কথঞ্চিৎ কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হ'তে দেখা যায়। হিন্দু কলেজের ছাত্র নব্যদলের অন্যতম রসিককৃষ্ণ মল্লিক, শিবচন্দ্র দেব প্রভৃতি এই সময় রাজ সরকারে ডেপুটী কলেক্টরি কর্ম্মে নিযুক্ত হলেন। তবে এ দলেরও রাজনীতি-চর্চ্চা তখনই সুরু হয়েছিল। কোন সুগঠিত প্রতিষ্ঠানের বদলে সংবাদপত্রই ছিল তখন তাঁদের রাজনীতি-চর্চ্চার একমাত্র বাহন।

বঙ্গভাষা-প্রকাশিকা সভার পর ভূম্যধিকারী বা জমিদার-সভা গঠিত হ'ল। তখন নিষ্কর ভূমির বাজেয়াপ্তি সম্পর্কে সরকার তরফে কতকগুলি নিয়ম চালু হ'তে থাকে। এতে জমিদার বা ভূম্যধিকারীদের সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা। একারণ ভূমিসংক্রান্ত বিষয়গুলির আলোচনার জন্য একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা সকলেই অনুভব করলেন। ব্রহ্মসভা বা ধর্ম্মসভার দলাদলি তখন একদিকে যেমন হ্রাস পেল উপস্থিত বিপদ সকলকে একযোগে কাজ করতেও তেমনি উদ্বুদ্ধ করলে। কাজেই সনাতনী ও সংস্কারপন্থী সকল ভূম্যধিকারীই ১৮৩৭ সালের ১২ই নবেম্বর হিন্দু কলেজ ভবনে সমবেত হ'য়ে একটি ভূম্যধিকারী বা জমিদার-সভা-স্থাপনের মনস্থ করলেন। রাষ্ট্রের

একটি বিশেষ শ্রেণীর রাষ্ট্রগত স্বার্থরক্ষার জন্যই এ সভা স্থাপিত হয়। সুতরাং একে পুরোপুরি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলা চলে না। তথাপি এতে যে নিয়ম অনুসৃত হয়েছিল তা গণতন্ত্রের অনুগ। জাতি-বর্ণ বিভেদ না ক'রে সকলের নিমিত্তই সভা স্থাপিত হয়েছিল। এরূপ নিয়ম হ'ল যে, ভূমির স্বত্বযুক্ত সকল শ্রেণীর ব্যক্তিই এর সভ্য হ'তে পারবেন। কিন্তু তাহ'লেও এই সভা ভূম্যধিকারী সভাই। পরবর্ত্তী ১৯শে মার্চ্চ (১৮৩৮) ভূম্যধিকারী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশী ও বিদেশী, হিন্দু, মুসলমান ও ইংরেজ—ভূমির স্বার্থসম্পন্ন সকলেই এর সভ্য শ্রেণীভূক্ত হলেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য হলেন থিয়োডোর ডিকেন্স, জর্জ্জ প্রিন্সেপ, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ রায়, কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, আশুতোষ দেব, রামরত্ন রায়, রামকমল সেন, মুন্‌শী আমীর, সত্যচরণ ঘোষাল ও রাধাকান্ত দেব। এঁরা প্রত্যেকেই প্রতিষ্ঠাপন্ন ও বর্দ্ধিষ্ণু জমিদার। বলা বাহুল্য, বাধাবিমুক্ত হ'য়ে ইংরেজরাও কেউ কেউ সে সময় এদেশে জমিদারী ক্রয় করেছিলেন। এ সভা ভূমি-সংক্রান্ত নানা বিষয় নিয়ে সরকারের সঙ্গে পত্র ব্যবহার করেন এবং এর ফলে জমীদার প্রজা উভয়েরই অনেক উপকার সাধিত হয়। কখনও কখনও পুলিশ, আইন-আদালত ও রাজস্বসংক্রান্ত বিষয়েও এ সভা মতামত জ্ঞাপন করেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বলেন, দশ বিঘা পর্য্যন্ত ব্রহ্মত্র জমির কর ছাড় দিবার নিয়ম ভূম্যধিকারী সভার উদ্যোগেই হয়েছিল।

ভূম্যধিকারী সভা প্রতিষ্ঠার বছরখানেক পরে ১৮৩৯, জুলাই মাসে রামমোহন রায়ের বন্ধু উইলিয়ম এডাম ইংলণ্ডে ভারতবাসীর কল্যাণার্থে ও ভারত সম্পর্কে ইংরেজ সাধারণের মধ্যে জ্ঞানবৃদ্ধির উদ্দেশ্য নিয়ে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' স্থাপন করেন। এডাম সাহেব আগে পাদ্রী ছিলেন, পরে রামমোহনের প্রেরণায় একেশ্বরবাদী হন। তিনি ভারতবাসীদের একজন হিতৈষী বন্ধু। এদেশে অবস্থানকালে নানা জনহিতকর অনুষ্ঠানে তিনি যোগ দিয়েছিলেন। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক বাংলা ও বিহারের প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার অনুসন্ধানের জন্য এডাম সাহেবকে নিযুক্ত করেছিলেন। এডাম তিন খণ্ড রিপোর্টে তাঁর অনুসন্ধানের ফল ব্যক্ত করেন। তখন এ দুই প্রদেশে অনুমান এক লক্ষ প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল—রিপোর্টে এ কথা লিপিবদ্ধ আছে। ৩০শে নবেম্বর ১৮৩৯ তারিখে ভূম্যধিকারী সভায় উক্ত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির

সঙ্গে সংযোগ-স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। অতঃপর ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি বিলাতে ভূম্যধিকারী সভার পক্ষে আন্দোলন চালাতে থাকেন। ১৮৪১ সনের প্রথম দিকে সোসাইটির মুখপত্রস্বরূপ 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এড্‌ভোকেট' প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদকও হলেন উইলিয়ম এডাম। জর্জ্জ টম্‌সন ক্রীতদাস-প্রথার উচ্ছেদে জোর আন্দোলন চালিয়ে ইতিপূর্ব্বেই ইংরেজ সমাজে মানবহিতৈষী টম্‌সন নামে পরিচিত হয়েছেন। তিনি ভারতবর্ষের প্রতিও সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। টমসন অবিলম্বে লণ্ডনস্থ কমিটির সঙ্গে যুক্ত হলেন।

রামমোহন রায়ের বন্ধু ও সহকর্ম্মী ব'লে দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রথমে হিন্দুসমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি অর্জ্জন করতে পারেন নি বটে, কিন্তু একনিষ্ঠ দেশসেবা এবং দানাদি সৎকর্ম্মের জন্য পরে এর নেতৃস্থানীয় হয়েছিলেন। ভূম্যধিকারী সভারও ছিলেন তিনি প্রাণ। দ্বারকানাথ ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বার বিলাত গমন করেন। সেখান থেকে জর্জ্জ টমসনকে তিনি ঐ বছরের শেষের দিকে কলকাতায় নিয়ে আসেন। ইতিপূর্ব্বেই ভূম্যধিকারী সভার কর্ম্মশৈথিল্য প্রকাশ পেয়েছিল। এ সময় 'ফ্রেণ্ড অফ্‌ ইণ্ডিয়া' বিদ্রূপ ক'রে বলেছেন যে, জর্জ্জ টমসন্‌ এসেই এ সভার দীর্ঘ নিদ্রা ভঙ্গ ক'রে দিয়েছেন! যা হোক, ১৮৪৩, ১৭ই জুলাই তারিখে ভূম্যধিকারী সভায় দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রস্তাবে ও রাধাকান্ত দেবের সমর্থনে জর্জ্জ টম্‌সন বিলাতে তাঁদের এজেণ্ট নিযুক্ত হন। এ সভায় আরও সিদ্ধান্ত হয় যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে তাঁদের অভাব-অভিযোগ জানাবার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র লণ্ডন সোসাইটিতে প্রেরণ করা হবে। কিন্তু ভূম্যধিকারী সভা কিছুদিন পরে আবার নিষ্ক্রিয় হ'য়ে পড়ল।

টম্‌সনের আবির্ভাবে কলকাতায় এমন একটি নূতন প্রতিষ্ঠান গঠিত হ'ল যাকে ভারতে নিয়মানুগ রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রথম উদ্যোগের সম্মান দেওয়া চলে। পূর্ব্ববর্ত্তী সভা দুটিতে নব্যদল যোগদান করেন নি। ভূম্যধিকারী সভায় তা হওয়া সম্ভবও ছিল না। কারণ নব্যদলের প্রায় সকলেই মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। তথাপি তাঁরা রাজনীতিচর্চ্চা বন্ধ করেন নি। জ্ঞানান্বেষণের কর্ম্মি-সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ 'সম্বাদ ভাস্কর' সংবাদপত্র প্রকাশ ক'রে তাতে প্রগতিশীল মতামত ব্যক্ত করতে লাগলেন। নব্যদল শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক কার্য্যে এ সময় মন নিবিষ্ট করেছেন। ১৮৩৮ সনে প্রতিষ্ঠিত সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা

সভায় (Society for the Acquisition of General Knowledge) ইতিহাস, সাহিত্য, বিজ্ঞান শিক্ষা ও রাষ্ট্রবিধি প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে রীতিমত তাঁদের প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা-বিতর্ক চলেছে। তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী এ সভার স্থায়ী সভাপতি ও প্যারীচাঁদ মিত্র সম্পাদক। জর্জ টম্‌সনের ভারতবর্ষে পৌঁছবার কয়েক মাস পূর্ব্বেই ১৮৪২, এপ্রিল মাসে তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, প্যারীচাঁদ মিত্র ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগে রামগোপাল ঘোষ 'বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর' নামে একখানা মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। রামগোপাল এর পূর্ব্বে 'জ্ঞানান্বেষণ'ও কিছুদিন পরিচালনা করেছেন। সংবাদপত্র দ্বারা নিঃস্বার্থ দেশসেবার এ-ই মনে হয় প্রথম নিদর্শন। কারণ পরিচালকগণ আরম্ভেই লিখলেন যে, এ পত্র দ্বারা তাঁরা অর্থোপার্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা করেন না। গ্রাহক বৃদ্ধি হলেই কাগজ মাসে একবারের অধিক প্রকাশ করা হবে। বিদ্যা, কৃষিকর্ম্ম, বাণিজ্য প্রভৃতির সঙ্গে রাজনীতিচর্চ্চাও এর উদ্দেশ্য মধ্যে গণ্য হ'ল। টম্‌সনের কলকাতা পদার্পণের পূর্ব্বেই ঐ বছর সেপ্টেম্বর মাসে এখানি পাক্ষিক পত্রে পরিণত হয়। এখানে একটি কথা মনে রাখা আবশ্যক। নব্যদল রাজনীতিতে প্রগতিপন্থী হ'লেও ব্রিটিশ শাসনকে সর্ব্বদা স্বীকার ক'রে নিয়েই তবে সবরকম আলোচনা চালিয়েছেন। নূতন সোসাইটির নিয়মের মধ্যেও এ কথার স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। দ্বারকানাথ ঠাকুর অনেক ক্ষেত্রে নব্যদলের মতামত সমর্থন না করলেও তাঁদের প্রতি খুবই সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ যে অনেকটা তাঁদের উপর নির্ভর করছে এ বিশ্বাস তাঁর ছিল। এঁদের সঙ্গে জর্জ্জ টম্‌সনকে প্রথম সুযোগেই পরিচিত করিয়ে দিলেন। ১৮৪৩ সালের ১১ই জানুয়ারী সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভার এক অধিবেশনে জর্জ টম্‌সনকে সভার পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানান হ'ল। টম্‌সনও তাঁর ভারত আগমনের উদ্দেশ্য সভায় বিবৃত করলেন। নব্যদল উদ্দেশ্য জেনে তাঁর দিকে অধিকতর আকৃষ্ট হলেন এবং তাঁদের তরফে তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় জনসভার অনুষ্ঠানের ভার নিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সিংহের মানিকতলার বাগান বাড়ীতে প্রতি সোমবার জনসভার অধিবেশন আরম্ভ হ'ল। সাধারণ লোকের পক্ষে প্রতি সপ্তাহে অতদূরে যাওয়া সম্ভব নয়, অথচ টম্‌সনের বক্তৃতা শোনবার আগ্রহ ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে দেখে চিৎপুর ও

কলুটোলার মোড়ে ৩১নং ফৌজদারী বালাখানায়ই তাঁরা সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন। ভারতবাসীদের আর্থিক ও রাজনৈতিক দুরবস্থা ও তার প্রতীকার সম্বন্ধে টম্‌সনের মতামত জানবার জন্য সভাগুলিতে হিন্দু ও মুসলমান নানা সম্প্রদায়ের গণ্যমান্য লোক উপস্থিত হতেন ও তাঁর সঙ্গে আলোচনায় যোগ দিতেন। ইংরেজদেরও কেউ কেউ সভায় উপস্থিত থাকতেন। ক্রমে নিয়মিত ভাবে রাজনীতি আলোচনার জন্য একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুভূত হ'ল। নব্যদল টম্‌সনের নেতৃত্বে এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান-স্থাপনের জন্য সচেষ্ট হলেন। ১৮৪৩, মার্চ্চ মাস থেকে টম্‌সনের সাহায্যে বেঙ্গল স্পেক্‌টেটরও পাক্ষিক হ'তে সাপ্তাহিকে রূপান্তরিত হয়।

ইতিমধ্যে একটি ব্যাপার নিয়ে কলকাতায় তোলপাড় উপস্থিত হ'ল। ১৮৪৩, ৮ই ফেব্রুয়ারী সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভার এক অধিবেশনে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বঙ্গদেশে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ফৌজদারী আদালত ও পুলিশের অবস্থা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। আগেকার মত এবারেও সভার অধিবেশন হিন্দু কলেজ ভবনেই হ'ল, এবং স্থায়ী সভাপতি তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী সভাপতিত্ব করলেন। কলেজ অধ্যক্ষ ক্যাপ্‌টেন ডি. এল. রিচার্ডসন অভ্যাগতরূপে সভায় উপস্থিত ছিলেন। দক্ষিণারঞ্জন প্রবন্ধের যেখানে সরকারী কার্য্যকলাপের কঠোর সমালোচনায় প্রবৃত্ত সেখানটা শুনে রিচার্ডসন আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি দক্ষিণারঞ্জনকে বাধা দিয়ে অন্যান্য কথার মধ্যে বললেন যে, কলেজ-গৃহকে তিনি রাজদ্রোহের আস্তানায় পরিণত হ'তে দেবেন না। তাঁর এরূপ বাধাদানে সভাপতি তারাচাঁদ দৃঢ় অথচ স্পষ্টভাবে বললেন যে, রিচার্ডসন কলেজ-গৃহের অধ্যক্ষ নন, তিনি নিমন্ত্রিত অতিথি মাত্র। তাঁকে তাঁর মন্তব্য প্রত্যাহার করতেই হবে। যদি প্রত্যাহার না করেন তা'হলে কলেজ কর্ত্তৃপক্ষের এবং প্রয়োজন হলে গবর্ণমেণ্টের গোচরেও এ ব্যাপার নেওয়া হবে। দক্ষিণারঞ্জন ও সভার সহকারী সভাপতি কালাচাঁদ শেঠ সভাপতি-নির্দ্দেশ সমর্থন করেন। রিচার্ডসন বক্তব্য প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। সভা সেদিনের মত বন্ধ হয়।

ব্যাপার কিন্তু এখানেই মিটল না। এ নিয়ে 'ইংলিশম্যান', 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' প্রভৃতি সংবাদপত্র নব্যদলকে নানারূপ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও গালমন্দ করতে

লাগল। তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী এ দলের নেতা, কাজেই তারা এর নাম দিল 'চক্রবর্ত্তী ফ্যাক্সন' বা 'চক্রবর্ত্তী চক্র'। ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া খুব গম্ভীরভাবেই লিখলে যে এরূপ রাজদ্রোহমূলক বক্তৃতা বাটাভিয়া ও সামারাঙে (যবদ্বীপ) দিলে, কম ক'রে হ'লেও, বক্তাকে নির্ব্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত করা হ'ত! এ বক্তৃতাটি পরবর্ত্তী ২রা ও ৩রা মার্চ্চ সংখ্যা 'বেঙ্গল হরকরা'য় সম্পূর্ণ মুদ্রিত হ'ল। হরকরা-সম্পাদক নিজ মন্তব্যে এই ব'লে বিস্ময় প্রকাশ করলেন যে, এর মধ্যে এমন কিছুই নেই যার জন্য নব্যদল এরূপ নিন্দাভাজন হ'তে পারেন। রিচার্ডসন রাজনীতিতে ছিলেন 'টোরী' বা রক্ষণশীল দলভুক্ত। তবে তিনিও ডিরোজিওর ন্যায় সুশিক্ষক ছিলেন। তিনি নিজে কবি ও সমালোচক। তাঁর শিক্ষায় ছাত্রদের মনে সত্যিকার সাহিত্য-প্রীতি জন্মে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিগণ রিচার্ডসনের ছাত্র।

'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' সাপ্তাহিকে পরিণত হবার সঙ্গে সঙ্গে একটি স্থায়ী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান-গঠনেরও আয়োজন হ'ল। কয়েকটি সভায় আলোচনার পর প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য-সম্বলিত কয়েকটি প্রস্তাব রচিত হয়। প্রস্তাবগুলির মর্ম্ম এই—প্রথম, সম্যক্ আলোচনা ও বিচার-বিবেচনা ক'রে সভা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছে যে, ব্রিটিশ ভারতীয় সাম্রাজ্যের বর্ত্তমান অবস্থায়, আর ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ও ব্রিটিশ জাতির সঙ্গে এর যে সম্পর্ক বিদ্যমান তাতে প্রত্যেকেরই স্বজাতির উন্নতিবিধানে ও স্বদেশের সাধারণ কল্যাণসাধনে যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। দ্বিতীয়, এই সভার মতে ব্যক্তিগত চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় এমন একটি সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক ও যুক্তিযুক্ত যার ভিত্তিমূলে সমবেত হ'য়ে ভারতবর্ষের মঙ্গলসাধনের জন্য এবং [ভারতীয়] ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের উন্নতি, কর্ম্মদক্ষতা ও স্থায়িত্ব-সম্পাদনের জন্য জাতি, ধর্ম্ম, শ্রেণী নির্ব্বিশেষে সকলেই বন্ধুভাবে একযোগে কার্য্য করতে পারবেন। তৃতীয়, 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' নামে একটি সোসাইটি স্থাপিত হবে। এর উদ্দেশ্য—ব্রিটিশ ভারতীয় লোকদের এবং এখানকার আইন-কানুন, প্রতিষ্ঠানগুলি, এবং ধনোৎপাদক উপায়গুলির বর্ত্তমান সত্যকার অবস্থা সম্বন্ধে তথ্যসমূহ সংগ্রহ ও প্রচার করা এবং শান্তিপূর্ণ ও বৈধ এমন সব উপায় অবলম্বন করা, যার ফলে ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেণীর মঙ্গল ও তাদের ন্যায্য অধিকার ও

স্বার্থ সংরক্ষণ হওয়া সম্ভব। চতুর্থ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধিশ্বরীর প্রতি শ্রদ্ধা রেখে, তাঁর শাসন মান্য ক'রে এবং ভারতীয় আইন-কানুনের প্রতি লক্ষ্য রেখেই সোসাইটির সকল কার্য্য পরিচালিত হবে। সোসাইটি আইনসঙ্গত ভাবে প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে বা যা করলে সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা নষ্ট হ'তে পারে এরূপ সকল কর্ম্মেরই বিরোধী। পঞ্চম, সাবালক ব্যক্তি মাত্রেই সোসাইটিকে নির্দ্দিষ্ট হার মত চাঁদা দিলে এবং উপরের মূলবিধিগুলি মান্য করলে সভ্য হতে পারবেন। বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত কাউকে সভ্য শ্রেণীভুক্ত করা হবে না। ষষ্ঠ প্রস্তাবে কয়েকজন সভ্য নিয়ে সাময়িকভাবে একটি কর্ম্মনির্ব্বাহক কমিটি প্রতিষ্ঠার কথা হয়।

২০শে এপ্রিল তারিখে এক জনসভায় এ সকল উদ্দেশ্য নিয়ে 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' স্থাপিত হ'ল। ইংরেজ ভারতবাসী উভয় সম্প্রদায়ের লোকই এতে যোগদান করে। যে চারজনের উপর প্রারম্ভিক কার্য্যের (সাধারণকে সোসাইটির উদ্দেশ্য জ্ঞাপন' কর্ম্মচারী নিয়োগ প্রভৃতি) ভার দেওয়া হ'ল তাঁরা ছিলেন—তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, চন্দ্রশেখর দেব, রামগোপাল ঘোষ ও প্যারীচাঁদ মিত্র। সোসাইটির সভাপতি হলেন জর্জ্জ টম্‌সন ও সম্পাদক প্যারীচাঁদ মিত্র। অন্যান্যদের মধ্যে চন্দ্রশেখর দেব ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সোসাইটির সভ্য শ্রেণীভুক্ত হলেন। টম্‌সন ছাড়া তিন জন ইংরেজও এর কর্ম্মীসভ্য হন। জাতি ধর্ম্ম বর্ণ নির্ব্বিশেষে ভারতের হিতকামী ব্যক্তিমাত্রেই এর সভ্য হ'তে পারতেন। তবে আগে যেমন বলেছি, এই নব্যদলও ব্রিটিশ সম্পর্ক বিবর্জ্জিত ভারত শাসনের কল্পনাও করতে পারেন নি। পূর্ব্ব যুগের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বিশৃঙ্খলা বিদূরণ ক'রে যারা দেশ ও সমাজে শান্তিস্থাপন করেছে তাদের প্রতি আনুগত্য স্বীকার রামমোহন রায়ের মত তাঁরাও কর্ত্তব্য ব'লেই ধরে নিয়েছিলেন। সোসাইটির মূল উদ্দেশ্য প্রকাশ পায় তৃতীয় প্রস্তাবে। ২০শে এপ্রিলের প্রকাশ্য সভায় এ প্রস্তাবটি উপস্থিত করেন তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও সমর্থন করলেন চন্দ্রশেখর দেব। তারাচাঁদ সম্পর্কে টম্‌সন বলেন, "এরূপ আগ্রশীল নীরব বিনয়ী কর্ম্মী খুব কমই দৃষ্ট হয়। তাঁর মহৎ কর্ম্মৈষণা ও সাধুতা প্রত্যেকেরই সম্মান ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে।" বাস্তবিক তারাচাঁদই নব্যদলের নেতৃত্ব করেন এবং এজন্য ইউরোপীয় সমাজের ওরূপ নিন্দাভাজন

হন। টম্‌সনের বক্তৃতাও ইউরোপীয়েরা ভাল চক্ষে দেখে নি। এক শ্রেণীর ইংরেজ-পরিচালিত সংবাদপত্রে প্রতি বক্তৃতারই বিরুদ্ধ সমালোচনা হ'তে লাগল। 'ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া' লিখলে, 'এখন দু'দিকে বজ্রধ্বনি হচ্ছে—পশ্চিমে বালাহিসারে ও কলকাতায় ফৌজদারী বালাখানাতে!' এ উপহাসের মূল লক্ষ্য টম্‌সনের বক্তৃতা। বস্তুতঃ এই সময়ের পর থেকেই ভারতীয় ও ইউরোপীয় সমাজের বিচ্ছেদের সূত্রপাত হয়। 'ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া' নব্যদলের রাজনীতি আদৌ পছন্দ করত না। ১৮৪৩ সালের ২০শে নবেম্বর বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর শেষ সংখ্যা বার হবার পর বন্ধ হ'য়ে গেলে এ কাগজখানিকে বিদ্রূপ ক'রে বলেছিল, 'এদেশবাসী দ্বারা কোন মঙ্গল কার্য্য করান যে কতখানি অসম্ভব তার প্রমাণ টম্‌সন এদেশে থাকতে থাকতেই পেয়ে গেলেন!'

বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটিও বেশী দিন স্থায়ী হ'ল না। রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের গোড়াপত্তন হ'লেও যাদের উপর এর রসদ জোগাবার ভার সেই শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে সম্মিলিত কর্ম্মৈষণা তখনও তেমন জন্মে নি। আবার মধ্যবিত্ত সমাজের লোক ব'লে নেতৃবর্গকেও পরিবার-প্রতিপালনের জন্য বিষয়ান্তরে লিপ্ত হ'তে হয়েছিল। যা হোক্, এই সোসাইটি স্থাপনের কয়েক বছর পরে কলকাতায় এমন একটি নূতন সঙ্ঘের পত্তন হ'ল যা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কোন-না-কোন প্রকারে রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবিত কালেই তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপন করেন ও তার মুখপত্র স্বরূপ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ করেন। এ দু'টি প্রতিষ্ঠানই বাঙালীদের মধ্যে জাতীয়তা বোধ জাগ্রত করতে খুবই সাহায্য করেছিল। হিন্দুশাস্ত্র-সার বেদান্তের উপর ভিত্তি ক'রে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজ পুনর্গঠনে মন দিলেন। সংস্কারপ্রিয় শিক্ষিত দলের ভিতরও ধীরে ধীরে স্বজাতিপ্রীতি ও স্বধর্ম্মপ্রীতি জাগতে থাকে। একটি বিষয়ে প্রথমতঃ এর প্রমাণও পাওয়া গেল। খ্রীষ্টতত্ত্ব-প্রচারে সরকারের সহানুভূতির কথা আগেই উল্লেখ করেছি। এ সময় ভারতীয়দের ভিতর খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারের ধুম পড়ে যায়। অনেক বঙ্গ সন্তান (যেমন, সুপ্রসিদ্ধ মাইকেল মধুসূদন দত্ত) তখন নানা প্রলোভনে প'ড়ে পরধর্ম্ম গ্রহণ করেন। হিন্দুসমাজ

এতে খুবই বিচলিত হ'য়ে পড়ে। এ ব্যাপারে প্রাচীনে-নবীনে মিলন হ'ল। ব্রাহ্মসমাজের নেতা যুবক নবীনপন্থী দেবেন্দ্রনাথ রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের মুখপাত্র প্রাচীনপন্থী বর্ষীয়ান্ রাজা রাধাকান্ত দেবের হাতে হাত মিলিয়ে এর প্রতিরোধে তৎপর হলেন। তারাচাঁদ, দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ নব্যদল ও মতিলাল শীল, রাজা রাধাকান্ত দেব, আশুতোষ দেব প্রভৃতি প্রাচীনগণ এজন্য সভা আহ্বান করলেন। তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু-সন্তানদের জন্য খ্রীষ্টানী-ভাবমুক্ত একটি আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করা। এজন্য প্রচুর অর্থও সংগৃহীত হয়, এবং প্রস্তাবিত স্কুলটির নাম দেওয়া হয় 'হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়'। ১৮৪৬ সনের ১লা মার্চ এই বিদ্যালয়টির কার্য্যারম্ভ হয়। কোষাধ্যক্ষ প্রমথনাথ দেব ও আশুতোষ দেবের নামে সুপ্রসিদ্ধ ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে সব টাকা গচ্ছিত রাখা হয়েছিল। কিন্তু ১৮৪৮ সালের প্রথম দিকে ব্যাঙ্কটি ফেল হওয়ায় বেশীর ভাগ টাকাই নষ্ট হ'য়ে যায়। বিদ্যালয়টির আর বিশেষ উন্নতি হয় নি বটে, কিন্তু সকলের সমবেত চেষ্টায় যে একদা সুফল ফলতে পারে বাঙালী-মনে এ বোধ জাগতে অধিক বিলম্ব হ'ল না। এ সময়কার আর-একটি ব্যাপারও ভারতীয়দের একযোগে কাজ করতে বিশেষ ভাবে প্রবুদ্ধ করে। এ কথাই এখন বলব।

সঙ্ঘবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলন

দ্বিতীয় যুগ

জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন তখন ছিলেন বড়লাটের আইনসচিব। এই বেথুনই বর্ত্তমান বেথুন কলেজের পূর্ব্বজ বেথুন স্কুলের প্রধান উদ্যোক্তা ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। বেথুন সাহেব ১৮৪৯ সালে মফস্বলবাসী ইউরোপীয়দের আইন ও শৃঙ্খলার মধ্যে আনয়নের উদ্দেশ্যে চারটি আইনের খসড়া রচনা করেন। 'মফস্বলবাসী' বলছি এইজন্য যে, তখন বহু ভারত-প্রবাসী বে-সরকারী ইউরোপীয় কলকাতা থেকে শত শত মাইল দূরে মফস্বলে ব্যবসা ও কৃষিকর্ম্ম-পরিচালনায় ব্যাপৃত ছিল। ১৮১৩ ও ১৮৩৩, বিশেষতঃ শেষোক্ত সালের সনন্দের পর থেকে ইউরোপীয়েরা অধিক সংখ্যায় এদেশে এসে বিষয়কর্ম্মে লিপ্ত হ'তে থাকে। নীল চাষ করতে গিয়ে অনেকে জমিদারী-তালুকদারীও কিনে ফেলে। অনেকে জাহাজ কোম্পানী, ষ্টীমার কোম্পানী প্রভৃতিও স্থাপন করলে। চা-এর ব্যবসার দিকেও অনেকে ঝুঁকে পড়ে। কলকাতার সুপ্রিম কোর্ট ছাড়া মফস্বলের কোন ফৌজদারী আদালতে তাদের বিচার হওয়া ছিল এতদিন আইনবিরুদ্ধ। ইউরোপীয়েরা যখন সংখ্যায় অল্প ছিল তখন এতে তেমন কোন আপত্তির কারণ ছিল না। এখন সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের জন্য নূতন আইনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হ'ল। মফস্বলে নিরঙ্কুশ হ'য়ে তাদের উপদ্রবও বেড়ে চলেছিল এই সময়। সরকারী কর্ম্মচারীরাও এ উপদ্রবের হাত থেকে অনেক সময় রেহাই পেত না। মফস্বল সহরের বিচারালয়ে শ্বেত-কৃষ্ণ বিচার-বৈষম্য তুলে দিতে প্রথমে চেষ্টা করেন লর্ড মেকলে, কিন্তু সে চেষ্টা অংশতঃ ফলবতী হয়। মাত্র দেওয়ানী আদালতেই এই বৈষম্য বিদূরিত হ'ল। এ-সময়কার প্রস্তাবিত আইনগুলির মর্ম্ম এইরূপ—প্রথম, মফস্বলের ফৌজদারী আদালতে ইউরোপীয়দের বিচারপ্রথা প্রবর্ত্তন, দ্বিতীয়—ইউরোপীয় প্রজাবৃন্দের অধিকারের সীমানির্দ্দেশ, তৃতীয়—জুরীদ্বারা বিচার ও চতুর্থ—সরকারী কর্ম্মচারীদের সংরক্ষণ। এই খসড়াগুলি প্রচারিত হ'লে ইউরোপীয় সমাজে ঘোরতর আন্দোলন

উপস্থিত হয়। অধিকার-সঙ্কোচের আভাসেই তারা ক্ষিপ্তপ্রায় হ'য়ে উঠল। কলকাতার ইউরোপীয়গণ ও ইউরোপীয়-পরিচালিত সংবাদপত্রগুলি মফস্বলবাসী ইউরোপীয়দের পূর্ণ সমর্থন করলে ও খসড়াগুলি প্রত্যাহার করতে সরকারকে পরামর্শ দিলে। তারা সকলে মিলে এ আইনগুলির নাম দিল 'ব্ল্যাক এক্টস্' বা 'কাল আইন'। গবর্ণমেণ্টও এ সম্বন্ধে আর অধিক দূর অগ্রসর হলেন না। আইন খসড়াতেই পর্য্যবসিত হ'ল।

প্রস্তাবিত আইনগুলি যে বিধিবদ্ধ হওয়া অত্যাবশ্যক ভারতীয়েরা তা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেছিল। তাদের মুখপাত্র হ'য়ে প্রসিদ্ধ বাগ্মী রামগোপাল ঘোষ এর যুক্তিযুক্ততা প্রতিপন্ন ক'রে একখানা পুস্তিকা লেখেন। এতে ইংরেজরা তো তাঁর উপর চটেই আগুন। নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে রামগোপালের যোগ ছিল। তিনি ছিলেন কেরী-প্রতিষ্ঠিত এগ্রিকালচার ও হর্টিকালচার সোসাইটির ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট বা সহকারী সভাপতি। এখানে ইংরেজদের প্রাধান্য ছিল। কাজেই পুস্তিকা-প্রকাশের পরবর্ত্তী অধি-বেশনেই তারা রামগোপালের নাম সোসাইটি থেকে একেবারে খারিজ করে দেয়।

ন্যায় হোক্ অন্যায় হোক্, ইউরোপীয়দের এতাদৃশ আন্দোলন-সাফল্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ভারতবাসীরাও সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা পরিচালনা করতে উদ্বুদ্ধ হলেন। আগেকার জমিদার বা ভূম্যধিকারী সভা ও বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির অস্তিত্ব পর্য্যন্তও লুপ্ত হয়েছে। এখন তাঁরা গবর্ণমেণ্টের দৌর্ব্বল্যও বিশেষ ক'রে পরখ করলেন। সনন্দ আসন্ন ; এজন্য তখন থেকেই শাসন-ব্যবস্থার সংস্কার-চেষ্টায় সঙ্ঘবদ্ধভাবে অগ্রসর হওয়াও আবশ্যক ছিল। এরূপ না হ'লে বিশেষ ক্ষতিরই সম্ভাবনা। কাজেই সত্বর একটি সঙ্ঘবদ্ধ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান-গঠনে নেতৃবর্গ অগ্রণী হলেন। কিছুকাল আলাপ-আলোচনার পর ১৮৫১ সালে ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে ন্যাশন্যাল এসোসিয়েশন বা দেশহিতৈষিণী সভা স্থাপিত হ'ল, আর এর সম্পাদক হলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এর মাত্র দেড় মাস পরে ২৯শে অক্টোবর ঐ একই উদ্দেশ্যে আর-একটি সঙ্ঘ বা সভা স্থাপিত হয় ; নাম হয় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা ভারতবর্ষীয় সভা। এ সভার সম্পাদকও হলেন দেবেন্দ্রনাথ। দ্বিতীয় সভা যে প্রথম সভারই পরিণতি তা বুঝতে কষ্ট

হয় না। এ সভার উদ্যোক্তাদের ভিতরে সনাতনী, রামমোহন-পন্থী, ডিরোজিও শিষ্যদল সকলকেই দেখতে পাই। এদিক দিয়ে আগেকার বঙ্গভাষা-প্রকাশিকা সভা, ভূম্যধিকারী সভা, বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি প্রত্যেকের চেয়েই এ সঙ্ঘটি অধিকতর প্রতিনিধিমূলক ও গণতান্ত্রিক। এবারকার সভার বিশেষত্ব, এতে একজনও ইউরোপীয় সভ্য নেওয়া হয় নি: আর সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক স্বার্থরক্ষাই ছিল এর মূল উদ্দেশ্য। রাজা রাধাকান্ত দেব হলেন এর সভাপতি, রাজা কালীকৃষ্ণ সহকারী সভাপতি, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক, দিগম্বর মিত্র (পরে রাজা) সহকারী সম্পাদক, এবং রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, হরকুমার ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ দেব, হরিমোহন সেন, রামগোপাল ঘোষ, উমেশচন্দ্র দত্ত, কৃষ্ণকিশোর ঘোষ, জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র এবং শম্ভুনাথ পণ্ডিত সদস্যবর্গ। এসোসিয়েশন যে নিখিল ভারতীয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত ও সমগ্র ভারতের প্রতিনিধি-সভায় পরিণত হ'তে চাচ্ছে—এসব কথা প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই ১১ই ডিসেম্বর তারিখে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক-রূপে বোম্বাই ও মাদ্রাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিকট পত্রে পরিষ্কাররূপে বিবৃত করলেন। তিনি স্পষ্টই লিখলেন যে, ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনন্দের মেয়াদ শীঘ্রই ফুরোবে। কাজেই এ সময়, নূতন সনন্দদানের পূর্ব্বে, কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রধান প্রধান শহরে দেশ-শাসনের সুব্যবস্থা ও নিজেদের উন্নতিসাধন উদ্দেশ্যে ভারতবাসীদের পক্ষে শাখা বা মূল সমিতি স্থাপন করা আবশ্যক। আর বর্ত্তমানে সকলেরই একযোগে একটি নিখিল-ভারতীয় সভার মারফত পার্লামেণ্টে আবেদনপত্র পাঠানো অধিকতর বাঞ্ছনীয়। কেন-না, ব্রিটিশ-অধিকৃত অঞ্চলসমূহের স্বার্থ যে এক ও অভিন্ন, এরূপ একটি আবেদনপত্র প্রেরণদ্বারা তা-ই সূচিত হবে। তবে একান্তপক্ষে যদি একটি সমিতিতে মিলেমিশে কাজ করা অসুবিধাজনক হয়, তবে তাঁরা যেন নিজ নিজ অঞ্চলে প্রতিনিধিমূলক সভা স্থাপন ক'রে ঐরূপ কাজ সুরু করেন। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পঁয়ত্রিশ বছর পূর্ব্বেই বাঙালী-মনে যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে একটি নিখিল-ভারতীয় প্রতিষ্ঠান-স্থাপনের কথা উদিত হয়েছিল, এর দ্বারা তা পরিষ্কার জানা যাচ্ছে। মাদ্রাজে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের একটি শাখা ও বোম্বাইয়ে একটি স্বতন্ত্র সভা অনুরূপ উদ্দেশ্য

নিয়ে স্থাপিত হ'ল ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি। বোম্বাইয়ের সভা প্রতিষ্ঠিত হয় নৌরজী ফুরদুঞ্জি ও দাদাভাই নৌরজীর চেষ্টায়।

১৮৫৩ সালে কোম্পানীর সনন্দের মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার কথা। কাজেই এসোসিয়েশনের প্রথম কার্য্য হ'ল—শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা। তখনকার দিনে ব্যবস্থা-পরিষদে ভারতীয় প্রতিনিধি থাকবার রেওয়াজ ছিল না। কাজেই কোন আইন বা বিধিসম্পর্কে ভারতবাসীর মতামত জানাবার একমাত্র উপায় ছিল পার্লামেণ্টে বা বড়লাটের নিকট অথবা উভয়ত্র 'পিটিশন' অথবা আবেদনপত্র পেশ। এসোসিয়েশনও একখানা আবেদনপত্র রচনা ক'রে পার্লামেণ্টে দাখিল করলেন। এই আবেদন-পত্রখানি নানা কারণে স্মরণীয়। প্রথমেই এর রচয়িতা হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কথা আমাদের স্মরণ করতে হয়। তিনি দরিদ্রের সন্তান। অর্থাভাবে কৈশোরেই লেখাপড়া ছেড়ে দশ টাকা মাইনের এক চাকরি নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। পরে কোম্পানীর মিলিটারী অডিট বিভাগে মাত্র পঁচিশ টাকা মাসিক বেতনে কর্ম্ম নিয়ে অল্পদিনের মধ্যেই চার শ' টাকার একটি পদে উন্নীত হন। এই পদে নিযুক্ত থাকতেই ১৮৬১, ১৪ই জুন তারিখে মাত্র আটত্রিশ বছর বয়সে তাঁর দেহান্ত ঘটে। কিন্তু এই অল্পকালের মধ্যেই তিনি বাঙালীর মনে নব বল ও নূতন আশার সঞ্চার ক'রে গেছেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সম্পাদক-রূপে তখনকার গবর্ণমেণ্টের নীতি সুপথে নিয়ন্ত্রিত করতে সাহায্য করেছিলেন হরিশ্চন্দ্র; নীল হাঙ্গামার কালে দরিদ্র নীলচাষীদের পক্ষ নিয়ে লেখনী চালিয়ে অত্যাচারী নীলকরদের ভয় ও ঈর্ষ্যারও তিনি কারণ হয়েছিলেন। হরিশ্চন্দ্র যখন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভ্য হলেন তখন 'হিন্দু পেট্রিয়ট' জন্মগ্রহণও করে নি। তিনি তখনও অপরিচিত ব্যক্তি। তবে ইতিপূর্ব্বে তিনি নিজের চেষ্টায় রীতিমত অধ্যয়নের ফলে নানা বিষয়ে এতখানি পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেছিলেন যে, অল্পদিনের মধ্যেই সভ্যগণ তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে পারলেন। পার্লামেণ্টের এই আবেদনপত্র রচনার ভার পড়ল তাঁর উপর। এই আবেদনপত্রখানি ভারতবাসীর রাষ্ট্রচেতনার ইতিহাসের এক উৎকৃষ্ট দলিল। রামমোহন রায়ের পরে, তখন পর্য্যন্ত এমন ব্যাপকভাবে ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা ও

প্রয়োজনের কথা অন্য কোথাও ব্যক্ত হয় নি। কংগ্রেসকে বহুদিন পরেও উল্লিখিত দাবিগুলি সম্বন্ধে আলোচনা চালাতে হয়েছে।

ভারত সুশাসনের উপায় ও ভারতীয়দের রাষ্ট্রীয় অধিকারের পথনির্দ্দেশ—এ দুটি বিষয় ছিল এই আবেদনপত্রের মূল কথা। আবেদনে স্পষ্ট ভাষায় বলা হ'ল যে, মোগল আমলের চেয়ে কোম্পানীর আমলে প্রতি বছর বেশী রাজস্ব আদায় হ'চ্ছে। মোগলযুগে সব অর্থ ই ভারতবর্ষে থেকে যেত ও তা ভারতবর্ষের উপকারে আসত। এখন রাজস্বের এক মোটা অংশ বিলাতে চলে যায়, ফলে কোম্পানীর শাসনে ভারতবাসী ক্রমেই গরীব হ'য়ে পড়ছে। পূর্ব্বেকার সনন্দদান-কালে দায়িত্বপূর্ণ পদে ভারতীয় নিয়োগের কথা ছিল, কিন্তু তা কার্য্যে পরিণত করবার কোন চেষ্টাই হয় নি। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে যুক্ত থেকে ভারতবাসী যতখানি সুবিধা-সুযোগ-লাভের আশা হৃদয়ে পোষণ করেছিল, এতদিনে তা অংশতঃও পূর্ণ হয় নি। বিচারে বৈষম্য, রাজস্ব আদায়ে কঠোরতা, প্রবলের উৎপীড়নে দুর্ব্বলের ধন-প্রাণ-নাশ, লবণ ও আফিমের উপর কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার প্রভৃতি অ-ব্যবস্থা দূর ক'রে, এবং ভারতীয় শিল্প উৎপাদনে উৎসাহ দিয়ে, ভারতবাসীর শিক্ষার সুবন্দোবস্ত ক'রে ও উচ্চতন সরকারী পদগুলিতে ভারতবাসী নিয়োগ ক'রে—শাসন-ব্যবস্থা সুসংস্কৃত করবার দাবিও এ আবেদনপত্রে জানান হ'ল। শাসনপ্রণালীর সংস্কারের কথাও এই সর্ব্বপ্রথম এসোসিয়েশন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে জানালেন। পরবর্ত্তী কালে শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগকে আলাদা করবার যেমন কথা ওঠে, এ সময়ও তেমনি শাসন-পরিষদ ও ব্যবস্থা-পরিষদকে স্বতন্ত্র ক'রে গঠনের প্রস্তাব চলে। কারণ, বড়লাটের শাসন-পরিষদই ছিল তখনকার দিনে ব্যবস্থা-পরিষদ, আর এ-ই সব আইন-কানুন তৈরী করত। এসোসিয়েশন এবারে ব্রিটিশ-শাসিত উপনিবেশ-গুলির আদর্শে একটি স্বতন্ত্র ব্যবস্থা-পরিষদের প্রস্তাব করলেন। তাঁদের প্রস্তাব—পার্লামেণ্টের ও বড়লাটের ক্ষমতা নির্দ্দিষ্ট ক'রে দিয়ে, একটি নূতন ব্যবস্থা-পরিষদের উপর আইন-কানুন করবার ক্ষমতা অর্পণ করা হোক্। আর চারটি প্রদেশ (বাংলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ) থেকে প্রত্যেকটির পক্ষে তিন জন ক'রে বার জন নেতৃস্থানীয় ভারতীয় সদস্য, প্রত্যেক প্রদেশের সরকার তরফে একজন ক'রে চার জন সিবিলিয়ান সদস্য ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট

নিযুক্ত সভাপতি এই সতর জন নিয়ে ব্যবস্থা-পরিষদ গঠিত হোক্। এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় যে, ভারতবাসীদের মতানুযায়ী শাসনব্যবস্থা-নিয়ন্ত্রণের কথা এ প্রস্তাবের মধ্যেই প্রথম পাওয়া যাচ্ছে, কারণ ব্যবস্থা-পরিষদে অধিকাংশই (সতর জনের মধ্যে বার জন) ভারতীয় সদস্য থাকবার প্রস্তাব করা হয়। এরূপ প্রস্তাব যে পার্লামেণ্টে গৃহীত হবে না, তা হয়ত জানাই ছিল, কিন্তু আবেদনপত্রে যে-সব মূল নীতি ব্যক্ত হয়েছে তার কোন-কোনটি পার্লামেণ্ট গ্রহণ না ক'রে পারেন নি। সনন্দে শাসন-পরিষদ ও ব্যবস্থা-পরিষদ আলাদা ক'রে দেওয়া হয়। কিন্তু ব্যবস্থা-পরিষদ গঠিত হ'ল মাত্র বার জন সদস্য নিয়ে—আর এতে রইলেন স্বয়ং বড়লাট, জঙ্গীলাট, চারজন শাসন-পরিষদের সদস্য, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ও অন্য একজন জজ, ও চারটি প্রাদেশিক সরকারের মনোনীত চার জন প্রতিনিধি। ভারতবাসী মনোনয়নের কোন কথাই এতে রইল না।

আবেদনে উল্লিখিত কোন কোন মূল নীতি আংশিকভাবেও যে সনন্দে গৃহীত হয়েছিল তার আভাস এই মাত্র আমরা পেলাম। এসোসিয়েশন কোম্পানীর সনন্দের মেয়াদ অত দীর্ঘ দিন রাখবার পক্ষপাতী ছিলেন না। সনন্দের মেয়াদ কমিয়ে এবারে মাত্র দশ বছর করা হ'ল। কোম্পানীর শাসন-ক্ষমতাও ঢের সঙ্কুচিত হ'ল। বিলাতে ডিরেক্টর সভার পরিবর্ত্তে ভারতশাসন-ব্যবস্থা কার্য্যতঃ বোর্ড অফ্ কণ্ট্রোলই নিয়ন্ত্রিত করতে লাগলেন। সিবিলিয়ানি চাকরিতে কোম্পানীর খুশীমত লোকই এতদিন নিয়োজিত হ'ত। এবারে ব্যবস্থা হ'ল, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় যে-সব ছাত্র উৎকৃষ্ট বিবেচিত হবে তাদেরই এ চাকরি দেওয়া হবে। বাংলা দেশ এতকাল বড়লাটের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন ছিল। অতঃপর অন্যান্য প্রদেশের মত একেও লেফ্টেন্যাণ্ট গবর্ণরের অধীন করা হ'ল। সার্ ফ্রেডারিক হ্যালিডে বঙ্গের প্রথম লেফ্টেন্যাণ্ট গবর্ণর।

বিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বহু বছর যাবৎ ভারতবাসীর মুখপাত্রস্বরূপ শিক্ষা, শাসন, বিচার, লবণ, নীলাম, পুলিশ, নীল-চাষ প্রভৃতি বহু বিষয় সম্পর্কে অভাব-অভিযোগ ও নূতন ব্যবস্থা-প্রবর্ত্তনের নির্দ্দেশ সরকারে নিবেদন করেন এবং কোন কোন বিষয়ে সফলকামও হন। এখানে বলে রাখি যে, শতাধিক বর্ষ অধিকার-ভোগের পর, ১৮৬২-৬৩ সালে সরকার লবণের ব্যবসা পরিত্যাগ

করেন। কিন্তু এতদিনে সরকারী নীতির ফলে স্বদেশীয় লবণশিল্প একেবারে বিনষ্ট হ'য়ে গেছে। লিভারপুল লবণ তখন বাঙালী-রসনার স্বাদ জোগাতে ব্যস্ত! দীর্ঘকাল ভারতবাসীরা লবণ তৈরীর অধিকার থেকে কিন্তু বঞ্চিতই ছিল। বহু আন্দোলন ও বিপুল ত্যাগস্বীকারের ফলে ইদানীং তারা এই মৌলিক অধিকার আংশিকভাবে ফিরে পায়। কিন্তু সে কথা পরে আসবে।

সনন্দদানের পর বছর, অর্থাৎ ১৮৫৪ সালে বোর্ড অফ্ কণ্ট্রোলের তরফে সার্ চার্লস উড নূতন ক'রে শিক্ষানীতির নির্দ্দেশ দিয়ে 'এডুকেশান ডেস্‌প্যাচ' নামে একখানা দলিল বিলাত থেকে ভারতবর্ষে গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করেন। এই দলিলে বর্ণিত নীতিগুলি পরবর্ত্তী পঞ্চাশ বছরের সরকারী শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করেছে বলা চলে। উচ্চশিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা—এতে স্তর ভেদে বিবিধ নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। অবিলম্বে কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়-স্থাপনের প্রস্তাব ক'রে উচ্চ শিক্ষা যেমন নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা হ'ল, তেমনি ভারতবাসীদের স্বদেশীয় ভাষাশিক্ষার জন্য নূতন আদর্শ বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা জানিয়ে মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষারও মোড় ফিরিয়ে দেওয়া হ'ল। মেকলের শিক্ষানীতিতে শুধু ইংরেজী শিক্ষাই সমর্থন পেয়েছিল। এবারে ইংরেজী, বাংলা উভয়বিধ শিক্ষারই নির্দ্দেশ দেওয়া হ'ল। আরও ঠিক হ'ল, বিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণীগুলিতেই শিক্ষার বাহন হবে ইংরেজী, নিম্ন শ্রেণীগুলিতে শিক্ষার বাহন বাংলা ও অন্যান্য দেশীয় ভাষাই থাকবে। বাংলা দেশে আদর্শ বঙ্গবিদ্যালয়গুলি স্থাপনের ভার প্রথম যাঁর উপর পড়েছিল তাঁর নাম আজ বাঙালীর ঘরে ঘরে কীর্ত্তিত। তিনি হলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। দীন অবস্থা থেকে নিজ প্রতিভাবলে তিনি ক্রমে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদে সমাসীন হন। তখন স্পেশাল ইন্‌স্পেক্টর-রূপে কয়েকটি জেলায় আদর্শ বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার ভারও তাঁর উপর পড়ে। ঈশ্বরচন্দ্র শুধু বিদ্যালয় স্থাপন করেই ক্ষান্ত হন নি, শিক্ষাপদ্ধতিও যথাসাধ্য নিজ মত অনুযায়ী চালিত করলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বেই বঙ্গসাহিত্যের সেবায় রত হয়েছিলেন। নব পদ্ধতি প্রবর্ত্তনে তাঁর সাহিত্যপ্রতিভাও নিয়োজিত হ'ল। পাঠ্যপুস্তক রচনা ক'রে শৈশব থেকে বাঙালী-মনে সাহস ও শক্তিসঞ্চারে তিনিই প্রথম প্রবৃত্ত হন। এর পর শিক্ষা-ডিরেক্টরের সঙ্গে মতানৈক্য হেতু তিনি অধ্যক্ষ ও ইন্‌স্পেক্টরী পদ

দুইটিই ছেড়ে দিলেন। এসময় ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও শিক্ষাপদ্ধতি নূতনভাবে নিয়ন্ত্রিত হ'তে সুরু হ'ল। ১৮৫৭ সালে কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হ'ল। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ভারত-বাসীদের মধ্যে যে ঐক্যস্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন, বিভিন্ন অঞ্চলে একই ধরণের শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হওয়ায় ক্রমে তা সম্ভব হ'য়ে উঠল। আর এই ঐক্যবুদ্ধি উন্মেষের ফলেই কংগ্রেসের উৎপত্তি।

ইউরোপীয় ও ভারতবাসীদের মধ্যে বিচার-বৈষম্য বিদূরণ ও বিচারের সুব্যবস্থা সম্পর্কে এসোসিয়েশন পূর্ব্বাপর অবহিত ছিলেন। আর এর প্রতিষ্ঠার মূলেও তো রয়েছে এই ব্যাপার। বিচার-বৈষম্য ভারতবাসীর কণ্ঠে কাঁটা হ'য়ে রইল। মফস্বলে ইউরোপীয়েরাই সর্ব্বেসর্ব্বা, যত দুঃখভোগ ভারতবাসীরই ললাট-লিখন। গবর্ণমেণ্ট ১৮৫৬-৫৭ সালে বিচার-বৈষম্য দূর করবার উদ্দেশ্যে আইন করার চেষ্টা করলেন। ইউরোপীয় সমাজ এবারে ধুয়া তুলল, মফস্বলের ফৌজদারী আদালতে তাদের বিচার হোক্ আপত্তি নেই, কিন্তু কোন ভারতবাসী তাদের বিচার করতে পারবে না। এর প্রতিবাদে ১৮৫৭, ৯ই এপ্রিল তারিখে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের আনুকূল্যে এক জনসভার অধিবেশন হয়। রামগোপাল ঘোষ, দিগম্বর মিত্র, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি ইউরোপীয় সমাজের এই অন্যায় আবদারের প্রতিবাদ ক'রে বক্তৃতা করেন। এসময় জর্জ্জ টমসন আবার ভারতে এসেছিলেন। তিনিও সভায় বক্তৃতা করলেন। কিন্তু একমাস পরেই সিপাহী বিদ্রোহ আরম্ভ হওয়ায় গবর্ণমেণ্টের এ উদ্যম বন্ধ হ'য়ে যায়। যা হোক্, এর পাঁচ বছর পরে ১৮৬১ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর ব্যবস্থা-পরিষদ আইন ক'রে ইউরোপীয়দের বিশেষ অধিকারগুলি তুলে দিলেন। এবারেও কিন্তু ভারতবাসীরা তাদের বিচারের অধিকার পেলে না।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন নীল-চাষ সম্বন্ধেও অবহিত ছিলেন, এর আভাস আগে পেয়েছি। কিন্তু এককভাবে নীল-চাষীদের পক্ষ-সমর্থন তাঁরা করেন নি। ভূস্বামী, প্রজা উভয় মিলেই এই সভা। শ্রেণীবিশেষের স্বার্থ জড়িত ব'লে তাঁরা হয়ত তখন এ বিষয়ে আগ্রহ দেখান নি। পরে কিন্তু এই এসোসিয়েশন জমিদার শ্রেণীর স্বার্থরক্ষায়ই ষোল আনা অবহিত হয়েছেন।

সিপাহী-বিদ্রোহের সময় থেকেই এর এই অধোগতি আরম্ভ। ১৮৫০-১৮৬০ এই দশ বৎসরে বাংলা দেশে নীল-চাষ সম্পর্কে ভীষণ গোলযোগ উপস্থিত হয়। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভ্য ও হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক প্রজা-দরদী হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রবল ইউরোপীয় সমাজ ও ততোধিক প্রবল ইউরোপীয়-পরিচালিত সংবাদপত্রগুলির বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ ক'রে নীল-চাষীদের অপরিসীম দুঃখ-দুর্দশার কথা শিক্ষিত সাধারণের গোচরে আনলেন। নীল-চাষের ইতিহাস নীলকরদের অত্যাচার-নিপীড়নের কালিমায় রঞ্জিত। কোম্পানীই প্রথমে নীল-ব্যবসা চালাতে সুরু করে। পরে তার ব্যবসাধিকার বিলুপ্ত হ'লে বে-সরকারী শ্বেতাঙ্গরা এ ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়। আইন করে নীলকরদের খুব সুবিধাও ক'রে দেওয়া হ'ল। চুক্তিভঙ্গ করলে নীল-চাষীরা ফৌজদারী আইনে দণ্ডিত হবে এ-ও একবার স্থির হয়। এ আইন অবশ্য পরে রদ হ'য়ে যায়। কিন্তু আবার ১৮৬০ সালের একাদশ আইনে সাময়িকভাবে হ'লেও, পুনরায় চুক্তিভঙ্গের জন্য দণ্ডদানের ব্যবস্থা হয়েছিল।

(নীল-চাষ সম্বন্ধে ১৮২৯ সালে রামমোহন রায় বলেছিলেন যে, এতে জনসাধারণ উপকৃত হচ্ছে। কিন্তু এর পর কুড়ি বছরের মধ্যেই নীল-চাষীর দুঃখ চরমে ওঠে। মফস্বলের ফৌজদারী আদালত ইউরোপীয়গণের বিচারের অধিকারী ছিল না। গরীব চাষীরা সুপ্রিম কোর্টে মোকদ্দমা পরিচালনে অপারগ। এজন্য ইউরোপীয়দের উপদ্রব ক্রমে অতিমাত্রায় বেড়েই চলল। নীলকরদের অত্যাচারের কথা ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের 'সমাচার চন্দ্রিকা' ও 'সমাচার দর্পণে' প্রথম উল্লিখিত হ'তে দেখি। এর সাতাশ বৎসর পরে ১৮৪৯ সালে সুলেখক অক্ষয়কুমার দত্ত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় নীলকরদের অত্যাচারের কথা বিশদভাবে প্রকাশ করেন। পরে হরিশ্চন্দ্র এ উদ্দেশ্যে তাঁর সবল লেখনী ধারণ করলেন। নীল-চাষীদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা রুশিয়ার 'সার্ফ' ও আমেরিকার নিগ্রো দাসদের সামিল হ'য়ে পড়েছিল। নীলকর কর্তৃক টাকা দাদন দিয়ে উৎকৃষ্ট জমিতে নীল-চাষে চাষীকে প্ররোচনা, আশানুরূপ ফসল না হ'লে পর বছর নীল উৎপাদনে তাকে বাধ্য করান, নীল-চাষের জন্য দশ বৎসরের চুক্তি, পুরুষানুক্রমে নীলকরের আজ্ঞাবহ প্রজায় পরিণতি, নীলকরদের জমিদারী-তালুকদারী ক্রয়ের অপকৌশল, প্রজাবৃন্দের দ্বারা

বেগার খাটান, চুক্তিভঙ্গকারী চাষীদের নীলকুঠিতে কয়েদ রাখা প্রভৃতি যত রকম অত্যাচার উৎপীড়ন হ'তে পারে, নীলকররা নির্বিঘ্নে নীল-চাষীদের উপর তা সবই করতে লাগল। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় থেকে মফস্বল অঞ্চলে নীলকরগণ কেউ কেউ এসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা লাভ করে। এতেও প্রজাদের ক্লেশ বহুগুণে বর্দ্ধিত হ'ল। ১৮৬০ সালে সরকার-প্রতিষ্ঠিত নীল কমিশনে সাক্ষীরা যে-সব সাক্ষ্য প্রমাণ দিলেন, তা থেকে এ সকলই প্রমাণিত হ'য়ে গেল।

বারাসত বিভাগের অন্যতম ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলভী আব্দুল লতিফ নীল-করদের অত্যাচারের এক বিবরণ দেন এখানকার ম্যাজিষ্ট্রেট এশ্‌লি ইডেনকে। এশ্‌লি ইডেন পরে বঙ্গপ্রদেশের ছোটলাট হয়েছিলেন। ইডেন এই মর্ম্মে একটি পরোয়ানা জারি করেন যে, নিজ জমিতে নীল চাষ করা কৃষকদের ইচ্ছাধীন, এজন্য তাদের উপর জোর-জুলুম করা বে-আইনী। এতে আশ্বস্ত হ'য়ে ১৮৫৯-৬০ সালে অনুমান পঞ্চাশ লক্ষ দরিদ্র, নিরক্ষর চাষী একযোগে ধর্ম্মঘট করে। বহু স্থানে চাষ হ'লেও নদীয়া, যশোহর ও পাবনাতেই নীল-চাষ হ'ত খুব বেশী। যশোহর-চৌগাছার বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস নামক দু'জন গ্রাম্য লোক নীল-চাষীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ তখন মাত্র বিংশতিবর্ষবয়স্ক যুবক। তিনি যশোহর ও নদীয়ার এক বিস্তৃত অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে নীলকরদের অত্যাচারের বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন। তিনি এই সব কথা পত্রাকারে কলকাতার 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় পাঠাতে লাগলেন। 'পেট্রিয়ট'-এ অন্যান্য অঞ্চল থেকেও অত্যাচার সম্পর্কে বহু পত্র প্রেরিত হয়েছিল। শিশিরকুমারের কার্য্যের ফলে নীল-চাষীদের ধর্ম্মঘট বিশেষ গুরুত্বলাভ করল। চাষীদের এই ধর্ম্মঘট বা জোট নীল হাঙ্গামা নামে অভিহিত হয়। নীল-চাষীদের এই ধর্ম্মঘট কিরূপ ব্যাপক ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ছিল তা ঐ সময়ের লেফ্‌টেন্যাণ্ট গবর্ণর স্যর্ জন পিটার গ্রাণ্ট নীল কমিশনে প্রদত্ত তাঁর নিজ মন্তব্যে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, তিনি যখন যশোহর, নদীয়া ও পাবনা জেলার মধ্যবর্ত্তী কুমার ও কালীগঙ্গার ষাট-সত্তর মাইল নদীপথ ষ্টীমারযোগে অতিক্রম করেন তখন সহস্র সহস্র নর-নারী ও শিশু এই নদী দুটির দু'ধারে উপস্থিত হ'য়ে সমবেতভাবে তাঁকে এই

প্রার্থনা জানায় যে, নীল-চাষ যেন তাদের দিয়ে আর করান না হয়। এ দৃশ্য গ্রাণ্টের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। নীল কমিশনে সাক্ষ্যদান-কালে হরিশ্চন্দ্রও বলেন, "আমি এই নীল হাঙ্গামা বিশেষ যত্ন ও সতর্কতার সঙ্গে পর্য্যালোচনা করেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বর্ত্তমানে নীল-চাষ প্রজার অহিতকারী। আমি এই মত বহুবার প্রকাশ করেছি।"

প্রসিদ্ধ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র ডাকবিভাগে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রূপে বিভিন্ন জেলায় অবস্থানকালে নীলকরদের অত্যাচার স্বচক্ষে দেখেন। তাঁর এই অভিজ্ঞতার ফল—বাংলা ১২৬৭ সালের (১৮৬০ ইং) আশ্বিন মাসে প্রকাশিত 'নীল-দর্পণ'। এর ইংরেজী অনুবাদ পাদ্রী জেমস্ লঙ প্রকাশ করেন। এজন্য সুপ্রিম কোর্টে নীলকরদের তরফে লঙের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা রুজু হয়। বিচারে তাঁর এক মাস কারাদণ্ড ও হাজার টাকা জরিমানা হ'ল। জরিমানার টাকা দিয়ে দেন স্বনামধন্য কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়। লঙ সাহেব এই অনুবাদ কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তকে দিয়ে করান। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, মধুসূদনও এই কারণে তাঁর সরকারী কর্ম্ম ত্যাগ করতে বাধ্য হ'ন। এই সময় হরিশ্চন্দ্রও মারা গেলেন। বাঙালী তার দুঃখ কবিতায় প্রকাশ করলে—

"নীল বানরে সোণার বাঙ্গলা করলে এবার ছারেখার।
অসময়ে হরিশ ম'ল, লঙের হ'ল কারাগার,
প্রজার আর প্রাণ বাঁচানো ভার।"

বাঙালী-মনে নীল কমিশন খুবই আশার সঞ্চার করেছিল বটে, কিন্তু এর সুপারিশগুলি তেমন আশাপ্রদ হয় নি। নীল কমিশন নীল-চাষের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করলেন। তাঁরা নীলকরদের অত্যাচার-নিবারণের জন্য সাক্ষাৎ-ভাবে কোন নিয়ম বেঁধে দেন নি। তবে বিচারের সুব্যবস্থার জন্য গবর্ণমেণ্ট জেলাগুলিকে বেশীসংখ্যক মহকুমায় বিভক্ত ক'রে সর্ব্বত্র আদালত প্রতিষ্ঠা করলেন। পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হ'ল। দাঙ্গা-হাঙ্গামা না বাধে এজন্য স্থানে স্থানে সৈন্যও মোতায়েন রাখার ব্যবস্থা হ'ল। প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হ'য়ে নীলকরগণ অতঃপর চুক্তিভঙ্গের মোকদ্দমা রুজু করায় বহু নীল-চাষী একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে যায়। তথাপি, নীলকরদের উৎপীড়ন পরে যে অনেকটা কমে যায় তা ঐ ধর্ম্মঘটেরই ফলে বলতে হবে। এখানে উল্লেখযোগ্য

যে, ১৮৬৮ সালের অষ্টম আইন দ্বারা "নীলচুক্তি আইন" রদ করা হয়। ১৮৯২ সালে বৈজ্ঞানিক উপায়ে রং প্রস্তুত আরম্ভ হ'লে বঙ্গে নীল-চাষ একেবারে কমে গেল।)

সিপাহী-বিদ্রোহের কথা প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করেছি। এর কথা একটু পরেই আলাদা করে বলব। এসময় জীবনের সর্ব্ব বিভাগকেই রাজনীতির প্রেরণা সচল ক'রে দিলে। সমাজ-সংস্কারে, সাহিত্য-রচনায়, সংবাদপত্র-পরিচালনে, ধর্ম্মালোচনায় (সংকীর্ণ অর্থে), নাট্যশালা-প্রতিষ্ঠায়, সভা-সমিতি-স্থাপনে বঙ্গে তথা ভারতবর্ষে এক নব যুগের উদয় হ'ল। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভারতীয় সমাজে তখন মধ্যমণি। তাঁর সমস্ত শক্তি ও প্রতিপত্তি হিন্দুসমাজে বিধবা-বিবাহ-প্রবর্ত্তনে নিয়োজিত। তখন সাহিত্যিক ও সম্পাদক-রূপে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, অক্ষয়কুমার দত্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বঙ্গদেশে সুপরিচিত। বাঙালী-মনে নবযুগের প্রভাবের ছাপ ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যানে'র এই কবিতাংশটিতে সুস্পষ্ট :—

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায় ?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে, কে পরিবে পায় ?
কোটী কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে, নরকের প্রায়।
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গ-সুখ তায় হে, স্বর্গ-সুখ তায়।

রামনারায়ণ তর্করত্ন (নাটুকে রামনারায়ণ) ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত নাটক-রচনায় লিপ্ত। বাঙালী নূতন নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা ক'রে তাঁদের নাটকগুলি অভিনয় করছে। দীনবন্ধু মিত্র 'নীল-দর্পণ' নাটক লিখেই বিখ্যাত হয়েছেন। তিনি এর পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহযোগে গুপ্ত-কবির নিকট শিক্ষানবীশী করেছেন। প্যারীচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহ বাংলা গদ্যে নূতন যুগের সূচনা করতে ব্যস্ত। ইংরেজী 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-সম্পাদনায় যেমন হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বাংলা 'সোমপ্রকাশ'-সম্পাদনে তেমনি দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করলেন। প্রকৃতপক্ষে, দ্বারকানাথই বাংলা সংবাদপত্র-সম্পাদনে নবযুগের প্রবর্ত্তক। বেথুন সোসাইটি, ভার্ণাকুলার লিটারেচার সোসাইটি, বিদ্যোৎসাহিনী সভা, হেয়ার স্মৃতিসভা প্রভৃতির সঙ্গে সে যুগের দেশী-বিদেশী সংস্কৃতির প্রধান উপাসকমণ্ডলী যোগ

দিয়েছিলেন। কলকাতায় বে-সরকারী চেষ্টায় বেথুন বালিকা স্কুল প্রতিষ্ঠিত হ'ল। এর কয়েক বছরের মধ্যেই সুদূর মফস্বলেও বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হয়। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সরকারী নির্দ্দেশে বহু স্থানে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বে-সরকারী ভাবে যাঁরা এবিষয়ে অগ্রণী হয়েছিলেন রাড়ুলিনিবাসী হরিশ্চন্দ্র রায়চৌধুরী ও কুমারখালীনিবাসী কৃষ্ণধন মজুমদার তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। হরিশ্চন্দ্র বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের পিতৃদেব। এইভাবে নানা স্থানে বাঙালীরা স্কুল-কলেজও প্রতিষ্ঠা করলেন। এক কথায় বলতে গেলে শহর ও পল্লীবাসীর জীবনে নূতন সাড়া এল এ-যুগে।

সিপাহী যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের বিবিধ প্রচেষ্টা, নীল-আন্দোলন প্রভৃতি সম্বন্ধে এইমাত্র বললাম। এসময়কার আর-একটি প্রধান ঘটনা—প্রধানতম বললেও হয়—সিপাহী বিদ্রোহ বা সিপাহী যুদ্ধ। বিদ্রোহ শুধু কোম্পানীর সিপাহী সৈন্যদের মধ্যেই হয় নি, এ আরও ব্যাপক ছিল। তথাপি সিপাহীদের মধ্যেই প্রথম আরম্ভ হয় ব'লেই হয়ত এর এই নাম দেওয়া হয়ে থাকবে। এসোসিয়েশনের প্রচেষ্টা বা নীল 'বিদ্রোহে'র সঙ্গে সিপাহী যুদ্ধের পার্থক্য মূলগত। প্রথম দুটি আন্দোলন চলেছিল গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার ক'রে। গবর্ণমেণ্টের নিকট ন্যায়বিচার' পাওয়া যাবে এই আশায়ই এদের পরিচালকগণ সকল কাজ নিয়ন্ত্রিত করেছেন। কিন্তু সিপাহী যুদ্ধের প্রকৃতি হ'ল ভিন্ন রূপ। এ একেবারে ইংরেজের কর্ত্তৃত্ব অস্বীকার ক'রে নিজেই নিজের প্রভু হ'তে চাইলে, আর ইংরেজ-শাসনের ভিত্তিমূলে প্রবলভাবে ধাক্কা দিলে। পলাশীর যুদ্ধের পর একশ' বৎসরের মধ্যে কোম্পানী ধীরে ধীরে তার পক্ষপুট বিস্তার করেছে সর্ব্বত্র। তারা একার্য্যে যে বাধা পায় নি তা নয়, কিন্তু এরূপ সঙ্ঘবদ্ধভাবে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের জনগণ কখনো এমন ক'রে তাদের বাধাদান করে নি। ইংরেজ এবারে বুঝতে পারলে ভারতবাসীর চিত্ত জয় করার চেষ্টা বৃথাই। ভারতবাসীদের মধ্যে এমন শক্তি এখনও রয়েছে যা সংহত হ'লে ইংরেজের শ্রেষ্ঠতর শক্তিকেও ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলতে পারে।

সিপাহী বিদ্রোহ বা যুদ্ধ আরম্ভ হয় ১৮৫৭ সালের ১০ই মে তারিখে। এর পর প্রায় দু' বছর এই বিদ্রোহ চলে। কোম্পানীর সর্ব্বশক্তি নিয়োজিত হয় বিদ্রোহ-দমনের জন্য। সিপাহী যুদ্ধ সম্পর্কে বহু পুস্তক লিপিবদ্ধ হয়েছে বটে, কিন্তু এখনও এর খাঁটি ইতিহাস লেখা হয়েছে বলে মনে হয় না। কেউ কেউ সিপাহী বিদ্রোহকে 'ন্যাশনাল ওয়ার অফ্ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স' বা স্বাধীনতা-লাভের উদ্দেশ্যে জাতীয় সংগ্রাম ব'লে উল্লেখ করেছেন। একথা স্বীকার করতে কিন্তু অনেকেরই আপত্তি হবে। এ সময় ভারতবর্ষের বিশিষ্ট ভূখণ্ডের অধিবাসীরা

বিশিষ্ট শ্রেণীর সহযোগে ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের জনগণের স্বাধীনতা-লাভ তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। তারা নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধিতে ব্যাহত হ'য়ে অন্যের আশ্রয়ে তা সিদ্ধিরই চেষ্টায় ছিল। সুতরাং একে আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামের সঙ্গেও তুলনা করা চলে না। সামান্য 'চা' নিয়ে বিবাদ সুরু হ'লেও আমেরিকাবাসীদের উদ্দেশ্য ছিল, সমগ্র আমেরিকান উপনিবেশের স্বাধীনতা-অর্জ্জন, এর শাসনে ব্রিটেনের কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার। লর্ড ডালহৌসীর আমলে (১৮৪৮-১৮৫৬) রেলপথ, তার ও টেলিগ্রাফ বিভাগ সবেমাত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কাজেই এর সাহায্যে ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় ঐক্যবোধ তখনও জাগ্রত হবার অবকাশ পায় নি। তখন বিদ্রোহ-দমনে এর দ্বারা গবর্ণমেণ্টের সাহায্য হ'ল খুব। পূর্ব্বোল্লিখিত মতবাদের সপক্ষে হয়ত একটা কথা বলা যায়। দিল্লীর বাদশাহের কর্তৃত্বস্বীকৃতির মধ্যে একটি নিখিল ভারতীয় আদর্শের নির্দ্দেশ পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু বাদশাহ্ তখন নাম মাত্রে পর্য্যবসিত হয়েছেন। আর বাদশাহী শাসন যুগোপযোগীও নয়। ও সময়ে নবজাতীয়তার মন্ত্রে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি উদ্বুদ্ধ। শিক্ষিত ভারতবাসীর মনকেও এ তখন স্পর্শ করেছে। পূর্ব্বযুগের সামন্ততন্ত্রের তখন বিদায় নেবারই পালা। যে কারণেই হোক্, এই নবজাতীয়তা-বোধ বিদ্রোহীদের মন স্পর্শ করে নি। যারা এই জাতীয়তা-বোধে আগেই উদ্বুদ্ধ হয়েছে তাদের সমর্থনও বিদ্রোহীরা পেলে না। এ প্রকারান্তরে ইংরেজেরই সহায় হ'ল। এ দুটি কারণেই তাদের সঙ্ঘশক্তি তখন বিরাট্ ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়।

লর্ড ডালহৌসী জবরদস্ত শাসক। ব্রিটিশ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। এজন্য তিনি দুটি প্রধান পথ বেছে নিলেন। প্রথমতঃ তিনি এই নীতি প্রচার করলেন যে, অপুত্রক রাজাদের রাজ্য তাদের মৃত্যুর পর সরকারে বাজেয়াপ্ত হবে। এ নীতির বলে চার বছরের মধ্যে সাতারা, ঝাঁশী ও নাগপুর ব্রিটিশ এলাকাভুক্ত হ'য়ে গেল। ১৮৫৬ সালে কু-শাসনের অজুহাতে ডালহৌসী অযোধ্যার নবাবকে পদচ্যুত ক'রে সমগ্র অযোধ্যা প্রদেশ দখল করলেন। একদিকে যেমন এই কার্য্য চলল, অন্যদিকে তেমনই যাদের সাহায্যে ইংরেজ-প্রভুত্ব সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই দেশীয় সৈন্যদল পুনর্গঠনে তিনি মন দিলেন। কোম্পানীর সৈন্যদল তখন তিন পল্টনে বিভক্ত—বাঙালী পল্টন,

বোম্বাই পল্টন ও মাদ্রাজী পল্টন। এর মধ্যে বাঙালী পল্টনই ছিল সুশিক্ষিত ও সকলের সেরা। কারো কারো ধারণা যে, বাঙালী সিপাহী নিয়েই বাঙালী পল্টন গঠিত। এ কিন্তু ঠিক নয়। আগ্রা-অযোধ্যা ও বিহারের উচ্চ শ্রেণীর, বিশেষ ক'রে ব্রাহ্মণদের নিয়েই বাঙালী পল্টন গঠিত হয়েছিল। 'বেঙ্গল আর্মি' বা বাঙালী পল্টন নামটিই আজও হয়ত ভ্রান্তির উদ্রেক করছে। তখনকার দেশীয় সৈন্যদের নাম সাধারণভাবে দেওয়া হ'ত সিপাহী।

বাঙালী পল্টনের সিপাহীরা উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু ও খুবই ধর্ম্মপ্রবণ। তাদের ভিতরে ঐকমত্য ও একপ্রাণতা যথেষ্ট। এজন্য তাদের দাবি কোম্পানীকে বহুবার অবনত মস্তকে মেনে নিতে হয়েছে। সিন্ধু যুদ্ধে, ব্রহ্ম যুদ্ধে ও সমুদ্র-পারের কোন কোন যুদ্ধে যেতে বাঙালী পল্টন অস্বীকার করে ও কর্তৃপক্ষও তাদের উপর জোর জুলুম বা জিদ না ক'রে তাদের অস্বীকৃতি মেনে নেন। গুর্খা ও শিখ যুদ্ধে—উভয়কেই ইংরেজরা হারিয়ে দেয় এই বাঙালী পল্টনেরই সাহায্যে। এ যুদ্ধগুলিতে বাঙালী পল্টনের সিপাহীদের কৃতিত্ব এত বেশী যে, গুর্খা ও শিখেরা ইংরেজের অপেক্ষা বাঙালী পল্টনের সিপাহীদেরই পরম শত্রু ব'লে জ্ঞান করতে শিখলে। লর্ড ডালহৌসী এহেন বাঙালী পল্টনের মর্য্যাদা স্বীকারে যেমন অরাজী ছিলেন, এর উপর একান্তভাবে নির্ভর ক'রে থাকতে তাঁর মন তেমনি সায় দিলে না। তিনি ১৮৫৬ সালে নিয়ম করলেন—যারা বিনাপত্তিতে কোম্পানীর আদেশ পালন করবে এমন লোককেই বাঙালী পল্টনে নেওয়া হবে, আর শিখ ও গুর্খাদেরও ইতিমধ্যেই সৈন্যদলে নেওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। বাঙালী পল্টনের সিপাহীরা এতে প্রমাদ গণলে। দেশ ও সমাজের সঙ্গে তাদের যোগ ঘনিষ্ঠ। কাজেই এ কথা আগ্রা-অযোধ্যা ও বিহারেও রাষ্ট্র হতে বিলম্ব হ'ল না। রাজ্যচ্যুত অযোধ্যার নবাব ও ঝাঁশীর রাণীর দেশ বহু সিপাহীর জন্মভূমি হ'ল। পেশোয়ার-পোষ্যপুত্র নানা সাহেবও বিঠোরের বাসিন্দা হয়েছেন। ডালহৌসী তাঁর ভাতা বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন। কাজেই উত্তর ভারতের সামন্ত নৃপতি ও সাধারণ অধিবাসী উভয়ের মধ্যেই কোম্পানীর উপর বীতশ্রদ্ধা দেখা দিল। সিপাহীদের অন্ন মারা যাবার উপক্রম হওয়ায় এই বীতশ্রদ্ধা অতি দ্রুত জাতক্রোধে পরিণত হয়। ক্ষেত্র অনেক আগেই প্রস্তুত হয়ে ছিল, টোটায় চর্ব্বি-সংযোগ—সে উপলক্ষ্য মাত্র। ডালহৌসীর

ভারতবর্ষ-ত্যাগের পরেই বিদ্রোহ সুরু হয়। কাজেই তাঁর শাসন-নীতিই যে প্রত্যক্ষভাবে এর জন্য দায়ী তা বুঝতে বিলম্ব হ'ল না।

এক শ্রেণীর মুসলমানদের ভিতরও ব্রিটিশ-বিদ্বেষ ধূমায়িত হয়ে উঠেছিল। দিল্লীর বাদশাহের প্রতি কোম্পানীর ব্যবহার কখনো তারা ক্ষমা করতে পারে নি। ওয়াহাবী সম্প্রদায় এই বিদ্বিষ্ট মনোভাব থেকেই ইন্ধন সংগ্রহ করে। ঐ সময় ব্রিটিশ-বিদ্বেষী মুসলমানরাও দলে দলে সিপাহীদের সঙ্গে এসে যোগ দেয়। ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ ও ইউরোপীয় সমাজ কিন্তু সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে ও পরেও বিদ্রোহের জন্য মুসলমানদের প্রধানতঃ দায়ী করেছিল। শাসনযন্ত্রও মুসলমানদের বিরোধী হয়েই ছিল বহুদিন।

এ সময়কার সিপাহী ও ব্রিটিশ পক্ষের অনাচার-অত্যাচার আজ ইতিহাসের বস্তু। কিন্তু এর পরে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যে-সব নীতি অনুসরণ করলেন তা এক দিকে যেমনি হ'ল বহুদূরপ্রসারী, অন্য দিকে ভারতীয় ও ইউরোপীয় সমাজের মধ্যে বিচ্ছেদ-বৈষম্যও ষোলকলায় পূর্ণ ক'রে দিলে। কর্ম্মে ও লক্ষ্যে এরা ক্রমে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে পড়ল। এর সূচনা আমরা কয়েক বছর পূর্ব্বে বেথুন সাহেবের বিচার-বৈষম্য বিদূরণ আইনগুলির বিরুদ্ধে ইউরোপীয় সমাজের সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের মধ্যেই লক্ষ্য করেছি। সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে আন্দোলন চরমে উঠে। বাংলায় ব্যাপক জঙ্গী আইন প্রবর্ত্তন ও বাঙালীকে নিরস্ত্রীকরণের জন্য জিদ, ব্রিটিশ সেনানী বিদ্রোহীদের যে-সব অত্যাচার করে ও যেভাবে তাদের গ্রাম ও ঘরবাড়ী দাহ করতে সুরু করে তার সমর্থন—এ সব কারণে 'ইউরোপীয়েরা' সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেল। তাদের ভারতীয় বিদ্বেষ এত বেড়ে গেল যে, নূতন বিধিবদ্ধ প্রেস আইন অনুযায়ী 'ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া'কে গবর্ণমেণ্ট জাতিবিদ্বেষ-প্রচারের অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করলেন ও সম্পাদককে এই প্রথম অপরাধের জন্য দণ্ড দান না ক'রে সতর্ক ক'রে দিলেন। বলা বাহুল্য, সিপাহী-বিদ্রোহ আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে বড়লাট লর্ড ক্যানিং এক বছরের জন্য প্রেস আইন ও অস্ত্রনিয়ন্ত্রণ আইন জারি করেন। তিনি ইউরোপীয়দের পরামর্শ গ্রহণ করেন নি, এজন্য তারা তাঁর উপরে অগ্নিশর্ম্মা হ'ল ও সভা ক'রে তাঁকে বিলাতে ফিরিয়ে নেবার জন্য পার্লামেণ্টে দরখাস্ত করতেও কসুর করলেন না। ইউরোপীয়েরা লর্ড

ক্যানিংকে বিদ্রূপ ক'রে 'ক্লেমেন্সি ক্যানিং' বা 'দয়াময় ক্যানিং' উপাধি দিলে। এক দিকে ইউরোপীয় সমাজ যখন তাঁর উপর খড়্গহস্ত, এবং ভারতীয়েরা ভয়বিহ্বল, তখন হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'হিন্দু পেট্রিয়টে' সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধ'রে ক্যানিং-এর উদার নীতির সমর্থন করেন ও যারা জিঘাংসাবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হয়ে সমগ্র ভারতীয়দের উপর কঠোর আইন-প্রয়োগের দাবি জানাচ্ছিল তাদের ঘোর প্রতিবাদ করতে থাকেন। বিলাতের মন্ত্রিসভাও কিন্তু লর্ড ক্যানিংকেই সমর্থন করলেন ও বিদ্রোহের মধ্যেই পার্লামেণ্টে আইন পাস করিয়ে (১৮৫৮, ২রা আগষ্ট) নিজেরা ভারতশাসন-ভার গ্রহণ করলেন। পরবর্ত্তী ১লা নবেম্বর রাণী ভিক্টোরিয়া তাঁর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘোষণায় জানিয়ে দিলেন যে, ভারতবাসীদের ধর্ম্মের উপরে অতঃপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হবে না, এবং রাজ-সরকারের দায়িত্বপূর্ণ পদে জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকল যোগ্য ব্যক্তিকেই নিয়োজিত করা হবে। এ ঘোষণা দ্বারা এক দিকে যেমন শিক্ষিত ভারতবাসীর আকাঙ্ক্ষা-পূরণের চেষ্টা হ'ল অন্য দিকে অশিক্ষিত জনগণের ধর্ম্মপ্রবণতাও মেনে নেওয়া হ'ল। ঘোষণায় আর-একটি বিষয়ও স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত হ'ল।

সিপাহী-বিদ্রোহের অন্যতম প্রত্যক্ষ কারণ—কারণে-অকারণে লর্ড ডাল-হৌসী-প্রবর্ত্তিত নীতি অনুযায়ী দেশীয় রাজ্যগুলির ব্রিটিশ এলাকাভুক্তি। এই নীতি একেবারে বর্জ্জন করবার কথা হ'ল অতঃপর। দেশীয় রাজন্যবর্গও সুতরাং এই ঘোষণা পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন ও বিদ্রোহীদের কাছ থেকে স'রে দাঁড়ালেন। সিপাহী-বিদ্রোহের পর থেকে আজ পর্য্যন্ত কোন দেশীয় রাজ্যকেই একেবারে ব্রিটিশ এলাকাভুক্ত করা হয় নি। ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ কু-শাসনের ও ষড়যন্ত্রের ওজুহাতে বহু রাজন্যকে গদিচ্যুত করেছেন, কিন্তু রাজ্য গ্রাস না ক'রে তাদের বংশধর বা কোন নিকট আত্মীয়কে গদিতে বসিয়েছেন। এই নীতির ফলে যে একটি বিসদৃশ ব্যাপারের উদ্ভব হয়েছে তার কথাও এখানে একটু বলি। ভারতবর্ষে বিদ্যমান ছোট-বড় বহু শত দেশীয় রাজ্য ছিল। কাশ্মীর, মহীশূর, হায়দ্রাবাদের মত বড় রাজ্য, আবার পাঁচ-শ, হাজার একর জমি-পরিমিত পল্লী নিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যও এখানে ছিল। এসব রাজ্যের অধিকাংশেরই গঠনতন্ত্র, শাসনপ্রণালী, শিক্ষাপদ্ধতি সেকেলে

ধরণের। ব্রিটিশ ভারতের অধিবাসীরা যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানে, শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রসর হয়ে বর্ত্তমানের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে চলছিলেন তখন পার্শ্ববর্ত্তী অধিকাংশ দেশীয় রাজ্যের লোকেরা মধ্যযুগীয় আবহাওয়ার মধ্যেই বৰ্দ্ধিত হয়। এর ফলে এক ভারতবর্ষের মধ্যেই দু'রকম—একটি অত্যগ্রসর আর-একটি অনগ্রসর —ভারতের সৃষ্টি হয়েছে। ভারতের ঐক্যবদ্ধ শাসনের পক্ষে এ এক ভীষণ বাধা।

পার্লামেণ্টে যে আইন পাস হ'ল তাতে আগেকার বোর্ড অফ্ কণ্ট্রোল তুলে দেওয়া হ'ল। এ সময় সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেট বা ভারত-সচিবের পদ সৃষ্টি হয়। তিনি ব্রিটিশ মন্ত্রিসভারও একজন মন্ত্রী হবেন এবং পনের জন অতিরিক্ত সদস্য নিয়ে গঠিত ইণ্ডিয়া কৌন্সিল নামক পরামর্শদাতৃ সভারও কর্ত্তা থাকবেন। আর ভারতে বড়লাট ভাইস্রয় বা রাজপ্রতিনিধিরূপে শাসন-কার্য্য পরিচালনা করবেন। অতঃপর ভারত-সচিব ও বড়লাটের ক্ষমতা খুবই বেড়ে গেল।

সিপাহী-বিদ্রোহ কিন্তু শাসনযন্ত্রে একটা মৌলিক পরিবর্ত্তন সাধন করলে। একটি কোম্পানীর হস্ত থেকে ভারত-শাসন ও সংরক্ষণ-কার্য্য ইংলণ্ডেশ্বরের নামে সমগ্র ব্রিটিশ জাতিই এবারে গ্রহণ করলে। গ্লাড্ষ্টোনের আমল পর্য্যন্ত বিলাতে এ একটি দলীয় প্রশ্ন রইলেও, ক্রমে ক্রমে ভারত-শাসন সমগ্র জাতিরই দায়িত্ব হয়ে পড়ল। আর কথায়ই আছে, 'ভাগের মা গঙ্গা পায় না'। দশ জনের কাজ ব'লে ভারত-সচিব ও ভাইস্রয়ের উপর ভারত-শাসনের ভার ছেড়ে দিয়ে পার্লামেণ্ট নিশ্চিন্ত হয়ে রইলেন। এজন্যই ভারতবর্ষ সম্পর্কে পার্লামেণ্টে বাৎসরিক আলোচনার দিনে কোরাম বা সিদ্ধ-সংখ্যার অভাবে অধিবেশন বন্ধ ক'রে দেবার উপক্রম হ'ত। ভারতবর্ষ-প্রবাসী বে-সরকারী ইউরোপীয় সমাজ আগে কোম্পানীর আমলে ভারত-সরকারকে যেমন আলাদা ক'রে ভাবত, অতঃপর তাদের পক্ষে তা আর সম্ভব হ'ল না। ভারতবর্ষ সমগ্র ইংরেজ জাতির সম্পত্তি, সুতরাং তাদেরও সম্পত্তি ব'লে তারা বিবেচনা করলে। ভারত-শাসনের সঙ্গে তারা নিজেদের বিশেষ ভাবে জড়িয়ে ফেললে। গবর্ণমেণ্টও এতদিন তাদের কতকটা ভিন্ন দৃষ্টিতেই দেখত, এবং ভারতীয় ও ভারত-প্রবাসী ইউরোপীয়দের মধ্যে ব্যবহার-সাম্য-

স্থাপনে মধ্যে মধ্যে প্রয়াস পেত। অতঃপর শাসকগোষ্ঠী ও বে-সরকারী ইউরোপীয় সমাজের দায়িত্ব একই স্তরে উন্নীত বা অবনমিত হ'ল। তাদের উভয়েরই চক্ষে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী একটি স্বতন্ত্র বস্তু ব'লে প্রতিভাত হ'তে লাগল। শুধু নীতির জন্যই ইংরেজ শাসকবর্গ একেবারে বে-সরকারী ইউরোপীয়দের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল বললে ভুল হবে, আত্মরক্ষার প্রাথমিক তাগিদেও তারা এরূপ হ'তে হয়ত উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। প্রবাসী ইউরোপীয়দের স্বার্থও তারা ষোল আনা অটুট রাখতে বদ্ধপরিকর হ'ল। ইংরেজের ব্যবসা-স্বার্থ দেশে ইতিপূর্ব্বেই প্রবল হয়ে উঠেছে। সহরে ও মফঃস্বলে প্রচুর ইংরেজ বসবাস করতে আরম্ভ করেছে। তাদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে কর্ত্তৃপক্ষ দেশরক্ষায় ও দেশশাসনে তাঁদের সহযোগিতা পূর্ণভাবে আদায় করলেন। ইউরোপীয় স্বার্থ বজায় রাখতে তাঁরা যতখানি আগ্রহ প্রকাশ করলেন ঠিক ততখানি তাঁরা ভারতীয়দের দূরে সরিয়ে রাখলেন।

ব্রিটিশ জাতি ভারত-শাসনভার গ্রহণের পর থেকে তার সামরিক নীতিও বদলাতে সুরু হয়। বিদ্রোহদমনে ডালহৌসির অনুসৃত নীতিই কিন্তু কার্য্যকরী হয়েছিল। নবগঠিত শিখ ও গুর্খাবাহিনী এবারে সরকারকে বিশেষভাবে সাহায্য করে। আগেই বলেছি, ব্রিটিশ নীতিচাতুর্য্যের ফলে শিখ ও গুর্খারা ইংরেজের পরিবর্ত্তে নিতান্ত ভ্রমবশতঃই স্বদেশবাসী হিন্দুস্থানী সিপাহীদের শত্রু ব'লে গণ্য করত। লর্ড ডালহৌসী বিলাতে বসেই বিদ্রোহের প্রাক্কালে লিখেছিলেন, 'হিন্দুস্থানী সিপাহীদের বিরুদ্ধে শিখ ও গুর্খারা বিশ্বস্তভাবে শয়তানের ("devils") মতই লড়বে!' সেনাপতি ম্যান্স্ফিল্ড বলেন, "শিখরা যে সিপাহী-বিদ্রোহের সুযোগ নিয়ে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা না ক'রে আমাদের পক্ষ নিয়ে লড়েছে তার কারণ এ নয় যে, তারা আমাদের খুব প্রীতির চক্ষে দেখে; তার কারণ এই যে, তারা বাঙালী পল্টনকে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করে।" সিপাহী-বিদ্রোহের সময় সার জন লরেন্স ছিলেন পঞ্জাবের চীফ কমিশনার। তিনিও নিজ অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন, "নিঃসংশয়ে বলতে পারি, বাঙালী পল্টনের ভ্রাতৃত্ববোধ ও ঐকমত্য আমাদের পক্ষে সব চেয়ে বেশী ক্ষতিকর হয়েছে। এই ত্রুটির (?) সংশোধন করতে হলে পল্টন প্রথমতঃ ইউরোপীয় সৈন্য ও দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন জাত থেকে সংগৃহীত সৈন্য দ্বারা ভর্ত্তি

করতে হবে।" সিপাহী-বিদ্রোহের পর কুড়ি বছরের মধ্যেই ভারতীয় সৈন্য-দলের এই 'ত্রুটি' (অর্থাৎ 'ঐকমত্য' ও 'ভ্রাতৃত্ববোধ') দূরীভূত হয়। সরকার বাঙালী পল্টনের চেহারা বদলে দিয়ে শিখ, পঞ্জাবী, মুসলমান, পাহাড়ী, জাঠ, রাজপুত ও গুর্খা দিয়ে সৈন্যদল পূর্ণ করলেন। ব্রিটিশ সৈন্যও অধিক সংখ্যায় ভারতে স্থিত হ'ল এর পর থেকে।

কয়েকটি বিশেষ শ্রেণী থেকে সৈন্য সংগ্রহ করায় এক দিকে সমগ্র ভারতীয় জাতি যেমন যুদ্ধবিদ্যায় অজ্ঞ থেকে গেল, অন্য দিকে আইনবলে তাদের নিরস্ত্র ক'রে রাখবারও ব্যবস্থা হ'ল। ১৮৭৯ সালে সার রিচার্ড টেম্প্‌ল বোম্বাই-এর গবর্ণর ছিলেন। তিনি তখন বলেন, "ব্রিটিশ শাসনে ভারতবাসীর পূর্ব্বেকার যুদ্ধ করবার ক্ষমতা হ্রাস পেতে পেতে এখন একেবারে শূন্যে গিয়ে পৌঁছেছে। আর এ ব্যাপারটি আমাদের শাসনের একটি প্রধান রক্ষাকবচ ব'লে বিবেচিত। সরকার এ বিষয়ে এতই সচেতন রয়েছেন যে, পঁচিশ বৎসরের অনুসৃত নীতির ফলেই ভারতবাসীরা সাধারণভাবে নিরস্ত্র হয়ে পড়েছে।" সিপাহী-বিদ্রোহের অন্যূন পঁচাশী বছর পরেও ভারতবাসী জাতি হিসাবে নিরস্ত্র ও যুদ্ধবিদ্যায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল।

বিদ্রোহ উত্তর ও মধ্য ভারতে ছড়িয়ে পড়লেও আগ্রা-অযোধ্যাই এর প্রধান লীলাক্ষেত্র। বিদ্রোহী সিপাহীদের ও বৃটিশবাহিনীর নির্ম্মম অত্যাচারের ফলে ও-অঞ্চল একেবারে শ্মশানে পরিণত হয়েছিল। বিদ্রোহ প্রশমিত হ'ল বটে, কিন্তু অধিবাসীদের মধ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনতে কর্ত্তৃপক্ষকে বিশেষ বেগ পেতে হয়। এ সময় একজন বাঙালী তাঁদের বিশেষভাবে সাহায্য করলেন। ডিরোজিও-শিষ্যদলের মধ্যে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে আমরা একজন উগ্র রাজনীতিক বলেই জানি। কিন্তু সে-যুগের শিক্ষিত বাঙালীর রাজনৈতিক উগ্রতাও একটি গণ্ডীর মধ্যেই প্রকাশ পেত। ইংরেজের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হোক, এ তারা চাইত না। দক্ষিণারঞ্জনের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মতবাদের উগ্রতাও কেটে গেছে। পাদ্রী আলেকজাণ্ডার ডাফের পরামর্শে লর্ড ক্যানিং দক্ষিণারঞ্জনকে রায়বেরিলীর অন্তর্গত বাজেয়াপ্ত তালুক শঙ্করপুরের স্বত্ব দিয়ে আগ্রা-অযোধ্যায় প্রেরণ করলেন। ঐ প্রদেশের বাজেয়াপ্ত তালুকগুলি বুঝে বুঝে 'রাজভক্ত' লোকদের স্থায়িভাবে প্রদান করা হয়েছিল। দক্ষিণারঞ্জন

তালুকদারদের সঙ্ঘবদ্ধ ক'রে ১৮৬১ সনের নভেম্বর মাসে লক্ষ্ণৌ শহরে 'আউধ্ বা অযোধ্যা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করেন। এসোসিয়েশনের মুখপত্রস্বরূপ 'সমাচার হিন্দুস্থানী' নামে ইংরেজী ও 'ভারত-পত্রিকা' নামে হিন্দুস্থানী সংবাদপত্রও প্রকাশিত হ'ল। বিধ্বস্ত অযোধ্যার পুনর্গঠনে দক্ষিণা-রঞ্জনের কৃতিত্ব সামান্য নয়। তিনি পনর বছরের অধিক কাল সেখানে বাস করেন এবং নানা জনহিতকর কার্য্যে ব্রতী হন। ও-অঞ্চলের রাজনীতি-চর্চ্চারও মুলাধার ছিলেন তিনি। তাঁর কর্ম্মশক্তি নিয়োজিত না হ'লে এই দেশের দৈন্য-দশা ঘুচতে আরও বহুকাল হয়ত চলে যেত। সিপাহী-বিদ্রোহ-দমনে যে নৃশংসতা অবলম্বিত হয় তার ফলে অযোধ্যার মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। এখনও তালুকদার ও প্রজা ছাড়া অন্য কোন শ্রেণী সেখানে খুঁজে পাওয়া ভার। তালুকদার শ্রেণী ক্রমে সরকার পক্ষে ঝুঁকে পড়ল; অতঃপর জনসাধারণের নেতৃত্ব যাঁরা গ্রহণ করেন তাঁরা অধিকাংশই অন্য প্রদেশ থেকে আগত, অযোধ্যা-প্রবাসী—নেহরু, সাপরু, কুঞ্জরু, মালবীয় প্রভৃতিরা।

সিপাহীযুদ্ধের অনাচারের ফলে ১৮৬১ সালে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। কোম্পানীর আমলে ইতিমধ্যেই ভারতবর্ষে কতকগুলি বড় বড় দুর্ভিক্ষ হয়ে গেছে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কথা আমরা সকলেই জানি। ১৮০৩ সালে বোম্বাইয়ে ও ১৮৩৭ সালে মাদ্রাজে বড়রকমের দুর্ভিক্ষ হয়। তারপরে এল ১৮৬১ সালের দুর্ভিক্ষ। শিক্ষিত ভারতবাসীর জাতীয়তা-বোধ সিপাহীযুদ্ধের সময় কর্ম্মে প্রকাশিত হবার সুযোগ পায় নি। এবারে তা যেন দুকূল উপচে পড়ল। দুর্ভিক্ষের ক্লেশ ভারতবাসীদের একভ্রাতৃত্ব ও একজাতীয়ত্ব-বোধে অনুপ্রাণিত করতে লাগল।

সিপাহী-বিদ্রোহের পর সরকারী ও বে-সরকারী ইউরোপীয় সমাজ এমনি একান্তভাবে স্বদেশ ও স্বজাতির স্বার্থরক্ষায় অগ্রসর হ'ল যে, এর প্রতিক্রিয়া ভারতীয় মনে উপস্থিত হতেও অধিক বিলম্ব হ'ল না। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রভাব তখন অনেকটা কমে গেছে, কেন-না শাসকশ্রেণীর সঙ্গে নিজেদের স্বার্থ মিলিয়ে নিতেই তখন এ সচেষ্ট। তথাপি এ যতটুকু স্বাধীন সত্তা বজায় রাখতে পেরেছিল তা হরিশ্চন্দ্রের পরবর্ত্তী 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-সম্পাদক কৃষ্ণদাস পালের চেষ্টায়। কৃষ্ণদাস প্রথমে এই এসোসিয়েশনের সহকারী

সম্পাদক ও পরে সম্পাদক হয়েছিলেন। দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আত্মজীবনীতে কৃষ্ণদাস পালকে ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞ ব'লে অভিহিত করেছেন। সিপাহী-বিদ্রোহের পরবর্ত্তী যুগে হিন্দু পেট্রিয়টে কৃষ্ণদাস পাল ও সোমপ্রকাশে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ইংরেজের নূতন মনোভাব বিশ্লেষণ ক'রে নিজেদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে স্বদেশবাসীকে সজাগ ক'রে দেন।

কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর অমর কাব্য 'মেঘনাদ বধ' ১৮৬০ সালের মধ্যেই লিখে শেষ করেন। মেঘনাদ বধ বাঙালীর প্রাণে নূতন আশার সঞ্চার করেছিল। সিপাহী-বিদ্রোহ সমর্থন বা তার প্রশস্তিবাদ করতে তখন কেউই ভরসা পেত না। ক্যানিঙের আমলে যে প্রেস আইন নূতন ক'রে বিধিবদ্ধ হয় তার বলে সংবাদপত্র ও পুস্তক-পুস্তিকা সবই বাজেয়াপ্ত হ'তে পারত। শিক্ষিত বাঙালী-মন তখন হয়ত এতটা অসাড় হয়ে পড়ে নি, তাই সিপাহী-বিদ্রোহের মধ্যে ব্যর্থতার গ্লানির সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রামের বীরত্বও উপলব্ধি করতে পারত। হয়ত কেউ কেউ এ বীরত্ব লক্ষ্য করেছিল ও নির্জ্জানের এই অবদমিত বাসনাকে প্রাচীন কাব্যের ছাঁচে ঢেলে সাধারণের কাছে প্রকাশ করতেও চেয়েছিল। রাবণ-সন্তান রাক্ষস-বীর ইন্দ্রজিৎকেই মধুসূদন করলেন তাঁর কাব্যের নায়ক। আর জ্ঞাতিশত্রু বিভীষণ—যাঁর গোপন কথা প্রকাশের ফলে হ'ল রাক্ষসকুলের পরাজয়, তাঁকে সাজালেন দেশদ্রোহী ক'রে! তিনি কাব্যছন্দে বিভীষণের দেশদ্রোহিতা ও জ্ঞাতিদ্রোহিতা এবং তার বিষময় ফল স্বদেশবাসীদের চোখের সামনে ধরিয়ে দিলেন। সিপাহীযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই যে এ কাব্যখানি এতটা সমাদর লাভ করেছিল তার একটি কারণ, এতদিন পরে, মনে হয়, শুধু ছন্দের নূতনত্ব বা রসের গভীরতাই নয়, এর উপরে আর-একটি জিনিষও রয়েছে, তা হ'ল বাঙালী তথা ভারতবাসীর তখনকার মনের কথা জোরের সঙ্গে প্রকাশ। বাঙালী বীর্য্যেরই উপাসক হ'তে চাইছে।

বাঙালীর নবজাতীয়তা-বোধ

সিপাহীযুদ্ধের পরে সরকার তরফে সৈন্যদল সম্পর্কে যে-সব নীতি অনুসৃত হতে সুরু হয় এই মাত্র তার আভাস দিয়েছি। এক দিকে রাণী ভিক্টোরিয়ার উদারনীতিমূলক ঘোষণা, অন্য দিকে সরকারের সুনির্দ্দিষ্ট রক্ষণশীল নীতি—দুয়ের মধ্যে পড়ে লর্ড ক্যানিং-এর পরবর্ত্তী ভাইস্‌রয় লর্ড এলগিন (১৮৬২-৬৩) বড় ফাঁপরে পড়লেন। তিনি ভারত-সচিব সার চার্লস উডকে (ইনিই প্রথম ভারত-সচিব বা সেক্রেটারী অফ্‌ ষ্টেট) লিখলেন যে, গণ্যমান্য ও সুশিক্ষিত ভারতবাসী-দের যদি শাসনকার্য্যের অংশভাগী না করা হয় তা'হলে তাঁরা জনসাধারণের সঙ্গে মিশে তাদের নেতৃত্ব গ্রহণ ক'রে সরকারের ঘোর শত্রু হয়ে দাঁড়াবেন। আর যদি শাসন-ব্যাপারে তাঁদের সহযোগিতা গ্রাহ্য হয় তা'হলে ব্রিটিশ প্রভুত্ব-প্রতিষ্ঠায় ব্যাঘাত ঘটবে। এই দোটানায় পড়ে, যাহোক, কর্ত্তৃপক্ষ ঠিক করলেন, যতটা সম্ভব প্রভুত্ব নিজেদের হাতে রেখে কোন কোন অপেক্ষাকৃত কম দায়িত্বশীল পদে ভারতবাসীকে নিযুক্ত করা চলবে।

তখন কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে উচ্চ শিক্ষা সাধারণের অধিগম্য হয়েছিল। ভারতীয় যুবকগণ উচ্চতম পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে পাশ্চাত্ত্যের জ্ঞানগরিমা উপলব্ধি করলেন। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, তারকনাথ পালিত, রাসবিহারী ঘোষ প্রভৃতি এযুগের বিশেষ কৃতি ছাত্র। কৃতি ছাত্রদের অনেকে স্বভাবতঃই সরকারী উচ্চ পদগুলিতে নিয়োগের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতে লাগলেন। কিন্তু ডেপুটি কলেক্‌টরী ও ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটই ছিল তখন ভারতবাসীর পক্ষে সর্ব্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য উন্মুক্ত পদ। প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মত প্রথম শ্রেণীর মনীষী ও জ্ঞানী ব্যক্তিও ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের বেশী কিছু আশা করতে পারেন নি! সিবিলিয়ানী পদ বিলাতে সাধারণের নিকট উন্মুক্ত হ'লেও ভারতবাসীর পক্ষে এতদিন তার সুযোগ-গ্রহণ আদৌ সম্ভবপর হয় নি। ১৮৬০ সালের পর থেকেই প্রথম বাঙালী যুবকগণ উচ্চ শিক্ষা লাভার্থে বিলাত গমন করতে আরম্ভ করেন। মহর্ষি

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিলাতে গিয়ে ১৮৬৩ সালে সিবিলিয়ানী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনিই ভারতবাসীদের মধ্যে প্রথম আই.সি.এস.। পশ্চিম ভারতে বোম্বাই প্রদেশে তাঁকে স্থিত করা হয়। সত্যেন্দ্র-নাথের সঙ্গে প্রসিদ্ধ বাগ্মী ও ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষও একই উদ্দেশ্য নিয়ে বিলাত গিয়েছিলেন। মনোমোহন 'বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা'র সভ্য ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের বন্ধু রামলোচন ঘোষের পুত্র। ইনি অল্প বয়সেই ইংরেজীতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১ সালের আগষ্ট মাসে 'ইণ্ডিয়ান মিরর' নামক ইংরেজী পাক্ষিক পত্রিকা বের ক'রে তাঁরই উপর এর সম্পাদনা-ভার অর্পণ করেন। তখন মনোমোহনের বয়স মাত্র সতর বছর। সিবিল সার্বিস পরীক্ষার নিয়মাদি পরিবর্ত্তনের ফলে দু-দুবার চেষ্টা করেও মনোমোহন কৃতকার্য্য হতে পারেন নি। অবশেষে ১৮৬৬ সালে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা পাস ক'রে স্বদেশে ফিরে আসেন।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাফল্যলাভের পর থেকেই বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ সিবিলিয়ানী পরীক্ষার নিয়ম-কানুন এমনি ভাবে রদ-বদল করতে লাগলেন যে ভারতীয়দের পক্ষে এতে উত্তীর্ণ হওয়া একরূপ দুর্ঘট হয়ে উঠল। শিক্ষিত বাঙালীর পক্ষে সরকারের অভিপ্রায় বুঝতে অধিক বিলম্ব হ'ল না। পাদরি টমসন ও গ্যারাট এ সম্পর্কে বলেন যে, ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ধ্বংসাবশেষের উপর যে শাসন-কাঠামো খাড়া করা হ'ল তাতে শিক্ষিত ভারতবাসীর স্থান ছিল না বললেই চলে। মেজর ইভান্স বেল বলেন, ১৮৬২ সালে যখন হাইকোর্ট ও ব্যবস্থা-পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হ'ল তখন এদেশীয়দের দায়িত্বপূর্ণ পদ-দান সম্বন্ধে খুবই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, কিন্তু পরে অতি সামান্যই কার্য্যে পরিণত করা হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, একটি আইন ক'রে কলকাতার সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামত আদালত এবং সুপ্রিম কোর্ট—সব নিয়ে ১৮৬২ সালে বর্ত্তমান কলকাতা হাইকোর্ট গঠিত হয়। বোম্বাই ও মাদ্রাজেও এসময় হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হ'ল। সমগ্র ভারতবর্ষ সম্পর্কে প্রযুক্ত দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনও এ সময়ে তৈরী হ'ল।

১৮৬১ সালে পার্লামেণ্টে 'ইণ্ডিয়ান কৌন্সিল্স্ অ্যাক্ট' নামে ভারতের ব্যবস্থা-পরিষদ সম্পর্কে একটি আইন বিধিবদ্ধ হয়। এ আইন অনুসারে

ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ পুনর্গঠিত হ'ল। এবারে বড়লাটের শাসন-পরিষদে একজন পঞ্চম সদস্য নিযুক্ত হলেন। বড়লাট, জঙ্গীলাট ও শাসন-পরিষদের পাঁচ জন সদস্য—এই সাত জন এবং বে-সরকারী অন্যূন ছয় ও অনধিক বার জন মনোনীত সদস্য নিয়ে ব্যবস্থা-পরিষদ গঠনের কথা হয়। ১৮৭০ সালে আইন কিঞ্চিৎ সংশোধিত হয়ে স্থির হয়, যখন যে প্রদেশে পরিষদের অধিবেশন হবে তখন সেই প্রদেশের শাসনকর্ত্তাও এতে অতিরিক্ত সদস্য হিসাবে যোগদান করবেন। বাংলা দেশ থেকে একজন সিনিয়র সিবিলিয়ান কর্ম্মচারীকেও অতিরিক্ত সদস্য ক'রে নেওয়া হয়। ১৮৬১ সালের আইনেই কিন্তু স্থির হ'ল, বে-সরকারী সদস্যদের মধ্যে অর্দ্ধেক হবেন ভারতীয়। এই আইন অনুসারে গঠিত প্রথম ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে ভারতীয় সদস্য মনোনীত হলেন পাতিয়ালার মহারাজা, কাশী-নরেশ এবং গোয়ালিয়রের ভূতপূর্ব্ব প্রধানমন্ত্রী সার্ দিনকর রাও। এতে কিন্তু একজনও বাঙালী গ্রহণ করা হয় নি।

পূর্ব্বে বোম্বাই ও মাদ্রাজে গবর্ণরের কৌন্সিল পরিষদ ছিল। আইন-প্রণয়নে তাদের ক্ষমতা ছিল বড়লাটেরই সমান। ১৮৩৩ সালের পার্লামেণ্টীয় আইনে তাদের এ ক্ষমতা বিলুপ্ত করা হয়। অতঃপর সপরিষদ বড়লাট সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের জন্য আইন তৈরী করতে লাগলেন। পরে ১৮৬১ সালের আইনবলে আবার বোম্বাই ও মাদ্রাজে ব্যবস্থা-পরিষদ গঠিত হ'ল। তারা প্রাদেশিক ব্যাপারে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রাপ্ত হলেও, প্রত্যেকটি আইনে বড়লাটের সম্মতি নেবার কথা থাকে। এইরূপে শাসন স্পষ্টতঃই কেন্দ্রীভূত করা হ'ল।

বাংলার জন্য কিন্তু পূর্ব্বে কোনরূপ স্বতন্ত্র ব্যবস্থাই ছিল না। এই আইনে এ প্রদেশে ব্যবস্থা-পরিষদ প্রবর্ত্তনের জন্য বড়লাটকে ক্ষমতা দেওয়া হয়। বড়লাটের ঘোষণা অনুসারে ১৮৬২ সালের ১৮ই জানুয়ারী বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদ গঠিত হ'ল। পরিষদের প্রথম অধিবেশন হয় পরবর্ত্তী ১লা ফেব্রুয়ারী। এ পরিষদে সদস্যসংখ্যা বার জন। এদের মধ্যে চার জন বাঙালী। সদস্যগণ দু' বছরের জন্য মনোনীত হতেন। রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রমাপ্রসাদ রায়, নবাব আবদুল লতিফ ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রথম মনোনীত সদস্য। এ বছরের ১লা আগষ্ট রমাপ্রসাদ রায়ের মৃত্যু হ'লে তাঁর স্থলে রামগোপাল ঘোষ ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য মনোনীত হন। মনোনীত সদস্যদের ক্ষমতা ছিল খুবই সীমাবদ্ধ।

শাসন সম্পর্কে কোনরূপ অভিযোগ বা প্রশ্ন পেশ করবার বা কোন বিষয়ে শাসন-পরিষদের সদস্যদের জবাবদিহি করাবার ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। নির্দ্দিষ্ট আইন বিধিবদ্ধ কালেই তাঁরা শুধু পরামর্শ দিতে পারতেন। তাঁদের কিন্তু ভোটদানের অধিকারও এবারে স্বীকৃত হয় নি। অন্যান্য ব্যবস্থা-পরিষদের মনোনীত সদস্যদের বেলায়ও এই নিয়ম চালু হ'ল।

রমাপ্রসাদ রায় রাজা রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি ঐ সময়ে হাইকোর্টের লিগ্যাল রিমেম্‌ব্রান্সার-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ পদে তিনিই প্রথম বাঙালী। সরকার ভারতবাসীদের মধ্যে তাঁকেই প্রথম হাইকোর্টের বিচারপতি নিয়োগ করেন। কিন্তু তাঁকে যখন এ সংবাদ দেওয়া হ'ল তখন তিনি মৃত্যুশয্যায়। প্রকৃতপক্ষে, শম্ভুনাথ পণ্ডিতই প্রথম ভারতবাসী, যিনি হাইকোর্টে বিচারাসনে বসে প্রথম জজীয়তি কার্য্য করেছিলেন। ইনিও সে-যুগের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। নবাব আব্দুল লতিফ ইংরেজী শিক্ষায় সুশিক্ষিত ও তখনকার মুসলমান সমাজের নেতৃস্থানীয়। কলকাতার মহম্মডান এসোসিয়েশনের ছিলেন তিনি অন্যতম কর্ণধার। সার সৈয়দ আহ্‌মেদের পূর্ব্বেই তিনি স্বধর্ম্মীদের ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন ক'রে বক্তৃতা করেছিলেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও রামগোপাল ঘোষ তখনকার বাঙালী-সমাজে সুপরিচিত ব্যক্তি। আমরা এতক্ষণে বহুবার এঁদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছি। প্রসন্নকুমার ঠাকুরও একজন প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী। তিনি ছিলেন রামমোহন রায়-পন্থী। রাজনীতিতেও তিনি মধ্য পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। লর্ড ডালহৌসী প্রসন্নকুমার ঠাকুরকে ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে ক্লার্ক এসিষ্ট্যাণ্ট-পদে নিয়োগ করেছিলেন। তখন কোন ভারতীয় সদস্য পরিষদে না থাকায় আইন-প্রণয়নকালে তাঁর মতামত জেনে নেওয়া খুবই প্রয়োজন হ'ত। তিনি পরে এই পরিষদেও সভ্য হন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন লক্ষ টাকা দান করেন। তাঁর দানেই 'ঠাকুর আইন অধ্যাপক' পদের সৃষ্টি হয়েছে। ডিরোজিও-শিষ্যদের ভিতর রামগোপাল ঘোষ প্রসিদ্ধ বাগ্মী ব'লে খ্যাতি লাভ করেন। ১৮৪৭ সনেই বাগ্মিতার জন্য ইংরেজদের নিকট তিনি 'ইণ্ডিয়ান ডিমস্থিনিস' বা ভারতীয় ডিমস্থিনিস আখ্যা পান। তাঁর স্বাদেশিকতা ছিল অনুপম। স্বদেশবাসীর স্বার্থরক্ষাকল্পে ব্যবস্থা-পরিষদে ও কলকাতা মিউনিসি-

প্যালিটিতে রামগোপালের বক্তৃতা তাঁর মৃত্যুর বহু পরেও লোকে স্মরণ করত। তিনি বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রতিষ্ঠার সময় থেকে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সদস্য ছিলেন।

রামগোপাল ঘোষের জীবিত কালেই যে বাঙালী-প্রধান শিক্ষিত যুবক সমাজের চিত্ত অধিকার করেছিলেন তাঁর নাম ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। তিনি নিজেও কিন্তু তখনও যুবক। কিন্তু তাঁর কথা বলবার পূর্ব্বে আর-এক জনের কথা আমাদের স্মরণীয়। তিনি হলেন প্যারীচরণ সরকার। মোহাবিষ্ট শিক্ষিত বাঙালীর দৃষ্টি স্বদেশ ও স্বজাতির দিকে ফিরিয়ে আনতে তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। প্যারীচরণ সরকার আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। বহুকাল বারাসতের সরকারী স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদে কার্য্য ক'রে এই সময় কলকাতার হেয়ার স্কুলে বদলি হয়ে আসেন। প্রথম ইংরেজী শিক্ষার্থীদের জন্য তিনি যে পাঠ্যপুস্তক লিখেছিলেন তা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয়ের মত এখনও আদর্শস্থানীয়ই হয়ে আছে। তিনি স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন এবং একটি বালিকা বিদ্যালয়ও স্থাপন করেন। কিন্তু তিনি বাঙালী-সমাজের সব চেয়ে বেশী উপকার করেছেন মাদকদ্রব্য বর্জ্জন আন্দোলন সুরু ক'রে দিয়ে। পরবর্ত্তী স্বাধীনতা-আন্দোলনের একটি প্রধান স্তম্ভ হ'ল এই মাদকদ্রব্য বর্জ্জন আন্দোলন। জাতির চিত্তশুদ্ধিও শক্তিলাভের পক্ষে এর আবশ্যকতা মহাত্মা গান্ধী শুধু স্বীকারই করেন নি, তিনি ভারতব্যাপী আন্দোলন চালিয়ে শিক্ষিত-অশিক্ষিত জনসাধারণকে মাদক দ্রব্যসেবনে বিরত করাতেও অনেকটা সক্ষম হয়েছিলেন। মেদিনীপুরে রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ১৮৬১ সালে সর্ব্বপ্রথম সুরাপান নিবারণী সভা প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু কলকাতায় এইরূপ একটি সভা স্থাপন ক'রে প্যারীচরণ সরকারই ১৮৬৩ সনে এই মারাত্মক ব্যাধির দিকে দেশবাসীর দৃষ্টি সকলের আগে আকর্ষণ করলেন। তখনকার শিক্ষিত সমাজ ছিল এ ব্যাধি দ্বারা ব্যাপক ভাবে আক্রান্ত। ডিরোজিও-শিষ্যদল ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে মদ্যপানেও রীতিমত অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। কত লোককে যে মদ্যপানের আতিশয্যে নিজেদের শক্তিসামর্থ্য বিলুপ্ত ক'রে ইহলোক থেকে অকালে বিদায় নিতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। প্রসিদ্ধ স্বদেশহিতৈষী হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও অতিরিক্ত মদ্যপানহেতু নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে মাত্র আটত্রিশ বৎসর বয়সেই প্রাণত্যাগ

করেন। কাজেই, প্যারীচরণ সরকারের প্রচেষ্টা এ সময় বাঙালী সমাজ, বিশেষ ক'রে শিক্ষিত বাঙালীর মহোপকার সাধন করেছিল। তিনি 'এডুকেশন গেজেট'-এর সম্পাদক ছিলেন বটে, কিন্তু বিশেষ ক'রে মাদক দ্রব্য নিবারক আন্দোলন চালাবার জন্য 'ওয়েল উইশার' নামে একখানি ইংরেজী ও 'হিতসাধক' নামে একখানি বাংলা পত্রিকাও প্রকাশ করিলেন। তিনি ঐ উদ্দেশ্য নিয়ে, ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে 'টেম্পারেন্স এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁর এই কার্য্যে সহায় হয়েছিলেন সুপণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ও রেভারেণ্ড সি. এইচ. এ. ড্যাল সাহেব। সুরেন্দ্রনাথ সত্যই বলেছেন, প্যারীচরণের এ আন্দোলন যুবকসমাজের চিত্তশুদ্ধি ঘটিয়েছিল, ও এজন্য নিষ্ঠার সঙ্গে নানা সৎকর্ম্ম করতে যুবকগণ অগ্রসর হ'তে পেরেছিলেন।

এ সময়কার আর-একটি প্রধান ঘটনা উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষ। আগেই বলেছি, দুর্ভিক্ষ ভারতবাসীদেব মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করায় বিশেষ সাহায্য করেছে। হিন্দুর গৌরবময় যুগে বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ চাণক্য দুর্ভিক্ষের সময় দুর্গতদের সাহায্যকারীকে তাদের অন্যতম প্রধান বান্ধব বলে আখ্যা দিয়েছেন। ঘন ঘন দুর্ভিক্ষের ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের ভারতবাসীরা পরস্পরকে পরস্পরের বান্ধব ব'লে ভাবতে শেখে। উড়িষ্যাদুর্ভিক্ষ এই বোধকে বিশেষভাবে পরিপুষ্ট করে। এই দুর্ভিক্ষে চল্লিশ লক্ষ অধিবাসীর ঘরে অন্নাভাবে হাহাকার ওঠে ও এক-তৃতীয়াংশ মৃত্যুর কবলে গিয়ে শান্তি লাভ করে। সরকারী কর্ম্মচারীদের অকর্ম্মণ্যতা দেখে শিক্ষিত ভারতবাসীর চোখ একেবারে খুলে গেল। তাঁরা নূতন ক'রে নিজেদের অবস্থা পর্য্যালোচনা করতে আরম্ভ করেন। অল্প কাল পরে সে যুগের বিখ্যাত লেখক ভোলানাথ চন্দ্র ও অন্যান্য মনীষীরা এর কারণ অনুসন্ধান-কল্পে অর্থনীতির আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। কিন্তু সমূহ বিপদ থেকে উড়িষ্যাবাসীদের জন্য বাঙালীরা যে উদ্যোগ-আয়োজন করেছিলেন তা অভূতপূর্ব্ব। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও প্যারীচরণ সরকারের নেতৃত্বে বাঙালীরা সাহায্য-ভাণ্ডার খুললেন ও উড়িষ্যাবাসীদের দুঃখ-নিবারণে অগ্রসর হলেন। তখন প্যারীচরণের গৃহ অন্নসত্রে পরিণত হয়েছিল।

বিশাল ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে একাত্মবোধ—অন্য কথায় জাতীয়তাবোধ—এসময় কার্য্যতঃ পুষ্টিলাভ করে আরও একটি বিশেষ

কারণে। আর এর মূলাধার হলেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। গত শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকেই কেশবচন্দ্র বাঙালী যুবকসমাজের নেতৃত্বগ্রহণে সমর্থ হন। ব্রাহ্মসমাজে যোগ দান ক'রে নৈষ্ঠিক ব্রাহ্ম ব'লে শীঘ্রই তিনি পরিচিত হলেন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধি দিলেন। সমাজ-সংস্কার, ধর্ম্ম-সংস্কার, সকল বিষয়েই কেশবচন্দ্র অগ্রণী। এসব নিয়ে কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মতভেদ ঘটে। এই মতভেদ ১৮৬৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বিচ্ছেদে পরিণত হয়। কেশবচন্দ্র পরে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' নামে স্বতন্ত্র সমাজ গঠন করেন। এর পূর্ব্বে ও পরে তিনি উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারত পরিভ্রমণ করলেন এবং বন্ধুগণ সঙ্গে নিয়ে বাংলা দেশের ঢাকা, মৈমনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলেও গেলেন। তাঁর নির্দ্দেশে বোম্বাই ও মাদ্রাজে ব্রাহ্মসমাজের অনুরূপ নূতন সমাজও গঠিত হ'ল। কেশবচন্দ্রের সমগ্র ভারত ভ্রমণ নানা স্থানের শিক্ষিত ভারতবাসীদের মনে একাত্মবোধ উন্মেষে বিশেষ সহায় হয়। তাঁর বাগ্মিতা সকলকে মুগ্ধ ক'রে দিলে। কোন নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে সমগ্র ভারতভ্রমণ এবং সকলকে ঐকমত্যে আনয়নের কার্য্যকর চেষ্টা এই প্রথম। এ ব্যাপারে শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে ঐক্যবোধ জাগ্রত হবার সুযোগ পেল।

কেশবচন্দ্রের ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারমূলক আন্দোলন শিক্ষিত ভারতবাসীর স্বজাতিপ্রীতিরও উদ্রেক করে। প্রথম, জাতিভেদ-প্রথার অনৌচিত্য তিনি উদাত্তকণ্ঠে প্রচার করলেন। তাঁর চেষ্টায় বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম বিবাহ-প্রথাও প্রবর্ত্তিত হ'ল। ১৮৭২ সনে সিবিল ম্যারেজ বা বিবাহ আইন পাস হবার পর এই বিবাহপ্রথা আইনতঃ সিদ্ধ হয়। এই আইন এখন ১৮৭২ সনের তিন আইন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। জাতিভেদ-প্রথার উচ্ছেদকল্পে শিক্ষিত যুবকদল এসময় বদ্ধপরিকর হন। যাঁরা ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হলেন তাঁরা এ আন্দোলনে একেবারে মেতে উঠলেন। যাঁরা প্রকাশ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন নি—যেমন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি, কেশবচন্দ্রের উপদেশের ফলে তাঁদের প্রাণেও জাতিভেদের নির্ম্মমতা কাঁটার মত বিঁধতে লাগল। সুরেন্দ্রনাথ জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অসবর্ণ বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন। কেশবচন্দ্রের চেষ্টার ফলে জাতিভেদ-প্রথা একেবারে উচ্ছেদ না হলেও এর নির্ম্মমতা ক্রমে অনেকটা কমে যায়; তথাকথিত উচ্চ-নীচদের পরস্পরের মধ্যে মমত্ব ও

আত্মীয়তাবোধ বৃদ্ধি পায়। আর জাতীয়তার ভিত্তিই তো ঈদৃশ অনুভূতি মহাত্মা গান্ধীর অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন আন্দোলনের সূত্র কেশবচন্দ্রের ঐ প্রকার চেষ্টার মধ্যেই আমরা পেয়ে থাকি।

এই সময়কার আর-একটি বিশেষ ঘটনা—কেশবচন্দ্রের 'যীশুখ্রীষ্ট—ইউরোপ ও এশিয়া'-শীর্ষক ইংরেজী বক্তৃতা। এ বক্তৃতাটি তখন খ্রীষ্টান ও হিন্দুসমাজে আলোড়ন উপস্থিত করেছিল। বড়লাট লর্ড লরেন্স থেকে আরম্ভ ক'রে ক্ষুদে পাদরি পর্য্যন্ত খ্রীষ্টানগণ ভাবতে লাগলেন, কেশবচন্দ্র খ্রীষ্টান হয়ে যাবেন! হিন্দুসমাজ কেশবচন্দ্র ও তাঁর অনুবর্ত্তীদের 'খ্রীষ্টান' আখ্যা দিলেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বলেন, পরবর্ত্তী কালে যে জনসাধারণ ব্রাহ্মদের খ্রীষ্টানের সামিল গণ্য করতে থাকে তার মুলই হ'ল ঐ বক্তৃতা। কেশবচন্দ্র ১৮৭০ সালে বিলাত যান। সেখানে নানা শ্রেণীর ইংরেজের নিকট তিনি প্রভূত সম্মান লাভ করেন। রাণী ভিক্টোরিয়াও তাঁহার সঙ্গে আলাপে মুগ্ধ হন। ভারতবর্ষের নারীজাতির সেবার উদ্দেশ্যে মিস্ মেরী কার্পেণ্টার ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশান প্রতিষ্ঠা করেন বৃষ্টল শহরে। কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠাসভায় উপস্থিত থেকে এর উদ্দেশ্য একান্তভাবে সমর্থন করেন। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে কেশবচন্দ্র ভারতবর্ষের অবস্থার কথা বিবৃত ক'রে কয়েকটি বক্তৃতা প্রদান করেন। এই সকল বক্তৃতার একটি হ'ল "ইংলণ্ডস্ ডিউটি টু ইণ্ডিয়া" (ভারতবর্ষের প্রতি ইংলণ্ডের কর্ত্তব্য) সম্বন্ধে। এই বক্তৃতায় তিনি ভারতীয়দের প্রতি ব্রিটিশের ব্যবহার এবং আবগারী বিভাগের দুর্নীতির বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য ক'রে ইংলণ্ডবাসীর দৃষ্টি এ দিকে আকর্ষণ করলেন।

কেশবচন্দ্র স্বদেশে ফিরে সমাজসেবায় মন দিলেন। এই নিমিত্ত তিনি "ইণ্ডিয়ান রিফর্ম এসোসিয়েশান" বা ভারত সংস্কারসভা স্থাপন ক'রে উপযুক্ত সহকর্ম্মীদের দ্বারা কার্য্য আরম্ভ করলেন। তিনি সামান্য-শিক্ষিতের জন্য 'সুলভ সমাচার' নামে এক পয়সা মূল্যের একখানা বাংলা সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। তিনি মজুর শ্রেণীর ও স্বল্প আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিদের শিক্ষার জন্য প্রাতঃ ও নৈশ বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করলেন। এ বিষয়ে তাঁর সহায়ক হন শ্রমিকবন্ধু শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, উমেশচন্দ্র দত্ত, শিবনাথ শাস্ত্রী

প্রভৃতি যুবক ব্রাহ্মদের সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষাপ্রচারেও বিশেষ অবহিত হন। মনোমোহন ঘোষের পরে ১৮৬২ সাল থেকে কিছুদিন তিনি 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্র সম্পাদন করেছিলেন। 'ইণ্ডিয়ান মিরর' তাঁর পিতৃব্য-পুত্র নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় বহুকাল চলেছিল। ১৮৮৫ সালে বোম্বাই-এ অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া কলকাতা থেকে আর যে দু'জন প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে এই নরেন্দ্রনাথ সেন একজন। অন্য জন—'নববিভাকর'-সম্পাদক গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায়। জাতীয়তাবোধের উন্মেষে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের প্রধানতম অবদান ভারতবর্ষ এক এবং অখণ্ড বলিয়া স্বীকার। তাঁর ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কার এবং সেবামূলক প্রচেষ্টাগুলির মধ্যে এই স্বীকৃতি অত্যন্ত প্রকট হয়ে পড়েছিল। 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ', ভারত-সংস্কার সভা প্রভৃতিতে তাঁর ভাবধারণা বিশেষভাবে রূপায়িত হয়, আর শিক্ষিত সাধারণের মনেই এই ভাবধারণা শিকড় গাড়বার সুযোগ পায়। কেশবচন্দ্রের আর-একটি কীর্ত্তি—দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীস্থ সাধকপ্রবর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের গুণপনা লোকসমক্ষে প্রকাশ। এর ফলে ভারতবাসীর মধ্যে নবজাতীয়তা-বোধ উন্মেষ বহুলাংশে সম্ভবপর হয়েছে।

কেশবচন্দ্র যখন তৎপ্রতিষ্ঠিত সমাজকে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' নাম দেন (১১ নবেম্বর, ১৮৬৬) তখন থেকে দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজ আদি ব্রাহ্মসমাজ নামে অভিহিত হ'তে থাকে। দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর সঙ্গীরা সাজাত্য-বোধে অনুপ্রাণিত হয়ে সব কাজ করতেন। কিন্তু তাঁর মত পুরোপুরি সাজাত্যবোধে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে দু'জন—রাজনারায়ণ বসু ও নবগোপাল মিত্র মহাশয়। রাজনারায়ণ বসু ইংরেজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত, আবার হিন্দুশাস্ত্রেও পারঙ্গম। তিনি ছিলেন গবর্ণমেণ্টের চাকরে, মেদিনীপুর সরকারী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। কিন্তু তখনকার দিনে গবর্ণমেণ্টের চাকরেরাও জন-আন্দোলনে যোগ দিতে পারতেন। সংবাদপত্র-সেবাতেও তাঁদের কোন বাধা ছিল না—হরিশ্চন্দ্রের বেলায়ই আমরা তা দেখেছি। রাজনারায়ণ মেদিনীপুরে অবস্থানকালে সমাজের উন্নতিমূলক অনেকগুলি সভা-সমিতি স্থাপন করেন। এই সব সভাসমিতির মধ্যে ১৮৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত 'জাতীয় গৌরব

সম্পাদনী সভা' একটি। এই সভার কার্য্যাবলীর ভিত্তিতে রাজনারায়ণ একখানি অনুষ্ঠানপত্র রচনা করেন। এই অনুষ্ঠানপত্রখানি প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ সনে। ১৮৬৭ সনে ভারতীয়দের মিলনক্ষেত্র-রূপে চৈত্র বা হিন্দু-মেলা নামে যে জাতীয় মেলার সূচনা হয় ও এ পরিচালনার জন্য যে জাতীয় সভার সৃষ্টি হয় তার মূলে ছিল রাজনারায়ণের এই সভা এবং উক্ত অনুষ্ঠান-পত্রখানি। 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা' একটি পূর্ণ স্বাদেশিক প্রতিষ্ঠান। আলাপে, ব্যবহারে, রীতিতে সব বিষয়েই এর স্বাদেশিকতা। 'গুড মর্ণিং', 'গুড ইভনিং'-এর বদলে 'সুপ্রভাত', 'সুরজনী' কথার চলন, ১লা জানুয়ারীর পরিবর্ত্তে ১লা বৈশাখ নববর্ষ উদ্‌যাপন ও পরস্পরের মধ্যে অভিনন্দনাদি জ্ঞাপন, কথাবার্ত্তায় ইংরেজী ব্যবহৃত হ'লে প্রতিটি শব্দের জন্য এক পয়সা দণ্ডস্বরূপ দান—সভ্যগণের এই সব নিয়ম মেনে চলতে হ'ত। তখন শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে ইংরেজীয়ানা এতই বেড়ে যায় যে, এরূপ করা তখন একান্তই আবশ্যক হয়ে পড়ে।

আর নবগোপাল মিত্রের কথা ? একটু পরেই তাঁর প্রাধান কীর্ত্তি চৈত্র বা হিন্দুমেলার কথা বলব। তিনি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গী ও আদি ব্রাহ্মসমাজ-ভুক্ত ছিলেন। কেশবচন্দ্রের উগ্র মতবাদ নবগোপালের একেবারে অসহ্য বোধ হ'ত। তাই কেশচন্দ্রের উদ্যোগে ১৮৭২ সালে হিন্দুধর্ম্ম অস্বীকার ক'রে যখন সিবিল ম্যারেজ আইন পাস হয় (এ আইন ব্রাহ্মবিবাহ আইন ব'লে পাস হয় নি, কারণ আদি ব্রাহ্মসমাজও এর বিপক্ষতা করেছিল) তখন তিনি জাতীয় সভার উদ্যোগে ১২৭৯ সালের ৩১শে ভাদ্র তারিখে কলকাতায় হিন্দুধর্ম্ম সম্পর্কে একটি বক্তৃতার আয়োজন করেছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে রাজনারায়ণ বসু 'হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা' নামে এই যুগান্তকারী বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতা তখন হিন্দুসমাজে নূতন তেজ সঞ্চার করেছিল। আর নবগোপাল হয়েছিলেন এর মূল কারণ। স্বাজাত্যবোধ তাঁতে যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে-ছিল। ইউরোপের বহু অঞ্চলের জনগণ তাদের ক্ষুদ্র শ্রেণী ও প্রদেশ-স্বার্থ ভুলে ঐ সময় এক-একটি নেশ্যন বা জাতিতে পরিণত হয়। ইটালী ও জার্ম্মাণীর জাতীয়তার দৃষ্টান্ত তখন সকল শিক্ষিত ভারতবাসীর সম্মুখে। নবগোপালও 'নেশ্যন' ও 'ন্যাশনাল' কথার বড়ই ভক্ত হয়ে পড়েন। তাঁর সংবাদপত্রের নাম

'ন্যাশনাল পেপার', কুস্তীর আখড়ার নাম 'ন্যাশনাল জিমনাসিয়ম', সভার নাম 'ন্যাশনাল' সোসাইটি', স্কুলের নাম 'ন্যাশনাল স্কুল'। স্বদেশবাসীরা তাই আদর ক'রে তাঁর নাম দিয়েছিলেন 'ন্যাশনাল নবগোপাল' বা 'ন্যাশনাল মিত্র'! তিনি হিন্দুজাতির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন শ্রেণী ও সামাজকে জাতীয়তার পতাকা-তলে সমবেত ক'রে এক নবজাতীয়তার মন্ত্রে দীক্ষা দিতে চেয়েছিলেন।

জাতীয়তা-মন্ত্রে দীক্ষা

চৈত্র বা হিন্দুমেলা

চৈত্র বা হিন্দুমেলা ভারতবাসীর জাতীয় জীবনে এক নূতন যুগের সূচনা করে। এজন্য এ সম্বন্ধে এখানে একটু বিস্তৃতভাবে বলতে হবে। রাজনারায়ণ বসু আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে, তাঁর জাতীয় গৌরব সঞ্চারিণী সভার আদর্শ ও কার্য্যকলাপ হ'তে "Prospectus of a society for the promotion of National Feeling among the educated natives of Bengal", অর্থাৎ শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে জাতীয়তাবোধ-বৃদ্ধিকল্পে একটি সভার অনুষ্ঠান-পত্র রচিত হয়। এই অনুষ্ঠানপত্র-পাঠে তাঁর অন্যতম বান্ধব নবগোপাল মিত্র হিন্দুমেলার ভাব পান। হিন্দুমেলা-স্থাপনের পর এর অধ্যক্ষতা করবার জন্য মিত্র মহাশয় জাতীয় সভা প্রতিষ্ঠা করেন। এ-ও তাঁর (রাজনারায়ণ বসুর) সভার আদর্শে গঠিত হয়েছিল। কিন্তু 'মেলা' নামটি নবগোপালেরই দেওয়া। মেলা কথাটির সঙ্গে ভারতবাসীর যোগ প্রকৃতিগত ও ঘনিষ্ঠ।

এই চৈত্রমেলায় শিক্ষিত সমাজ সমবেতভাবে স্বদেশের কথা আলোচনা করতে সুরু করেন। এজন্য ভারতের রাজনৈতিক ইতিবৃত্তে এর স্থান স্ব-মহিমাতেই উজ্জ্বল। নবগোপাল মিত্র ছিলেন এর প্রাণ। এ কার্য্যে তাঁর বিশেষ সহায় হয়েছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁদের ঐকান্তিক চেষ্টা-যত্নে রাজনারায়ণের ভাব-বীজটি ফল-পুষ্প-ভারাবনত একটি সুন্দর মহীরুহে আত্মপ্রকাশ করে ১৭৮৮ শকে (ইংরেজী ১৮৬৭ সাল) চৈত্র সংক্রান্তিতে। নবগোপাল সহকারী সম্পাদক-রূপে চৈত্র মেলার যাবতীয় কর্ম্ম সম্পাদন করতেন। দ্বিতীয় অধিবেশনে ১৭৮৯ শক, ৩০শে চৈত্র তারিখে সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর চৈত্র মেলার উদ্দেশ্য বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন :

"এই মেলার প্রথম উদ্দেশ্য, বৎসরের শেষে হিন্দুজাতিকে একত্রিত করা। এইরূপ একত্র হওয়ার ফল যদ্যপি আপাততঃ কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না,

কিন্তু আমাদের পরস্পরের মিলন ও একত্র হওয়া যে কত আবশ্যক ও তাহা যে আমাদের পক্ষে কত উপকারী তাহা বোধ হয় কাহারও অগোচর নাই। এক দিন কোন এক সাধারণ স্থানে একত্রে দেখাশুনা হওয়াতে অনেক মহৎকর্ম্ম-সাধন, অনেক উৎসাহবৃদ্ধি ও স্বদেশের অনুরাগ প্রস্ফুটিত হইতে পারে। যত লোকের জনতা হয় ততই ইহা হিন্দুমেলা ও ইহা হিন্দুদিগেরই জনতা এই মনে হইয়া হৃদয় আনন্দিত ও স্বদেশানুরাগ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। **আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য নহে, কোন বিষয়সুখের জন্য নহে, কোন আমোদ-প্রমোদের জন্য নহে, ইহা স্বদেশের জন্য—ইহা ভারতভূমির জন্য।**

"ইহার আরো একটি মহৎ উদ্দেশ্য আছে, সেই উদ্দেশ্য আত্মনির্ভর, এই আত্মনির্ভর ইংরাজ জাতির একটি প্রধান গুণ। আমরা এই গুণের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আপনার চেষ্টায় মহৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া, এবং তাহা সফল করাকেই আত্মনির্ভর কহে। ভারতবর্ষের এই একটি প্রধান অভাব, আমাদের সকল কর্ম্মেই আমরা রাজপুরুষগণের সাহায্য যাচ্ঞা করি, ইহা কি সাধারণ লজ্জার বিষয়? কেন আমরা কি মনুষ্য নহি? মানবজন্ম গ্রহণ করিয়া চিরকাল পরের সাহায্যের উপর নির্ভর করা অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আর কি আছে; অতএব **যাহাতে এই আত্মনির্ভর ভারতবর্ষে স্থাপিত হয়—ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হয়, তাহা এই মেলার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।**"

মেলার কার্য্য বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হ'ল ও প্রত্যেকটি পরিচালনার জন্য পৃথক পৃথক মণ্ডলী গঠিত হ'ল। মেলার উদ্দেশ্য ছিল সর্ব্বতোমুখী। আর এর সম্পাদনে বঙ্গের গুণি-মানীরা অনেকে অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁদের ভিতর রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, রমানাথ ঠাকুর, দিগম্বর মিত্র, দুর্গাচরণ লাহা, প্যারীচরণ সরকার, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক, কৃষ্ণদাস পাল, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, ভরতচন্দ্র শিরোমণি, ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, হরিনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত, সালিকরাম, ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল, দুর্গাদাস কর, গোপাললাল মিত্র, অম্বিকাচরণ গুহ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

হিন্দুমেলার কর্ত্তৃপক্ষগণ জাতীয় জীবনকে বিভিন্ন দিক থেকে সজীব

করতে উদ্বুদ্ধ হলেন। ঐক্যবোধ-বৃদ্ধি, সামাজিক উন্নতি, শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, স্বাস্থ্য—নানা বিষয়েই এঁরা দৃষ্টিক্ষেপ করেন। জাতীয় জীবনের সকল দিকের সংগঠন ও সংস্কারকল্পে সম্মিলিত প্রচেষ্টা এই প্রথম। আর এ সকল কার্য্যের মূল লক্ষ্য, বহু দূরবর্ত্তী হলেও, ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা-লাভ। প্রসিদ্ধ নাট্যকার মনোমোহন বসু মহাশয় চৈত্র মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে এ কথা স্পষ্ট ক'রেই ব্যক্ত করেন। এই দ্বিতীয় অধিবেশন থেকেই মেলার কার্য্যক্রম পুরোপুরি আরম্ভ হয়। প্রায় প্রতিবারেই অধিবেশনের আরম্ভে গীত হ'ত ভারতবাসীর সুবিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত 'গাও ভারতের জয়'। রাষ্ট্রীয় মুক্তির ইতিহাসে এর স্থান সুনির্দ্দিষ্ট। ভারতীয় প্রথম সিবিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এর রচয়িতা। সঙ্গীতটি এই :

মিলে সবে ভারত-সন্তান, একতান মনঃপ্রাণ, গাও ভারতের যশোগান।
ভারতভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান ? কোন্ অদ্রি হিমাদ্রি সমান ॥
ফলবতী বসুমতী, স্রোতস্বতী পুণ্যবতী, শত খনি রত্নের নিধান।
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়, গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয়।
রূপবতী সাধ্বী সতী, ভারত-ললনা, কোথা দিবে তাদের তুলনা ?
শর্ম্মিষ্ঠা সাবিত্রী সীতা, দময়ন্তী পতিরতা, অতুলনা ভারত-ললনা।
হোক ভারতের জয়, ইত্যাদি
বশিষ্ঠ গৌতম অত্রি মহামুনিগণ, বিশ্বামিত্র ভৃগু তপোধন।
বাল্মীকি বেদব্যাস, ভবভূতি কালিদাস, কবিকুল ভারত-ভূষণ,
হোক ভারতের জয়, ইত্যাদি।
বীরযোনি এই ভূমি বীরের জননী, অধীনতা আনিল রজনী ;
সুগভীর সে তিমির, ব্যাপিয়া কি রবে চির, দেখা দিবে দীপ্ত দিনমণি।
হোক ভারতের জয়, ইত্যাদি
ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জ্জুন নাহি কি স্মরণ, পৃথুরাজ আদি বীরগণ ?
ভারতের ছিল সেতু, যবনের ধূমকেতু, আর্ত্তবন্ধু দুষ্টের দমন।
হোক ভারতের জয়, ইত্যাদি
কেন ডর, ভীরু, কর সাহস আশ্রয়, যতোধর্ম্মস্ততো জয়।

ছিন্ন ভিন্ন হীন বল, ঐক্যেতে পাইবে বল, মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয় ?
হোক ভারতের জয়, ইত্যাদি।

সঙ্গীতের পর সহকারী সম্পাদক নবগোপাল মিত্র রাজ্য, বাণিজ্য, স্বাস্থ্য, বিদ্যা, সমাজ প্রভৃতি বিবরণ সমবেত জনমণ্ডলীর সম্মুখে পাঠ করতেন। দ্বিতীয় অধিবেশনে পঠিত বিবরণীর একস্থানে তিনি বলেন :

"আবিসিনিয়া যুদ্ধযাত্রাকে ১৭৮৯ শকের ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের একটি প্রধান ঘটনা বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। কেননা, এই যুদ্ধব্যয়ের কিয়দংশ ভারতবর্ষকে সহ্য করিতে হইয়াছে।"

এই সামান্য পঙক্তি কয়টিতে গবর্ণমেণ্টের নবানুসৃত সামরিক নীতির দুটি স্পষ্ট দিক প্রতিভাত। সিপাহীযুদ্ধের পর এমন কোন পল্টন আর রইল না যারা সমুদ্রপারে যেতে আপত্তি করতে পারে। আবার এ সময় থেকেই ভারতবর্ষের বাইরেও সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে ভারতীয় অর্থব্যয় ও ভারতীয় সৈন্যপ্রেরণ হতে সুরু হয়।

মেলাক্ষেত্রে সংস্কৃত, বাংলা কবিতা, বিজ্ঞান, শিক্ষাবিজ্ঞান ও সাহিত্যমূলক প্রবন্ধ এবং কুস্তি প্রদর্শনের পর উৎকৃষ্ট কুস্তিগীর, লেখক ও শিল্পীদের পারিতোষিক বিতরণ হ'ত। লেখক ও কবিদের মধ্যে পরবর্ত্তী কালে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রী, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রজনীকান্ত গুপ্ত। স্বদেশীয় চারু ও কারু শিল্পের সমাবেশ ও বিভিন্ন স্বদেশী কুস্তি ও কসরত প্রদর্শন মেলার বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল। মহিলাদের হস্তনির্ম্মিত সূচীশিল্প—আসন, জুতা, থলে, খরপোস, পশমের ও সূতীর কার্য্য, কৃষ্ণনগরের পুতুল, বারাণসী শাড়ী, ঢাকার স্বর্ণকারদের রূপা ও সোনার গড়ন, বিবিধ বাদ্যযন্ত্র, নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র, ভাস্করীয় প্রতিমূর্ত্তি, ভারতীয় চিত্রকরদের পটচিত্র ও অন্যান্য ধরণের আঁকা ছবি প্রদর্শনী-বিভাগে স্থান পেত এবং উৎকৃষ্ট পুরুষ ও মহিলা শিল্পী নিজ নিজ দ্রব্যের গুণানুসারে পুরস্কার পেতেন। প্রদর্শনীতে হস্তশিল্প ছাড়া ফল, ফুল, মূল, চারা, শস্য, বীজ প্রভৃতি উদ্ভিদ্ দ্রব্য, এবং লাঙ্গল, চরকা, তাঁত প্রভৃতি কৃষি ও শিল্পকরণ যন্ত্রাদি রাসায়নিক ক্রিয়া এবং কুস্তি, অশ্বচালন, পাইকখেলা, বাঁশবাজি প্রভৃতি খেলা দেখানো হ'ত।

চৈত্রমেলায় একজন হতেন সভাপতি। তবে সভাপতিকেই যে প্রধান

বক্তা হ'তে হবে এমন কোন নিয়ম ছিল না। তৃতীয় বৎসরে মেলার সভাপতি হন ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল, কিন্তু প্রধান বক্তা ছিলেন মনোমোহন বসু মহাশয়। ইনি দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম অধিবেশনে প্রধান বক্তা হিসাবে বক্তৃতা করেন। হিন্দু-মেলার আদর্শে মফস্বলেও বারুইপুর, দিনাজপুর, ফরিদপুর প্রভৃতি অঞ্চলে জাতীয় মেলার অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত বারুইপুরে বাংলা ১২৭৬ সাল থেকেই কলকাতার মেলার আদর্শে একটি মেলা অনুষ্ঠিত হ'তে থাকে। এ মেলার তৃতীয় অধিবেশনে ১২৭৮, ৩০শে ফাল্গুন মনোমোহন বসু প্রধান বক্তা ছিলেন। ১৮৭৪ ও ৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মেলা হয় কলকাতার পার্শি বাগান উদ্যানে। ১৮৭৫ সালের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন রাজনারায়ণ বসু মহাশয়। রাজনারায়ণ সভাপতি-রূপে বরোদানিবাসী বিখ্যাত গায়ক মৌলাবক্সকে সঙ্গীত ও নড়ালের জমিদার রাইচরণ রায়ের ব্যাঘ্রশিকারে নৈপুণ্য-প্রদর্শন জন্য স্বর্ণপদক উপহার দেন। এবারে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (তখন মাত্র চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালক) 'হিন্দুমেলার উপহার' নামে একটি জাতীয় ভাবোদ্দীপক কবিতা পাঠ করেন। রবীন্দ্রনাথ ১৮৭৭ সালের হিন্দুমেলায়ও আর-একটি বিখ্যাত কবিতা পাঠ করেন। তখনকার বড়লাট লর্ড লিটন দিল্লীতে যে দরবার করেছিলেন তাঁকে উদ্দেশ ক'রেই এ কবিতাটি লিখিত। এর প্রথম কয়েক পঙ্‌ক্তি এই,

"দেখিছ না অয়ি ভারত-সাগর, অয়ি গো হিমাদ্রি দেখিছ চেয়ে,
প্রলয়কালের নিবিড় আঁধার, ভারতের ভাল ফেলেছে ছেয়ে।
অনন্ত সমুদ্র তোমারই বুকে, সমুচ্চ হিমাদ্রি তোমারই সম্মুখে,
নিবিড় আঁধারে, এ ঘোর দুর্দ্দিনে, ভারত কাঁপিছে হরষ-রবে !
শুনিতেছি নাকি শত কোটি দাস, মুছি অশ্রুজল, নিবারিয়া শ্বাস,
সোণার শৃঙ্খল পরিতে গলায় হরষে মাতিয়া উঠেছে সবে ?" ইত্যাদি

মেলা এর পরও কয়েক বৎসর চলেছিল। ১৮৮০ সাল পর্য্যন্ত যে এর রীতিমত অধিবেশন হয় তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

যে ব্যাপক আদর্শ নিয়ে বাংলার শিক্ষিত সমাজ চৈত্রমেলা উদ্‌যাপনে অগ্রসর হয়েছিলেন তার পূর্ণ পরিচয় পাই আমরা স্বদেশপ্রেমিক মনোমোহন বসুর বক্তৃতাসমূহে। মনোমোহন সে-যুগের একজন প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও কবি।

তিনি 'মধ্যস্থ' নামে একখানা পত্রিকারও (প্রথমে সাপ্তাহিক, পরে মাসিক) সম্পাদনা করেছিলেন। বাঙালী তাঁরই কাছে জাতীয়তামন্ত্রে দীক্ষা নিলে। তাঁর নাম ভারতবাসীর চিরস্মরণীয়। তিনি দ্বিতীয় মেলায় প্রদত্ত অভিভাষণের প্রথমেই বললেন :

"স্থির চিত্তে বিবেচনা করিলে এই বোধ হয়, আজ আমরা একটি অভিনব আনন্দবাজারে উপস্থিত হইয়াছি। সারল্য আর নির্ম্মৎসরতা আমাদের মূলধন, তদ্বিনিময়ে ঐক্যনামা মহাবীজ ক্রয় করিতে আসিয়াছি। সেই বীজ স্বদেশক্ষেত্রে রোপিত হইয়া সমুচিত যত্নবারি এবং উপযুক্ত উৎসাহ তাপ প্রাপ্ত হইলেই একটি মনোহর বৃক্ষ উৎপাদন করিবেক। এত মনোহর হইবে যে, যখন জাতিগৌরব রূপ তাহার নব পত্রাবলীর মধ্যে অতি শুভ্র সৌভাগ্য-পুষ্প বিকশিত হইবে, তখন তাহার শোভা ও সৌরভে ভারত-ভূমি আমোদিত হইতে থাকিবে। তাহার ফলের নাম করিতে এক্ষণে সাহস নয় না, অপর দেশের লোকেরা তাহাকে **স্বাধীনতা** নাম দিয়া তাহার অমৃতাস্বাদ ভোগ করিয়া থাকে। আমরা সে ফল কখন দেখি নাই, কেবল জনশ্রুতিতে তাহার অনুপম গুণগ্রামের কথা মাত্র শ্রবণ করিয়াছি। কিন্তু আমাদিগের অবিচলিত অধ্যবসায় থাকিলে অন্ততঃ 'স্বাবলম্বন' নামা মধুর ফলের আস্বাদনেও বঞ্চিত হইব না। ফলতঃ একতাই সেই মিলন-সাধনের একমাত্র উপায় এবং অদ্যকার এ সমাবেশ-রূপ অনুষ্ঠান যে সেই ঐক্য-স্থাপনের অদ্বিতীয় সাধন, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।"

চৈত্রমেলা বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, গাণপত্য, বৌদ্ধ, জৈন, নাস্তিক, আস্তিক সকলেরই মিলনভূমি। এর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে মনোমোহন বলেন :

"ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হওয়ানাবধি এদেশে যত কিছু উত্তম বিষয়ের অনুষ্ঠান হইয়াছে, প্রায় রাজপুরুষগণ অথবা অপরাপর ইংরাজ মহাত্মারাই তাহার প্রথম উত্তেজক এবং প্রধান প্রবর্ত্তক। কিন্তু এই চৈত্রমেলা নিরবচ্ছিন্ন স্বজাতীয় অনুষ্ঠান, ইহাতে ইউরোপীয়দিগের নামগন্ধমাত্র নাই, এবং যে সকল দ্রব্য সামগ্রী প্রদর্শিত হইবে. তাহাও স্বদেশীয় ক্ষেত্র, স্বদেশীয় উদ্যান, স্বদেশীয় ভূগর্ভ, স্বদেশীয় শিল্প, এবং স্বদেশীয় জনগণের হস্তসম্ভূত! স্বজাতির উন্নতিসাধন, ঐক্যস্থাপন এবং স্বাবলম্বন অভ্যাসের চেষ্টা করাই এই সমাবেশের একমাত্র পবিত্র উদ্দেশ্য।"

তিনি তাই স্বদেশবাসিগণকে সম্বোধন করে বলেন :

"অতএব হে স্বদেশস্থ ভ্রাতৃগণ! আসুন আমাদের পরম হিতের জন্য, জননী জন্মভূমির জন্য, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সংস্কৃত ভাষার জন্য, শারীরিক বলাধান জন্য, মনের ঔৎকর্ষ জন্য, শিল্প-বিজ্ঞান জন্য, দেশের মঙ্গলের জন্য, আসুন আমরা সকলে একত্র মিলিত হই! আজ ইহাকে অতি ক্ষুদ্র দেখাইতেছে বলিয়া অনাদর করা নির্ব্বুদ্ধির কর্ম্ম, আপনাদিগের দ্বারা লালিত পালিত হইলে ইহাই তখন মহামহীরুহ হইয়া উঠিবে। যখন দেখিবেন ঢাকা ও শান্তিপুরের তন্তুবায়গণ, কাশী ও কাশ্মীরের কারুগণ, জয়পুর লক্ষ্ণৌয়ের ভাস্করগণ, চণ্ডালগড় ও কুমারটুলির কুমারগণ, পাটনার কৃষকগণ, অথবা সংক্ষেপে বলিতে গেলে উত্তর ও দক্ষিণের, পূর্ব্ব ও পশ্চিমের সমব্যবসায়ী, সমশিল্পী, এবং সমবিদ্য গুণিগণ এই চৈত্রমেলাব রঙ্গভূমিতে আপনা হইতে আসিয়া পরস্পর প্রতিযোগিতা-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে—যখন দেখিবেন তাহারা এই মেলায় প্রদত্ত প্রতিষ্ঠা ও পুরস্কারকে অমূল্য ও অতুল্য গৌরবান্বিত জ্ঞান করিতেছে—যখন দেখিবেন এই মেলাকে স্বজাতীয় গৌরবভূমি বলিয়া সকলের প্রত্যয় জন্মিয়াছে, তখনই জানিবেন এই নব-রোপিত বৃক্ষের ফল লাভ হইল। সেই শুভ ফল না আসা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতে হইবেক—ধৈর্য্যধারণপূর্ব্বক সেই শুভ দিনের প্রতীক্ষা করিতে হইবেক। অতএব পুনশ্চ বলি, আসুন, আমরা মিলিত হই। জননী জন্মভূমি অধিকতর আপনাদের আদেশ করিতেছেন, তাঁহার দুঃখ বিমোচনে অগ্রসর হউন! চেষ্টা করিলে কখন ব্যর্থ হইবে না।"

হিন্দুমেলার তৃতীয় অধিবেশনে মনোমোহন বসু মহাশয় সামাজিকতার প্রচলিত অর্থ ছাড়া অন্য অর্থ 'জাতীয়তা-বোধ' সম্বন্ধে এইরূপ বলেন :

"সামাজিকতার যে অন্য একটি মহোচ্চ ব্যুৎপত্তি আছে, দুর্ভাগ্যক্রমে আধুনিক হিন্দুজাতি যাহা ভুলিয়া গিয়াছেন, সেই ব্যুৎপত্তিবোধক সামাজিকতাই লক্ষ্য।...তাহাকে পাইবার জন্যই এত প্রয়াস। সে সামাজিকতার অভাবে কোন জাতি, জাতিপদবাচ্য হইতে পারে না—সে সামাজিকতার অভাবে স্বাতন্ত্র্য আর অনৈক্য, যথেচ্ছাচার আর পরতন্ত্রতা, ইহারাই সমাজরাজ্যের অধিপতি হইয়া সমাজকে উচ্ছৃঙ্খলার হস্তে অর্পণ করিয়াছে। অতএব সেই সামাজিকতাকে উদ্ধার করা যে কতদূর আবশ্যক হইয়াছে তাহা বলা যায় না। সে সামাজিকতার

অন্য নাম জাতিধর্ম্ম। সেই স্বজাতিধর্ম্ম আমাদিগের অজ্ঞানতারূপ অন্ধকার কারাগারে পরবশ্যতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ আছে, তাহাকে মুক্ত করা সর্ব্বপ্রযত্নে বিধেয়।"

কিন্তু তা করিতে গেলে অগ্রে 'আত্মনির্ভর' নামক শাণিত অস্ত্র দ্বারা 'পরবশ্যতা' রূপ শৃঙ্খলকে ছেদন করতে হবে। সেই আত্মনির্ভর লাভ করবার জন্য এইরূপ সমাবেশই অদ্বিতীয় উপায়। তাই মনোমোহন বলেন:

"স্বজাতীয় সকল শ্রেণীস্থ লোকের একত্র অধিবেশন, পরস্পর সৎসম্ভাষণ, পরস্পরের মনোগত ভাব-বিনিময়, গত সম্বৎসর মধ্যে সমাজের কিবা উন্নতি আর কিবা অনুন্নতি হইয়াছে তদালোচনাপূর্ব্বক উন্নতিকে উৎসাহ দেওয়া আর অনুন্নতিকে নিরুৎসাহ করা এবং স্বজাতীয়ের প্রতি স্বজাতীয়ের অনুরাগ বর্দ্ধন ও স্বজাতীয় শিল্প-সাহিত্যাদির প্রতি সমুচিত আস্থা জন্মাইয়া দেওয়া যখন মেলার কার্য্য হইল, তখন এই মেলা যে স্বাবলম্বনরূপ অমূল্যনিধির আকরস্থল হইবে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।"

কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য করলেই এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি কর্ত্তব্য শেষ হয় না। মনোমোহন বসু মহাশয় অভিভাষণে তাই স্বদেশসেবার বিভিন্ন উপায়ের উল্লেখ ক'রে বলেন:

"[অর্থসাহায্য ব্যতীত] যাঁহার যে বিষয়ে যেমন ক্ষমতা, তিনি সেই বিষয়ে তদরূপ সহকারিতা করিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। যিনি মান্য ব্যক্তি, তাঁহার উপস্থিতি দ্বারা মেলার মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করা উচিত। যিনি অনুসন্ধিৎসু প্রজ্ঞাবান বলিয়া খ্যাত, তাঁহার সদুপায় নির্দ্ধারণ ও সদুপদেশ দান করা কর্ত্তব্য। যিনি বিদ্বান্, তিনি অধ্যক্ষ শ্রেণীর বিদ্যোৎসাহী বিভাগে নিযুক্ত হইয়া তাহার গুরুত্ব বিধান করুন। যিনি কবি, তিনি হিতজনক প্রসঙ্গ-পুষ্প ভাবসূত্রে গ্রন্থ করিয়া মেলার অঙ্গশোভা সম্পাদন করুন। যিনি বক্তা, তিনি সদ্বক্তৃতা দ্বারা সমাজের উৎসাহ ও কর্ত্তব্য-জ্ঞানকে জাগরূক করিতে থাকুন। যিনি সঙ্গীতজ্ঞ, তিনি সুমধুর সঙ্গীতরসে মেলাভূমিকে অমৃতরসে প্লাবিত করুন। যাঁহারা মল্লবিদ্যায় কৌতুকী, তাঁহারা যোদ্ধা প্রতি যোদ্ধা আনয়ন করিয়া বল ও কৌশলের শিক্ষক হউন। যাঁহারা দৃশ্যকাব্যের রসজ্ঞ, তাঁহারা রঙ্গভূমির বিশুদ্ধ আমোদ দেখাইয়া আমোদ ও উপদেশ দান করুন। যাঁহারা উদ্ভিদ্

বিস্তার ভাবগ্রাহী, তাঁহারা নানাজাতি কুসুম, নানাজাতি ফলমূল, নানাজাতি তরুলতা, নানাজাতি শস্য, এবং নানাজাতি জলজ শৈবালাদি আহরণ করিয়া অথবা আহরণকারীদিগকে উৎসাহ দিয়া কৃষি ও বাণিজ্যের শোভা ও ভৈষজ্যের উন্নতি সাধন করুন।"

হিন্দুমেলার পঞ্চম অধিবেশন হয় বাংলা ১২৭৮ সালের ৩০শে মাঘ। এ অধিবেশনে মনোমোহন ধনী ও ভূস্বামীদের ঔদাসীন্যের জন্য খেদ প্রকাশ ক'রে বলেন, "রাজ্যসংক্রান্ত বিষয়ে ভারতবর্ষীয় সভা এবং সাধারণ ঐক্যবিধান বিষয়ে এই হিন্দুমেলা, আমাদিগের মগ্নাবস্থার তৃণাশ্রয়বৎ হইয়াছে; এই দুইটিকে প্রাণপণে ধরিয়া রাখিতে হইবেক, ভগবানের কৃপা হইলে এই উভয়ের সাহায্যেই অকূলে কূল পাইতে পারি।"

রাজনীতিক্ষেত্রে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা ভারতবর্ষীয় সভা মুখ্যতঃ একটি জমিদার-সভা হইলে তখনও স্বদেশবাসীদের মুখপাত্র-রূপে কর্ম্মে লিপ্ত ছিল। এ সভায় বাংলার ধনী মানী ভূম্যধিকারীরাই অধিক সংখ্যায় সমবেত হতেন। সাধারণ শিক্ষিতেরা অধিক সংখ্যায় এর আওতার ভিতরে য়েতে পারতেন না। এজন্য সভার কর্ম্মগুলিতে তাঁদের মতামত কমই গ্রাহ্য হ'ত। সপ্তম দশকের প্রারম্ভেই এ সভার বিরুদ্ধে তাই তখন নানারূপ প্রতিক্রিয়া হতে সুরু হয়। একথা পরে বলব। কিন্তু মনোমোহন বসু মহাশয় হিন্দুমেলার পক্ষ থেকে তাঁদের আমন্ত্রণ জানালেন অর্থ সাহায্য দ্বারা এর সুফলপ্রসূ কার্যকলাপকে সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে। তিনি তাঁদের লক্ষ্য ক'রে ভাষণটিতে বলেন:

"আয় রে সৌভাগ্যশালী প্রিয় পুত্রগণ! আয় রে আমার ধন-কুবের প্রধান সন্তানগণ! আয় রে রাজ্যাধিকারি—ভূম্যধিকারি কৃতজ্ঞ কৃতি পুত্রগণ! যদি ভাগ্যক্রমে ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে সৌভ্রাত্র বন্ধনের আর একতারূপ অতুল্য একাবলিহার ধারণের সুযোগ পাইয়াছ, তবে বৎসগণ! বৃথা অভিমান, অনর্থ গর্ব্ব, সর্ব্বনাশক ইন্দ্রিয়াসক্তির বশীভূত আর থেকো না! স্বদেশানুরাগকে তোমাদের পথ-প্রদর্শক কর; তিনি অচিরে নির্ম্মল আনন্দমন্দিরে তোমাদিগকে লইয়া যাইবেন। হায় বৎস! তোমাদের প্রতিই তোমাদের অভাগ্যবতী জননীর অধিক আশাভরসা—মধ্যাবস্থ তোমাদের কনীয়ান্ ভ্রাতারা যেরূপ

মাতৃভক্তি-পরায়ণ আর বাসনা ও বিদ্যাবুদ্ধিতে যেরূপ সুযোগ্য, তাহাদের যদি সেরূপ সম্পত্তি, সম্ভ্রমবল, প্রভুত্ববল থাকিত, তবে বৎস! কোন চিন্তার বিষয়ই হইত না। তোমরা সহায় না হইলে তাহারা কি করিতে পারে? তোমরা অনুবল হইলে তাহারা অসাধ্য সাধন করিতে পারিবে—যত্নাস্ত্রে সকল বিঘ্নের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিবে। অতএব প্রাণ-প্রতিম প্রিয়তম সন্তানগণ! আর ঔদাস্য নিদ্রায় অচেতন রহিও না; জননীর দুঃখাবমার্জ্জনে আর বিলম্ব করিও না; জাগরূক হও, উত্থান কর, চক্ষুরুন্মীলন কর, পবিত্র প্রতিজ্ঞাজলে অভিষিক্ত হও, স্বাবলম্বনরূপ বসন পরিধান কর, ঐক্যরূপ শিরস্ত্রাণ মস্তকে ধর, আশারূপ গাছ তোমার করতলে লও, ভ্রান্তি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বিস্তীর্ণ কর্ম্মভূমিতে অবতীর্ণ হও—চাহিয়া দেখ, প্রভাত হইয়াছে—শ্রবণ কর, স্বজাতি-কুঞ্জের গৌরবশাখীকে ভর করিয়া কর্ত্তব্য কোকিল, উৎসাহ শুক, আর উত্তেজনা সারী জয়-জয়ন্তী তানে গান করিতেছে—নববঙ্গের নবোদ্যম কুসুমের যশঃ সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইতেছে—নবোদ্ভিন্ন সুশিক্ষা-রূপ সুপক্ষধারী সুপবিত্র-চেতা ছাত্রপুঞ্জ মধুকরশ্রেণীরূপে গুঞ্জরব করিয়া কুঞ্জবনে আসিতেছে—আবার বৃক্ষের অন্তরালে দৃষ্টি কর 'সৌভাগ্য অরুণ' তরুণ বেশে অল্পে অল্পে উদয় হইতেছে! তাহার শোভা দেখাইবার জন্য তোমরা তোমাদের সকল ভ্রাতাকে একত্র কর, সেই অরুণের আশ্চর্য্য আলোক দেখিয়া পুলক পাইয়া এই ভারত-লোক-বাসী সকলই শব্দ করুক 'জয় জয় জয়!' হিমাচলের পবিত্র গিরিগুহা হইতে প্রতিধ্বনি হউক, 'জয় জয় জয়!' আকাশে শব্দ হউক 'জয় জয় জয়!'

'হিন্দু মেলার জয়!' 'হিন্দু মেলার জয়!' 'হিন্দু মেলার জয়!'

হিন্দুমেলার উদ্দেশ্য এতক্ষণে আমরা নিশ্চয়ই অনেকটা বুঝে নিয়েছি। 'পরবশ্যতা' দূর ক'রে স্বাবলম্বন ব্রত গ্রহণ করতে পারলে আমরা স্বজাতিধর্ম্ম ফিরে পাব। তখন আমাদের মূল লক্ষ্য আসবে হাতের মুঠোর মধ্যে। বারুইপুরে অনুষ্ঠিত মেলায় মনোমোহন আমাদের আদর্শের নাম দিয়েছেন 'উন্নতি'। গ্রামবাসী সাধারণ জনগণ তাঁর শ্রোতা। সুতরাং একটি সুন্দর উপমা দিয়ে এর মর্ম্মকথা তিনি তাদের বুঝিয়ে দিলেন। তিনি বললেন: "শারদীয়া মহাদেবীর ন্যায় এই উন্নতি দেবীও দশভুজা! তাঁহারও দশ হস্তে দশবিধ অস্ত্র

আছে ;—প্রথম হস্তে কৃষি, দ্বিতীয় হস্তে উদ্যান-তত্ত্ব, তৃতীয় হস্তে বাণিজ্য, চতুর্থে শিল্প, পঞ্চমে ব্যায়াম, ষষ্ঠে সাহিত্য, সপ্তমে প্রতিযোগিতা, অষ্টমে সামাজিকতার জীর্ণ সংস্কার, নবমে স্বাবলম্বন এবং দশম হস্তে ঐক্য ! উদ্যম নামক সিংহের পৃষ্ঠে আরূঢ়া হইয়া উন্নতি দেবী এই সব অস্ত্র, বিশেষতঃ শেষোক্ত অস্ত্রদ্বারা দৈত্যপতি 'পরবশ্যতার' বক্ষস্থল বিদ্ধ করিতেছেন।"

হিন্দুমেলা শিক্ষিত সাধারণের মনে যে নবজাতীয়তার উন্মেষ সাধন করেছিল তা আমরা পরবর্ত্তী সময়ের ঘটনাপরম্পরায় সম্যক উপলব্ধি করতে পারব। এই সময়ে বহু মনীষী হিন্দুমেলার নবজাতীয়তার সূত্র গ্রহণ ক'রে ভারতবাসীকে আত্মনির্ভর হ'তে অহর্নিশ উপদেশ দিয়েছেন। কারণ আত্মনির্ভর না হ'লে আত্মশক্তি অর্জ্জন অসম্ভব। রাষ্ট্রনীতিতে এই আত্মশক্তিই যে সবচেয়ে বড় কথা।

কর্ম্মের আহ্বান

১৮৭০-১৮৮০, এই দশ বৎসর বাঙালী তথা ভারতীয় জীবনে একটি ভীষণ কর্ম্মচাঞ্চল্যের যুগ। এক দিকে হিন্দুমেলার আহ্বান, অন্য দিকে ইউরোপের বিভিন্ন জাতির একরাষ্ট্রভুক্তি ও আমেরিকার নিগ্রোদাসদের স্বাধীনতালাভ—এ সবের ফলে বাঙালী মনে এক অখণ্ড স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন উদিত হ'ল। সুয়েজ খাল উন্মোচনে (১৮৬৯) যেমন দ্রুত গমনাগমনের সুবিধা হ'ল তেমনি ইউরোপীয় জাতীয়তা ও গণতন্ত্রমূলক ভাবধারা ও দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতির সঙ্গেও ভারতবাসী অতি দ্রুত পরিচিত হ'তে লাগল। ও-সবের প্রভাব সমসাময়িক সাহিত্যেও সুস্পষ্ট। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'ভারত-সঙ্গীতে' উদাত্ত স্বরে বললেন—

"বাজ রে শিঙ্গা বাজ এই রবে,
শুনিয়া ভারতে জাগুক সবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে
ভারত শুধু কি ঘুমায়ে রবে?"

'ভারত-সঙ্গীত' প্রকাশের পর বাঙলায় মহা হুলুস্থূল পড়ে গেল। কবিতাটি প্রথম ভূদেব মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ১২৭৭, ৭ই শ্রাবণ সংখ্যা 'এডুকেশন গেজেটে' মুদ্রিত হয়। এ ধরণের কবিতা-প্রকাশের জন্য সরকারের নিকট ভূদেববাবুর জবাবদিহি করতে হইয়েছিল।

হেমচন্দ্র ছাড়া আরও বহু বঙ্গকবি ও নাট্যকার ভারতমাতার দুর্দ্দশার কাহিনী এসময় ছন্দে ও কথায় গ্রথিত করতে লাগলেন। মনোমোহন বসু লিখলেন—

দিনের দিন, সবে দীন, হয়ে পরাধীন!
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তা-জ্বরে জীর্ণ, অনশনে তনু ক্ষীণ॥
সে সাহস বীর্য্য নাহি আর্য্য-ভূমে,
পূর্ব্ব গর্ব্ব সর্ব্ব খর্ব্ব হ'লো ক্রমে,
চন্দ্র-সূর্য্য-বংশ অগৌরবে ভ্রমে, লজ্জা রাহু মুখে লীন॥

অতুলিত ধন রত্ন দেশে ছিল,
যাদুকর জাতি মন্ত্রে উড়াইল,
কেমনে হরিল কেহ না জানিল, এম্নি কৈল দৃষ্টিহীন ॥
তুঙ্গ দ্বীপ হ'তে পঙ্গপাল এসে,
সার শস্য গ্রাসে যত ছিল দেশে,
দেশের লোকের ভাগ্যে খোসা ভুষী শেষে,
হায় গো রাজা কি কঠিন !

তাঁতি, কর্ম্মকার করে হাহাকার,
সূতা জাঁতা ঠেলে অন্ন মেলা ভার—
দেশী বস্ত্র অস্ত্র, বিকায় নাকো আর, হ'লো দেশে কি দুর্দ্দিন।
আজ যদি এ রাজ্য ছাড়ে তুঙ্গরাজ,
কলের বসন বিনা, কিসে রবে লাজ,
ধ'র্ব্বে কি লোক তবে দিগম্বরের সাজ, বাকল টেনা ডোর কপীন।
ছুঁই, সূতা পর্য্যন্ত আসে তুঙ্গ হ'তে,
দীয়াশেলাই কাটী, তাও আসে পোতে,
প্রদীপটী জ্বালিতে ; খেতে, শুতে, যেতে, কিছুতে লোক নয় স্বাধীন।"
('হরিশ্চন্দ্র'—পৌষ ১২৮১)

সপ্তম এড্ওয়ার্ড যখন যুবরাজ-রূপে ভারতবর্ষে আসেন তখন নবীনচন্দ্র সেন লেখেন—

"ভারতের তন্তু নীরব সকল,
দুঃখিনীর লজ্জা রক্ষে ম্যাঞ্চেষ্টার !
লবণাম্বুরাশি-বেষ্টিত যে স্থল,
জন্মে লিবরপুলে লবণ তাহার !"

এলাহাবাদ-প্রবাসী গোবিন্দচন্দ্র রায় কবিতায় বললেন—

"কত কাল পরে বল ভারত রে,
দুখ সাগর সাঁতারি পার হবে।
অবসাদ হিমে ডুবিয়ে ডুবিয়ে,

ওকি শেষে নিবেশে রসতল রে,
নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে,
পরদাস খতে সমুদায় দিলে।
পর হাতে দিয়ে ধনরত্ন সুখে,
পর লৌহ বিনির্ম্মিত হার বুকে,
পর দীপমালা নগরে নগরে,
তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।"

'অবলা-বান্ধব'-সম্পাদক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় গাইলেন—

সোনার ভারত আজ যবনাধিকারে।
ভারত সন্তান বক্ষঃ ভাসে অশ্রুধারে।
জ্ঞান রত্নাদির খনি, সভ্যতার শিরোমণি,
আজি সেই পূণ্যভূমি, ডোবে গভীর আঁধারে।
* * *
ভারত শ্মশান হোক, মরু হয়ে পড়ে রোক,
তবু অধীনতা বেড়ি, রেখোনারে পায়ে ধরে।

('বীরনারী'—১৮৭৫)

উপেন্দ্রনাথ দাস-বিরচিত বিখ্যাত 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটকে (১৮৭৫) গীত হ'ল—

"হায় কি তামসী নিশি ভারত মুখ ঢাকিল।
সোনার ভারত আহা ঘোর বিষাদে ডুবিল॥
শোক সাগরেতে ভারত মা দিবানিশি,
স্মরি পূর্ব্ব যশোরাশি, কান্দিতেছে অবিরাম ;
কে এখন নিবারিবে, জননীর অশ্রুজল !"

বঙ্গকবি যখন ভারতমাতার অশ্রুজল নিবারণ করতে স্বদেশবাসীকে আহ্বান করলেন ঠিক সেই সময়ে বৈদিশিক রাষ্ট্রনীতির ছলাকলা তার আশা-আকাঙ্ক্ষা-পূরণের পথরোধে তৎপর হ'ল। ভারত-সন্তানগণ দেশী ও বিদেশী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষায় কৃতিত্ব দেখাতে লাগলেন বটে, কিন্তু স্বদেশ-শাসনে তাঁদের কোন দায়িত্ব স্বীকৃত হ'ল না। তাঁরা যে নিজ বাসভূমে পরবাসী।

ভারতসচিব ডিউক অব্ আর্গাইল ১৮৬৯ সালে পার্লামেণ্টে বলেছিলেন যে, ঐ সময় পর্য্যন্ত ষোল জন ভারতীয় আই সি এস পরীক্ষার জন্য উপস্থিত হ'লেও মাত্র একজন কৃতকার্য্য হ'তে পেরেছেন। ভারতীয়েরা অযোগ্য ব'লে এরূপ হয় নি। আট-ন বছরে এ পরীক্ষার নিয়ম-কানুন এতবার বদলানো হয় যে, কত কষ্ট স্বীকার ক'রে বিলাতে গিয়েও ভারতীয় যুবকগণ বিফল মনোরথ হ'তে বাধ্য হতেন। এত সব বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও কিন্তু ১৮৭১ সালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, বিহারীলাল গুপ্ত ও শ্রীপদ বাবাজী ঠাকুর আই.এস.সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও স্বদেশে ফিরে দায়িত্বপূর্ণ সরকারী কার্য্যে অধিষ্ঠিত হন। সিপাহী-বিদ্রোহ ভারতবর্ষে ভারতীয় ও ইউরোপীয় সমাজকে সম্পূর্ণ আলাদা ক'রে দিয়েছিল, আর ভারতীয়দের উচ্চ শিক্ষার কৃতিত্ব প্রদর্শন অতঃপর ইউরোপীয় সমাজকে তাদের উপর ঈর্ষ্যান্বিত ও কুপিত ক'রেও তুললে। সমগ্র ভারতে বাঙালী আবার শিক্ষায় অধিক অগ্রসর। এজন্য কর্ত্তৃপক্ষের নজর তার উপরই পড়ল বেশী ক'রে। ১৮৬৯ সালেই বাংলার বাইরে কর্ম্মচারি-নিয়োগ সম্পর্কে এই আদেশ জারি হয়েছিল যে, উচ্চ শিক্ষিত বাঙালীকে সরকারী কার্য্যে পারতপক্ষে যেন নিয়োগ করা না হয়।

বাংলা দেশে অতঃপর চেষ্টা চলে যাতে বাঙালী সাধারণ উচ্চ শিক্ষালাভের 'দুরাকাঙ্ক্ষা' হৃদয়ে পোষণ করতে না পারে। ইংরেজী শিক্ষার জন্য পূর্ব্বে হিন্দুরাই অগ্রণী হয়ে নিজ ব্যয়ে স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ বিষয়ে সরকারের গতি ছিল অতীব মন্থর। বঙ্গের ছোটলাট সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল (১৮৭১-৭৪) উচ্চ শিক্ষাদানের জন্য যা-কিছু সামান্য সরকারী ব্যবস্থা, জন-শিক্ষার জন্য অর্থ সংকুলানের ওজুহাতে তারও মূলে আঘাত করে বসলেন। তাঁর আদেশে কলকাতার সংস্কৃত কলেজ, কৃষ্ণনগর ও বহরমপুর কলেজ প্রথম শ্রেণীর কলেজ থেকে দ্বিতীয় শ্রেণী অর্থাৎ ফার্ষ্ট আর্টস্ কলেজে অবনমিত হ'ল। তাঁর এ কার্য্যে বাংলার শিক্ষিত সমাজে খুব আন্দোলন উপস্থিত হয়। কিন্তু এসব অগ্রাহ্য ক'রে বড়লাট ও ভারত-সচিব ক্যামবেলের কার্য্যই সমর্থন করলেন। তিনটি কলেজের খরচ কমিয়ে যে সামান্য অর্থ উদ্বৃত্ত হ'ল, প্রাথমিক শিক্ষার পক্ষে তা হ'ল মরুভূমিতে জলবিন্দু! জনশিক্ষা-সমস্যার কণামাত্রও এ দ্বারা পূরণ হ'ল না। লোকের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল রইল যে, উচ্চ শিক্ষা বন্ধ ক'রে

বাঙালীকে দাবিয়ে রাখাই সরকারী কার্য্যের মূল উদ্দেশ্য। স্বদেশপ্রাণ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই সময়, ১৮৭২ সালে, বঙ্গসন্তানদের উচ্চ শিক্ষাদানের জন্য মেট্রোপলিটান (অধুনা, বিদ্যাসাগর) কলেজ স্থাপন করলেন।

রাজরোষ শুধু বাংলা ও বাঙালীর উপর নিবদ্ধ থাকে নি, অন্যত্রও এর প্রকোপ কম-বেশী পতিত হয়। সিপাহী-বিদ্রোহ থেকেই মুসলমানদের উপর ইংরেজ চটেছিল। তার উপর ওয়াহাবী আন্দোলন ভারতবর্ষে খুবই চাঞ্চল্য উপস্থিত করলে। সরকারের মতে ওয়াহাবীরা ব্রিটিশকে ভারতবর্ষ থেকে তাড়িয়ে ভারতের শাসনযন্ত্র হস্তগত করারও মতলবে ছিল। তবে একথা সত্য যে, উত্তর ভারতে ওয়াহাবী দলভুক্ত একদল গোঁড়া মুসলমান সিপাহী-বিদ্রোহের পূর্ব্বে মোগল সম্রাটকে দিল্লীর সিংহাসনে বসাতে যেমন উদ্‌গ্রীব হয়, বিদ্রোহের পরে অত্যাচার-অনাচারে দুর্ভিক্ষে নিষ্পেষিত হয়ে ব্রিটিশের উপর খুবই বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠে। সমগ্র উত্তর ভারতে তারা ছড়িয়ে ছিল। তবে তাদের প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র ছিল পাটনা। ওয়াহাবী নেতা আমীর খাঁকে সরকার ১৮১৮, তিন আইন অনুসারে ১৮৭১ সালে যাবজ্জীবন নির্ব্বাসিত করলেন। তাঁর প্রকাশ্য বিচারের জন্য কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জন পেণ্টন নরম্যানের এজলাসে আবেদন করা হ'ল। এ উদ্দেশ্যে ওয়াহাবীরা বোম্বাই হাইকোর্ট থেকে প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মিঃ এ্যানেষ্টিকে এনেছিলেন। তিনি ছলজবাবে লর্ড মেওর শাসনকালের (১৮৬৮-৭২) অনাচার-অবিচারের কথা বিশদভাবে উল্লেখ করেন। এ্যানেষ্টির এই বক্তৃতাসমেত মোকদ্দমার বিবরণ ওয়াহাবীরা পুস্তিকাকারে ছেপে চারদিকে বিলি করলে। বিপিনচন্দ্র পাল বলেন, যৌবনে এই পুস্তিকাখানি পাঠ ক'রে তাঁরা যেন একেবারে মেতে উঠেছিলেন। এর কিছু পরেই, ১৮৭১ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর, টাউন হলের সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময় প্রধান বিচারপতি নরম্যান (তখনও বর্ত্তমান হাইকোর্ট-ভবন নির্ম্মিত হয় নি, টাউন হলেই কোর্ট বসত) আবদুল্লা নামে এক আততায়ীর ছোরার আঘাতে অচৈতন্য হয়ে পড়েন ও সেই দিন রাত্রেই মারা যান। ইউরোপীয় সমাজ এজন্য এতদূর ক্ষিপ্ত হয়েছিল যে, আবদুল্লার ফাঁসি হবার পর তার শব কবর দিতে না দিয়ে সৎকার করিয়ে ফেলল। এর অব্যবহিত পরে ১৮৭২, ৮ই ফেব্রুয়ারী আন্দামান ভ্রমণকালে শের আলী নামক এক কয়েদীর হস্তে বড়লাট

লর্ড মেও-ও প্রাণ বিসর্জ্জন দেন। এই শের আলী খাইবার গিরির পাদদেশে জাম্‌রাদ গ্রামের বাসিন্দা। এ দুইট ওয়াহাবী দলের কুকার্য্য বলে সরকার পক্ষের ধারণা। তাঁরা অতঃপর নির্ম্মম হস্তে এ আন্দোলন দমন করলেন। বাংলা-বিহারের সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণ কিন্তু কখনও ওযাহাবীদের সমর্থন করেন নি। তাঁরা বহু পূর্ব্বেই কলকাতায় ন্যাশনাল মোহম্মডান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা ক'রে নিয়মতন্ত্রানুগ রাজনীতিক আন্দোলন চালাতে আরম্ভ করেন। ওয়াহাবী আন্দোলন নির্ম্মূল হ'লে উত্তর ভারতে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনকল্পে নিয়মিত চেষ্টা সুরু হয়। সার সৈয়দ আহ্‌মদ খাঁ এ বিষয়ে অগ্রণী হয়ে ১৮৭৪ সালের ২৪শে মে আলিগড়ে একটি কলেজ স্থাপন করেন। এ কলেজটি পরে আলিগড বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। মুসলমান সমাজে সার সৈয়দ আহ্‌মদ খাঁ একজন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি।

মুসলমান সমাজ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রতি বিমুখ ছিল প্রথম থেকেই। সমাজের চিন্তাশীল নেতৃবৃন্দ, যেমন মৌলবী আবদুল লতিফ, সার সৈয়দ আহ্‌মদ এই বিমুখতা দূরীকরণে সচেষ্ট হলেন সপ্তম দশকে। তাঁহার প্রয়াসের পরিণতি ঐ আলিগড় কলেজ প্রতিষ্ঠায়; কিন্তু সাধারণ উচ্চ শিক্ষা নিরোধ করার জন্যে সরকার এই সময়েই নানা রূপ বিধি প্রয়োগ করতে আরম্ভ করলেন। আর এতে ক'রে বিশেষ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা হ'ল যাঁরা উচ্চশিক্ষা-লাভে উদ্‌গ্রীব ও সমর্থ তাঁদের। এই বিধি-বিধানের প্রতিবাদে শুধু কলকাতায় নয়, মফস্বলেও সভাসমিতি অনুষ্ঠিত হয। ভারতবাসীদের মুখপত্র-স্বরূপ ভারতবর্ষীয় সভা কলকাতায় ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জুলাই এক বিরাট সভার আয়োজন করেন। এই সভায় মফস্বলের সতরটি স্থান থেকে প্রতিনিধিরা এসে যোগ দেন। এ ধরণের প্রতিনিধি-সভা পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নি। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' এর উদ্দেশ্য ও কার্য্যক্রম আলোচনা ক'রে বলেছিলেন এই সভা ভারতবর্ষের প্রথম 'পার্লামেন্ট' বা গণ-প্রতিনিধি সভা। বাস্তবিক সরকারের উচ্চশিক্ষা-নিরোধের সংকল্পে জাতির মনে কি গভীর বিক্ষোভ দেখা দেয়, সভার উদ্দেশ্য-বর্ণনায় এবং বিভিন্ন বক্তার বক্তৃতায় পরিষ্কার হৃদয়ঙ্গম হয়। ভারতবর্ষীয় সভার সভাপতি রাজা রমানাথ ঠাকুর সভায় পৌরোহিত্য করেন। উদ্দেশ্য বিবৃত করলেন সম্পাদক সুবিখ্যাত কৃষ্ণদাস পাল। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ,

রাজেন্দ্রলাল মিত্র, সত্যচরণ ঘোষাল, চন্দ্রনাথ বসু, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রমুখ বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ। সরকার কিন্তু তখন প্রতিজ্ঞায় অটল ; এইরূপ দেশব্যাপী প্রতিবাদ ও আন্দোলনে ভ্রূক্ষেপ করলেন না। বিক্ষোভ তদবধি জনচিত্তে দৃঢমূখ অসন্তোষে পরিণত হ'তে থাকে।

বড়লাট লর্ড নর্থব্রুকের আমল (১৮৭২-৭৬) দুটি কারণে বিশেষ স্মরণীয়। এ সময় বাংলা-বিহারে ব্যাপকভাবে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। এখানে একটা কথা বলা আবশ্যক যে, বর্ত্তমান বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের কতকাংশ নিয়ে তখন বঙ্গপ্রদেশ গঠিত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, বহুনিন্দিত সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল খুব ক্ষিপ্রতার সহিত কার্য্য ক'রে দুর্ভিক্ষের উগ্রতা অনেকটা প্রশমিত করেন।

এ সময়কার আর-একটি ব্যাপার যা নিয়ে শিক্ষিত সমাজে ভীষণ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়—তা হ'ল বরোদার গাইকোয়াড়ের গদিচ্যুতি। ব্রিটিশ প্রতিনিধি কর্ণেল ফেয়ার সাহেবের হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার অপরাধে ব্রিটিশ এলাকায় গাইকোয়াড়ের বিচার হয় ও ফলে তাঁর রাজ্যচ্যুতি ঘটে। এই নিয়ে ভারতের সর্ব্বত্র, বিশেষ করে কলকাতায় ভীষণ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। হিন্দু পেট্রিয়ট, সোমপ্রকাশ ও অমৃতবাজার পত্রিকা এ নিয়ে জোর লেখালেখি শুরু করলেন। রাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা অনুযায়ী এঁরা মিত্র রাজাদের স্বাধীন ব'লেই ধ'রে নিয়েছিলেন। ভিক্টোরিয়ার ঘোষণায় যা-ই থাকুক না কেন, ভারতে ইংরেজ-শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তখন ব্রিটিশ জাতির অভিপ্রায়। এ কারণ, রাজন্য-ভারতের আভ্যন্তরিক শাসনে মধ্যযুগীয় শাসনপদ্ধতি বাহাল রেখে একে ব্রিটিশ ভারত থেকে আলাদা ক'রে রাখাই ছিল, যেমন তাদের স্বার্থ, বাইরের ব্যাপারে একে সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনাও তাদের তেমনি ছিল প্রয়োজন,—যাতে ভবিষ্যতে সিপাহী-বিদ্রোহের মত কোনরূপ ব্যাপক ব্রিটিশ-বিরোধী উত্থান না ঘটতে পারে। শিক্ষিত ভারতবাসী, বিশেষ বাঙালী, কিন্তু রাণীর ঘোষণার প্রতিই চোখ নিবদ্ধ রাখলে।

দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সিবিল সার্বিস থেকে বিতাড়ন এ সময়কার আর-একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। সার জর্জ্জ ক্যাম্বেলের উচ্চ

শিক্ষাহ্রাসের চেষ্টা, তার উপরে উচ্চশিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ সিবিলিয়ান সুরেন্দ্রনাথের প্রতি সরকারের দুর্ব্যবহার—দু-ই বাঙালী তথা ভারতবাসীকে আত্মস্থ হতে প্রবুদ্ধ করলে। ১৮৭১, ২২শে নবেম্বর তারিখে সুরেন্দ্রনাথ শ্রীহট্টে এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ নিয়ে যান। ভারতবাসীরা উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত হ'লে স্বার্থহানির বিশেষ সম্ভাবনা—ইউরোপীয় কর্ম্মচারীরা এ বিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত হয়ে তাঁদের প্রতি অপ্রসন্ন হয়ে উঠলেন। সুরেন্দ্রনাথের যোগ্যতায় তাঁদের অনেকে ঈর্ষান্বিত হলেন। এইচ সি সাদার্লাণ্ড নামে এক ফিরিঙ্গী সাহেব তখন ওখানকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট। ডিরোজিও-ও ফিরিঙ্গী ছিলেন, কিন্তু তিনি ভারবর্ষকেই স্বদেশ ব'লে গণ্য করতেন। পরবর্ত্তী কালের ফিরিঙ্গীরা কিন্তু ইউরোপীয়দের হালচাল অনুকরণে প্রবৃত্ত হয় ও ব্রিটেনকেই মাতৃভূমি জ্ঞান করতে শেখে। কবে থেকে তাদের মনোবৃত্তির এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে বলা কঠিন। তবে সিপাহী-বিদ্রোহের সময় তারা ইংরেজের বিশেষ সাহায্য করায় সৈন্যবিভাগ পুনর্গঠিত হ'লে তারা তাতে বিশিষ্ট স্থান লাভ করে; অন্যান্য চাকরিতেও তারা অধিক সংখ্যায় নিযুক্ত হ'তে থাকে। তারা এদেশে ইংরেজের স্বার্থকেই নিজেদের স্বার্থ ব'লে গণ্য করতে লাগল। পরবর্ত্তী ইল্‌বার্ট বিল আন্দোলনের সময়ও তারা ইউরোপীয় সমাজের সঙ্গে মিলিত হয়ে কাজ করে। এরূপ মনোবৃত্তিযুক্ত ফিরিঙ্গীসমাজের একজন ছিলেন ম্যাজিষ্ট্রেট সাদারল্যাণ্ড। নৌকাচুরির অপরাধে ধৃত যুধিষ্ঠির নামে এক আসামী ফেরার বা পলাতক—এইরূপ লেখা একটি নথি সুরেন্দ্রনাথের নিকট উপস্থাপিত করা হ'লে তিনি তাতে স্বাক্ষর করেন। যুধিষ্ঠির কিন্তু আসলে ফেরার ছিল না। সাদার্লাণ্ডের নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি এ ব্যাপারের জন্য সুরেন্দ্রনাথকে কর্ত্তব্য-সম্পাদনে অযোগ্য প্রতিপন্ন করতে উঠে পড়ে লাগলেন। সুরেন্দ্রনাথের বিচারের জন্য কমিশন বসল। সভ্যগণ একযোগে তাঁকে দায়িত্বপূর্ণ কাজের অযোগ্য সাব্যস্ত করলেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট কমিশনের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে পঞ্চাশ টাকা মাসহারার ব্যবস্থা ক'রে সুরেন্দ্রনাথকে কর্ম্মচ্যুত করলেন। সুরেন্দ্রনাথ এর প্রতিকারের জন্য বিলাত যান। ভরত-সচিব ভারত-গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্তই বাহাল রাখলেন। বার কৌন্সিলের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও সরকারী কর্ম্মচ্যুতিহেতু ব্যারিষ্টার হবার অনুমতিও সুরেন্দ্রনাথ পেলেন না। তিনি ১৮৭৫

সনের জুন মাসে তিনি ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। পিতৃবন্ধু বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁকে মেট্রোপলিটন কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক পদ দিলেন। সুরেন্দ্রনাথের প্রতি বিলাতে ও ভারতে কর্তৃপক্ষের এতাদৃশ ব্যবহারে সমগ্র শিক্ষিত সমাজ বিচলিত হয়ে উঠল। তারা কিন্তু বসে রইল না, তাদের কর্ম্মশক্তি নব নব পথ অনুসন্ধানে নিয়োজিত হ'ল। এখানে একটি কথা মনে রাখা দরকার। ব্রিটিশগণ প্রথম প্রথম হিন্দুদের খাতির করত বটে, কিন্তু পরে যখন হিন্দুরা দেশ-শাসনে যোগ্যতা দেখিয়ে প্রতিযোগী হতে চাইলে, তখন থেকেই প্রাধান্যচ্যুতির আতঙ্ক তাদের পেয়ে বসল। তাদের এ আতঙ্ক ক্রমেই বেড়েই চলে।

যে-সব প্রতিষ্ঠান ও মনস্বী ব্যক্তি এই দুর্দ্দিনে ভারতবাসীর মনে সাহস, শক্তি ও আশার সঞ্চার ক'রে তাদের সুপথে চালিত করতে চেয়েছিলেন তাঁরা জাতির নিকট চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। শিশিরকুমার ঘোষ তাঁর 'অমৃত-বাজার পত্রিকা'য়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বঙ্গদর্শনে', ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানসভা-প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এবং জাতীয় নাট্যশালা জাতিকে শক্তির সন্ধান দিতে তৎপর হলেন। শিশিরকুমারের নাম আমরা ইতিপূর্ব্বে কয়েক বার পেয়েছি। তিনি ভ্রাতাদের সঙ্গে যশোহর পোলুয়া-মাগুরা থেকে ১৮৬৮ ২০ ফেব্রুয়ারী 'অমৃতবাজার পত্রিকা' প্রকাশ ও সম্পাদনা আরম্ভ করেন। তিনি তিন বছর পরে কলকাতায় পত্রিকা তুলে নিয়ে আসেন। অমৃতবাজারের সহজ সরল তেজোদৃপ্ত লেখা এক দিকে যেমন বাঙালী-মনে শক্তি সঞ্চার করতে লাগল, অন্য দিকে ইউরোপীয়দের নিকট রাজদ্রোহের আকর ব'লেও প্রতিভাত হ'ল। সরকারী নীতির ছলাকলা শিশিরকুমার সবিস্তারে ফাঁস ক'রে দিতেন। ক্যাম-বেলের শিক্ষানীতি ও গাইকোয়াড়ের রাজ্যচ্যুতি সম্পর্কে শিশিরকুমারের দৃঢ় লেখনী তখন শিক্ষিত সমাজকে আত্মস্থ ক'রে তুলতে বিশেষ সাহায্য করলে। শিশিরকুমার ছিলেন প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রশাসনের পক্ষপাতী। তাঁর পূর্ব্বেও কেউ কেউ, যেমন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, গণতন্ত্রের কথা বলেছেন; কিন্তু ভারতবাসীরা যে তখনই প্রতিনিধিমূলক শাসনের যোগ্য, তা শিশিরকুমারই সর্ব্বপ্রথম ঘোষণা করেন। তাঁর ইণ্ডিয়ান লীগের কথা পরে বলব।

ভারতবাসীর জাতীয়ত্ববোধের উন্মেষে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দান

মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে হয়। আমরা যে সময়ের কথা এখন বলছি তখন তিনি একজন কুশলী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। কিন্তু 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা' প্রভৃতি উপন্যাস লিখে বাঙালী পাঠকের চিত্ত ইতিমধ্যেই তিনি জয় ক'রে নিয়েছেন। তিনি ১২৭৯ সালের (ইং ১৮৭২) বৈশাখ মাসে 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ করেন এবং ক্রমাগত পাঁচ বৎসর স্বহস্তে সম্পাদনা করে আত্মবিস্মৃত বাঙালীর মোহনিদ্রা সজোরে ভেঙ্গে দিলেন। বাঙালীর পূর্ব্বগৌরব, বর্ত্তমান শক্তি ও ভবিষ্যৎ আশাভরসার কথা তাঁর অমর লেখনীমুখে অতি পরিষ্কার রূপে ব্যক্ত হ'তে লাগল। বাংলা সাহিত্যের মহীয়ান্ রূপ তিনি আত্মবিভ্রান্ত ইঙ্গ-বঙ্গের সম্মুখে উদ্ভাসিত করলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ,' 'দেবী চৌধুরাণী', 'ধর্ম্মতত্ত্ব' পরবর্ত্তী কালের রচনা, তাঁর অমর সঙ্গীত 'বন্দেমাতরম' তখনও অজ্ঞাত। কিন্তু এই সময়েই তিনি বাঙালীকে স্বপ্রতিষ্ঠ হ'তে উপদেশ দিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন—

"যতদিন দেশী-বিদেশীতে বিজিত-জেতৃ সম্বন্ধ থাকিবে, ততদিন আমরা নিকৃষ্ট হইলেও পূর্ব্বগৌরব মনে রাখিব, ততদিন জাতি-বৈর-শমতার সম্ভাবনা নাই ; বরং আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে, যতদিন ইংরেজের সমতুল্য না হই, ততদিন যেন আমাদিগের মধ্যে এই জাতি-বৈরিতার প্রভাব এমনই প্রবল থাকে। যতদিন জাতি-বৈর আছে ততদিন প্রতিযোগিতা আছে। বৈর ভাবের জন্যই আমরা ইংরেজদিগের কতক কতক সমতুল্য হইতে চেষ্টা করিতেছি। ইংরেজের নিকট অপমানগ্রস্ত, উপহসিত হইলে যতদূর আমরা তাহাদিগের সমকক্ষ হইবার যত্ন করিব, তাহাদিগের কাছে বাপু-বাছা ইত্যাদি আদর পাইলে ততদূর করিব না—কেননা সে গায়ের জ্বালা থাকিবে না। বিপক্ষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ঘটে, স্বপক্ষের সঙ্গে নহে। উন্নত শত্রু উন্নতির উদ্দীপক, উন্নত বন্ধু আলস্যের আশ্রয়। আমাদিগের সৌভাগ্যক্রমেই ইংরেজের সঙ্গে আমাদের জাতি-বৈর ঘটিয়াছে।"

বঙ্কিমচন্দ্র 'কমলাকান্ত-প্রসূতি' জননী বঙ্গভূমির ভাবী মূর্ত্তি দেশবাসীর সম্মুখে ধরিয়ে দিলেন—

"চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ী-মৃত্তিকারূপিণী— অনন্ত-রত্নভূষিতা—এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশভুজা—দশ দিক্—দশ

দিকে প্রসারিত ; তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত ; পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরজন কেশরী শত্রুনিষ্পীড়নে নিযুক্ত। এ মূর্ত্তি এখন দেখিব না—আজি দেখিব না, কাল দেখিব না—কালস্রোতে পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু একদিন দেখিব—দিগ্‌ভুজা, নানা প্রহরণপ্রহারিণী, শত্রু-মর্দ্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠ-বিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞান-মূর্ত্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ, আমি সেই কালস্রোত মধ্যে দেখিলাম এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা।"

"এস ভাই সকল! আমরা এই অন্ধকার কালস্রোতে ঝাঁপ দিই। এস, আমরা দ্বাদশ কোটি ভুজে ঐ প্রতিমা তুলিয়া, ছয় কোটি মাথায় বহিয়া, ঘরে আনি।"

ভারতবাসীর অবরুদ্ধ কর্ম্মশক্তিকে একটি বিশেষ পথে চালনা করলেন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার। তিনি প্রথম এলোপাথ ও পরে হোমিওপাথ চিকিৎসক হিসাবে কলকাতায় সুপবিচিত হন। তাঁর পাণ্ডিত্য ও স্বাধীনচিন্তা বাঙালীর মুখে মুখে কীর্ত্তিত। ভারতবর্ষের অধীনতায় যেমন বিজ্ঞান কার্য্যকরী, একে সবল স্বাধীন করবার পক্ষেও বিজ্ঞান অনুরূপ কার্য্যকরী। এই সত্য তিনিই এ সময় ভারতবর্ষে প্রচার করেন এবং বিজ্ঞানের বিবিধ বিভাগ আলোচনা ও আয়ত্ত করবার জন্য ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানসভা প্রতিষ্ঠায় যত্নবান্ হন। আট বছরের অবিরাম চেষ্টার ফলে ১৮৭৬, ২৯শে জুলাই ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানসভা স্থাপিত হ'ল। বঙ্কিমচন্দ্র বিজ্ঞানসভার প্রস্তাবে বঙ্গদর্শনে (১২৭৯, ভাদ্র সংখ্যা) যা লিখেছিলেন তা এখনও বহু পরিমাণে সত্য। তিনি লেখেন—

"বিজ্ঞানের সেবা করিলে বিজ্ঞান তোমার দাস, যে বিজ্ঞানকে ভজে বিজ্ঞান তাহাকে ভজিবে। কিন্তু যে বিজ্ঞানের অবমাননা করে, বিজ্ঞান তাহার কঠোর শত্রু।"

"বিজ্ঞান মহায়সশকট বাহনে, তড়িৎ-তার সঞ্চালনে, কামান সন্ধানে, অয়োগোলক বর্ষণে এই বীরপ্রসূ ভারতভূমি হস্তামলকবৎ আয়ত্ত করিয়া শাসন করিতেছে। শুধু তাহাই নহে, বিদেশীয় বিজ্ঞানে আমাদিগকে ক্রমশঃই নির্জীব করিতেছে। যে বিজ্ঞান স্বদেশী হইলে আমাদের দাস হইত, বিদেশী হইয়া আমাদের প্রভু হইয়াছে। আমরা দিন দিন নিরুপায় হইতেছি। অতিথিশালায়

আজীবনবাসী অতিথির ন্যায় আমরা প্রভুর আশ্রমে বাস করিতেছি। এই ভারতভূমি একটি বিস্তীর্ণ অতিথিশালা মাত্র।"

ভারতবর্ষ তখন সত্যসত্যই একটি বিস্তীর্ণ অতিথিশালায় রূপান্তরিত। অবাধ-বাণিজ্যনীতি প্রবর্ত্তনের ফলে ভারতবর্ষের শিল্পসম্পদ বিলুপ্তপ্রায়, ভারতবর্ষ এক বিরাট কৃষিক্ষেত্রে পরিণত। সে যুগের প্রসিদ্ধ লেখক ভোলানাথ চন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'মুখার্জ্জিস্ ম্যাগাজিনে' (১৮৭৪) বিলাতী দ্রব্য-বর্জ্জনে প্রস্তাব ক'রে এই মর্ম্মে লিখলেন,—

"কোনরূপে দৈহিক বল প্রয়োগ না ক'রে, রাজানুগত্য অস্বীকার না ক'রে এবং কোন নূতন আইনের জন্য প্রার্থনা না জানিয়ে আমরা আমাদের পূর্ব্ব সম্পদ ফিরিয়ে আনতে পারি। চরম ক্ষেত্রে, একমাত্র না হ'লেও সবচেয়ে অধিক কার্য্যকরী অস্ত্র—'নৈতিক শত্রুতা' (moral hostility)। এ অস্ত্র অবলম্বনে কোন অপরাধ নেই। আসুন বিলাতী দ্রব্য ক্রয় করিব না—এই সঙ্কল্প আমরা সকলে গ্রহণ কবিব। সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, ভারতবর্ষের উন্নতি ভারতবাসীরই সাধ্য।"

বাঙালী জীবনের এই যুগসন্ধিক্ষণে বাংলার রঙ্গমঞ্চও কম কৃতিত্ব প্রদর্শন করে নি। ১৮৭২ সালের মাঝামাঝি 'ন্যাশনাল থিয়েটা'র নামে একটি সাধারণ রঙ্গমঞ্চ কলকাতায় আত্মপ্রকাশ করে। প্রসিদ্ধ নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু ও অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী প্রভৃতিরা মিলে এর প্রতিষ্ঠা করেন। নীলদর্পণ, ভারতমাতা, হরিশ্চন্দ্র, বীরনারী, সুরেন্দ্র-বিনোদিনী, প্রভৃতি জাতীয় ভাবমূলক নাটক এখানে ও অন্যান্য রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। গাইকোয়াড়ের রাজ্যচ্যুতি উপলক্ষেও বহু নাটক রচিত ও অভিনীত হয়েছিল। ১৮৭৫ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় যুবরাজ (সপ্তম এড্ওয়ার্ড) আগমন করেন। সরকারী উকীল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় নিজ ভবানীপুরস্থ বাসভবনে হিন্দুপুরনারীদের সমবেত করে তাদের দ্বারা যুবরাজকে অভ্যর্থনা করান। এ নিয়ে হিন্দুসমাজে হুলুস্থূল উপস্থিত হয়। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাজিমাৎ' কবিতা লিখে এ ঘটনাকে অমর করেছেন। জগদানন্দের কার্য্যকে ব্যঙ্গ ক'রে 'গজদানন্দ' প্রহসন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হ'ল। রাজভক্ত প্রজাকে রক্ষার জন্য বড়লাট স্বয়ং অর্ডিন্যান্স জারি ক'রে এর অভিনয় বন্ধ ক'রে দেন।

'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী'র অভিনয়ও অশ্লীলতার ওজুহাতে বন্ধ করানো হয় ও বিচারে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিখ্যাত অমৃতলাল বসু ও উপেন্দ্রনাথ দাসের বিরুদ্ধে এক মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। মোকদ্দমা হাইকোর্ট পর্য্যন্ত গড়াল। হাইকোর্টে কিন্তু 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' অশ্লীল প্রমাণিত হ'ল না। অমৃতলাল ও উপেন্দ্রনাথ মুক্তি পেলেন। ১৮৭৬ সালের ডিসেম্বর মাসে সরকার জনসাধারণের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য ক'রে রঙ্গমঞ্চ নিয়ন্ত্রিত আইন পাস ক'রে এর স্বাধীনতা সঙ্কুচিত করলেন।

সঙ্ঘবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলন

তৃতীয় যুগ

শিশিরকুমার ঘোষের নামের সঙ্গে এখন আমরা সুপরিচিত। তাঁর কার্য্য-কলাপের আভাসও আমরা কিছু কিছু পেয়েছি। ভারতবাসীরা পার্লামেণ্টারী বা প্রতিনিধিমূলক শাসনের সম্পূর্ণ উপযোগী—এ মত তিনিই প্রথম ১৮৭০ সালে তাঁর নিজ 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু দেশ-শাসনের ভার গ্রহণ করতে হ'লে স্বদেশবাসীর রাজনৈতিক শিক্ষার প্রয়োজন। যে-সব দেশে পার্লামেণ্টীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত, সে-সব স্থানে শিক্ষিত সাধারণের রাজনৈতিক সভাসমিতির প্রাচুর্য্য আছে। ভারতবর্ষে এরূপ প্রতিষ্ঠানের একান্ত অভাব। কলকাতার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রায় জমিদার-সভায় পরিণত হলেও রাজনীতি আন্দোলন-আলোচনার এ-ই তখনও একমাত্র প্রতিষ্ঠান। শিশিরকুমার একে সাধারণ মধ্যবিত্তদের অধিগম্য করবার জন্য এর বার্ষিক চাঁদা পঞ্চাশ টাকা থেকে পাঁচ টাকায় কমিয়ে দেবার প্রস্তাব করলেন। কিন্তু এসোসিয়েশনের কর্ত্তারা তাঁর কথায় কর্ণপাত না করায় তিনিই এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান-স্থাপনে অগ্রসর হন। শিশিরকুমার পত্রিকায় এ সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করলেন, তাঁর অগ্রজ হেমন্তকুমার বঙ্গের মফস্বল অঞ্চলে গিয়ে এরূপ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা জনসাধারণকে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। ১৮৭৫ সালের মধ্যে বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ, শান্তিপুর, রাণাঘাট, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর, যশোহর, খুলনা, রাজশাহী, ঢাকা, হুগলী, বরিশাল, ময়মনসিংহ প্রভৃতি শহর অঞ্চলে রাজনৈতিক সঙ্ঘ বা এসোসিয়েশন গঠিত হ'ল। শিশিরকুমার অতঃপর কলকাতায় একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান-স্থাপনে মন দিলেন।

তখন এক দিকে যেমন 'ন্যাশনাল' কথাটির খুব চল, অন্য দিকে 'ইণ্ডিয়ান' বা ভারতবর্ষীয় কথাটিরও খুব অনুরাগী হয়ে উঠেছেন শিক্ষিত সম্প্রদায়। শাসন-কর্ত্তারা বিশাল ভারতবর্ষকে বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে বিভক্ত ক'রে এক থেকে অন্যকে

স্বতন্ত্র ক'রে রাখতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। বাঙালী রাষ্ট্রনৈতিক চেতনায় অগ্রসর, এজন্য তাদের পক্ষে সরকারের এ অভিপ্রায় বুঝতে বিলম্ব হয় নি। শিক্ষিত জনের নিকট ভারতবর্ষ এক অখণ্ড দেশ। সকল ব্যাপারেই তারা ভারতবর্ষকে এক ভাবতে শিখেছে। এইরূপ ধারণার ফলেই শিশিরকুমারের প্রতিষ্ঠানটির 'ইণ্ডিয়ান লীগ' নামকরণ করা হয়। সুরেন্দ্রনাথ বলেন, 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশান' নামটিও তিনি এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই দিয়েছিলেন। যা হোক, শিশিরকুমার অগ্রজ হেমন্তকুমার ও অনুজ মতিলাল ঘোষের সহযোগে ১৮৭৫ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর ইণ্ডিয়ান লীগ স্থাপন করলেন। তাঁর এ কার্য্যে শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও রেভাঃ কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও সহায় হলেন। এ একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হ'লেও শিল্পবিদ্যালয়-স্থাপনও এর উদ্দেশ্যমধ্যে গণ্য ছিল। বার্ষিক চাঁদা মাত্র পাঁচ টাকা ধার্য্য হওয়ায় শিক্ষিত সাধারণ এর সভ্য হ'তে সক্ষম হলেন। আটত্রিশ জন সভ্য নিয়ে লীগের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠিত হয়। এর সঙ্গে বিশিষ্ট লোকদের কোন না কোন সময়ে সংশ্লিষ্ট দেখতে পাই। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীমোহন দাশ, রেভাঃ কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দুর্গামোহন দাশ, মনোমোহন ঘোষ, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মনোমোহন বসু, নবগোপাল মিত্র, আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম এঁদের ভিতর উল্লেখযোগ্য। লীগ পরিচালনা সম্পর্কে শিশিরকুমারের সঙ্গে বনিবনাও না হওয়ায় এঁদের অনেকেই প্রতিষ্ঠার অল্পদিন পরে লীগ ত্যাগ করেন।

লীগ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা নিয়ে সে সময়ের অনেকে অনেক কথা বলেছেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের কর্তৃপক্ষ বরাবর শিশিরকুমারের বিরোধী ছিলেন। তাঁর উগ্র ও প্রগতিশীল মতবাদ তাঁদের পক্ষে মোটেই গ্রহণযোগ্য হয় নি। লীগ যে বেশী দিন স্থায়ী হয় নি, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের লীগ পরিত্যাগ ও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের কর্ত্তাদের বিরোধীতা—এদের কোনটিই তার জন্যে কম দায়ী নয়।

সার্ রিচার্ড টেম্পল (১৮৭৪-৭৭) তখন বঙ্গের ছোটলাট। তিনি একজন বিচক্ষণ রাজপুরুষ। শিশিরকুমারের স্পষ্ট ও সতেজ লেখনি টেম্পল মহোদয়কে তাঁর দিকে অবিলম্বে আকৃষ্ট করে। ইণ্ডিয়ান লীগ ও তার উদ্দেশ্যকে তিনি

প্রীতির চক্ষেই দেখতে লাগলেন। শিশিরকুমারের প্রস্তাবিত 'এল্‌বার্ট টেম্পল অফ্‌ সায়ান্স' নামে শিল্পবিদ্যালয়ে অর্থসাহায্যেরও তিনি ব্যবস্থা করেছিলেন। শিল্প-বিদ্যালয়টি দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হ'ল।

শিশিরকুমারের এসকল কার্য্যে প্রধান সহায় হয়েছিলেন পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। কৃষ্ণমোহনকে লোকে বলত 'পলিটিক্যাল পাদ্রী'। অর্থাৎ, পাদ্রী বা ধর্ম্মযাজক হয়েও তিনি প্রগতিশীল রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যোগ রক্ষা করে চলতেন। ইণ্ডিয়ান লীগ প্রতিষ্ঠার সময় তাঁর বয়স ষাটেরও উপর। তথাপি তিনি কিছুকাল এর সভাপতিত্ব করেছিলেন। উক্ত শিল্প-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তিনি বিশেষ যত্নবান্‌ ছিলেন। পরে তিনি ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভাপতি হন। সুরেন্দ্রনাথ বলেন, বার্দ্ধক্যে উপনীত হলেও কৃষ্ণমোহন রাজনীতিচর্চ্চায় ও পৌরসেবায় যুবজনোচিত কর্ম্মতৎপরতা দেখিয়েছিলেন। কৃষ্ণমোহন ডিরোজিও-যুগের একজন প্রধান ব্যক্তি। তিনি যৌবনে খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করেছিলেন বটে, কিন্তু বরাবর ভারতীয়ই ছিলেন এবং ভারতীয় সংস্কৃতি ও শাস্ত্রদর্শনাদি আলোচনায় জীবন অতিবাহিত করেন। এসব বিষয়ে অনন্যতুল্য কৃতিত্বপ্রদর্শনের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৭৫ সালে তাঁকে 'ডক্টর অফ্‌ ল' উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁর সঙ্গে প্রাচ্য বিদ্যায় সুপণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং মনিয়র উইলিয়মস্‌ও এই উপাধি প্রাপ্ত হন।

শিশিরকুমার তথা 'ইণ্ডিয়ান লীগ' একটি বিষয়ে খুবই সাফল্য লাভ করেছিলেন এবং এজন্যই হয়ত সুরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, 'ইণ্ডিয়ান লীগের দ্বারাও কিছু প্রয়োজনীয় কাজ সাধিত হয়।' শিশিরকুমার বরাবর প্রতিনিধিমূলক শাসনেরই শুধু পক্ষপাতী ছিলেন না, ভারতবাসীরা যে তখনই এর উপযুক্ত এ ধারণাও তাঁর মনে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয়েছিল। সার্‌ রিচার্ড টেম্পল কল্‌কাতা মিউনিসিপালিটিকে একটি প্রতিনিধি-মূলক কর্পোরেশনে পরিণত করতে চেষ্টা করেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের কর্ত্তারা প্রতিনিধিমূলক শাসনের গুরুত্ব না বুঝে বা নিজেদের প্রাধান্য বিলুপ্তির আশঙ্কায়, যে কারণেই হোক্‌, এর বিরোধী হলেন। তখন শিশিরকুমার ও তাঁর ইণ্ডিয়ান লীগই সার টেম্পলের প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন। কলকাতা কর্পোরেশন যে ক্রমে একটি স্বায়ত্তশাসন-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে তার মূলে ছিল শিশিরকুমারের ঐকান্তিক সমর্থন। ১৮৭৬ সালে কলকাতা

কর্পোরেশন আইন বিধিবদ্ধ হয়ে নূতন কর্পোরেশন গঠিত হ'ল। কলকাতা আঠারটি ওয়ার্ড বা পল্লীতে বিভক্ত হয় এবং এখান থেকে মোট আটচল্লিশ জন প্রতিনিধি করদাতাদের ভোটে নির্ব্বাচিত হবার অধিকার পান। কর্পোরেশনে কিন্তু মোট সদস্যসংখ্যা হ'ল বাহাত্তর জন। স্থির হয়, বাকী চল্লিশ জন সদস্য গবর্ণমেণ্ট মনোনীত করবেন। এই নিয়ম বহু কাল চলে। ১৮৯৯ সালে যখন সরকার কর্পোরেশনের এ অধিকারে সঙ্কোচ সাধন করেন, তখন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ আঠাশ জন প্রতিনিধি এর প্রতিবাদে সদস্যপদ ত্যাগ করেন। সুরেন্দ্রনাথ ১৮৭৬ সালেই কবদাতাদের ভোটে কর্পোরেশনের সদস্য নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন।

(ইণ্ডিয়ান লীগ স্থাপনের অল্পকাল পরেই কলকাতায় ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা ভারত-সভা প্রতিষ্ঠিত হ'ল। সুরেন্দ্রনাথেব কলকাতা প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বেই ব্যারিষ্টার আনন্দমোহন বসু পুণার ছাত্রসভার আদর্শে কলকাতায় একটি 'ষ্টুডেণ্টস্ এসোসিয়েশন' বা 'ছাত্রসভা' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ছাত্রসভা প্রধানতঃ সামাজিক বিষয় নিয়েই আলোচনা করত। আনন্দমোহন এর সভাপতি ও নন্দকিশোর বসু নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কৃতী ছাত্র এর সম্পাদক। সুরেন্দ্রনাথ ছাত্রসভাকে কেন্দ্র ক'রে তাঁর অপূর্ব্ব বাগ্মিতাপ্রভাবে ছাত্রসমাজের মনে দেশপ্রীতি উদ্রেক করতে সক্ষম হলেন। বস্তুতঃ, এই ছাত্রসভাকেই পরবর্ত্তী ভারত-সভার আদি বলতে হয়। ছাত্রসভার উদ্যোগে তাঁর প্রথম বক্তৃতা 'শিখশক্তির অভ্যুদয়' প্রদত্ত হয় গোলদীঘির উত্তরে পুরাতন হিন্দু-কলেজের হলঘরে। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর দ্বিতীয় বক্তৃতা 'শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব' প্রদান করেন ভবানীপুরস্থ লণ্ডন মিশনারী সোসাইটি ভবনে। যুবকসমাজে কিন্তু ঝড় তুলল তাঁর ম্যাট্‌সিনী ও যুবক ইটালী সম্পর্কীয় বক্তৃতাবলী। ইউরোপীয় ইতিহাস ও সাহিত্য এবং হিন্দুমেলা, সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের আলোচনা স্বদেশীভাবোদ্দীপক সাহিত্য, নাটক ও সঙ্গীত আগে থেকেই ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে আরম্ভ করে। এসময় সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতায় যুবকমনে স্বাজাত্যবোধ সত্যোপেত ও বস্তুগত হয়ে উঠল। নরেন্দ্রনাথ দত্ত (বিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দ), ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি পরবর্ত্তী কালের বিখ্যাত ব্যক্তিগণ নিয়মিতভাবে তাঁর বক্তৃতা শুনতেন। এই সময় বিপিনচন্দ্র পাল অধ্যয়নরত

যুবক। সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা, বিশেষ ম্যাট্‌সিনী সম্পর্কীয় বক্তৃতাবলী সম্বন্ধে বিপিনচন্দ্র বলেন :

"সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মীপ্রতিভাই আমাদের সমক্ষে আধুনিক ইউরোপীয় ইতিহাসের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আদর্শকেও উজ্জ্বল করিয়া ধরে। ম্যাট্‌সিনীর দৈবী প্রতিভা, গ্যারিবল্ডীর স্বদেশ উদ্ধারকল্পে অদ্ভুত কর্ম্মচেষ্টা, য়ুন ইটালী (Young Italy) সম্প্রদায়ের ও নব্য আয়র্লণ্ডের (New Ireland) আত্মোৎসর্গপূর্ণ দেশচর্য্যা, এ সকলের কথা সুরেন্দ্রনাথই সর্ব্বপ্রথম এদেশে প্রচার করেন এবং তাঁহার এই সকল ঐতিহাসিক শিক্ষাকে আশ্রয় করিয়া পূর্ব্বে আমাদের যে স্বদেশাভিমান বহুল পরিমাণে কবিকল্পনা ও পৌরাণিকী কাহিনী অবলম্বন করিয়াই ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাহাই এখন স্বদেশের ও বিদেশের ইতিহাসের দৃষ্টান্ত ও শিক্ষার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া, কিঞ্চিৎ পরিমাণে সত্যোপেত ও বস্তুগত হইয়া উঠিল।"

যুবকমনে এই বক্তৃতাবলীর প্রভাব সম্বন্ধে বিপিনচন্দ্র তাঁর ইংরেজী আত্মজীবনীতে আরও বিশদ করে যে-সব কথা বলেছেন তার কতকাংশের স্থূল মর্ম্ম এই :

"আমরা অষ্ট্রিয়ার অধীন ইটালিয়ানদের অবস্থা ও ব্রিটিশ আমলে আমাদের নিজেদের অবস্থার মধ্যে বহুলাংশে সমতা দেখতে পেলাম। আমাদেরও মফঃস্বল অঞ্চলে ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে মোকদ্দমা উপস্থিত হ'লে ভারতীয়েরা কোনরূপ ন্যায় বিচারই পায় না। একই সিবিল সার্বিসের ভারতীয় ও ইউরোপীয় অংশের মধ্যে ক্ষমতার তারতম্য আমাদের হৃদয়ে জ্বালা বাড়িয়ে দিত। আসাম চা-বাগানের কুলিদের দুর্দ্দশা তখন দেশীয় সংবাদপত্রগুলিতে ব্যক্ত হতে আরম্ভ হয়। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ম্যাজিষ্ট্রেটী জুলুমের কাহিনী প্রায়ই প্রকাশ করতেন। এই সকল ব্যাপারে ম্যাট্‌সিনী-পরিচালিত স্বাধীনতা সংগ্রামের বিবরণ আমাদের তিক্ত মনকে একেবারে আবিষ্ট করে ফেললে। আমরা ম্যাট্‌সিনীর লেখা ও যুবক ইটালীয় আন্দোলনের ইতিহাস পড়তে আরম্ভ করলাম। আমরা ক্রমে ইটালীর স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রথম প্রচেষ্টাগুলি, বিশেষ 'কার্বোনারি' প্রচেষ্টার সঙ্গে পরিচিত হলাম। ম্যাট্‌সিনী প্রথমে কার্বোনারির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

স্বাধীনতালাভের উদ্দেশ্যে ইটালীতে যেসব গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় তারই নাম এক কথায় কার্বোনারি। কার্বোনারির গুপ্ত পদ্ধতি সভ্যদের মধ্যে প্রকারান্তরে ভীরুতারই প্রশ্রয় দিত। এজন্য ম্যাট্‌সিনী এর সম্পর্ক ত্যাগ ক'রে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের ম্যাট্‌সিনী সম্পর্কীয় বক্তৃতা থেকে প্রেরণা পেয়ে আমরাও ভারতের স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠায় লেগে গেলাম। কিন্তু তখনও কোনরূপ বিপ্লবী মনোভাব দ্বারা আমরা চালিত হই নি বা স্বদেশের রাষ্ট্রনৈতিক মুক্তির জন্য কোনরূপ গুপ্ত হত্যার কথাও ভাবি নি। সুরেন্দ্রনাথ নিজেই এইরূপ বহু গুপ্ত যুব সমিতির অধিনায়ক ছিলেন। উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য কোনরূপ নির্দ্দিষ্ট প্রোগ্রাম যুবকদের ছিল না বটে, কিন্তু তাঁরা আদর্শে খুবই নিষ্ঠাবান্ ছিলেন। আমি একটি সমিতির কথা জানি—আমি অবশ্য এর সভ্য ছিলাম না—যার সভ্যগণ তরবারির অগ্রভাগ দ্বারা বক্ষঃস্থল ছিন্ন ক'রে রক্ত বার করতেন ও সেই রক্ত দিয়ে অঙ্গীকারপত্রে নিজ নিজ নাম স্বাক্ষর করতেন।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তেও তাঁদের একটি গুপ্ত সমিতির কথা বিশদভাবে উল্লেখ করেছেন। বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসু ছিলেন এর সভাপতি ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান কর্ম্মনায়ক।

সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতায় যুবকসমাজ কর্ম্মপ্রেরণা লাভ করলেন। তিনিও নিজ শক্তি পরিমাপ করতে সক্ষম হলেন। শিশিরকুমারের ইণ্ডিয়ান লীগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বন্ধুদের সঙ্গে সাধারণগম্য প্রকাশ্য রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানগঠনে তিনি অতঃপর অগ্রসর হলেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ও জাষ্টিস দ্বারকানাথ মিত্র 'বেঙ্গল এসোসিয়েশন' নামে একটি রাজনীতিক সভা স্থাপনের প্রস্তাব করেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ যুগোপযোগী ক'রে এর নাম দিলেন 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' বা ভারতসভা। সমগ্র ভারতবর্ষের রাজনীতিক সমস্যার আলোচনাই হবে এ সভার কাজ। আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন এর প্রধান উদ্যোক্তা। প্রথম তিন জনই আবার সে যুগের বিশেষ উৎসাহী ব্রাহ্ম যুবক। সুরেন্দ্রনাথের মত এঁরাও স্বাধীনতার মন্ত্রে তখন উদ্দীপিত। আনন্দমোহন বসু অঙ্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় র‍্যাংলার। ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা

পাশ ক'রে কলকাতায় এসে তিনি স্বাধীন আইনব্যবসায় আরম্ভ করেন ও ছাত্র-সভার মারফত জনহিতে মন দেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সুকবি ও গ্রন্থকার, সরকারী হেয়ার স্কুলে শিক্ষকতাকর্ম্মে নিযুক্ত। আদর্শনিষ্ঠা ও স্বাধীনচিত্ততার জন্য যুবকগণ সহজেই তাঁর দিকে আকৃষ্ট হ'তেন। এখানে তাঁর একটি কার্য্যের কথা উল্লেখ করব।

শিবনাথ তখন সরকারী কর্ম্মে লিপ্ত। এ সময়, ১৮৭৬ সালের মাঝামাঝি তাঁরই নেতৃত্বে তাঁর অনুরক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, সুন্দরীমোহন দাস, কালীশঙ্কর শুকুল, তারাকিশোর রায়চৌধুরী (পরবর্ত্তী কালের বিখ্যাত সন্তদাস বাবাজী) প্রভৃতি মিলে একটি নূতন সোসাইটি বা সমিতি স্থাপন করেন। বিপিনচন্দ্র বলেন, সুরেন্দ্রনাথের প্রেরণায় প্রতিষ্ঠিত এ সময়কার অন্যান্য সমিতির সঙ্গে এর বিশেষ পার্থক্য ছিল। রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে ধর্ম্ম ও সমাজ সম্পর্কে ব্রাহ্ম সমাজের প্রগতিশীল মতবাদ-পোষণ ও পালনও এ সমিতির উদ্দেশ্য হ'ল। সভা প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পরে একদিন মধ্যরাত্রে শিবনাথের নেতৃত্বে অগ্নিকুণ্ড জেলে তা প্রদক্ষিণ করতে করতে তাঁরা সমাজ ও ধর্ম্মবিষয়ক আদর্শের সঙ্গে রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতারও অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। একটি অঙ্গীকারে স্পষ্ট এই নির্দ্দেশ ছিল যে, জীবন গেলেও কেউ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের দাসত্ব করবেন না। কারণ, তাঁদের মতে ব্রিটিশ জাতি বলপ্রয়োগ দ্বারা ভারতবর্ষ জয় করেছে। তবে তাঁরা সরকারী আইন ভঙ্গ করবেন না স্থির করেন। শিবনাথ তখনও সরকারী চাকুরে। তিনি সেদিন অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করতে পারেন নি। তিনি আত্মজীবনীতে লিখেছেন, "যখন ইঁহারা ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে আগুনের চারিদিকে ঘুরিয়া আসিতে লাগিলেন, তখন এক আশ্চয্য বল ও আশ্চর্য্য প্রতিজ্ঞা আমার মনে জাগিতে লাগিল।" শিবনাথ এর কিছুকাল পরেই সরকারী কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন।

ভারতসভার অন্যতম উদ্যোক্তা ও কর্ম্মী দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম আগে আমরা পেয়েছি। তিনি ফরিদপুরের অন্তর্গত লোনসিংহ স্কুলের বাংলা শিক্ষক ছিলেন। সেখান থেকেই তিনি 'অবলা-বান্ধব' পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার খুবই পক্ষপাতী ছিলেন। "না জাগিলে ভারত ললনা, এ ভারত আর জাগে না জাগে না" —বিখ্যাত গানটি তাঁরই

রচনা। তিনিও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার পূজারী। ভারতসভা সংগঠনে তাঁর কৃতিত্ব সুরেন্দ্রনাথ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। আনন্দমোহন, শিবনাথ ও দ্বারকানাথ তিন জনই আবার কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে মতদ্বৈধ হেতু ১৮৭৮ সালে কলকাতায় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হন। আনন্দমোহন গণতন্ত্রের আদর্শে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের গঠনতন্ত্র রচনা করেন। তাঁর আশা ছিল, ভারতের রাষ্ট্রীয় গঠনতন্ত্র একদিন এই আদর্শেই রচিত হবে। এইরূপ কর্ম্মী ও মনীষিবৃন্দের যোগাযোগেই ভারতসভার জন্ম।

১৮৭৬ সালের ২৬শে জুলাই তারিখে একটি সাধারণগম্য রাজনৈতিক সভা-স্থাপনের উদ্দেশ্যে কলকাতায় 'হিন্দু ব্যবস্থাদর্পণ' প্রণেতা শ্যামাচরণ সরকারের সভাপতিত্বে এক জনসভার অধিবেশন হ'ল। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের কর্ত্তৃপক্ষ পূর্ব্বেকার ইণ্ডিয়ান লীগের বিরোধী ছিলেন। তাঁরা কিন্তু এবারে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের বিরোধিতা করলেন না, বরং এর কর্ত্তৃস্থানীয় মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ, কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি এই সভায় উপস্থিত থেকে উদ্যোগীদের উৎসাহ বর্দ্ধন করলেন। ইণ্ডিয়ান লীগের তরফে সভাস্থাপনের বিরোধিতা হলেও শেষ পর্য্যন্ত তা টেকে নি। আনন্দমোহন বসু হলেন ভারতসভার সম্পাদক। 'সাধারণী'-সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও 'আর্য্যদর্শন'-সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এর সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হলেন। সভার সভ্য হলেন নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামেশ্বর মল্লিক, ক্ষেত্রচন্দ্র গুপ্ত, চন্দ্রনাথ বসু, মনোমোহন ঘোষ, সারদাচরণ মিত্র, উমেশচন্দ্র দত্ত, কালীনাথ দত্ত, নবগোপাল মিত্র, নীলমণি মিত্র (এলাহাবাদ), রাজনারায়ণ বসু, সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী, কেদারনাথ চৌধুরী, প্রসাদদাস মল্লিক, কৃষ্ণমোহন মল্লিক, ভোলানাথ চন্দ্র, অঘোরনাথ কুণ্ডার, শ্রীনাথ বসু, জয়গোপাল সোম।

ভারতসভা নিখিল ভারতীয় আদর্শ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হ'ল। সুরেন্দ্রনাথ বলেন, ম্যাট্‌সিনীর ইউনাইটেড ইটালী বা ঐক্যবদ্ধ ইটালীই তাঁকে একটি অখণ্ড ভারতবর্ষের আদর্শে অনুপ্রাণিত করে। ভারতীয় রাজনীতি এতদিন ছিল একান্তভাবেই বহির্মুখী, এবারে সুরেন্দ্রনাথের চেষ্টায় অন্তর্মুখী

হবারও সুযোগ পেল। অতঃপর এক দিকে যেমন ব্রিটিশ জাতির নিকট সুবিচারের আশায় পার্লামেণ্টে আবেদন-নিবেদন চলতে থাকে, অন্য দিকে দেশবাসী জনগণকেও শাসকবর্গের অবিচারেব কথা জানিয়ে দিয়ে তাদের সঙ্ঘবদ্ধ করার চেষ্টা চলে। দৃঢ় জনমত-গঠন, রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি ও আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য বিভিন্ন শ্রেণী ও জাতির মধ্যে ঐক্যবুদ্ধির উন্মেষ, হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মধ্যে প্রীতিসম্বন্ধ-স্থাপন ও সমসাময়িক আন্দোলনগুলির সঙ্গে জনসাধারণের সংযোগ-সাধন- এই চতুর্ব্বিধ উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতসভা প্রতিষ্ঠিত হ'ল। ইণ্ডিয়ান লীগও নিখিল ভারতীয় উদ্দেশ্য নিয়েই গঠিত হয়, কিন্তু নানা কারণে তার এ উদ্দেশ্য কার্য্যকরী হ'তে পারে নি। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের আদর্শ পূর্ব্বে কতকটা এরূপ ছিল বটে, কিন্তু একে কার্য্যকরী করতে কর্ত্তৃপক্ষ কখনও তৎপর হন নি। পুণার সার্ব্বজনিক সভা ও মাদ্রাজের মহাজনসভা প্রাদেশিক স্বার্থ নিয়েই ব্যস্ত। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা ভারতসভাই সুতরাং নিখিল ভারতীয় উদ্দেশ্যসাধনে অগ্রসর হ'ল। বিপিনচন্দ্রও বলেন, "সুরেন্দ্রনাথের প্রেরণায় ও উদ্যোগে যে ভারতসভার জন্ম হয় তাহাই সর্ব্বপ্রথমে এই প্রাদেশিকতাকে অতিক্রম করিয়া ভারতের রাষ্ট্রীয় চিন্তা ও কর্ম্মকে এক সূত্রে গাঁথিয়া তুলিতে চেষ্টা করে। আজ কংগ্রেস সমগ্র ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় শক্তিকে সংহত করিবার জন্য যে চেষ্টা করিতেছে, চৌত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে সুরেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত ভারতসভাই প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বপ্রথমে সেই চেষ্টার সূত্রপাত করে।"]

ভারতসভার কার্য্যকলাপ

সুরেন্দ্রনাথ বিবিধ যুবসমিতির নেতৃত্ব গ্রহণ ক'রে যুবক সম্প্রদায়ের মনে নূতন আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করতে ইতিপূর্ব্বেই প্রয়াস পেয়েছিলেন। এখন থেকে ভারতসভার মারফত বিশাল ভারতবর্ষের জনশক্তিকে সংহত করতেও উদ্বুদ্ধ হলেন। এসময় এর সুযোগও উপস্থিত হ'ল খুব।

তখন ঘোর রক্ষণশীল ডিস্‌রেলী (লর্ড বেকনস্‌ফিল্ড) বিলাতের প্রধান-মন্ত্রী। তাঁর সময়ে (১৮৭৪-১৮৮০ জুন) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যেমন পুষ্ট হয়, ইতিপূর্ব্বে তেমনটি আর হয় নি। ও-যুগে ব্রিটিশ শক্তির প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল রুশিয়া। ১৮৫৬ সালে ক্রিমিয়া যুদ্ধে ব্রিটেন তুর্কির পক্ষ নিয়ে রুশিয়াকে হারিয়ে দেয়। ১৮৭৬ সালে রুশিয়া তুরস্ক আক্রমণ করলে ব্রিটেন তার পক্ষ নেয় নি। বিজিত তুরস্ক ও বিজয়ী রুশিয়ার মধ্যে যে সন্ধি হ'ল তার ফলে রুশিয়ার পক্ষে পূর্ব্ব-দক্ষিণ ইউরোপ ও ভূমধ্যসাগরে অবাধ গতিবিধির সুবিধা হয়। ব্রিটেন কিন্তু সাম্রাজ্যস্বার্থের জন্য এ সন্ধি স্বীকার করলে না। তখন ১৮৭৮ সালে আবার বার্লিনে বিভিন্ন শক্তি মিলিত হয়ে একটি চুক্তি সম্পাদন করে, রুশিয়াও এতে যোগ দেয়। বিসমার্ক ও ডিস্‌রেলীর চেষ্টায়, রুশিয়ার তুর্কী বিজয় স্বীকৃত হ'লেও সমস্ত সুযোগ-সুবিধা থেকেই তাকে বঞ্চিত করা হয়। রুশিয়া কিছু পূর্ব্ব থেকেই মধ্য এশিয়ায় তার পক্ষপুট বিস্তার করিবার চেষ্টা করে। বার্লিন চুক্তির পর সে এই দিকে অধিকতর নজর দিতে থাকে। একারণ ভারতে ব্রিটিশ নীতির উপর প্রতিক্রিয়া হ'ল ভীষণ। ব্রিটিশের আশঙ্কা, আফগানিস্তানের পথে রুশিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করবে। এজন্য তারা আটঘাট বাঁধতে সুরু করে।

ডিস্‌রেলী ১৮৭৬ সালে মিশরের খেদিবের নিকট থেকে তাঁর সুয়েজ খাল কোম্পানীর বিরাট অংশ সবই ক্রয় করলেন ও সুয়েজ খালের উপর কর্তৃত্ব করতে লাগলেন। এ কারণে ভারতবর্ষে ও প্রাচ্যে যাতায়াতের পথ ব্রিটিশের পক্ষে নিষ্কণ্টক হ'ল। ডিস্‌রেলী রক্ষণশীল প্রধানমন্ত্রী, লর্ড সল্‌স্‌বেরী

রক্ষণশীল ভারতসচিব, আর লর্ড লিটন (প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক লিটনের পুত্র) রক্ষণশীল ভাইস্‌রয়। কাজেই স্বার্থরক্ষার অছিলায় তাঁরা যে ভারতীয় জনমত অগ্রাহ্য করবেন তাতে' আর বিচিত্র কি? ডিস্‌রেলী ১৮৭৬ সালে রাণী ভিক্টোরিয়াকে 'এম্‌প্রেস্‌ অফ্‌ ইণ্ডিয়া,' বা ভারতসম্রাজ্ঞী উপাধি দান করলেন। ইংলণ্ডে যখন রাজক্ষমতা ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হচ্ছে, তখন ভারতবর্ষকে খাস জমিদারীতে পরিণত ক'রে এর উপরে অবাধ স্বৈরশাসন চালালে ব্রিটিশ আদর্শের মূলেই কুঠারাঘাত করা হয়,—তখন এই ব'লে খুবই প্রতিবাদ উঠে। বড়লাট লর্ড লিটনের এসব প্রতিবাদ গ্রাহ্য করার কথা নয়। ১৮৭৭ সালের ১লা জানুয়ারী দিল্লীতে খুব জাঁকাল রকমের এক দরবার অনুষ্ঠান ক'রে তিনি প্রকাশ্যভাবে রাণী ভিক্টোরিয়ার এই উপাধির কথা সাধারণকে জানিয়ে দেন। রাজন্যবর্গকেও নানা উপাধি দেওয়া হ'ল। রাজন্যবর্গ স্বাধীন রাজার তুল্য, তাঁদের উপাধি দান ভারত গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা-বহির্ভূত, এরূপ কথাও তখন কেউ কেউ বললেন। তবে একথাও লোকে বুঝতে পারলে যে, কি ব্রিটিশ ভারত, কি রাজন্য-শাসিত ভারত, সর্ব্বত্র বিটিশ প্রাধান্য মানিয়ে নেওয়াই গবর্ণমেণ্টের মুখ্য উদ্দেশ্য।

ভারতশাসনের 'ইস্পাত কাঠামো' (Steel-frame) সিবিল সার্বিস নিয়ে এ সময়ে ভারতবাসীদের মধ্যে খুব বিক্ষোভ উপস্থিত হ'ল। (১৮৫৩ সালের সনন্দে সিবিল সার্বিস পরীক্ষা প্রতিযোগিতামূলক করা হ'লে প্রতিযোগীদের বয়স অনূর্দ্ধ তেইশ বছরের মধ্যে রাখা স্থির হয়। আরও স্থির হয় যে, প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর ছাত্রদের দু'বছর পড়াশুনা ও শিক্ষানবিসি করতে হবে। ১৮৫৯ সালে পরীক্ষাকালীন বয়স ও শিক্ষানবিসি সময় এক এক বৎসর কমিয়ে যথাক্রমে বাইশ ও এক বৎসর করা হয়। দু'বছর পরে আবার প্রতিযোগীদের বয়স অনূর্দ্ধ একুশ বছরে কমিয়ে শিক্ষানবিসির সময় দু'বছর করা হ'ল। পরীক্ষার নিয়মও ছিল অদ্ভুত। প্রথম থেকেই সংস্কৃত ও আরবি ভাষায় নম্বর ধার্য্য হয় ৩৭৫, আর সে স্থলে গ্রীক ও লাটিনে ধার্য্য হয় ৭৫০। মেকলে এইরূপ ব্যবস্থা ক'রে যান। ১৮৫৯ সালে প্রাচ্য ভাষাগুলির নম্বর বাড়িয়ে ৫০০ করা হ'ল। কিন্তু ১৮৬৩ সালে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হলেই আবার নম্বর পূর্ব্ববৎ কমান হয়। প্রায় দশ বছরের মধ্যে বিলাতের এই পরীক্ষায়

ষোলজন ভারতীয় প্রতিযোগী উপস্থিত হন, কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাড়া আর কেউ ঐ সব কারণে উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হন নি। ১৮৬০ সালে ইণ্ডিয়া কৌন্সিল কমিশন একই সময়ে বিলাতে ও ভারতবর্ষে সিবিল সার্বিস পরীক্ষাগ্রহণের জন্য গবর্ণমেণ্টে সুপারিশ করেন। এ অনুসারে কাজ হয় নি। এজন্য ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে ১৮৭০ সালে এই মর্ম্মে এক আইন পাস হ'ল যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট যাতে ভারতে বসেই যোগ্য ভারতীয়দের সিবিলিয়ানীর অনুরূপ পদে নিযুক্ত করতে পারেন সেজন্য ভারতসচিবের অনুমোদন-সাপেক্ষে তাঁরা যেন নিয়মপত্র রচনা করেন। মোট সিবিলিয়ানী পদের এক-ষষ্ঠাংশে ভারতবাসীর জন্য নির্দ্দিষ্ট ক'রে রাখবারও কথা হ'ল এই আইনে।

ভারতশাসনে ভারতবাসীর অধিকার বরাবর স্বীকৃত হ'লেও কার্য্যতঃ তাকে এ থেকে প্রায় বঞ্চিত করেই রাখা হয়। তথাপি যেটুকু সুবিধা ছিল, ভারত-সচিব লর্ড সল্‌স্‌বেরি তাতেও বাদ সাধলেন। তিনি ১৮৭৬ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী সিবিল সার্বিস পরীক্ষার্থীদের বয়স একুশ থেকে একেবারে উনিশ বছরে কমিয়ে দিলেন। এর ফলে ভারত-সন্তানদের পক্ষে এদেশে শিক্ষা সমাপ্ত ক'রে বিলাতে গিয়ে আই.সি.এস. পরীক্ষা দান অসম্ভব হয়ে পড়ে। ওদিকে ১৮৭০ সালে এদেশে বসেই সিবিলিয়ানীর অনুরূপ পদে ভারতীয় নিয়োগ সম্পর্কে যে আইন বিধিবদ্ধ হয় তা-ও এত দিনে কার্য্যকরী হয় নি। কাজেই দায়িত্বপূর্ণ পদগুলি ভারতবাসীর অনধিগম্য হয়েই রইল। উচ্চ রাজপদে ভারতীয় নিয়োগ ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষের কিরূপ অনভিপ্রেত, ভারতসচিবকে প্রেরিত বড়লাট লর্ড লিটনের একটি গোপনীয় পত্রে তা পরিষ্কার উল্লিখিত হয়। তিনি লেখেন, "ভারতবাসীদের সিবিল সার্বিসে নিয়োগের দাবি পূরণ করা আদবে সম্ভব নয়। কাজেই, তাদের এ দাবি অস্বীকার করা বা তাদের প্রবঞ্চনা করা—এ দুটির একটি পথ বেছে নিতে হবে। আমরা দ্বিতীয়টিই বেছে নিয়েছি। বিলাতে ভারতীয়দের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা এবং প্রতিযোগীদের বয়স হ্রাস করা আইনকে অকেজো করবারই কৌশল মাত্র। এ পত্রখানি গোপনীয়, সুতরাং বলতে আমার বিন্দুমাত্রও দ্বিধা নেই যে, কি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট, কি ভারত গবর্ণমেণ্ট কেউ-ই এ অভিযোগের সন্তোষজনক

জবাব দিতে পারবেন না যে, আমরা মুখে যা অঙ্গীকার করেছি, কাজে তা ষোল আনাই ভঙ্গ করছি!"

ভারতসচিবের উক্ত কার্য্যের প্রতিবাদে ভারতসভার উদ্যোগে কলকাতা টাউন হলে ১৮৭৭ সালের ২৪শে মার্চ্চ তারিখে মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেবের সভাপতিত্বে এক বিরাট জনভার অধিবেশন হয়। শিক্ষিত বাঙালী সমাজ সরকারী নীতিতে এত ক্ষুব্ধ হয়েছিল যে সমাজ ও ধর্ম্মসংস্কারক নেতা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনও সভায় উপস্থিত হয়ে এর কার্য্যে যোগদান না ক'রে পারেন নি। সভার একজন ভারতীয় প্রতিনিধি মারফত একটি সিবিল সার্বিস মেমোরিয়াল বা স্মারকলিপি পার্লামেণ্টে প্রেরণের কথা হ'ল। আরও স্থির হ'ল যে, সুরেন্দ্রনাথ সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ ক'রে সিবিল সার্বিস স্মারকলিপির মর্ম্ম সর্ব্বত্র বুঝিয়ে দেবেন। ভারতসভার কার্য্যের নূতন ধারা অর্থাৎ পার্লামেণ্টে আবেদনপত্র-প্রেরণ ও সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় জনমত-গঠন—দুই-ই এবারে এই প্রথম অনুসৃত হ'ল। একজন প্রতিনিধি মারফত পার্লামেণ্টে আবেদনপত্র পেশ করার মধ্যেও নূতনত্ব ছিল।

সুরেন্দ্রনাথ এই উদ্দেশ্যে মে-জুন মাসে সমগ্র উত্তর ভারত পরিভ্রমণ করলেন। বাঁকিপুর, এলাহাবাদ, আগ্রা, লাহোর, অমৃতসহর দিল্লী, মীরাট, কাণপুর, লক্ষ্ণৌ, আলীগড়, বারাণসী প্রভৃতি স্থানে গেলেন ও জনসভায় সিবিল সার্বিস স্মারকলিপি প্রেরণে সমগ্র শিক্ষিত ভারতবাসীর দায়িত্ব বুঝিয়ে দিলেন। এসময় উত্তর ভারতের বহু বিশিষ্ট জননেতার সঙ্গে তিনি পরিচিত হন। লাহোরে 'ট্রিবিউন' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সর্দ্দার দয়াল সিং মাজিটিয়া ও কালীপ্রসন্ন রায়, আলীগড়ে সার সৈয়দ আহ্‌মদ খাঁ, এলাহাবাদে পণ্ডিত অযোধ্যানাথ, লক্ষ্ণৌতে পণ্ডিত বিশ্বম্ভরনাথ, মামুদাবাদের রাজা আমীর হোসেন, বারাণসীর হিন্দী সাহিত্যসম্রাট বাবু হরিশ্চন্দ্র ও বাবু রামকালী চৌধুরী প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুরেন্দ্রনাথ পরবর্ত্তী শীতকালে (১৮৭৮) ঐ একই উদ্দেশ্যে দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারত পরিভ্রমণ করেন। বোম্বাই, সুরাট, আহ্‌মদাবাদ, পুণা প্রভৃতি শহরেও জনসভার অনুষ্ঠান হয়। বোম্বাইয়ে কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাং, ফিরোজ শা মেহ্‌তা ও পুণায় মহাদেবগোবিন্দ রাণাড়ে এ কার্য্য সমর্থন করলেন। সুরেন্দ্রনাথ মান্দ্রাজ হয়ে কলকাতায়

ফিরলেন। সুরেন্দ্রনাথের পূর্ব্বেও অনেকে ভারত পরিভ্রমণ করেছেন, কিন্তু এবারেই সকল অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে এক অত্যাশ্চর্য্য একপ্রাণতা লক্ষিত হ'ল। সিবিল সার্বিস উপলক্ষ্য ক'রে সকলেই এক অভিনব আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হলেন।

বিলাতে পার্লামেণ্ট সমীপে স্মারকলিপি উপস্থাপিত করবার জন্য ভারত-সভা ব্যারিষ্টার লালমোহন ঘোষকে প্রেরণ করলেন। লালমোহন সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষের অনুজ। সিবিল সার্বিস স্মারকলিপিতে দুটি বিষয়ের উল্লেখ ছিল, এক—সিবিল সার্বিস পরীক্ষার্থীদের উর্দ্ধতম বয়স বাড়িয়ে উনিশ থেকে বাইশ বছর করা, দুই—বিলাতে ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন কেন্দ্রে একই সময়ে সিবিল সার্বিস পরীক্ষা গৃহীত হয়ে উত্তীর্ণ ব্যক্তিদের গুণানুসারে এক তালিকা ভুক্ত করা। লালমোহন বিলাতে নানা স্থানে বক্তৃতা ক'রে সিবিল সার্বিসে ভারতবাসীর প্রতি অবিচারের কথা ইংরেজ জনসাধারণকে বুঝিয়ে দিলেন। পার্লামেণ্ট ভবনে প্রসিদ্ধ বাগ্মী ভারতবন্ধু ও পার্লামেণ্ট-সদস্য জন ব্রাইটের সভাপতিত্বে লালমোহন স্মারকলিপি ব্যাখ্যা ক'রে এক হৃদয়-গ্রাহী বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার ফলে সদস্যগণের ভিতর এত চাঞ্চল্য দেখা গেল যে, ভারতসচিব লর্ড সল্‌স্‌বেরি বক্তৃতা দানের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই ১৮৭০ সালের আইনের নিরিখে রচিত নিয়মপত্রের মুদ্রিত প্রতিলিপি পার্লা-মেণ্টে পেশ করলেন। ভারতসচিব লর্ড সল্‌স্‌বেরির এরূপ কর্ম্মতৎপরতা দেখে তখন অনেকে খুবই বিস্মিত হয়েছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে এতে তখন বিস্মিত হবার কিছুই ছিল না। বিলাতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার সম্মুখীন না হয়ে ভারতবর্ষে বসেই যাতে ভারতীয়কে নিয়োগ করা সম্ভব হয় এ উদ্দেশ্যে পার্লামেণ্টে আইন বিধিবদ্ধ হয় ১৮৭০ সালে, কিছু আগেই এ কথা বলেছি। কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কতখানি আগ্রহান্বিত ছিলেন, প্রায় ন' বছর ধরে টালমাটাল করার মধ্যেই তা সুপ্রকট। ১৮৭৯ সালের মে মাসে বড়লাট ঐ আইন কার্য্যকরী করবার জন্য রচিত নিয়মপত্র ভারতসচিব সল্‌স্‌বেরির নিকট পাঠান। ভারতসচিব নিয়মপত্র গ্রহণ ক'রে ভারত-গবর্ণমেণ্টকে ভারতবাসী নিয়োগের অনুমতি দিলেন। এ সার্বিসের নাম হ'ল ষ্টেট্যুটারী সিবিল সার্বিস। নিয়মপত্রে এর ক্ষমতা 'কাভেনাণ্টেড্' অর্থাৎ প্রতিযোগিতা-

মূলক সিবিল সার্বিসের চেয়ে ঢের সঙ্কীর্ণ করা হ'ল। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, বিভাগীয় কমিশনার, বা গবর্ণমেণ্টের উচ্চ দায়িত্বপূর্ণ পদে এ শ্রেণীর সিবিলিয়ানদের নিয়োগে স্পষ্ট বাধা সৃষ্টি করা হ'ল। তাদের প্রত্যেকের বেতনও উক্ত সিবি-লিয়ানদের দুই-তৃতীয়াংশ ধার্য্য হয়। ছাত্রসভার প্রথম সম্পাদক নন্দকিশোর বসু সর্ব্বপ্রথম এই ষ্টেট্যুটারী সিবিল সার্বিসে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ষ্ট্যাটুটারী সিবিল সার্বিস কিন্তু মোটেই জনপ্রিয় হয় নি।

১৮৭৮-৭৯ সালে ভারত-সরকার আফগানিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। এ যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আগে আমরা কতকটা আঁচ পেয়েছি। রুশিয়াকে ঠেকিয়ে রাখাই ব্রিটিশের উদ্দেশ্য। কিন্তু এ নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ায় ভারতবর্ষে, বিশেষ বাংলা দেশে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ভীষণ আন্দোলন উপস্থিত হয়। পূর্ব্ব বছর ১৮৭৭ সালে, দক্ষিণ ভারতে বোম্বাই, মাদ্রাজ, হায়দ্রাবাদ ও মহীশূরের এলাকাভুক্ত এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে ভীষণ দুর্ভিক্ষ শুরু হয়। দুর্ভিক্ষ দু' বছর চলে। এর ফলে ঐ সব অঞ্চলের অনুমান বায়ান্ন লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সরকারের দুর্ভিক্ষ তহবিলে যে অর্থ ছিল তা দুর্ভিক্ষ নিরাকরণের বদলে আফগান যুদ্ধ পরিচালনায় ব্যয়িত হতে শুরু হয়। এ সম্বন্ধেও ভারত-বাসি-পরিচালিত সংবাদপত্রসমূহে তীব্র সমালোচনা হ'তে থাকে। বাংলা সংবাদপত্রগুলি এর সমালোচনায় অগ্রণী ত হ'লই, উপরন্তু দুর্ভিক্ষের কারণ বিশ্লেষণ ক'রে লোকের আর্থিক দুর্গতি সম্বন্ধে, এবং সরকারের আবগারি ও অন্যান্য আত্মঘাতী নীতি সম্বন্ধেও বিশেষ আলোচনা দিনের পর দিন করতে লাগল। এসব বিষয়ে সরকারের দায়িত্বহীনতা দেখে সংবাদপত্রগুলি কঠোর বাদানুবাদ চালাতে থাকে। পররাজ্য আক্রমণে ভারত গবর্ণমেণ্টের যে নীতি বিচ্যুতি ঘটছে সে কথাও স্মরণ করিয়ে দিতে তারা কসুর করলেন না। সোমপ্রকাশ, সাধারণী, অমৃতবাজার পত্রিকা, চারুমিহির প্রভৃতির নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এসব সমালোচনা রক্ষণশীল কর্ত্তাদের একেবারে অসহ্য হ'ল। তাঁরা এবারে শুদ্ধমাত্র দেশীয় ভাষার সংবাদপত্রগুলির কণ্ঠরোধে বদ্ধপরিকর হলেন। লর্ড লিটন গবর্ণমেণ্ট ও গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণকে সমালোচনার হাত থেকে অব্যাহতি দেবার জন্য ১৮৭৮ সালের ১৪ই মার্চ্চ তারিখে এক দিনের অধিবেশনেই দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হন্তারক ভার্ণাকুলার প্রেস অ্যাক্ট পাস

করিয়ে নিলেন। এর প্রতিবাদে সোমপ্রকাশ, নববিভাকর ও সাধারণী প্রকাশ বন্ধ হ'ল। শিশিরকুমার দোভাষী 'অমৃতবাজার পত্রিকা'কে একরকম রাতারাতিই ইংরেজী সাপ্তাহিকে পরিণত করিলেন।

ভারত-সরকারের শাসন-নীতি, দুর্ভিক্ষ নিরাকরণে অবহেলা ও আফগান যুদ্ধ—এসকলের প্রতিবাদে ভারতবাসি-পরিচালিত সংবাদপত্রসমূহ যখন ঐক্যমত, এবং ভারতসভার চেষ্টায় সমগ্র ভারতের জনমত সংঘবদ্ধ তখন কর্ত্তৃপক্ষের মনে এইরূপ ধারণা হ'ল যে, ভারতবর্ষে এক ব্যাপক বিদ্রোহ আসন্ন। সিপাহী-বিদ্রোহ হয়ে গিয়েছে মাত্র কুড়ি বছর। কাজেই তার স্মৃতি তাঁরা তখনও হয়ত ভুলতে পারেন নি। ভারত-সরকারের এইরূপ ধারণা যে অমূলক, প্রেস আইনের প্রতিবাদে অনুষ্ঠিত জনসভায় সভাপতি পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেন। কিন্তু উক্ত ধারণা সরকারের মনে এতই বদ্ধমূল হয়ে ছিল যে, ভারতবাসীদের ব্যাপকভাবে নিরস্ত্র করার জন্য লর্ড লিটন 'আর্মস্ অ্যাক্ট' বা অস্ত্র আইন নামে আর-একটি আইনও বিধিবদ্ধ করলেন। বিনা লাইসেন্সে অস্ত্রশস্ত্র, এমন কি বন্দুক বা তরবারিটি পর্য্যন্ত রাখা ভারতীয়দের পক্ষে বে-আইনী ঘোষিত হ'ল। শ্বেত-অশ্বেত, খ্যাত-অখ্যাত সকল বিদেশীই অস্ত্রশস্ত্র রাখতে ও ব্যবহার করতে পারবে, কিন্তু ভারতবর্ষের স্থায়ী বাসিন্দা হিন্দু ও মুসলমান এসব রাখলে তা হবে আইনতঃ দণ্ডনীয় অপরাধ! এরূপ আইন বিধিবদ্ধ হওয়ায় শিক্ষিত ভারতীয়ের মন ব্রিটিশের উপর ভীষণ তিক্ত হয়ে উঠল।

ভারতসভা এ দুটি বিষয় নিয়েই জনমতগঠনে প্রবৃত্ত হলেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ও তার মুখপত্র 'হিন্দু পেট্রিয়ট' এই সব প্রতিক্রিয়াশীল আইনের বিরুদ্ধে আশানুরূপ প্রতিবাদ করেন নি, পরন্তু এর কর্ত্তৃস্থানীয় ব্যক্তিরা জনমতগঠন ও জনসভা অনুষ্ঠানের বিরোধী হয়ে পড়লেন। ভারতসভাই অগ্রণী হয়ে কর্ত্তৃপক্ষের ভ্রূকুটি ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বিরোধিতা অগ্রাহ্য ক'রে কলকাতার টাউন হলে পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক জনসভার অনুষ্ঠান করেন। তাঁদের এ প্রতিবাদ-কার্য্যের অনুষ্ঠানের পশ্চাতে যে জনমত প্রবল তা বোম্বাই, কাণপুর ও এলাহাবাদ এসোসিয়েশন, নাগপুর শীতবল্‌দি ক্লাব এবং বাংলা দেশে ভারতসভার আদর্শে প্রতিষ্ঠিত বরিশাল,

বগুড়া, ময়মনসিংহ, সেনহাটি, ভজনঘাটা, মেহেরপুর, কাঁথি, চট্টগ্রাম, ঢাকা ও রাজশাহীর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সমর্থন হতে তা স্পষ্টই বুঝা গেল। এ সবের পক্ষ থেকে ভারতসভা পার্লামেণ্টে প্রেরণের জন্য একখানা প্রতিবাদ-লিপি রচনার ভার নিলেন।

উক্ত আইনগুলি সম্বন্ধে বিলাতে সরকার-বিরোধী দলের মধ্যে ইতিপূর্ব্বেই আলোচনা আরম্ভ হয়। তাই ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের বিরোধী দলের নেতা মিঃ গ্লাডষ্টোনের নিকট ভারতসভার পক্ষ থেকে প্রতিবাদলিপি পাঠান হ'ল। প্রতিবাদপত্র পেয়ে উদারনীতিক দলপতি গ্লাডষ্টোন স্বয়ং পার্লামেণ্টে ভারতে অনুসৃত নীতির তীব্র সমালোচনা শুরু করলেন। ভারতবাসীদের মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ও অস্ত্ররক্ষার অধিকার অন্যায়ভাবে কেড়ে নেওয়া হয়েছে, এ কথাও তিনি বক্তৃতায় উল্লেখ করেন। ১৮৮০ সালে ব্রিটেনে যে সাধারণ নির্ব্বাচন হ'ল তাতে উদারনীতিক দলের নির্ব্বাচনপ্রার্থী সদস্যগণ এবং বিশেষ ক'রে দলপতি মিঃ গ্লাডষ্টোন তাঁর মিডলোথিয়ান নির্ব্বাচকমণ্ডলীতে প্রদত্ত বক্তৃতায় ডিস্‌রেলীর শাসনের প্রতিবাদ করতে গিয়ে ভারতবর্ষে অনুসৃত সরকারী নীতির তীব্র নিন্দা করেন। এ নির্ব্বাচনে ডিস্‌রেলী তথা রক্ষণশীল দল পরাজিত হলেন। উদারনীতিক দল জয়যুক্ত হওয়ায় দলপতি গ্লাডষ্টোন মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। এসময় লর্ড লিটন বেগতিক দেখে পদত্যাগ করেন। তখন গ্লাডষ্টোন উদারচেতা লর্ড রিপণকে ভারতের বড়লাট করে পাঠান। লর্ড রিপণ এদেশে এসে প্রথমেই প্রেস আইন তুলে দিলেন। 'আর্মস অ্যাক্ট' কিন্তু রদ হয় নি।

ভারতসভার কোন মুখপত্র ছিল না। সুরেন্দ্রনাথ ১৮৭৯ সালে নাম মাত্র মূল্যে সাপ্তাহিক 'বেঙ্গলী' পত্রিকার স্বত্ব ক্রয় করে সম্পাদনা শুরু করেন। ভারতসভা পত্রিকার আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণে অক্ষম, এজন্য তিনি নিজেই সব ঝুঁকি মাথায় নিলেন। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' এবং 'বেঙ্গলী' পত্রের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। তিনি ছিলেন সে যুগের একজন বিদ্বান্ ও স্বদেশভক্ত পুরুষ।

ভারতে নবজীবন

রাজনীতি সমগ্র ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে ঐক্যবুদ্ধির উদ্রেক করল বটে, কিন্তু তার উৎসমূলে রস জুগিয়েছেন তিন জন শ্রেষ্ঠ ভারত-সন্তান। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথা আজ কে না জানেন? কেশবচন্দ্র সেনের কথা পূর্ব্বে বলা হয়েছে। স্বামী দয়ানন্দ (১৮২৪-১৮৮৩) আর্য্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা। বেদের অভ্রান্ততা ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা তিনি সর্ব্বত্র প্রচার করেন। তিনিও ছিলেন পৌত্তলিকতার বিরোধী ও সমাজসংস্কারের পক্ষপাতী। তিনি ইংরেজীতে অনভিজ্ঞ ছিলেন। সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা ক'রে ও পুস্তক-পুস্তিকা লিখে তিনি তাঁর মতবাদ প্রচার করতেন। তিনি যোগী, তাঁর যোগলব্ধ অভিজ্ঞতা সাধারণে জেনে আশ্চর্য্য হয়ে গেল। উত্তর ভারতের জনগণ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্ব্বিশেষে, তাঁর কাছ থেকে নূতন-প্রেরণা লাভ করলে। এতদিন হিন্দুধর্ম্মের নিন্দাই চলেছে সর্ব্বত্র। এখন, একজন যোগী সাধু পুরুষের মুখে এর মহিমা-কীর্ত্তন শুনে শিক্ষিত সম্প্রদায়ই বিশেষভাবে উপকৃত হ'ল। যে আত্মবিশ্বাস প্রায় শূন্যে গিয়ে পৌঁছেছিল তা আবার তারা সম্পূর্ণ ফিরে পেলে, এক-ভ্রাতৃত্ব ও এক-জাতীয়ত্ব-সূত্রে পরস্পর গ্রথিত হ'ল। রাজদ্বারে আশা-আকাঙ্ক্ষা-পূরণে ব্যাহত হয়ে শিক্ষিত সম্প্রদায় দয়ানন্দ-প্রতিষ্ঠিত আর্য্যসমাজের ভিতর দিয়ে দেশ ও জাতির মঙ্গলকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করলেন। লালা হংসরাজ, লালা লজপত রায়, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রমুখ আর্য্যসমাজীগণ ভারতের নব জাতিগঠনে যেভাবে নিজেদের বিলিয়ে দিয়েছেন তা সর্ব্বকালেই স্মরণীয়। উত্তর ভারতের সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম্ম সকল বিভাগেই দয়ানন্দের শিক্ষার প্রভাব সুস্পষ্ট।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের (১৮৩৬-১৮৮৬) নিকট এসময় বাঙালী তার মনের কথা নিবেদন করতে ব্যস্ত। উচ্চশিক্ষিত হিন্দু, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান তাঁর অমৃতমধুর বাণী শোনবার জন্য শহরের কর্ম্মকোলাহল

থেকে দক্ষিণেশ্বরের আম্রকাননে নিরালায় ছুটে চলেছে। যে পুরোহিত বা যাজকসম্প্রদায় শিক্ষিত বাঙালীর নিকট প্রায় অর্দ্ধ-শতাব্দী যাবৎ হয়ে রয়েছে অবজ্ঞেয় তাদেরই একজন এই রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। তাঁরই কাছে শিক্ষিত সমাজের ধর্ণা দেওয়া কম বিস্ময়ের বিষয় নয়। কিন্তু এ-ই তখন ঘটেছিল। বাঙালীকে রামকৃষ্ণদেব আশার কথা শোনালেন। পৌত্তলিকতার মত ঘৃণ্য বস্তুও যে ধর্ম্মসাধনের অন্যতম অঙ্গ হতে পারে একথা তিনিই প্রথম শিক্ষিত সমাজকে শোনান। হিন্দু, খ্রীষ্টান বা মুসলমান—সকল ধর্ম্মই সমান পূজ্য, সকল ধর্ম্মেই সমান সত্য নিহিত, তিনি 'নিজে আচরি ধর্ম্ম' পরকে একথা শেখালেন। সকলের প্রতি সকলের, প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেকের প্রেমপূর্ণ ভ্রাতৃভাব-প্রদর্শনে ধর্ম্মের দিক দিয়েও কোন বাধা নেই—পরমহংসদেবের এই বাণী ধর্ম্মবাহুল্য-পীড়িত ভারতবাসীর দেহে বিদ্যুৎ-বেগে শক্তি সঞ্চার করলে। জাতির জীবনে ঐক্যবোধ সৃষ্টিকল্পে শিক্ষিত জনের মহৎ প্রচেষ্টা পরমহংসদেবের মঙ্গল হস্ত-স্পর্শে শুদ্ধ সত্তা লাভ করলে। আস্তিক, নাস্তিক, সংশয়বাদী—পরমহংস-দেবের গৃহদ্বার সকলের নিকট মুক্ত। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, মহেন্দ্রলাল সরকার, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অশ্বিনীকুমার দত্ত—সে যুগের গুণীমানী সকলেই তাঁর গুণ ও শক্তিতে মুগ্ধ। রাজদ্বারে লাঞ্ছিত, আকাঙ্ক্ষাপূরণে অসমর্থ শিক্ষিত সমাজ এই নিরক্ষর গ্রাম্য পুরোহিতের নিকট শক্তির সন্ধান পেলেন। স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) পরমহংসদেবের শিক্ষা রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাধর্ম্মে রূপায়িত করেছেন। আজ কিন্তু উচ্চ-নীচ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্ব্বিশেষে সকলের হৃদয়েই পরমহংসদেবের স্থান দৃঢ়নিবদ্ধ।

কেশবচন্দ্র, দয়ানন্দ, রামকৃষ্ণের শিক্ষায় আশাহত ভারতবাসী যখন আশান্বিত, তার নীরস মন নবরসপ্লুত—এই কল্যাণ মুহূর্ত্তে ভারতসভা নূতন চিন্তা ও কর্ম্মধারা জনসাধারণের নিকটে পরিবেশন করলেন। এতদিন সভার কার্য্য গর্হিত রাজবিধির প্রতিবাদেই সীমাবদ্ধ ছিল, অতঃপর সভা গঠনমূলক কার্য্যে হাত দিলেন। ভারতসভার মূল উদ্দেশ্য—ভারতে

প্রতিনিধিমূলক শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। এজন্য প্রথমেই তাঁরা মিউনিসিপ্যালিটি ও জেলা কমিটিগুলির সংস্কারে অবহিত হন। শহরের স্বাস্থ্য, রাস্তাঘাট প্রভৃতির তত্ত্বাবধানের জন্য মিউনিসিপ্যালিটি অনেক স্থলে আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু এতে কর্তৃত্ব করতেন পদস্থ রাজকর্মচারীরা। জেলা-কমিটিগুলির বয়স তখনও দশ বছর অতিক্রান্ত হয় নি। এর প্রতিষ্ঠার একটু কৌতুকপূর্ণ ইতিহাস আছে। ১৮৬১-৬৫ সালে আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় বিলাতে তুলার অভাব ঘটে। তখন মধ্যপ্রদেশ ও বেরার অঞ্চল থেকে তুলা রপ্তানি আরম্ভ হয়। তুলা রপ্তানির জন্য রাস্তাঘাট-নির্ম্মাণ আবশ্যক। এজন্য ভারত-সরকার নিজ ব্যয়ে প্রথম প্রথম রাস্তানির্ম্মাণে হাত দিলেন। ১৮৭১ সালে তাঁরা একটি আইন বিধিবদ্ধ ক'রে প্রত্যেক জেলার অধিবাসীদের উপর রাস্তাঘাট-নির্ম্মাণের জন্য রোড-সেস বা পথকর নামে একটি নূতন কর বসান। ক্রমে রাস্তাঘাট-নির্ম্মাণ বাদে জনশিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যের ব্যয়ও এ দ্বারা নির্ব্বাহিত হতে থাকে। ডিষ্ট্রিক্ট কমিটি নামে এক কমিটির উপর এসব কার্য্যের ভার পড়ে। এ কমিটির দুই-তৃতীয়াংশই বে-সরকারী সদস্য ছিলেন, কিন্তু তাঁরা সবাই সরকার কর্তৃক মনোনীত হতেন। জেলার শাসনকর্ত্তা কমিটির স্থায়ী সরকারী চেয়ারম্যান বা সভাপতি ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ তথা ভারতসভা এই সব জেলা-কমিটি ও মিউনিসিপ্যালিটি-গুলিকে জনপ্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করবার জন্য এক প্রস্তাব ক'রে ভারত-সরকারের নিকট পাঠালেন। তখন লর্ড রিপণ ভারতের বড়লাট। প্রেস আইন রদ ক'রে তিনি ইতিমধ্যেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। ১৮৮১, অক্টোবর ও ১৮৮২, মে মাসে সপরিষদ বড়লাট জনপ্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের আবশ্যকতা স্বীকার ক'রে এক 'রেজলিউশন' বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এরই ফলে ১৮৮৫ সালে বঙ্গে 'লোক্যাল সেল্ফ্ গবর্ণমেণ্ট অ্যাক্ট' বা স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন আইন পাস হয়ে যায়। আজ বঙ্গদেশে যে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও লোক্যাল বোর্ড বর্ত্তমান তার ভিত্তি ঐ আইনের মধ্যেই নিহিত। সাধারণের ভোটে লোক্যাল বোর্ডের প্রতিনিধি-নির্ব্বাচন ও লোক্যাল বোর্ড কর্তৃক ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সদস্যনির্ব্বাচন-ব্যবস্থা অতঃপর প্রবর্ত্তিত হয়। অবশ্য প্রত্যেক বোর্ডে কয়েকজন ক'রে সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য থাকাও স্থির হয়। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান বা সভাপতি কিন্তু সর্ব্বত্র ১৯১৮ সালের পূর্ব্ব-পর্য্যন্ত বরাবর জেলা

ম্যাজিষ্ট্রেটই ছিলেন। মিউনিসিপ্যালিটিতেও নির্ব্বাচনপ্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু সেখানে চেয়ারম্যান-নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্য থেকেই হতে পারবেন স্থির হয়।

১৮৮৫ সালের প্রজাস্বত্ব আইনের মূলেও ছিলেন লর্ড রিপণ। ক্যানিং ১৮৫৯ সালের দশম আইন দ্বারা প্রজার উপর জমিদারের অধিকারগুলি কিছু কিছু সঙ্কোচ সাধন করেন ও পাট্টা কবুলিয়তের ব্যবস্থা ক'রে প্রজাকে জমির স্বত্বাধিকার দান করেন। কিন্তু কৃষকদের দুঃখকষ্ট এতেও বিশেষ নিবারিত হয় নি। বঙ্গের ছোটলাট সার জর্জ ক্যাম্বেল ১৮৭২ সালে কৃষকদের অবস্থা পর্য্যালোচনা ক'রে গবর্ণমেণ্টে এক মন্তব্যলিপি পেশ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বঙ্গদর্শনে' ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখে কৃষকদের দুরবস্থা ও তা প্রতিকারের উপায়সমূহ সাধারণের গোচরে আনেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, প্রধানতঃ তাঁরই আলোচনার ফলে সরকার কৃষকদের সম্পর্কে আইন করতে অগ্রসর হন। ভারতসভাও প্রজাদের দুঃখদৈন্য মোচনের জন্য নদীয়া, যশোহর, চব্বিশ পরগণা প্রভৃতি জেলার বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে জনসভার অনুষ্ঠান করেন। এ বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন ভারতসভার অন্যতম সহকারী সম্পাদক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ভারতসভা প্রজাস্বত্ব-বিষয়ক আইন সম্বন্ধে সরকারকে এক স্মারকলিপি প্রেরণ করেন। প্রস্তাবিত আইনে এর বহু বিষয় গৃহীত হয়। এ আইনের নাম হ'ল '১৮৮৫ সালের প্রজাস্বত্ব আইন'। জমিতে প্রজার স্বত্ব এবার সুনির্দ্দিষ্ট হ'ল। কোন জমি বার বৎসর একাদিক্রমে ভোগ করলে তাতে যে প্রজার দখলি স্বত্ব জন্মে তা এবারেই স্থির হয়। জমিদারের তরফে প্রজাকে জমির খাজনা-প্রাপ্তির নিদর্শনস্বরূপ দাখিলা দেওয়ার রীতিও এই আইন দ্বারা প্রবর্ত্তিত হ'ল।

কিন্তু ভারতবাসীর নিকট লর্ড রিপণের নাম স্মরণীয় অন্য একটি বিশেষ কারণে। আর এই কারণেই সুরেন্দ্রনাথের ন্যাশনাল কনফারেন্স ও এলান অক্টেভিয়ান হিউমের ন্যাশনাল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা অত আসন্ন হয়ে পড়ে। সার কোর্টনি ইল্‌বার্ট এই সময় ছিলেন বড়লাটের আইনসচিব। বঙ্গের ছোটলাট সার এ্যাস্‌লি ইডেন (১৮৭৭-১৮৮২) কলকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট বিহারীলাল গুপ্তের একখানি পত্র ও পত্রোল্লিখিত বিষয় সম্বন্ধে নিজ অনুকূল

মত লিপিবদ্ধ ক'রে বড়লাটের দপ্তরে প্রেরণ করেন। পত্রের মর্ম্ম ছিল এই যে, ইউরোপীয়দের ফৌজদারী আইনে দণ্ডনীয় অপরাধের বিচারে দেশীয় সিবিলিয়ানদের অক্ষমতা যেন অবিলম্বে দূর করা হয়। পূর্ব্বেকার আইনে ইউরোপীয়দের বিশেষ অধিকারগুলি লোপ করা হয় বটে, কিন্তু তাদের বিচারে দেশীয় বিচারকদের অক্ষমতা বাহালই থেকে যায়। লর্ড রিপণ বিচারে ইত্যাকার বর্ণবৈষম্য বিদূরণের জন্য আইনসচিব সার কোর্টনি ইলবার্টকে দিয়ে ফৌজদারী আইন সংশোধন ক'রে একটি আইনের খসড়া প্রণয়ন করান। এইজন্যই ঐ খসড়া ইলবার্ট বিল নামে পরিচিত হয়েছে। খসড়াটি ১৮৮২, ২রা ফেব্রুয়ারী ব্যবস্থা পরিষদে পেশ করা হ'লে যেন ভীমরুলের চাকে ঢিল ছোঁড়া হ'ল! ভিতরকার সাহেব সভ্যগণ, মায় তখনকার বঙ্গের ছোটলাট সার রিভার্স অগষ্টাস টমসন (১৮৮২-১৮৮৭) এবং বাইরের সওদাগর, আইন-ব্যবসায়ী, সংবাদপত্র-সম্পাদক প্রভৃতি সমগ্র ইউরোপীয় সমাজ একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। ইংরেজগণ লর্ড রিপণকে ব্যক্তিগতভাবে অপমান করতেও দ্বিধা করলে না। ছোটলাট টমসন জ্ঞাতসারেই তাঁকে ধরে জোরপূর্ব্বক বিলাতে পাঠিয়ে দেবারও ষড়যন্ত্র করেছিল। তখন ইউরোপীয় সমাজ আত্মরক্ষার্থ একটা 'ডিফেন্স এসোসিয়েশন'ও গঠন করলে। এই এসোসিয়েশন থেকেই ইউরোপীয়ান এসোসিয়েশনের জন্ম। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এ সময় ইউরোপীয়দের মনোবৃত্তির প্রতি ধিক্কার জানিয়ে কবিতায় লিখলেন,

"গেল রাজ্য, গেল মান, হাঁকিল ইংলিশম্যান
ডাক ছাড়ে ব্রান্‌শন কেণ্ডয়িক, মিলার—
নেটিবের কাছে খাড়া, 'নেভার—নেভার!'
'নেভার' সে অপমান, হতমান বিবিজান,
নেটিবে পাবে সন্ধান আমাদের জানানা?
বিবিজান! দেহে প্রাণ, কখনো তা হবে না॥
হিপ হিপ হিপ হুরে হ্যাট কোট বুট প'রে
সরা ভাবে জগতেরে—তা'দের বিচার,
নেটিবের কাছে হবে? 'নেভার—নেভার!!'"

এই সময় শিক্ষিত-অশিক্ষিত ভারতীয় সমাজ লর্ড রিপণকে তাঁর সাধু সঙ্কল্পের জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করে। গ্রীষ্মাবাস সিমলা থেকে কলকাতা পৌঁছলে তারা তাঁকে হাওড়া থেকে গবর্ণমেণ্ট হাউস পর্য্যন্ত শোভাযাত্রা ক'রে নিয়ে যায়। বেলগাছিয়া উদ্যানে বাঙালীরা সমবেত হয়ে তাঁকে বিশেষভাবে অভিনন্দিত করে। বাঙালী জমিদারশ্রেণী প্রজাস্বত্ব আইনের সূচনাহেতু রিপণের উপর তেমন খুশী ছিল না। এদের সমর্থন না পেলেও ভারতবর্ষের বিশাল জনসমষ্টি ছিল তাঁর পশ্চাতে। তিনি যখন কর্ম্মত্যাগ ক'রে স্বদেশে চলে যান তখন কলকাতা থেকে বোম্বাই পর্য্যন্ত পথিমধ্যে সমস্ত ষ্টেশনে ও শহরে ভারতবাসীরা তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিল। রিপণের এইরূপ জনপ্রিয়তা দেখে 'If it be real, what does it mean?', "এ যদি সত্য হয়, তাহ'লে এর অর্থ কি?" শিরোনামায় একখানা পুস্তিকা লেখেন তৎকালীন রাজস্বসচিব সার অকল্যাণ্ড কল্‌ভিন। তিনি পুস্তিকার একস্থলে লিখতে বাধ্য হলেন, "বিরাট ভারতবর্ষের শুষ্ক অস্থিতে নবজীবনের স্পন্দন অনুভূত হচ্ছে।" যা হোক, ইল্‌বার্ট বিল এক বৎসর পরে ১৮৮৩, ২৮শে জানুয়ারী যে আকারে পাস হ'ল তাতে আগেকার অবস্থার বিশেষ কোন প্রতীকার হ'ল না। ইউরোপীয় আসামী অর্দ্ধেক সংখ্যক ইউরোপীয় জুরি প্রার্থনা করলেই দেশীয় ম্যাজিষ্ট্রেট বা সেসন জজকে তাতে সম্মত হতে হ'ত। জুরির অভাব ঘটলে নিকটবর্ত্তী কোন জেলায়—যেখানে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক জুরি-প্রাপ্তির সম্ভাবনা—বিচারকার্য্য স্থানান্তরিত করার কথা ছিল। এরূপ অবস্থায় দেশীয় বিচারকগণ প্রায়ই ইউরোপীয়দের বিচারভার গ্রহণ করতেন না।

এসময়কার আর একটি ঘটনা যা নিয়ে কাশী কাঞ্চি দ্রাবিড় মথিত হয়ে উঠল—তা হ'ল সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দু'মাস দেওয়ানী জেলে কারাবাস। হাইকোর্টের বিচারপতি নরিস এক মোকদ্দমা বিচারের সময় আদালতে শালগ্রাম শিলা আনিয়েছিলেন। 'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন' পত্রে এর একটি বিবরণ ও সমালোচনা বার হয়। এর উপর নির্ভর ক'রে সুরেন্দ্রনাথও এই নিয়ে তাঁর 'বেঙ্গলী' পত্রে তীব্র সমালোচনা করেন।

আদালত অবমাননার দায়ে ১৮৮৩ সালের ৫ই মে হাইকোর্টের বিচারপতি-মণ্ডলীর সম্মুখে তাঁর বিচার হয় ও বিচারে দোষী সাব্যস্ত হ'য়ে তাঁর ঐরূপ দণ্ডাদেশ হয়। বিচারপতি সার রমেশচন্দ্র মিত্র পূর্ব্ব নজীর উল্লেখ করে সুরেন্দ্রনাথকে কিঞ্চিৎ জরিমানা ক'রে ছেড়ে দেবার পক্ষে রায় দিয়েছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের প্রতি ওরূপ দণ্ডদানে শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলের মধ্যেই তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হ'ল। তাঁর বিলাতিপনা জেনেও হিন্দুধর্ম্মের স্বপক্ষতা করায় হিন্দু সাধারণ তাঁকে আপন ক'রে নিলে। ছাত্রসমাজ একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। তারা বিচারের দিনে একযোগে ধর্ম্মঘট ক'রে হাইকোর্টের প্রাঙ্গণে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। এ বিষয়ে যিনি তাদের নেতৃত্ব করেছিলেন তাঁর নাম আজও ভারতবাসীর প্রাণে অপূর্ব্ব শক্তি দান করছে। তিনি পরবর্ত্তী কালের ভারত-বিখ্যাত সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে এর প্রতিক্রিয়া কম হয় নি। সর্ব্বত্র জনসভায় দণ্ডদানের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাস হ'ল ও সুরেন্দ্রনাথের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করা হ'ল। আনন্দমোহন বসু ১৮৮৩ সালের ভারত-সভার কার্য্যবিবরণীতে এই মর্ম্মে লিখেছেন,

"অশুভ থেকে শুভের উদ্ভব—বাক্যটীর যাথার্থ্য এ ঘটনায় যেরূপ সুষ্ঠুরূপে প্রমাণিত হ'ল এমনটি পূর্ব্বে কখনো হয় নি। এ ব্যাপারটিতে সর্ব্বত্র যতখানি গভীর ক্রোধ ও ক্ষোভের উদ্রেক হয়েছে তাতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন প্রদেশের জনগণ পরস্পরের জন্য বেদনাবোধ করতে শিখেছে এবং ঐক্য ও প্রীতির বন্ধন অতি দ্রুত প্রতিষ্ঠিত হ'তে চলেছে।"

বাস্তবিক, এক দিকে ইলবার্ট বিল নিয়ে ইউরোপীয় সমাজের বিসদৃশ আন্দোলন ও অন্য দিকে সুরেন্দ্রনাথের প্রতি অন্যায় দণ্ডাদেশ এ দুটি কারণে বিভিন্ন অঞ্চলের ভারতবাসীদের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন দৃঢ় হবার বিশেষ সুযোগ ঘটে। আর এই শুভ লক্ষণকে অবিলম্বে বস্তু গত ক'রে তোলবারও চেষ্টা শুরু হয়। এতদিন নিজেদের দীন অবস্থা যদি-বা বুঝতে কিছু বাকি ছিল, এবারে ইলবার্ট বিল আন্দোলনের তীব্রতায় তা সম্যক্ উপলব্ধি হ'ল। ইউরোপীয়েরা প্রকাশ্যে বলতে লাগল, ভারতবাসীরা দাস জাতি ("subject race"), তারা স্বাধীন লোকের অধিকার ("citizen

rights") ভোগের সম্পূর্ণ অযোগ্য! ভারতসভা এতদিন যে আন্দোলন চালান, তার অন্যতম মূল লক্ষ্য ছিল স্বদেশে ভারতীয়দের প্রতিনিধিমূলক শাসনপ্রতিষ্ঠা। কিন্তু এর উপায় তখনও তাঁদের মনে নির্দ্দিষ্ট আকারে দেখা দেয় নি। তবে এজন্য যে একটি স্থায়ী তহবিল বা ধনভাণ্ডার আবশ্যক সে সম্বন্ধে সভা পূর্ব্বে এক প্রস্তাব করেছিলেন। সাপ্তাহিক 'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন' (২১শে জুন ১৮৮৩) একটি জাতীয় ধনভাণ্ডার-প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সুরেন্দ্রনাথ কারাগারে থাকতেই কৃষ্ণনগরের জননায়ক উকীল তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে ও অন্যান্য জননেতাকে পত্র দ্বারা একটি সুন্দর প্রস্তাব ক'রে পাঠালেন। ১৮৮৩, ৪ঠা জুলাই তারিখের 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায়ও এই প্রস্তাব-সম্বলিত তাঁর একখানি পত্র প্রকাশিত হ'ল। পত্রের স্থূল মর্ম্ম এই—প্রতিনিধিমূলক শাসনপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধভাবে আন্দোলন চালান আবশ্যক। সেজন্য দুটি উপায় অবলম্বন প্রয়োজন—প্রথম, একটি ন্যাশনাল এসেম্বলী বা নিখিল ভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগঠন ও দ্বিতীয়, আন্দোলন সুষ্ঠুরূপে পরিচালনার জন্য একটি 'ন্যাশনাল ফণ্ড' বা জাতীয় ভাণ্ডারপ্রতিষ্ঠা। তারাপদ এ দুটিকে অভিন্ন জ্ঞান ক'রে প্রথমটিকে 'পুরুষ' ও দ্বিতীয়টিকে 'প্রকৃতি' আখ্যা দেন। পত্রে একটি পরিকল্পনাও সংক্ষেপে সন্নিবেশিত হয়। ইংলণ্ডবাসীদের ভারতবর্ষের অবস্থা জানাবার জন্য ইংলণ্ডে একজন স্থায়ী প্রতিনিধিরক্ষা, ভারতবাসীদের রাজনৈতিক শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে স্বদেশে এক দল রাজনৈতিক মিশনরী-নিয়োগ (তাঁদের কার্য্য হবে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নানা স্থানে রাষ্ট্রীয় সংঘ, বিপণিসংঘ ও অনুরূপ সংঘপ্রতিষ্ঠা), জাতীয় ব্যবসা ও শিল্পে উৎসাহদান, কার্য্যকরী শিল্প-যন্ত্রের উদ্ভাবক ও নির্ম্মাতাদের এবং শিল্পবিজ্ঞান সম্বন্ধে পুস্তক-পুস্তিকা লেখকদের পদক, পুরস্কার ও সার্টিফিকেট দেওয়ার ব্যবস্থা, আর বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে সদ্ভাবসৃষ্টির চেষ্টা—এসব উদ্দেশ্য নিয়ে উক্ত ন্যাশনাল এসেম্বলী প্রতিষ্ঠা করা হবে।

সুরেন্দ্রনাথ জেল থেকে বেরিয়ে এসেই এ সকল প্রস্তাব শীঘ্র কার্য্যে পরিণত করবার জন্য সচেষ্ট হলেন। বিভিন্ন কেন্দ্রের নেতৃস্থানীয়দের সঙ্গে

পত্র ব্যবহার ক'রে অবিলম্বে একটি ন্যাশনাল কন্‌ফারেন্স বা জাতীয় সম্মেলন-স্থাপনের আবশ্যকতা বুঝিয়ে দিলেন। তাঁদের সম্মতি নিয়ে ভারতসভার আনুকূল্যে কলকাতায় ১৮৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসে একটি ন্যাশনাল কন্‌ফারেন্স আহূত হয়। ২৮শে, ২৯শে ও ৩০শে ডিসেম্বর—এই তিন দিন কলকাতার এলবার্ট হলে এর অধিবেশন হ'ল। প্রথম দিন বর্ষীয়ান্ রামতনু লাহিড়ী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন সভায় পৌরোহিত্য করেন যথাক্রমে কালীমোহন দাশ এবং অন্নদাচরণ খাস্তগীর মহাশয়দ্বয়। সম্মেলনে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় একশ প্রতিনিধি যোগদান করেন। আনন্দমোহন বসু তাঁর উদ্বোধন বক্তৃতায় এই মন্তব্য করলেন যে, ভাবী ন্যাশনাল পার্লামেণ্ট বা জাতীয় পরিষদের এ-ই হ'ল প্রথম স্তর। প্রথম ও পরবর্ত্তী কংগ্রেসে যে-সব বিষয় নিয়ে বার বার আলোচনা হয়েছে, এ সম্মেলনের প্রস্তাবগুলির মধ্যে তারই সূত্র আমরা পাই। প্রতিনিধিমূলক ব্যবস্থাপরিষদ-গঠন, সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষা-ব্যবস্থা, শাসনবিভাগ থেকে বিচারবিভাগ পৃথক করা, সিবিল সার্বিসে ও অন্যান্য উচ্চ রাজপদে অধিক সংখ্যায় ভারতীয় নিয়োগ, জাতীয় ধনভাণ্ডার-স্থাপন, অস্ত্র-আইন রহিতকরণ—এই সব বিষয় নিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কভেনাণ্টেড্ সিবিল সার্বিস সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

পরবর্ত্তী মে মাসে (১৮৮৪) সুরেন্দ্রনাথ পুনরায় ভারতভ্রমণে বার হলেন। বাঁকীপুর, বারাণসী, এলাহাবাদ, কাণপুর, লক্ষ্ণৌ, আলীগড়, আগ্রা, দিল্লী, আম্বালা, রাওয়ালপিণ্ডি, মুলতান, লাহোর—উত্তর ভারতের বহু শহরে তিনি গমন করলেন। পূর্ব্ববারে সিবিল সার্বিসের অব্যবস্থা বিদূরণের জন্যই নানা স্থানে সভাসমিতি অনুষ্ঠিত হয়। এবারেও এ বিষয়টি তাঁর বক্তৃতার অঙ্গ ছিল। তবে এবারকার মূল উদ্দেশ্য ছিল আর-একটি। তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে সুষ্ঠু ও স্থায়িভাবে রাজনৈতিক আন্দোলন চালাবার জন্য একটি জাতীয় ভাণ্ডার স্থাপনের আবশ্যকতার কথা সকলকে বুঝিয়ে দিলেন। এবারে সর্ব্বত্র তিনি অদ্ভুত সাড়া পেলেন। বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষিত জনগণের মধ্যে রাষ্ট্রীয় চেতনা

এত দিনে খুবই জাগ্রত হয়েছে। সিবিল সার্বিসে ভারতীয়দের প্রতি অবিচারের কথা উল্লেখ ক'রে ভারতসভা বড়লাটের মারফত ভারতসচিবের নিকট স্মারকলিপিও প্রেরণ করেন।

১৮৮৫ সালের মাঝামাঝি হেন্‌রী কটন নামে এক সিবিলিয়ান কর্ম্মচারী 'নিউ ইণ্ডিয়া' বা 'নবীন ভারত' পুস্তক লেখেন। বইখানির প্রকাশে ইউরোপীয় ও ভারতীয় উভয় সমাজেই বেশ একটা চাঞ্চল্য উপস্থিত হ'ল। ভাবতবাসীর প্রতি ইউরোপীয়দের বিষম ব্যবহার, সরকারী শোষণনীতি, অবাধ বাণিজ্যনীতির ফলে ভারতীয় শিল্পব্যবসায়ের দুরবস্থা, ভারতীয় রাজস্ব, সরকারী ঋণ প্রভৃতি সম্বন্ধে কটন সাহেব বইখানিতে বিশদ আলোচনা কবেন। তিনি এক স্থলে লেখেন,

"শিক্ষিত সমাজ দেশের কণ্ঠ ও মস্তিষ্ক। শিক্ষিত বাঙালীরা এখন পেশোয়ার থেকে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত জনমত নিয়ন্ত্রিত করছেন। যদিও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের সাধারণ অধিবাসীরা বাঙালীদের চেয়ে শিক্ষায় ও রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্যবোধে অনগ্রসর তথাপি বাঙালীর মতই তারাও শিক্ষিত জনের আদেশ ও নেতৃত্ব মান্য করতে সমান তৎপর। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে এর কোন লক্ষণই দৃষ্টিগোচর হ'ত না। পঞ্জাবে বাঙালী প্রভাব—লর্ড লরেন্স, মণ্টগোমারি, ম্যাকলাউড কখন কল্পনাও করতে পারেন নি। কিন্তু বর্ত্তমানে অবস্থা এমনই যে, গত বৎসর একজন বাঙালী বক্তা ইংরেজীতে বক্তৃতা করতে করতে যখন উত্তর-ভারত পরিভ্রমণ করেন তখন তা কোন বীর পুরুষের দিগ্বিজয় অভিযান ব'লেই ভ্রম হয়েছিল! এখন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ঢাকা থেকে মুলতান পর্য্যন্ত যুবক সম্প্রদায়ের মনে সমান প্রেরণা জাগায়।"

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রসিদ্ধ উপন্যাস 'আনন্দমঠ' ১৮৮২ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত করেন। তাঁর স্বদেশ-ভক্তিমূলক অন্যান্য গ্রন্থ রাজসিংহ, দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম পর পর প্রকাশিত হ'তে থাকে। শিক্ষিত সমাজ সাহিত্যের ভিতর দিয়েও নব চেতনা লাভ করলে। 'আনন্দমঠে' ভারতবাসী সন্তানদল একই কালে মুসলমান ও ইংরেজ শক্তিকে যুদ্ধে হারিয়ে দিতে তৎপর হয়। সন্তানদলের এই কৃতিত্ব বাঙালীর প্রাণে নূতন

আশার সঞ্চার করে। পরবর্ত্তী যুগে সন্তানদের বিখ্যাত 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র জাতীয় সঙ্গীতে পরিণত হয়েছে। মন্ত্রটি এই,

বন্দে মাতরম্
সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং শস্য শ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্
ফুল্লকুসুমিত দ্রুমদলশোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীং সুখদাং বরদাং মাতরম্।

সপ্তকোটিকণ্ঠকলকলনিনাদ করালে,
দ্বিসপ্ত কোটি ভুজৈর্ধৃত খর-করবালে, অবলা কেন মা এত বলে।
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং রিপুদল বারিণীং মাতরম্।

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।

ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী কমলা কমল-দল-বিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং
নমামি কমলাম্ অমলাম্ অতুলাম্ সুজলাং সুফলাং মাতরম্

বন্দে মাতরম্
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং ধরণীং ভরণীং মাতরম্॥

১৮৮৫ সালের ২৫, ২৬ ও ২৭শে ডিসেম্বর কলকাতায় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে বিশেষ জাঁকজমকসহকারে জাতীয় সম্মেলন দ্বিতীয় বার অনুষ্ঠিত হ'ল। ভারতসভার সঙ্গে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন ও সেন্ট্রাল মহম্মডান এসোসিয়েশনও যোগদান করেন। প্রথম বারে কিন্তু এঁরা যোগ দেন নি। এবারকার সম্মেলনে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রতিনিধি এসেছিলেন।

আসাম, এলাহাবাদ, বারাণসী, মীরাট, কৃষ্ণনগর, হুগলী, ভবানীপুর, বৰ্দ্ধমান, ভজনঘাট, সেনহাটী, পাবনা, টাকী, বাগেরহাট, কানাইপুর, রামজীবনপুর, চুঁচুড়া, কটক, কাতাদা, বেরা, বৈদ্যবাটী, রাজশাহী, ব্রাহ্মণবারিয়া, নোয়াখালি, ঘাটাল, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, জঙ্গীপুর, মজঃফরপুর, মহিষাদল, কালনা, ত্রিহুত প্রভৃতি অঞ্চলের জনসভাসমূহ সম্মেলনে প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। বিহার জমিদারসভার পক্ষে দ্বারভাঙ্গার মহারাজা এবং বোম্বাই থেকে ভি. এন্. মাণ্ডলিক সভায় উপস্থিত হন।

এবারকার সম্মেলনেও তিন দিন তিন জন পৌরোহিত্য করেন। প্রথম দিনে সভাপতি হয়েছিলেন দুর্গাচরণ লাহা, দ্বিতীয় দিনে হন জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও তৃতীয় দিনে মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ। প্রথম দিনের অধিবেশনে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জাতীয় সম্মেলনের পরিকল্পনার একটু ইতিবৃত্ত প্রদান করেন। তিনি বলেন যে, ১৮৭৭ সালের দিল্লী দরবার দেখে তখন অনেকের মনে এই কথাই উদিত হয় যে, জাতীয় সমস্যাগুলির আলোচনার জন্য ভারতীয় জননেতাদের নিয়ে এরূপ একটি সম্মেলন হ'লে বিশেষ ভাল হয়। ১৮৮৩ সালের পূর্ব্বে এ বিষয়টি কার্য্যে পরিণত হ'তে পারে নি। ঐ বৎসরে কলকাতায় অনুষ্ঠিত 'ইণ্টারন্যাশনাল একজিবিশন' বা আন্তর্জ্জাতিক প্রদর্শনীর সুযোগ নিয়ে ভারতসভা একটি জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করেন। তদবধি ভারতবর্ষের বহু স্থলে, বোম্বাই, এলাহাবাদ, মাদ্রাজ এবং আজমীরেও এইরূপ সম্মেলন শুরু হয়। বাস্তবিক এই সময় ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই যেন আমাদের জাতীয় উন্নতির জন্য উদ্যোগ-আয়োজনের সাড়া পড়ে যায়।

জাতীয় সম্মেলনের প্রথম বারের অধিবেশনে যে-সব বিষয়ের আলোচনা শুরু হয়েছিল এবারকার অধিবেশনে তা আরও ব্যাপকতর ভাবে আলোচিত হ'ল। ব্যবস্থাপরিষদের পুনর্গঠন সম্বন্ধে প্রথম দিনে সুরেন্দ্রনাথ যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন তার আলোচনায় রাজশাহী, পাবনা, চুঁচুড়া প্রভৃতি অঞ্চলের প্রতিনিধি ব্যতীত হেনরী কটন, কালীমোহন দাশ, অম্বিকাচরণ মজুমদার, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, মাণ্ডলিক প্রমুখ নেতৃবৃন্দও যোগ দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে ইতিকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য সম্মেলনে দারভাঙ্গার

মহারাজা, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, দুর্গাচরণ লাহা, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, আশুতোষ বিশ্বাস, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ উনিশ জন সদস্য নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হ'ল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে অস্ত্র-আইন রহিতকরণ, শাসনব্যয়-হ্রাস, সিবিল সার্বিস প্রশ্ন, শাসনবিভাগ থেকে বিচারবিভাগ স্বতন্ত্রীকরণ, পুলিশ-বিভাগ পুনর্গঠন এবং পার্লামেণ্ট কর্তৃক ভারতশাসন বিষয়ে অনুসন্ধান— ভারতবাসীর পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ এই সকল বিষয় আলোচিত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তাব গৃহীত হয়। এখানে একটি লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, প্রত্যেকটি প্রস্তাবের উপরেই বিভিন্ন অঞ্চলের বহু প্রতিনিধি নিজ নিজ মন্তব্য প্রকাশ করেন। সুরেন্দ্রনাথও অধিকাংশ প্রস্তাবের আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন। বোম্বাই নগরীতে ২৮শে ডিসেম্বর থেকে যে সম্মেলন হওয়ার কথা, তাকে অভিনন্দন জানিয়ে তৃতীয় দিনে অধিবেশন শেষে প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে এই মর্মে এক তার প্রেরণ করা হ'ল,—"কলকাতার সম্মেলনে সমবেত প্রতিনিধিবর্গ বোম্বাইয়ের আসন্ন সম্মেলনের প্রতি গভীর সহানুভূতি জানাচ্ছে।"

কংগ্রেস-যুগ

ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা

পরিকল্পনা

এতক্ষণ পরে আমরা কংগ্রেসের কথায় উপনীত হলাম। ১৮৮৫ সালের ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে কলকাতায় জাতীয় সম্মেলনের অধিবেশন সমাপ্ত হয়। বোম্বাই শহরে নিখিল-ভারতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিয়ে কংগ্রেস বা সম্মেলন উদ্যাপিত হচ্ছে জেনে তার শুভ কামনা ক'রে সম্মেলনের পক্ষে তার প্রেরণের কথা এইমাত্র বলেছি। কংগ্রেসে এই তার পঠিতও হয়েছিল। আনন্দমোহন বসু মহাশয় তখন ভারতসভার কার্য্যে আসাম সফর করছিলেন। তিনিও সাফল্য কামনা ক'রে স্বতন্ত্র-ভাবে কংগ্রেসে এক তার করেন। এ তারও ঐ সভায় পঠিত হ'ল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু প্রমুখ জননেতাদের কিন্তু আগে যথাসময়ে এই জাতীয় কংগ্রেসের বিষয় জানান হয় নি। শেষ মুহূর্ত্তে তাঁরা যখন এ সম্মেলনের কথা জানতে পারলেন তখনই তাতে তাঁদের আন্তরিক সহানুভূতি ও সহযোগিতার কথা ব্যক্ত করলেন। তবে পূর্ব্বে তাঁদের এ বিষয়ে কেন জানান হয় নি সে সম্বন্ধে পরে কিছু বলতে হবে।

বাঙালী মনে নিখিল-ভারতীয় অনুষ্ঠানের কল্পনা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার অন্যূন বিশ বছর পূর্ব্বে জাগ্রত হয়েছিল এবং তা প্রথম রূপ পেয়েছিল হিন্দুমেলার বার্ষিক অধিবেশনের মধ্যে। পরে শিশিরকুমার ঘোষের 'ইণ্ডিয়ান লীগ', সুরেন্দ্রনাথ-আনন্দমোহনের 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' বা ভারতসভা নিখিল-ভারতীয় রাষ্ট্রীয় আলোচনার ধারা অব্যাহত রাখে। ১৮৮৩ ও ১৮৮৫ সালের কলকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় সম্মেলনের মধ্যে কংগ্রেসের স্পষ্ট রূপ আমরা দেখতে পাই। বাংলাদেশে যখন এইরূপ নিখিল-ভারতীয় আদর্শে সম্মিলিতভাবে রাষ্ট্রনীতির আলোচনা শুরু হয়েছে তখন অন্যান্য প্রদেশেও এ উদ্দেশ্যে নানা সভাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হ'তে থাকে। পূর্ব্বে কলকাতার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের একটি শাখা

মাদ্রাজে গঠিত হয়। বোম্বাইয়ে একটি স্বতন্ত্র সভা স্থাপিত হয়েছিল। এ সময় দেখতে পাই, মাদ্রাজে 'মহাজন সভা' স্থানীয় রাজনীতিক কার্য্য-পরিচালনায় রত। বিখ্যাত 'হিন্দু' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা জি সুব্রহ্মণ্য আয়ার মহাজন সভারও প্রতিষ্ঠাতা ও অন্যতম পরিচালক। পুণার সার্ব্বজনিক সভা ১৮৭২ সাল থেকে দক্ষিণ ভারতের সামাজিক ও রাজ-নৈতিক নানা কার্য্যে লিপ্ত হয়। শিশিরকুমার ঘোষ ১৮৭৬ সালে ও অঞ্চল ভ্রমণ করেন। সেখান থেকে ফিরে এসে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় লিখলেন যে, পুণার সার্ব্বজনিক সভা পল্লীগ্রামে অনূ্যন কুড়িটি শালিসী আদালত পরিচালনা করছে। মহাদেবগোবিন্দ রাণাডে সে যুগের একজন সূক্ষ্মদর্শী ও দূরদর্শী রাজনীতিক। তাঁর নাম মহারাষ্ট্রে সুপরিচিত। তিনি ছিলেন এই সার্ব্বজনিক সভার প্রাণ। এই সভার মুখপত্র ছিল একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা। এই সময়ে পুণার মনীষিশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুশাস্ত্রী চিপ্‌লঙ্কার 'নিবন্ধমালা' পত্রিকার ভিতর দিয়ে মারাঠা জাতির প্রাণে নূতন আশার সঞ্চার করতে থাকেন। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক-অনুসৃত নব রাজনীতির মূলে ছিলেন তিনি ও তাঁর 'নিবন্ধমালা'। আগেকার বোম্বাই এসোসিয়েশন বহুদিন নির্জীব অবস্থায় থেকে শেষে একেবারে উঠে যায়। ১৮৮৫ সালের ৩১শে জানুয়ারী সেখানে 'বম্বে প্রেসিডেন্সি এসোসিয়েশন' নামে পুনরায় একটি রাজনৈতিক সভা স্থাপিত হ'ল। সার জামশেঠজী জিজিভাই এর সভাপতি। বদরুদ্দিন তায়েবজী, ফিরোজশা মাঞ্চারজী মেহ্‌তা, দিনশা এডুলজী ওয়াচা ও কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাং তখন বোম্বাইয়ের নেতৃপদে সমাসীন। শেষোক্ত তিন জন ঐ সভার সম্পাদক-পদে বৃত হন। কিন্তু এ সকলই খণ্ড প্রচেষ্টা। এগুলিকে সংহত ক'রে ভারতীয় মহাজাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা ও দাবিসমূহ ব্যক্ত করবার জন্য একটি সম্মিলিত অনুষ্ঠানের প্রয়োজন সর্ব্বত্র বহু দিন থেকেই অনুভূত হয়েছিল। 'থিওসফিক্যাল সোসাইটি' শিক্ষিত সমাজের নিকট অপরিচিত নয়। মাদাম ব্লাভাস্কি এর প্রতিষ্ঠাতা। মাদ্রাজ শহরের আডিয়ার এর প্রধান কেন্দ্রস্থল। সে যুগের গণ্যমান্য বহু লোক এর সভ্য হয়েছিলেন। প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসে তাঁরা এখানে এসে 'কনভেনশন' বা সভা

করতেন। ১৮৮৪ সালে কন্‌ভেনশনের পর মাদ্রাজের রাও বাহাদুর রঘুনাথ রাওয়ের গৃহে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি মিলিত হয়ে প্রস্তাব করেন যে, রাজনীতিক উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতি বছর অনুরূপ সম্মেলন করলে মন্দ হয় না। কিন্তু এই মনোভাবকে সুষ্ঠু রূপ দেবার জন্য একজন মহামনাঃ ব্যক্তির সাহায্য প্রয়োজন হ'ল।

এলান অক্টেভিয়ান হিউমকে অনেকে কংগ্রেসের জনক বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু তিনি নিজেই বলেছেন, এ সম্মান তাঁর একার প্রাপ্য নয়। তবে তিনি যে কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠার মূলে একজন তা আমাদের মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে হবে। হিউম ছিলেন সিবিলিয়ান। তাঁর নিবাস স্কটলণ্ডে। ভারতবর্ষে তিনি বহু দিন সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় তিনি ছিলেন বিদ্রোহের লীলাক্ষেত্র অযোধ্যার এটোয়া জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট। বিদ্রোহের ভয়াবহ দৃশ্য তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। তিনি ১৮৭০-৭৯ সালে ভারত-গবর্ণমেণ্টের দায়িত্বপূর্ণ সেক্রেটারীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। হিউম স্বাধীনচেতা সিবিলিয়ান, উচ্চ কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর খিটিমিটি লেগেই ছিল। বড়লাট লর্ড লিটন তাঁকে একটি প্রদেশের শাসনকর্ত্তৃত্ব-দানের প্রস্তাব করলে ভারতসচিব লর্ড সল্‌স্‌বেরি ঐ ওজুহাতেই তা নাকচ ক'রে দেন। শেষ পর্য্যন্ত আবার ঐ কারণেই তাঁকে সেক্রেটারী পদ থেকে অবনমিত করা হ'ল। রেভিনিউ বোর্ডের কার্য্যে সিমলা থেকে এলাহাবাদে তিনি স্থানান্তরিত হলেন। হিউম একজন বিখ্যাত পক্ষিবিদ্ ছিলেন। ভারতবর্ষের পক্ষিতত্ত্ব আলোচনায় তিনি বিস্তর অর্থ ও সময় ব্যয় করেছেন। এ সম্বন্ধে তাঁর বহু পুস্তকও আছে। সিমলায় তাঁর একটি পক্ষি-চিড়িয়াখানা ছিল। সরকারের কুনজরে পড়ায় তাঁর পক্ষিতত্ত্ব আলোচনায়ও বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে। দীর্ঘ বত্রিশ বছর রাজকার্য্যে নিয়োজিত থেকে ১৮৮২ সালে হিউম অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি সিমলারই বাসিন্দা হলেন।

হিউমের অন্যতম প্রধান 'অপরাধ' ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীকে অন্তরের সহিত ভালবাসা। ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় হীন অবস্থা দেখে তিনি স্থির থাকতে পারতেন না। তাঁর *Old Man's Hope* নামক পুস্তিকায় প্রকাশিত 'Awake' শীর্ষক কবিতাটিতে এ ভাব সুব্যক্ত :

1

Sons of Ind, why sit ye idle,
Wait ye for some Deva's aid ?
Buckle to, be up and doing !
Nations by themselves are made !

2

Are ye serfs or are ye freemen,
Ye that grovel in the shade ?
In your own hands rest the issues !
By themselves are nations made !

3

Ye are taxed, what voice in spending
Have ye when the tax is paid ?
Up ! Protest ! Right triumphs ever !
Nations by themselves are made !

4

Yours the land, lives all, at stake, tho'
Not by you the cards are played ;
Are ye dumb ? speak up and claim them !
By themselves are nations made !

5

What avail your wealth, your learning,
Empty titles, sordid trade ?
True self-rule were worth them all !
Nations by themselves are made !

6

Are ye dazed, or are ye children,
Ye, that crouch, supine, afraid ?
Will your childhood last for ever ?
By themselves are nations made !

7

Whispered murmurs darkly creeping,
Hidden worms beneath the glade,
Not by such shall wrong be righted !
Nations by themselves are made !

8

Do ye suffer ? do ye feel
Degradation ? undismayed?
Face and grapple with your wrongs !
By themselves are nations made !

9

"Ask no help from Heaven or Hell !
In yourselves alone seek aid !
He that wills, and dares, has all ;
Nations by themselves are made !

10

"Sons of Ind, be up and doing,
Let your course by none be stayed,
Lo ! the dawn is in the East ;
By themselves are nations made !"

কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস 'আলোচনা'য় কবিতাটির এইরূপ অনুবাদ করেছেন :

১

অলস হইয়া বসি ভারত সন্তান,
সাহায্য করিছ ভিক্ষা কোন্ দেবতার ?
সাধ কার্য্য—কর সজ্জা—করহ উত্থান,
সংগঠিত হয় জাতি যত্নে আপনার !

২

তোমরা কি চিরদাস অথবা স্বাধীন—
দিশেহারা অন্ধকারে ডুবে চিরদিন ?
তোমাদের(ই) হস্তে ইহা মীমাংসার ভার,
সংগঠিত হয় জাতি যত্নে আপনার !

৩

এই যে বসেছে টেক্‌স, ব্যয়ের সময়
মতামত দিতে পার—আছে অধিকার ?
সত্যের জানিও জয়—জানিও নিশ্চয়,
ওঠ, কর প্রতিবাদ, ভয় কি তোমার ?
সংগঠিত হয় জাতি যত্নে আপনার !

৪

যদিও বিপদাপন্ন সমস্তই হায়
তবু দেশ তোমাদেরি, তোমাদেরি প্রাণ—
সর্ব্বস্বই তোমাদের ; ক্ষমতা কোথায়
সাধিতে অহিত কিংবা করিতে কল্যাণ ?
বোবা কি তোমরা ? সবে চাহ অধিকার
সংগঠিত হয় জাতি যত্নে আপনার !

৫

ঐশ্বর্য্যে কি উপকার ? কোন্ প্রয়োজন
হেন শিক্ষা শূন্যোপাধি নীচ ব্যবসার ?
মূল্যবান ততোধিক স্বায়ত্ত-শাসন ;
সংগঠিত হয় জাতি যত্নে আপনার !

৬

তোমরা কি অন্ধ কিংবা শিশু সমুদয়
হামাগুড়ি দেয় যারা ভয়ে নত ভীত ?
থাকিবে কি চিরকাল শৈশব সময় ?
আপনার যত্নে জাতি হয় সংগঠিত !

৭

কানাকানি আর্ত্তনাদ চলেছে আঁধারে,
হামাগুড়ি দিয়া যায় ক্ষুদ্র কীট চয়,
সাধ্য কি এ অন্যায়ের প্রতিবাদ করে
উপত্যকা তলে যারা লুকাইয়া রয় !
আপনার যত্নে জাতি সংগঠিত হয় !

৮

বোঝ কি এত যে ক্লেশ সহ অবিরাম ?
অপমান অনুভব করে কি হৃদয় ?
কর অন্যায়ের সঙ্গে নির্ভয়ে সংগ্রাম,
আপনার যত্নে জাতি সংগঠিত হয় !

৯

চেয়ো না সাহায্য স্বর্গ নরকের কাছে,
আত্মার ভিতরে খোঁজ সেখানেই আছে,
যে করে সাহস ইচ্ছা সর্ব্বস্ব তাহার
সংগঠিত হয় জাতি যত্নে আপনার !

১০

ভারত সন্তান সবে হও হে জাগ্রত,
হও কার্য্যে অগ্রসর করি প্রাণপণ,
অবাধে কার্য্যের গতি কর প্রবাহিত,
প্রাণান্তে দিও না তাহা রোধিতে কখন।
দেখ পূর্ব্বদিকে চেয়ে অরুণ উদয়,
আপনার যত্নে জাতি সংগঠিত হয় !

হিউম ১৮৮৩ সালের ১লা মার্চ্চ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট-গণকে সম্বোধন ক'রে যে বিখ্যাত পত্র লেখেন তাতেও এই ভাব পরিষ্কার ব্যক্ত হয়েছে। এখানে বলে রাখি, আসাম থেকে পঞ্জাব পর্য্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারত তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকাভুক্ত। ১৮৮৬

সালে পঞ্জাব ও ১৮৮৮ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। হিউম উক্ত পত্রে এই মর্ম্মে বলেন, "তাঁর মত বিদেশীরা ভারতবাসীদের কার্য্যে সাহায্য করতে পারেন মাত্র। কিন্তু স্বদেশহিতকর কার্য্যে, শাসন-ব্যাপারে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় সকলের আগে তাদের অগ্রসর হতে হবে। যদি পঞ্চাশ জন উচ্চশিক্ষিত ভারতবাসী ব্যক্তি-স্বার্থ ভুলে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করেন তাহ'লে তাঁরা অনেক সৎ কার্য্য সাধন করতে পারেন। আর যদি এটুকুও সম্ভব না-হয় তাহ'লে চিরকাল পরের দাসানুদাস হয়ে তাঁদের থাকতেই হবে। তাঁরা যেন সর্ব্বদা স্মরণ রাখেন যে, কি ব্যক্তি কি জাতি সকলেরই সুখ ও স্বাধীনতার পাথেয় হ'ল আত্মত্যাগ ও নিঃস্বার্থপরতা। তাঁদের অদৃষ্টের তাঁরাই নিয়ামক।"

হিউম শিক্ষিত ভারতবাসীকে ঐক্যবদ্ধ ক'রে তাঁদের কর্ম্মপ্রণালী একটি সুনির্দ্দিষ্ট, নিয়মানুগ পথে চালাতে কেন এত উদ্‌গ্রীব হয়েছিলেন সে সম্বন্ধে আমরা অন্য একটি কারণের উল্লেখ অনেক স্থানে পাই। বড়লাট লর্ড লিটনের আমলে ধনী-নির্ধন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেই সরকারের উপর ভীষণ বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠে। তখন ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকেরা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধেরও জল্পনা-কল্পনা করে। দাক্ষিণাত্যে দুর্ভিক্ষের তাড়নায় কৃষক প্রজাদের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয়। সেখানকার 'ফাড্‌কে বিদ্রোহ' আজ ইতিহাস-বিখ্যাত। প্রকাশ, মহারাষ্ট্রে বোম্বাই লাট সার রিচর্ড টেম্পলের মস্তক নেবার জন্য পাঁচ শ' টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল! হিউম ভারত-গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী রূপে এ সকল বিষয় অবগত ছিলেন। বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ সৃষ্টি করতে লোকেরা কিরূপ যত্নশীল, সাত খণ্ড বইতে লিখিত নাম ধাম থেকে হিউম তা জানতে পারেন। এক দিকে নিরক্ষর জনসাধারণ দুর্ভিক্ষের নিষ্পেষণে এসময়ে মরিয়া হয়ে উঠে, অন্য দিকে শিক্ষিত সম্প্রদায় তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে সরকারের ঔদাসীন্য হেতু তাঁদের উপর বিদ্বিষ্ট হয়ে পড়ে। সুতরাং ভারতব্যাপী বিদ্রোহের আশঙ্কা প্রবল হয়। লর্ড রিপণের উদার শাসন-নীতি সকলের সন্তোষ উৎপাদন করল বটে, কিন্তু স্বদেশ-শাসনে ভারতবাসীর দায়িত্ব গ্রাহ্য না হ'লে এ ভাব অধিক দিন স্থায়ী থাকা সম্ভব

নয়। হিউমের মনে সিপাহী বিদ্রোহের কথাও জাগরূক ছিল। সার সৈয়দ আহ্‌মদ বিদ্রোহকালে ইংরেজের প্রভূত সাহায্য করেন। তিনি ১৮৫৮ সালে বিদ্রোহের মধ্যেই এর কারণ বিশ্লেষণ ক'রে একখানা পুস্তিকা লেখেন। কয়েক বছর পরে এর ইংরেজী অনুবাদও প্রকাশিত হয়। তার ভিতর এক স্থানে তিনি লিখেছিলেন, ভারতবর্ষের ব্যবস্থা-পরিষদে কোন ভারতীয় সদস্যের স্থান না থাকায়ই এরূপ বিদ্রোহ সম্ভবপর হয়েছে। ভারত-বাসীর মনোভাব ইংরেজদের জানবার উপায় ছিল না। বিদ্রোহের প্রাক্কালেও ইংরেজ প্রভুগণ এরূপ ব্যাপক বিদ্রোহের সম্ভাবনা সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না। ১৮৭৯ সালে ভারতবর্ষের অবস্থা ঠিক সিপাহী-বিদ্রোহের পূর্ব্বেকার অবস্থার সমতুল্য—হিউম একথা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি প্রথম সুযোগেই ভারতীয় মন থেকে ব্রিটিশ বিদ্বেষ বিদূরণে তৎপর হলেন। কিন্তু এ কার্য্যের প্রধান সহায় স্বদেশ-শাসনে ভারত-বাসীকে ব্রিটিশের সমান অংশী করা। হিউম তাই রাজকার্য্য থেকে অবসর গ্রহণ করবার পরেই ভারতবাসীদের সংঘবদ্ধ করতে তৎপর হয়েছিলেন।

হিউম এই উদ্দেশ্য সম্মুখে রেখে ১৮৮৩ সালের প্রথমেই 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ইউনিয়ন' নামে একটি সংঘ স্থাপন করেন। তিনি এর কর্ত্তব্য তিন ভাগে ভাগ করলেন। পরে তিনি কংগ্রেসের উদ্দেশ্যও ঠিক এইরূপ বর্ণনা করেন। প্রথম, ভারতবর্ষের অধিবাসীদের পৃথক পৃথক অংশকে একটি অখণ্ড সম্পূর্ণ জাতিতে সম্মিলিত করা; দ্বিতীয়, এরূপ সম্মিলিত জাতিকে আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক সকল দিকেই পুনরুজ্জীবিত করা; তৃতীয়, ভারতবর্ষের অধিবাসীদের প্রতি প্রযোজ্য যে-সব আইন, নিয়ম বা বিধি অন্যায় ও ক্ষতিকর তা দূর ক'রে ইংলণ্ডের সঙ্গে তাদের সখ্যভাব দৃঢ় করা। হিউমের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে করাচী, আহ্‌মদাবাদ, সুরাট, বোম্বাই, পুণা, মাদ্রাজ, কলকাতা, বারাণসী, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা ও লাহোরে সিলেক্ট কমিটি গঠিত হ'ল। তিনি ঐ বছরের শেষে পুনরায় একটি সম্মেলন আহ্বানেরও পক্ষপাতী ছিলেন।

সম্মেলন হতে কিন্তু দু' বছরের বেশী সময় লাগে। বোম্বাইয়ের কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাং সুরেন্দ্রনাথের নিকট থেকে কলকাতা সম্মেলনের কার্য্য-বিবরণ চেয়ে নেন—সুরেন্দ্রনাথ বলেছেন। ১৮৮৫ সালের মার্চ্চ

মাসে প্রস্তাবিত সম্মেলন সম্পর্কে এক বিবৃতি নানা স্থানের নেতৃবর্গের নিকট প্রেরিত হয়। যে-সব কর্ম্মী ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে জাতির উন্নতিমূলক কার্য্যে নিয়োজিত তাদের পরস্পরের ভিতর ভাব-বিনিময় এবং আগামী বৎসরে করণীয় রাজনীতিক বিষয়গুলির আলোচনা ও সিদ্ধান্ত এ সম্মেলনের উদ্দেশ্য ব'লে বিজ্ঞাপিত হ'ল। হিউম অতঃপর অল্পদিনের জন্য বিলাত যান ও এ বিষয়ে লর্ড রিপণ, জন ব্রাইট, প্রভৃতি ভারত-বন্ধুদের পরামর্শ নেন। পার্লামেণ্টে ভারতীয় পক্ষের কথা যাতে ব্যক্ত হ'তে পারে তারও ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করলেন। পরে যে ইণ্ডিয়ান পার্লামেণ্টারী কমিটি গঠিত হয় তার সূত্র এর ভিতরেই পাই। তখন হাউস অফ্ কমন্সে ভারতসচিবই ছিলেন ভারতের একমাত্র মুখপাত্র, তাঁর কথাই এতদিন পার্লামেণ্টের সভ্যগণ বেদবাক্য ব'লে মেনে নিতেন। কিন্তু ভারতসচিবের মারফত শুধু ভারত-সরকারের মতামতই ব্যক্ত হ'ত। ভারতীয় জন-সাধারণের কথা তাঁদের অজ্ঞাতই থেকে যেত। হিউম আর-একটি ব্যবস্থা করলেন যার প্রয়োজনীয়তা এখনও খুব বেশী। রয়টার এবং ইংলণ্ডের পত্রিকাগুলির ভারতস্থিত সংবাদদাতারা ইংরেজ পক্ষের কথাই বেশী ক'রে সরবরাহ করতেন। হিউম 'ইণ্ডিয়ান টেলিগ্রাফ ইউনিয়ন' নামে একটি ভারতীয় সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান গঠন করলেন এবং লণ্ডনের ও প্রাদেশিক পত্রিকাগুলির সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠান-প্রদত্ত সংবাদমুদ্রণের ব্যবস্থা করলেন। এ প্রতিষ্ঠান অল্প দিন মাত্র স্থায়ী ছিল।

হিউম ভারতবর্ষে ফিরে বড়লাট লর্ড ডাফরিনের সঙ্গেও এ বিষয়ে পরামর্শ করলেন। তাঁর সঙ্গে পরামর্শের ফলেই যে সম্মেলনের উদ্দেশ্য ব্যাপকতর করা হয় তার প্রমাণ আছে। হিউম প্রথমে সম্মেলনকে মূলতঃ একটি সামাজিক অনুষ্ঠান ক'রেই গড়তে চেয়েছিলেন। পার্লামেণ্টে যেমন একটি সরকার-বিরোধী দল থাকে, এখানে জনসাধারণের মতামত অবগতির জন্য লর্ড ডাফরিন একে সেইরূপ আইনানুগ একটি সরকার-বিরোধী দল হিসাবেই দেখতে চান। হিউম এ কথার সারবত্তা বুঝে বন্ধুবর্গকে এ সম্বন্ধে লিখলেন। তাঁরা এতে সম্মতি দেওয়ায় সম্মেলনে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে রাজনীতির আলোচনাকেও প্রাধান্য দেওয়া স্থির

হ'ল। কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, হিউম বোম্বাইয়ের গবর্ণরকে এর সভাপতি করতে চেয়েছিলেন. কিন্তু এরূপ হ'লে প্রতিনিধিদের স্বাধীন মতামত প্রকাশে বিঘ্ন ঘটবে—এজন্য লর্ড ডাফরিন হিউমকে ঐরূপ অভিপ্রায়ও ত্যাগ করতে বলেন। এই লর্ড ডাফরিনই কিন্তু তাঁর আমলের শেষের দিকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। এ কথা পরে বলব। ঐ সময় লর্ড ডাফরিন হিউমকে বলেছিলেন, তাঁর ভারতবর্ষে অবস্থানকালে এ পরামর্শের কথা যেন সাধারণ্যে প্রকাশ না পায়। শেষের দিকে ডাফরিনের ব্যবহারে তিত-বিরক্ত হ'লেও হিউম বা তাঁর বন্ধুবর্গ কখনো একথা প্রকাশ করেন নি।

প্রথম অধিবেশন

কংগ্রেস নামটি আজকাল আমাদের বড় প্রিয়। 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ইউনিয়নই' কিন্তু এর অগ্রজ—একথা হয়ত অনেকে জানেন না। বোম্বাইয়ে সম্মেলন আরম্ভের কয়েক দিন মাত্র পূর্ব্বে কংগ্রেস নামটি গৃহীত হয়। এই কংগ্রেস পুণায় ২৫শে থেকে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত হবে স্থির হয়েছিল। কিন্তু সেখানে ঐ সময় কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় বোম্বাই শহরে অধিবেশন স্থানান্তরিত করা হয় ও ২৮শে তারিখ থেকে অধিবেশন আরম্ভ হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল হ'তে মোট বাহাত্তর জন প্রতিনিধি কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে যোগদান করেন। কলকাতা, কাশী, এলাহাবাদ, লাহোর, বোম্বাই, পুণা, সুরাট, আহ্‌মদাবাদ, করাচী, মাদ্রাজ ও মফস্বলের নানা অঞ্চল থেকে প্রতিনিধি আগমন করেন। মাদ্রাজের মহাজন সভা, পুণার সার্ব্বজনিক সভা, বোম্বাই এসোসিয়েশন, সুরাটের প্রজা হিতবর্দ্ধক সভার কর্ত্তৃপক্ষ এসে যোগ দিলেন। হিন্দু, ট্রিবিউন, ইন্দুপ্রকাশ, মরাঠা, কেশরী, জ্ঞান-প্রকাশ, ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন, ইণ্ডিয়ান মিরর, নববিভাকর প্রভৃতি সংবাদ-পত্রের সম্পাদক ও প্রতিনিধিরা উপস্থিত হলেন। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে পুণার সার্ব্বজনিক সভার সভাপতি কৃষ্ণজী লক্ষ্মণ নুলকা, এর

অবৈতনিক সম্পাদক সীতারাম হরি চিপলঙ্কর, ফার্গুসন কলেজের অধ্যক্ষ বামন শিবরাম আপ্টে, 'মরাঠা' ও 'কেশরী'র সম্পাদক গোপালগণেশ আগারকর, কলকাতার লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ডবলিউ সি. বানার্জ্জী নামে বেশী পরিচিত), 'ইণ্ডিয়ান মিরর'-সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন, 'নববিভাকর'-সম্পাদক উকীল গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায়, এলাহাবাদের 'ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন'-সম্পাদক জানকীনাথ ঘোষাল, স্বনামধন্য দাদাভাই নৌরজী, ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাং, বোম্বাই করপোরেশনের চেয়ারম্যান ফিরোজশাহ্ মাঞ্চারজী মেহ্তা, দীন্‌শা এদুলজী ওয়াচা, 'ইন্দুপ্রকাশ'-সম্পাদক নারায়ণগণেশ চন্দ্রাবরকর, মাদ্রাজের মহাজন সভার সভাপতি পি রাঙ্গিয়া নাইডু, ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য এস. সুব্রহ্মণ্য আয়ার, পি. আনন্দ চার্লু, 'হিন্দু'র সম্পাদক জি সুব্রহ্মণ্য আয়ার, 'হিন্দু'র সহ-সম্পাদক ও মহাজন সভার সেক্রেটারী এম্. বীররাঘব আচার্য্য প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু উপস্থিত প্রতিনিধিদের ভিতর কলকাতার সুবিখ্যাত-'অমৃত-বাজার পত্রিকা'র শিশিরকুমার ঘোষ ও মতিলাল ঘোষ বা বহু পুরাতন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বা ভারতসভার প্রসিদ্ধ কর্ম্মী ও বক্তা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসুর নাম কেন পাই না জানতে স্বভাবতঃ আগ্রহ জন্মে, বিশেষতঃ পর বছরে কলকাতা অধিবেশন যখন এঁরাই অগ্রণী হয়ে সুসম্পন্ন করেছিলেন। হিউমের সহযোগিগণ এঁদের নামের সঙ্গেও নিশ্চয়ই পরিচিত ছিলেন। সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ই বা পূর্ব্বে না জানিয়ে বোম্বাই রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে মাত্র সুরেন্দ্রনাথকে কংগ্রেসের কথা জানালেন কেন? এ বিষয় জানতেও কম কৌতূহল হয় না। বাংলা বা কলকাতা থেকে যে উপযুক্তসংখ্যক প্রতিনিধি কংগ্রেসে যোগদান করেন নি এ কথা উমেশচন্দ্র সভাপতির প্রারম্ভিক ও সর্ব্বশেষ বক্তৃতায় উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু এর কারণ স্বরূপ তিনি বলেছেন, মৃত্যু ও অন্যান্য আকস্মিক ঘটনার জন্যই এ সম্ভব হয় নি। 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-সম্পাদক, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের অন্যতম পরিচালক কৃষ্ণদাস পাল এবং সুপণ্ডিত ডক্টর কৃষ্ণমোহন

বন্দ্যোপাধ্যায় এ বৎসর মারা যান। অন্যদের কেন যথাসময়ে আহ্বান করা হয় নি এতদিন পরে তার একটি মাত্র কারণ আমাদের নিকট ধরা পড়ে। বিপিনচন্দ্র পাল কোন কোন স্থানে এর ইঙ্গিতও করেছেন। শিশিরকুমার ঘোষ, আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন প্রগতিবাদী রাজনীতিক। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' রাজদ্রোহপ্রচারে লিপ্ত —এই অপবাদ ইউরোপীয় মহলে সর্ব্বদা ব্যক্ত হ'ত। সুরেন্দ্রনাথ সিবিল সার্বিস থেকে বিতাড়িত হয়ে যেভাবে জনসেবায় নিয়োজিত, তাতে তিনি সরকারী মহলে বিশেষ প্রশংসা দাবি করতে পারতেন না। উপরন্তু ইতিপূর্ব্বে জনসেবার জন্য তিনি কারাদণ্ডও ভোগ করেছেন। হিউম বা কংগ্রেসের অন্যান্য অনুষ্ঠাতারা ভারতবর্ষের মঙ্গল সাধন করতে চান বটে, কিন্তু তা ধীরে সুস্থে বিবেচনা ক'রে ও যতদূর সম্ভব সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা বজায় রেখে। এ দুটি কারণই হয়ত তাঁদের নিমন্ত্রণ করায় বিঘ্ন স্বরূপ হয়েছিল। তবে সভায় যে-সব প্রস্তাব পাস হয় এবং তার সমর্থনে যে-সব বক্তৃতা দেওয়া হয় তাতে কিন্তু রাজভক্তির প্রস্রবণ বয় নি। বক্তাবিশেষ রাজানুগত্য-প্রীতি দেখালেও অধিকাংশ বক্তৃতাই ছিল সরকারী নীতির তীব্র সমালোচনায় ভরপুর।

যা হোক, প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হ'লে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্যবিবৃতির নিরিখে তাঁর বক্তব্য স্বল্প কথায় ব্যক্ত করেন। এ অধিবেশনের প্রস্তাবসমূহে ও তার উপরে প্রদত্ত বক্তৃতায় শিক্ষিত ভারতবাসীর এতকালের অব্যক্ত ও অবরুদ্ধ মনোভাব কথায় সাধারণের নিকট প্রকাশ পেল। তাঁরা স্বদেশ ও স্বজাতির উন্নতিচিন্তায় কিরূপ অগ্রসর তাও সম্যক বুঝা গেল। পরবর্ত্তী কুড়ি-একুশ বছর পর্য্যন্ত কংগ্রেস কিঞ্চিৎ অদল-বদল ও সংযোগ-বিয়োগ ক'রে এই সকল প্রস্তাব ও দাবি কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পেশ করেছেন। এজন্য সংক্ষেপে হ'লেও এগুলির উল্লেখ করা প্রয়োজন।

প্রথম প্রস্তাব উত্থাপন করেন 'হিন্দু'-সম্পাদক জি. সুব্রহ্মণ্য আয়ার। রয়াল কমিশন দ্বারা ভারত-শাসন সম্পর্কে অনুসন্ধানের দাবি করা হয় এ প্রস্তাবে। পার্লামেণ্ট উপযুক্তসংখ্যক ভারতীয় ও ইউরোপীয় নিয়ে

কমিশন গঠন করবেন এবং ভারতে ও ইংলণ্ডে এ সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন। সুব্রহ্মণ্য আয়ার মহাশয় বক্তৃতায় এই মর্ম্মে বলেন, "কোম্পানীর আমলে পার্লামেণ্ট প্রতি বিশ বছর অন্তর ভারত-শাসন সম্পর্কে খুঁটিনাটি তদন্ত করতেন। ১৭৭৩, ১৭৯৩, ১৮১৩, ১৮৩৩ ও ১৮৫৩ সালে এইরূপ ব্যাপক ও বিস্তৃত তদন্ত হয়েছিল। কিন্তু গত বত্রিশ বছরের মধ্যে পার্লামেণ্ট এসম্বন্ধে কোনই তদন্তের ব্যবস্থা করেন নি। ফলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ও আমলাতন্ত্র যথেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছে। কোম্পানীর আমল ও বর্ত্তমান আমলের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করলে নিশ্চয়ই বলতে হবে, বহু বিষয়ে ভারতবাসীরা বর্ত্তমানে লাভবান্ না হয়ে ক্ষতিগ্রস্তই হচ্ছে। পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক শাসনভার-গ্রহণের পর থেকে ভারতবাসীর অবস্থা হয়ে পড়েছে ভীষণ মন্দ। পূর্ব্বে লোকের দুঃখদৈন্যে শাসকগণের যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল। এখন সে সহানুভূতি আর নেই, তার পরিবর্ত্তে কঠোরতাই এখন সুপ্রকট। গবর্ণমেণ্টের শাসনব্যয় ও ঋণভার অত্যধিক। কিন্তু সে অনুপাতে আয়েব পন্থা মোটেই আশানুরূপ বাড়ে নি।

দ্বিতীয় প্রস্তাবে শাসন-সংস্কারের প্রথম ধাপ হিসাবে সর্ব্বপ্রথম 'ইণ্ডিয়া কৌন্সিল' নামে ভারতসচিবের পরিষদ তুলে দেওয়ার দাবি করা হয়। এ কৌন্সিলের কথা আগে বলেছি। এর অধিকাংশ সভ্য ভারতের অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ সিবিলিয়ান। তারা ভারতের নিমক খেলেও ভারতবাসীর শাসনাধিকারের ঘোর বিরোধী ছিল। ভারতবাসীরা চিরকাল তাদের অধীন থাকবে—এইরূপ মনোবৃত্তি দ্বারাই তারা চালিত হ'ত। সুতরাং তারা প্রতিপদে ভারতবর্ষের ও ভারতবাসীর উন্নতিমূলক কার্য্যেরই বিঘ্ন জন্মাত। এ কৌন্সিল রাখবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। উপনিবেশ-সচিবের কোন স্বতন্ত্র কৌন্সিল নেই। ভারতের ঘরের দুয়ারে ক্ষুদ্র দ্বীপ সিংহল। সিংহলবাসীরাও ব্যবস্থা-পরিষদের মারফত দেশের বাৎসরিক আয়ব্যয়-নির্দ্ধারণে ও আইন-প্রণয়নে নিজেদের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারত, আর ভারতবাসীরা এ অধিকার থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত! ইণ্ডিয়া কৌন্সিলের সদস্যরা তাদের এ অধিকারে বাদ সাধে। নিজ সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে—যেমন, আবিসিনিয়া অভিযান, মিশরীয় অভিযান,

এমন কি লণ্ডনে তুর্কী সুলতানের অভ্যর্থনাকার্য্যেও ভারতীয় রাজকোষ থেকে অর্থব্যয়—ইণ্ডিয়া কৌন্সিল এসব ব্যাপারে টুঁ শব্দটিও করে নি, বরং সায়ই দিয়েছে। ভারতবন্ধু পার্লামেণ্ট-সদস্য মিঃ ফসেট এ নিয়ে পার্লামেণ্টে ও বাইরে বহুবার প্রতিবাদ করেছেন। এখানে বলে রাখি, সিবিল সার্বিস পরীক্ষা সম্পর্কে ভারতীয়দের প্রতি অবিচার দূরীকরণেও তিনি বিশেষ প্রয়াসী হয়েছিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নি। বিলাতে পার্লামেণ্ট নামে কর্ত্তা হলেও ভারতসচিব ও তাঁর পরিষদ কার্য্যতঃ ভারত-শাসনের কলকাঠি নিয়ত নাড়াতেন।

তৃতীয় প্রস্তাবটি ছিল দেশের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেশের শাসন-কর্ত্তৃত্ব পরিচালনের মূল হ'ল এখানে। কংগ্রেস বহুকাল এ নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে তবে কতকটা কৃতকার্য্য হয়েছিলেন। ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাং প্রস্তাব করলেন যে, নিখিল-ভারতীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদগুলির সংস্কার সাধন ক'রে ভারতীয় প্রতিনিধি-সংখ্যা মোট সদস্যের অন্ততঃ অর্দ্ধেক এবং ভারতীয় রাজস্বের আয়ব্যয় বরাদ্দ ও আইন-প্রণয়নাদি অধিকাংশ সদস্যের মতানুযায়ী করা হোক, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যা (আগ্রা-অযোধ্যা সংযুক্ত প্রদেশের নাম পরবর্ত্তী কালের দেওয়া) এবং পঞ্জাবে শাসনপরিষদ প্রতিষ্ঠিত হোক, আর পার্লামেণ্টে একটি ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি গঠন করা হোক। ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তৃপক্ষ পরিষদের অধিকাংশ সদস্যের দ্বারা গৃহীত প্রস্তাব বা সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্য্য না করলে এই কমিটি সে সম্বন্ধে অভিযোগ শুনবেন ও যথা কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত করবেন। আমরা পূর্ব্বেই ১৮৬১ সালের ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ আইনের বিষয় অবগত হয়েছি। পঁয়ত্রিশ বছর পরেও এ আইনের কোনরূপ সংশোধন বা পরিবর্ত্তন হয় নি। ভারতবাসী শিক্ষাদীক্ষায় এই দীর্ঘকালের ভিতর খুবই অগ্রসর হলেও দেশ-শাসনে তার অধিকার বরাবরই অগ্রাহ্য হয়ে এসেছে। পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশেও ব্যবস্থা-পরিষদ প্রবর্ত্তিত হয় নি এই সময়ের ভিতর। এ সময় থেকে যে আন্দোলন সুরু হ'ল তার ফলে অবশ্য উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ১৮৮৬ সালে ও পঞ্জাবে ১৮৯৭ সালে ১৮৬১ সালের আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা-পরিষদ গঠিত হয়। দেশ-শাসনে স্বদেশবাসীদের

অধিকার ও দায়িত্ব বরাবর অস্বীকৃত হ'লেও ভারতসচিবের কর্ত্তৃত্ব আশাতীত রকম বেড়েই যায়। তেলাং মহাশয় বলেন, "ভারতসচিব ভারতবর্ষের সত্যকার স্বৈরাচারী মোগল সম্রাট! তাঁর ইচ্ছাই আইন। বর্ত্তমান প্রাদেশিক ও নিখিল-ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদগুলি সবই শাসকবর্গের স্বৈরাচার আইনসঙ্গত করিয়ে নেবার একটা ফন্দি ও আইনানুগ শাসনের মুখোস। ভারতের শাসনকেন্দ্র লণ্ডন থেকে ভারতবর্ষে নিয়ে আসা চাই। নির্ব্বাচন-পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়, বণিক্‌সভা, মিউনিসিপালিটি ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডকে সদস্য নির্ব্বাচনের অধিকার দিলে সুফল ফলবে। সভাপতি উমেশচন্দ্র এ প্রস্তাব সম্পর্কে বলেন যে, তাঁরা একদিন এমন শাসনতন্ত্র লাভ করবেন, যা হবে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনের তুল্য। ব্যবস্থা-পরিষদ থেকে মন্ত্রিসভা গঠিত হবে, আর এর নিকটই মন্ত্রিসভা সব বিষয়ে দায়ী থাকবেন।"

চতুর্থ প্রস্তাবে স্বদেশপ্রাণ দাদাভাই নৌরজী সিবিল সার্বিস সম্পর্কে ভারতবাসীর অসুবিধার কথা উল্লেখ করেন এবং এই দাবি পেশ করেন যে, ১৮৬০ সালের ইণ্ডিয়া আফিস কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বিলাতে ও ভারতবর্ষে একই সময়ে পরীক্ষা গৃহীত হোক ও পরীক্ষার্থীদের উচ্চতম বয়স বাড়িয়ে উনিশ স্থলে তেইশ বছর করা হোক। সিবিল সার্বিস থেকে ভারতীয়দের দূরে সরিয়ে রাখবার চেষ্টা চলেছিল খুব। ষ্টেটুটারী সিবিল সার্বিস নামে যে একটি বিশেষ শ্রেণীর চাকরি সৃষ্টি হয়েছিল তাতে সিবিলিয়ানদের সমান পদমর্য্যাদা লাভ বা উচ্চতম দায়িত্বপূর্ণ পদে স্বাভাবিক নিয়মে উন্নয়ন অসম্ভব ছিল। এজন্য এ ব্যবস্থা অপ্রিয় হয়ে উঠে ও এর বিরুদ্ধেও তীব্র প্রতিবাদ হতে থাকে। দাদাভাই ভারতবাসীর আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে গবেষণা ক'রে ইতিপূর্ব্বে যশস্বী হয়েছেন। তিনি বক্তৃতায় দেখালেন যে, যখন ইংলণ্ডে মাথা পিছু গড়ে বার্ষিক আয় ৪৯৫ টাকা, ফ্রান্সে ৩৪৫ টাকা, এমন কি অনুন্নত তুরস্কেও ৬০ টাকা, তখন ভারতবর্ষে মাথা পিছু গড় আয় বার্ষিক মাত্র ২৭ টাকা। আর জমিদার, ধনী, খনি ও কারখানার মালিক, মোটা মাইনের চাকরে ইত্যাদির আয় বাদ দিলে সাধারণ ভারতবাসীর গড় আয় বছরে ২০৲ টাকায় গিয়ে

দাঁড়ায়। ভারতবাসীর দারিদ্র্যের অন্যতম প্রধান কারণ, বিদেশী শাসক-বর্গের বেতন, ভাতা, পেন্সন বাবদে প্রতি বছর বহু কোটি টাকা ভারতবর্ষ থেকে বিলাতে চলে যায়। বাট্টার হার ইংলণ্ডের সুবিধামত নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় আরও তাদের শতকরা পঁচিশ টাকা বেশী দিতে হচ্ছে বহু বছর থেকে। দাদাভাই সুতরাং বললেন, "বিদেশীকে প্রদত্ত প্রতিটি পাই পয়সা ভারতবর্ষের পক্ষে বিষম আর্থিক ক্ষতি, ভারতবাসীকে প্রদত্ত প্রতিটি পাই পয়সা দেশের পক্ষে সম্পূর্ণ আর্থিক লাভ।"

বঙ্গদেশাগত 'নব বিভাকর'-সম্পাদক গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায় দাদাভাইয়ের প্রস্তাব সমর্থন ক'রে এক তথ্যপূর্ণ জোরাল বক্তৃতা করেন। ভারতবাসীর আর্থিক দুরবস্থা দূর করতে হ'লে যে বিদেশী দ্রব্য ক্রয় বন্ধ করা একান্ত আবশ্যক এ কথা গিরিজাভূষণই প্রথম কংগ্রেসে ব্যক্ত করলেন।—"আমরা দরিদ্র, স্বদেশে যে-সব জিনিস আমরা পাই, তা না কিনে আমরা বিদেশ থেকে আমদানী জিনিস বেশী মূল্যে কিনব কেন? আমরা যে-সব মোটা বেতন ও পেন্সন সিবিলিয়ান কর্ম্মচারীদের দিই, তা এদেশের বাইরেই ব্যয়িত হয়। আমরা এত অর্থ ব্যয় ক'রে যে অভিজ্ঞতা ক্রয় করি, তা ভবিষ্যৎ ব্যবহারের জন্য এদেশে থাকে না, জাহাজ বোঝাই হয়ে বিদেশে চলে যায় ও আমাদের বিরুদ্ধেই নিয়োজিত হয়।"

পঞ্চম প্রস্তাব ভারতের সৈন্যব্যয় সম্পর্কে। গত শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ইউরোপে ব্রিটেন রুশিয়াকেই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করত। তার পররাষ্ট্র-নীতি এর প্রতি লক্ষ্য রেখেই নির্দ্ধারিত হ'ত। রুশিয়া আফগানিস্তানের পথে ভারতবর্ষ আক্রমণ করবে, এই ছিল ব্রিটেনের ভয়। লর্ড রিপণ আফগানিস্তানের সঙ্গে বন্দোবস্ত ক'রে এ সম্ভাবনা কার্য্যতঃ নিরাকৃত করলেও বিলাতী প্রভুরা নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন নি। তাই এ সময় আবার কুড়ি লক্ষ পাউণ্ড ব্যয়ে ত্রিশ হাজার নূতন সৈন্য (দশ হাজার ইংরেজ ও কুড়ি হাজার ভারতীয়) নিয়োগের কথা হয়। প্রস্তাবে এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করা হ'ল। মাদ্রাজ মহাজন সভার সভাপতি রঙ্গিয়া নাইডু এ প্রস্তাব উত্থাপন ক'রে বলেন যে, ভারতীয় বাহিনী এখন আর জাতীয় বাহিনী নেই, অর্থাৎ সৈন্যদের ভিতর

জাতীয়তাবোধ লোপ পেয়েছে। তারা এখন বেতনভোগী সৈন্যে পরিণত! রঙ্গিয়া নাইডু বলেন যে, ভারতীয়দের যুদ্ধশক্তি দাবিয়ে না রেখে তাকে উৎসাহিত করাই কর্ত্তৃপক্ষের উচিত। ভারতীয় বাহিনীকে বেতনভোগী কর্ম্মচারীর মত ব্যবহার না ক'রে, তাকে উপযুক্ত মর্য্যাদাদান এবং জাতীয় বাহিনীর অঙ্গ ব'লে স্বীকার ভারতীয়দের যুদ্ধশক্তি বাড়িয়ে দেবার প্রকৃষ্ট উপায়।

এ প্রস্তাব সমর্থন করেন দীন্‌শা এডুলজী ওয়াচা। ভারতরক্ষা ও ভারতীয়-বাহিনী সম্পর্কে তাঁর গবেষণা এযুগেও শিক্ষিত ভারতবাসীর বিস্ময়ের উদ্রেক করে। দীন্‌শা বলেন, "১৮৫৬ সালে ভারতীয় বাহিনীতে সৈন্য ছিল ২৫৪,০০০ আর ১৮৮৫ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ১৮৯,০০০ জনে। কিন্তু পূর্ব্বে যেখানে ব্যয় হ'ত সতর কোটী টাকা, এ সময় তা বেড়ে প্রায় ছাব্বিশ কোটী টাকায় দাঁড়িয়েছে।" এর কারণ কি? দীন্‌শা বলেন, সিপাহী-বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে ১৮৫৯ সালে ভারতীয় সৈন্যদল যখন পুনর্গঠিত হয়, সেই সময় থেকেই দেশীয় সৈন্য হ্রাস পায় ও ব্রিটিশ সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি হয়। আর এই ব্রিটিশ সৈন্যদের বেতন ও ভাতা বাবদে খরচা পড়ে খুবই বেশী। সৈন্যব্যয়বৃদ্ধির আর-একটি কারণ, সিপাহী-বিদ্রোহের পূর্ব্বে সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে ভারতীয় বাহিনী বড় একটা বাইরে পাঠান হ'ত না, যদি-বা পাঠান হ'ত তার ব্যয়ভার ইংলণ্ডকে বহন করতে হ'ত। সিপাহী-বিদ্রোহের পর ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সরকারের অধীন করা হ'লে এ ব্যবস্থা উল্টে গেল। ভারতে স্থিত সৈন্য সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হ'তে থাকে, কিন্তু তার ব্যয়ভার ভারতবর্ষের স্কন্ধেই সম্পূর্ণ চাপান হয়!"

ষষ্ঠ প্রস্তাবে বলা হয় যে, যদি সৈন্যসংখ্যা ও সৈন্যব্যয়বৃদ্ধি একান্তই প্রয়োজন হয় তাহ'লে বিদেশাগত দ্রব্যের উপর শুল্ক বসিয়ে ও লাইসেন্স ট্যাক্স আদায় ক'রে তা যেন নির্ব্বাহ করা হয়। ভারতবর্ষে প্রধানতঃ ব্রিটিশ বাণিজ্য ও স্বার্থ অটুট রাখবার জন্য অবাধ বাণিজ্যনীতি প্রবর্ত্তিত হয়। এর ফলে ভারতের শিল্পব্যবসায় বিলুপ্ত হয়ে ভারতবর্ষ এক বিশাল কৃষিক্ষেত্র ও ভারতবাসী এক বিরাট কৃষক শ্রেণীতে পরিণত হ'ল।

এই সময় ব্রিটিশ তরফে ব্রহ্মযুদ্ধ চলছে। সপ্তম প্রস্তাবে ফিরোজ শা মেহ্‌তা ব্রিটিশের এ কার্য্যের নিন্দা ক'রে বলেন, "যদি শেষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মদেশ অধীন করাই

হয় তাহ'লে একে যেন ভারতবর্ষ ভুক্ত না ক'রে একটি ক্রাউন কলোনী বা সাক্ষাৎ পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক শাসিত উপনিবেশে (যেমন, সিংহল) পরিণত করা হয়। এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবিধ। ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষ-ভুক্ত করা হ'লে তার সমগ্র ব্যয়, মায় যুদ্ধব্যয়, ভারতবর্ষের স্কন্ধে চাপান হবে। দ্বিতীয়, ভারতবর্ষ-ভুক্ত হলে ব্রহ্মের শাসনাধিকার ব্রহ্মবাসীরা লাভ করতে পারবে না, ক্রাউন কলোনী হ'লে তারা স্বাভাবিক নিয়মেই শাসনাধিকার অন্ততঃ খানিকটা লাভ করবে।"

প্রথম অধিবেশনের পরই কংগ্রেসের এই প্রস্তাবগুলি ভারতবর্ষের নানা স্থানে জনসভায় গৃহীত হয়। জনসাধারণও ক্রমে কংগ্রেসের হিতকারিতা বুঝে তার দিকে আকৃষ্ট হ'তে থাকে।

বহির্মুখী প্রচেষ্টা

প্রথম পর্ব্ব

(১৮৮৬—১৮৯২)

১৮৫৮ সালে ব্রিটিশরাজ তথা ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করেন। কিন্তু ব্রিটিশ জনসাধারণের অমনোযোগ ও ঔদাসীন্যহেতু ভারতসচিবই ক্রমে ভারতবর্ষের প্রকৃত কর্ত্তা হয়ে পড়েন ও তাঁর আশ্রয়ে এখানে এক বিরাট্ আমলাতন্ত্রের সৃষ্টি হয়। ব্যক্তি বিশেষ কেউ কেউ ভারতীয়ের প্রতি সদয় হলেও, এই শাসকশ্রেণী তার দেশ-শাসনের অধিকার স্বীকার করতে একেবারেই নারাজ ছিল। ভারতবর্ষের নেতৃবর্গ, তথা কংগ্রেস তাই পার্লামেণ্টকে নিজ কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ করতে প্রথম থেকেই চেষ্টিত হলেন। তখনকার যুগের শিক্ষিত ভারতবাসীরা ইংলণ্ডবাসী ইংরেজদের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণাই পোষণ করতেন। ইংরেজের সাহিত্য, ইংরেজের ইতিহাস, ইংরেজের গণতন্ত্র-প্রীতি ও পার্লামেণ্টীয় শাসনপদ্ধতি, সে যুগে শুধু ভারতবাসীকে কেন, অন্যান্য বহু জাতিকেও তাদের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত করে। ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট 'মাদার অফ্ পার্লামেণ্টস্' বা জগতের যাবতীয় পার্লামেণ্টের জননী আখ্যাও পেয়েছেন। ভারতবাসীর প্রতি পার্লামেণ্টের যাতে শুভবুদ্ধির উদ্রেক হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই কংগ্রেস আন্দোলন করতে শুরু করলেন।

পূর্ব্ব নির্দ্দেশমত ১৮৮৬ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হ'ল। এবারবার সভাপতি হলেন দাদাভাই নৌরজী। কংগ্রেস এক বছরের মধ্যে শিক্ষিত সাধারণের প্রিয় হয়ে উঠেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে চারশ'র উপর প্রতিনিধি এসে এ অধিবেশনে যোগ দিলেন। এ অধিবেশনের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, বিভিন্ন প্রদেশের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও জনসভা প্রতিনিধি নির্ব্বাচন ক'রে এতে পাঠান। পূর্ব্ব বারে এরূপ হতে পারে নি। এবারে অভ্যর্থনা-সমিতিও নূতন গঠিত হ'ল। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের

অন্যতম পরিচালক, প্রত্নতত্ত্বে সুপণ্ডিত ও সুসাহিত্যিক ডক্টর রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হন। উক্ত এসোসিয়েশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা উত্তরপাড়ার জমিদার ঊনআশী বছর বয়স্ক অন্ধ জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রথম দিনের সভায় কংগ্রেসের শুভ কামনা ক'রে একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। সামাজিক বিষয়ে বিভিন্ন শ্রেণী, সমাজ ও প্রদেশের মধ্যে পার্থক্য বর্ত্তমান, এজন্য জাতীয় কংগ্রেসে এর আলোচনা অসম্ভব। দাদাভাই নৌরজী তাই একে একটি নিছক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ব'লেই নিজ অভিভাষণে আখ্যা দিলেন। সেই থেকে কংগ্রেস একটি পুরোপুরি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ব'লেই গণ্য। কংগ্রেস-মঞ্চ থেকে দীন্‌শা এদুলজী ওয়াচা যুক্তিপ্রমাণ-প্রয়োগে ভারতীয় জনগণের দুঃখদৈন্যের কথা ব্যক্ত করলেন। তিনি হিসাব ক'রে দেখালেন, ইংরেজী ১৮৪৮ সাল থেকে সাধারণের আর্থিক অবস্থা ক্রমে এত খারাপ হয়ে পড়েছে যে, সরকারী হিসাবমতেই অন্যূন সাড়ে চার কোটি লোক প্রত্যহ একাহারে বা অনাহারে থাকতে বাধ্য হয়। নানা খাতে প্রতি বছর বহু কোটি টাকা বিলাতে চলে যায় ব'লেই এই ভয়ঙ্কর পরিণতি। সুতরাং প্রতিনিধিমূলক শাসনব্যবস্থা, সিবিল সার্বিসে ভারতীয় নিয়োগ, সৈন্যব্যয় প্রভৃতি সম্পর্কে প্রস্তাব পূর্ব্ববৎ গৃহীত হ'ল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, মতিলাল ঘোষ প্রমুখ বঙ্গের জনপ্রিয় নেতৃবৃন্দ এই অধিবেশনকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন। প্রতিনিধিমূলক শাসন-সম্পর্কীয় প্রধান প্রস্তাবটিতে নির্ব্বাচন-পদ্ধতি সম্পর্কে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় এই প্রথম কংগ্রেসে যোগদান করেন।

ভারতবাসীরা, কয়েকটি বিশিষ্ট শ্রেণী ছাড়া, সকলেই যুদ্ধবিদ্যা-শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। 'ভলান্টিয়ার' বা স্বেচ্ছাসৈনিক দলে ইংরেজ, ফিরিঙ্গী, এমন কি কি ভারতীয় খ্রীষ্টান পর্য্যন্ত ভর্ত্তি হতে পারত, কিন্তু ভারতবর্ষের স্থায়ী বাসিন্দা হিন্দু-মুসলমানকে এ থেকে একেবারে বাদ দেওয়া হয়। হিন্দু-মুসলমানের অস্ত্র রাখবারও উপায় নেই। 'আর্মস এক্ট্' বা অস্ত্র আইন তাদের নিরস্ত্র করেছে। কংগ্রেস এ অধিবেশনে এই বিষম অবস্থার প্রতিবাদ ক'রে এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের (পরে আগ্রা-অযোধ্যা) প্রতিনিধি রাজা রামপাল সিংহ এই প্রস্তাব উত্থাপন ক'রে বলেন,

"সরকার আমাদের যা কিছু মঙ্গল করছেন সেজন্য আমরা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমাদের যে ভীষণ অপূরণীয় ক্ষতি করা হয়েছে, সে জন্য আমরা কখনই কৃতজ্ঞ হ'তে পারি না। আমাদের প্রকৃতি অবনমিত করার জন্য, আমাদের ভিতরকার যুদ্ধশক্তি নিয়মিতভাবে বিলুপ্ত করার জন্য, একটি যোদ্ধা ও বীর জাতিকে কলম-পেশা কেরাণী দলে পরিণত করার জন্য আমরা কখনও সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতে পারি না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, অবস্থা এখনও অতটা সঙ্গীন হয়ে উঠে নি। ভারতের সর্বত্র আমাদের মধ্যে এখনও এমন অনেকে আছেন, যাঁরা অসি চালনা করতে সক্ষম এবং আবশ্যক হ'লে স্বদেশ-রক্ষার জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। যে গবর্ণমেণ্টের নিকট আমরা এতখানি ঋণী, তার জন্য আমরা প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেও কুণ্ঠিত হব না। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গেই আমার এ কথাও মনে হচ্ছে যে, গ্রেট ব্রিটেনের সকল রকম সুকীর্ত্তি, সব রকম সুমহৎ আবিষ্কার, যে-সব কার্য্য দ্বারা আমাদের উপকার করেছেন বা করতে চেষ্টা করেছেন সে-সব সত্ত্বেও তুলাদণ্ডে ওজন করলে তার অপকর্ম্মের পরিমাণ হবে ঢের বেশী, এবং ইংলণ্ডের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য আনন্দিত না হয়ে ভারতবাসীর দুঃখিত হতে হবে একদিন।

"এসব কথা কঠোর হ'লেও সত্য। জাতীয়তাবোধ, স্বজাতি ও স্বদেশ-রক্ষার শক্তি বিনষ্ট করলে একটি জাতির যে পরিমাণ ক্ষতি করা হয় অন্য কিছুর দ্বারাই তা পূরণ হবার নয়।

"গবর্ণমেণ্ট যে ভ্রান্ত নীতি অনুসরণ করেছেন তার ফলে আমাদেরই যে শুধু দুঃখভোগ করতে হবে তা নয়। আপনারা জগতের বিভিন্ন দিকে দৃকপাত করুন, প্রতিটি দেশেরই রণসম্ভার ও সৈন্যসামন্ত বিশালাকার। সমগ্র সভ্য জগতের ভবিষ্যৎ বিপন্ন। আজ হোক, কাল হোক, ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হবে, এবং তাতে গ্রেট ব্রিটেনও নিশ্চয়ই জড়িয়ে পড়বে। গ্রেট ব্রিটেন তার সকল ধন-সম্পদ দিয়েও জনসংখ্যার প্রতি হাজারে এক শ' যোদ্ধা সংগ্রহ করতে পারবে না, যা ইউরোপের অন্য কয়েকটি শক্তি করতে সক্ষম। ইংলণ্ড ইউরোপ থেকে বিচ্ছিন্ন, এজন্য কতকটা সুরক্ষিতও বটে, কিন্তু ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যবর্ত্তী সমুদ্রপথ শত্রু সমাকীর্ণ। ভারতবর্ষগামী স্থলপথ উন্মুক্ত ও সকলের জানা। ভারতবর্ষ অন্য থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে নেই এবং এই ভারতবর্ষই, যাকে অধীন ক'রে

রাখায় ব্রিটেনের এত সম্পদ ও মর্য্যাদা—ইউরোপীয় শক্তি দ্বারা আক্রান্ত হ'য়ে এ একদিন ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হবে। তখন ইংলণ্ড এই ব'লে অনুশোচনা করবে যে, লক্ষ লক্ষ সাহসী ভারতবাসীকে অস্ত্রবিদ্যা না শিখিয়ে তার মুষ্টিমেয় সেনাবাহিনীর উপর ভারতরক্ষার ভার ছেড়ে দিয়ে কি ভুলই না করেছে!

"কিন্তু আমাদের পক্ষেও এ নীতি খুবই অশুভকর, সুতরাং নিন্দার্হ। উচ্চ-নীচ সকলেই আমরা অস্ত্রের ব্যবহার ভুলতে বসেছি। সঙ্গে সঙ্গে সেই আত্ম-নির্ভর শক্তিও চলে গেছে যা মানুষকে সাহসপূর্ব্বক বিপদের সম্মুখীন হ'তে উদ্বুদ্ধ করে, যেজন্য মানুষ মনুষ্যপদবাচ্য হয়। যখন আমি পাঁচ বছরের বালক তখনই আমার পিতামহ আমাকে সব রকম ব্যায়াম শিখিয়েছিলেন, অস্ত্রচালনা ও রণকৌশলও তখন থেকে শিখি। কিন্তু আজকাল কে তার পুত্রকে এরূপ শিক্ষা দেন? কোন্ যুবক আজকাল এ সব জান্‌তে পারেন? পঞ্চাশ বছর পূর্ব্বে, যুদ্ধের বাসনা না নিয়েও যুবকগণ যুদ্ধবিদ্যা শিখতেন ও একদিন না একদিন যথাস্থলে বীরত্ব দেখাতে পারবেন ভেবে উৎফুল্ল হতেন। বর্ত্তমানে তাঁরা ঐরূপ মনোভাব প্রায় হারাতে বসেছেন। যদি মানুষকে উপযুক্ত সৈন্য হ'তে হয়, বিপদের সময়—যা প্রত্যেক দেশের পক্ষেই আসা সম্ভব—তার সম্মুখীন হবার যোগ্যতা অর্জ্জন করতে হয় তাহ'লে তাকে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করতেই হবে। শৈশব থেকে পিতামাতাকে, বয়োজ্যেষ্ঠকে অস্ত্র ব্যবহার করতে দেখা তার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর পূর্ব্বেও অযোধ্যায় সকল ভদ্র-সন্তানকেই যুদ্ধবিদ্যা শেখান হত।"

অস্ত্র-আইন তুলে দেওয়ার বা তার কঠোরতা হ্রাসের পক্ষেও প্রস্তাব গৃহীত হয়।

কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় কংগ্রেসের এই প্রথম অধিবেশনকে একটি সঙ্গীতে স্মরণীয় ক'রে রেখেছেন। পাঠক লক্ষ্য করবেন, 'বন্দে মাতরম্' তখন গীত না হলেও, হেমচন্দ্র তার একটি বিশেষ অংশ এই সঙ্গীতে নিবদ্ধ করেন।

কি আনন্দ আজি ভারত-ভুবনে—ভারত-জননী জাগিল!
আহা কি মধুর নবীন সুহাসি
মায়ের অধরে রয়েছে প্রকাশি,
যেন বা প্রভাতী কিরণের রাশি উষার কপোলে জ্বলিল!

মরি কি সুষমা ফুটেছে বদনে,
কিবা জ্যোতি জ্বলে উজল নয়নে,
কি আনন্দে দিক্ পূরিল !—ভারত-জননী জাগিল !
পূরব-বাঙ্গালা, মগধ, বিহার,
দেরাইস্‌মাইল্, হিমাদ্রির ধার,
করাচী, মান্দ্রাজ, সহর বোম্বাই,
সুরাটী, গুজরাটী, মহারাঠী ভাই, চৌদিকে মায়েরে ঘেরিল ;
প্রেম-আলিঙ্গনে করে রাখি কর,
খুলে দেছে হৃদি—হৃদি পরস্পর,
এক প্রাণ সবে এক কণ্ঠস্বর মুখে জয়ধ্বনি করিল !
প্রণয়-বিহ্বলে ধরে গলে গলে,
গাহিল সকলে মধুর কাকলে গাহিল—"বন্দে মাতরম্,
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং সুখদাং বরদাং মাতরম্।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীং
ফুল্ল-কুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনীং
সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিণীং সুখদাং বরদাং মাতরম্
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং রিপুদলবারিণীং মাতরম্।"
উঠিল সে ধ্বনি নগরে নগরে
তীর্থ দেবালয় পূর্ণ জয়স্বরে, ভারত জগত মাতিল।

দুটি বিষয় এখানে উল্লেখযোগ্য। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে প্রতিনিধি-মূলক শাসনতন্ত্র-গঠনের প্রস্তাবের পরই উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে এ বৎসর ১৮৬১ সালের আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা-পরিষদ গঠিত হয়। সিবিল সার্বিস সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্যও পঞ্জাবের ছোটলাট এচিন্সনের সভাপতিত্বে তের জন সদস্য নিয়ে এক কমিটি গঠিত হ'ল। এতে ভারতীয় ছিলেন পাঁচ জন। এঁদের মধ্যে সার সৈয়দ আহ্‌মদ খাঁ ও হাইকোর্টের বিচারপতি রমেশচন্দ্র মিত্রের নাম বিশেষ ক'রে উল্লেখ করবার মত। এর সিদ্ধান্তের কথা যথাসময়ে বলব।

১৮৮৭ সালে কংগ্রেস হয় মান্দ্রাজে। এবারকার সভাপতি হলেন একজন মুসলমান, বোম্বাই-নিবাসী বিখ্যাত ব্যারিষ্টার বদরুদ্দিন তায়াবজী। অভ্যর্থনা

সমিতির সভাপতি সার টি মাধব রাও একজন প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞ। একাধিক মিত্ররাজ্যে প্রধান মন্ত্রিত্ব ক'রে তখন অবসর জীবন যাপন করছিলেন। এবার ছ'শর উপর প্রতিনিধি কংগ্রেসে যোগদান করেন।

অধিবেশনের পূর্ব্বেই মাদ্রাজ প্রদেশে জনসাধারণের মধ্যে খুব সাড়া পড়ে যায়। বীররাঘব আচার্য্য কংগ্রেস সম্পর্কে তামিল ভাষায় এক পুস্তিকা লিখে তার ত্রিশ হাজার খণ্ড বিতরণ করেন। দশ হাজারের অধিক অধিবাসী যুক্ত প্রত্যেক শহরে কংগ্রেসের বাণী প্রচারের জন্য সাব-কমিটি গঠিত হ'ল। মাদ্রাজে উচ্চ-নীচ, ধনী-নির্ধন সকলেই যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য ক'রে অধিবেশনকে সাফল্যমণ্ডিত করে। কংগ্রেসের বার্ত্তা সাধারণকে এমন কি জনমজুরদেরও কিরূপ উৎসাহিত করেছিল তা একটি ব্যাপারে বেশ বুঝা যায়। মাদ্রাজে কংগ্রেসের জন্য যে অর্থ সংগৃহীত হয় তার ভিতর সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা সংগৃহীত হয় জনমজুর ও সাধারণ লোকের প্রদত্ত এক আনা থেকে দেড় টাকা পর্য্যন্ত চাঁদায়। মান্দালয়, রেঙ্গুন, সিঙ্গাপুর থেকেও মাদ্রাজীরা চাঁদা পাঠায়।

পূর্ব্ব দু'বছর কংগ্রেসের বিষয়-নির্ব্বাচনী সভা ব'লে কিছু ছিল না। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ যেরূপভাবে প্রস্তাব রচনা করতেন প্রকাশ্য কংগ্রেসে তাই পাস করিয়ে নিতেন। বিপিনচন্দ্র পাল ও দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এবং দূরদর্শী রাজনীতিক মহাদেবগোবিন্দ রাণাড়ের সহায়তায় এবারে প্রথম বিষয়-নির্ব্বাচনী সভা গঠিত হয়। উপস্থিত কংগ্রেস প্রতিনিধিদের ভিতর হ'তে কয়েকজনকে বাছাই ক'রে নিয়ে এই সভা গঠিত হ'ল। পরবর্ত্তী কয়েক বৎসর যাবৎ এই সভাই কংগ্রেসের যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করেছিল।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের নিরিখে এবারেও কতকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। মূল প্রস্তাব—প্রতিনিধিমূলক শাসনতন্ত্র—উত্থাপন করলেন দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ। এ প্রস্তাব সম্পর্কে টি. মাধব রাও, মাদ্রাজের ব্যারিষ্টার আর্ডলি নর্টন, পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ধর, পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় ও অশ্বিনীকুমার দত্ত বক্তৃতা করেন। মালবীয়জী বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে, ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ভারতবর্ষ শাসন সম্পর্কে মোটেই মনোযোগী নন। ভারতবর্ষের বজেট আলোচনা পার্লামেণ্ট অধিবেশনের শেষের দিকে ফেলা হয়। গত বারে এ বিষয় আলোচনাকালে সওয়া ছ'শ সদস্যের মধ্যে মাত্র উনত্রিশ জন উপস্থিত ছিলেন।

পার্লামেণ্ট নিজের কর্ত্তব্য নিজে করবেন না, প্রতিনিধিমূলক শাসন-পরিষদ প্রবর্ত্তিত ক'রে ভারতবাসীকেও তা করতে দিবেন না। অথচ অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, কেপকলোনি প্রভৃতি উপনিবেশগুলিতে পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন দেওয়া হয়েছে। আর এই সুপ্রাচীন সুসভ্য ভারতবর্ষের বেলাতেই যত আপত্তি। বরিশালের জননায়ক অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় ঐ প্রস্তাবের সমর্থনে পঁয়তাল্লিশ হাজার বরিশালবাসীর সহিযুক্ত একখানা আবেদনপত্র কংগ্রেসে পেশ করেন। তিনি বহু জনসভায় প্রতিনিধিমূলক শাসনতন্ত্রের আবশ্যকতা প্রতিপাদন ক'রে বক্তৃতা করেন ও এইরূপ সহিযুক্ত একখানা আবেদনপত্র ইতিপূর্ব্বে পার্লামেণ্টেও প্রেরণ করেছিলেন। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন যে, অশিক্ষিত জনগণ—নমঃশূদ্র, মুসলমান প্রভৃতিও প্রতিনিধিমূলক শাসনব্যবস্থার খুবই পক্ষপাতী। স্বদেশবাসীরা তাদের জন্য আইন-কানুন প্রণয়ন করবেন শুনে তারা এই মত প্রকাশ করেছে যে, তাদের দুঃখদৈন্য শীঘ্রই ঘুচে যাবে। এবারে তাঞ্জোর থেকে তিন জন সূত্রধর প্রতিনিধিরূপে কংগ্রেসে যোগদান করেন। তাঁদের মধ্যে একজন কংগ্রেস-সভায় বক্তৃতা ক'রে নিজেদের দুঃখদৈন্যের কথা ব্যক্ত করলেন। দেশরক্ষা-বাহিনীর দায়িত্বপূর্ণ পদে ভারতীয় নিয়োগ, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে স্বেচ্ছাসৈন্য-সংগ্রহ ও অস্ত্র-আইনের কঠোরতা বিদূরণ প্রভৃতি সম্পর্কে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। নরেন্দ্রনাথ সেন, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি এ প্রস্তাবগুলির উপর বক্তৃতা করেন।

স্থির হ'ল, কংগ্রেসের পরবর্ত্তী অধিবেশন হবে এলাহাবাদে। কিন্তু এর ভিতরে কতকগুলি অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল। কংগ্রেস প্রথম থেকেই প্রতি বার রাজানুগত্য স্বীকার ক'রে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করতেন। কিন্তু মাত্র প্রথম তিন অধিবেশনেই কর্ত্তৃপক্ষের সহানুভূতি লাভে সমর্থ হন। কলকাতা অধিবেশনে স্বয়ং লর্ড ডাফরিন ও বোম্বাই ও মাদ্রাজ অধিবেশনে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা প্রতিনিধিগণকে অভ্যর্থনা করেছিলেন। কিন্তু মাদ্রাজ অধিবেশনের পরই কর্ত্তৃপক্ষের মতিগতি বদলে গেল। এর প্রধান কারণ হ'ল, যা কারো কারো মুখে পরে ব্যক্তও হয়েছে, কংগ্রেসের সঙ্গে প্রজাশক্তি তথা ভারতীয় জনসাধারণের প্রত্যক্ষ যোগসাধন। কংগ্রেস প্রতিনিধিরা নিজ নিজ প্রদেশে গিয়ে সভাসমিতি অনুষ্ঠান করেন এবং কংগ্রেসের আদর্শ ও প্রস্তাবগুলির উদ্দেশ্য

সাধারণকে বুঝিয়ে দেন। ১৮৮৮ সালের আরম্ভেই ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র অন্যূন এক হাজার জনসভা অনুষ্ঠিত হয় ও তার ভিতর বহু সভায় পাঁচ হাজারেরও অধিক লোক উপস্থিত থাকে। জমিদারের অনুপস্থিতিতে জমিদারীতে প্রজা-বৃন্দের কিরূপ দুর্দ্দশা হয় একথা ব্যাখ্যা ক'রে 'কেম্‌বক্স্‌পুরের মৌলবী ফরিদুদ্দিন ও রামচন্দ্রের মধ্যে কথোপকথন' নামে কংগ্রেস কর্ত্তৃক একখানা পুস্তিকার বহুলক্ষ খণ্ড বিতরণ করা হয়। এখানে, জমিদার বলতে ব্রিটিশরাজ ও জমিদারী বলতে ভারতবর্ষ।

ওদিকে হিউম সাহেবও পুস্তিকা লিখে ও নিজেও বক্তৃতাদি ক'রে সকলকে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। কংগ্রেসের দাবীপূরণে কর্ত্তৃপক্ষের ঔদাসীন্য ও অবহেলাই বিশেষ ক'রে তাঁদের একার্য্যে প্রবৃত্ত করেছিল। ১৮৮৮ সালের প্রথমেই উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ছোটলাট সার অক্‌ল্যাণ্ড কল্‌ভিন কংগ্রেসের ও এর প্রধান উদ্যোক্তা হিউমের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করলেন। হিউম সাহেবও যথা সময়ে এর জবাব দেন। তিনি জবাবের একস্থলে বললেন, "আমাদের কর্ম্মদোষে ভারতবর্ষে যে ভীষণ শক্তি মাথা নাড়া দিয়ে উঠবার উপক্রম হয় তা থেকে রেহাই পাবার জন্য একটি নিরাপদ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন খুবই অনুভূত হয়েছিল। কংগ্রেস অপেক্ষা কোন নিরাপদ প্রতিষ্ঠানের কল্পনা করাও অসম্ভব।" এসময় থেকে হিন্দু-মুসলমান পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টাও শুরু হয়। 'ভারতে হিন্দু-মুসলমান দুই স্বতন্ত্র জাতি'—বড়লাট ডাফরিন স্বয়ং এই মতবাদ প্রচার করলেন। ধর্ম্মে বিভিন্ন হ'লেও হিন্দু-মুসলমান দুই যে একজাতিভুক্ত, একই পিতামাতার সন্তান একথা তিনি বা তাঁর অধস্তন ব্যক্তিরা স্বীকার করলেন না। ডাফরিনের এই মতবাদ আমাদের জাতীয়তা-বোধের মূলে কি আঘাতই না দিয়েছে! সরকারের এই বিভেদনীতির ছাপ এ সময়ে একটি ব্যাপারে স্পষ্ট হয়ে পড়ল। ডাফরিন কংগ্রেসের উপর এতখানি বীতরাগ হন যে, ভারতবর্ষ-ত্যাগের প্রাক্কালে ১৮৮৯ সালে তিনি একটি বক্তৃতায় বললেন, "কংগ্রেসের পাণ্ডারা বিরাট জনসংখ্যার তুলনায় অতি নগণ্য ('microscopic minority'), এরূপ আন্দোলন দ্বারা অন্ধকারে তাঁরা ঝাঁপ দিচ্ছেন ('jump into the dark')। ডাফরিনের এই কথাগুলি পরে লর্ড কার্জ্জনও বহু ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন।

হিন্দু-মুসলমানে বিচ্ছেদ ঘটাবার চেষ্টা পূর্ব্বেও হয়েছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জামালুদ্দিন নামে একজন মিশরীয় ধর্ম্মপ্রচারক ভারতবর্ষে এসে শিক্ষিত মুসলমানদের কর্ণে প্যান-ইস্‌লাম বা জগতের সব মুসলমানের স্বার্থ এক, এই মন্ত্র দিয়ে যান। এরই বশবর্ত্তী হয়ে মহম্মদ ইউসুফ বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে ১৮৮৩ সালে স্বায়ত্তশাসন-প্রথা প্রবর্ত্তনের আলোচনাকালে মুসলমানদের জন্য সভ্য-সংখ্যা সংরক্ষিত করার জিদ করেন। এই মহম্মদ ইউসুফ কিন্তু ঐ বক্তৃতাতেই নারীর ভোটাধিকার-দানের সপক্ষেও মত প্রকাশ করেছিলেন। এই বৎসর পাবলিক সার্বিস কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। সিবিল সার্বিস পরীক্ষার্থী-দের বয়স উর্দ্ধতম তেইশ ও ন্যূনতম একুশ স্থিরীকরণে এবং ষ্টেটুটারী সিবিল সার্বিস প্রথা তুলে দিয়ে নিম্নতন বিভাগের দক্ষ কর্ম্মচারীদের উচ্চতর পদে নিয়োগে কমিশনের সকল সদস্যই একমত হলেন। কিন্তু একই সময়েই বিলাতে ও ভারতে সিবিল সার্বিস পরীক্ষাগ্রহণের বিরুদ্ধে অধিকাংশ সভ্যই মত দেন। বলা বাহুল্য, হিন্দু সভ্য তিন জন এর অনুকূলেই মত প্রকাশ করেছিলেন। মুসলমান সভ্যদ্বয়—সার সৈয়দ আহ্‌মদ খাঁ ও অপর একজন এই ব'লে এর বিরুদ্ধতা করলেন যে, ভারতে সিবিল সার্বিস পরীক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা হ'লে হিন্দুরাই সব অধিকার করবে, মুসলমানদের প্রতি সুবিচার করা হবে না। এর ভিতরেই সরকারের বিভেদপ্রচেষ্টার সূত্র আমরা পরিষ্কার লক্ষ্য করি। পূর্ব্বে ১৮৭৭ সনে কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের উত্তর-ভারত ভ্রমণকালে সৈয়দ আহ্‌মদ ঐ প্রস্তাব সমর্থন করেন ও একটি সভার সভাপতিত্বও করেন। সৈয়দ আহ্‌মদ খাঁ মুসলমান সমাজে খুবই প্রতিপত্তিশালী। তিনি পেট্রিয়টিক এসোসিয়েশন নামে কংগ্রেস-বিরোধী একটি রাজনীতিক সভা স্থাপন করেন। বলা বাহুল্য, তাঁর এ কার্য্যে কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ সহানুভূতি ছিল। মুসলমানগণ যাতে কংগ্রেসে যোগদান না করে সেজন্য তিনি অতঃপর তাঁর সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করতে থাকেন। উক্ত কমিশন সিবিল সার্বিস ছাড়া ভারত গবর্ণমেণ্টের রেল, বন, চিকিৎসা, আবগারি প্রভৃতি অন্যান্য বিভাগেও ভারতবাসী নিয়োগের ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা-প্রবর্ত্তনের সুপারিশ করেন।

এ সময়ের আর-একটি ঘটনাও এখানে স্মরণীয়। এ ব্যাপারেও বঙ্গদেশ অন্যান্য প্রদেশের অগ্রগামী। সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গদেশেই ১৮৮৮ সালে

প্রথম প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রাদেশিক সমস্যাগুলির আলোচনা কংগ্রেসে করা সম্ভব নয় ব'লে এইরূপ সম্মেলনের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল। ঐ বৎসর ২৫শে, ২৬শে ও ২৭শে অক্টোবর কলকাতায় প্রথম সম্মেলন হয় স্বনামধন্য ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের সভাপতিত্বে। সম্মেলনের প্রথম ও প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল,—আসাম চা-বাগানের শ্রমিকদের দুর্দ্দশা। মাদ্রাজ কংগ্রেসে 'প্রাদেশিক ব্যাপার' ব'লে এ বিষয়ে আলোচনা স্থগিত থাকে। এ প্রস্তাব উত্থাপন করেন শ্রীহট্টনিবাসী বিপিনচন্দ্র পাল ও সমর্থন করেন শ্রমিক-বন্ধু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। দ্বারকানাথ স্বয়ং শ্রমিকের (মহেন্দ্রলাল বলেন 'কুলি' কথাটি ঘৃণিত ব'লে অব্যবহার্য্য) বেশে বিভিন্ন চা-বাগানে কিছুদিন কর্ম্ম ক'রে তাদের দুর্দ্দশা নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করলেন। এই সব অভিজ্ঞতা তিনি বাংলা 'সঞ্জীবনী' ও ইংরেজী 'বেঙ্গলী' পত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত করেন। তিনি সম্মেলনেও 'কুলী-জীবনের' কথা সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। চা-বাগানের শ্রমিকদের সমস্যা বস্তুতঃ প্রাদেশিক নয়, কারণ বিহার, ছোটনাগপুর, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, পঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চল থেকে চা-বাগানের শ্রমিক সংগৃহীত হ'ত। দ্বাদশ অধিবেশনে কংগ্রেস তাই এ সমস্যা আলোচনার বিষয়ীভূত ক'রে নেন। চা-বাগানের শ্রমিকদের অবস্থা ছিল নীল-চাষীদের চেয়েও ভীষণ। চুক্তিভঙ্গের অপরাধে দণ্ডদান তো আইনেরই বিধান ছিল। এ ছাড়া হাজার হাজার নারী-পুরুষের জীবনও নির্ভর করত চা-বাগানের ম্যানেজার সাহেবদের মর্জ্জির উপর। তাদের ক্রোধের মুখে কত লোককে যে সে-যুগে প্রাণ হারাতে হয়েছে তার সংখ্যা নেই। সার হেন্‌রী কটন আসামের চীফ কমিশনার হয়ে শ্রমিকদের দুর্দ্দশামোচনের চেষ্টা করেন, কিন্তু লর্ড কার্জ্জনের প্রতিবন্ধকতায় তা কার্য্যকরী হয় নি।

১৮৮৮ সালে কংগ্রেস এলাহাবাদে আহূত হয়। কিন্তু এবার যে একটা ঘোর বিপদ উপস্থিত হ'তে পারে তার আভাষ সারাবর্ষব্যাপী কংগ্রেস-বিরোধী সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টার মধ্যেই পাওয়া গিয়েছিল। এলাহাবাদে কংগ্রেস অনুষ্ঠানের ভার পড়েছিল জনপ্রিয় নেতা প্রসিদ্ধ উকীল পণ্ডিত অযোধ্যানাথের উপর। তিনি ছিলেন সেবারে অভ্যর্থনা-সমিতিরও সভাপতি। সার অক্‌ল্যাণ্ড কল্‌ভিন স্বয়ং এলাহাবাদে উপস্থিত। কাজেই কিরূপ বাধার

সৃষ্টি হয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়। সরকারী চাতুর্য্যের ফলে অযোধ্যানাথ কংগ্রেসের জন্য স্থাননির্ণয়ে চার চার বার অকৃতকার্য্য হন। অযোধ্যানাথ এতেও কিন্তু টলেন নি। গোপনে গোপনে লাটপ্রাসাদের সন্নিকট 'লাউদার ক্যাসেল'ই তিনি ভাড়া ক'রে ফেললেন! দ্বারবঙ্গের মহারাজা সার লক্ষ্মীশ্বর সিংহ পরে এই ভবনটি ক্রয় করেন। ১৮৯২ সালে এলাহাবাদে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তা এখানেই সুসম্পন্ন হয়েছিল।

এবারকার সভাপতি হন প্রসিদ্ধ এণ্ড্ ইউল কোম্পানীর মালিক স্কট্লণ্ডবাসী ভারতবন্ধু মিঃ জর্জ্জ ইউল। তিনি বলেন, সরকার যত বেশী বাধাবিঘ্নের সৃষ্টি করবেন, কংগ্রেস ততই শক্তিশালী হয়ে উঠবে। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে প্রতিনিধিরা যাতে কংগ্রেসে যোগ দিতে না পারেন তার চেষ্টাও কি কর্ত্তৃপক্ষ কম করেছিলেন? কংগ্রেসে যোগদানেচ্ছু মাদ্রাজের এক ভদ্রলোককে শান্তিরক্ষার ওজুহাতে বিশ হাজার টাকার মুচলেকায় আবদ্ধ ক'রে তবে ছেড়ে দেওয়া হয়। এরূপ নানা বাধাবিপত্তির মধ্যেও এবারকার কংগ্রেস প্রতিনিধি-সংখ্যা পূর্ব্ব বারের দ্বিগুণ অর্থাৎ বার শ'র উপরে দাঁড়াল। সার সৈয়দ আহ্মদ খাঁর বিরোধিতা সত্ত্বেও অযোধ্যা থেকে বিস্তর মুসলমান এসে কংগ্রেসে যোগদান করলেন। এবারেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মত প্রতিনিধিমূলক শাসনব্যবস্থা ও অন্যান্য বিষয়সম্পর্কে প্রস্তাব গৃহীত হয় ও ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষকে এবিষয়ে সত্বর অবহিত হবার জন্য অনুরোধ করা হয়। এ সময় গণিকাবৃত্তি-নিয়ন্ত্রণের জন্য যে আইনের প্রস্তাব চলে তা সমর্থন ক'রে কংগ্রেস একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এই প্রস্তাবের উপর বক্তৃতাকালে ক্যাপ্টেন হিয়ারসে নামীয় এক সেনানী বলেন যে, ভারত-সরকার সৈন্যবাহিনীর জন্য দু' হাজার গণিকা পোষণ করে থাকেন।

ভারতবর্ষে আমলাতন্ত্র যখন প্রবলভাবে কংগ্রেসের বিরোধিতা করতে লাগল তখন নেতাদের প্রচেষ্টাও বেশী ক'রে বহির্মুখী হয়ে পড়ল। পার্লামেণ্টকে কি ক'রে নিজেদের মতানুবর্ত্তী করা যায় অতঃপর এই চেষ্টাই হ'ল তাঁদের। এলান্ হিউম ১৮৮৫ সালেই বিলাতে ভারতীয়দের মুখপাত্র স্বরূপ একটি সোসাইটি-স্থাপনের সঙ্কল্প করেন। ১৮৮৭ সালে দাদাভাই নৌরজী কংগ্রেসের কথা-প্রচারের ভার নেন। পর বৎসর উইলিয়ম ডিগ্বির তত্ত্বাবধানে লণ্ডনে কংগ্রেসের একটি আপিস স্থাপিত হয়। ১৮৮৯ সালের ২৭শে জুলাই লণ্ডন

শহরে কংগ্রেসের শাখা রূপে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া কমিটি' স্থাপিত হ'ল। এর পরিচালনার ভার পড়ল দাদাভাই নৌরজী, উইলিয়ম ওয়েডারবর্ণ, ডবলিউ এস্. কেন্ ও উইলিয়ম ডিগ্‌বির উপর। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া কমিটি ১৮৯০ সালে কংগ্রেসের মুখপত্র স্বরূপ 'ইণ্ডিয়া' নামে একখানা পত্রিকা প্রকাশ করেন। এখানা প্রথম প্রতি মাসে বার হ'ত, পরে ১৮৯৮, ৭ই জানুয়ারী থেকে সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হ'লে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া কমিটি ও 'ইণ্ডিয়া পত্রিকা' দু-ই তুলে দেওয়া হয়।

১৮৮৯ সালে কংগ্রেসের অধিবেশন হ'ল পুনরায় বোম্বাইয়ে। কংগ্রেসের কার্য্যে জনসাধারণের উৎসাহ উদ্দীপনা ক্রমশঃ বেড়েই চলল। তাই ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রায় উনিশ শ' প্রতিনিধি এবারকার অধিবেশনে যোগদান করলেন। এঁদের মধ্যে মুসলমান-সদস্য ছিল প্রায় এক-পঞ্চমাংশ। পণ্ডিতা রমাবাঈ, লেডী বিদ্যাগোরী নীলকণ্ঠ, রমাবাঈ রাণাড়ে, নিকম্ব, কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় ও স্বর্ণকুমারী ঘোষাল—এই ছয়জন মহিলাও এবারে কংগ্রেসে যোগ দেন। ভারতবর্ষের অবস্থা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালাভের জন্য পার্লামেণ্ট-সদস্য চার্ল্‌স ব্রাড্‌ল এ সময় ভারতবর্ষে আগমন করেন। ব্রাড্‌ল সাহেবকে লোকে বলত 'মেম্বর ফর ইণ্ডিয়া' অর্থাৎ ভারতবর্ষের পক্ষে সদস্য। তিনি পার্লামেণ্টে ভারতবর্ষের দুঃখদৈন্যের কথা যেমন ক'রে ব্যক্ত করতেন এমনটি আর কেউ করতেন না। বোম্বাইয়ে পদার্পণ করলে কৃতজ্ঞ ভারত-বাসীরা দূর দূরান্ত থেকে তাঁকে অভিনন্দন জানাতে লাগ্‌ল। তিনি কংগ্রেসে যোগদান করলেন। অধিবেশনের মধ্যে কংগ্রেস একটি বিশেষ দিনে তাঁকে জাতির পক্ষ থেকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। এবারে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হয়েছিলেন ফিরোজ শাহ্ মেহ্‌তা ও সভাপতি সার্ উইলিয়ম ওয়েডারবর্ণ।

সভাপতির আসন থেকে সার্ উইলিয়ম ওয়েডারবর্ণ এই কথা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করলেন যে, ভারতবর্ষের দুর্দ্দিন ১৮৫৮ সাল থেকেই শুরু হয়েছে। ভারতশাসন-সম্পর্কে দেখা শুনা করবার এখন আর কেউ নেই। ভারতসচিব স্বৈরাচারী শাসকে পরিণত, ভারতবাসীর ভালমন্দ তিনি দেখেন না। নইলে লর্ড রিপণ যখন কৃষকসমাজের উপকারের জন্য কৃষিব্যাঙ্ক-স্থাপনের প্রস্তাব

করেন তখন তা তিনি অগ্রাহ্য করতে পারতেন না। একথা ধ্রুব সত্য যে, কোন দেশেই 'কৃষিব্যাঙ্ক' ছাড়া কৃষি ও কৃষকের উন্নতি হয় না।

কংগ্রেস প্রতিনিধিমূলক শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন ও পার্লামেণ্টে পেশ করবার জন্য ব্রাড্‌লকে অনুরোধ জানান। অর্দ্ধেক নির্ব্বাচিত ভারতীয় সদস্য নিয়ে ব্যবস্থা-পরিষদগুলির গঠন, নির্ব্বাচিত সদস্যদের প্রশ্নজিজ্ঞাসা ও বজেট আলোচনার অধিকার, শাসন ও রাজস্ববিষয়ক আইন-প্রণয়নে তাঁদের মতামত গ্রহণ অর্থাৎ ভোটাধিকার-দান, নির্ব্বাচন-প্রণালী প্রভৃতি সম্পর্কে এই পরিকল্পনায় পরিষ্কার নির্দ্দেশ থাকে। নিখিল ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে ভারতীয় সদস্য নির্ব্বাচন করবেন প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদগুলির ভারতীয় সদস্যরা—এই মর্ম্মে উক্ত পরিকল্পনায় একটি সংশোধন প্রস্তাব উপস্থিত করেন লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক ও তা সমর্থন করেন পুণ্যশ্লোক গোপাল-কৃষ্ণ গোখ্‌লে। এ দু'জনকেই আমরা এই প্রথম কংগ্রেসে যোগ দিতে দেখি। দু'জনই ভারতমাতার সেবায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ।

বালগঙ্গাধর তিলক প্রথম যৌবনেই স্বদেশবাসীর মধ্যে শিক্ষাবিস্তারকল্পে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে 'ডেকান এডুকেশন সোসাইটি' ও একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্কুলটি কিছুকাল পরে ফাগুর্সন কলেজে পরিণত হয়। 'মরাঠা' ও 'কেশরী' নামে ইংরেজী ও মরাঠী দু'খানা সংবাদপত্রও সোসাইটির কর্ত্তৃত্বা-ধীনে প্রকাশিত হ'ত। সোসাইটির সভ্যগণ দরিদ্র জীবন যাপন করতেন ও মাসে পঁচাত্তর টাকার অধিক বেতন গ্রহণ করতেন না। 'কেশরী'তে বোম্বাই প্রদেশের এক মিত্ররাজ্যের শাসনবিধির সমালোচনা-প্রসঙ্গে গুপ্ত কথা প্রকাশের জন্য ৮৮২ সালে বিচারে তিলক ও তাঁর সহকর্ম্মী আগারকারের চার মাস কারাদণ্ড হয়। জনসেবায় তিলকের এই প্রথম কারাবাস। ১৮৯০ সালে সোসাইটির অন্যান্য পরিচালকগণের সঙ্গে সমাজসংস্কার সম্বন্ধে মতানৈক্য হেতু তিনি সোসাইটির সম্পর্ক ত্যাগ করেন এবং মরাঠা ও কেশরীর পরিচালনা ও সম্পাদনা ভার স্বয়ং গ্রহণ করেন। বিবাহসম্মতি আইন এই বৎসরই বিধিবদ্ধ হয়। তিলক এর বিরুদ্ধে জোর আন্দোলন চালান। গোখ্‌লের সঙ্গে তাঁর বিরোধিতা শুরু হয় এই সময় থেকে। তিলক শুধু অঙ্কশাস্ত্রেই কৃতবিদ্য ছিলেন

না, হিন্দুশাস্ত্রেও তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। মরাঠী 'গীতারহস্য' ও ইংরেজী 'ওরায়ন' তাঁকে অমর ক'রে রাখবে।

পুণ্যশ্লোক গোখ্‌লে উক্ত সোসাইটির দারিদ্র্য-ব্রতাবলম্বী সভ্য ও শিক্ষক। তিনি অর্থনীতিতে সুপণ্ডিত। আলোচনা ও গবেষণা ক'রে ভারতবর্ষের অবস্থা তিনি সম্যক অবগত হয়েছেন। সামাজিক বিষয়ে তিনি ছিলেন উদার প্রগতি-পন্থী, মহাদেবগোবিন্দ রাণাড়ের যোগ্য শিষ্য। তিনি ১৯০৫ সালে 'সার্ভেণ্ট অফ্‌ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' নামে এক ভারতসেবক-মণ্ডলী গঠন করেন। ব্রিটেনের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রকার হিতসাধন করাই এ সোসাইটিব উদ্দেশ্য। ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য হিসাবে গোখ্‌লের কার্য্য, বিশেষ—জনশিক্ষা-প্রবর্ত্তনে সরকারকে প্রবুদ্ধ করবার চেষ্টা তাঁর স্বদেশবাসীরা বহুকাল স্মরণ করবে। তিনি আমরণ কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন এবং ১৯০৫ সালে বারাণসী অধিবেশনে কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেন।

বোম্বাইয়ের অধিবেশনে গোখ্‌লে মহোদয় সিবিল সার্বিস সম্পর্কীয় প্রস্তাবের সমর্থনে একটি জোরাল বক্তৃতা করলেন। এ সম্বন্ধে পাবলিক সার্বিস কমিশনের মতামত আগে উল্লিখিত হয়েছে। সিবিল সার্বিসে মোট ৯৪১ জন কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিল। ১৮৭০ সালের পার্লামেণ্টীয় আইন অনুসারে এর এক-ষষ্ঠাংশ অর্থাৎ ১৫৮ জন ভারতীয় হবার কথা। কমিশন এই সংখ্যা কমিয়ে ১০৮ জন ভারতীয় নিয়োগের পক্ষে মত দেন। ঐ সংখ্যাও কিন্তু কমিয়ে আবার ৯৩ করা হ'ল। পর বৎসর কলকাতা অধিবেশনে গোখ্‌লে স্বয়ং এ ব্যবস্থার নিন্দা ক'রে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তিনি তখন এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, শিক্ষিত সমাজের উপর বিশ্বাস স্থাপন না করলে ও আশা-আকাঙ্ক্ষা-পূরণে এতখানি অমনোযোগী হ'লে ফল বিষময় হবে। গোখ্‌লের এ কথায় কর্ণপাত না ক'রে কর্ত্তৃপক্ষ তাঁরই পেছনে গোয়েন্দা লাগিয়েছিলেন।

প্রতিনিধিমূলক শাসনপ্রণালী-প্রবর্ত্তন ও শাসনকার্য্যে ভারতীয় নিয়োগের ব্যবস্থা এ দু-ই ছিল তখনকার দিনে কংগ্রেসের প্রধান দাবী। পার্লামেণ্টই এ সকলের নিয়ন্তা, একারণ নেতৃবৃন্দ বিলাতে জনমত-গঠনে উদ্যোগী হলেন। এ অধিবেশনেই এলান্‌ হিউম, আর্ডলি নর্টন, জর্জ্জ ইউল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়, আর. এন্. মুধোলকার, ফিরোজ শা মেহতা প্রভৃতিকে নিয়ে বিলাতে

এক প্রতিনিধিদল প্রেরণের ব্যবস্থা হ'ল। এই প্রতিনিধিদল ১৮৯০ সালে বিলাত গমন করেন। তাঁরা লণ্ডন, অক্সফোর্ড ও মফস্বলে নানা সভাসমিতিতে বক্তৃতা ক'রে ভারতবর্ষের দাবীসম্পর্কে ইংরেজ জনসাধারণকে ওয়াকিবহাল করার চেষ্টা করেন। সুরেন্দ্রনাথ বলেন, তাঁরা এবারে ইংরেজ সাধারণের বিশেষ সহানুভূতি লাভে-সমর্থ হয়েছিলেন। এ অধিবেশনে এই নিয়ম স্থির হ'ল যে, প্রতি দশ লক্ষ ভারতবাসী পিছু পাঁচ জন ক'রে প্রতিনিধি কংগ্রেসে যোগদান করতে পারবেন। সাধারণ সম্পাদক এলান্ হিউমের সহকারী নিযুক্ত হলেন এলাহাবাদের বিশিষ্ট জননেতা পণ্ডিত অযোধ্যানাথ। তাঁকে পরামর্শদানের জন্য বঙ্গে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মাদ্রাজে আনন্দ চার্লু ও বোম্বাইয়ে ফিরোজ শা মেহ্‌তা ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল নিযুক্ত হন।

কংগ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশন হ'ল কলকাতায়। পূর্ব্ব বৎসরে যে নিয়ম স্থির হয় তার ফলে এবারে প্রতিনিধি-সংখ্যা অনেক হ্রাস পেয়ে সাত শ'র কিছু উপরে গিয়ে দাঁড়াল। দর্শকসংখ্যা হ'ল প্রায় সাত হাজার। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হলেন বিখ্যাত ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ। মনোমোহন বরাবর ফৌজদারী মোকদ্দমায় আসামীপক্ষ সমর্থন করতেন। তিনি মোকদ্দমা-পরিচালনার সময় পুলিসের দৌরাত্ম্য ও শাসকবর্গের ঔদাসীন্য সবিশেষ আলোচনা করতেন। ফলে সে যুগে শাসকবর্গের অনাচার অনেকটা প্রশমিত হয়। মনোমোহন অসহায়ের বন্ধু, আবার দুর্নীতিপরায়ণ শাসকের ভীতির কারণ, এজন্য তাঁর সুনাম সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। মনোমোহন শাসনবিভাগ থেকে বিচারবিভাগ স্বতন্ত্র করার বরাবর পক্ষপাতী ছিলেন। প্রতি বছর কংগ্রেসে এবিষয়ক প্রস্তাব উত্থাপনেও তিনি ছিলেন অগ্রণী।

এবারকার মূল সভাপতি ফিরোজ শা মেহ্‌তাও বোম্বাইয়ের একজন বিখ্যাত ব্যারিষ্টার। ফিরোজ শার ধনবল প্রচুর, কর্ম্মশক্তি অসাধারণ, স্বৈর-শাসনেরও ঘোর বিরোধী। একারণ দাদাভাই নৌরজী বিলাতের স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার পর থেকেই বোম্বাইয়ের নেতৃত্বভার স্বভাবতই তাঁর উপর পড়ে। তিনি কংগ্রেসে কর্ত্তৃত্ব করেছেন বহুদিন।

পূর্ব্বেকার ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ আইনের সংশোধন ক'রে প্রতিনিধিমূলক শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তনের জন্য চার্লস ব্রাড্‌ল ১৮৯০ সালে পার্লামেণ্টে একটি

আইনের খসড়া পেশ করেন। এ খসড়ার ভিত্তিতে আইন প্রণয়ণের জন্য লালমোহন ঘোষ পার্লামেন্টকে অনুরোধ জানিয়ে কংগ্রেসে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। বলা বাহুল্য, প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হ'ল। ভারতীয় বজেট পেশের পূর্ব্বে যাতে কমন্স সভার সভাপতি ভারতীয়দের দাবী উপস্থাপিত করার সুবিধা দান করেন সে বিষয়ে অনুরোধ জানিয়ে এবাবে এক নূতন প্রস্তাব গৃহীত হয়। চিরস্থায়ী ব্যবস্থা একমাত্র বাংলারই নিজস্ব। যে-সব অঞ্চলে এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয় নি সে-সব স্থলে সরকারী রাজস্ববিভাগ এত দ্রুত কর বাড়াতে থাকে যে, প্রজাদের আর্থিক কষ্ট ও দুঃখ চরমে ওঠে। প্রতি বছর জমির খাজনা দেড় গুণ দ্বিগুণ বেড়ে গিয়ে শেষে পনর গুণ বিশ গুণে গিয়ে ঠেকেছিল। কংগ্রেসের একটি বক্তৃতায় প্রকাশ, একটি গ্রামে হিসাব করে দেখা যায়, ভূমির মোট উপস্বত্ব যা, খাজনাও ধার্য্য হয়েছে তাই। এজন্য পঞ্চম অধিবেশন থেকেই বঙ্গদেশের অনুরূপ অন্যান্য প্রদেশেও যাতে ভূমির চিরস্থায়ী ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয় সেজন্য প্রতি বছর কংগ্রেসে প্রস্তাব গৃহীত হ'তে থাকে। এবারেও এইরূপ একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

লবণ করের প্রতিবাদেও একটি প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। ১৮৮৮ সালে সরকারী আদেশে এই লবণ কর বসান হয়। দীন্‌শা এদুলজী ওয়াচা হিসাব ক'রে দেখান, এই অত্যাবশ্যক দ্রব্যটি প্রতি বছর ভারতবাসীরা প্রত্যেকে গড়ে মাত্র দশ পাউণ্ড খেতে পায়। ইউরোপে মাথা পিছু গড়ে ব্যবহৃত হয় ছাব্বিশ পাউণ্ড। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া কমিটির দ্বারা বিলাতে প্রচারকার্য্য চালাবার জন্য এবারে ব্যয়বরাদ্দ হ'ল চাল্লিশ হাজার টাকা, আর ভারতবর্ষের জন্য ব্যয় ধরা হ'ল মাত্র পাঁচ হাজার। কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ বিলাতে জনমতগঠনের প্রয়োজনীয়তা এতই অনুভব করলেন যে, ১৮৯২ সালে সেখানে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন করারও প্রস্তাব করেন। সুসাহিত্যক স্বর্ণকুমারী ঘোষাল, প্রথম ভারতীয় মহিলা-চিকিৎসক কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ পাঁচ জন মহিলা এবারকার অধিবেশনে যোগদান করেন। কাদম্বিনী সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়ে সংক্ষেপে কিছু ব'লেও ছিলেন।

ইংরেজ আমলে মাদক দ্রব্যের ব্যবহার শহর পল্লী সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এর প্রতিরোধকল্পে প্যারীচরণ সরকারের প্রচেষ্টার কথা আগে উল্লেখ করেছি। কর্ত্তৃপক্ষ খোলাভাটী-প্রথা প্রবর্ত্তন ক'রে দেশীয় মদ উৎপাদনে ও ব্যবহারে

এদেশবাসীকে উৎসাহ দিতে থাকেন। এক সময় সুরেন্দ্রনাথ, কৃষ্ণকুমার মিত্র, কালীশঙ্কর শুকুল ও সুগায়ক বরিশালবাসী বরদাপ্রসন্ন রায়ের সহযোগে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত করেছিলেন। বরিশালে অশ্বিনীকুমার দত্তও বিশেষভাবে আন্দোলন চালিয়ে বহু সুরাবিপণি ও সুরা-উৎপাদন কেন্দ্র বন্ধ করতে সক্ষম হন। বিলাতে পার্লামেণ্টেও কেন্ প্রমুখ ভারত-বন্ধুগণ গবর্ণমেণ্টের আবগারি নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। এর ফলে ভারত সরকার খোলাভাটি-প্রথা রহিত করতে অবহিত হলেন। কংগ্রেস এবারে এ বিষয়ের উল্লেখ ক'রে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করলেন।

১৮৯১ সালে নাগপুরে মাদ্রাজের বিখ্যাত আইনব্যবসায়ী আনন্দ চালুর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের সপ্তম অধিবেশন হ'ল। চার্লস্ ব্রাড্‌ল, মাধব রাও ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র এ বছর ইহধাম ত্যাগ করায় সভাপতি মহাশয় নিজ অভিভাষণে দুঃখ প্রকাশ করলেন। ভারতবর্ষ ও আফগানিস্তানের মধ্যে এবছর থেকে সীমানির্দ্দেশের কার্য্য শুরু হয়। শিক্ষিত সম্প্রদায় তখনও ১৮৭৮ সালের আফগান যুদ্ধ ও ভারতের উপর তার প্রতিক্রিয়ার কথা ভুলতে পারেন নি। কাজেই কংগ্রেস নেতৃবর্গ এই সীমানির্দ্দেশের মধ্যে আর-একটি যুদ্ধের সন্ধান পেলেন। সৈন্যব্যয়সম্পর্কে দীন্‌শা এদুলজী ওয়াচা এবারে হিসাব ক'রে দেখালেন যে, ১৮৬৪ হতে ১৮৮৫ সালের মধ্যে সৈন্যব্যয় বাড়ে মাত্র পাঁচ কোটি টাকা, আর ১৮৮৫-৮৬—১৮৯০-৯১ সালের মধ্যে তা বাড়ে চুয়ান্ন কোটি টাকা। আর এ বর্দ্ধিত হ'ল শুধু রুশিয়ার ভাবী আক্রমণ ঠেকাবার জন্য। তাই এ অধিবেশনে বালগঙ্গাধর তিলক এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, ভাবী আক্রমণের (যা পঁচিশ বছরের মধ্যে নাও হতে পারে) আশঙ্কায় জলের মত অর্থব্যয় না ক'রে, ভারতবাসীরা যাতে সত্য সত্যই আত্মরক্ষায় সমর্থ হ'তে পারে সেজন্য অস্ত্র-আইনের কঠোরতা ও পক্ষপাতিত্ব বিদূরণ, যুদ্ধবিদ্যাশিক্ষার জন্য মিলিটারী কলেজ স্থাপন, যোদ্ধৃ জাতিদের নিয়ে 'মিলিশিয়া' বা সৈন্যদল এবং বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায় থেকে স্বেচ্ছাসৈন্য নিয়ে রক্ষীবাহিনী গঠন করা হোক। আলী মহম্মদ ভীমজী, তিলকের প্রস্তাব সমর্থন ক'রে বলেন যে, জার্ম্মানীতে বাৎসরিক সৈন্যব্যয় মাথা পিছু ১৪৫ টাকা, ফ্রান্সে ১৮৫ টাকা, ইংলণ্ডে ২৮৫ টাকা আর ভারতবর্ষে ৭৭৫ টাকা।

বন-করের প্রতিবাদেও এবারে একটি প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। বন-আইন দ্বারা ভারতবাসীর যুগযুগান্তের অধিকার লোপ করা হয়। এর ফল কিরূপ বিষময় হ'ল একটি দৃষ্টান্তে তা বেশ বুঝা যাবে। বন-কর স্থাপনের ফলে সর্ব্বত্র গোচারণ-ভূমির বিশেষ অভাব ঘটে এবং এক মাদ্রাজেই এক বছরে তিন লক্ষ গরু মারা যায়। জনশিক্ষার ওজুহাতে উচ্চ শিক্ষা সঙ্কোচের জন্য সরকার শিক্ষা ব্যয় কমাতেও বদ্ধপরিকর হলেন এ সময়। শিক্ষাবিৎ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র একটি প্রস্তাবে এর প্রতিবাদ করেন এবং সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষা সম্পর্কে একটি কমিশন স্থাপনের জন্য সরকারকে অনুরোধ জানান।

কংগ্রেসের অষ্টম অধিবেশন হ'ল এলাহাবাদে। এলাহাবাদের জননায়ক পণ্ডিত অযোধ্যানাথ এবারে মারা যান। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হন পণ্ডিত বিশ্বম্ভর নাথ ও মূল সভাপতি হন কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। বিলাতের সেণ্ট্রাল ফিন্‌স্‌ব্যুরি কেন্দ্র হ'তে দাদাভাই নৌরজী ভারতীয়দের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম পার্লামেণ্টে সদস্য নির্ব্বাচিত হন, এজন্য উমেশচন্দ্র অভিভাষণে আনন্দ জ্ঞাপন করেন। সাধারণ নির্ব্বাচনের পূর্ব্বেই বিলাতের রক্ষণশীল সরকার ইণ্ডিয়া কৌন্সিল আইন পাস করলেন। নির্ব্বাচনের নিয়মাদি না জেনে আইন সম্পর্কে কোন মতামত প্রকাশ করতে সভাপতি মহাশয় দ্বিধা বোধ করেন। বঙ্গের কোন কোন জেলায় জুরীর ক্ষমতা সঙ্কুচিত করা হয়। উচ্চ শিক্ষার সঙ্কোচ-সাধন করা হ'ল এ বছরে। উমেশচন্দ্র তাঁর বক্তৃতায় এসব বিষয়ের উল্লেখ ক'রে তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। এ অধিবেশনে দার্শনিকপ্রবর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল শিক্ষাসম্পর্কীয় প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

১৮৯২ সালের 'ইণ্ডিয়া কৌন্সিলস্ এ্যাক্ট' বা ভারতের ব্যবস্থাপরিষদ আইনের কথা এইমাত্র উল্লেখ করলাম। ১৮৬১ সালের পরে এত কাল আর এ ধরণের আইন বিধিবদ্ধ হয় নি। কংগ্রেস প্রথম অধিবেশনেই প্রতিনিধিমূলক শাসন-পরিষদের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন ক'রে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন। ভারত-বর্ষের শাসনপ্রণালী ভারতবাসী নিয়ন্ত্রিত করলে দুঃখ-দৈন্যের অবসান হবে, কংগ্রেস নেতারা এই বিশ্বাসের অনুবর্ত্তী হয়ে বহু বৎসর আন্দোলন করেছেন। একটু আগে বলেছি, ১৮৯০ সালে চার্লস্ ব্রাড্‌ল হাউস অফ কমন্সে ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদ সম্পর্কে একটি আইনের খসড়া উপস্থিত করেন। ইতিমধ্যে

ব্রাড্‌ল সাহেব মারা গেলেন। তাঁর জীবিত কালেই কিন্তু ভারতসচিব লর্ড ক্রস হাউস অফ লর্ডসে সরকার পক্ষে একটি বিল উত্থাপন করেছিলেন। এ বিলে প্রত্যক্ষ নির্ব্বাচনের নামগন্ধও ছিল না। হাউস অফ কমন্সে এ বিল উত্থাপন করেন সহকারী ভারতসচিব মিঃ কার্জ্জন (তখনও তিনি লর্ড হন নি)। ক্রসের বিলই কমন্সে গৃহীত হয়ে আইনে পরিণত হ'ল।

সদস্য-নির্ব্বাচনের নিয়মাবলী রচনার ভার ভারত-গবর্ণমেণ্টের উপর দেওয়া হয়। কি নিখিল-ভারতীয় কি প্রাদেশিক সর্ব্বত্রই সদস্য-সংখ্যা হ'ল খুবই সামান্য। স্থির হয়, অন্যূন দশ জন ও অনধিক ষোল জন সদস্য নিয়ে ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদ, অন্যূন আট জন ও অনধিক কুড়ি জন সদস্য নিয়ে মাদ্রাজ ও বোম্বাই ব্যবস্থাপরিষদ, অনধিক কুড়ি জন সদস্য নিয়ে বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদ এবং পনর জন সদস্য নিয়ে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যা ব্যবস্থা-পরিষদ গঠিত হবে।

কংগ্রেসে যে-সব প্রস্তাব গৃহীত হয় ও ব্রাড্‌ল যে খসড়া পার্লামেণ্টে পেশ করেন তাতে প্রতিটি পরিষদের অর্দ্ধেক সদস্য প্রত্যক্ষভাবে ভারতীয়দের দ্বারা নির্ব্বাচিত হবার এবং এক-চতুর্থাংশ সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত ও বাকী অংশ সরকারী সদস্য হবার কথা ছিল। নির্ব্বাচন-প্রণালী এমন ভাবে ধার্য্য হয় যে, সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় থেকেও উপযুক্ত সংখ্যক সদস্য নির্ব্বাচিত হ'তে পারতেন। উক্ত আইনে কিন্তু এসব কিছুই গৃহীত হয় নি। বে-সরকারী ভারতীয় সদস্য-সংখ্যা নির্ণয়ের ভারও ভারত-গবর্ণমেণ্টের উপর ছেড়ে দেওয়া হ'ল। এবারে সদস্যগণ বজেট আলোচনা ও প্রশ্ন জিজ্ঞাসার অধিকার লাভ করলেন, কিন্তু বজেটের উপর ভোটদানের অধিকার এবারেও তাঁরা পেলেন না। এইরূপে কংগ্রেসী আন্দোলনের প্রথম পর্ব্ব শেষ হয়।

বহির্মুখী প্রচেষ্টা

দ্বিতীয় পর্ব্ব

(১৮৯৩-১৮৯৮)

মনোমোহন ঘোষ কংগ্রেসে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, বিলাতের বিখ্যাত নেতা জন ব্রাইট তাঁকে বলেন—নির্ম্মম শস্য-কর তুলে দেবার জন্য তাঁদের ত্রিশ বৎসর আন্দোলন চালাতে হয়েছিল। নবম কংগ্রেসের সভাপতি রূপে দাদাভাই নৌরজীও বলেন, শস্য আইন, দাসত্ব-নিরোধক আইন, কারখানা আইন, পার্লামেণ্টায় সংস্কার আইন প্রভৃতি পার্লামেণ্টে বিধিবদ্ধ করাবার জন্য ইংরেজদের দীর্ঘকাল আন্দোলন চালাতে হয়। তাঁদের এ কথার ব্যঞ্জনা এই যে, কংগ্রেস আন্দোলন চালিয়েছে মাত্র আট বছর, ব্রিটিশের নিকট থেকে সুযোগ সুবিধা আদায় করতে হ'লে আরও বহু বছর তাঁদের আন্দোলন করতে হবে। কাজেই নেতৃবর্গের নির্দ্দেশ অনুসারে কংগ্রেস ব্রিটিশ জনমত ও ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে অধিকতর ধৈর্য্যসহকারে আন্দোলন চালাতে তৎপর হলেন।

১৮৯২ সালে ভারতীয় সমস্যাসমূহের প্রতি পার্লামেণ্টের সদস্যগণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য দাদাভাই নৌরজী ও সার উইলিয়ম ওয়েডারবর্ণের চেষ্টায় একটি ইণ্ডিয়ান পার্লামেণ্টারী কমিটি গঠিত হয়। কমিটি অল্পকাল মধ্যেই এক শ' চুয়ান্ন জন পার্লামেণ্ট-সদস্যের সহানুভূতি-লাভে সমর্থ হলেন। এই সদস্যদের সাহায্যে একই সময়ে বিলাতে ও ভারতবর্ষে সিবিল সার্বিস পরীক্ষা-গ্রহণের প্রস্তাব ভারতসচিবের বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৮৯৩, ২রা জুন পার্লামেণ্টে গৃহীত হয়। এদিকে ব্যবস্থাপরিষদে সদস্যগ্রহণের নিয়মও সত্বর স্থিরীকৃত হ'ল। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের প্রস্তাবের নিরিখে বিশ্ববিদ্যালয়, মিউনিসি-পালিটি, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, করপোরেশন, বণিকসভা, জমিদারসভা প্রভৃতির উপর সদস্যের নাম সুপারিশ ক'রে লাট দপ্তরে পাঠাবার ভার দেওয়া হ'ল।

লাটসাহেব ইচ্ছা করলে এ-সব গ্রহণ করতে পারেন বা নাকচ করতেও পারেন। তবে সাধারণতঃ তাঁদের সুপারিশই তিনি গ্রহণ করতেন। নির্ব্বাচনপ্রথার গোড়াপত্তন হ'ল। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদে কুড়ি জন সদস্যের মধ্যে সাত জন ভারতীয় সদস্য গ্রহণের কথা হয়। কলকাতা করপোরেশন থেকে সর্ব্বপ্রথম সদস্য প্রেরিত হলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কংগ্রেসের নবম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হ'ল লাহোরে দাদাভাই নৌরজীর সভাপতিত্বে। জনহিতব্রতী সর্দ্দার দয়াল সিং মাজিটিয়ার নাম আমরা আগে পেয়েছি। তিনি হলেন অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি। এবারকার প্রতিনিধি-সংখ্যা ৮৬৭ ও দর্শকসংখ্যা চার হাজারের উপর। এখানে একটি কথা ব'লে রাখি যে, যে বছর যে কেন্দ্রে কংগ্রেসের অধিবেশন হ'ত সে বছর সে কেন্দ্র থেকে বিস্তর লোক কংগ্রেসে প্রতিনিধি রূপে প্রেরিত হতেন। এবারে পঞ্জাব থেকে চার শ' একাশী জন প্রতিনিধি কংগ্রেসে যোগদান করেন। দাদাভাই নৌরজী তাঁর অভিভাষণে কোন কোন বিষয়ে কংগ্রেসী আন্দোলনের সাফল্যের কথা উল্লেখ করেন, কিন্তু ব্রিটিশ জাতিকে এই অনুরোধও জানান যে, তাঁরা যেন তাঁর স্বদেশবাসীর প্রতি আস্থা স্থাপন ক'রে তাদের দাবিপূরণে সর্ব্বদা অবহিত থাকেন। ভারতের মর্ম্মান্তিক দারিদ্র্যের জন্য দাদাভাই শাসনব্যবস্থাকেই দায়ী করলেন। ভারতবাসী স্বোপার্জ্জিত ফলভোগে সমর্থ হ'লে রুশিয়াকে ব্রিটেনের ভয় করবার কোন কারণই থাকবে না। কারণ তখন তারা তার হয়ে লড়তে সক্ষম হবে। তিনি এই আশা ব্যক্ত ক'রে অভিভাষণ শেষ করলেন যে, অবিলম্বে ইংরেজ ও ভারতবাসী সকল বিষয়ে সমান অধিকার লাভ করবে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মত এবারেও নানা সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা হয় ও প্রস্তাব গৃহীত হয়। ব্যবস্থাপরিষদ আইনে প্রত্যক্ষ নির্ব্বাচন প্রথা স্বীকৃত হয় নি ব'লে এর সমালোচনা হ'ল খুব। বড়লাট ভারতীয় সদস্যগ্রহণের যে নিয়ম প্রবর্ত্তন করেছেন ও বোম্বাইয়ে যেভাবে পরিষদে সদস্য গৃহীত হয়েছে, গোখ্‌লে একটি বক্তৃতায় তার কঠোর সমালোচনা করেন। সুরেন্দ্রনাথ সিবিল সার্বিস প্রস্তাবগ্রহণের কথা উল্লেখ ক'রে পার্লামেণ্টকে অভিনন্দন জানান। পঞ্জাবে ব্যবস্থাপরিষদ প্রবর্ত্তনের জন্য আর-একটি প্রস্তাব পাস হয়। লালা লাজপত রায় একটি বক্তৃতায় শিক্ষা সম্পর্কে সরকারী নীতির তীব্র সমালোচনা

করেন। তিনি বলেন, "আমরা ধনজন দিয়ে মিশরে, আবিসিনিয়ায় ও আফ্‌গানিস্তানে ব্রিটিশের সাহায্য করেছি, আর তার প্রতিদানেই আমাদের শিক্ষাসঙ্কোচের ব্যবস্থা চলেছে!" এবারে নূতন ক'রে এক প্রস্তাব উথাপন করেন ডাক্তার বাহাদুরজী। ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্বিসে ভারতীয় নিয়োগের দাবি তিনি এ প্রস্তাবে জানালেন।

কংগ্রেসের দশম অধিবেশন (১৮৯৪) হ'ল মাদ্রাজে। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি রঙ্গিয়া নাইডু ভারতবর্ষের দারিদ্র্যের কারণসমূহ বিশ্লেষণ ক'রে বললেন, 'শাসকবর্গ বিদেশ থেকে ভারত শাসন করেন ব'লে ভারতীয় রাজস্বের উপর অত্যধিক টান পড়ে। রাজস্বের এক-তৃতীয়াংশ সৈন্যরক্ষার জন্য ব্যয় হয়, অবাধ বাণিজ্যনীতি প্রবর্ত্তনে ভারতবর্ষ-জাত শিল্পাদির বিলোপ সাধিত হয়েছে। এসব কারণেই ভারতবর্ষ আজ শ্রীহীন।' এবার মূল সভাপতি হ'লেন পার্লামেণ্টের আইরিশ সদস্য মিঃ এলফ্রেড ওয়েব। তিনি হিসাব ক'রে দেখান, ভারতীয় রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ প্রতি বছর ভারতবর্ষের বাইরে ব্যয়িত হয়। এরূপ ব্যবস্থা বহুদিন চললে দেশ গরীব হবে না ত কি?

এবছরে দু-একটি বিসদৃশ ব্যাপার ঘটল। প্রথম, ভারত-গবর্ণমেণ্টের বিরোধিতা অগ্রাহ্য ক'রে সকৌন্সিল ভারতসচিব ভারতবর্ষের বস্ত্রশিল্পের উপর কর বসালেন। বস্ত্রশিল্প কারখানার তখন সবে শৈশব অবস্থা। এ সময়ে এরূপ বাধা নূতন শিল্পের পক্ষে মারাত্মক। কিন্তু ভারতসচিবের মতে ব্রিটিশ তথা লাঙ্কাশায়ারের স্বার্থ যে ভারতীয় স্বার্থের চেয়ে বড। কংগ্রেস প্রথম প্রস্তাবেই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন। ইণ্ডিয়া কৌন্সিল উচ্ছেদ সম্পর্কে ব্যারিষ্টার আর্ডলি নর্টন একটি প্রস্তাব উথাপন করেন। ইণ্ডিয়া কৌন্সিল ভারতীয় স্বার্থের কিরূপ বিরোধী, গ্লাড্‌ষ্টোন ও অন্যান্য ব্রিটিশ রাজনীতিকদের অভিমত উদ্ধৃত ক'রে তিনি সকলকে তা বুঝিয়ে দেন। শাসন ব্যয় সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য একটি কমিশন বসাতে পার্লামেণ্টকে অনুরোধ জানিয়ে কংগ্রেস আর-একটি প্রস্তাব গ্রহণ করলেন।

তৃতীয়টি সিবিল সার্বিস পরীক্ষাগ্রহণ সম্পর্কে। একই সময়ে বিলাতে ও ভারতে সিবিল সার্বিস পরীক্ষাগ্রহণের অনুকূলে হাউস অফ কমন্সে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় সে সম্পর্কে ভারতসচিব ভারত-গবর্ণমেণ্ট ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট-

গুলির নিকট মতামত চেয়ে পাঠান। এক মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট ছাড়া অন্য সব প্রাদেশিক গবর্ণেমণ্ট ন্যায় ভারত-গবর্ণমেণ্ট উক্ত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। ভারত-গবর্ণমেণ্ট এই সব মতামত ভারতসচিবকে পাঠিয়ে দিলেন। বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের আপত্তি খুবই কৌতুককর। তাঁরা বলেন, ভারতেও পরীক্ষাগ্রহণ আরম্ভ হ'লে বিলাতে প্রতিযোগী গ্রহণের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হবে ও এজন্য আয়ার্লণ্ডের ও কানাডা অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি উপনিবেশের প্রার্থীদের বিশেষ অসুবিধা ঘটবে! ভারতসচিব ১৮৯৪, ১৯শে এপ্রিল ভারত-গবর্ণমেণ্টকে জানান যে, পার্লামেণ্টে গৃহীত হ'লেও তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এ প্রস্তাব কার্য্যকরী হবে না। পার্লামেণ্টে গৃহীত প্রস্তাব প্রকারান্তরে অকেজোই করা হ'ল।

একাদশ অধিবেশন হয় পুণা শহরে। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি বর্ষীয়ান্ রাও বাহাদুর ডি এম্ ভিদে মারাঠার পূর্ব্ব গৌরব স্মরণ ক'রে এই আশা ব্যক্ত করলেন যে, ভারতবর্ষ এমন একটি জাতিতে পরিণত হবে যার ভিত্তি হবে দৃঢ়, প্রস্তরবৎ শক্ত। এবারকার সভাপতি হলেন দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে সভাপতি-পদে বরণ করবার সময় ডাঃ বাহাদুরজী বলেন, "সুরেন্দ্রনাথের নাম করলেই আত্মত্যাগ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, স্বদেশপ্রেম, অপূর্ব্ব বাগ্মিতা-শক্তি, এবং ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের একটি পরিপূর্ণ মূর্ত্তি আমাদের চোখের সম্মুখে ভেসে উঠে।"

সুরেন্দ্রনাথ সভাপতির মঞ্চ থেকে দীর্ঘ আড়াই ঘণ্টাকাল অনর্গল বক্তৃতা করেন। কংগ্রেসের ইতিহাসে এ দৃশ্য নূতন। ভারতবর্ষ ও ভারতশাসন সম্পর্কীয় যাবতীয় বিষয়ই তিনি বক্তৃতায় আলোচনা করলেন। কংগ্রেসমণ্ডপে সমাজসংস্কার সম্মেলনের অধিবেশন সম্পর্কে রক্ষণশীল বালগঙ্গাধর তিলক ও উদারপন্থী গোপালকৃষ্ণ গোখ্লের মধ্যে বিতর্ক ও কলহের সৃষ্টি হয়। সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ এ বিষয়ে বলেন যে, কংগ্রেস সম্মিলিত জাতীয় প্রতিষ্ঠান। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, পার্শী, শিখ, রক্ষণশীল, উদারপন্থী সকলেরই আশ্রয়স্থল। আমাদের রাষ্ট্রীয় অধিকার-প্রসারের ও দাবিপূরণের জন্যই এর সৃষ্টি। সমাজ-সংস্কারের আলোচনা এখানে হওয়া বিধেয় নয়। সুরেন্দ্রনাথ স্বয়ং ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য। কাজেই নিজ অভিজ্ঞতা থেকে পরিষদের কর্ম্মপ্রণালী ও

তাঁদের ক্ষমতা সম্পর্কেও তিনি বিশেষভাবে বর্ণনা করেন। ব্যবস্থাপরিষদ-গুলিতে জনসংখ্যার অনুপাতে ভারতীয়দের কত সামান্য আসন দেওয়া হয়েছে তার উল্লেখ ক'রে তিনি বলেন যে, বাংলা দেশের লোকসংখ্যা সাত কোটি, কিন্তু পরিষদে প্রতিনিধি গৃহীত হয়েছেন মাত্র সাত জন। আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে তিনি বলেন, গত ষাট বছরের মধ্যে ভারতবর্ষের রাজস্বে একচল্লিশ কোটি টাকা ঘাটতি পড়েছে, আর জাতীয় ঋণ বৃদ্ধি পেয়েছে বিশ কোটি থেকে দু'শ দশ কোটি টাকায়! এর মধ্যে বিয়াল্লিশ কোটি টাকা বেড়েছে গত দশ বছরেরই ভিতর। ব্রিটিশ রাজ্য উত্তর-পূর্ব্ব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে প্রসারিত করার যে বাতুলতাসুলভ প্রচেষ্টা তার ফলেই এই বিষম অবস্থার সূত্রপাত। কিন্তু তিনি ইংলণ্ডের সদিচ্ছায় আস্থাবান। তার আওতায় এসে তার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে বহু দেশ যেমন স্বাধীনতা লাভ করেছে, ভারতবর্ষও এক দিন সেরূপ স্বাধীনতা লাভ করবে—এই ব'লে সুরেন্দ্রনাথ তাঁর বক্তৃতা পরিসমাপ্ত করেন।

প্রথম প্রস্তাবে তিন মাসের মধ্যে কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র প্রণয়ন ক'রে সাধারণ সম্পাদক ও ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেলকে প্রেরণ করতে জানকীনাথ ঘোষাল পুণা-সমিতিকে অনুরোধ জানান। দ্বিতীয় প্রস্তাব উত্থাপন করেন বৈকুণ্ঠনাথ সেন। এ সময়ে ভারতীয় রাজস্বব্যয় সম্পর্কে একটি পার্লামেণ্টারি কমিটি বসেছিল। কমিটির আলোচ্য বিষয় যাতে ব্যাপকতর করা হয়, এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য হ'ল তাই। অর্থাৎ, কোন্ কোন্ খাতে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয় তাই শুধু না দেখে কি ধরণের নীতি দ্বারা চালিত হয়ে এরূপ ব্যয় করা হচ্ছে তা-ও যেন নির্ণয় করা হয়। এ প্রস্তাবটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঐ কমিশনই ওয়েলবি কমিশন নামে পরিচিত। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় একটি তথ্যপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতায় সিবিল সার্বিস, পেন্সন, ভাতা, সুদ (এক কথায় 'হোম চার্জ্জেস'), সামরিক ব্যয়, বাণিজ্যনীতি প্রভৃতি কোটি কোটি ভারতবাসীর কিরূপ মৃত্যুর কারণ হয়েছে তা তিনি বিশেষরূপে ব্যক্ত করেন।

উপনিবেশসমূহে প্রবাসী ভারতীয়ের প্রতি ইউরোপীয়দের ব্যবহার নির্ম্মম। এ সময় দক্ষিণ আফ্রিকা প্রবাসী ভারতীয়দের ব্যবসা ও অন্যান্য অধিকার-লোপেরও বিশেষ ব্যবস্থা হয়। কংগ্রেস এর প্রতিবাদ ক'রে এই প্রথম এক প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। এ অধিবেশনে বিখ্যাত ভারতবন্ধু রেভারেণ্ড জাবেজ টি.

সাণ্ডার্লণ্ড যোগ দান করেন ও হেরম্বচন্দ্র মৈত্র কর্তৃক উত্থাপিত শিক্ষাসংকোচ সম্পর্কে সরকারী নীতির প্রতিবাদ-প্রস্তাব সমর্থন করেন। রেলে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের অসুবিধা সম্পর্কেও এক প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সিবিল সার্বিস সম্পর্কীয় প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এবারেও ব্রিটিশ কমিটির জন্য ষাট হাজার টাকা ব্যয় ধার্য্য হয়। দীন্‌শা এদুলজী ওয়াচা হিউম সাহেবের সহযোগীরূপে জয়েণ্ট জেনারেল সেক্রেটারী নিযুক্ত হলেন।

১৮৯৬ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের দ্বাদশ অধিবেশন হ'ল। এবারকার অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ছিলেন রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়। তিনি এ সময় অসুস্থ থাকায় তাঁর অভিভাষণ পাঠ করেন বিখ্যাত ব্যবহারজীবী ডক্টর রাসবিহারী ঘোষ। এ বছর প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ মারা যান। রমেশচন্দ্র অভিভাষণে তাঁর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। এ সময় একটি কথা উঠে যে, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ যেমন ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি শিক্ষিত ভারতীয়ের চেয়ে জনসাধারণের অবস্থা ভাল জানেন ও তাঁরাই তাদের অধিকতর মঙ্গল সাধন ক'রে থাকেন। রমেশচন্দ্র বলেন, শিক্ষিত ভারতবাসীই দরিদ্র নিরক্ষর ভারতীয় জনসাধারণের স্বাভাবিক ও অবিসংবাদিত নেতা।

মূল সভাপতি মহম্মদ রহিমুতুল্লা সায়ানি। কংগ্রেসে এই বার বছরে দু'জন মুসলমান সভাপতি হলেন। সায়ানি তাঁর অভিভাষণে বিশদ আলোচনা ক'রে দেখান যে, মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগদানের আপত্তির কারণগুলি সবই ভুয়ো। তিনি জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলকে কংগ্রেসে সম্মিলিত হ'তে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন।

এবারকার কংগ্রেসে কতকগুলি নূতন বিষয়েরও প্রস্তাব ও আলোচনা হ'ল। ভারত-সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে রাজস্ববণ্টনের কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম ছিল না। ভারত-সরকার উচ্চতম কর্তৃপক্ষ। প্রাদেশিক সরকারগুলি তাদের হুকুম তামিল করতে বাধ্য। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে প্রাদেশিক রাজস্বের বেশীর ভাগই ভারত-গবর্ণমেণ্ট গ্রাস ক'রে ফেলতেন। প্রতি বছর প্রাদেশিক সরকারের যা' কিছু টাকা উদ্‌বৃত্ত থাকত, পাঁচ বছর অন্তে হিসাব হ'লে তাও আবার তাঁরা নিয়ে নিতেন। অথচ জাতির সকল রকম গঠনমূলক কার্য্য যেমন—শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্পোন্নতি প্রভৃতি সকলই ছিল একান্তভাবে প্রাদেশিক

সরকারগুলিরই করণীয়। প্রতি বছর ভারত-গবর্ণমেণ্টকে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিয়ে বাকী সবই যাতে প্রাদেশিক সরকারগুলি নিজ নিজ প্রদেশের জন্য ব্যয় করতে পারেন, সরকারকে তার ব্যবস্থা করবার অনুরোধ জানিয়ে বালগঙ্গাধর তিলক কংগ্রেসে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, ভারত-সরকার অমিতব্যয়ী স্বামী, সর্ব্বরকম খেয়াল খুশী চরিতার্থ করার জন্য চাই তার অর্থ; প্রাদেশিক সরকারগুলি তার এক একটি পত্নী। যা-কিছু পুঁজিপাটা আছে নীরবে সব দিয়েও এদের সোয়াস্তি নেই।

দ্বিতীয় নূতন প্রস্তাব উত্থাপন করেন আনন্দমোহন বসু মহাশয়। শিক্ষা-বিভাগে ভারতীয়দের প্রতি অবিচার ও অসম ব্যবহার এ প্রস্তাবের মূল বস্তু। তিনি বলেন, ১৮৮০ সালের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে অন্ততঃ শিক্ষাবিভাগে ইউরোপীয় ও ভারতীয়ের মধ্যে কোন তারতম্য করা হ'ত না। তাঁরা সকলেই সমান বেতন পেতেন ও পাঁচ শ' টাকা মাসিক বেতনে তাঁদের চাকরি আরম্ভ হ'ত। ১৮৮০ সালে ভারতীয় কর্ম্মচারীদের প্রারম্ভিক বেতন কমিয়ে তিন শ' তেত্রিশ টাকা ও ১৮৮৯ সালে আড়াই শ' টাকা করা হয়। তখন পর্য্যন্তও কিন্তু পদমর্য্যাদা সমান ছিল। ১৮৯৬ সালে যে ব্যবস্থা হয়েছে তাতে বেতনের তারতম্য ত আছেই, উপরন্তু পদমর্য্যাদারও তারতম্য করা হয়েছে। শিক্ষাবিভাগের উচ্চতম চাকরিগুলি দু' শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েছে—ভারতীয় ও প্রাদেশিক। ভারতীয় শ্রেণীতে বিলাতে নিযুক্ত ব্যক্তিরা থাকবেন, প্রাদেশিক শ্রেণীতে থাকবেন ভারতে নিযুক্ত ব্যক্তিরা। বিলাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হ'লেও ভারতীয়েরা এই দ্বিতীয় শ্রেণীতে নিযুক্ত হবেন। কয়েকটি কলেজের অধ্যক্ষ পদেও তাঁরা নিযুক্ত হ'তে পারবেন না স্থির হয়। এইরূপ বিসদৃশ ব্যাপারের ফলে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মত বিখ্যাত বৈজ্ঞানিককেও প্রাদেশিক বিভাগেই চিরদিন কর্ম্ম করিতে হয়েছে। আনন্দমোহন কংগ্রেসমণ্ডপ থেকে এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান।

রেভাঃ কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামের সঙ্গে আমরা ইতিপূর্ব্বে পরিচিত হয়েছি। তিনি বরাবর কংগ্রেসে উপস্থিত থেকে কোন-না-কোন প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে এক একটি পরীক্ষাকেন্দ্র না ক'রে শিক্ষা-কেন্দ্রে পরিণত করার প্রস্তাব এবারেই প্রথম কংগ্রেস থেকে উত্থাপিত হয়,—আর এ

প্রস্তাবের মূল হলেন কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও যে শিক্ষা-কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে তার সূচনা এই প্রস্তাবেরই মধ্যে। কালীচরণ বলেন, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের মত বৈজ্ঞানিক প্রতিভা উচ্চতম শিক্ষায় ও গবেষণায় নিয়োজিত না হ'লে দেশের উন্নতির সম্ভাবনা নেই।

কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনে আসাম চা-বাগানের শ্রমিক সম্বন্ধে প্রস্তাব তুলতে দেওয়া হয় নি এই কারণে যে, এ একটি প্রাদেশিক প্রশ্ন। বস্তুতঃ এ প্রশ্ন যে মোটেই প্রাদেশিক নয়, পূর্ব্বেই তা দেখান হয়েছে। চা-শ্রমিকদের দুরবস্থা ও তার প্রতিকার সম্পর্কে প্রস্তাব উত্থাপন করেন যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়। তিনি বলেন যে, চা-করদের দুর্ব্যবহারের কথা শুনে আসামগামী শ্রমিকদের ষ্টীমার থেকে ব্রহ্মপুত্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন! বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় স্বাভাবিক ওজস্বিনী ভাষায় চা-শ্রমিকদের দুর্দ্দশার কথা বর্ণনা করলেন।

মাদ্রাজ ও বোম্বাই গবর্ণরের শাসনপরিষদ দু'জন সদস্য নিয়ে গঠিত। একটি প্রস্তাবে এই সদস্য সংখ্যা বাড়িয়ে তিন জন করার ও তৃতীয় সদস্যপদে কোন বে-সরকারী ভারতীয় নিয়োগের দাবি জানান হয়। পরে প্রাদেশিক ও ভারতীয় শাসনপরিষদে, এমন কি ভারতসচিবের কৌন্সিলে যে ভারতীয় সদস্য গৃহীত হয়েছেন তার মূল আমরা এই প্রস্তাবের ভিতরেই পাই। সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ (পরে লর্ড) আর একটি নূতন প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এ ধরণের প্রস্তাব পূর্ব্বে কংগ্রেস মঞ্চ থেকে উত্থাপিত হয় নি। এ সময়ে ঝালোয়ারের মহারাজাকে কোন অপ্রকাশ্য কারণে গদিচ্যুত করা হয়। সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন এই দাবি ক'রে প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ও রাজন্যদের গ্রহণযোগ্য কোন সাধারণ ট্রাইবুনালে প্রকাশ্য বিচার ব্যতিরেকে মহারাজাদের গদিচ্যুত করা বাঞ্ছনীয় নয়। কংগ্রেস নেতৃবর্গ অতঃপর রাজন্য-ভারতের প্রতি যতই আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকেন, সরকারী নীতিও তদনুযায়ী পরিবর্ত্তিত হ'তে শুরু হয়।

এ সময় দুর্ভিক্ষ ভারতময় ছড়িয়ে পড়ে। সুরেন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে প্রস্তাব উত্থাপন ক'রে বলেন, গবর্ণমেণ্ট-অনুসৃত নীতির ফলে ভারতে আজ এই দুর্দ্দিন উপস্থিত। আকবরের আমলে শ্রমিকগণ যে পরিমাণ মজুরি পেত, এখন তার

চেয়ে ঢের কম পায়। অথচ জীবিকানির্ব্বাহের ব্যয় বহুগুণ বেড়ে গেছে। ভারতের দারিদ্র্যসম্পর্কে প্রত্যেকবার পার্লামেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এবারে এ সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপন করেন আর. এন. মুধোলকর। তিনি বলেন, ভারতের সর্ব্বত্র চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, কৃষিব্যাঙ্ক, কারিগরি শিক্ষার প্রবর্ত্তন ও আয়কর হ্রাস না হ'লে ভারতবাসীর দারিদ্র্য মোচন হওয়া কঠিন। তখন পাঁচ শ' টাকা বার্ষিক আয়ের উপরেও আয়কর ধার্য্য হ'ত! সরকারী চিকিৎসা-বিভাগে বৈষম্য বিদূরণের প্রস্তাব করেন এবারে ডাঃ নীলরতন সরকার। দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবাসী ভারতীয়দের দুর্দ্দশার কথা পরমেশ্বরম্ পিলৈ একটি প্রস্তাবে বিবৃত করেন। তিনি বলেন, 'ভারতবর্ষে এখন আমরা ব্যবস্থাপরিষদের সদস্য হ'তে পারি। পার্লামেন্টের দ্বারও আমাদের নিকট মুক্ত। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় ছাড়পত্র ছাড়া ভারতীয়দের চলাফেরা পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ। রাত্রে ঘরের বার হ'তে দেওয়া হয় না, নির্দ্দিষ্ট জায়গা ছাড়া অন্যত্র বসবাস করতে তারা অক্ষম, রেলের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে তাদের গমনাগমন নিষিদ্ধ। ট্রাম থেকে ভারতীয়দের ফুটপাথে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া সেখানকার দৈনন্দিন ব্যাপার। হোটেলে আহার বা সাধারণগম্য পথে গমন করতেও তাদের দেওয়া হয় না; ভারতীয়ের গায়ে থুথু দেওয়া হয়, আরও কতরকম অপমান নির্যাতন যে তাদের সহ্য করতে হয় তার ইয়ত্তা নেই।' নাটালে এই সময় একটি কঠোর আইন পাস হয়—চুক্তির মেয়াদ ফুরোলে হয় ভারতীয়দের নূতন চুক্তিতে আবদ্ধ হ'তে হবে, নতুবা মাথা পিছু বছরে তিন পাউণ্ড ক'রে সরকারে টেক্স দিতে হবে। আর ভারত-গবর্ণমেণ্টও এই প্রস্তাবে সম্মতি দান করেছিলেন।

এবারকার কংগ্রেসের একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল শিল্পপ্রদর্শনী। শিল্পপ্রদর্শনী এখন কংগ্রেসের একটি বিশেষ অঙ্গ, কিন্তু এখানেই তার সূত্রপাত। কংগ্রেসনেতা দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় এই শিল্পপ্রদর্শনী অনুষ্ঠানের মূলে ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য কংগ্রেস-কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে তাঁকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন।

কংগ্রেসের ত্রয়োদশ অধিবেশন হ'ল বেরারের রাজধানী অমরাবতীতে। ১৮৯৭ সাল ভারতবাসীর পক্ষে নানা কারণে স্মরণীয়। স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ সালে আমেরিকার শিকাগো বিশ্বধর্ম্ম সম্মেলনে হিন্দুধর্ম্মের একমাত্র প্রতিনিধি-রূপে উপস্থিত হয়ে বক্তৃতা করেন। তাঁর এই বক্তৃতায় ও পরবর্ত্তী কয়েকবছর

যাবৎ হিন্দুধর্ম্মের মূলতত্ত্ব প্রচারহেতু বিদেশে—ইউরোপে ও আমেরিকায়, ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর মর্য্যাদা আশ্চর্য্যরকম বর্দ্ধিত হয়। স্বামীজী পুরো চার বছর পরে ১৮৯৭ সালের জানুয়ারী মাসে ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন ও সর্ব্বত্র দিগ্বিজয়ী বীরের সম্মান লাভ করেন। ভারতবাসী তাঁর মধ্যে অপূর্ব্ব সাহস, তেজ, শক্তি ও পরিপূর্ণতার প্রকাশ দেখে দুঃখদৈন্যের ভিতরেও যেন শক্তিমান হয়ে উঠল। পরমহংসদেবের শিক্ষায় বিবেকানন্দ শক্তিমান্, স্বদেশে ফিরে নরনারায়ণের সেবায় তিনি আত্মোৎসর্গ করলেন। বেলুড় মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন তাঁর অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। তিনিই প্রথম ভারতবাসীকে বহির্মুখী মনোবৃত্তি পরিত্যাগ ক'রে নিজের দোষ-ত্রুটি ক্ষালনে অবহিত হ'তে উপদেশ দিলেন। 'ভারতবর্ষের দুঃখদৈন্যের জন্য ভারতবাসীই দায়ী, তা নিরাকরণের উপায়ও তারই হাতে'—এই মহামূল্য বাণী তিনিই ভারতময় প্রথম প্রচার করেন।

এ বছরটি আরও নানা কারণে স্মরণীয়। ভারত-সরকারের অমিতব্যয়িতার কথা কংগ্রেস বরাবর ঘোষণা ক'রে এসেছেন। ব্যয়সঙ্কোচের জন্য নানারূপ প্রস্তাব ত নেতৃবর্গ করেছেনই। এই আন্দোলনের ফলে পার্লামেণ্ট সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য একটি কমিশন বসান। লর্ড ওয়েলবী সভাপতি ছিলেন ব'লে এ কমিশন ওয়েলবী কমিশন নামে পরিচিত। ভারতবন্ধু সার উইলিয়ম ওয়েডারবর্ণ, ডবলিউ. এস্. কেন ও দাদাভাই নৌরজী কমিশনের সদস্য ছিলেন। কমিশনে সাক্ষ্য দেবার জন্য ভারতবর্ষ থেকে চারজন আহূত হন। এঁরা হলেন বোম্বাইয়ের দীন্‌শা এডুলজী ওয়াচা, পুণার গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে, মাদ্রাজের জি. সুব্রহ্মণ্য আয়ার ও বাংলার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। দাদাভাই নৌরজী সদস্য হ'লেও কমিশনের সপক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। সাক্ষ্যদানের পরে নেতৃবর্গ ভারতে ফিরে আসেন ও পরবর্ত্তী কংগ্রেসে যোগদান করেন।

সুরেন্দ্রনাথ জুন মাসেই কলকাতায় ফিরে এলেন। এই জুন মাস বাঙালীর নিকট আর-একটি কারণে স্মরণীয়। সমগ্র বাংলা, বিহার ও আসাম জুড়ে ১২ই জুন এক ভীষণ ভূমিকম্প হয়। তাতে ধনপ্রাণ নাশ হয় বিস্তর। ভূমিকম্পের সময় রাজশাহীর অন্তর্গত নাটোরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের তৃতীয় দিনের অধিবেশন হচ্ছিল, অধিবেশন শেষ হবার মুখেই এই ভূমিকম্প হয়।

পূর্ব্ব বছর থেকেই দুর্ভিক্ষ ভারতময় ছড়িয়ে পড়েছে। কংগ্রেসমঞ্চ থেকে সুরেন্দ্রনাথ এ নিয়ে দুর্ভিক্ষপীড়িত জনসাধারণের সাহায্যের জন্য সকলের নিকট আবেদন জানান। বোম্বাইয়ে এ সময় ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। তা ছাড়া এখানে আরও একটি নূতন বিপদ দেখা দিল। প্লেগ মহামারী সর্ব্বপ্রথম ভারতের বোম্বাই প্রদেশে আবির্ভূত হয় ও শত শত লোকের প্রাণহানি ঘটাতে থাকে। লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণে ভীষণ আতঙ্কের উদ্রেক হ'ল। সরকার প্লেগ কমিটি প্রতিষ্ঠা করলেন। পুণায় প্লেগ-নিবারণের জন্য যে সব উপায় অবলম্বিত হ'ল তা নিয়ে খুবই কথা উঠে। সরকারী কর্ম্মচারী হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকলের গৃহে এমন কি অন্তঃপুরে প্রবেশ করে, দেবমন্দির ও মস্‌জিদে ঢুকে প্লেগাক্রান্ত ব্যক্তি অন্বেষণের সময় এমনভাবে কার্য্য ক'রে চলল যা জনসাধারণের পক্ষে খুবই আপত্তিজনক। 'প্লেগ কর্ম্মচারীদের চেয়ে প্লেগ ভাল'—উত্যক্ত হয়ে লোকে এরূপ কথাও বলতে লাগল। নাটু-ভ্রাতৃদ্বয় এর প্রতীকারের আশায় উচ্চতম কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এক আবেদনলিপি প্রেরণ করেন। নাটু-ভ্রাতৃদ্বয়ের নাম আজ জাতীয় ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে। সর্দ্দার নাটু ও তাঁর ভ্রাতা বংশপরম্পরায় রাজভক্ত প্রজা। মরাঠা দেশে ইংরেজ-আধিপত্য স্থাপনে ব্রিটিশকে তাঁদের পূর্ব্বপুরুষগণ সাহায্য করেন। এর পুরস্কার স্বরূপ ইংরেজের নিকট থেকে তাঁরা জায়গীরও ভোগ করতেন।

প্লেগ কমিটির উপর লোকের বিদ্বেষ এত বেড়ে গেল যে, এর সভাপতি মিঃ র‍্যাণ্ড ও কর্ম্মচারী লেফ্‌টন্যাণ্ট এয়ারেষ্ট আততায়ীর হাতে প্রাণ বিসর্জ্জন দেন। আততায়ীরা অবিলম্বে ধরা পড়ল ও বিচারে চরম দণ্ডে দণ্ডিত হ'ল। কিন্তু ভারতীয় আমলাতন্ত্র এতেই নিরস্ত হ'ল না। যে নাটু-ভ্রাতৃদ্বয় আগেই তাদের সতর্ক ক'রে দিয়েছিলেন তাঁদের উপরই কোপ পড়ল। নাটু-ভ্রাতৃদ্বয় ১৮২৭ সালের বোম্বাই রেগুলেশন অনুযায়ী বিনা বিচারে বন্দী হলেন। তাঁদের সম্পত্তিও সরকারে বাজেয়াপ্ত হ'ল। তাঁরা আঠার মাস বন্দী জীবন কাটিয়ে মুক্তিলাভ করেন। এ নিয়ে তখন ভারতবর্ষে খুবই আন্দোলন ও বিক্ষোভ উপস্থিত হয়! কিন্তু আর যে একটি ব্যাপার ঘটল তাতে আমলাতন্ত্রের নিপীড়ন নীতি অন্য সকল ব্যাপার ছাপিয়ে উঠল।

বালগঙ্গাধর তিলক কংগ্রেসের একজন বিশিষ্ট নেতা। তাঁর কথা ইতিপূর্ব্বে

কিছু বলেছি। তিনি পাঁচ বছর একাদিক্রমে বোম্বাই প্রাদেশিক সম্মেলনের সম্পাদক ছিলেন। ১৮৯৫ সালে কংগ্রেসের পুণা অধিবেশনে অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদকরূপে কিছুকাল তিনি কাজ করেন। পরে সমাজসংস্কার সম্মেলন সম্পর্কে মতদ্বৈধতা হেতু সম্পাদকের পদ ছেড়ে দেন। তিনি আড়াই বছর যাবৎ বোম্বাই ব্যবস্থাপরিষদের সদস্য ছিলেন। তিলক ১৮৯৩ সালে গণপতি-উৎসব ও ১৮৯৫ সালে শিবাজী-উৎসবের সূচনা করেন। তদবধি প্রতি বছর শিবাজীর জন্মদিনে এই উৎসব প্রতিপালিত হ'তে থাকে। এই সব কারণে ইতিমধ্যেই তিনি মরাঠাজাতির হৃদয় জয় করেছেন। ১৮৯৬ সালের দুর্ভিক্ষ নিবারণে তিলক স্বয়ং সরকারকে বিশেষ সাহায্য করেন। পর বছর প্লেগ আরম্ভ হ'লে তিনি পুণায়ই থেকে গেলেন ও নিজ জীবন বিপন্ন ক'রে রোগীদের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। তিলক প্লেগ কমিটির অনাচারের তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং নিজে হিন্দু প্লেগ হাসপাতাল স্থাপন ক'রে রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা ক'রে দেন।

১৮৯৭ সালের ১৩ই জুন শিবাজী-উৎসব নিষ্পন্ন হয় ও এর বিস্তৃত বিবরণ ১৫ই জুন তারিখের কেশরী পত্রে প্রকাশিত হয়। পরবর্তী ২২শে জুন র‍্যাণ্ড ও এয়ারেষ্ট নিহত হন। আমলাতন্ত্র কাকতালীয়বৎ যুক্তিতেই তিলককে রাজদ্রোহ অপরাধে দায়ী ক'রে ২৬শে তারিখে গ্রেপ্তার করে। তিনি হাইকোর্টে দায়রায় সোপর্দ্দ হলেন। ৮ই সেপ্টেম্বর ছ'জন ইউরোপীয় ও তিনজন ভারতীয় জুরীর সম্মুখে তাঁর বিচার হ'ল। ইউরোপীয় জুরীরা তাঁকে দোষী ও ভারতীয় জুরীরা তাঁকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করেন। জজ অধিকাংশের মত গ্রহণ ক'রে তিলককে দেড় বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। সুপণ্ডিত ম্যাক্সমূলার ও উইলিয়ম হাণ্টার মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নিকট আবেদন ক'রে কারাগারে তিলকের পড়াশুনা করবার সুবিধা ক'রে দেন। এক বছর কারাদণ্ড ভোগের পর ১৮৯৮ সালে ৬ই সেপ্টেম্বর তিনি অব্যাহতি পান। তিলকের সঙ্গে অন্য সংবাদপত্রের সম্পাদকেরও কারাদণ্ড হয়েছিল।

এক দিকে দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও ভূমিকম্প অন্য দিকে নির্ব্বাসন, কারাদণ্ড ও ভারতব্যাপী বিক্ষোভ—এরূপ অবস্থার মধ্যে অমরাবতীতে মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিখ্যাত উকীল চিত্তুর শঙ্করন নায়ারের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের ত্রয়োদশ অধি-

বেশন অনুষ্ঠিত হ'ল। অভ্যর্থনা-সভার সভাপতি ছিলেন তিলক-বন্ধু গনেশ-শ্রীকৃষ্ণ খাপার্দ্দে। প্রতিনিধি সংখ্যা প্রায় সাত শ'। সভাপতি তাঁর তেজো-ব্যঞ্জক বক্তৃতায় ভারতময় বিক্ষোভের কথা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করলেন। তিনি তিলকের প্রসঙ্গ উত্থাপন ক'রে বলেন যে, তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের ভিত্তি কি সে সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট এখনও নির্ব্বাক্। ভারতবর্ষের অধিবাসীরা তা জানতে চাইছে,—ভবিষ্যৎ বংশধরগণও তা জানতে চাইবে। উন্নতির প্রকাশ্য পথরোধের আয়োজন হ'লে তা নিশ্চিত অপ্রকাশ্য অলিগলির মধ্যে নিজ পথ খুঁজে নিতে বাধ্য হবে। তিনি উপসংহারে বললেন—"আমরা কি ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকব, না তার উন্নতিসাধনে, উন্নততর অবস্থায় পৌঁছতে যথাসাধ্য চেষ্টা করব! দীর্ঘকালের পরাধীনতায় ও দাসত্বে ভারত-বাসীর জাতীয় শক্তি বিলুপ্ত এবং শ্রীবৃদ্ধি ব্যাহত হয়েছে; তার ঐশ্বর্য্য ও মহত্ব থেকেও আজ সে বিচ্যুত। ভারতবর্ষ যদি বর্ত্তমান অপেক্ষা উন্নততর অবস্থায় উপনীত হ'তে চায় ও অন্যান্য জাতিসমূহের মধ্যে যোগ্য আসনলাভের আকাঙ্ক্ষা করে তা হ'লে সম্পূর্ণরূপে শিক্ষিত ভারতবাসীর ঐকান্তিক চেষ্টা-যত্নেই সম্ভব হবে।"

শিক্ষিত সাধারণের উপর আমলাতন্ত্র যে নিপীড়ন শুরু করেন তার ফলেই কংগ্রেসের 'এক্‌স্ট্রিমিষ্ট' বা চরমপন্থী দলের সৃষ্টি। কোন কোন কংগ্রেস-নেতার মনে এ সময় জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলন চালাবার প্রয়োজনীয়তার কথা উদিত হয়। অশ্বিনীকুমার দত্ত বহু পূর্ব্বেই এরূপ আন্দোলন শুরু করেন। তিনি এই অধিবেশনেই স্পষ্ট ভাষায় বলেন, "বছরে তিন দিন কংগ্রেস ক'রে বা সেই উপলক্ষ্যে কয়েক দিন স্থানে স্থানে সভা ক'রে দেশের যথার্থ উন্নতি হবে না। এ তামাসা মাত্র। সারা বছর ধ'রে প্রতি দিন, প্রতি মুহূর্ত্ত সমগ্র ভারতীয় সমাজের স্তরে স্তরে, তিল তিল ক'রে এ কার্য্যটি করতে হবে। এজন্য একটি সঙ্ঘ গঠন আবশ্যক।"

কংগ্রেসে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মত এবছরও শাসনপ্রণালী সম্পর্কীয় নানা প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। এ সময় ভারত-সরকার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অগ্রসর নীতি পরিচালনে ব্যস্ত। এজন্য তাদের যুদ্ধে লিপ্ত হ'তে হয়। ওয়াচা মহাশয় এর প্রতিবাদ ক'রে বললেন যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টেরই এই যুদ্ধের ব্যয় ভার সম্পূর্ণ

বহন করা উচিত। একটি প্রস্তাবে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় বিলাতে ওয়েলবী কমিশনকে এই অনুরোধ করেন, তাঁরা যেন ভারতবর্ষের শাসন-প্রণালীর সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও অনুসন্ধান করেন। ভারতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদগুলিতে নির্ব্বাচিত সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি, বজেটের উপর ও আইন প্রণয়নে নির্ব্বাচিত ভারতীয় সদস্যদের ভোটদানের অধিকার, সামরিক এবং অসামরিক ভারত ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের মধ্যে ব্যয় বণ্টন প্রভৃতি সম্বন্ধেও যেন কমিশনে আলোচনা হয়। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এ প্রস্তাব সমর্থন করেন।

এবারকার অধিবেশনে দুটি খুব গুরুতর বিষয়ের আলোচনা হ'ল। প্রথমটি বিনা বিচারে নির্ব্বাসন সম্পর্কে, দ্বিতীয়টি ফৌজদারী আইনে নব-প্রস্তাবিত রাজদ্রোহ ('সিডিশন') ধারার সংশোধন সম্পর্কে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম প্রস্তাবটি উত্থাপন ক'রে বলেন, "বঙ্গের ১৮১৮ সালের তিন আইন, মাদ্রাজের ১৮১৯ সালের দুই আইন ও বোম্বাইয়ের ১৮২৭ সালের পঁচিশ আইন এযুগে একেবারে অচল। বিনা বিচারে কাউকে বন্দী করা মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়। বোম্বাই আইন অনুসারে ধৃত নাটু-ভ্রাতৃদ্বয়কে হয় অবিলম্বে কারামুক্ত করা হোক, নতুবা প্রকাশ্য বিচারালয়ে তাঁদের বিচার হোক।" সুরেন্দ্রনাথ আরও বলেন, "পুণায় পিটুনি পুলিশ বসিয়ে ভয়ানক ভুল করা হয়েছে। এর চেয়েও বড়রকমের ভুল হয়েছে তিলক ও দু'জন সম্পাদককে রাজদ্রোহ আইনে দণ্ডিত ক'রে। তিলকের জন্য আমার প্রাণ বেদনায় ভরপুর। সমগ্র জাতিই আজ তাঁর জন্য ক্রন্দনরত।"

এই আমলাতন্ত্র অন্যদিকে দমন-নীতি পাকাপোক্ত করবার জন্য ফৌজদারী আইনের রাজদ্রোহ বিষয়ক ১২৪ (ক) ধারা সংশোধনেও উঠে পড়ে লাগলেন। কোন লেখায় বা বক্তৃতায় ভারত-গবর্ণমেণ্টের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ ('contempt and hatred') প্রকাশিত হ'লে লেখক বা বক্তাকে আইনতঃ দণ্ডনীয় ক'রে ঐ ধারা সংশোধনের প্রস্তাব করা হ'ল। শুধু তাই নয়, ম্যাজিষ্ট্রেট যে-কোন লোককে রাজদ্রোহের অপরাধে গ্রেপ্তার ক'রে নিজেই তার বিচার করতে পারবেন। দায়রায় বা হাইকোর্টে রাজদ্রোহ অপরাধ-বিচারের যে প্রথা ছিল তাও রহিত করার প্রস্তাব হ'ল এর মধ্যে। ম্যাজিষ্ট্রেট সদাচরণের ('good behaviour') প্রতিশ্রুতি আদায়ের জন্য যে-কোন ব্যক্তির নিকট উপযুক্ত

পরিমাণ জামিন দাবি করতে পারবেন। সভা-সমিতিতে বক্তৃতা ও সংবাদপত্রে লেখার স্বাধীনতা এইরূপে ব্যাহত হ'লে জাতির উন্নতির পথে বিষম বিঘ্ন ঘটবে এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব উত্থাপন করলেন ধীরমতি প্রবীণ কংগ্রেস নেতা উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। গবর্ণমেণ্ট কিন্তু ব্যবস্থাপরিষদে উক্ত মর্ম্মে আইন সংশোধিত করিয়ে নিলেন। কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ তখনও বিলাতের জনমতের উপর সম্পূর্ণ আস্থাবান। বিলাতে জনমত গঠনের জন্য এবারেও ষাট হাজার টাকা মঞ্জুর হ'ল।

কংগ্রেসের চতুর্দ্দশ অধিবেশন হয় মাদ্রাজে, ১৮৯৮ সালে। এবারে সভাপতি হলেন বিখ্যাত ব্যারিষ্টার রাজনীতিজ্ঞ ধর্ম্মপ্রাণ আনন্দমোহন বসু। আনন্দ-মোহন তাঁর সুচিন্তিত অভিভাষণে সরকারের দমননীতি, শিক্ষানীতি, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অগ্রসর নীতি ও স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতাহ্রাস প্রচেষ্টার তীব্র সমালোচনা করেন। এ সময়ে সরকারী নীতি এতটা দুর্ব্বিষহ হ'য়ে উঠে যে, রাজনীতিতে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ সভাপতি মহাশয়ের জনৈক বন্ধু তাঁকে লেখেন, "আপনি কি ব্রিটিশরাজের মিত্র? তা হ'লে এই সব আত্মঘাতী নীতি থেকে কর্ত্তৃপক্ষকে নিরস্ত হ'তে অনুরোধ করুন। আর আপনি যদি শত্রু হন, তা হ'লে আমার পরামর্শ এই যে, নীরব থাকুন এবং সব বিষয়েই নিজেরাই নিজেদের পথ বেছে নিন।" সরকারের দমন ও পেষণনীতির ফলে ক্রমশঃই কর্ত্তৃপক্ষের উপর ভারতবাসীর আস্থা টলতে লাগল।

এ অধিবেশনেও যথারীতি শাসনসম্পর্কীয় বহু প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। রাজদ্রোহমূলক আইনের কথা আগে বলেছি। এবার কংগ্রেসে এর প্রতিবাদ ক'রে এক প্রস্তাব পাস হ'ল। প্রস্তাবক জাম্বুলিঙ্গ মুদালিয়ার বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বললেন, "আস্থা ও সদিচ্ছার বদলে গবর্ণমেণ্টের উপর লোকের অবিশ্বাস ও সন্দেহই বিদ্যমান। হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের প্রতি সকলের মনে একটা তিক্ত ভাব বিরাজ করছে।"

এক সময় সরকার 'সিক্রেট প্রেস কমিটি' নামে সংবাদপত্র শাসনের জন্য একটি কমিটি স্থাপন করেন। আজকাল 'সেন্সর' কথাটির সঙ্গেই আমরা খুবই পরিচিত। সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ ও রচনার উপর গোপনে গোপনে বিচার-আলোচনা করা হ'ল ঐ প্রেস কমিটির কাজ। ডবলিউ. এ. চেম্বার্স-এর

প্রতিবাদে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন ও নরসিংহ চিন্তামণ কেলকার তা সমর্থন ক'রে এক জোরাল বক্তৃতা দেন।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে যে কয়েকটি স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠান ছিল তাতে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের সংখ্যাধিক্য থাকায় তাদের বিশেষ প্রতিপত্তি জন্মে। সরকার এই অধিকারটুকুও বরদাস্ত করতে পারলেন না। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদে কলকাতা মিউনিসিপাল আইন সংশোধন ক'রে ও বোম্বাইয়ে সিটি ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট মারফত এই প্রতিপত্তি বিলোপের চেষ্টা চলল। গণেশশ্রী খাপার্দ্দে এর প্রতিবাদে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন ও যোগেশচন্দ্র চৌধুরী তা সমর্থন করেন। যোগেশচন্দ্র বল্লেন, কলকাতা কর্পোরেশনের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের অপরাধ, করদাতাদের স্বার্থরক্ষায় তৎপরতা এবং ঐকান্তিকতার সঙ্গে কর্ত্তব্য-সম্পাদন।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবাসী ভারতীয় সমস্যা ক্রমশঃ জটিল হ'য়ে উঠল। নাটালে ভারতীয় বিরোধী আইনের কথা পূর্ব্বে বলা হয়েছে। ভারতের বড়লাট লর্ড এল্‌গিন (১৮৯৪-১৮৯৮) ঐ নিষ্ঠুর আইনে সম্মতি দান করলেন। বাস্তবিক লর্ড এল্‌গিনের আমলেই ভারতবর্ষে ও ভারতের বাইরে ভারতীয়দের দুর্গতি শুরু হয়—লর্ড কার্জ্জন এসে প্রজ্বলিত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলেন মাত্র। ট্রান্সভালে এই মর্ম্মে একটি আইন পাস হ'ল যে, শহরগুলির মধ্যে ভারতবাসীরা বাস করতে পারবে না। শহর হ'তে খানিকটা দূরে যেখানে ময়লা আবর্জ্জনা পুড়িয়ে ফেলা হয় সে সব অঞ্চলেই তাদের বসবাসের উপযুক্ত স্থান ব'লে স্থির হয়। এ সময়কার ভারতসচিব ছিলেন লর্ড জর্জ্জ হ্যামিলটন। তিনি ভারতীয়দের উপর খুবই বিরূপ—ভারতীয়দের 'অসভ্য' জাতি ব'লে আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর নিকট থেকে সুবিচারের আশা দুরাশা! এইসব অনাচার অবিচারের প্রতিকারের আশা না দেখে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী এই সময় দক্ষিণ আফ্রিকার নাটাল ও ট্রান্সভাল প্রদেশে জোর আন্দোলন শুরু করেন। কংগ্রেস এবারেও ভারতীয়দের প্রতি দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে এক প্রস্তাব গ্রহণ করলেন।

স্বৈরশাসন ও কংগ্রেসের কার্য্যক্রম

(১৮৯৯-১৯০৪)

লর্ড কার্জ্জন ১৮৯৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন। কংগ্রেস তাঁকে যথারীতি অভিনন্দন জানালেন ও এই আশা ব্যক্ত করলেন যে, তাঁর আমলে ভারত-শাসনে আবার উদারনীতি অনুসৃত হবে। কিন্তু কার্জ্জনের কার্য্যাবলী এর বিপরীতই প্রমাণিত করলে। দুর্ভিক্ষ নিবারণে এবং ইউরোপীয় ও ভারতীয়ের মধ্যে বিচারবৈষম্য বিদূরণে তিনি কতকটা চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু তাঁর স্বৈরশাসন কংগ্রেস নেতৃবর্গকে শীঘ্রই বিদ্বিষ্ট ক'রে তুলল। সুরেন্দ্রনাথ বলেন, ভারত-সভার পক্ষ থেকে ১৮৯৯ সালে কার্জ্জনকে অভিনন্দন করবার জন্য কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি লাটপ্রাসাদে গমন করেন। কিন্তু দেশী পাদুকা পরিহিত ব'লে কেউ কেউ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি পান নি! এই সামান্য ব্যাপার থেকেই তাঁরা তাঁর ভাবী স্বৈরশাসনের আভাস পেলেন। বস্তুতঃ লর্ড কার্জ্জন একটি বক্তৃতায় এই কথা স্পষ্ট ব্যক্ত করলেন যে, ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্যের মূল উদ্দেশ্য দুটি—একটি, ভারতে ব্রিটিশ শাসন সুদৃঢ় করা, অন্যটি, ভারতে ব্রিটিশ বাণিজ্যের প্রসার। কংগ্রেসের উপরও তিনি ছিলেন খুব বিরূপ। ১৯০০, ১৮ই নবেম্বর তিনি ভারতসচিবকে এক পত্রে লেখেন, "আমার নিজের বিশ্বাস এই যে, কংগ্রেসের পতন সন্নিকট এবং আমার একটা প্রধান আকাঙ্ক্ষা হ'ল, ভারতে অবস্থিতিকালেই একে শান্তিতে মরণের পথে এগিয়ে দেওয়া।" কাজেই যতই দিন যেতে লাগল ততই শিক্ষিত সমাজ তাঁর নীতির স্বরূপ বুঝতে পারলেন।

গবর্ণমেণ্ট-নীতি যখন ভারতবাসীর উন্নতির পরিপন্থী ও ক্রমে অতিমাত্রায় প্রতিক্রিয়াশীল হ'তে শুরু হয় তখনও নেতৃবর্গ নূতন অবস্থার সঙ্গে তাল রেখে কংগ্রেসের কার্য্যক্রম নিয়ন্ত্রিত করেন নি। তাঁরা ব্রিটিশ জনসাধারণের তথা ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের ন্যায়পরায়ণতার উপরই আস্থাশীল রইলেন ও পূর্ব্বের মত

বিলাতে জনমত গঠনের জন্য প্রতি বছর প্রচুর টাকা ব্যয় করতে লাগলেন। আমরা দেখেছি, কংগ্রেস বহু বছর বিলাতের জনমত গঠনের জন্য ষাট হাজার টাকা ক'রে ব্যয় করেছেন, কিন্তু ভারতবর্ষে ভারতীয়দের মধ্যে রাজনৈতিক কার্য্য চালাবার উদ্দেশ্যে মোটেই ব্যয়বরাদ্দ করেন নি, তাঁরা এদিকে তেমন তৎপরও হন নি। দূরদর্শী রাজনীতিক অশ্বিনীকুমার দত্ত কংগ্রেসের অমরাবতী অধিবেশনে এই ক্রটির প্রতি নেতৃবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা ক'রে ব্যর্থকাম হন।

বাস্তবিক, প্রবীণ দলের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বহির্মুখী, আর নবীন দলের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অন্তর্মুখী। নবীন ও প্রবীণ উভয়ের মধ্যে পরে যে বিরোধ চরমে গিয়ে পৌঁছে তার ভিতরেও ছিল এই দৃষ্টিভঙ্গীর মূলগত পার্থক্য। তখন বহির্মুখী প্রচেষ্টার যে প্রয়োজনীয়তা ছিল না তা নয়, তবে এর সঙ্গে অন্তর্মুখী প্রচেষ্টাও যে বিশেষ আবশ্যক, এ সরল সহজ কথাটি প্রবীণ দল স্বীকার না করায় পরবর্ত্তী কালে যত গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়েছে। এর পরে ক্রমেই কংগ্রেসের মধ্যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাশ দেখতে পাই। মনীষি বিপিনচন্দ্র পাল ১৯০২ সাল থেকে তাঁর 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রে এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর রীতিমত ব্যাখ্যা শুরু করেন।

কংগ্রেসের অমরাবতী অধিবেশনের সময় সার এণ্টনি ম্যাকৃডনাল্ড ছিলেন বেরারের চীফ কমিশনার। তিনি সে সময় এই অধিবেশনে আপত্তি করেন নি। ১৮৯৯ সালে এই ম্যাকৃডনাল্ড উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যার ছোট-লাট হন। এবার কিন্তু তিনি লক্ষ্ণৌ শহরে কংগ্রেসের অধিবেশন হ'তে দিলেন না। শহর থেকে আট মাইল দূরে গম ও ইক্ষুক্ষেত পরিবেষ্টিত মশা-মাছি-শূকর-নেকড়ে সমাকীর্ণ গ্রাম অঞ্চলে এবারে অধিবেশন হ'ল। রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় হলেন এবারকার কংগ্রেসের সভাপতি। সরকারী দমননীতি ও তার প্রতি-ক্রিয়া সম্বন্ধে তিনি তাঁর অভিভাষণে বিশদরূপে উল্লেখ করেন। পূর্ব্ববছর বিধিবদ্ধ 'সিডিশন' বা রাজদ্রোহ আইন সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, সংবাদপত্রে ও সভাসমিতিতে রাজনৈতিক বিষয়ের স্বাধীন আলোচনা বন্ধ করলে রাজদ্রোহ অতি দ্রুতই ব্যাপ্তিলাভ করবে। রমেশচন্দ্র বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্। ভারতের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে তিনি বিস্তর গবেষণা করেছেন। গবেষণার ফলে তিনি যে-সব সত্যে উপনীত হয়েছেন তার একটি হ'ল এই, ভারতবর্ষের দারিদ্র্যের জন্য এর জনসংখ্যা বৃদ্ধি দায়ী নয়। এর কারণ, ভারতবাসীর অত্যধিক কর-

বৃদ্ধি এবং যন্ত্রশিল্পে উন্নত ইংলণ্ডের সঙ্গে অবাধ প্রতিযোগিতা হেতু ভারতের গ্রাম্য শিল্পসমূহের বিনাশ। মোট উৎপন্ন দ্রব্যের এক-ষষ্ঠাংশ কর দেওয়াই ভারতবর্ষের সনাতন রীতি ছিল। এই রীতি বদল হওয়ায় ভারতবাসীর এত দারিদ্র্য। রমেশচন্দ্র বলেন, স্বায়ত্তশাসন-লাভেই ভারতবর্ষের দৈন্যদশা বিদূরিত হওয়া সম্ভব। তাঁর মতে ইংরেজ শাসকবর্গের ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচারের উপর ভারতবাসীর আস্থা আর তেমন নেই।

গবর্ণমেণ্ট ১৮৯৯ সালে কলকাতা করপোরেশন আইন বিধিবদ্ধ ক'রে এর ক্ষমতা অনেকটা সঙ্কুচিত করলেন। এতদিন নির্ব্বাচিত সদস্যের সংখ্যা মোট সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ ছিল, বর্ত্তমান আইনে তা কমিয়ে অর্দ্ধেক করা হ'ল। মনোনীত সদস্যসংখ্যা বাড়িয়ে করা হয় অর্দ্ধেক। চেয়ারম্যান সরকারী কর্ম্মচারী, এ কারণ সব সময়ের জন্য তিনি গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ভোট দিতেন। সুতরাং করপোরেশনে গবর্ণমেণ্ট সংখ্যাধিক্য হলেন। লর্ড কার্জ্জনের কূট ও কৌশলে স্বায়ত্ত-শাসনের মূলনীতি এইরূপে ব্যাহত হ'ল। আইন পাস হবার পূর্ব্বে ও পরে কলকাতায় এ নিয়ে তুমুল আন্দোলন চলে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীনাথ মিত্র প্রমুখ আঠাশ জন নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি করপোরেশনের সদস্য-পদে ইস্তফা দেন। বোম্বাই করপোরেশনের ক্ষমতা সঙ্কুচিত করার জন্যও সেখানকার ব্যবস্থাপরিষদে একটি আইনের খসড়া উপস্থাপিত করা হয়। এবারকার অধিবেশনে সুরেন্দ্রনাথ এসবের প্রতিবাদ-প্রস্তাব উত্থাপন ক'রে বললেন, "আমি এবিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় যে, স্বদেশী হোক বিদেশী হোক প্রত্যেক গবর্ণমেণ্টেরই প্রধানতম রক্ষাকবচ হ'ল জনসাধারণের সন্তোষ, প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা। অভিযোগ নিরাকৃত না ক'রে সাধারণের প্রীতি কেমন ক'রে অর্জ্জন করা সম্ভব? আর নিয়মানুগ পন্থা বা বৈপ্লবিক উপায়—এ দুটির একটিও অবলম্বন না করলে তাদের অভিযোগই-বা কিরূপে নিরাকৃত হবে? আমরা নিয়মতন্ত্রের বন্ধু, কেন-না আমরা বিপ্লবের শত্রু। আমরা আমাদের পথ বাছাই ক'রে নিয়েছি, প্রতিপক্ষ তাঁদের পথ বাছাই করে নিন। তাঁরা কি আমাদের পক্ষ নিতে চান, না বিপ্লবী দলের সঙ্গে যোগ দিতে চান? নিয়মতন্ত্র ও বিপ্লব—এ দুয়ের ভিতরে কোন মধ্য পন্থা নেই। হয় তুমি প্রথমটির পক্ষ নেবে, না হয় তুমি বিপ্লবের পতাকাতলে গিয়ে দাঁড়াবে।"

এই কথা ব'লে তিনি এই বক্তৃতা শেষ করলেন যে, কর্ত্তৃপক্ষের মতিগতি সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াশীল হ'য়ে পড়েছে। তাঁরা অতীতের সুকৃতি বিনষ্ট করতে, উন্নতির গতি রোধ করতে আনন্দ অনুভব করছেন।

ভারতীয়দের প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব আরও দুটি বিষয়ে প্রকাশ পেল। বিদেশ থেকে 'তারে' যে-সব বার্ত্তা ভারতবর্ষে আসত তার উপর খবরদারি করবার জন্য ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদে 'টেলিগ্রাফিক প্রেস মেসেজেস্ বিল' নামে একটি আইনের খসড়া পেশ করা হ'ল। কংগ্রেস এর প্রতিবাদ ক'রে প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। এই সময় বোম্বাই ও মাদ্রাজে নিয়ম করা হ'ল যে, সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষায়তনগুলির কর্ত্তৃপক্ষ ও শিক্ষকগণ শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টরের অনুমতি ব্যতীত কোন রাজনীতিক আন্দোলনে বা সভায় যোগ দিতে পারবেন না! এর প্রতিবাদেও প্রস্তাব গৃহীত হ'ল।

কংগ্রেসের ষোড়শ অধিবেশন হ'ল লাহোরে। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ছিলেন লাহোর চীফ কোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল প্রবাসী বাঙালী কালীপ্রসন্ন রায়। পঞ্জাবের নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। এজন্য তাঁকেই পাঞ্জাবীরা অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি পদের যোগ্য বিবেচনা করেছিলেন। এবারকার মূল সভাপতি নারায়ণগণেশ চন্দাবরকর। সভাপতিত্ব করবার পরই তিনি বোম্বাইয়ে গিয়ে হাইকোর্টের বিচারাসনে বসেন। কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাং, বদরুদ্দীন তায়েবজী, এস্. সুব্রহ্মণ্য আয়ার, চিত্তূর শঙ্করণ নায়ার, আশুতোষ চৌধুরী প্রমুখ আরও অনেকে সে যুগে হাইকোর্টের বিচারপতি হয়েছিলেন।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মত এ অধিবেশনেও বিচার, শাসন, শিক্ষা, সামরিক নীতি, সরকারী রাজস্ব, দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবাসী ভারতীয় সমস্যা, বঙ্গের মত অন্যান্য প্রদেশেও চিরস্থায়ী ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন, সুরাপানের অপকারিতা, দুর্ভিক্ষ ও ও দারিদ্র্য, উচ্চ পদে ভারতীয় নিয়োগ প্রভৃতি নানা বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপিত ও গৃহীত হ'ল। এই সময়ে 'ইণ্ডিয়ান মাইন্স্ এক্ট' নামে ভারতবর্ষের খনিসমূহ সম্পর্কে একটি আইন বিধিবদ্ধ হয়। ভূপেন্দ্রনাথ বসু এ প্রসঙ্গে একটি তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা করলেন। তিনি বললেন, "রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তগত না হ'লে দেশের শিল্প-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হওয়া অসম্ভব। এমন দেশ কোথায় আছে যেখানে

স্বদেশী শিল্পের উপর ট্যাক্স বসিয়ে বিদেশী শিল্পের সুযোগ ক'রে দেওয়া হয়? এমন দেশ কোথায় আছে যেখানে বিদেশী বণিক্ ও উৎপাদকের সুবিধার জন্য চিনির মত স্বদেশজাত নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর কর বসান হয়? এমন দেশ কোথায় যেখানে সদ্যপ্রতিষ্ঠিত কারখানাগুলির কার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদনের জন্য আইন বিধিবদ্ধ করা হয়? কাজেই, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছাড়া শিল্পোন্নতি সম্ভব—যাঁরা এ মতের অনুবর্ত্তী তাঁরা সাবধান হউন।"

এবারে লালা লজপত রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ গঠনমূলক প্রস্তাব করলেন। ভারতবর্ষের শিক্ষা ও শিল্প সম্বন্ধে আলোচনার জন্য কংগ্রেসে যাতে প্রতি বছর অন্ততঃ অর্দ্ধদিন সময় দেওয়া হয় এ-ই ছিল প্রস্তাবের মর্ম্ম। প্রস্তাবটি গৃহীত হ'ল। কংগ্রেসে কার্য্যকর গঠনমূলক প্রস্তাব এই প্রথম। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে প্রতিনিধি নিয়ে এ উদ্দেশ্যে দুটি কমিটি গঠিত হ'ল ও উভয় কমিটিরই সম্পাদক হলেন লালা হরকিষণ লাল। বাংলা দেশ থেকে শিল্প কমিটিতে চৌদ্দ জন সভ্য গৃহীত হন। তাঁদের ভিতর বৈকুণ্ঠনাথ সেন, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। শিক্ষা কমিটিতে ছিলেন আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, নীলরতন সরকার, অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতি বঙ্গের বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্গণ। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এলাহাবাদ থেকে এ কমিটিতে নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন। এ সময় জামশেঠজী নাজিরবান্জী টাটা বিজ্ঞানের গবেষণার জন্য একটি বিদ্যাগার স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রচুর অর্থ দান করেন। কংগ্রেস এজন্য তাঁকে অভিনন্দিত করলেন। এই অর্থ দ্বারা বাঙ্গালোর সায়ান্স ইন্‌ষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১৯০১ সালে কংগ্রেস হ'ল কলকাতায়। কলকাতার অধিবেশনে এবারেও এর সঙ্গে একটি শিল্পপ্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হ'ল। প্রদর্শনীর সভাপতি হলেন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কংগ্রেসের সভাপতি বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ নেতা দীন্‌শা এদুলজী ওয়াচা। ওয়াচা মহাশয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন থেকেই গবর্ণমেণ্টের সমরনীতি, রাজস্ব ও বাট্টাহারসম্পর্কে প্রস্তাব উত্থাপন ও আলোচনা ক'রে যশস্বী হয়েছেন। এবারেও তাঁর অভিভাষণে ভারতের দারিদ্র্য, তার কারণ ও এসব নিরাকরণের উপায়াদি সম্বন্ধে তিনি বিশেষভাবে আলোচনা

করেন। ভারতবাসী দেশ-শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করলে তবে ভারতবর্ষের শ্রী ফিরে আসতে পারে। কিন্তু ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। দীন্‌শা তাই বলেন, "মর্লির ভাষায় বলতে গেলে সাম্রাজ্যমত্ততা ও এর পরিপূরকস্বরূপ দমন-নীতি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে পেয়ে বসেছে। কিন্তু আজ হোক কাল হোক সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে এই রাজনীতিক উন্মত্ততা চলে যেতে বাধ্য। তখন উদার নীতি নিশ্চয়ই এর স্থান গ্রহণ করবে। ভারতবাসীরা ব্রিটিশ শাসনের সুফল কখনও অস্বীকার করে নি। কিন্তু তাই ব'লে তারা চিরকাল এর গুণগান ক'রে একটি চাটুকার জাতিতে পরিণত হবে এরূপ আশা করা ভুল। আমরা সুশাসনে আছি নিঃসন্দেহ, কিন্তু বহু মন্দ এর সঙ্গে মিশ্রিত হ'য়ে আছে। আমাদের বাসনা এই, মন্দ দূরীভূত হয়ে সময়ে আমরা আরও উৎকৃষ্টতর শাসন-প্রণালী লাভ করি।"

এই উৎকৃষ্টতর শাসনপ্রণালী কি ধরণের হবে সে সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট কথা ইতিপূর্ব্বে কংগ্রেস মঞ্চ থেকে কেউ কখনো বলেন নি। মিঃ স্মেড্‌লি নামে একজন নিমন্ত্রিত প্রতিনিধি এবারে এ সম্বন্ধে বললেন, "আপনারা বিভিন্ন প্রস্তাবে যে-সব দাবি করেন তা নিতান্তই সামান্য; কর্তৃপক্ষ এগুলি পূরণ ক'রে আপনাদের 'হোম রুল' (বা স্বরাজ) না দিয়ে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন। কিন্তু আমি বলি—আপনারা ভারতবর্ষের 'হোম রুল' এর জন্য কায়মনে চেষ্টা করুন, ভগবান্ আপনাদের সহায়।"

ভারতবর্ষের নানা সমস্যা সম্বন্ধে বহু প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। বিলাতের প্রিভি কৌন্সিলে একজন ভারতীয় আইনজ্ঞ গ্রহণের প্রস্তাব করা হ'ল এবারে। চীফ কমিশনার সার হেনরি কটন আসামের চা-বাগান শ্রমিকদের বেতনবৃদ্ধির প্রস্তাব করেছিলেন। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত না হওয়ায় কংগ্রেস দুঃখ প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, চুক্তিভঙ্গের অপরাধে শ্রমিকদের যে ফৌজদারী আইনে দণ্ডনীয় হবার বিধি আছে তা তুলে দেওয়া হোক। কটনের প্রস্তাব কার্য্যকরী না হওয়ার মূলেও ছিলেন লর্ড কার্জ্জন। কটন সাহেব তাঁর স্মৃতি-কথায় লিখেছেন, বড়লাট লর্ড কার্জ্জন প্রথমে তাঁর প্রস্তাবে সম্মতি দেন, কিন্তু পরে চা-করদের সঙ্গে যোগ দিয়ে এতে বিঘ্ন ঘটান। কংগ্রেসের এ অধিবেশনে একটি গঠনমূলক প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ প্রস্তাবের নূতনত্ব হ'ল, কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন না জানিয়ে

একেবারে দেশবাসীর কাছে আবেদন জানান। প্রস্তাবটির প্রথম অংশের মর্ম্ম এই, কংগ্রেসের মতে বর্ত্তমান আর্থিক দুর্দ্দশার একটি প্রধান কারণ—উৎপন্ন দ্রব্যাদির ক্রয়বিক্রয়-নীতিতে জনগণের অজ্ঞতা। সুতরাং এ বিষয়ে তাদের ওয়াকিবহাল করতে স্বদেশহিতৈষী শিক্ষিত ব্যক্তিরা যেন সচেষ্ট হন। প্রস্তাবটির দ্বিতীয় অংশে বলা হয় যে, ভারতবর্ষের আর্থিক সমস্যা দূর করতে হ'লে গ্রামে শহরে সর্ব্বত্র ভারতবাসীদের মূলধন সরবরাহ ও ঋণদান ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন আবশ্যক। কংগ্রেস এজন্য স্বদেশবাসীদের মধ্য থেকে মূলধন সংগ্রহ করতে সকলকে আহ্বান করেন। বিলাতে কংগ্রেসকার্য্য চালাবার জন্য অর্থের বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায় এবারে প্রত্যেক প্রতিনিধির প্রবেশমূল্য দশ টাকা থেকে কুড়ি টাকায় বাড়ান হ'ল। মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও মহাদেবগোবিন্দ রাণাড়ের মৃত্যুতে কংগ্রেস প্রথমেই শোক প্রকাশ করলেন।

এবারকার কংগ্রেসের আর-একটি বিশেষত্ব—মহাত্মা গান্ধীর উপস্থিতি। ব্যারিষ্টার মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবাসী ভারতীয়দের অবিসম্বাদিত নেতা। ১৮৯৪ সাল থেকেই তিনি তাদের দুঃখদুর্দ্দশা মোচনে যথাসাধ্য তৎপর রয়েছেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবাসী ভারতীয় সমস্যা সম্বন্ধে পরমেশ্বরম্ পিলৈ এযাবৎ কংগ্রেসে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। এবারে গান্ধীজী স্বয়ং কংগ্রেসে উপস্থিত হ'য়ে প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। প্রবাসী ভারতীয় সম্পর্কে মদনজিতের কার্য্যও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

ইতিমধ্যে বুয়র যুদ্ধ (১৮৯৯-১৯০০) হ'য়ে গেছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্রিটিশ ও বুয়র নামে পরিচিত ওলন্দাজদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বহু দিনের পুরাতন। কেপ কলোনি ও নাটাল প্রদেশে ইংরেজ এবং অরেঞ্জ ফ্রি ষ্টেট ও ট্রান্সভালে বুয়রদের প্রাধান্য ছিল। ওখানকার বাসিন্দা হ'লেও উভয়েরই কাজ ছিল দেশের ধনরত্ন আহরণ। ক্রীতদাস-প্রথা লোপ পেলে তাদের ঠিকা জনমজুরের আবশ্যক হ'য়ে পড়ে। ভারতবর্ষ থেকেই অতঃপর ঠিকা জনমজুর সংগৃহীত হ'তে থাকে। পরে ভারতীয় বণিকরাও ব্যবসা করতে সেখানে যায় ও বসতি স্থাপন করে। ১৮৮১ সালে একবার ব্রিটিশ ও বুয়রদের মধ্যে যুদ্ধ বাধে ও প্রধানমন্ত্রী গ্লাডষ্টোন বুয়রদের স্বাধীনতা স্বীকার করেন। কিম্বারলীর হীরকখনির উপর ব্রিটিশের লোভ ছিল বরাবর। তারা ঐ অঞ্চলে ক্রমশঃ প্রভাব বিস্তার করলে। কিম্বারলী

বুয়র অঞ্চলের সীমানায় অবস্থিত, কাজেই এর ন্যায্য অধিকারী ব'লে বুয়ররাই নিজেদের জাহির করতে লাগল। এ নিয়ে উভয়ের মধ্যে প্রথমে মনকষাকষি, পরে রীতিমত যুদ্ধ আরম্ভ হয়। প্রেসিডেণ্ট ক্রুগারের নেতৃত্বে বুয়র সেনানী এই যুদ্ধে আশ্চর্য্য রণকৌশল প্রদর্শন করে। ক্রুগার পূর্ব্বেই বিস্তর অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ ক'রে রেখেছিলেন। কাজেই ব্রিটিশ বাহিনীগুলিকে প্রথম প্রথম হারিয়ে দিতে বুয়রদের বিশেষ বেগ পেতে হয় নি। মহাত্মা গান্ধী ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গঠন ক'রে বুয়র যুদ্ধে ব্রিটিশ প্রজা হিসাবে ইংরেজদের সাহায্য করেন। দু' বছর অবিশ্রান্ত যুদ্ধের পর ব্রিটিশের জয়লাভ ঘটল বটে, কিন্তু পরে কিছুকাল বুয়ররা গরিলাযুদ্ধে তাদের ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলেছিল। প্রবাসী ভারতীয়দের উপর বুয়রদের ব্যবহার ছিল খুবই নির্ম্মম। বুয়রদের বিরুদ্ধে যে ইংরেজরা যুদ্ধে লিপ্ত হয় তার একটি প্রধান কারণ ছিল এই। ইংরেজ ও বুয়রদের মধ্যে বিবাদ মিটল। দক্ষিণ আফ্রিকা ১৯০৮ সালে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভ করলে। প্রবাসী ভারতীয়দের দুর্দ্দশার কিন্তু অবসান হ'ল না।

কংগ্রেসের অষ্টাদশ অধিবেশন হ'ল গুজরাটের আহ্‌মদাবাদ শহরে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিতীয়বার কংগ্রেসের সভাপতি হলেন। কংগ্রেসের সঙ্গে একটি শিল্পপ্রদর্শনীও অনুষ্ঠিত হ'ল। এর উদ্বোধন করলেন বরোদার গাইকবাড়। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি দেওয়ান বাহাদুর আম্বালাল সরাভাই বলেন, "গুজরাট এক সময়ে ধনধান্যে পূর্ণ ছিল। কিন্তু এখন দারিদ্র্য তার চির সহচর। গুজরাটের অধিবাসী মাত্র এক কোটি, এর মধ্যে অন্যূন পঁচিশ লক্ষ বিগত দুটি দুর্ভিক্ষে মারা গেছে। আজ বহু লোক অন্নাভাবে দেশান্তরিত। গুজরাটে কাপড়ের কল স্থাপিত হয়েছে বটে, কিন্তু ট্যাক্সের তাড়ানায় তার উন্নতি পদে পদে ব্যাহত। শাসনক্ষমতা আয়ত্ত না হ'লে দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি যে অসম্ভব একথা আজ আমরা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছি।"

সুরেন্দ্রনাথ তাঁর বক্তৃতায় একটি বিষয়ে কংগ্রেসের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করলেন। উচ্চ শিক্ষার উপর আমলাতন্ত্র বহুকাল ধরেই বিরূপ। সার জর্জ্জ ক্যাম্‌বেল এক সময়ে উচ্চ শিক্ষার সংকোচসাধনে বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। লর্ড রিপন শিক্ষা কমিশন বসিয়ে এইরূপ মনোবৃত্তির লাঘব ঘটাতে প্রয়াস পান। জনশিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষা উভয়েরই দ্রুত প্রসারের তিনি

ব্যবস্থা করেন। কমিশনের মন্তব্য গ্রহণ ক'রে তিনি জনশিক্ষার ভার ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের হাতে দিলেন ও উচ্চ শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠায় সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা ক'রে দেশবাসীকে উৎসাহিত করলেন। কলকাতায় ও মফঃস্বলে এর পর বহু প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। লর্ড কার্জ্জন ১৯০২ সালে শিমলায় ইউরোপীয় শিক্ষাবিদ্‌দের নিয়ে গোপনে একটি সভা করেন। এর অব্যবহিত পরেই বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন স্থাপিত হয়। এতে প্রথমে একজনও হিন্দু সভ্য গৃহীত হয় নি। পরে এ নিয়ে বিতর্ক উপস্থিত হ'লে বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে সদস্য নিয়োজিত করা হ'ল।

লর্ড কার্জ্জনের প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের সঙ্গে শিক্ষিতমাত্রেই কমবেশী পরিচিত। কাজেই কমিশনের সিদ্ধান্তসম্পর্কে তাদের মনে নানারূপ আশঙ্কার উদ্রেক হ'ল। পাঁচ মাস পরে কমিশনের রিপোর্ট যখন বার হ'ল তখন তারা বুঝতে পারলে, উচ্চ শিক্ষার মূলে আঘাত করাই লর্ড কার্জ্জনের উদ্দেশ্য। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বিরুদ্ধ মন্তব্য রিপোর্টভুক্ত হ'ল বটে, কিন্তু সরকার তা আদৌ গ্রহণযোগ্য মনে করেন নি। সুরেন্দ্রনাথ সভাপতির অভিভাষণে এর তীব্র প্রতিবাদ জানালেন এবং উচ্চ শিক্ষার সঙ্কোচসাধনই যে লর্ড কার্জ্জনের এরূপ কমিশন স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য তা সকলকে বুঝিয়ে দিলেন। কংগ্রেসের একটি প্রস্তাবে কমিশনের মন্তব্যগুলির কথা এরূপ উল্লিখিত হয়—(১) যে সব দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ প্রথম শ্রেণীর কলেজে পরিণত হ'তে অক্ষম তাদের তুলে দেওয়া ও নূতন দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ স্থাপনে অনুমতি দান বন্ধ করা, (২) বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট কর্তৃক বিভিন্ন কলেজের ছাত্র-বেতনের নিম্নতম হার বেঁধে দেওয়া, (৩) সমগ্র দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে একই ধরণের শিক্ষাপ্রবর্ত্তন, (৪) প্রত্যেক প্রদেশের জন্য একটি মাত্র কেন্দ্রীয় আইন কলেজ প্রতিষ্ঠা, (৫) শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টরের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন বে-সরকারী স্কুলকে মঞ্জুরি দান না করা, (৬) নির্ব্বাচনের বদলে সেনেটের অধিকাংশ সভ্যের সরকার কর্তৃক মনোনয়ন ও এভাবে সেনেট ও সিণ্ডিকেটকে সরকারী শিক্ষাবিভাগের অঙ্গীভূত করা।

কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে, বিশেষ আইন কলেজ ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজগুলি তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে অতঃপর ভারতব্যাপী তীব্র আন্দোলন

উপস্থিত হ'ল। ভারত-গবর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলিকে এই মর্ম্মে এক আদেশপত্র পাঠাতে বাধ্য হলেন যে, আইন কলেজ ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ যেন তুলে দেওয়া না হয়। কমিশনের সিদ্ধান্তের নিরিখে ১৯০৪ সালে 'ইণ্ডিয়ান ইউনিভারসিটিস্ এ্যাক্ট' বিধিবদ্ধ হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটেরও বেশীর ভাগ সদস্যই সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত হবেন স্থির হ'ল। বিচারপতি সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ১৯০৮-১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত ভাইস চ্যান্সেলার ছিলেন। তিনি আইনের সীমা লঙ্ঘন না ক'রেও এমন ভাবে সেনেট ও সিণ্ডিকেট গঠনে সরকারকে সাহায্য করলেন যাতে অন্ততঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বে-সরকারী মত অনুযায়ী সকল কাজ নির্ব্বাহ করা সম্ভব হয়েছে। কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত করবার প্রস্তাব বহু পূর্ব্বেই করেছিলেন। মনীষিশ্রেষ্ঠ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁর অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি বিরাট শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত করেন। ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ও এ আদর্শ পরে গ্রহণ করেছেন।

কি স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান, কি বিশ্ববিদ্যালয়, কি অন্যান্য বিষয় লর্ড কার্জ্জনের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির জন্য ভারতময় বিক্ষোভ উপস্থিত হ'ল। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর মূল অভিভাষণে ও উপসংহার-বক্তৃতায় গবর্ণমেণ্টের প্রতি একান্ত ভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ না ক'রে যুবকসমাজকে সঙ্ঘবদ্ধভাবে নিঃস্বার্থ দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করতে উপদেশ দিলেন। তিনি মূল অভিভাষণে বললেন, "স্বাধীনতার জয়পতাকা কেউ একদিনেই ওড়াতে পারে নি। স্বাধীনতা-দেবী বড়ই ঈর্ষ্যাপরায়ণা, তিনি তাঁর ভক্তমণ্ডলীর নিকট থেকে দীর্ঘকালের অবিশ্রান্ত সাধনা দাবি করেন। ইতিহাস পাঠ করুন। স্বাধীনতালাভের উদ্দেশ্যে নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রাম চালাবার জন্য কিরূপ অফুরন্ত ধৈর্য্য, তিতিক্ষা ও নিঃস্বার্থ সাধনা প্রয়োজন এর কাছ থেকে তা জেনে নিন।" জাপান তখন প্রাচ্যের নবোদিত সূর্য্য। তার কথা উল্লেখ ক'রে সুরেন্দ্রনাথ বলেন, "জাপানের দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে। তার ইতিহাস পাঠ করলে জাপানীদের আশ্চর্য্য আত্মত্যাগ, অদ্ভুত নিজস্বকরণ ক্ষমতা, ধৈর্য্য, তিতিক্ষা, অদম্য উৎসাহ ও লেগে-থাকা শক্তির কথা জানতে পারবেন। কি ভাবে সংরক্ষণশীল প্রাচীর সঙ্গে প্রগতিশীল প্রতীচীর সংযোগ সাধন করা সম্ভব এশিয়ার সর্ব্বপ্রাচীন দেশ সর্ব্বনবীন দেশের

নিকট থেকে তা শিক্ষা করুক।" এসব সত্ত্বেও সুরেন্দ্রনাথ কিন্তু ভারতবর্ষে ব্রিটিশ-সম্পর্কের স্থায়িত্বই কামনা করলেন। তবে বর্ত্তমান স্বৈরাচার দূর ক'রেই যে তা সম্ভব এ কথাও উল্লেখ করতে তিনি তোলেন নি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মত এবারেও কংগ্রেসে নানা প্রস্তাব গৃহীত হ'ল।

কংগ্রেসের পরবর্ত্তী অধিবেশন হ'ল মাদ্রাজে। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি নবাব সৈয়দ মহম্মদ সাহেব বাহাদুর দেশসেবায় হিন্দু-মুসলমানের সমান অধিকার ও দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেন। মূল সভাপতি প্রসিদ্ধ বাগ্মী ও ব্যারিষ্টার লালমোহন ঘোষ অভিভাষণে স্বৈরাচারী শাসন-নীতির প্রতি ভারতবাসীর তীব্র মনোভাব স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেন। এক দিকে লক্ষ লক্ষ লোকের অনাহারে মৃত্যু, অন্য দিকে ১৯০৩ সালের ১লা জানুয়ারী অনুষ্ঠিত দিল্লী দরবারে জলের মত অজস্র অর্থব্যয়—তিনি এই মর্ম্মান্তিক তামাসার কঠোর সমালোচনা করলেন। ব্রিটিশ আমলে ভারতে গৃহযুদ্ধ প্রশমিত হ'য়ে শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বটে, কিন্তু তাঁর মতে "গৃহযুদ্ধ ও অরাজকতার ফলে যেমন একসময় লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণহানি ঘটত, এখনও তেমনি দুর্ভিক্ষে ও অনশনে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণহানি ঘটছে; কাজেই ভারতবাসীর কাছে এ দুটোর ভিতরে তেমন কোনই প্রভেদ নেই।" কংগ্রেসের মধ্যে যে এক নূতন দলের সৃষ্টি হয়েছে লালমোহন অভিভাষণে তা স্বীকার করলেন, এবং গণতন্ত্রমূলক আদর্শে কার্য্য করতে গিয়ে যাতে আমরা স্বৈরাচারী না হই এজন্য সকলকে অনুরোধ জানালেন। তিনি ইউনিভারসিটিস্ বিল, অফিসিয়াল সিক্রেট্স্ বিল, মাদ্রাজ মিউনিসিপাল বিল, প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল আইনগুলির বিষয় ও ব্রিটিশের নির্ম্মম অবাধ-বাণিজ্যনীতির ফলে দেশীয় শিল্পের ধ্বংসের কথা পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করেন। বঙ্গবিচ্ছেদের যে চেষ্টা শুরু হয়েছে তারও তিনি আভাস দেন। এ বক্তৃতাটি কংগ্রেসের প্রবীন নেতাদের মনঃপূত না হ'লেও নবীন দল এ দ্বারা বিশেষ উৎসাহিত হন। লালমোহনই এই অভিভাষণে সর্ব্বপ্রথম ভারতবাসীর অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন।

সরকারী নীতি ক্রমশঃ কঠোর হ'তে কঠোরতর হ'লেও কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলি পূর্ব্ববৎ মামুলি ধরণেরই রইল। লর্ড কার্জ্জন ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী ও ভারতবর্ষে গণতন্ত্র-প্রবর্ত্তনের ঘোর বিরোধী। শাসকবর্গের স্বৈরাচার অটুট রাখবার জন্য

তিনি 'অফিসিয়াল সিক্রেট্স্' আইন ব্যবস্থাপরিষদে পাস করিয়ে নেন্। এ আইন বলে তিনি সরকারী নীতি ও কার্য্যগুলির অধিকাংশকেই গোপনীয় ছাপ দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। এসকল বিষয় প্রকাশ বে-আইনী ও দণ্ডনীয় অপ-রাধ বলে গণ্য হ'ল। এর প্রতিবাদেও কংগ্রেসে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

পর বছর কংগ্রেসের অধিবেশন হয় বোম্বাইয়ে। কার্জ্জনী আমলের স্বৈরা-চার শিক্ষিত ভারতবাসীর মনে এক আশ্চর্য্য প্রেরণা জাগায়। তাই এবারে কংগ্রেসের প্রতিনিধি-সংখ্যা হাজারের উপরে গিয়ে পৌঁছে। ১৮৯৫ সালের পরে প্রতিনিধি-সংখ্যা এত বেশী আর কখনও হয় নি। এবারে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হলেন ফিরোজ শা মেহ্‌তা ও মূল সভাপতি সার হেন্‌রি কটন। সার উইলিয়ম ওয়েডারবর্ণ ও পার্লামেণ্ট সদস্য মিঃ স্যামুয়েল স্মিথ কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন। ফিরোজ শা মেহ্‌তা কংগ্রেসের ভিতরে দুটি দলের অস্তিত্ব স্বীকার করেন ও বলেন যে, যতদিন ভারতবাসীর অভিযোগসমূহ নিরাকৃত না হবে ততদিন দু'দল থাক্‌বেই। কংগ্রেস উইলিয়ম ডিগ্‌বী ও জামশেঠজী নাজিরবানজী টাটার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন।

মূল সভাপতি সার হেন্‌রি কটনের বিষয় আমরা আগেই কিছু কিছু জানতে পেরেছি। তাঁর উর্দ্ধতন ও অধস্তন চার পুরুষ কোম্পানীর ও ব্রিটিশ-রাজের আমলে ভারতবর্ষে সিবিলিয়ানী চাকরী করেন। সার হেনরী ছিলেন প্রকৃত ভারত-হিতৈষী রাজপুরুষ। তিনি ইল্‌বার্ট বিল আন্দোলনের অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করায় স্বজাতীয়দের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। তিনি চাকরি-জীবনের শেষ দিকে আসামের চীফ কমিশনার পদে অধিষ্ঠিত হয়ে চা-বাগানের শ্রমিকদের মঙ্গল সাধনে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু বড়লাট লর্ড কার্জ্জনের প্রতিবন্ধকতায় তাতে সাফল্য লাভ করেন নি। কটন সাহেব বঙ্গের ছোট-লাট হওয়ার কথা ছিল; কিন্তু ভারতীয়দের প্রতি সযানুভূতিশীল হওয়ায় তাঁর পদোন্নতিতে বিঘ্ন ঘটে। তিনি ১৯০৩ সালে কর্ম্মে থেকে অবসর গ্রহণ ক'রে বিলাত যান ও পর বছর ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান কমিটির প্রেসিডেণ্ট হন। ভারত-বাসীরা কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ কটন সাহেবকে কংগ্রেসের বিংশতি অধিবেশনে সভাপতি পদে অভিষিক্ত করলে।

কটন তাঁর উদ্বোধন বক্তৃতায় ভারতবর্ষের ভাবী শাসনপ্রণালী সম্পর্কে বলেন

যে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শেই ভারত-রাষ্ট্র গঠিত হবে। প্রত্যেকটি প্রদেশ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্ররূপে একটি ফেডারেশনে সম্মিলিত হবে। ("a Federation of free and separate States, the United States of India")। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বঙ্গ-ভঙ্গ সম্পর্কে তিনি কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব করেন। পরে বঙ্গ-ভঙ্গ রদ ক'রে যে ভাবে নূতন প্রদেশ গঠিত ও শাসন ব্যবস্থা নির্ণীত হয় তা তাঁরই প্রস্তাবের অনুগ। তিনি বলেন, একজন ছোটলাটের পক্ষে বঙ্গের মত বড় প্রদেশ (তখন বিহার-উড়িষ্যা এর অন্তর্গত ছিল) শাসন দুঃসাধ্য হ'লে হয় বোম্বাই ও মাদ্রাজের মত বাংলার শাসনভার সকৌন্সিল গবর্ণরের উপর প্রত্যর্পণ করা হোক, নতুবা অ-বঙ্গভাষী বিহারকে স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করা হোক। কর্তৃপক্ষ কিন্তু তখন এর কোনটিই না ক'রে প্রথমে চট্টগ্রাম বিভাগ ও ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলাকে আসামের সঙ্গে মিলিয়ে স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করতে চেয়েছিলেন। পরে অবশ্য তাঁদের উদ্দেশ্য আরও ব্যাপক হয় অর্থাৎ ঢাকা ও রাজসাহী বিভাগকেও আসামের সঙ্গে যুক্ত ক'রে নূতন প্রদেশ গঠন করা হয়।

১৯০৪ সালে লর্ড কার্জ্জনের প্রতিক্রিয়াশীল নীতি চরমে উঠে। বিশ্ব-বিদ্যালয় আইন বিধিবদ্ধ ক'রে তিনি ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্বাধীনতা হরণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্যগণ সরকার মনোনীত হ'লেও এযাবৎ তাঁরা ছিলেন আজীবন সদস্য। অতঃপর প্রতি পাঁচ বছর অন্তর সরকার এই সব সদস্য মনোনীত করবেন স্থির হ'ল।

লর্ড কার্জ্জন একটি সরকারী প্রস্তাবে স্থির করেন যে, শাসনকার্য্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করতে হ'লে দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিকসংখ্যক ইউরোপীয় নিযুক্ত করা আবশ্যক। তিনি এই প্রসঙ্গে এই মর্ম্মে অভিমত প্রকাশ করলেন যে, ভারতীয়েরা উচ্চ দায়িত্বশীল পদের অযোগ্য! তিনি ১৮৩৩ সালের পার্লামেণ্টীয় বিধি ও ১৮৫৮ সালের মহারাণীর ঘোষণা উভয়ের গুরুত্বই অস্বীকার করতে প্রয়াস পেলেন। এবারকার অধিবেশনে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করলেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি হিসাব ক'রে দেখালেন যে, যে-সব পদের বেতন হাজার টাকা ও তার উপর, সে-সব পদে শতকরা মাত্র চৌদ্দ জন, আর পাঁচ শ' টাকার পদগুলিতে শতকরা মাত্র সতর জন ভারতবাসী নিয়োজিত!

কার্জ্জনী আমলে ভারতীয় অর্থে সাম্রাজ্য-বিস্তার নীতি পূর্ণোদ্যমে অনুসৃত হ'তে থাকে। তিনি ১৯০৩-০৪ সালে তিব্বতে 'ব্রিটিশ মিশন' নামে একটি বিজয় অভিযান প্রেরণ করেন। এর প্রতিবাদে প্রস্তাব উত্থাপন ক'রে এন এ ওয়াদিয়া বলেন, "তিব্বতের কৃষকগণ স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য শক্তিমান শত্রুর বিরুদ্ধে এমন ভাবে লড়েছে যাতে তাদের পবিত্র স্বদেশপ্রেম, অদম্য-স্বাধীনতা-প্রীতি ও বিপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করবার প্রশংসনীয় উদ্যম প্রকাশ পেয়েছে।" সার বলচন্দ্র কৃষ্ণ একটি প্রস্তাবে ভারতসচিবের বেতন ও তাঁর কৌন্সিলের ব্যয়ভার ভারত-সরকারের বদলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে বহন করতে অনুরোধ জানান। ভারতসচিবের স্বৈরাচারী হবার একটি প্রধান কারণ—তাঁর বেতনের জন্য কি ব্রিটেন কি ভারতবর্ষ কারও নিকট তাঁকে জবাবদিহি করতে হয় না। বঙ্গ-ভঙ্গ প্রস্তাবের বিরুদ্ধেও কংগ্রেসে একটি প্রস্তাব গৃহীত হ'ল।

বিলাতে এই সময় সাধারণ নির্ব্বাচন আসন্ন হয়। ভারত-বন্ধু সার উইলিয়ম ওয়েডারবর্ণের প্রস্তাবে ও বালগঙ্গাধর তিলকের সমর্থনে স্থির হ'ল যে, ভারতের অবস্থা ব্রিটিশ জনসাধারণকে বুঝাবার জন্য কংগ্রেস থেকে কয়েকজন প্রতিনিধি প্রেরণ করা হবে। তিলক এই প্রসঙ্গে বলেন, ভারত-সরকার যখন তাঁদের কথায় কর্ণপাত করেন না তখন বিলাতের জনমতই একমাত্র ভরসা। এই প্রস্তাব অনুসারেই লালা লজপত রায় ও গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে বিলাতে প্রেরিত হয়েছিলেন। লালা লজপত রায় এ সময়ে একবার আমেরিকায়ও গমন করেন। লালাজী বিলাত থেকে ফিরে এসে এই মত প্রকাশ করলেন যে, বিলাতের লোকেরা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত, সেখানে জনমত গঠনের জন্য সময় ও অর্থ ব্যয় বৃথা। স্বদেশে বসেই ভারতবাসীকে সঙ্ঘবদ্ধ ক'রে রাষ্ট্রীয় আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ করতে হবে। গোখ্‌লে মহোদয় এই উদ্দেশ্যে ১৯০৫ সালে 'সার্ভেণ্ট অফ্‌ দি ইণ্ডিয়া সোসাইটী' বা ভারত-ভৃত্য সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রিটিশের অধীন থেকে ভারতবাসীর নৈতিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় উন্নতি সাধন এই সমিতির লক্ষ্য। লালা লজপত রায়ও বহু বছর পরে 'সার্ভেণ্ট অফ্‌ দি পিপ্‌ল্‌ সোসাইটি' নামে অনুরূপ একটি সমিতি স্থাপন করেছিলেন।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ ও স্বদেশী-ব্রত গ্রহণ

লর্ড কার্জ্জন ১৯০৫ সালের শেষে কর্ম্মে ইস্তফা দিয়ে বিলাত চলে যান। লর্ড কিচেনারের সঙ্গে মতদ্বৈধতাই তাঁর এই পদত্যাগের একমাত্র কারণ। জঙ্গীলাট বড়লাটের শাসনপরিষদের সদস্য এবং দেশরক্ষা-বিভাগের কর্ত্তা। কিন্তু এ বিষয়ে বডলাটের পরামর্শদাতা ছিলেন এক স্বতন্ত্র ব্যক্তি। বড়লাটকে কোন কথা জানাতে হ'লে এঁর মারফতই জানাতে হ'ত। লর্ড কিচেনারের এ ব্যবস্থা মোটেই পছন্দসই ছিল না। এ ব্যবস্থা রদ ক'রে জঙ্গীলাটকেই আইনতঃ বড়লাটের পরামর্শদাতারূপে গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে ভারতসচিবকে তিনি এক পত্র লেখেন। লর্ড কার্জ্জন পূর্ব্ব ব্যবস্থারই পক্ষপাতী। কাজেই, ভারতসচিব যখন লর্ড কিচেনারের মতেই সায় দিলেন তখন তাঁর পদত্যাগ করা ছাড়া উপায়ন্তর রইল না।

লর্ড কার্জ্জনের স্বৈরশাসনের নমুনা আমরা আগেই পেয়েছি। তাঁর আমলে পুলিশ কমিটি নিয়োজিত হয়। এ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী তিনি পুলিশ আইন বিধিবদ্ধ করান। গোয়েন্দা বিভাগ এই সময়েরই সৃষ্টি। পাঁচ শ' টাকার বদলে হাজার টাকার উপরে আয়কর নির্দ্ধারণ, লবণকর হ্রাস, পুরাতন মন্দির-রক্ষা, সমবায় সমিতি প্রভৃতি আইন দ্বারা ভারতবাসী কম উপকৃত হয় নি, কিন্তু তিনি ভারতবাসীদের নিম্নস্তরের জীব ব'লেই মনে করতেন ও ইংরেজের সমান মর্য্যাদা দিতে বরাবরই কুণ্ঠিত ছিলেন। ১৯০৫ সালে ১১ই ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে লর্ড কার্জ্জন চ্যান্সেলার রূপে একটি বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতায় তিনি সমগ্র এশিয়াবাসীকে মিথ্যাবাদী, অসাধু ও কপটতাপ্রিয় ব'লে আখ্যা দেন। ভগিনী নিবেদিতা এ উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। নিবেদিতা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্প্রদায় ভুক্তা বিদুষী ও মহীয়সী মহিলা। তাঁর পূর্ব্ব নাম মিস্ মার্গারেট নোবেল। ১৯০২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি ভারতবর্ষে আগমন করেন। সংস্কৃত ও ললিত কলার

ব্যাখ্যায় তিনি সর্ব্বদা নিরত ছিলেন। লর্ড কার্জ্জনের ওরূপ দাম্ভিক নির্লজ্জ মিথ্যা উক্তিতে নিবেদিতা হৃদয়ে খুবই ব্যথা পান ও কার্জ্জনের 'প্রব্লেম্স্ অফ্ দি ফার ঈষ্ট'—গ্রন্থ থেকে এক উক্তি 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় উদ্ধৃত ক'রে দেখিয়ে দেন, লর্ড কার্জ্জন নিজেই কিরূপ অনৃতবাদী! কার্জ্জনের উক্তির প্রতিবাদে ডক্টর রাসবিহারী ঘোষের সভাপতিত্বে পরবর্ত্তী ১০ই মার্চ্চ (১৯০৫) কল্‌কাতা টাউন হলে এক বিরাট্ জনসভার অধিবেশন হয়। রাসবিহারী তাঁর অভিভাষণে কার্জ্জনের উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করেন।

দীর্ঘ সাত বছরের স্বৈরশাসনে ভারতবাসী উত্যক্ত হ'য়ে উঠেছিল খুবই, কিন্তু যাবার বেলা লর্ড কার্জ্জন বাঙালীকে এমন এক আঘাত দিয়ে যান যার ফলে বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষ দীর্ঘকাল আন্দোলিত হ'তে থাকে। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ সম্পর্কে জল্পনা বহুদিন পূর্ব্বেই শুরু হয়। কংগ্রেস এর প্রতিবাদে ১৯০৩ ও ১৯০৪ সালে প্রস্তাব গ্রহণ করেন। লর্ড কার্জ্জনের নির্দ্দেশে বঙ্গের ছোটলাট নূতন প্রতিষ্ঠিত ল্যাণ্ড হোল্ডার্স এসোসিয়েশন বা জমীদারসভা আহ্বান ক'রে তাদের এর মর্ম্ম বুঝিয়ে দিলেন। স্বয়ং পূর্ব্ব বাংলা ভ্রমণ ক'রে জমীদার ও প্রজাদের এ সম্পর্কে অনেক কথা বললেন। কিন্তু মুষ্টিমেয় মুসলমান ছাড়া কেউই তাঁর এ প্রস্তাবে রাজি হন নি। ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ জমীদার মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী তাঁকে মুখের উপরই বলেছিলেন, বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ হ'লে বাঙালীরা সেজন্য প্রাণপণে লড়তেও দ্বিধা করবে না। এর পর কিছুকাল সব চুপচাপ থাকে। অকস্মাৎ একদিন শোনা গেল, বঙ্গব্যবচ্ছেদ-কার্য্যে ভারতসচিব সম্মতি দান করেছেন। সে দিন ছিল ২০শে জুলাই, ১৯০৫। রাজসাহী বিভাগ, ঢাকা বিভাগ ও চট্টগ্রাম বিভাগ আসামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ এবং বাকী অংশ—প্রেসিডেন্সি বিভাগ, বর্দ্ধমান বিভাগ, বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর বাংলাদেশ নামে পরিচিত হ'ল! তিনি বঙ্গ ভঙ্গ ক'রে এক ঢিলে দুই পাখী মারতে চেয়েছিলেন। বাঙালী জাতি রাজনীতিতে ও শিক্ষায় অগ্রসর ও সমগ্র ভারতে নেতৃস্থানীয়। এই জাতিকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারলে তার নেতৃত্বক্ষমতাও ঘুচে যাবে ভারতবাসীর প্রগতিমূলক আন্দোলনেও ভাটা পড়বে। অন্য উদ্দেশ্য ছিল আরও মারাত্মক —হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ভেদবুদ্ধির উদ্রেক। তিনি পূর্ব্ববঙ্গ সফরকালে

মুসলমানদের বুঝিয়েছিলেন, নূতন প্রদেশ গঠিত হ'লে পূর্ব্ববঙ্গে তাদেরই প্রাধান্য হবে। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত থাকলে সরকারে প্রতিপত্তিলাভে তাদের কোনই সুবিধা হবে না। ঢাকার নবাব ও অন্যান্য মুসলমান প্রধানেরা কেউ কেউ প্রথমে বঙ্গব্যবচ্ছেদ-প্রস্তাবে আপত্তি করলেও শেষ পর্য্যন্ত কার্জ্জনের কথায় ভুলে তাঁরই মতানুবর্ত্তী হয়েছিলেন। নবগঠিত পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের ছোটলাট সার ব্যাম্‌ফিল্ড ফুলার কার্জ্জনের এই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করতে সবিশেষ তৎপর হন। তিনি প্রকাশ্যে বহু স্থলে বলেছিলেন, তাঁর হিন্দু মুসলমান দুই স্ত্রী ·হিন্দু দুয়ো রাণী অবহেলিতা ও নিন্দিতা, আর মুসলমান সুয়ো রাণী—প্রণয়াস্পদা ও সবিশেষ অনুরাগিণী!

বঙ্গভঙ্গের বার্ত্তা শুনে পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ সর্ব্বত্র বাঙালীপ্রাণ ভীষণ উদ্বেলিত হ'য়ে উঠে, ফলে যে আন্দোলন উপস্থিত হ'ল বাঙলার ইতিহাসে তার তুলনা নেই। কার্জ্জনের তীব্র কশাঘাতে বাঙালীর নিদ্রা ভেঙ্গে গেল ও সমগ্র শক্তি বঙ্গভঙ্গ-প্রতিরোধ আন্দোলনের মধ্যে নিয়োজিত হ'ল। রবীন্দ্রনাথ নব পর্য্যায় বঙ্গদর্শনে লিখলেন:

"বাহিরের কিছুতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবে, একথা আমরা কোন মতেই স্বীকার করিব না। কৃত্রিম বিচ্ছেদ যখন মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইবে, তখনই আমরা সচেতনভাবে অনুভব করিব যে, বাঙ্গালার পূর্ব্ব পশ্চিমকে চিরকাল একই জাহ্নবী তাঁহার বহু বাহু পাশে বাঁধিয়াছেন, একই ব্রহ্মপুত্র তাঁহার প্রসারিত আলিঙ্গনে গ্রহণ করিয়াছেন। এই পূর্ব্ব পশ্চিম, হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ বাম অংশের ন্যায়, একই পুরাতন রক্তস্রোত সমস্ত বঙ্গদেশের শিরায় উপশিরায় প্রাণ বিধান করিয়া আসিয়াছে। জননীর বাম দক্ষিণ স্তনের ন্যায় চিরদিন বাঙালীর সন্তানকে পালন করিয়াছে। আমরা প্রশ্রয় চাহি না—প্রতিকূলতার দ্বারাই আমাদের শক্তির উদ্বোধন হইবে। বিধাতার রুদ্র মূর্ত্তিই আজ আমাদের পরিত্রাণ। জগতে জড়কে সচেতন করিয়া তুলিবার এক মাত্র উপায় আছে—আঘাত, অপমান ও অভাব; সমাদর নহে, সহায়তা নহে, সুভিক্ষা নহে।"

কল্‌কাতায় ও মফস্বলস্থ বিভিন্ন শহরে বাঙালীরা সভাসমিতি ক'রে প্রতিজ্ঞা করলেন, এ ব্যবস্থার প্রতিকার করতেই হবে। কিন্তু হীনবল জাতির পক্ষে কি উপায় অবলম্বন সম্ভব! স্বদেশী যুগের অন্যতম প্রধান নেতা কৃষ্ণকুমার

মিত্র তাঁর 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় দেশের জনসাধারণকে একটি উপায় এইরূপ বাৎলে দিলেন। তারা যেন সকলে প্রতিজ্ঞা করে—"আমরা স্বদেশের কল্যাণের জন্য মাতৃভূমির পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমরা অতঃপর দেশজাত দ্রব্য পাইলে কোনওবিদেশীয় দ্রব্য ক্রয় করিব না। এই কার্য্য করিতে যদি কোন আর্থিক বা অন্য কোনও প্রকার ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়, তাহাও আমরা করিতে প্রস্তুত হইব। আমরা এরূপ কার্য্য কেবল নিজেরাই করিয়া ক্ষান্ত হইব না, বন্ধু বান্ধব ও অন্যান্য লোকদিগকেও এইরূপ করিবার জন্য যথাসাধ্য যত্ন ও চেষ্টা করিব। ভগবান আমাদের এই শুভ সঙ্কল্পে সহায় হউন।"

তড়িৎ গতিতে এই বাণী বাংলার দিকে প্রতিধ্বনিত হ'ল। জনগণ সভাসমিতি ক'রে বিলাতী দ্রব্য 'বয়কট' বা বর্জ্জনের সঙ্কল্প গ্রহণ করলে। এই 'বয়কট' কথাটির কিন্তু একটি চমৎকার ইতিহাস আছে। এ কথাটি প্রথম আয়ার্লণ্ডে ব্যবহৃত হয়। ক্যাপ্টেন চার্লস কানিংহাম বয়কট (১৮৩২-৯৭) আয়ার্লণ্ডের এক ইংরেজ জমিদারের প্রতিনিধি রূপে কাজ করতেন। ১৮৮০ সালে প্রজারা যে হারে খাজনা দিতে চাইলে তা তিনি গ্রহণ করতে রাজি হলেন না। এর ফলে ক্যাপ্টেন বয়কটকে তারা সর্ব্বপ্রকারে বর্জ্জন করে। ভৃত্যরা তাঁকে ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। তারা পত্র আদানপ্রদান ও খাদ্য সরাবরাহ বন্ধ ক'রে, তাঁর গৃহপ্রাচীরও ভেঙ্গে দেয়। বয়কটের যখন এইরূপে জীবনমরণ সমস্যা উপস্থিত তখন সরকার সৈন্যদল পাঠিয়ে তাঁকে উদ্ধার করেন। 'বয়কট' কথাটির পরে বহুল প্রচার হয়েছে। বিদেশী দ্রব্যাদি বর্জ্জনকেও এই বয়কট আখ্যা দেওয়া হয়। চীনে এসময়ের কিছু পূর্ব্বে মার্কিনী দ্রব্যাদি সার্থকভাবে বয়কট করা হয়েছিল।

বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ স্বদেশভক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী "বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথায়" লিখলেন, "মা লক্ষ্মী, কৃপা কর, কাঞ্চন দিয়ে কাচ নেবো না। ঘরের থাকতে পরের নেবো না। শাঁখা থাকতে চুড়ি পরবো না। পরের দুয়ারে ভিক্ষা করবো না। মোটা বসন অঙ্গে নেবো। মোটা ভুষণ আভরণ করবো। পরশীকে খাইয়ে নিজে খাব। মোটা অন্ন অক্ষয় হোক, মোটা বস্ত্র অক্ষয় হোক। ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাকুক।"

কান্তকবি রজনীকান্ত সেন সঙ্কীর্ত্তনপ্রিয় বাঙালীকে সঙ্কীর্ত্তন শুনালেন :

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়,
মাথায় তুলে নেরে ভাই !
দীন দুখিনী মা যে তোদের,
তার বেশী আর সাধ্য নাই।
সেই মোটা সূতার সঙ্গে,
মায়ের অপার স্নেহ দেখতে পাই ,
আমরা এম্‌নি পাষাণ, তাই ফেলে ওই
পরের দোরে ভিক্ষা চাই।
ওই, দুঃখী মায়ের ঘরে,
তোদের সবার প্রচুর অন্ন নাই ;
তবু, তাই বেচে কাচ সাবান মোজা,
কিনে কল্লি ঘর বোঝাই।
আয়রে আমরা মায়ের নামে,
এই প্রতিজ্ঞা করবো ভাই,
পরের জিনিস কিনব না,
যদি মায়ের ঘরের জিনিস পাই।"

ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, সিরাজগঞ্জ, সর্ব্বত্র অন্ততঃ হাজার জনসভায় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হ'ল ও সঙ্গে সঙ্গে বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জনের প্রস্তাব করা হ'ল। ৭ই আগষ্ট (১৯০৫) তারিখে কাশীমবাজারের মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কলকাতা টাউন হলে এক বিরাট্ জনসভায় মফস্বলের বিলাতী বর্জ্জন আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন ক'রে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবে স্পষ্ট বলা হয় যে, ভারতশাসনের প্রতি ব্রিটিশ জনসাধারণের ঔদাসীন্য ও জনমতের প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্টের উপেক্ষা তাদের এই পন্থা অবলম্বন করতে বাধ্য করেছে। প্রস্তাব উত্থাপন করেন 'ইণ্ডিয়ান মিরর'-সম্পাদক বয়োবৃদ্ধ নরেন্দ্রনাথ সেন।

বক্তৃতায়, প্রবন্ধে ও গানে বিলাতী বর্জ্জন ও স্বদেশী গ্রহণের কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হ'তে লাগল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কান্তকবি রজনীকান্ত সেন,

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, কামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির রচিত সঙ্গীত; রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, বিপিনচন্দ্র পাল, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির প্রবন্ধ ও যশস্বী গায়ক রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতবিশারদ হেমচন্দ্র সেন, প্রভৃতির গানে বাঙালী উদ্বোধিত হ'ল। কৃষ্ণকুমার মিত্র, বিপিনচন্দ্র পাল, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, প্রেমতোষ বসু, গীষ্পতি কাব্যতীর্থ প্রভৃতি বক্তার ওজস্বিনী বক্তৃতায় বঙ্গসন্তান মেতে উঠল। সরকার হিন্দু সমাজ থেকে মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখবার চেষ্টা করেছিলেন। তথাপি বহু বিশিষ্ট মুসলমান স্বদেশী আন্দোলনে মনে প্রাণে যোগ দিলেন। ঢাকার নবাব শলিমুল্লার ভ্রাতা আকাতুল্লা বাহাদুর স্বদেশী আন্দোলন পূর্ণ সমর্থন করেন। ব্যারিষ্টার আব্দুল রসুল, মৌলবী আবুল কাসেম, আবুল হোসেন, দেদার বক্স, দীন মহম্মদ, আবদুল গফুর সিদ্দিকী, লিয়াকৎ হোসেন, ইস্‌মাইল সিরাজী, আবদুল হালিম গজনবী প্রভৃতি বিখ্যাত মুসলমানগণ দিকে দিকে স্বদেশীর বার্ত্তা প্রচার করতে লাগলেন। দেশীয় খ্রীষ্টানসমাজ, জমিদারসমাজ ও নারীসমাজ স্বদেশীর প্রেরণায় একেবারে মাতোয়ারা হলেন। বিলাতী বর্জ্জনকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য নানা সমিতি ও সঙ্ঘ গঠিত হ'ল। মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার ব্রতী সমিতি, সুরেশচন্দ্র সমাজপতির বন্দেমাতরম্ সম্প্রদায় ও ভবানীপুর-কালীঘাট অঞ্চলের সন্তান সম্প্রদায়, চিত্তরঞ্জন দাশের ভবনে স্থাপিত স্বদেশী মণ্ডলী এস্থলে উল্লেখ-যোগ্য। পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত কলকাতার ফিল্ড এণ্ড একাডেমি ক্লাবও স্বদেশী মন্ত্র-প্রচারে অগ্রণী হলেন। মফস্বলের সমিতিগুলির মধ্যে বরিশালের স্বদেশবান্ধব সমিতি ও ময়মনসিংহের সুহৃৎ সমিতি স্বদেশী প্রচারে বিশেষ অবহিত হন। এই প্রসঙ্গে কলিকাতার ডন সোসাইটি ও তার মুখপত্র 'ডন ম্যাগাজিন' পত্রিকার কথা এখানে উল্লেখযোগ্য। বাঙালী যুবকদের মনে স্বদেশী ভাব জাগাতে, বঙ্গভঙ্গের কয়েক বৎসর পূর্ব্ব থেকেই এ বিশেষ সাহায্য করছিল।

'ডন ম্যাগাজিন' ও 'ডন সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মনস্বী সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সরকার ঘোষণা করলেন, ১৯০৫, ১৬ই অক্টোবর (৩০শে আশ্বিন) বঙ্গের

অঙ্গচ্ছেকার্য্য সমাধা হবে। অমনি দিকে দিকে এই দিনটিকে ক্ষোভ ও দুঃখের প্রতীক ক'রে তোলবার জন্য নেতৃবর্গ আয়োজন শুরু করলেন। এই দিনটিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উভয় বঙ্গের মিলনের চিহ্নস্বরূপ 'রাখীবন্ধন' ও রামেন্দ্র-সুন্দর ত্রিবেদী ক্ষোভ প্রকাশের জন্য 'অরন্ধন' পালন করবার প্রস্তাব করলেন। প্রস্তাব সাগ্রহে গৃহীত হ'ল। সুরেন্দ্রনাথ 'অখণ্ড বঙ্গভবন' প্রতিষ্ঠার আয়োজন করতে লাগলেন। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, তিনি পূর্ব্বে প্যারিসের 'হোটেল দ্য ইন্‌ভ্যালিড'-এ ফ্রান্সের প্রত্যেকটি প্রদেশের প্রতীক স্বরূপ এক একটি মূর্ত্তি দেখেছিলেন। আল্‌সেস লোরেন ওসময়ে ফ্রান্স থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল ব'লে তার প্রতীককে বস্ত্রাবৃত ক'রে রাখা হয়েছিল। কল্‌কাতায় এরূপ একটি ভবনে প্রতিটি জেলার প্রতীক স্বরূপ এক একটি মূর্ত্তি থাকবে ও যত দিন বিচ্ছিন্ন জেলাগুলি আবার বঙ্গের সঙ্গে যুক্ত না হবে তত দিন সে-সকলের প্রতীক বস্ত্রাচ্ছাদিত ক'রে রাখা হবে। সুরেন্দ্রনাথের এ প্রস্তাব ভগিনী নিবেদিতা ও ব্যারিষ্টার তারকনাথ পালিত সাগ্রহে সমর্থন করেছিলেন। ঐ দিনেই এই ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হ'ল।

বঙ্গভঙ্গকার্য্য বাঙালীর হৃদয়তন্ত্রীতে কত গভীর আঘাত দিয়েছিল এদিনের প্রতিপাল্য কর্ম্মপদ্ধতিতে তা সুপ্রকট। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ স্থির করলেন,—শোকপ্রকাশ স্বরূপ ৩০শে আশ্বিন শিশু ও রোগী ব্যতীত, কেউই অন্নজল গ্রহণ করবেন না এবং সকলেই সেদিন খালি পায়ে থাকবেন। কোন বাঙালীর ঘরে চুলি জ্বলবে না। ব্যবসাবাণিজ্য সব বন্ধ থাকবে, রাস্তায় ঘোড়ার গাড়ী বা গরুর গাড়ী চলবে না। দোকানপাট ও বাজারও বন্ধ রাখার কথা হয়। আরও কথা থাকে যে, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব থেকে কল্‌কাতার উত্তর হ'তে দক্ষিণ পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানে যুবকগণ 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত করতে করতে গঙ্গার ধারে সমবেত হ'য়ে তথায় স্নান ক'রে বীডন স্কোয়ার ও কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে সমবেত হবে। প্রথমত, সেখানে রাখীবন্ধন ও বঙ্গ-বিচ্ছেদ জনিত প্রাণের ক্ষেদ ও সঙ্কল্পপ্রকাশ, দ্বিতীয়ত, অপার সার্কুলার রোডে অপরাহ্নকালে এক বিরাট সভার অনুষ্ঠান এবং গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের বাঙালীদের যে বিচ্ছিন্ন করতে পারেন নি তার চিহ্ন স্বরূপ ঐ সভাস্থল ক্রয় ও তদুপরি অখণ্ড বঙ্গভবন নির্ম্মাণব্যবস্থা, তৃতীয়ত, বাগবাজার ষ্ট্রীটে

পশুপতি বসুর বাটীতে সন্ধ্যাকালে আর-একটি জনসভা হবে। শেষোক্ত স্থলে স্বদেশী বস্ত্র উৎপাদনের সাহায্যার্থ অর্থ সংগ্রহ করার কথাও হয়।

এই কার্য্যক্রম কল্‌কাতার বাঙালীসমাজ নীরবে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল। সেদিন সর্ব্বত্র হরতাল—কাজকর্ম্ম, গাড়ী চলাচল সবই বন্ধ। 'রাখী-বন্ধন'এর মিলন মন্ত্র রবীন্দ্রনাথ রচিত এই 'রাখীসঙ্গীতে' সহস্র কণ্ঠে গীত হ'ল,

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার হাওয়া বাংলার ফল
পুণ্য হউক্ পুণ্য হউক্
পুণ্য হউক্ হে ভগবান—
বাংলার ঘর বাংলার হাট
বাংলার বন বাংলার মাঠ
পূর্ণ হউক্ পূর্ণ হউক্
পূর্ণ হউক হে ভগবান—
বাঙালীর পণ বাঙালীর আশা,
বাঙালীর কাজ বাঙালীর ভাষা,
সত্য হউক্ সত্য হউক্
সত্য হউক্ হে ভগবান—
বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন
বাঙালীব ঘরে যত ভাই বোন
এক হউক্ এক হউক্
এক হউক্ হে ভগবান।

এই গানটিও সঙ্গে সঙ্গে গীত হ'ল,

ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে,
ততই বাঁধন টুট্‌বে—
মোদের ততই বাঁধন টুট্‌বে।
ওদের যতই আঁখি রক্ত হবে
মোদের আঁখি ফুট্‌বে—
ততই মোদের আঁখি ফুট্‌বে।

আজকে যে তোর কাজ করা চাই,
স্বপ্ন দেখার সময় ত নাই ;
এখন ওরা যতই গর্জ্জাবে ভাই,
তন্দ্রা ততই ছুটবে—
মোদের তন্দ্রা ততই ছুটবে।

* * *

গঙ্গাস্নানান্তে বীডন উদ্যানে ও সেণ্ট্রাল কলেজ প্রাঙ্গণে রাখী উৎসব সম্পন্ন হ'ল। অপরাহ্ণে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট স্থানে অখণ্ড বঙ্গভবন-স্থাপন উদ্দেশ্যে সভা অনুষ্ঠিত হ'ল। স্বদেশগতপ্রাণ, সর্ব্বজনপ্রিয় নেতা আনন্দমোহন বসু তখন রোগশয্যায়। অল্পকাল মধ্যেই এই রোগশয্যা মৃত্যুশয্যায় পরিণত হয়েছিল। তিনি একরকম মৃত্যুশয্যা থেকে এসে এই সভার সভাপতিত্ব করলেন। আরাম কেদারায় ক'রে তাঁকে সভাস্থলে আনা হ'ল। সদ্য অবসরপ্রাপ্ত হাইকোর্টের বিচারপতি কল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় ভাইস্-চ্যান্সেলার স্বধর্ম্মনিষ্ঠ সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আনন্দমোহনকে সভাপতির আসন গ্রহণের প্রস্তাব ক'রে বঙ্গভঙ্গের অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে এক মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা করলেন। সুরেন্দ্রনাথ বলেন, বঙ্গভঙ্গকার্য্য বাঙালী মাত্রেরই মর্ম্মস্থলে যে ভীষণ আঘাত করেছিল সার গুরুদাসের বক্তৃতাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। পঞ্চাশ হাজার লোকের বিপুল 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনির মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ আনন্দমোহনের অভিভাষণ পাঠ করেন। অভিভাষণ পাঠের পর আনন্দমোহন বসু স্বাক্ষরিত একটি ঘোষণাপত্র পঠিত হয়। ঘোষণাপত্রটি ইংরেজীতে পাঠ করেন ব্যারিষ্টার ও পরবর্ত্তী কালে কল্‌কাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সার আশুতোষ চৌধুরী ও বাংলায় পাঠ করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ঘোষণাপত্রটি এই—

"Whereas the Government has thought fit to effectuate the partition of Bengal in spite of the universal protest of the Bengalee Nation, we hereby pledge and proclaim that we as a people shall do everything in our power, to counteract the evil effects of the dismemberment of our province and to maintain the integrity of our race. So God help us."—A. M. Bose.

বাংলা --

"যেহেতু বাঙালী জাতির সর্ব্বজনীন প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া পার্লামেণ্ট বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ কার্য্যে পরিণত করা সঙ্গত বোধ করিয়াছেন, সেহেতু আমরা এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের কুফল নাশ করিতে এবং বাঙালী জাতির একতা সংরক্ষণ করিতে আমরা সমস্ত বাঙালী জাতি, আমাদের শক্তিতে যাহা কিছু সম্ভব তাহার সকলই প্রয়োগ করিব। বিধাতা আমাদের সহায় হউন।"

পশুপতি বসুর গৃহপ্রাঙ্গণে সন্ধ্যায় সভা হ'ল। প্রায় এক লক্ষ লোক সভায় যোগদান করে। পূর্ব্ব নির্দ্দেশমত স্বদেশী বস্ত্র প্রস্তুতকল্পে একটি ভাণ্ডার-স্থাপনের জন্য সভাস্থলে অর্থ যাচ্ঞা করা হয়। জনগণ মুদ্রাবৃষ্টি করতে থাকেন ও অল্পকাল মধ্যে পঞ্চাশ হাজার টাকা উঠে। এব পরে আরও কুড়ি হাজার টাকা আদায় হয়েছিল। এ অর্থ থেকে ২০৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে বস্ত্র-বয়ন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হ'ল, কয়েক শ' চরকাও কেনা হ'ল। এ বিদ্যালয় কিন্তু বেশী দিন স্থায়ী হয় নি। উক্ত টাকাব একটি মোটা অংশ ব্যয়েব পর বিদ্যালয় তুলে দেওয়া হয়। ভারতসভার কর্ত্তৃত্বাধীনে অবশিষ্ট টাকা থেকে বিভিন্ন বয়ন-বিদ্যালয়ে এখনও অর্থ সাহায্য করা হয়।

প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হ'লেও স্বদেশী আন্দোলন বঙ্গে ব্যবসায় ও শিল্পে এক নবযুগের সূচনা করলে। বঙ্গলক্ষ্মী কাপড়ের কল, বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক, ন্যাশন্যাল সোপ ফ্যাক্টরী, ষ্টীল ট্রাঙ্ক ফ্যাক্টরী, ট্যানারী ফ্যাক্টরী, হিন্দুস্থান ও ন্যাশন্যাল বীমা কোম্পানী প্রভৃতি বহু শিল্পব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্বদেশী আন্দোলনের ফলেই উদ্ভুত। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল কেমিক্যাল নামক ঔষধপ্রস্তুতির কারখানা স্বদেশী যুগে বাঙালীকে 'স্বদেশী' করতে কম সাহায্য করে নি।

স্বদেশীর ভাববন্যায় শহর পল্লী কখন যে প্লাবিত হ'য়ে গেল কেউ তা টেরও পেলে না। বাঙালীর এই আশ্চর্য্য প্রতিজ্ঞা আত্মবিশ্বাসের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য মনস্বীরা নিজেদের ভিতরেই শক্তির সন্ধান করতে লাগলেন। সাধারণের নিকট এই নব ভাব প্রচারের পক্ষে সংবাদপত্রই উৎকৃষ্ট বাহন। ইংরাজী অমৃতবাজার পত্রিকা ও বেঙ্গলী আর বাংলা সঞ্জীবনী ও হিতবাদী এ

বিষয়ে আত্মনিয়োগ করেন বটে, কিন্তু আরও কয়েকটি প্রধান পত্রিকা নব ভাবের বাহন হ'য়ে পর পর প্রকাশিত হ'ল। মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা 'নবশক্তি'তে ও উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব 'সন্ধ্যা'য় নব ভাব প্রচার করতে শুরু করেন। ব্রহ্মবান্ধব সর্ব্ব প্রথম ব্রাহ্ম ছিলেন, পরে খ্রীষ্টান হন, কিন্তু ক্রমে হিন্দুধর্ম্মের দিকেই তাঁর মন অধিকতর আকৃষ্ট হয়। তাঁর জাতীয়তার ভিত্তিও ছিল এই হিন্দুত্ব। তিনি ইংরেজী দর্শন ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের তিনি একজন প্রধান উদ্যোক্তা। ইতিপূর্ব্বে তিনি 'সোফিয়া' নামে ইংরেজী পত্রিকা সম্পাদন করেছেন। স্বদেশী আন্দোলনের আরম্ভেই তাঁর সমস্ত শক্তি ও প্রতিভা 'সন্ধ্যা'-সম্পাদনে নিয়োজিত করলেন। তাঁর শিক্ষায় বাঙালী আত্মস্থ হ'ল। ব্রহ্মবান্ধব বাংলাদেশে আত্মশক্তি উন্মেষের নায়ক। ভারতবর্ষের উন্নতি ভারতবাসীরই সাধ্য—এই কথা তিনি অতি সহজ ভাষায় সন্ধ্যার ভিতর দিয়ে সর্ব্বসাধারণকে বুঝিয়ে দিলেন। রাজনীতিক্ষেত্রেও যে ভিক্ষাবৃত্তি নিষ্ফল এই কথাও তিনি সকলকে শোনান। ব্রহ্মবান্ধব বঙ্গের চরমপন্থী দলের অন্যতম স্রষ্টা। তিনি ইংরেজের শাসন স্বীকার করতেন না। ব্রহ্মবান্ধব রাজদ্রোহের দায়ে ১৯০৭ সালে সরকার কর্ত্তৃক ধৃত হলেন। আদালতে তাঁর বিচার আবম্ভ হ'লে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনে অস্বীকৃত হন। এদিক দিয়ে তিনিই ভারতবর্ষে সর্ব্ব প্রথম অসহযোগী। উপাধ্যায় বলেছিলেন, তাঁকে কারাবদ্ধ কবা ব্রিটিশের সাধ্যাতীত। বস্তুতঃ তিনি হাজতবাস কালেই মারা যান।

স্বদেশী আন্দোলনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল বঙ্গের দিকে দিকে এর স্বাভাবিক অতি-বিস্তৃতি। বঙ্গের এমন জেলা নেই, এমন জনপদ নেই যেখানে স্বদেশীর ভাবে লোক অনুপ্রাণিত হয় নি। রাজসাহী, রংপুর, সিরাজগঞ্জ, ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম সকল অঞ্চল স্বদেশী ভাবে প্লাবিত ও পরিশোধিত হ'ল। ছাত্র ও যুবকসমাজ মেতে উঠল সকলের চেয়ে বেশী। একান্ত ক'রে তাদের চেষ্টাতেই সর্ব্বত্র বিলাতী বর্জ্জন সার্থক হ'য়ে উঠল। শাসকবর্গের সজাগ দৃষ্টি এদিকে পড়তে মোটেই বিলম্ব হ'ল না। তাঁরা নানা স্থানে, বিশেষ ক'রে রংপুর, ঢাকা ও মাদারিপুরে ছাত্রদলন আরম্ভ করলেন। স্বদেশী আন্দোলন থেকে ছাত্রসমাজকে সরিয়ে রাখবার জন্য

ভারত-সরকার রিজ্‌লি সার্কুলার, বাংলা সরকার কার্লাইল সার্কুলার ও পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম সরকার লায়ন সার্কুলার প্রচার করেন। এতেও যখন বিশেষ ফল হ'ল না তখন ছাত্রদলন শুরু হ'ল। রংপুর ও ঢাকার বহু ছাত্রকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হ'ল, কাউকে কাউকে বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত করা হ'ল। এদিকে কল্‌কাতায় এত সব সার্কুলারের ছড়াছড়ি দেখে যুবকসমাজ এন্টি-সার্কুলার সোসাইটি গঠন করলেন। এর সভাপতি হলেন প্রবীণ কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় ও সম্পাদক নবীন শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু। এ সোসাইটির সভ্য ছাত্রগণ বিলাতী বর্জন আন্দোলন প্রবলভাবে চালাতে লাগলেন। এঁরাই প্রথমে বড়বাজারে বিলাতী বস্ত্রের দোকানে 'পিকেটিং' বা ধর্ণা দিতে আরম্ভ করেন। যাহোক, মফস্বলের ও কল্‌কাতার নির্য্যাতিত ও বহিষ্কৃত ছাত্রদের শিক্ষাব্যবস্থার জন্য শীঘ্রই জাতীয় বিদ্যালয়-স্থাপনের চেষ্টা শুরু হ'ল। ১৯০৫, ৯ই নবেম্বর তারিখে পান্তির পাঠে (অধুনা এখানে বিদ্যাসাগর কলেজ হোষ্টেল অবস্থিত) অনুষ্ঠিত এক সভায় ভগিনী নিবেদিতা বাঙ্গালী জাতিকে একটি ন্যাশনাল ইউনিভারসিটি স্থাপনের অনুরোধ জানিয়ে প্রথমে একটি বক্তৃতা করেছিলেন। এখানে এই উদ্দেশ্যে আরও সভা হ'ল। এখানকার একটি সভায় সুবোধচন্দ্র বসু মল্লিক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়-স্থাপনের জন্য এক লক্ষ টাকা দিতে অঙ্গীকার করেন। তাঁর এই মহৎ দানের জন্য মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা তাঁকে 'রাজা' উপাধি দিলেন। ময়মনসিংহ-গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও মুক্তাগাছার জমিদার মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী যথাক্রমে পাঁচ লক্ষ ও আড়াই লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তি এই উদ্দেশ্যে দান করেছিলেন।

বরিশালে স্বদেশী আন্দোলন এত প্রবল ও তীব্র হ'য়ে উঠে যে সরকার একে একটি 'প্রোক্লেম্‌ড্‌ ডিষ্ট্রীক্ট' বা 'আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গকারী' অঞ্চল ব'লে ঘোষণা করলেন। বস্তুতঃ বরিশালবাসীর একনিষ্ঠ কর্ম্মতৎপরতায় স্বদেশী আন্দোলন বিশেষ সাফল্য লাভ করে। বরিশালের নেতা অশ্বিনীকুমার দত্তের কথা আগে আমরা বহুবার পেয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শিক্ষা সমাপ্ত ক'রে ১৮৮০ সাল থেকে নিজ জেলা বরিশালকেই তিনি কর্ম্মকেন্দ্র করেছিলেন। ১৮৮৪ সালে 'ভারতগীতি' রচনা ক'রে দেশবাসীর মনে স্বদেশপ্রীতি ও স্বাবলম্বন-শক্তি জাগ্রত করতে চেষ্টা করেন। বরিশালে ব্রজমোহন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা

তিনিই। এখানে অধ্যাপনার ভিতর দিয়ে ছাত্রসমাজে তিনি ঐ মন্ত্রই বিশেষ ক'রে প্রচার করেন। কাজেই প্রথম আহ্বানেই একদল নিষ্ঠাবান্, ত্যাগী, সাহসী কর্ম্মী এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন। ব্রজমোহন কলেজ ও স্কুলের শিক্ষকবৃন্দও তাঁর কার্য্যে আন্তরিকভাবে সাহায্য করলেন। এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, ছাত্র ও ছাত্রদের অভিভাবকদের মনে স্বদেশী কিরূপ দৃঢ়নিবদ্ধ হয়েছিল একটি মাত্র দৃষ্টান্তেই তা সম্যক্ উপলব্ধি হবে। বাখরগঞ্জ জেলার মত ব্রজ-মোহন কলেজ ও স্কুল সরকার কর্ত্তৃক 'চিহ্নিত' হয়েছিল। শ্রীযুত দেবপ্রসাদ ঘোষ ব্রজমোহন স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ও কলেজ থেকে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন। কিন্তু উভয় বারেই তিনি সরকারী বৃত্তি থেকে বঞ্চিত হন। অশ্বিনীকুমারের প্রেরণায় স্বদেশ বান্ধব সমিতি নিয়মিতভাবে স্বদেশী প্রচারে প্রবৃত্ত হলেন। মুকুন্দ দাস স্বদেশী গানে বরিশালবাসীকে মাতিয়ে তুললেন। অশ্বিনীকুমারের অন্যতম সহযোগী মনোমোহন চক্রবর্ত্তী এই গানটি রচনা ক'রে এই সময় গাইলেন,

"ছেড়ে দাও কাচের চুড়ী, বঙ্গনারী,
কভু হাতে আর প'রো না।
জাগ গো ভগিনী! ও জননী!
মোহের ঘোরে আর থেকো না।
কাচের মায়াতে ভুলে, শঙ্খ ফেলে,
কলঙ্ক হাতে মেখো না;
তোমরা যে গৃহলক্ষ্মী ধর্ম্ম সাক্ষী,
জগৎ ভরে আছে জানা।
চটকদার কাচের বালা ফুকের মালা,
তোমাদের অঙ্গে সাজে না!
নাই বা থাক্ মনের মতন স্বর্ণভূষণ,
তাতে ত দুঃখ দেখি না।
সিঁথিতে সিন্দুর ধরি, বঙ্গনারী,
জগতে সতী-শোভনা!

বলিতে লজ্জা করে—প্রাণ বিদরে
বার লাখের কম হবে না—
পুঁতির কাচ ঝুঠা মুক্তায় এই বাঙ্গালায়
দেয় বিদেশে, কেউ জানে না।
ঐ শোন বঙ্গমাতা শুধান কথা—
"উঠ আমার যত কন্যা!
তোরা সব করিলে পণ মায়ের এ ধন
বিদেশে উড়ে যাবে না।
আমি যে অভাগিনী—কাঙ্গালিনী,
দুই বেলা অন্ন জুটে না;
কি ছিলাম, কি হইলাম, কোথায় এলাম –
মা যে তোরা ভাবিলি না!"

কবির আহ্বানে নারীসমাজ আশ্চর্য্য সাড়া দিলেন। অশ্বিনীকুমার প্রমুখ পাঁচ জন নেতা বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জনের জন্য এক অনুরোধপত্র প্রচার করলেন। বরিশালের কোথাও এক কাঁচ্চা মূল্যেরও বিদেশী দ্রব্য বিকোল না। পূর্ব্ববঙ্গ সরকার বরিশালবাসীর এই প্রতিরোধশক্তি ভেঙে দেবার উদ্যোগ-আয়োজন করলেন। বরিশাল শহরে, বানরিপাড়া কেন্দ্রে ও অন্যান্য স্থানে গুর্খা সৈন্য মোতায়েন করা হ'ল। বানরিপাড়ায় নারীর উপর গুর্খা সৈন্যের গর্হিত আচরণে একদল যুবক কিরূপে ছোটলাট ব্যাম্‌ফিল্ড ফুলারের প্রাণনাশে উদ্যত হয় ও সুরেন্দ্রনাথ কিরূপে তাদের নিরস্ত করেন—সুরেন্দ্রনাথের জীবনীগ্রন্থে তা পরিষ্কার বর্ণিত আছে। বিলাতী দ্রব্যের আমদানী ক'রে ম্যাজিস্ট্রেট ফুলার সাহেব বরিশালে এক বাজার খুললেন, কিন্তু ক্রেতা নেই। একমাত্র দোকানী 'হৃদয়' ফুলারকে বিদ্রূপ ক'রে গান গাইল, "এ বাজারে আমি একা দোকানদার ভাই।" সরকার প্রমাদ গণলেন। ছোটলাট ফুলার বরিশালে গেলেন এবং অশ্বিনীকুমার ও অন্যান্য জননেতাদের নিজ নিজ লঞ্চে ডেকে নিয়ে অপমানিত করলেন। এর ফলে বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জন দ্বিগুণতর উৎসাহে চলতে থাকে। অনাচার অত্যাচারকে অগ্রাহ্য করার অদ্ভুত শক্তি ও সাহস সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীর প্রাণের কথা গানে ব্যক্ত করলেন,

আমি ভয় করব না, ভয় করব না।
দু'বেলা মরার আগে
মরব না ভাই মরব না।
তরিখানা বাইতে গেলে,
মাঝে মাঝে তুফান মেলে,
তাই ব'লে, হাল ছেড়ে দিয়ে
কান্নাকাটি ধরব না।
শক্ত যা তাই সাধতে হবে,
মাথা তুলে রইব ভবে ;
সহজ পথে চলব ভেবে,
পাঁকের 'পরে পড়ব না।
ধর্ম্ম আমার মাথায় রেখে,
চলব সিধে রাস্তা দেখে,
বিপদ্ যদি এসে পড়ে
ঘরের কোণে সরব না।

স্বদেশী আন্দোলন ও কংগ্রেস

(১৯০৫-১৯০৬)

এই সময় বারাণসী-ধামে কংগ্রেসের একবিংশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হ'ল। এর সভাপতিত্ব করলেন পুণ্যশ্লোক গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে। গোখ্‌লে মহোদয় লর্ড কার্জ্জনের স্বৈর-শাসন সবিস্তারে ব্যাখ্যা ক'রে বললেন যে, ভারতবাসীর মঙ্গলের জন্যই, ভারতবাসীর স্বার্থ রক্ষার জন্যই ভারতবর্ষ শাসন করতে হবে। বঙ্গভঙ্গ অন্দোলনে আপামর জনসাধারণের মধ্যে যে বিক্ষোভ উপস্থিত হয়েছে তা মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু সরকার তা-ই উপেক্ষা করছেন। আমাদের অবস্থা যদি বর্ত্তমানে এতই হীন হ'য়ে থাকে, আমরা যদি বর্ত্তমান শাসনে নিজেদের এতই অসহায় বোধ করি, তা হ'লে বলা আবশ্যক যে, জনস্বার্থের খাতিরে ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের সঙ্গে কোনরূপ সহযোগিতা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। গোখ্‌লে এই প্রসঙ্গে আরও বলেন, "বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের ফলে বঙ্গদেশের এই বিপুল জনজাগরণ আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করবে। ব্রিটিশ রাজত্বে এই প্রথম জাতি ও ধর্ম্মের বৈষম্য ভুলে বাঙালী জাতি বাইরের কোন সাহায্যের অপেক্ষা না রেখে স্বাভাবিক প্রেরণার বশে অন্যায়ের প্রতিরোধে অগ্রসর হয়েছে। প্রধান লক্ষণীয় বিষয় এই যে, জনসেবার আদর্শ উচ্চ হইতে উচ্চতর পথে নীত হয়েছে, আর সমগ্র ভারতবর্ষ এই আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলা দেশের নিকটই ঋণী।" গোখ্‌লে স্বদেশীর পূর্ণ সমর্থন করলেন, কিন্তু 'বয়কট' সম্বন্ধে বললেন যে, এ কথাটির সঙ্গে দ্বেষ ও হিংসার ভাব বিজড়িত থাকায় পারত পক্ষে এ কারও বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা উচিত নয়। তবে বাংলার অবস্থা বিবেচনা করলে বল্‌তে হয়, সেখানে এমন চরম অবস্থা উপস্থিত হয়েছে যখন 'বয়কট' অস্ত্র প্রয়োগ করা ছাড়া উপায়ান্তর নেই। স্বদেশী যুগের বহু পূর্ব্বেও বাঙালী মনীষীরা স্বদেশজাত শিল্পদ্রব্যের উন্নতির জন্য বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। বঙ্গভঙ্গ

আন্দোলনে এই অনুভূতি কর্ম্মস্তরে গিয়ে পৌঁছায়। গোখ্‌লে মহাশয় স্বদেশী শিল্প, বিশেষ বস্ত্র শিল্পের প্রসার কিরূপে সম্ভব সে সম্বন্ধেও অভিভাষণে বিশদ-ভাবে আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, ভারতীয় শিল্পের উন্নতি করতে হ'লে ভারতবাসীকেই মূলধন জোগাতে হবে, বিদেশীমূলধন বিদেশজাত দ্রব্যের মতই দেশকে সমানে শ্রীহীন ক'রে তোলে।

পূর্ব্ব বারের মত এ অধিবেশনেও শাসন সংস্কার ও শাসন অধিকারমূলক নানা দাবি গৃহীত হয়। এবারকার সর্ব্বপ্রধান আলোচ্য বিষয় হ'ল স্বভাবতঃই বঙ্গভঙ্গ ও বঙ্গের বয়কট আন্দোলন। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যে প্রস্তাব করা হয় তাতে কোনই আপত্তি হ'ল না। সুরেন্দ্রনাথ এ প্রস্তাব উত্থাপন ক'রে তাঁর স্বাভাবিক ওজস্বিনী ভাষায় বঙ্গের উপব সরকারের দমন-নীতির বহন সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। সভা, শোভাযাত্রা, সঙ্কীর্ত্তনের মিছিলের উপর নিষেধাজ্ঞা, 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতের জন্য শাস্তিবিধান, বালকদের দণ্ডদান ও কারাগারে প্রেরণ, পিটুনি পুলিশ ও গুর্খাবাহিনী স্থাপন—সরকারী দমন-নীতির এই বিশেষ অঙ্গগুলি তিনি উল্লেখ করতে ভোলেন নি। 'বয়কট' প্রস্তাব নিয়ে কিছু গণ্ডগোলের সৃষ্টি হ'ল। বস্তুত বয়কট সম্পর্কে সাক্ষাৎভাবে কোন প্রস্তাবই গৃহীত হ'ল না। বয়কট আন্দোলনের ফলে বাংলা দেশে যে দমন-নীতি অনুসৃত হয় তার প্রতিবাদে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় একটি প্রস্তাব উত্থাপন ক'রে বলেন যে, 'বয়কট'ই সম্ভবতঃ একমাত্র আইনসঙ্গত ও কার্য্যকর উপায় যা দ্বারা বঙ্গবাসীর পক্ষে বঙ্গভঙ্গের দিকে ব্রিটিশ জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করা সম্ভব। পঞ্জাব-কেশরী লালা লজপত রায় এই প্রস্তাবের সমর্থনে বাংলার স্বদেশী আন্দোলনকে পূর্ণভাবে সমর্থন করেন ও বাংলার রাজনীতির এই নব পদ্ধতির প্রশংসা ক'রে বাঙালীকে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, "আমি স্বদেশী আন্দোলনকে অতি মহৎ জিনিস ব'লে গ্রহণ করেছি। আমি একে আমাদের দেশের দুঃখদৈন্য মোচনের একমাত্র উপায় ব'লে মনে করি। আমি বিশ্বাস করি, এ-ই আমাদের দেশের মুক্তির পথ। এই 'স্বদেশী'ব্রত আমাদের ত্যাগী, আত্মবিশ্বাসী, আত্মসম্মান-পরায়ণ এবং সর্ব্বোপরি মানুষ ক'রে তুলবে। আমার মতে, এই স্বদেশীই সমগ্র ভারতের সর্ব্বজনগ্রাহ্য ধর্ম্ম হওয়া উচিত।"

পঞ্চম জর্জ্জ প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স রূপে এ সময় ভারতবর্ষে আগমন করেন।

তাঁকে অভ্যর্থনা করতে চরমপন্থীরা প্রথমে আপত্তি করলেও শেষ পর্য্যন্ত এতে পরোক্ষ সম্মতি দেন। ব্যবস্থাপরিষদগুলিকে অধিকতর প্রতিনিধিমূলক করা, আবগারী-নীতি, উচ্চপদে ভারতীয় নিয়োগ, রাজস্ব, সৈন্যব্যয়, অস্ত্র আইন, প্রবাসী ভারতীয়, পুলিশ, শিক্ষা, ভারতের দারিদ্র্য প্রভৃতি নানা বিষয়ে কংগ্রেস প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। ভারতের দাবিসমূহ বিলাতে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পেশ করার জন্য বিজয়রাঘব আচার্য্য সভাপতি গোখ্‌লেকে বিলাতে প্রেরণের প্রস্তাব করেন। ভগিনী নিবেদিতা এই প্রস্তাব সমর্থন ক'রে বলেন যে, শতাব্দী পূর্ব্বে নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য-নীতির প্রতিবাদেই ইউরোপে বিভিন্ন স্বাধীন জাতির উদ্ভব হয়েছে। এখন আবার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য অধীন দেশগুলিকে স্বাধীন ব'লে স্বীকার না করলে অতি দ্রুতই জাতীয়তাবাদের প্রসার লাভ ঘটবে।

১৯০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে বিলাতে সাধারণ নির্ব্বাচন হয় ও উদারনৈতিক দল জয়লাভ ক'রে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এর একমাস পূর্ব্বে লর্ড মিণ্টো ভারতের বড়লাট হ'য়ে আসেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে স্বায়ত্তশাসনসম্পন্ন কানাডায় রাজপ্রতিনিধি রূপে কার্য্য করেছেন। কাজেই রক্ষণশীল মন্ত্রিসভা কর্ত্তৃক নিযুক্ত হ'লেও তিনি ভারতের শাসন ব্যাপারে উদার-নীতি পোষণ করবেন—সকলে এরূপ অনুমান করেছিলেন। ওদিকে উদারনৈতিক মন্ত্রিসভায় ভারতসচিব হলেন মিঃ (পরে লর্ড) জন মর্লি। তিনি কব্‌ডেন-ব্রাইটের শিষ্য ও গ্লাডষ্টোনের সহকর্ম্মী। সুতরাং তাঁর ভারতসচিবের পদ গ্রহণে কংগ্রেস-নেতৃবর্গ, বিশেষ ক'রে প্রাচীনগণ অনেকটা আশ্বস্ত হলেন। কিন্তু বাঙালীকে অবিলম্বে নিরাশ হ'তে হ'ল। মর্লি পার্লামেণ্টে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের নিন্দা করলেও একে একটি 'সেটেল্‌ড্‌ ফ্যাক্ট্‌' বা স্থায়ী ব্যাপার ব'লে উল্লেখ করলেন! এর পরে বঙ্গদেশে স্বদেশী আন্দোলন আরও তীব্র হ'য়ে উঠে। বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জনে বঙ্গবাসী অধিকতর দৃঢ়তা প্রকাশ করে। শহরে পল্লীতে বিলাতী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব হ'তে থাকে। বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে শাসনকর্ত্তাদের মূর্ত্তিও উগ্র হ'য়ে উঠল, ধরপাকড় ও দণ্ডদান স্বাভাবিক নিয়ম হ'য়ে দাঁড়াল।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন বাংলার একটি বৈশিষ্ট্য। ১৮৮৮ সালে এ শুরু হয় বটে, কিন্তু ১৮৯৫ সাল থেকেই প্রতি বছর এর অধিবেশন হ'তে থাকে।

মফঃস্বল শহরে এক একবার এক এক স্থলে এই সম্মেলন হ'ত। মফঃস্বলে প্রথম প্রাদেশিক সম্মেলন হ'ল বহরমপুরে বৈকুণ্ঠনাথ সেনের আগ্রহাতিশয্যে। কৃষ্ণনগর, চুচুঁড়া, চট্টগ্রাম, নাটোর, বর্দ্ধমান প্রভৃতি নানাস্থানে এর অধিবেশন হয় ও আনন্দমোহন বসু, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, আশুতোষ চৌধুরী, ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ মনীষীরা বিভিন্ন সময়ে সভাপতিত্ব করেন। ১৯০৬ সালের ১৪ই ও ১৫ই এপ্রিল অধিবেশন হবার কথা হয় স্বদেশীর পীঠস্থান বরিশাল শহরে। স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম নেতা ব্যারিষ্টার আবদুল রসুল সভাপতিত্ব করবেন স্থির হয়। বরিশালের নেতা অশ্বিনীকুমার দত্ত, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ সেন, শরৎকুমার রায় প্রমুখ সহকর্মীদের সঙ্গে বাখরগঞ্জ জেলার নানাস্থানে ভ্রমণ করেন ও স্বদেশীপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য জনগণকে উদ্‌বুদ্ধ করতে থাকেন। এ সময়ে বরিশালে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ হয়। কিন্তু অর্থাভাব ও অন্নকষ্ট সত্ত্বেও অধিবাসীরা স্বদেশী নেতাদের আহ্বানে আশ্চর্য্য সাড়া দিলে ও যথাসাধ্য অর্থসাহায্য করলে।

ইতিপূর্ব্বেই পূর্ব্ববঙ্গে প্রকাশ্য রাস্তায় 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করা বে-আইনী ঘোষিত হয়েছিল। 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি ক'রে বহু যুবক বেত্রদণ্ডে ও অন্যবিধ দণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। বরিশালেও 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করা বে-আইনী। অভ্যর্থনা-সমিতি জেলার শাসকবর্গের নিকট এই শর্ত্তে আবদ্ধ হলেন যে, প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনাকালে তাঁরা ষ্টেশনে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করবেন না। সম্মেলনের পূর্ব্বদিন সন্ধ্যায় কলকাতা, ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চল থেকে বহু প্রতিনিধি ষ্টীমারযোগে বরিশাল পৌঁছেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, টাকীর জমীদার রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৃষ্ণকুমার মিত্র ও এন্টি-সার্কুলার সোসাইটির সভ্যগণ, বিপিনচন্দ্র পাল, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, আনন্দচন্দ্র রায়, অনাথবন্ধু গুহ, যাত্রামোহন সেন প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ সম্মেলনে যোগদানের জন্য ১৩ই এপ্রিল বরিশালে উপস্থিত হলেন। অভ্যর্থনা-সমিতি শাসনকর্ত্তাদের যে শর্ত্ত দিয়েছিলেন তা যথারীতি প্রতিপালিত হ'ল—ষ্টেশনে কেউই 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করলেন না। কৃষ্ণকুমার মিত্রের নেতৃত্বে এন্টিসার্কুলার সোসাইটির সভ্যগণ এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট হ'তে না পেরে

অভ্যর্থনা-সমিতির আতিথ্য স্বীকার করেন নি। ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষ স্বদেশীর অন্যতম উদ্যোক্তা রজনীকান্ত গুহের ভবনে তাঁরা গেলেন। অবশেষে স্থির হ'ল, সম্মেলনের প্রথম দিন রাজাবাহাদুরের হাবেলীতে প্রতিনিধিগণ সমবেত হ'য়ে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করবেন ও শোভাযাত্রা ক'রে সভামণ্ডপে গমন করবেন।

নির্দ্দিষ্ট স্থানে যথাসময়ে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করবার পর শোভাযাত্রা বার হ'ল। প্রথম গাড়ীতে চললেন সভাপতি আবদুল রসুল ও তাঁর পত্নী (ইউরোপীয় মহিলা), পেছনেই পদব্রজে চললেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল ঘোষ ও ভূপেন্দ্রনাথ বসু। এইরূপে পর পর সারিবদ্ধ ভাবে শোভাযাত্রা অগ্রসর হ'তে লাগল। পশ্চাতে রইলেন 'বন্দেমাতরম্' ব্যাজ পরিহিত এন্টিসাকুলার সোসাইটির সভ্যগণ। সর্ব্বপশ্চাতে ছিলেন সোসাইটির সভাপতি কৃষ্ণকুমার মিত্র, রজনীকান্ত গুহ ও গীষ্পতি কাব্যতীর্থ। আশে-পাশে ঢের পুলিশ মোতায়েন ছিল। 'বন্দেমাতরম্' ব্যাজ পরিহিত সভ্যগণ যেমনি হাবেলী থেকে রাস্তায় বের হলেন (তখন তাঁরা 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করেন নি), অমনি পুলিশ তাঁদের উপর দীর্ঘ যষ্টি দ্বারা প্রহার শুরু করলে। বহু জন আহত হলেন, কিন্তু ফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেচারাম লাহিড়ী, ব্রজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও চিত্তরঞ্জন গুহঠাকুরতার আঘাতই হ'ল গুরুতর। চিত্তরঞ্জন লাঠির ঘায়ে পার্শ্ববর্ত্তী পুষ্করিণীতে ছিটকে পড়লেন। জলের মধ্যেও তাঁর উপর চার্জ্জ করা হয়। লাঠির আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই সভ্যগণ 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি উচ্চারণ করতে থাকেন। চিত্তরঞ্জন তখনও পর্য্যন্ত 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি উচ্চারণ করছিলেন। অপর একজন পুলিশ এসে তাঁকে না তুললে তাঁর হয়ত জীবন্তে সমাধি হ'ত।

শোভাযাত্রার প্রথম অংশ কিছু দূরে চলে গিয়েছিল। নেতৃবৃন্দ এ-সংবাদ পেয়ে ছুটে এলেন। পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ কেম্প একমাত্র সুরেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করলেন। সুরেন্দ্রনাথকে ম্যাজিষ্ট্রেট এমার্সনের ভবনে নিয়ে যাওয়া হ'ল। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি অশ্বিনীকুমার দত্ত, বিহারীলাল রায় ও কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ তাঁর সঙ্গে গেলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সরাসরি বিচারে ১৮৮ ধারা মতে বে-আইনী শোভাযাত্রা পরিচালনার দায়ে সুরেন্দ্রনাথকে দু'শ টাকা জরিমানা করেন। সুরেন্দ্রনাথ একখানা চেয়ারে বসতে উদ্যত হওয়ায় আদালত

অবমাননার জন্য তাঁর আরও দু'শ টাকা জরিমানা হ'ল। জরিমানার টাকা দিয়ে সুরেন্দ্রনাথ অশ্বিনীকুমার প্রভৃতির সঙ্গে সভাক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন।

গ্রেপ্তারের সময় সুরেন্দ্রনাথ ভূপেন্দ্রনাথ বসুকে সম্মেলনের কার্য্য চালাতে বলেছিলেন। সম্মেলনের কার্য্য শুরু হ'য়ে গিয়েছিল। মনোরঞ্জন গুহ-ঠাকুরতা একদিকে পুত্র চিত্তরঞ্জন ও অন্যদিকে ব্রজেন্দ্রনাথকে নিয়ে একটি টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে পুলিশের নির্ম্মম অত্যাচারের কাহিনী বিশদ রূপে বর্ণনা করলেন। ভূপেন্দ্রনাথ বসুর মত ধীরপন্থী লোকও অত্যন্ত বিচলিত হ'য়ে বললেন,"আজ ইংরেজ রাজত্বের অবসান হ'ল।" অশ্বিনীকুমারের অনুপস্থিতিতেই তাঁর অভিভাষণ পঠিত হয়। অশ্বিনীকুমার অভিভাষণে বাঙালীকে আত্মশক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে অনুরোধ করেন। জাতীয় শিক্ষা প্রবর্ত্তন, সালিশী আদালত গঠন, স্বদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠা এই তিনটি গঠনমূলক কার্য্যের উপর তিনি বিশেষ জোর দেন। অশ্বিনীকুমার বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ সম্পর্কে বলেন,

"ভারতসচিব বলিয়াছেন বঙ্গবিভাগ আন্দোলন হ্রাস পাইয়াছে" এ 'কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা'। আমি মিঃ জন মর্লিকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি কি মনে করেন এইরূপ একটা ব্যাপারের কারণ বিদূরিত না হইলে সভ্য জগতের কুত্রাপি আন্দোলন হ্রাস হইতে পারে? এরূপ ব্যাপারে ইংলণ্ড, স্কট্‌লণ্ড বা আয়ার্লণ্ড কোন স্থানেই আন্দোলন হ্রাস হইত বলিয়া তিনি কি বিশ্বাস করিতে পারেন? আত্মম্ভরী ও অত্যাচারী এক দল ব্যক্তি কোন এক বৃহৎ জাতির প্রাণে বেদনা দিয়া, তাহাদের সামাজিক, নৈতিক, শিক্ষাবিষয়ক এবং শিল্প-বাণিজ্য সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার স্বার্থে প্রচণ্ড আঘাত করিয়া অবশেষে নির্লজ্জের ন্যায় জাতীয় প্রতিবাদকে অল্পসংখ্যক আন্দোলনকারীর তথাকথিত প্রতিবাদ বলিয়া উপেক্ষা করিতেছেন। বঙ্গবাসীর ধৈর্য্য অপরিসীম, তথাপি বাঙালীর এই বোধ আছে যে, তাহাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের বীজ নিহিত রহিয়াছে। যে-দিন লর্ড কার্জ্জনের তরবারি বঙ্গ-জননীর হৃদয় দ্বিধা-বিভক্ত করিয়াছে সেই চিরস্মরণীয় ১৬ই অক্টোবর (১৯০৫) বঙ্গবাসী কি ভগবানের নামে শপথ করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করে নাই যে, বঙ্গবিভাগের কুফল নাশ ও বাঙ্গালী জাতির একতা রক্ষা করিতে বঙ্গবাসী যথাশক্তি চেষ্টা করিবে? জাতীয় শক্তির বলে এই প্রতিজ্ঞা বৎসরের পর বৎসর দৃঢ়তর হইবে।"

অশ্বিনীকুমার দমন-নীতি সম্পর্কে বলেন,

"বঙ্গবিভাগ হেতু যে অসন্তোষ ও অসহিষ্ণুতার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে তাহা কি হ্রাস হইবার কোন চিহ্ন দেখা যাইতেছে? সার্ ব্যাম্‌ফিল্ড ফুলার কঠোর অত্যাচারমূলক শাসন-নীতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন; তাহাতে অত্যাচারিত ব্যক্তি ক্রমে শান্তভাব ধারণ করিবে ইহা কি স্বাভাবিক? শোকাতুর ব্যক্তিকে কঠোর শাসন করিলে তাহার হৃদয়ের বেদনা দূর করা যায় কি? কিন্তু সার্ ব্যাম্‌ফিল্ড ফুলার এই নীতিই অনুসরণ করিয়াছেন। 'কোন জাতিই আইন দ্বারা শাসিত হয় না, পাশবিক শক্তি দ্বারা ত নয়ই'—লাট ফুলার তাঁহার দেশ-বাসী জনৈক প্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞের ব্যাখ্যাত রাজনীতির এই প্রথম সূত্রই বিস্মৃত হইয়াছেন। যখন বঙ্গদেশ গভীর শোকাচ্ছন্ন তখন তিনি গুর্খা সৈন্য ও পিটুনি পুলিশ স্থাপন, স্পেশ্যাল কনষ্টেবল গঠন, প্রকাশ্য স্থানে পবিত্র 'বন্দেমাতরম্' উচ্চারণ নিষেধ, ছাত্রদিগের পক্ষে রাজনৈতিক ব্যাপারে ও সাধারণ সভা-সমিতিতে যোগদান বে-আইনী করিয়া বিস্তর আইন জারি করিয়াছেন। যাহার ধমনীতে এক বিন্দু শোণিত প্রবাহিত হয় সে কি এ অবস্থায় হৃদয়ের ভাব চাপিয়া রাখিতে পারে? আমাদের দুঃখকাহিনী শ্রবণ করিবার জন্য পৃথিবীতে কেহ নাই, ভারতবাসীর স্বার্থ সম্বন্ধে ইংরেজ জাতি সম্পূর্ণ উদাসীন।"

সভাপতি মহাশয় বলেন যে, ধর্ম্মে বিভিন্ন হ'লেও "রাজনৈতিক আন্দোলনে আমরা আমাদের স্বদেশীয় হিন্দু ও খ্রীষ্টানদের সহযাত্রী।" 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক মতিলাল ঘোষ এর পরেই প্রস্তাব করেন,

"অদ্য দিবালোকে সমস্ত শহরের লোকের সম্মুখে, ডিষ্ট্রীক্ট ও এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ডিষ্ট্রীক্ট পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের আদেশে সভাপতি রসুল সাহেবের অভ্যর্থনার জন্য সমবেত প্রতিনিধিগণের উপর পুলিশের লাঠি চালনায় এবং দেশের অন্যতম নেতা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিনা কারণে গ্রেপ্তার করায় প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বরিশাল জেলায় আইনসঙ্গত শাসন লুপ্ত হইয়াছে। অধিকন্তু পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম বিভাগের নানাস্থানে লোক স্বদেশ-সেবার জন্য প্রহৃত ও নানারূপে লাঞ্ছিত হইতেছে। তাহা দেখিয়া এই সমিতি বিশ্বাস করেন যে, এদেশে আর বৈধ শাসন প্রণালী প্রচলিত নাই। যে সকল কার্য্যের জন্য বর্ত্তমান দায়িত্বশূন্য গবর্ণমেণ্ট দায়ী, এই বর্ষের সম্মেলন তৎসমুদয়ের আলোচনা

হইতে বিরত থাকিয়া, যে সমস্ত কার্য্য দেশবাসীর আত্মসাধ্য সে সকল বিষয়েরই আলোচনা করিবে।”

‘সন্ধ্যা’ সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও ‘হাওড়া হিতৈষী’ সম্পাদক গীষ্পতি কাব্যতীর্থের দ্বারা সমর্থিত হ’লে এ প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। নেতৃবর্গ আত্মশক্তির উপর পূর্ণ নির্ভর করতে অতঃপর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ’লেন। সুরেন্দ্রনাথ এই সময় অশ্বিনীকুমারের সঙ্গে মণ্ডপে প্রবেশ করলে তুমুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। এরপর সভার কার্য্য পরদিনের জন্য মুলতবী থাকে।

পর দিবস অধিবেশন আরম্ভ হ’লে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সভাস্থলে আগমন করেন এবং সভাপতিকে বলেন যে, ‘বন্দেমাতরম্’ ধ্বনি করা হবে না, এই শর্ত্তে রাজী না হ’লে তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ ব’লে সভা বন্ধ ক’রে দিবেন। এই হীন শর্ত্তে রাজী না হওয়ায় সম্মেলনের অধিবেশন এখানেই শেষ হ’ল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে,এই বে-আইনী আদেশ অমান্য ক’রে সম্মেলনের কার্য্য চালাবার জন্য কৃষ্ণকুমার মিত্র শেষ পর্য্যন্ত মণ্ডপে উপস্থিত ছিলেন। বরিশালে সম্মেলন অসমাপ্ত রইল বটে, কিন্তু নেতৃবর্গ ও জনসাধারণ স্বদেশী আন্দোলন চালাতে অধিকতর দৃঢ়সঙ্কল্প হ’লেন। বঙ্গের সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ কলকাতায় বরিশালের পুলিশী অনাচারের প্রতিবাদে বহু জনসভা হ’ল। যুবক মনে এর প্রতিক্রিয়াও হ’ল খুব।

এ বছরের পরবর্ত্তী স্মরণীয় ঘটনা—শিবাজী উৎসব। মারাঠা কেশরী বালগঙ্গাধর তিলক এই উৎসবের উদ্গাতা, পূর্ব্বে আমরা এ কথা বলেছি। বাঙালী নেতাদের মধ্যে আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী একদল লোকের উদ্ভব হ’ল। প্রাচীনপন্থীরা আবেদননিবেদন প্রতিবাদের পক্ষপাতী। কিন্তু এই দল ঘোষণা করলেন, ‘ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ’, ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা কোন জাতি স্বাধীনতা লাভ করতে পারে নি, তাঁরাও পারবেন না। আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী দল শিবাজী উৎসবের আয়োজন ক’রে সাধারণের ভিতর এই জাতীয়তা প্রচারের আয়োজন করলেন। স্বদেশী মণ্ডলীর ও বিশেষ ক’রে উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের উদ্যোগে ফিল্ড এণ্ড একাডেমি ক্লাবের নিকট পান্তীর মাঠে শিবাজী উৎসব সুসম্পন্ন হ’ল। উৎসবের অঙ্গস্বরূপ একটি স্বদেশী মেলার আয়োজন হয় ও এর ভার পড়ে

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের উপর। উৎসবের প্রধান হোতা হ'লেন বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়।

বালগঙ্গাধর তিলক বাংলার স্বদেশী আন্দোলন ও নূতন ভাবধারার একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তাই শিবাজী উৎসবে নিমন্ত্রিত হয়েই তিনি গণেশশ্রীকৃষ্ণ খাপার্দ্দে ও ডাক্তার বি এস মুঞ্জেকে সঙ্গে নিয়ে পরবর্ত্তী ৪ঠা জুন সোমবার কলকাতায় আগমন করলেন। কলকাতাবাসীরা তিলককে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত করে। ঐদিন অপরাহ্নে মতিলাল ঘোষ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হ'য়ে তিলক মেলার উদ্বোধন করেন। উৎসবে ভবানী-পূজারও ব্যবস্থা হয়। শিবাজী উৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'শিবাজী' শীর্ষক প্রসিদ্ধ কবিতাটি রচনা করেন। তিলক মহাশয় মেলাকে 'Political festival' বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত উৎসব ব'লে আখ্যা দেন।

পরদিন মূল উৎসবের সভাপতিত্ব করেন অশ্বিনীকুমার দত্ত। এদিন তিলক, খাপার্দ্দে ও মুঞ্জে তিন জনেই হিন্দিতে বক্তৃতা করলেন। উদ্যোক্তাদের আমন্ত্রণে সুরেন্দ্রনাথও একদিন উৎসবের পৌরোহিত্য করেছিলেন। ১০ই জুন রবিবার প্রাতঃকালে ত্রিশ হাজার কলকাতাবাসী তিলককে নিয়ে শোভাযাত্রা ক'রে ভাগীরথী বক্ষে অবগাহন করলে। উৎসবের স্বেচ্ছাসেবকগণকে সুবোধচন্দ্র বসু মল্লিক ১১ই জুন এক ভোজে আপ্যায়িত করেন। সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যুবকদিগকে আশীর্ব্বাদ করলেন। তিলক ও খাপার্দ্দে তাঁদের কর্ত্তব্যনিষ্ঠার প্রশংসা করেন। খাপার্দ্দে বললেন, 'আজ তোমরা স্বেচ্ছাসৈনিক; অদূর ভবিষ্যতে এদেশের যুবকেরা সত্যিকার সৈনিক হ'তে পারবে'।

এই সময়ে প্রতাপাদিত্য, সীতারাম রায় প্রভৃতি মধ্যযুগের বঙ্গবীরগণেরও উৎসব অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। এই সব বীরের জীবনী নিয়ে নূতন নাটকও রচিত হ'তে লাগল। রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী সাহিত্য-সম্রাজ্ঞী, স্বর্ণকুমারীদুহিতা সরলা দেবী শারদীয়া মহাষ্টমীর দিনে বীরাষ্টমী ব্রত উদ্‌যাপন করলেন। সর্ব্বত্র বীর পূজার সাড়া পড়ে গেল। সরলা দেবী যুবকদের মধ্যে শরীর চর্চ্চা, অসি-খেলা প্রভৃতির প্রচলনে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। এ সম্বন্ধে স্বদেশী যুগের পূর্ব্বেই কংগ্রেসেও তিনি প্রস্তাব এনেছিলেন। পরে, পঞ্জাব-হাঙ্গামার সময়েও তিনি স্বামী রামভূজ দত্ত চৌধুরীর পার্শ্বে দাঁড়িয়ে অশেষ কষ্ট ভোগ করতে

কুণ্ঠাবোধ করেন নি। সরলা দেবী নারী-কল্যাণকর বিবিধ আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন। বিগত ১৮ই আগষ্ট ১৯৪৫ দিবসে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেছেন।

এবছরের (১৯০০) তৃতীয় স্মরণীয় ঘটনা 'বন্দেমাতরম্' ও 'যুগান্তর' প্রকাশ। 'সন্ধ্যা' নূতন ভাবধারা সুষ্ঠুরূপেই প্রচার করতেন, কিন্তু সমগ্র ভারতবাসীর নিকট এই ভাবধারা পৌঁছতে হ'লে ইংরেজী পত্রিকা আবশ্যক। এজন্য সুবোধচন্দ্র বসু মল্লিক, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রভৃতির অর্থে ১৯০৬ সালের ৬ই আগষ্ট তারিখে 'বন্দেমাতরম্' প্রকাশিত হ'ল। এ কাগজখানির 'মটো' বা শিরোভূষণ ছিল "India for Indians", 'ভারতবাসীর জন্য ভারতবর্ষ'। পুরাতন পন্থীরা এর ভিতরে নিজেদের আদর্শবিচ্যুতির আভাস পেলেন। কারণ তাঁরা এতদিন ব্রিটিশের সহযোগেই ভারতবর্ষ শাসনের স্বপ্ন দেখে এসেছেন। 'ভারতবাসীর জন্য ভারতবর্ষ' একথা তাঁদের প্রাণে আনন্দের পরিবর্ত্তে উদ্বেগেরই সৃষ্টি করলে। আর ইংরেজ-পরিচালিত আধা-সরকারী কাগজগুলো এর ভিতরে একেবারে কাঁচা 'সিডিশন' বা রাজদ্রোহই দেখতে পেলে। ভারতবাসীরা তো ভারতবর্ষে প্রবাসী, তারা আবার কোন্ সাহসে এর অধিকারী হ'তে চায়! এ পত্রিকাখানির উপর তারা ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠল। 'বন্দেমাতরম্'-এর সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি। অরবিন্দ ঘোষ কিছুকাল পরে সম্পাদকমণ্ডলীতে যোগ দেন।

অরবিন্দ ঘোষের কথা না শুনেছেন এমন লোক ভারতবর্ষে বিরল। অরবিন্দ বিখ্যাত স্বদেশপ্রেমিক রাজনারায়ণ বসুর দৌহিত্র। তিনি বিলাতে আশৈশব শিক্ষালাভ করেন। আই-সি-এস পরীক্ষায় অন্যান্য বিষয়ে কৃতিত্ব দেখালেও তিনি অশ্বারোহণে অপারগ হন। এজন্য অকৃতকার্য্য হ'য়ে স্বদেশে ফিরে এলেন ও বরোদা কলেজে সহকারী অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হলেন। এই পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন তাঁহার হৃদয়ে স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন উদিত হয় এবং অনেকটা তাঁরই অনুপ্রেরণায় বঙ্গে বিপ্লব আন্দোলনের উদ্ভব ঘটে। এ কিন্তু স্বদেশী যুগের কয়েক বৎসর আগের কথা। স্বদেশী আন্দোলনের আরম্ভে অরবিন্দ উক্ত পদ ত্যাগ ক'রে বাংলায় আগমন করেন ও জাতীয়-শিক্ষাপরিষদের অন্যতম আচার্য্য পদে ব্রতী হন। এর অল্পকাল পরেই তিনি 'বন্দেমাতরম্'-এর সঙ্গে যুক্ত হলেন।

এর প্রায় বার বৎসর পূর্ব্বে অরবিন্দ বোম্বাইয়ের 'ইন্দুপ্রকাশ' কাগজে কংগ্রেসের তখনকার কর্ম্মপদ্ধতির অর্থাৎ আবেদননিবেদন নীতির ব্যর্থতার দিকে স্বদেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। 'বন্দেমাতরম্'-এ তিনি 'নিউ স্পিরিট' বা 'নব ভাব' ও 'নিউ পাথ' বা 'নূতন পথ' শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখে বাঙালী তথা ভারতবাসীর সম্মুখে নূতন আদর্শ ও কর্ম্ম-পদ্ধতি উপস্থিত করলেন। বাঙালী কৃতজ্ঞচিত্তে অবিলম্বে তাঁকে নেতার আসনে বসালে।

সাপ্তাহিক 'যুগান্তর'—কি সংবাদপত্র পরিচালনে, কি রাষ্ট্রীয় কর্ম্মপদ্ধতি বিশ্লেষণে বাংলাদেশে যুগান্তর সৃষ্টি করে। এর সম্পাদক ও পরিচালক ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। অরবিন্দ ঘোষ, সখারাম গণেশ দেউস্কর, দেবব্রত বসু (পরলোকগত প্রজ্ঞানন্দ স্বামী), অরবিন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিগণ ছিলেন যুগান্তরের লেখক। যুগান্তর তরুণ দলের মুখপত্র। যুগান্তর-পক্ষীয়দের আদর্শ ছিল পূর্ণ স্বাধীনতা। বাহুবলকে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জ্জনের উপায় ব'লে তাঁরা বিশ্বাস করতেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ভাণ্ডার' নামক একখানি মাসিক পত্রের মধ্য দিয়ে স্বদেশীর নিগূঢ় অর্থ স্বদেশবাসীকে বুঝাইয়া দিতে আরম্ভ করলেন। তাঁরও উদ্দেশ্য ছিল বাঙালী জাতিকে স্বাবলম্বী হ'তে উদ্বুদ্ধ করা।

'ন্যাশনাল কৌন্সিল অফ্ এডুকেশন' বা জাতীয়-শিক্ষাপরিষদের কথাও এখানে উল্লেখযোগ্য। স্বদেশী আন্দোলনে নির্যাতিত ও বিদ্যালয়-বিতাড়িত ছেলেদের জন্য জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন কল্পে সুবোধচন্দ্র বসুমল্লিক, ব্রজেন্দ্র-কিশোর রায়চৌধুরী প্রভৃতির দানের কথা উল্লেখ করেছি। এই উপলক্ষে সার্ তারকনাথ পালিত ও ডক্টর রাসবিহারী ঘোষের নিকট থেকেও প্রচুর অর্থ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা হয়। সুতরাং এ সময় বাঙালী সন্তানদের মধ্যে জাতীয়তার আদর্শে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা বিস্তারের জন্য একটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলল। সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ মনীষীবৃন্দ ছিলেন এ বিষয়ে বিশেষ অগ্রণী। তাঁদেরই চেষ্টা-যত্নে ১৯০৬ সালের ১৪ই আগষ্ট কলকাতার টাউন-হলে ডক্টর রাসবিহারী ঘোষের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায়

জাতীয়-শিক্ষাপরিষদের অন্তর্গত বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ ও স্কুল আনুষ্ঠানিক ভাবে স্থাপিত হয়। সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত জনমণ্ডলীকে জাতীয় শিক্ষার আদর্শ পরিষ্কার ক'রে বুঝিয়ে দেন, সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলেন যে, বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতির দোষত্রুটি-মুক্ত জাতীয় শিক্ষারই তাঁরা ব্যবস্থা করবেন, প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির বিরোধিতা তাঁরা করবেন না। ন্যাশনাল কলেজের অধ্যক্ষ হলেন অরবিন্দ ঘোষ (শ্রীঅরবিন্দ)। আর প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা (সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট) হলেন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইতিপূর্ব্বে 'ডন সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ডন ম্যাগাজিন এই সোসাইটির মুখপত্র। এ দুয়ের দ্বারা স্বাদেশিকতা প্রচার আগেই শুরু হয়। একদল বাঙালী যুবক তাঁর দিকে আকৃষ্ট হ'য়ে এ-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। এই প্রসঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি শিক্ষা, শিল্প প্রভৃতির সুষ্ঠু আলোচনার দ্বারা বাঙালীদের মধ্যে স্বাজাত্যবোধের উন্মেষে বিশেষ সহায়তা করেছিলেন। যুবক সমাজে তাঁর প্রতিপত্তি ছিল অসাধারণ। নূতন ভাবধারা সৃষ্টিতে নিবেদিতার কৃতিত্ব কখনও ভোলবার নয়। জাতীয়-শিক্ষাপরিষদ ব্যতীত সার্ তারকনাথ পালিতের আগ্রহাতিশয়ে আরও একটি জাতীয়-সমিতি স্থাপিত হয়, এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কারিগরি শিক্ষা প্রবর্ত্তন ও স্বাবলম্বন শিক্ষা। এবৎসরই স্থাপিত হয় বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট। এর প্রায় অধিকাংশ ব্যয় বহন করতে থাকেন সার্ তারকনাথ পালিত। এই প্রতিষ্ঠানটির অনারারি প্রিন্সিপাল বা অবৈতনিক অধ্যক্ষ ছিলেন প্রসিদ্ধ ভূ-তত্ত্ববিদ্ প্রমথনাথ বসু। ১৯১০ সালে এই দুইটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান সম্মিলিত হয়।

এখানে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। সার্ ব্যাম্‌ফিল্ড ফুলার ছাত্র সম্প্রদায়ের উপর ছিলেন খুবই চটা। যে-সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রেরা স্বদেশীর পক্ষপাতী সেই সব প্রতিষ্ঠানকে নানাভাবে শাস্তি দানের তিনি ব্যবস্থা করেন। সরকারী বৃত্তিপ্রাপ্ত কোন ছাত্র ঐ সব প্রতিষ্ঠানে ভর্ত্তি হ'তে পারত না। আবার এখান থেকে কোন ছাত্র সরকারী বৃত্তি লাভের উপযুক্ত বিবেচিত হ'লেও বৃত্তি পেত না। সিরাজগঞ্জের ভিক্টোরিয়া স্কুলের ছাত্রেরা স্বদেশী ব্যাপারে অভিযুক্ত হওয়ায় ফুলার গবর্ণমেণ্ট কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে এর মঞ্জুরী বাতিল ক'রে দেবার জন্য অনুরোধ জানালেন। বিশ্ববিদ্যালয় ফুলার

গবর্ণমেণ্টের অনুরোধ রক্ষায় অসমর্থ হ'য়ে চ্যান্সেলার বড়লাট লর্ড মিণ্টোর উপর এ বিষয়টির মীমাংসার ভার দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে ভাইস চ্যান্সেলার সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় শিমলায় গিয়ে বড়লাটকে সব বিষয় বুঝিয়ে দিলেন। এর ফলে লর্ড মিণ্টো অনুরোধ-পত্র প্রত্যাহারের নির্দ্দেশ দিয়ে ফুলার সাহেবকে 'তার' করলেন। ফুলার কিন্তু অনুরোধ রক্ষিত না হ'লে পদত্যাগ করবেন এরূপ জিদ ধরেন। লর্ড মিণ্টো ভারতসচিব মর্লিকে এসব কথা জানালে মর্লি সাহেব অগত্যা তাঁর পদত্যাগের প্রস্তাবই গ্রহণ করেন! মর্লির 'রিকলেক্‌শন্‌স্' বা স্মৃতিকথা দ্বিতীয় খণ্ডে ঐ বিষয়ের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে। উপায়ান্তর না দেখে ফুলার অগত্যা ১৯০৬ সালের ২০শে আগষ্ট ভারতবর্ষ থেকে চিরতরে বিদায় নিতে বাধ্য হলেন।

সার্ ব্যাম্‌ফিল্ড ফুলার প্রকাশ্যে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিভেদ-নীতি প্রচার করতেন। উচ্চতর শাসনকার্য্যও এ সময় এই নীতি দ্বারা খুবই প্রভাবিত হ'ল। ১৯০৬ সালের ১লা অক্টোবর মাননীয় আগা খাঁর নেতৃত্বে একদল মুসলমান প্রতিনিধি শিমলায় লর্ড মিণ্টোর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে তাঁর হস্তে একখানা স্মারকলিপি অর্পণ করেন। তাঁরা তাতে সরকারী শাসনপদ্ধতিতে মুসলমান সমাজের আস্থা জ্ঞাপন করেন। প্রস্তাবিত শাসন-সংস্কারে যে-সব ব্যবস্থা-পরিষদ গঠিত হবে তার প্রত্যেকটিতে মুসলমানদের পৃথক্‌ভাবে সদস্যনির্ব্বাচনের অধিকার ও জনসংখ্যার অনুপাতের চেয়েও অতিরিক্ত সদস্যপদ দানের কথাও স্মারকলিপিতে স্পষ্ট উল্লিখিত হয়। এখানে ব'লে রাখি যে, ১৯০৬ সালের আরম্ভেই ভারতসচিব মর্লি বড়লাটের নিকট শাসন-সংস্কারের প্রস্তাব করেন ও সঙ্গে সঙ্গে এই মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, সংস্কৃত শাসনব্যবস্থা সত্বর প্রবর্ত্তিত হ'লে মুসলমান, জমিদার ও দক্ষিণ-পন্থী("Right Wing") কংগ্রেসীদের স্বমতে আনয়ন করা ও প্রগতিবাদীদের 'একঘরে' ক'রে রাখা সম্ভব হবে! আমলাতন্ত্র মর্লির এই মতবাদের সুযোগ নিয়ে হিন্দু মুসলমানের মধ্যেই প্রথমতঃ ভেদ-নীতি প্রবর্ত্তন করবার ব্যবস্থা করলেন। প্রকাশ, তাঁদের প্ররোচনায়ই উক্ত প্রতিনিধি-দল বড়লাট লর্ড মিণ্টোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। লর্ড মিণ্টোও মুসলমান সমাজের সহযোগিতার প্রতিশ্রুতিতে আনন্দ প্রকাশ করলেন ও তাঁদের দাবির ন্যায্যতা স্বীকার ক'রে তা পূরণে প্রতিশ্রুত হলেন। এই প্রতিশ্রুতির ফলেই

পরবর্ত্তী মর্লি-মিণ্টো শাসন-সংস্কারে মুসলমানদের পৃথক্ নির্ব্বাচন প্রথা স্বীকৃত হয়।

কংগ্রেস অধিবেশনের সময় নিকটবর্ত্তী হ'ল। কিন্তু সভাপতি নির্ব্বাচন নিয়ে নূতনপন্থীদের সঙ্গে প্রাচীনদের মতবিরোধ স্পষ্ট হ'য়ে উঠল। নূতন দল 'আত্মশক্তিতে' বিশ্বাসী, তাঁরা স্বদেশীর পূর্ণ সমর্থক ও নূতন ভাবধারার অন্যতম প্রবর্ত্তক বালগঙ্গাধর তিলককে এ বছরে কংগ্রেসের সভাপতি করতে চেয়েছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি পুরাতনপন্থী নেতাদের সঙ্গে এ নিয়ে নূতনপন্থী নেতাদের বিরোধের সূত্রপাত হয়। তাঁরা গোপনে সর্ব্বজনমান্য দাদাভাই নৌরজীকে এ পদ গ্রহণে আহ্বান করেন। দাদাভাই-এর সম্মতি প্রকাশিত হ'লে এ সম্বন্ধে নূতন দল আর আপত্তি করলেন না। অভ্যর্থনা-সমিতিই তখন পর্য্যন্ত সভাপতি মনোনয়ন করতেন। সুরেন্দ্রনাথ সমিতিকে সহজেই এ প্রস্তাবে সম্মত করান।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হলেন ডক্টর রাসবিহারী ঘোষ। অভিভাষণে তিনি এ সময়কার বঙ্গশাসনকে রুশিয়ার জারের নির্ম্মম দেশশাসনের সঙ্গে তুলনা করেন। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, বদরুদ্দীন তায়েবজী এবং মাদ্রাজের কংগ্রেসকর্ম্মী বীররাঘব আচার্য্যের মৃত্যুতে কংগ্রেস দুঃখ প্রকাশ করেন। কংগ্রেসে এবারে বিপুল জনসমাগম হয়। ষোল শ'র উপর প্রতিনিধি কংগ্রেসে যোগদান করেন। দর্শক সংখ্যাও হয়েছিল প্রায় কুড়ি হাজার। বঙ্গের স্বদেশী আন্দোলন ভারতবাসী মাত্রেরই প্রাণে নূতন সাড়া এনে দেয়। সভাপতি বিরাশী বছরের বৃদ্ধ দাদাভাই নৌরজী স্বদেশী আন্দোলন ও বিপুল স্বার্থত্যাগের জন্য বাঙালী জাতিকে অভিনন্দিত করলেন। তাঁর অভিভাষণের মূল বক্তব্য হ'ল, "আন্দোলন কর, আন্দোলন কর, আন্দোলনের তরঙ্গ-হিল্লোলে আসমুদ্র হিমাচল কাঁপিয়ে তোল। গণতন্ত্রপরায়ণ ব্রিটিশ জাতি আন্দোলনের নিকট যেমন মস্তক অবনত করে এমন আর কিছুরই নিকটে করে না। আন্দোলন সর্ব্বপ্রকারে গণতন্ত্র-সম্মত ও উপদ্রববিহীন হওয়া আবশ্যক। ভারতবাসীরা ব্রিটিশ প্রজা, ব্রিটিশের সমান অধিকার তার ন্যায্য প্রাপ্য।" দাদাভাই ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় আদর্শ সম্পর্কে বলেন, ভারতবর্ষের লক্ষ্য হবে গ্রেটব্রিটেন বা স্বাধিকারপ্রাপ্ত ব্রিটিশ উপনিবেশের অনুরূপ শাসনতন্ত্র লাভ,

যাকে এক কথায় বলা যায় 'স্বরাজ'। কংগ্রেস-মঞ্চ থেকে 'স্বরাজ' কথাটি এবারেই প্রথম উচ্চারিত হ'ল।

বিষয়-নির্ব্বাচনী সমিতিতে প্রস্তাব রচনার সময়ও নূতন ও পুরাতনপন্থীদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হ'ল। পুরাতন দলের নায়ক হলেন সার্ ফিরোজ শা মেহ্‌তা, আর নূতন দলের অগ্রণী হলেন বিপিনচন্দ্র পাল। উভয় দলের ভিতরে খুবই কথা কাটাকাটি হয় এবং নূতন দল বিষয়-নির্ব্বাচনী সমিতি থেকে বার্ হ'য়ে আসেন। শেষে দাদাভাই নৌরজীর চেষ্টায় উভয় দলে আপোষ-রফা হ'ল। এ বারেই কিন্তু বুঝা গেল, উভয় দলের বিরোধ বিচ্ছেদে পরিণত হ'তে বিশেষ বিলম্ব হবে না। পুরাতনপন্থীদের মামুলী প্রস্তাবগুলির সঙ্গে নূতন দলের স্বরাজ, স্বদেশী, বয়কট ও জাতীয় শিক্ষা সম্পর্কীয় প্রস্তাবও গৃহীত হ'ল। এ প্রস্তাবগুলির মর্ম্ম এই,

স্বরাজ—উপনিবেশে যে ধরণের স্বায়ত্তশাসন বর্ত্তমান, ভারতবর্ষেও সেই ধরণের স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা করা হোক্, এবং এ উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করার পক্ষে প্রথম ধাপ হিসাবে,

(১) ভারতবর্ষে কর্ম্মচারী নিয়োগের জন্য বিলাতে যে-সব প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষা গৃহীত হয় তা ভারতে ও বিলাতে উভয়ত্রই গ্রহণের ব্যবস্থা করা হোক্, এবং ভারতবর্ষে বসে যে-সব উচ্চ পদে কর্ম্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা আছে তাতেও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা প্রবর্ত্তিত হোক্।

(২) ভারতসচিবের কৌন্সিলে এবং মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের গবর্ণরের শাসনপরিষদে উপযুক্তসংখ্যক ভারতবাসীকে গ্রহণ করা হোক্।

(৩) ভারতীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপরিষদগুলি এরূপভাবে প্রসারিত করা হোক্, যাতে সত্যকার জন-প্রতিনিধিদের পক্ষে অধিক সংখ্যায় নির্ব্বাচিত হ'য়ে বজেট আলোচনায় ও শাসন কার্য্য নিয়ন্ত্রণে নিজ ক্ষমতা প্রয়োগ করা সম্ভব।

(৪) মিউনিসিপ্যালিটি, লোক্যাল বোর্ড ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের ক্ষমতা বর্দ্ধিত করা হোক্। বিলাতের অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের উপরে ঐ দেশের লোক্যাল গবর্ণমেণ্ট বোর্ড যতখানি কর্ত্তৃত্ব করেন এখানকার প্রতিষ্ঠানগুলির উপর সরকার ঠিক ততখানি কর্ত্তৃত্ব করবেন।

বয়কট—শাসনকার্য্যে ভারতবাসীর মতামত গ্রাহ্য নয় এবং সরকারে

প্রেরিত আবেদনপত্রও বিবেচিত হওয়ার আশা নেই। এজন্য বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ কল্পে বঙ্গদেশে উদ্‌যাপিত বয়কট বা বর্জ্জন আন্দোলন আইনসঙ্গত।

বিপিনচন্দ্র পাল বয়কট সম্পর্কে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, বয়কট আন্দোলন শুধু বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জনেই নিবদ্ধ নয়, পূর্ব্ববঙ্গ সরকারের সঙ্গে সর্ব্বরকমে সহযোগিতাবর্জ্জনই এর উদ্দেশ্য। পূর্ব্ব বঙ্গের ব্যবস্থাপরিষদও নেতৃবর্গ বয়কট করবেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় এ কথায় আপত্তি ক'রে বলেন, বয়কটের এরূপ ব্যাপক প্রয়োগে কংগ্রেস সম্মত হ'তে পারেন না। প্রস্তাবে উল্লিখিত বিষয়ের জন্যই কংগ্রেস দায়ী, কোন বক্তা বিশেষের বক্তৃতার জন্য দায়ী হ'তে পারেন না, গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে এ কথা বলায় বিতর্ক বন্ধ হয়। পূর্ব্ববঙ্গ কিন্তু বিপিনচন্দ্রের ব্যাখ্যাই মেনে নিয়েছিল।

স্বদেশী—কংগ্রেস স্বদেশী আন্দোলনকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করেন এবং দেশবাসীকে এর সাফল্যের জন্য তৎপর হ'তে আহ্বান করেন। তাঁরা যেন স্বদেশী শিল্পের উৎপাদন ও উন্নতির জন্য নিয়ত তৎপর থাকেন, এবং কিঞ্চিৎ ত্যাগ স্বীকার ক'রেও, বিদেশী দ্রব্যের পরিবর্ত্তে স্বদেশজাত দ্রব্যই ক্রয় ক'রে স্বদেশী শিল্পের প্রসারে সহায়তা করেন।

জাতীয় শিক্ষা—কংগ্রেস এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, জাতির পক্ষে বালক-বালিকাদের মধ্যে সমগ্র দেশব্যাপী জাতীয় শিক্ষা প্রবর্ত্তনে সচেষ্ট হবার সময় উপস্থিত হয়েছে। জাতীয় আদর্শে স্বদেশবাসীর কর্ত্তৃত্বাধীনে দেশের প্রয়োজন-অনুরূপ সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কারিগরি এই ত্রিবিধ শিক্ষার ব্যবস্থা করা আশু প্রয়োজন।

এবারকার কংগ্রেসে এক বছরের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে কতকগুলি নিয়ম গৃহীত হয়। একটি নিয়মে ধার্য্য হ'ল, কংগ্রেস-সভাপতি মনোনয়নে অভ্যর্থনা-সমিতির তিন-চতুর্থাংশ সভ্যের সম্মতি প্রয়োজন। এরূপভাবে সভাপতি মনোনয়নে অসমর্থ হ'লে সেণ্ট্রাল ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি যাকে সভাপতি মনোনীত করবেন তিনিই সভাপতি হবেন। এই কমিটিতে সভ্য থাকবেন বাংলা, বিহার, আসাম ও ব্রহ্মদেশ থেকে ১২ জন, মাদ্রাজ থেকে ৮ জন, বোম্বাই থেকে ৮, যুক্তপ্রদেশ থেকে ৬, পঞ্জাব ও মধ্যপ্রদেশ প্রত্যেকটি থেকে ৬ ও বেরার থেকে ২ জন। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকগণও এর অতিরিক্ত সদস্য হবেন।

আর একটি নিয়মে বিষয়-নির্ব্বাচন কমিটি গঠনের কথা হয় এইরূপ—বাংলা, বিহার, আসাম ও ব্রহ্মদেশ—২৫ জন, মাদ্রাজ—১৫, বোম্বাই—১৫, যুক্তপ্রদেশ—১০, পঞ্জাব—১০, মধ্যপ্রদেশ—৬, বেরার—৪, এবং যে প্রদেশে যে বার কংগ্রেস হবে সেবার সেখানকার প্রতিনিধিগণ কর্তৃক নির্ব্বাচিত আরও ১০ জন সদস্য, সভাপতি, পূর্ব্ব সভাপতিগণ, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি, কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকগণ ও অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদকগণ।

কংগ্রেস সপ্তাহে কলকাতায় একটি শিল্প প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হ'ল। একে প্রথমে কংগ্রেসের অঙ্গীভূত করার কথা হয়, কিন্তু বিদেশী জিনিস প্রদর্শিত হওয়ায় প্রতিনিধিগণের আপত্তি হেতু এর উপর কংগ্রেসের ছাপ দেওয়া হয় নি। প্রদর্শনী উন্মোচন করেন বড়লাট লর্ড মিণ্টো। তিনি বক্তৃতায় স্বদেশীকে 'সৎ' ও 'অসৎ' দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করলেন। তাঁর মতে বর্জ্জন-নীতি মিশ্রিত স্বদেশী ত্যাগ ক'রে শুধু স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারেই ভারতবাসীর তৎপর হওয়া উচিত। তাঁর এই উক্তির মধ্যেও ভেদ-নীতির আভাস পাওয়া যায়।

আদর্শ-সংঘাত ও শাসন-নীতি

(১৯০৭—১৯০৯)

কলকাতা কংগ্রেসে নূতন দলের প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় ফিরোজ শা মেহ্‌তা প্রমুখ প্রাচীনপন্থীরা খুশি হ'তে পারেন নি। তাঁরা নূতন দলের অগ্রসর নীতিকে দাবিয়ে রাখতে বদ্ধপরিকর হলেন। নূতন ও পুরাতন দলের মধ্যে বিরোধ ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠল ও দুটি স্বতন্ত্র নাম লাভ করলে। নূতন দলের নাম দেওয়া হ'ল 'এক্‌স্‌ট্রিমিষ্ট' বা চরমপন্থী, পুরাতন দল 'মডারেট' বা নরম পন্থী ব'লে আখ্যাত হ'ল। মহারাষ্ট্রে বালগঙ্গাধর তিলক, পঞ্জাবে লালা লজপত রায় ও বঙ্গে বিপিনচন্দ্র পাল নব ভাবের প্রধান উদ্গাতা। এজন্য ভারতবাসী আদর ক'রে তিনজনকেই 'লাল-বাল-পাল' এই একটি কথায় অভিহিত করতেন।

অরবিন্দ ঘোষও এ দলের একজন প্রধান ব্যক্তি। তিনি নূতন ভাবধারাকে ধর্ম্মের পর্য্যায়ে উন্নীত ক'রে একে অপূর্ব্ব স্নিগ্ধতা দান করেন। তিনি বলেন, "জাতীয়তা-বোধ বা দেশভক্তি একটি ধর্ম্ম, ঈশ্বর হ'তে উদ্ভূত। জাতীয়তাকে কেউ রোধ করতে পারে না, কেননা ঈশ্বরই একে নিয়ন্ত্রিত করছেন।......শুধু রাজনৈতিক কর্ম্মপ্রণালী অনুসরণ ক'রে, জাতীয় শিক্ষা প্রবর্ত্তন ক'রে বা শুধু বয়কট আন্দোলন চালিয়ে এ দেশকে বাঁচান সম্ভব নয়। স্বদেশী দ্বারা কিঞ্চিৎ আর্থিক সমৃদ্ধি ঘটতে পারে, কিন্তু এর চাকৃচিক্যে ভুলে ও একে নিরাপদে রক্ষা করতে গিয়ে আসল উদ্দেশ্য ভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশী।......দৃশ্যমান শক্তিসমূহের চেয়ে স্বদেশের শক্তি অন্যবিধ। দেশমাতৃকার শক্তি নিজস্ব। এর পরিপুষ্টির জন্য তোমার আবশ্যক নেই, আমার আবশ্যক নেই, অন্য কারোরই আবশ্যক নেই।"

স্বরাজের বেদান্ত-সম্মত ব্যাখ্যা ক'রে অরবিন্দ বুঝিয়ে দেন, নিজের চেষ্টায় যেমন নিজের প্রভুত্ব সম্ভবে, জাতিকেও তেমনি প্রভুত্ব অর্জ্জন করতে হয়

নিজেকে, পরের সাহায্যে স্বাধীনতা অর্জ্জন অসম্ভব। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ আলিপুর বোমার মামলায় অরবিন্দের পক্ষ সমর্থন ক'রে যে বক্তৃতা করেন তাতে বলেছিলেন, "অরবিন্দ স্বদেশপ্রেমের কবি, জাতীয়তার ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা ও মানব জাতির মহাপ্রেমিক"।

বিপিনচন্দ্র স্বরাজের অর্থ করলেন আত্মকর্তৃত্ব বা 'অটোনমী'। তাঁর মতে "স্বরাজ কেউ কাউকে দান করতে পারে না। এ নিজেকেই অর্জ্জন করতে হয়। আজ যদি ইংরেজ বলে, স্বরাজ লও, আমি ধন্যবাদ দিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করব। কারণ আমি নিজে যা অর্জ্জন করতে পারি না তা আমি গ্রহণ করবার অধিকারী নই। আমাদের সকল শক্তি এমনি ভাবে নিয়োজিত করব, ধন ও জন এরূপ ভাবে সংহত ও সঙ্ঘবদ্ধ করব, যার ফলে আমরা বিরুদ্ধ শক্তিকে স্বমতে আনয়ন করতে সক্ষম হই। বিলাতী পণ্য বর্জ্জন থেকে আরম্ভ ক'রে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ পর্য্যন্ত আমাদের অস্ত্র। আমরা গঠনমূলক কার্য্যেও মন দিব। সরকারী ব্যবস্থার অনুরূপ শাসন-ব্যবস্থা আমরা দেশময় প্রতিষ্ঠিত করব।"

অরবিন্দের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বিপিনচন্দ্রের কথায় এবারে অনেকটা পরিষ্কার হ'ল। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হবার পূর্ব্ব বৎসরই (১৯০৪) স্বদেশী সমাজ নামক একটি সারগর্ভ বক্তৃতা করেছিলেন। এই বক্তৃতার পূর্ণ সমর্থনও পাওয়া গেল বিপিনচন্দ্র পাল প্রদত্ত ব্যাখানে। কিন্তু কর্ম্মীশ্রেষ্ঠ বালগঙ্গাধর তিলক নূতন দলের আদর্শ ও কর্ম্মপ্রণালী আরও বস্তুগত ও সময়োপযোগী ক'রে জনসাধারণকে বুঝিয়ে দিলেন। তিলকও স্বরাজ্যের আদর্শে নিষ্ঠাবান্। কিন্তু সময়ের উপযোগী ক'রে তিনি স্বরাজ্যের এইরূপ ব্যাখ্যাই করলেন, "প্রকৃতিপুঞ্জের মতানুসারে পরিচালিত রাজ্য বৈদেশিক রাজ্য বৈদেশিক রাজার অধীন হ'লেও স্বরাজ্য নামে অভিহিত হবার যোগ্য। প্রকৃতিপুঞ্জের মত উপেক্ষিত হ'লে হিন্দু রাজার রাজ্যও স্বরাজ্য নামে অভিহিত হ'তে পারে না।" নূতন দলের উদ্দেশ্য এবং নূতন ও পুরাতন ভাবধারার মধ্যে পার্থক্য সম্বন্ধে তিলক মহোদয় মিঃ নেভিন্‌সন নামক একজন ইংরেজ সাংবাদিকের নিকট এই মর্ম্মে বলেন,

"আমরা যে চরমপন্থী আখ্যা পেয়েছি তা আমাদের উদ্দেশ্যের বিশিষ্টতার

জন্য নয়, আমাদের কর্ম্মপন্থার বৈশিষ্ট্যের জন্য। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ হোক্‌, ব্রিটিশের সঙ্গে সকল সম্পর্ক এখনই ছিন্ন হোক্‌—ভারতবর্ষের খুব অল্প লোকই এটি চান। বর্ত্তমানে আমাদের দেশের শাসনভার যাতে ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে আমাদের হাতে আসে তা-ই আমাদের উদ্দেশ্য। আমাদের আশা—ভারতের বিভিন্ন প্রদেশগুলি সম্মিলিত হ'য়ে প্রাচীতে এক যুক্তরাষ্ট্র গঠন করবে। বর্ত্তমানে আমরা আমাদের কর্ম্ম দ্বারা আমলাতন্ত্রকে জানাতে চাই, তাদের অনুসৃত পদ্ধতি সকলই ভাল নয়। বর্ত্তমান যুগের ইংরেজ রাজনীতিকরা পুরাতন রোম-সাম্রাজ্যকেই সাম্রাজ্য-শাসনের আদর্শ ক'রে নিয়েছেন।

"কিরূপে আমরা আমলাতন্ত্রের চৈতন্যের উদ্রেক করতে পারি আজকের সমস্যা তাই। আর এখানেই তথাকথিত মডারেটদের সঙ্গে আমাদের মতানৈক্য। মডারেটরা এখনও আশা করেন যে, বিলাতে প্রতিনিধি পাঠিয়ে তথাকার জনমত গঠন করা সম্ভব। চরমপন্থীরা এ আশা রাখেন না। তাঁদের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছে যে, ইংলণ্ডের জনসাধারণও ভারত-শাসন সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। সেখানে মুষ্টিমেয় লোক ছাড়া কেউই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোনরূপ খোঁজ-খবর লওয়া আবশ্যক মনে করে না। অবসর প্রাপ্ত ইংরেজ কর্ম্মচারীরা স্বদেশে গিয়ে ব্রিটিশ জনমতকে ভারতবাসীর বিরোধী ক'রে তোলেন। তাঁরা বরাবরই আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেন। লর্ড ক্রোমার সেদিন পার্লামেণ্টে বলেছেন, 'ভারত-কথা আলোচনা কালে আমাদের দলগত পার্থক্য ভুলে যাওয়া উচিত।' অর্থাৎ তাঁর মতে রক্ষণশীল দলের ন্যায় উদারনৈতিক দলেরও অন্ধভাবে বুরোক্রাসী বা আমলাতন্ত্রের সমর্থন করা কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষ সম্পর্কে ঐরূপ কর্ত্তব্য দুটি দলই নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করছেন! হতাশ হয়েই আমরা—ভারতের চরমপন্থীরা অন্য পন্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছি। আমাদের আদর্শ—আত্মনির্ভরতা, ভিক্ষাবৃত্তির তিরোধান। বয়কট ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আমাদের অস্ত্র। কারো উপর বল-প্রয়োগের আমরা পক্ষপাতী নই। কর্ম্মপদ্ধতি অনুসরণ করতে গিয়ে যদি দুঃখ বরণ করতে হয় তাতেও আমরা পশ্চাৎপদ হব না।"

নূতন দলের মত যখন এইরূপ তখন পুরাতন দল যে তাদের থেকে দূরে

সরে পড়বেন তাতে আর আশ্চর্য্য কি! গবর্ণমেণ্ট নরম ও চরম পন্থীদের মধ্যে সুস্পষ্ট মতভেদ দেখে চরমপন্থীদের দূরে সরিয়ে নরমপন্থীদের কোলে টানবার ব্যবস্থা করলেন। ভারতসচিব জন মর্লি ত স্পষ্টই বলেছেন, শাসন ব্যাপারে কিছু সুবিধা দিয়ে নরমপন্থীদের সরকারের অনুবর্ত্তী ক'রে নেওয়াই সঙ্গত ("to rally the Moderates")! চরমপন্থীদের উপর সরকারের কোপদৃষ্টি পতিত হ'তে অধিক বিলম্ব হ'ল না। পঞ্জাব, বাংলা, বোম্বাই এ তিনটি প্রদেশেই দমন কার্য্য শুরু হয়। রাজদ্রোহকর বিষয় প্রকাশের জন্য পঞ্জাবের 'ইণ্ডিয়া' পত্রিকার সম্পাদক ও মুদ্রাকর এবং 'পাঞ্জাবী' পত্রিকার মালিক ও সম্পাদক কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। পঞ্জাব সরকারের রাজস্ব-বৃদ্ধি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করায় জাতীয় আন্দোলনের প্রধান হোতা লালা লজপত রায় ১৮১৮ সালের তিন আইনে বন্দী হন ও সরাসরি একেবারে মান্দালয়ে নির্ব্বাসিত হন (৯ই মে, ১৯০৭)। সর্দ্দার অজিত সিংহও এই আইনে কারারুদ্ধ হলেন।

বঙ্গে অনুসৃত নীতির মধ্যে কিঞ্চিৎ নূতনত্ব ছিল। বাংলার চরমপন্থী নরমপন্থী উভয় দলই বিলাতী পণ্য বর্জ্জনে সমান তৎপর। কারণ বঙ্গভঙ্গ ব্যাপার তাদের প্রাণকে সমানভাবেই উদ্বেলিত করে। গবর্ণমেণ্ট মুসলমানকে হিন্দু থেকে আলাদা ক'রে রাখতে আগে থেকেই তৎপর হয়েছেন। স্বার্থপর প্রচারকদের প্ররোচনায় অজ্ঞ মুসলমানগণ এপ্রিল মাসের শেষ ভাগে ঢাকা, জামালপুর ও কুমিল্লায় দাঙ্গাহাঙ্গামায় লিপ্ত হয়। পূর্ব্ববঙ্গ সরকার হাঙ্গামার গুরুত্ব এই ব'লে লাঘব করতে চেষ্টা করেন যে, হিন্দু দোকানীরা মুসলমানদের নিকট বিলাতী দ্রব্য বিক্রয় করতে অস্বীকার করায়ই এসব দাঙ্গাহাঙ্গামা সংঘটিত হয়েছে! কিন্তু বিচারকালে এসব মিথ্যা ব'লেই প্রতিপন্ন হ'ল। ভেদ-নীতি বিচার বিভাগকেও তখন অনেকটা আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে। কুমিল্লার ইংরেজ দায়রা জজ কোন দাঙ্গাকারীর মোকদ্দমায় হিন্দু ও মুসলমান সাক্ষীদের দুই স্বতন্ত্র শ্রেণীতে বিভক্ত করেন ও হিন্দুদের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য ক'রে মুসলমানদের সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য ব'লে রায়ে উল্লেখ করেন! হাইকোর্টে আপীল হ'লে বিচারপতিরা এরূপ পক্ষপাতমূলক বিচার-পদ্ধতির অজস্র নিন্দা করলেন ও এই মর্ম্মে মন্তব্য করলেন যে, এরূপ লোক বিচারাসনে বসবার সম্পূর্ণ অযোগ্য।

সরকারের নজর পড়ল অতঃপর বঙ্গের চরমপন্থীদের উপর। 'যুগান্তর' চরমপন্থীদেরও অগ্রণী. কাজেই এর উপরই প্রথম নজর পড়ল সরকারের। সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সর্ব্বপ্রথম ধৃত হলেন ও কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কিংসফোর্ডের বিচারে ২০শে জুলাই এক বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। মুদ্রাকরের দণ্ড হ'ল দু'বছর। বিবেকানন্দ ভূপেন্দ্রের জননীকে কলকাতার নারীসমাজ প্রকাশ্য সভায় অভিনন্দিত করলেন। প্রগতিবাদী 'বন্দেমাতরম্' ও 'সন্ধ্যা'র উপরও সরকার সমান চটা। 'বন্দেমাতরম্'-এর সম্পাদকরূপে অরবিন্দ ঘোষ ও 'সন্ধ্যার' সম্পাদকরূপে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ধৃত হন। এ দু'জনের মোকদ্দমায় বিশেষ নূতনত্ব ছিল। বিপিনচন্দ্র পাল অরবিন্দের মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করেন। এজন্য আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত হ'য়ে তিনি ছ' মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। বিপিনচন্দ্রের বিচারের দিন আদালতে বিস্তর জনসমাগম হয়েছিল। তখন ছাত্র ও পুলিশের মধ্যে হাঙ্গামা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কিংসফোর্ড সুশীল সেন নামক একটি কিশোর ছাত্রকে পনর ঘা বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত করেন। বিপিনচন্দ্র ইতিপূর্ব্বে এপ্রিল মাসে মাদ্রাজে গিয়ে নূতন ভাবাদর্শ সম্বন্ধে নানাস্থানে বহু বক্তৃতাও করেছিলেন। যা হোক্, মোকদ্দমায় অরবিন্দ মুক্তিলাভ করলেন (২৩শে সেপ্টেম্বর)। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় বলেছিলেন, তিনি সন্ন্যাসী, ইংরেজ রাজের সাধ্য নেই যে তাঁকে কারাবদ্ধ করেন। হ'লও তাই। তিনি হাজত থাকা কালে ইহলোক ত্যাগ করলেন। উপাধ্যায় মহাশয় কিন্তু মামলার শুনানী আরম্ভেই (২৩শে সেপ্টেম্বর) বলেছিলেন, বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট স্বরাজ আন্দোলন সম্পর্কে বিদেশী গবর্ণমেণ্টের নিকট জবাবদিহি করতে তিনি বাধ্য নন! তিনি সরকারের সঙ্গে কার্য্যতঃ অসহ-যোগের সূচনা করলেন। সকল মোকদ্দমাই মিঃ কিংসফোর্ডের এজলাসে নিষ্পন্ন হয়। তাঁর রূঢ় ব্যবহারে লোকে খুবই উত্যক্ত হয়েছিল! সরকার ১৯০৭, ১লা নবেম্বর 'সিডিশাস্ মিটিংস্ এ্যাক্ট' বা রাজদ্রোহকর সভা বন্ধ আইন ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদে পাস করিয়ে নেন। এর দ্বারা প্রকাশ্য সভায় রাজনীতির আলোচনা বন্ধ করা হ'ল। ছ'মাস পূর্ব্বেই কিন্তু একটি অর্ডিন্যান্স জারী ক'রে ভারত গবর্ণমেণ্ট পঞ্জাবে ও পূর্ব্ববঙ্গে সভা বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন।

বিলাতে উদারনৈতিক দল মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করায় কংগ্রেসের পুরাতনপন্থী

নেতারা যেন মরুভূমির মধ্যে ওয়েসিসের সন্ধান পেলেন। লর্ড কার্জ্জনের স্বৈর-শাসনের প্রকোপে তাঁরা একেবারে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাঁরা বিলাতের জনমত গঠন ক'রে উদারনৈতিকদের সাহায্যে ভারত-ভাগ্য ফেরাতে সক্ষম হবেন এরূপ আশা করতে লাগলেন। গোখ্‌লে কংগ্রেস প্রতিনিধিরূপে বিলাত গেলেন ও মর্লিকে তাঁদের তরফে সর্ব্ব রকমে সমর্থন দানের প্রতিশ্রুতি দিলেন। স্বদেশবাসী প্রগতিপন্থীদের তাঁরা মনে করলেন দেশের, সমাজের ও রাষ্ট্রের শত্রু, সুতরাং তাঁদেরও উদ্দেশ্য পথে বিঘ্ন। তাঁরা প্রগতিবাদীদের কটুকাটব্য করতেও দ্বিধা বোধ করেন নি। ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদে ডক্টর রাসবিহারী ঘোষ নানা সময়ে প্রগতিবাদীদের 'Grasshoppers', 'Cricketers', 'Pestilential demagogues' প্রভৃতি 'মধুর' সম্বোধনে সম্বোধিত করতেও ছাড়েন নি। পুরাতন দলের প্রধান পাণ্ডা ছিলেন সার্ ফিরোজ শা মেহ্‌তা। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় এবং কৃষ্ণস্বামী আয়ারও তখন নূতন দলের ঘোর বিরোধী ছিলেন। পরে কংগ্রেসে নূতন দলের প্রাধান্য হ'লে মডারেটগণ কংগ্রেস ত্যাগ করেছেন বটে, কিন্তু মালবীয়জী কংগ্রেসের সঙ্গেই বরাবর যুক্ত রয়েছেন ও বৃদ্ধ বয়সে দেশমাতৃকার সেবায় কারাবরণও করেছেন।

কংগ্রেসে আদর্শ-দ্বন্দ্ব বহু পূর্ব্বেই আরম্ভ হয়। ১৯০৭ সালের সভাপতি নির্ব্বাচন নিয়েই এই দ্বন্দ্ব ঘোরাল হ'য়ে উঠল। এবারে নাগপুরে কংগ্রেস হবার কথা ছিল। এখানকার জাতীয়তাবাদীরা মহামতি তিলককে সভাপতি পদে বরণ করতে চাইলেন। এ নিয়ে দু'দলে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হ'লে নাগপুর থেকে সুরাট শহরে অধিবেশন-স্থান পরিবর্ত্তিত হয়। স্থান পরিবর্ত্তনে পুরাতন পন্থী ফিরোজ শা মেহ্‌তার খুবই হাত ছিল। সুরাটের কংগ্রেসীরা প্রায় সকলেই পুরাতন পন্থী ও মেহ্‌তার মতাবলম্বী। কাজেই এই স্থানই নিরাপদ ব'লে বিবেচিত হয়। এই সময় লালা লজপত রায়ের কারামুক্তি হ'ল। সুতরাং তিলক লজপত রায়কে সভাপতি করার প্রস্তাব করলেন। সমগ্র ভারতের প্রগতিবাদীরা এ প্রস্তাব সাগ্রহে সমর্থন করেন। কলকাতায় অরবিন্দ ঘোষ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী প্রমুখ জাতীয় দলের নেতৃবৃন্দ সাধারণ সভা ক'রে এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। পুরাতন পন্থীরা কিন্তু এতে রাজী হলেন না। লজপত রায়

সরকারের কুনজরে পড়েছেন, তাঁকে সভাপতি পদ দিলে সরকার কংগ্রেসের উপরে খাপ্পা হ'য়ে উঠবেন এই ছিল তাঁদের আশঙ্কা। তাঁরাও স্পষ্টই বলেছেন, কংগ্রেস জনমতের প্রতিভূ নন, সরকার ও জনসাধারণ উভয়ের মধ্যে কংগ্রেস হ'ল মধ্যস্থ। যেখানে মত ও পথ উভয় দিকেই অনৈক্য সেখানে ঐক্যের আশা করাই ভুল। সুরাটে নানারূপ চেষ্টা সত্ত্বেও যে দু'দলের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হয় নি তার কারণও হ'ল এই।

এখানে আর একটি কথা ব'লে রাখি। কংগ্রেসের নিয়ম-কানুন তখনও সুষ্ঠু ভাবে স্থিরীকৃত হয় নি। অভ্যর্থনা-সমিতিই এতদিন সভাপতি নির্ব্বাচন বা মনোনয়ন করতেন। কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে তা সমর্থিত ক'রে নেওয়া হ'ত মাত্র। এতদিন সভাপতি নির্ব্বাচনে কোন দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় নি, সুতরাং সহজেই সভাপতি নির্ব্বাচন সম্পন্ন হ'ত। কোনরূপ মতানৈক্য উপস্থিত হ'লে কি উপায়ে তার মীমাংসা হবে কংগ্রেস-নেতৃবর্গ সে কথা কখনও ভাবেন নি। যখন এ বিষয়ে কোন নির্দ্দিষ্ট ধারা কংগ্রেস নিয়মে নেই তখন উপস্থিত প্রতিনিধিবর্গের অধিকাংশের ভোটেই এই বিষয়ে মীমাংসা হওয়া পার্লামেণ্টীয় রীতি। এজন্য মহামতি তিলক সুরাট কংগ্রেসে উপস্থিত প্রতিনিধিদের উপর মীমাংসার ভার দিয়ে পার্লামেণ্টের রীতি যথাযথ অনুসরণ করেছিলেন।

সুরাট কংগ্রেসে যোগ দেবার জন্য প্রায় ষোল শ' প্রতিনিধি উপস্থিত হলেন। এঁদের মধ্যে ন'শ আন্দাজ ছিলেন পুরাতন পন্থী আর প্রায় সাত শ' নূতন পন্থী বা চরমপন্থী। পুরাতন পন্থীরা কলকাতা কংগ্রেসে গৃহীত স্বরাজ, স্বদেশী, বয়কট ও জাতীয় শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব প্রথমে নাকচ করতে চেয়েছিলেন, পরে নূতন দলের চাপে এর কিছু কিছু অদল-বদল ক'রে গ্রহণ করতে রাজী হন। নূতন দল পূর্ব্বেই তাঁদের মনোভাব বুঝতে পেরেছিলেন। সুরাটে পূর্ব্বে যে বোম্বাই প্রাদেশিক সম্মেলন হয় তাতে সার্ ফিরোজ শার নির্দ্দেশে এসব প্রস্তাব উত্থাপিতই হ'তে পারে নি। নাগপুর থেকে সুরাটে কংগ্রেসের স্থান বদলে নূতন দলের সন্দেহ বরং দৃঢ়ই হ'ল। সুরাটে উপস্থিত হ'য়ে তাঁরা স্থির করলেন যে, কংগ্রেসের পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাবগুলির ভাষাগত ও ভাবগত পরিবর্ত্তন করা হবে না—এই মর্ম্মে প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেলে তাঁরাও সভাপতি নির্ব্বাচনে

প্রতিবন্ধকতা করবেন না। গোখ্‌লে পরে বলেছেন, প্রকাশ্য কংগ্রেস কি করবেন না করবেন সে সম্বন্ধে তাঁদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া সম্ভব ছিল না। এ কথার যুক্তিযুক্ততা সকলেই স্বীকার করবেন; তবে পুরাতন দল যে প্রস্তাবের কিছু অদল-বদল করতে চেয়েছিলেন এটা নিশ্চিত। গোখ্‌লেও এ-পরিবর্ত্তনের কথা জানতেন। নূতন দলের নেতা হিসাবে তিলক পরিবর্ত্তিত প্রস্তাবগুলি দেখতে চাইলেন, কিন্তু তাঁর কথায় কেউ কর্ণপাতও করলেন না। নূতন দল অতঃপর স্থির করলেন, প্রকাশ্য কংগ্রেসে সভাপতি নির্ব্বাচন থেকে আরম্ভ ক'রে সকল কার্য্যেই তাঁরা ভোট গণনার দাবি করবেন। ২৬শে ডিসেম্বর প্রকাশ্য কংগ্রেসের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ পঠিত হ'ল। তার পরে ডক্টর রাসবিহারী ঘোষকে সভাপতি নির্ব্বাচনের প্রস্তাব করতে উঠে সুরেন্দ্রনাথ বক্তৃতা আরম্ভ করেন। কিন্তু সভায় এরূপ গণ্ডগোল হয় যে, কর্ত্তৃপক্ষ পরদিনের জন্য সভা স্থগিত রাখতে বাধ্য হন। উভয় দলের মধ্যে মিলন-সূত্র পাওয়ার জন্য এবারে জোর চেষ্টা শুরু হ'ল। লালা লজপত রায়, মতিলাল ঘোষ প্রভৃতি এবিষয়ে অগ্রণী হলেন। মহামতি তিলকও নূতন দল আপোষ-নিষ্পত্তির জন্য শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত উদ্‌গ্রীব ছিলেন, কিন্তু পুরাতন পন্থীদের জিদের ফলে আপোষ সম্ভব হ'ল না। লালা লজপত রায় পরে বলেছিলেন, উভয় দলের বিরোধ এত গভীর যে, স্বতন্ত্র ভাবেই তাঁদের কিছুদিন কাজ করা কর্ত্তব্য।

পরদিন অধিবেশন যথারীতি আরম্ভ হ'ল। সুরেন্দ্রনাথের প্রস্তাবে ও মতিলাল নেহেরুর সমর্থনে ডক্টর রাসবিহারী ঘোষ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিলক নূতন দলের নেতা হিসাবে সভাপতি নির্ব্বাচনের সময় কিছু বলবার জন্য অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিকে পূর্ব্বে পত্র লিখেছিলেন, কিন্তু এর জবাব দেওয়া তিনি সঙ্গত মনে করেন নি। সুতরাং তিলক সভাপতির আসন গ্রহণের পরেই মঞ্চে উঠে কিছু বলবার জন্য দাঁড়ান। সভাপতির তাঁর কার্য্য বিধিবহির্ভূত ব'লে নির্দ্দেশ দেন। তিলক তখন উপস্থিত প্রতিনিধিদের নিকট অনুমতি যাচ্ঞা করেন। পুরাতন পন্থীরা নানাদিক থেকে তাঁকে আক্রমণ করতে চেষ্টা করেন। গোখ্‌লে তিলককে আড়াল ক'রে থাকায় তাঁর গায়ে কারো হাত বা আঘাত পড়ে নি। সভায় তুমুল কোলাহল উপস্থিত হ'ল।

ইতিমধ্যে অকস্মাৎ একখানা মারাঠা চটি সুরেন্দ্রনাথের গাত্র স্পর্শ ক'রে ফিরোজ শা মেহ্‌তার গণ্ডদেশে গিয়ে পড়ল। ভীষণ গণ্ডগোলের মধ্যে সভা ভঙ্গ হ'ল।

পুরাতনপন্থী নেতৃবর্গ এতে নিরস্ত হলেন না। তাঁরা ইস্তাহার জারি ক'রে স্বমতানুবর্ত্তীদের নিয়ে পর দিন একটি 'কন্‌ভেনশন' বা সম্মেলন বসালেন। লজপত রায়ও এতে যোগদান করলেন। এই কন্‌ভেনশনে কংগ্রেসের আদর্শ নির্ণয় ও নিয়ম-পত্র রচনার উদ্দেশ্যে একটি সাব্‌কমিটি গঠিত হ'ল। ১৯০৮ সালের ১৮ই ও ১৯শে এপ্রিল এলাহাবাদে কন্‌ভেনশনের এক অধিবেশন হয় ও কংগ্রেসের গঠন-তন্ত্র গৃহীত হয়। ১৯২০ সালে নাগপুর কংগ্রেস পর্য্যন্ত এই গঠন-তন্ত্র অনুসারেই মোটামুটি সব কাজ পরিচালিত হয়েছে। সর্ব্বসমেত ত্রিশটি ধারা নিয়ে এই গঠন-তন্ত্র। কংগ্রেসের 'ক্রীড্‌' বা লক্ষ্য স্থির হ'ল,

"ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বায়ত্ত-শাসন সম্পন্ন দেশগুলির ন্যায় ভারতবর্ষের শাসন-প্রণালী অর্জ্জন ও দেশ-শাসনে ভারতের ন্যায্য অধিকার ও দায়িত্ব সম্ভোগের উদ্দেশ্যেই এই কংগ্রেস গঠিত। বর্ত্তমান শাসন-প্রণালী ধীরে ধীরে সংস্কার ক'রে আইনসঙ্গত উপায়ে এ উদ্দেশ্য সাধন করতে হবে। জাতীয় একতাবৃদ্ধি, জাতীয়তার উন্মেষ এবং দেশের নৈতিক, মানসিক, আর্থিক ও বাণিজ্য সম্বন্ধীয় উন্নতি সাধনও কংগ্রেসের অন্যতম লক্ষ্য।

"যাঁরা কংগ্রেসের মূল উদ্দেশ্য স্বীকার ক'রে এর নিয়মাবলী মেনে চলবার অঙ্গীকার করবেন তাঁরাই কংগ্রেসের প্রতিনিধি হবার যোগ্য।"

নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি এইরূপ সদস্য সংখ্যা নিয়ে গঠিত হ'ল—মাদ্রাজ ১৪, বোম্বাই ২০, আসাম ও বঙ্গ ২৫, আগ্রা-অযোধ্যা ২৫, পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ২০, মধ্যপ্রদেশ ১২, বিহার ও উড়িষ্যা ২০, বেরার ৬, ব্রহ্মদেশ ৫, অন্ধ্র ১১, সিন্ধু ৫, দিল্লী-আজমীর-মাড়োয়ার-রাজপুতানা ৬। কমিটির সদস্যদের এক-পঞ্চমাংশ মুসলমান হওয়া চাই। কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব সভাপতিগণ ও সাধারণ সম্পাদকগণ বিশেষ প্রতিনিধি ব'লে গণ্য হবেন। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকগণই নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদকের কার্য্য করবেন।

সভাপতি নির্ব্বাচনে ভবিষ্যতে যাতে কোনরূপ বাধা সৃষ্টি না হয় এজন্য

গঠনতন্ত্রের ত্রয়োবিংশ ধারায় এই বিস্তারিত নিয়ম ধার্য্য হ'ল—জুন মাস শেষ হবার পূর্ব্বে প্রত্যেক প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি অভ্যর্থনা-সমিতির নিকট কংগ্রেস সভাপতি পদের যোগ্য লোকের নাম প্রেরণ করবেন। জুলাই মাসের প্রথমেই অভ্যর্থনা-সমিতি শেষ নিয়োগের জন্য নাম নির্ব্বাচন ক'রে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিসমূহের নিকট প্রেরণ করলে সকলকে নিজ মত জানাতে হবে। তাবপর আগষ্ট মাসের প্রথমে অভ্যর্থনা-সমিতি সব বিষয় বিচার করবেন। যিনি অধিকাংশ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হ'য়ে অভ্যর্থনা-সমিতির অধিবেশনেও অধিক ভোট পাবেন, তিনিই নির্ব্বাচিত হবেন। যদি অধিকাংশ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত নাম অভ্যর্থনা-সমিতিতে গৃহীত না হয় বা নির্ব্বাচিত সভাপতির মৃত্যু, পদত্যাগ বা অন্য কোন কারণে পুনরায় নির্ব্বাচন প্রয়োজন হয় তা হ'লে অভ্যর্থনা-সমিতি নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির উপর নির্ব্বাচনের ভার অর্পণ করবেন এবং তাঁদের নির্ব্বাচনই গৃহীত হবে। সেপ্টেম্বর মাস শেষ হবার পূর্ব্বেই এ কাজ সম্পন্ন করা চাই। যে প্রদেশে কংগ্রেসের অধিবেশন হবে সে প্রদেশের লোক কখনও সভাপতি নির্ব্বাচিত হ'তে পারবেন না। প্রকাশ্য অধিবেশনে সভাপতি নির্ব্বাচন করা হবে না, নির্ব্বাচিত সভাপতিকে আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হবে মাত্র।

এইসব নিয়মে আবদ্ধ হ'য়ে কংগ্রেসের পরবর্ত্তী অধিবেশন হ'ল মাদ্রাজে, ডক্টর রাসবিহারী ঘোষের সভাপতিত্বে। কিন্তু এর পূর্ব্বেই ভারতের আকাশে একখণ্ড কাল মেঘ উত্থিত হ'ল।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ সেন প্রমুখ প্রবীণ রাজনীতিকগণ বলেছিলেন, বরিশালের অনাচারের ফলে ভারতবর্ষে বিপ্লববাদের উদ্রেক হওয়া আশ্চর্য্য কিছুই নয়। বাস্তবিক প্রায় দু'বছর ধরে বঙ্গের নানাস্থানে আমলাতন্ত্র যে নীতি অনুসরণ করেন—তাতে সকলেরই মন নৈরাশ্যে পূর্ণ হয়েছিল।

বিচ্ছিন্ন বঙ্গের পশ্চিম অংশের ছোট লাট সার্ এণ্ড্রু ফ্রেজারের ট্রেন উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টার মধ্যেই বিপ্লবাত্মক কর্ম্মের প্রথম অভিব্যক্তি। কলকাতার ভূতপূর্ব্ব চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কিংস্‌ফোর্ড ১৯০৮ সালে মজঃফরপুরে দায়রা জজ হ'য়ে যান। তাঁর প্রাণনাশের জন্য ১৯০৮ এপ্রিল মাসে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী নামে দু'জন বিপ্লবী মজঃফরপুরে গমন করেন। তাঁদের

গুলিতে ভ্রমক্রমে ৩০শে এপ্রিল প্রিংলি কেনেডি নামক একজন ইংরেজ ব্যবহার-জীবীর পত্নী ও কন্যা নিহত হন। কেনেডি সাহেব ভারতীয়দের বন্ধু ছিলেন, একবার একটি প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতিত্বও করেন। কেনেডি পত্নী ও দুহিতার মৃত্যুতে দেশব্যাপী বিক্ষোভ উপস্থিত হ'ল। প্রফুল্ল চাকী পুলিশের হাতে ধরা না দিয়ে আত্মহত্যা করেন। বিচারে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়। ঐ হত্যাকাণ্ডের পরই পুলিশ কলকাতার মাণিকতলায় এক বোমা তৈয়ারীর কার-খানা আবিষ্কার করে ও ২রা জুন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র দাস, নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, কানাইলাল দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতিকে গ্রেপ্তার করে। অরবিন্দ ঘোষকেও ঐ দিন তাঁর গ্রে ষ্ট্রীটস্থ ভবনে গ্রেপ্তার করা হয়। আলীপুর বোমার মামলা বিখ্যাত রাজনৈতিক মামলাগুলির মধ্যে একটি; এক বছর ধরে এ মামলা চলেছিল। কিন্তু এই মামলার মধ্যে আরো কয়েকটি হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়। সত্যেন্দ্রনাথ ও কানাইলাল গুপ্তকথা প্রকাশের আশঙ্কায় রাজ-সাক্ষী নরেন গোঁসাইকে নিহত করে ও জেলের মধ্যে স্বতন্ত্র বিচারে উভয়েরই ফাঁসি হ'য়ে যায়। সরকার পক্ষে বোমার মামলা পরিচালনা করতে আরম্ভ করেন সরকারী উকীল আশুতোষ বিশ্বাস। তিনিও ১৯০৯, ১০ই ফেব্রুয়ারী বিপ্লবীদের হস্তে প্রাণ দিলেন। দু'মাস পরে একজন দারোগাও নিহত হলেন। সার্ এণ্ড্রু ফ্রেজারের উপর দ্বিতীয় বার আক্রমণ হয় ১৯০৮, ৭ই নবেম্বর।

অরবিন্দের পক্ষে মোকদ্দমা পরিচালনা করেছিলেন ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাশ। মামলায় অরবিন্দ মুক্তিলাভ করেন। চিত্তরঞ্জন দাশ মামলা পরিচালনায় স্বল্প পারিশ্রমিকে যেরূপ কঠোর পরিশ্রম করেন, জেরায় ও ছলজবাবে যেরূপ কৌশল ও কৃতিত্ব দেখান তাতে তাঁর খ্যাতিও এ সময় থেকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। অন্যান্যদের মামলা হাইকোর্ট পর্য্যন্ত গড়ায় ও বারীন্দ্র, উপেন্দ্র-নাথ প্রভৃতির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। অন্যান্যদেরও কঠোর শাস্তি হ'ল। হাইকোর্টে সরকার পক্ষে মোকদ্দমা তদ্‌বির করতেন পুলিশের ডেপুটি সুপারি-ণ্টেণ্ডেণ্ট সমসুল আলম; তিনিও গুলীর আঘাতে নিহত হয়েছিলেন।

সরকারের দমন-নীতি পূর্ণোদ্যমে চলতে লাগল। নবশক্তি, যুগান্তর, সন্ধ্যা, বন্দেমাতরম্—এ চার খানি কাগজের উপর কর্ত্তৃপক্ষের নজর ছিল অত্যধিক।

প্রথম দু'খানি কাগজের মুদ্রাকরদের যথাক্রমে দু' বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা জরিমানা এবং শেষের দু'খানির উপর ছ' মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা জরিমানা হ'ল। ইতিমধ্যে এক সংবাদপত্র আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই আইনের প্রকোপে সব ক'খানা পত্রিকাই ১৯০৮ সালের মধ্যে উঠে যায়। যে-সব স্থানে স্বদেশীর কেন্দ্র সে-সব স্থানে পিটুনি পুলিশ বসিয়ে অধিবাসীদের নিকট থেকে অতিরিক্ত টেক্স আদায় করা হয়েছিল। বরিশালে মুকুন্দ দাস তিন বছর ও ভবরঞ্জন মজুমদার দেড় বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। রাজদ্রোহের অভিযোগে মৌলবী লিয়াকৎ হোসেনের তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড হ'ল। এইভাবে বঙ্গের সর্ব্বত্র আরও বহু লোক দণ্ডিত হলেন।

বিপিনচন্দ্র পাল ৮ই মার্চ্চ বক্সার জেল থেকে মুক্তিলাভ করেন। এর পরদিন হাওড়া ষ্টেশনে লক্ষাধিক লোক তাঁকে সম্বর্দ্ধনা করে। পূর্ব্ব বছর মাদ্রাজ সফরের সময় তিনি সেখানে একটি জাতীয় দল গঠন করেছিলেন। এই দলের নেতা চিদম্বরম্ পিলে এই নূতন ভাবধারা ব্যাখ্যা ক'রে নানাস্থানে বক্তৃতা করেন। ১২ই মার্চ্চ তাঁকে ও তাঁর সহকর্ম্মী সুব্রহ্মণ্য শিবকে টিনেভেলী-টুটিকোরিনের কর্ত্তৃপক্ষ গ্রেপ্তার করেন। নিম্ন আদালতের বিচারে চিদম্বরমের যাবজ্জীবন ও সুব্রহ্মণ্যের দশ বছর কারাবাসের আদেশ হয়! পরে হাইকোর্ট দণ্ডাদেশ কমিয়ে প্রত্যেকেরই ছ' বছর ক'রে শাস্তি দিলেন।

এই সময় ভারতসচিব লর্ড মর্লি ভারতের আমলাতন্ত্রকে 'চিনভ্নিক' নামে অভিহিত করেন। রুশিয়ার অত্যাচারী শাসক-সম্প্রদায়ের মধ্যে চিনভ্নিক ছিল সেরা। লর্ড মর্লি এই দমন কার্য্যকে বহুবার 'নির্ম্মম', 'বীভৎস' ও 'সমর্থনের অযোগ্য' ব'লে তাঁর ডেসপ্যাচে ও লর্ড মিণ্টোকে লিখিত পত্রে উল্লেখ করেছেন। তিনি সাধারণভাবে এই নিপীড়ন কার্য্যের, বিশেষ উক্ত মোকদ্দমাটির বিষয় উল্লেখ ক'রে বড়লাট লর্ড মিণ্টোকে (১৯০৮, ১৪ই জুলাই) এই মর্ম্মে লেখেন, "রাজদ্রোহ অপরাধের বিচারে যে রকম ভীষণ দণ্ডদান করা হচ্ছে তাতে আমি বড়ই শঙ্কা অনুভব করছি, একথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে। আজ আমি পাঠ করলাম, বোম্বাইয়ে যারা ঢিল ছুঁড়েছিল তাদের প্রত্যেকের এক বছর ক'রে কারাদণ্ড হয়েছে। এ ব্যাপার সত্য সত্যই

বীভৎস। টিনেভেলী-টুটিকোরিনে দণ্ডিত দু' ব্যক্তির একজনের হ'ল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও অন্য জনের দশ বছরের কারাবাস—এসব একেবারেই সমর্থন করা যায় না। আমি কোন মতেই এরূপ বীভৎস ব্যাপারে সম্মতি দিতে পারি না। এরূপ অন্যায় ও নির্ব্বুদ্ধিতা সত্বর প্রতিকারের জন্য আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করছি। আমরা শান্তি শৃঙ্খলা বাজায় রাখব, কিন্তু অতিরিক্ত কঠোরতা অবলম্বিত হ'লে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করা সম্ভব হবে না। পক্ষান্তরে এরূপ কঠোরতায় লোককে বেশী ক'রে বোমার দিকেই আকৃষ্ট করবে।"

ভারত-সরকার ১৯০৮, ৮ জুন তারিখে একদিনের অধিবেশনেই বিস্ফোরক আইন ও সংবাদপত্র আইন ব্যবস্থাপরিষদে পাস করিয়ে নেন। বিস্ফোরক দ্রব্য কারো কাছে পাওয়া গেলে তার দণ্ডের বিধান হ'ল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। সংবাদপত্রের লেখার মধ্যে হিংসাত্মক কর্ম্মে প্ররোচনা থাকলে কাগজ প্রকাশের অনুমতি বাতিল ও ছাপাখানা পর্য্যন্ত বাজেয়াপ্ত করা হবে। এ ছাড়া সম্পাদক মুদ্রাকরেরও কঠোর দণ্ডের বিধান হ'ল। এ আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পূর্ব্বেই সংবাদপত্র শাসন শুরু হয়। মাদ্রাজের 'ইণ্ডিয়া' ও 'স্বরাজ্য', মধ্যপ্রদেশের 'হরিকিশোর', আলীগড়ের 'উর্দ্দু ই-মোয়ালা' ও বোম্বাইয়ের 'হিন্দু স্বরাজ্য', 'বিহারী' ও 'অরুণোদয়' প্রমুখ পত্রিকাগুলির কতক সরকারে বাজেয়াপ্ত হ'ল, অন্য কয়েকটির সম্পাদকের কারাদণ্ড হ'ল।

কিন্তু 'কেশরী'-সম্পাদক বালগঙ্গাধর তিলকের মোকদ্দমার প্রতি সমগ্র ভারতেরই দৃষ্টি নিপতিত হ'ল বেশী ক'রে। মজঃফরপুরের হত্যাকাণ্ডের পরে তিনি 'কেশরী'তে 'দেশের দুর্দ্দৈব', 'এসকল উপায় স্থায়ী নয়', 'বোমার প্রকৃত অর্থ' শীর্ষক কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। বলা বাহুল্য, তিনি এগুলিতে বোমা বর্ষণকারীদের তীব্র নিন্দা করেছিলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সরকারের রুশীয় পদ্ধতির কঠোর সমালোচনা করতেও তিনি ভোলেন নি। এই হয়ত ছিল তাঁর উপর আমলাতন্ত্রের কোপের কারণ। তিলক বোম্বাইয়ে বসে ২৪শে জুন রাজ-দ্রোহের দায়ে ধৃত ও অভিযুক্ত হলেন। হাইকোর্টের দায়রায় একমাস ধরে বিচারের পর ২২শে জুলাই তাঁর ছ' বছর কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা জরিমানার আদেশ হ'ল। জুরিদের মধ্যে ছিলেন সাতজন ইউরোপীয় ও দু'জন পার্শী। পার্শী জুরিদ্বয় তিলককে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করেন। দণ্ডাদেশ

প্রাপ্তির পর তিলক বলেছিলেন—"জুরিরা যদিও আমাকে দোষী ব'লে সাব্যস্ত করেছেন তথাপি আমি নিজেকে নির্দ্দোষ মনে করি। আমি বিশ্বাস করি মানুষের বিচার ক্ষমতার অতীত এক শ্রেষ্ঠ শক্তি দ্বারা জগতের কার্য্য পরিচালিত হ'য়ে থাকে। যে পবিত্র কর্ম্ম সাধনের জন্য আমি চেষ্টা-যত্ন করেছি, আমার দুঃখভোগে তা সিদ্ধির পথে অগ্রসর হবে, হয়ত ভগবানের এ-ই অভিপ্রেত।" তিলকের এবম্বিধ দণ্ডাদেশে ভারতময় বিক্ষোভ উপস্থিত হয়। বোম্বাই কলগুলির শ্রমিকগণ এতই ব্যথিত হয়েছিল যে, তারা ছ' দিন পর্য্যন্ত কাজে যাওয়া বন্ধ রেখেছিল। ভারতবাসীরা এরূপ নিষ্ঠাবান্ দেশ-সেবককে এক বাক্যে 'লোকমান্য' উপাধি দিলে।

অতঃপর ১১ই ডিসেম্বর তারিখে ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদে একদিনের অধিবেশনেই সরকার ফৌজদারী আইন সংশোধন ক'রে হত্যা ও ষড়যন্ত্র অপরাধে ধৃত আসামীদের সরাসরি বিচারে সুবিধা করিয়ে নেন। এই আইনেরই আর একটি ধারায় তাঁরা যে-কোন সমিতিকে সন্দেহবশে বে-আইনী ঘোষণার অধিকার লাভ করেন। এর পরই বরিশালের স্বদেশ-বান্ধব সমিতি, ঢাকার অনুশীলন সমিতি, ময়মনসিংহের সুহৃৎ-সমিতি, কলকাতার অনুশীলন ও অন্যান্য সমিতি বে-আইনী ঘোষিত হয়। এ বছর ফেব্রুয়ারী মাসে অর্দ্ধোদয় যোগ হয়েছিল। কলকাতার বিভিন্ন সমিতির অধীনে স্বেচ্ছাসেবকমণ্ডলী এমন কর্ম্মতৎপরতা প্রদর্শন করে যে, পুলিশও তখন তাদের অজস্র প্রশংসা করে। কিন্তু অতঃপর সরকারের ধারণা হ'ল, এই সব সমিতিই রাজদ্রোহ প্রচারের প্রধান কেন্দ্র। ১৩ই ডিসেম্বরের মধ্যে অশ্বিনীকুমার দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, সুবোধচন্দ্র বসুমল্লিক, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, পুলিনবিহারী দাস ও ভূপেশচন্দ্র নাগ প্রমুখ বঙ্গের ন' জন কর্ম্মীশ্রেষ্ঠ ১৮১৮ সালের তিন আইন অনুসারে ধৃত হ'য়ে বন্দী হলেন। বিক্ষুব্ধ বাংলা যেন শোকে মুহ্যমান হ'ল। বাংলার হৃদয়তন্ত্রীতে এই ব্যাপার এমন প্রচণ্ড আঘাত করলে যে, তখনকার রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক রহিত ধর্ম্মপ্রচারক পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এর প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব ক'রে বাঙালীর মর্ম্মব্যথা প্রকাশ করতেও দ্বিধা বোধ করেন নি।

এরূপ দুর্দ্দিনের মধ্যে ১৯০৮ সালে মাদ্রাজে খণ্ডিত কংগ্রেসের অধিবেশন

হ'ল। কংগ্রেসের অধিবেশনের পূর্ব্বে নূতন ও পুরাতন দলের মধ্যে মিলনের চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু পুরাতনপন্থী ফিরোজ-শা মেহ্‌তার প্রতিবন্ধকতায় সে চেষ্টা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। চরমপন্থীরা কংগ্রেস থেকে দূরে রইলেন। সভাপতি ডক্টর রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় অভিভাষণে সরকারী দমন-নীতির তীব্র প্রতিবাদ করলেও নূতন দলের উপর কটূক্তি বর্ষণ করতে ভোলেন নি। অভিভাষণের শেষে অবশ্য তিনি নবীন সম্প্রদায়কে লক্ষ্য ক'রে বলেন যে, এমন একদিন হয়ত আসবে যখন অগ্রণী যুবকদল মনে করবেন, পুরাতন পন্থীরা তাঁদের সময়ে সাধ্যমত কর্ম্ম করতে চেষ্টা-যত্নের ক্রটি করেন নি।

এবারে কংগ্রেসে নানা প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। বিপ্লবাত্মক কর্ম্ম, সরকারের দমন-নীতি, বিশেষতঃ বিনাবিচারে নেতৃবৃন্দের নির্ব্বাসন প্রভৃতি সম্পর্কে নিন্দাসূচক প্রস্তাব কংগ্রেস গ্রহণ করেন। জোহানেস্‌বার্গ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রেরিত প্রতিনিধি মুশীর হাসান কিদোয়াই দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবাসী ভারতীয়দের দুর্দ্দশা কাহিনী সবিস্তারে বিবৃত করলেন। বক্তৃতার শেষে তিনি বললেন, "একবার আপনারা কল্পনা করুন, চীন সরকার চীন-প্রবাসী ইউরোপীয়দের উপর যদি এরূপ অপমান অত্যাচার করত তা হ'লে ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি কি ব্যবস্থাই-না অবলম্বন করত!"

এবারকার প্রধান প্রস্তাব হ'ল ভাবী মর্লি-মিণ্টো শাসন-সংস্কার সম্পর্কে। লর্ড মর্লি ভারতসচিবের তক্তে বসেই ভারতবর্ষের শাসন-সংস্কারের দিকে মনঃসংযোগ করেন। তিনি ১৯০৭ ২৬শে আগষ্ট ইণ্ডিয়া কৌন্সিলে সিভিলিয়ান কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত ও সৈয়দ হোসেন বিলগ্রামিকে সদস্যরূপে গ্রহণ করেন। শাসন-সংস্কার বিষয়ে বড়লাট লর্ড মিণ্টোরও পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। মর্লির অনুমতি নিয়ে তিনিই এদিকে কার্য্য আরম্ভ করেন। তিনি শাসন-পরিষদের কয়েক জন সদস্যের উপর একটি নূতন শাসন-তন্ত্র প্রণয়নের ভার দেন। তাঁরা পৃথক্ নির্ব্বাচনের ভিত্তিতে শাসন-তন্ত্র প্রণয়ন ক'রে ভারতসচিবের নিকট পাঠান। লর্ড মর্লি কিন্তু পৃথক্ নির্ব্বাচনে আদৌ পক্ষপাতী ছিলেন না। তবে স্থানীয় কর্ত্তাদের আগ্রহ দেখে তিনি সংযুক্ত ও পৃথক্—এর মাঝামাঝি এই নূতন ধরণের নির্ব্বাচন প্রণালী সন্নিবিষ্ট ক'রে শাসন-সংস্কারের প্রস্তাব বড়লাটের নিকট ফের পাঠান। পুরাতন পন্থী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত মদন-

মোহন মালবীয়, আর এন মুধোলকার, লালা হরকিষণ লাল প্রভৃতি কংগ্রেসের একটি প্রস্তাবে মর্লির ডেস্‌প্যাচ সমর্থন করলেন। কংগ্রেসের উদীয়মান নেতা মহম্মদ আলী জিন্না এই ডেস্‌প্যাচের মধ্যেই হিন্দু-মুসলমানে ঐক্য স্থাপনের উপায় ও জাতির ভবিষ্যৎ মুক্তির সন্ধান পান।

কিন্তু তখনকার দিনের মুসলমান প্রধানগণ, বিশেষতঃ যাঁরা আমলাতন্ত্রের পরামর্শে লর্ড মিণ্টোর নিকট পৃথক্ নির্ব্বাচনের এবং বিশেষ সুযোগ সুবিধার আবেদন জানিয়েছিলেন তাঁরা কিছুতেই মর্লির প্রস্তাবে রাজী হলেন না। মর্লিকে পৃথক্ নির্ব্বাচনে সম্মত করাবার জন্য তাঁদের এক প্রতিনিধি দল লণ্ডনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এতে ফলোদয় না হওয়ায় বিলাতে ও ভারতবর্ষে এ নিয়ে আন্দোলন শুরু হ'ল। ১৯০৬ সালে ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় যে মোস্‌লেম শিক্ষা সম্মেলন হয় তাতে মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জন্য একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রস্তাব হয়েছিল। পর বছর ডিসেম্বর মাসে করাচী অধিবেশনেও এ সম্বন্ধে পরামর্শ হয় ও নেতারা মিলে একটি গঠন-তন্ত্র রচনা করেন। ১৯০৮ সালের মার্চ্চ মাসে লক্ষ্ণৌ সহরে একটি সভায় গঠন-তন্ত্র গৃহীত হ'ল। প্রকৃত প্রস্তাবে মোস্‌লেম লীগের প্রথম অধিবেশন হ'ল ঐ সালের ডিসেম্বরে অমৃতশহরে; আর এতে সভাপতিত্ব করলেন পূর্ব্বোক্ত স্মারকলিপির অন্যতম রচয়িতা সার্ সৈয়দ আলী ইমাম। মুসলমানদের রাজভক্তি প্রকাশ এবং মুসলমান সমাজ ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের মধ্যে উদ্ভূত ভুল ধারণা দূর ক'রে পরস্পরের মধ্যে প্রীতি স্থাপন মোস্‌লেম লীগের প্রথম উদ্দেশ্য ব'লে বর্ণিত হ'ল। উদ্দেশ্যের দ্বিতীয় অংশে মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় ও অন্যবিধ অধিকার রক্ষা ও তাদের প্রয়োজন ও অভাব-অভিযোগের কথা মোলায়েম ভাবে ব্যক্ত করার কথা হ'ল। তবে এই দুটি উদ্দেশ্য বজায় রেখে আবশ্যকমত ভারতবর্ষের অন্যান্য সমাজের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনও লীগ কর্ত্তব্য ব'লে গণ্য করলেন। সৈয়দ আলী ইমাম কংগ্রেসের উদ্দেশ্য (স্বরাজ বা স্বায়ত্ত-শাসন লাভ) খুবই প্রগতিশীল ও তৎকালে অনুষ্ঠিত নানারূপ অনাচারের উত্তেজক ব'লে মুসলমান সমাজের গ্রহণযোগ্য মনে করেন নি। তবে তিনি অভিভাষণে কংগ্রেসের বিবিধ দাবি—যেমন শাসন-বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ আলাদা করা, সৈন্যব্যয় হ্রাস, উচ্চ পদে ভারতীয় নিয়োগ প্রভৃতি সমর্থন করেন। ভাবী শাসন-সংস্কারে পৃথক্ নির্ব্বাচনের দাবি

পূরণ করা না হ'লে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে জোর আন্দোলন চালান হবে—এরূপ হুমকি দেখাতেও কিন্তু সভাপতি ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ভোলেন নি! বড়লাট লর্ড মিণ্টো ও ভারতগবর্ণমেণ্ট তথা বিরাট্ আমলা-তন্ত্র যখন পৃথক্ নির্ব্বাচন প্রথার পক্ষে, তখন একা লর্ড মর্লির বিরোধিতায় কি আসে যায়? বস্তুতঃ সমবেত সমর্থনের সম্মুখে মর্লির বিরোধিতা বানের জলের মুখে শুক্‌নো পাতার মত কোথায় যেন ভেসে গেল! ১৯০৯ সালের ২৫শে মে তারিখে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে পৃথক্ নির্ব্বাচন পদ্ধতি সহ ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদ আইন বিধিবদ্ধ হ'ল। আর একে কার্য্যকর করার জন্য নিয়ম রচনার ভার পড়ল ঐ আমলাতন্ত্রেরই উপর। কাজেই পরবর্ত্তী ১৫ই নবেম্বর যখন ঐ সব প্রকাশিত হ'ল তখন মডারেটরাও ধৈর্য্য ধারণ করতে পারলেন না।

নির্ব্বাচক মণ্ডলী চার ভাগে বিভক্ত হ'ল-(১) সাধারণ (২) জমিদার (৩) মুসলমান ও (৪) বিশেষ। জমিদার ও মুসলমান ছাড়া হিন্দু জনসাধারণ এবারেও প্রত্যক্ষ নির্ব্বাচনের অধিকার পেলে না। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি, বণিক্ সমাজ, বিশ্ববিদ্যালয়, করপোরেশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের উপর প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের ভার অর্পিত হ'ল। তবে আগের চেয়ে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় প্রতিবারেই প্রত্যেক বিভাগের মিউনিসিপ্যালিটি ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডই সদস্য নির্ব্বাচনের অধিকার পেলে। জমিদার ও বিশেষ শ্রেণীর নির্ব্বাচক মণ্ডলীতে হিন্দু ও মুসলমানের ভোটাধিকারের তারতম্য করা হ'ল। একজন হিন্দু বছরে পাঁচ হাজার টাকা রাজস্ব দিলে তবে তার ভোটাধিকার জন্মাত, আর একজন মুসলমান বছরে সাড়ে সাত শ' টাকা দিলেই ভোট দিতে পারত! হিন্দু আয়কর দিলে ভোটদানের অধিকারী হ'ত না, মুসলমান আয়কর দিলে ভোটদানের অধিকারী হ'ত। অবসরপ্রাপ্ত মুসলমান রাজকর্ম্মচারী, মুসলমান অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটরাও ভোটদানের অধিকার পেলেন। ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্যদের ক্ষমতা আগের চেয়ে কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হ'ল। বজেটের উপর ভোটদানের অধিকার এবারেও স্বীকৃত হয় নি, কিন্তু বজেট আলোচনার সময় বাড়িয়ে দেওয়া হ'ল। পরিষদে বজেট উপস্থিত করার পূর্ব্বে রাজস্ব-সচিব রাজস্ব সম্বন্ধে একটি বিবৃতি প্রদান করবেন স্থির হ'ল। এই বিবৃতির অংশ-বিশেষের উপর সদস্যগণ প্রস্তাব উত্থাপনের অধিকার পান। প্রস্তাব অধিকাংশের

ভোটে গৃহীত হ'লেও সরকার তা গ্রহণ করতে বাধ্য নন। তবে এ সম্বন্ধে তাঁরা বিবেচনা করবেন এরূপ নির্দ্দেশ দেওয়া হ'ল। অন্যান্য প্রস্তাব সম্বন্ধেও এই একই ধারা প্রযোজ্য। প্রশ্ন জিজ্ঞাসার অধিকারও প্রসারিত করা হয়। প্রশ্নের উত্তর অসন্তোষজনক হ'লে অতিরিক্ত প্রশ্ন করার অধিকারও প্রশ্নকারী সদস্য লাভ করেন। প্রাদেশিক পরিষদগুলির বে-সরকারী সদস্যগণ ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদের বে-সরকারী সদস্যদের নির্ব্বাচন করতেন। ভারতীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপরিষদগুলির সদস্য সংখ্যা তিন শ্রেণীর—নির্ব্বাচিত, মনোনীত বে-সরকারী, মনোনীত সরকারী। প্রত্যেক পরিষদেই স্থানীয় শাসনকর্ত্তা (বড়লাট, ছোটলাট প্রভৃতি) সভাপতিত্ব করবেন স্থির হয়। নির্ব্বাচিত, মনোনীত ও সরকারী সদস্য এবং মোট সংখ্যার ফিরিস্তি এখানে দিলাম,

পরিষদ	নির্ব্বাচিত	মনোনীত	সরকারী	মোট সংখ্যা
ভারতবর্ষ	২৫ (২৭)	৭ (৫)	৩৬	৬৮
মাদ্রাজ	১৯ (২১)	৭ (৫)	২০	৪৬
বোম্বাই	২১	৭	১৮	৪৬
বঙ্গদেশ	২৬ (২৮)	৫ (৪)	২০	৫১ (৫২)
সংযুক্ত প্রদেশ	২০ (২১)	৬	২০	৪৬ (৪৭)
পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম	১৮	৫	১৭	৪০
পঞ্জাব	৫ (৮)	৯ (৬)	১০	২৪
ব্রহ্মদেশ	১	৮	৬	১৫
বিহার ও উড়িষ্যা	(২১)	(৪)	(১৮)	(৪৩)
আসাম	(১১)	(৪)	(৯)	(২৪)

বঙ্গবিভাগ রহিত হ'লে ১৯১২ সালে যে নূতন ব্যবস্থা হয় তদনুসারে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হ'ল।

এ সময়ে বড়লাট বা গবর্ণরের শাসনপরিষদেও একাধিক ভারতীয় সদস্য গ্রহণের কথা হয়। এর পূর্ব্বে ১৯০৯, ২৪শে মার্চ্চ বড়লাটের শাসনপরিষদে এড্‌ভোকেট জেনারেল সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ আইন-সদস্য নিযুক্ত হন। আশ্চর্য্যের বিষয়, লর্ড রিপণ শাসনপরিষদে ভারতীয় সদস্য নিয়োগের প্রবল বিরোধিতা

করেন। সৈয়দ আমীর আলীও এই সময় প্রিভি কৌন্সিলের অন্যতম বিচারপতি নিযুক্ত হলেন।

নূতন শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তনের কথা চলেছিল কয়েক বছর ধরেই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সরকারের দমন-নীতিও প্রবলভাবে দেখা দেয়। ১৯০৯ সালে যখন শাসন-সংস্কার আসন্ন তখনও দমন-নীতির প্রকোপ প্রশমিত হয় নি। ১৯০৮ সালে মহারাষ্ট্রে গণেশ দামোদর সভারকর 'লঘু অভিনব ভারতমেলা' নামে একখানা কবিতা পুস্তক প্রকাশিত করেন। তিনি এজন্য অভিযুক্ত হন। বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারে কবিতাগুলি রাজদ্রোহসূচক বিবেচিত হ'ল ও গণেশ দামোদর ১৯০৯, ৯ই জুন যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হলেন। গণেশ দামোদর কনিষ্ঠ বিনায়ক দামোদর সভারকরের সঙ্গে ১৮৯৯ সালে গণপতি-উৎসবের সময় 'ভারত-মেলা' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৬ সালে ভারত-মেলার নাম দেওয়া হ'ল অভিনব ভারত সোসাইটি। ১৯০৫, জানুয়ারী মাসে শ্যামজী কৃষ্ণবর্ম্মা লণ্ডনে ইণ্ডিয়ান হোমরুল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। 'ইণ্ডিয়ান সোশিওলজিষ্ট' নামে এক আনা মূল্যের একখানা পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। তিনি দু' হাজার টাকা মূল্যের তিনটি বৃত্তি দিয়ে ভারতীয় যুবকদের বিলাতে শিক্ষালাভের সুবিধা ক'রে দেন। বিনায়ক দামোদর সভারকর ১৯০৬ সালে পুণার ফার্গুসন কলেজ থেকে বি-এ পাস ক'রে ঐ বৃত্তি নিয়ে বিলাত যান। তিনি ম্যাট্‌সিনির আত্মজীবনী মারাঠীতে অনুবাদ করেন ও দাদাকে দিয়ে পুণা থেকে প্রকাশিত করান। তিনি 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম, ১৮৫৭' নামে ইংরেজীতে একখানা পুস্তকও লেখেন। গণেশ দামোদরের নির্ব্বাসনে শ্যামজীর শিষ্যেরা ক্রুদ্ধ হ'য়ে এর প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর হয়। মদনলাল ধিংরা বিলাতে বসে ১৯০৯, ১লা জুলাই স্যর্ উইলিয়ম কার্জ্জন ওয়াইলিকে নিহত করে। ওয়াইলিকে বাঁচাতে গিয়ে ডাঃ লালকাকা নামে একজন ভারতীয়ও মারা যান। বিচারে ধিংরার মৃত্যুদণ্ড হ'ল। অভিনব ভারত সোসাইটির অন্যান্য সভ্যগণ নাসিকের ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জ্যাকসনকে গুলি ক'রে হত্যা করে। অভিনব সোসাইটি ও তার শাখাগুলি অতঃপর ছত্রভঙ্গ ক'রে দেওয়া হ'ল ও সভ্যগণ অনেকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হ'ল। বিনায়ক ধৃত হ'য়ে বোম্বাইয়ে প্রেরিত হন ও বিচারে তাঁর দণ্ড হয় যাবজ্জীবন

নির্ব্বাসন। আহ্‌মদাবাদের বড়লাট লর্ড মিণ্টোর উপরেও এই সময় বোমা বর্ষিত হয়।

এই অবস্থার মধ্যে লাহোরে খণ্ডিত কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন হ'ল। উপস্থিত প্রতিনিধি সংখ্যা এবারে আড়াইশ'ও হয় নি। এবারকার অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হন লালা হরকিষণ লাল ও মূল সভাপতি পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়। দু'জনেই শাসন-সংস্কারের নিন্দায় পঞ্চমুখ হলেন। সুরেন্দ্রনাথ শাসন-সংস্কার সম্পর্কিত প্রস্তাব উত্থাপন ক'রে বললেন, "এ কথা এতটুকুও অতিরঞ্জিত নয় যে, নিয়ম-পত্রে মর্লি-মিণ্টো শাসন-সংস্কারকে একেবারে বধ করা হয়েছে। কারা এরূপ ক্ষতি করেছে? কারাই বা একটি সুন্দর ব্যবস্থাকে এরূপ নির্ম্মমভাবে পঙ্গু ক'রে দিয়েছে? আমলাতন্ত্রই এজন্য ষোল আনা দায়ী। আমরা এই সামান্য সুযোগ সুবিধার জন্যও যে কঠোর সাধনা করেছি তার প্রতিশোধ নেবার নিমিত্তই কি তারা এরূপ করলে?"

সৈয়দ আলী ইমামের ভ্রাতা সৈয়দ হাসান ইমাম পৃথক্ নির্ব্বাচনের দোষ ত্রুটি প্রদর্শন ক'রে বক্তৃতা করলেন। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের অভিমত বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ ও জনসাধারণকে জ্ঞাপন করবার জন্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভূপেন্দ্রনাথ বসুকে প্রেরণের প্রস্তাব করা হ'ল।

আঁধারে আলো

(১৯১০-১৯১৫)

কংগ্রেসের প্রতিবাদে কোন ফল হ'ল না। নূতন নিয়ম সম্বলিত মর্লি-মিণ্টো শাসন-সংস্কার ১৯১০, ২৫শে ডিসেম্বর ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত হ'ল। এর পূর্ব্বদিন কলকাতায় ডেপুটি পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শামসুল আলম জনৈক আততায়ীর গুলিতে মারা গেলেন। বড়লাট লর্ড মিণ্টো ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদ উন্মোচন কালে বললেন, শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হ'লেও এ প্রকার অনাচার তিনি কঠোর হস্তে দমন করবেন। পরবর্ত্তী ৯ই ফেব্রুয়ারী তিন আইনে বন্দী বঙ্গ-সন্তানগণ মুক্তি পেলেন। কিন্তু ঐ দিনই পরিষদের নিয়মাদি স্থগিত রেখে সরকার প্রেস আইন পাস করিয়ে নেন। আগেকার আইনগুলির চেয়ে এর ক্ষেত্র হ'ল বহুব্যাপক। এই আইন অনুসারে নূতন মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠাকালে মুদ্রাকরকে অন্যূন পাঁচ শ' ও অনধিক দু' হাজার টাকা সরকারে অগ্রিম জমা দিতে হ'ত! সংবাদপত্রে আপত্তিকর জিনিস প্রকাশিত হ'লে প্রথমে এক হাজার টাকা থেকে দশ হাজার টাকার মধ্যে জরিমানা আদায়ের বিধি ছিল। এর পরেও আপত্তিকর ব্যাপার পত্রস্থ করলে কাগজখানি ও মুদ্রাযন্ত্র একেবারে বাজেয়াপ্ত হ'য়ে যেত। ১৯১০-১৯১৯, এই দশ বছরেরর মধ্যে এই আইন বলে ৩৫০টি মুদ্রাযন্ত্র, ৩০০ খানা সংবাদপত্র ও ৫০০খানা বই বাজেয়াপ্ত হয়। অমৃতবাজার পত্রিকা, বম্বে ক্রনিকেল, হিন্দু, ট্রিবিউন, পাঞ্জাবী প্রভৃতি ইংরেজী ও বসুমতী, স্বদেশমিত্রম্, বিজয়া, ভারতমিত্র প্রভৃতি দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্রগুলি এ আইনের কবলে পড়ে দণ্ডিত হয়েছিল। ডায়ার্কির আমলে এ আইন তুলে দেওয়া হয়।

লোকের সাধারণ সভা-সমিতি করার তো জো নেই, সংবাদপত্রে বা পুস্তক-পুস্তিকায় মনের ক্ষোভ ও বেদনার কথা প্রকাশ করাও আত্মহত্যারই সামিল। এ সময় এক দল তরুণ আবার আঁধারে পথ খুঁজতে লাগল। ডাকাতি ও নর-

হত্যার হিড়িক পড়ে গেল। এ সময় যত রকম ডাকাতি ও নরহত্যা বা তার চেষ্টা হয় প্রায় সকলই রাজনীতির সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত ব'লে সন্দেহ করা হ'ল। হাওড়া ও ঢাকার ষড়যন্ত্র মামলা এ বছরের দুটি প্রধান রাজনৈতিক মোকদ্দমা। প্রথমটিতে বহু লোক দণ্ডিত হ'ল। দ্বিতীয়টিতে চুয়াল্লিশ জন জড়িয়ে পড়লেও পনের জনের কঠোর কারাদণ্ড হয়। এর ভিতরে ঢাকা অনুশীলন-সমিতির নায়ক, তিন আইনের ভূতপূর্ব্ব বন্দী পুলিনবিহারী দাসও ছিলেন। তাঁর দণ্ড হ'ল সাত বছর। তিনি আন্দামানে প্রেরিত হলেন।

শাসনকাল পূর্ণ হবার পূর্ব্বেই লর্ড মিণ্টো কার্য্যে ইস্তফা দিয়ে বিলাত চলে যান। বড়লাট ও ভারতসচিবের মধ্যে ভারত-শাসনে অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে মতদ্বৈধতা হেতুই মিণ্টো পদত্যাগ করেন। ১৯১০ সালের নবেম্বর মাসে লর্ড হার্ডিঞ্জ ভারতবর্ষে বড়লাট হ'য়ে আসেন। রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড এ সময়ে মারা যান।

এবার কংগ্রেস হ'ল এলাহাবাদে। ভারত-বন্ধু সার্ উইলিয়ম ওয়েডারবর্ণ এবারে সভাপতিপদে বৃত হন। তিনি দুটি প্রধান উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতবর্ষে আগমন করেন—হিন্দু ও মুসলমানের ভিতরের ক্রমবর্দ্ধমান বিভেদ দূরীকরণ ও কংগ্রেসের চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যে বিরোধের মীমাংসা। অভিভাষণেও তিনি একথা ব্যক্ত করলেন। তাঁর মতে কংগ্রেসের কর্ম্মপদ্ধতি ত্রিবিধ হওয়া উচিত—প্রথম, ভারতে জনমত গঠন ও ভারতবাসীকে রাজনৈতিক শিক্ষাদান, দ্বিতীয়—গবর্ণমেণ্টকে অভাব-অভিযোগ জ্ঞাপন, তৃতীয়—বিলাতে প্রচারকার্য্য। তিনি আরও বললেন যে, ইংরেজ ও ভারতবাসী একযোগে কার্য্য করলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ("ইউনাইটেড ষ্টেট্স্ অফ ইণ্ডিয়া") প্রতিষ্ঠায় দীর্ঘকাল বিলম্ব হবে না। এবারকার অধিবেশনে সর্ব্বসমেত ত্রিশটি প্রস্তাব গৃহীত হ'ল, কিন্তু নূতন ভাব-ধারার পরিপোষক কোন নির্দ্দেশই তাতে মিলল না। সভাবন্ধ আইন, প্রেস আইন প্রভৃতি দ্বারা ভারতবাসীর কণ্ঠরোধ করা হয়েছে। কংগ্রেস এর প্রতিবাদ করলেন, কিন্তু এর প্রতিষেধ কল্পে কোন আইনসঙ্গত উপায় তাঁরা বাৎলে দিলেন না। এ সময় আবার ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতিতেও পৃথক্ নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তনের কথা হ'ল। মহম্মদ আলী জিন্না এক প্রস্তাবে এই আত্মঘাতী নীতির তীব্র প্রতিবাদ করলেন। সভাপতি সার্

উইলিয়মের চেষ্টা সত্ত্বেও চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যে মিলন সংঘটিত হ'ল না। তিনি এলাহাবাদে ১৯১১, ১লা জানুয়ারী হিন্দু-মুসলমান নেতৃবৃন্দের এক সম্মিলিত বৈঠক আহ্বান করেন। বৈঠকে উভয়ের মধ্যে বিভেদের কারণগুলিই মাত্র নির্নীত হ'ল।

১৯১১ সালে আবার বিপ্লবাত্মক কর্ম্ম নানাদিকে অনুষ্ঠিত হ'তে লাগল। পূর্ব্বেকার সভাবন্ধের আইনের মেয়াদ ছিল মাত্র তিন বছর। ১৯১০, নবেম্বর মাসে মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে ব্যবস্থাপরিষদের সদস্যগণ এ আইনটি যাতে একেবারে রদ হ'য়ে যায় তার চেষ্টা করেন। কিন্তু আমলাতন্ত্রের মতিগতি বিচিত্র। ১৯১১ সালের মার্চ্চ মাসে পূর্ব্ব আইন তুলে দিয়ে আবার কিঞ্চিৎ সংশোধিত আকারে সভাবন্ধ আইন পাস করিয়ে নিলে! বলা বাহুল্য, বে-সরকারী সদস্যগণ এর ঘোর প্রতিবাদ করেছিলেন।

মর্লি-মিণ্টো শাসন-সংস্কারে মডারেটরাও খুশি হ'তে পারেন নি। কাজেই প্রগতিশীল রাজনীতিকগণ, মায় যুবক সমাজ. এ ভূয়ো সংস্কারে সন্তুষ্ট হ'তে পারবেন না তা তো জানা কথা। দমন-নীতি মূলক আইন প্রণয়ণে ও তার ব্যাপক প্রয়োগেও শিক্ষিত জনের অসন্তোষ বেড়ে গেল। তবে বিপ্লবাত্মক কর্ম্ম বন্ধ করার জন্যই ঐ সকল ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় ব'লে সরকার পক্ষে ঘোষিত হয়েছিল। দমনমূলক এতগুলি আইন সত্ত্বেও কিন্তু ১৯১১ সালে ১৮টা, ও ১৯১২ সালে ১৩টা ডাকাতি ও নরহত্যা বা তার চেষ্টা হয়। ১৯১৩-১৬ সালের মধ্যে আবার বিপ্লবাত্মক কর্ম্মের প্রকোপ বাড়ে।

১৯১১, ডিসেম্বর মাসের প্রথম ভারতসচিব লর্ড ক্রুকে সঙ্গে নিয়ে রাজা পঞ্চম জর্জ্জ ও রাণী মেরী ভারতবর্ষে আগমন করেন। রাজা-রাণীর আগমন উপলক্ষে ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীতে এক দরবার অনুষ্ঠিত হয়। রাজা পঞ্চম জর্জ্জ একটি রাজকীয় ঘোষণায় বঙ্গভঙ্গ রদ করলেন এবং পশ্চিম ও পূর্ব্ববঙ্গের বাংলাভাষী অংশসমূহকে এক বঙ্গভুক্ত করার আদেশ দিলেন। ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরের কথাও ঐ ঘোষণায় উল্লিখিত হয়। এবারে প্রাকৃতিক বাংলাকে যে আবার নূতন ক'রে ভঙ্গ করা হ'ল একথা আনন্দের আতিশয্যে তখন কারো চোখে পড়ল না। তবে বাঙালী সাধারণ এতদিনের অনুষ্ঠিত অন্যায়ের প্রতিকারে কতকটা আশ্বস্ত হ'ল। রাজধানী

স্থানান্তরিত করায় কিন্তু তারা মোটেই খুশি হ'তে পারলে না। এ বিষয় এবারকার কলকাতা কংগ্রেসের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ভূপেন্দ্রনাথ বসুও তাঁর অভিভাষণে ব্যক্ত করেন। অত্যগ্রসর দল কিন্তু সরকারের অতিবিলম্বিত ভ্রমসংশোধনে নিজ কর্ম্মপন্থা থেকে নিরস্ত হ'ল না, তাদের প্রচুর শক্তি অপ্রকাশ্য অলিগলিতে গুপ্ত কর্ম্মে নিয়োজিত হ'তে লাগল। দমন-নীতিও সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলল।

কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে সভাপতি হওয়ার কথা ছিল শ্রমিক নেতা ও পরবর্ত্তীকালে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী মিঃ রাম্‌সে ম্যাক্‌ডনাল্ডের। কিন্তু এ সময় তাঁর পত্নী-বিয়োগ হওয়ায় শেষ মুহূর্ত্তে এ ব্যবস্থার বদল করতে হ'ল ও লক্ষ্ণৌর নেতা পণ্ডিত বিষণনারায়ণ ধরের উপর এ কার্য্য নির্ব্বাহের ভার পড়ল। বিষণনারায়ণ অভিভাষণের প্রথমেই 'ইণ্ডিয়ান মিরর' সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন ও 'অমৃতবাজার পত্রিকা' সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন। তিনি একস্থলে বলেন, আমলাতন্ত্র জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা দাবিয়ে রাখবার জন্য যে-সব নীতি অনুসরণ করে তার ফলেই দেশে অশান্তির সৃষ্টি হয়। তিনি নূতন ভাব-ধারাকে সমর্থন ক'রে বলেন, "আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক করতে হ'লে সম্প্রদায়গত স্বার্থ রক্ষার বদলে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে জাতীয় আদর্শেই চালিত হওয়া উচিত। আগ্রহাতিশয্য, আদর্শবাদ, এমনকি অসম্ভবকে লাভ করার উৎকট আকাঙ্ক্ষাও কখনও কখনও ভাল। আদর্শবাদী, নূতনের পূজারীদের সঙ্গেই আমার অধিকতর সহানুভূতি, কারণ আমি জানি প্রত্যেক সংস্কার প্রয়াসী প্রতিষ্ঠানে একদল চরমপন্থী থাকা আবশ্যক। জগতের প্রত্যেক বড় কার্য্যেই এদের প্রয়োজনীয়তা আছে। ধীর পন্থা অবলম্বনে অনেক সময় অতিরিক্ত সতর্কতার সঙ্গে ভীরুতা ও ঔদাসীন্য এসে পড়ে। আমার মতে ভারতবর্ষে এখন এমন এক দল সাহসী ও উদ্যমশীল লোকের প্রয়োজন—যাঁরা অল্পেই সন্তুষ্ট হবেন না ; এমন লোক চাই যাঁরা দেশের সেবায় একেবারে মরিয়া হ'য়ে উঠবেন।"

কিন্তু প্রেস আইন, সভাসমিতি আইন ও অন্যান্য দমন-নীতি মূলক আইনের জন্য ভারতের কর্ম্মশক্তি অবরুদ্ধ। এ আইনগুলির বিরুদ্ধে কংগ্রেসে যথারীতি প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। কিন্তু আমলাতন্ত্র অনড়, তারা এতে কর্ণপাতও করলে না।

বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার পরে ১৯১২ সালের মার্চ্চ মাসে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ যুক্তবঙ্গকে একটি সকৌন্সিল গবর্ণরের প্রদেশে পরিণত করেন। বিহার-উড়িষ্যা ও আসামকে দু'টি স্বতন্ত্র প্রদেশ করা হ'ল। রাজধানীও যথারীতি দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়। এ সময় ভারতে, বিশেষ ক'রে বঙ্গে ও পঞ্জাবে যুবকগণ বিপ্লবাত্মক কর্ম্মে লিপ্ত হ'য়ে পড়ে ও স্থানে স্থানে হত্যা-চেষ্টাও চলতে থাকে। লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৯১২, ২৩শে ডিসেম্বর রাজকীয় আড়ম্বরে শোভাযাত্রা ক'রে হস্তী-পৃষ্ঠে নূতন রাজধানী দিল্লীতে যখন প্রবেশ করেন ঠিক সেই সময় তাঁর উপর বোমা নিক্ষিপ্ত হয় ও তিনি আহত হন। ১৯১৩, মার্চ্চ মাসেই কর্ত্তৃপক্ষ ব্যবস্থা-পরিষদে ফৌজদারী আইন সংশোধন করান। অতঃপর ষড়যন্ত্রকে একটি বিশেষ ধারাবদ্ধ অপরাধ ব'লে গণ্য করা হ'ল। লর্ড হার্ডিঞ্জকে হত্যার চেষ্টা হেতু দিল্লীতে এক ষড়যন্ত্র মামলা রুজু হয় ও অপরাধীরা কঠোরদণ্ডে দণ্ডিত হয়। বিচারে দু' জনের ফাঁসি ও দু' জনের সাত বছর ক'রে সশ্রম কারাদণ্ড হ'ল। গবর্ণমেণ্ট রাসবিহারী বসুকে পঞ্জাবে বিপ্লব-কর্ম্মের নায়ক ব'লে উল্লেখ করেছেন। রাসবিহারী এই মামলায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। কিন্তু তাঁকে কেউ ধরতে পারলে না। ছদ্মবেশে নানাস্থান ঘুরে তিনি জাপান চলে যান। রাসবিহারী বসু জাপান-সরকারে একটি উচ্চ দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

লর্ড হার্ডিঞ্জ স্বদেশে ও বিদেশে ভারতবাসীর স্বার্থরক্ষায় বিশেষ অবহিত ছিলেন। সরকারী উচ্চ পদগুলিতে ভারতবাসীরা যোগ্য হ'লেও নিযুক্ত হতেন খুবই কম। এসব পদ ভারতীয়দের অধিগম্য করবার জন্য কংগ্রেস দীর্ঘকাল আন্দোলন করেন। এবারে, লর্ড হার্ডিঞ্জের আমলে এসম্বন্ধে অনুসন্ধান ও উপায় নির্দ্ধারণের জন্য লর্ড ইস্‌লিংটনের সভাপতিত্বে এগার জন সভ্য নিয়ে একটি রয়্যাল কমিশন গঠিত হ'ল। এতে ভারতীয় সদস্য ছিলেন তিন জন—গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে, আব্‌দার রহিম ও চৌবল। রাম্‌সে ম্যাক্‌ডনাল্ড ও লর্ড রোনাল্ডশে কমিশনের সদস্য ছিলেন। কমিশন দু' বার ভারতবর্ষ পরি-ভ্রমণ ক'রে ১৯১৫ সালের আগষ্ট মাসে সরকারে এক রিপোর্ট পেশ করেন। যুদ্ধের জন্য রিপোর্ট প্রকাশ দু' বছর পর্য্যন্ত স্থগিত থাকে। ইতিমধ্যে গোখ্‌লে মারা যাওয়ায় কমিশনে তাঁর মতামত যুক্ত হ'তে পারে নি।

এ সময়ে ভারতবর্ষের আভ্যন্তরিক ও আন্তর্জাতিক অবস্থা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মিলনের পক্ষে খুবই অনুকূল হ'ল। বঙ্গভঙ্গের সময় সপক্ষে টানবার জন্য মুসলমানদের নানা রকম বিশেষ সুবিধার প্রলোভন দেখান হয়। কিন্তু পৃথক্ নির্ব্বাচন বাদে আর কোন সুযোগ-সুবিধা তাদের বরাতে জুটল না। মহম্মদ আলী জিন্না, হাসান ইমাম, ওয়াজির হাসান, মজহ্‌রুল হক্, মৌলানা মহম্মদ আলী প্রভৃতি জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ পৃথক্ নির্ব্বাচনের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। উচ্চ রাজপদেও মুসলমানরা বিশেষ কোনই সুবিধা পেলে না। সরকারী বিভাগগুলি হিন্দু-মুসলমান উভয়ের পক্ষেই সমান দুর্ভেদ্য। বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ায় তাদের অতিরিক্ত সুখ-সুবিধার আশাও আর রইল না। ওদিকে তুরস্কের উপর ইউরোপীয় শক্তিবর্গ এক যোগে চেপে বসল। তুরস্কের নাম দেওয়া হয়েছিল 'ইউরোপের রুগ্ন মনুষ্য'। এই রুগ্ন মানুষটিকে ইউরোপ থেকে তাড়ানই ছিল ইউরোপীয়দের উদ্দেশ্য। ১৯১১-১৩ এই তিন বছর প্রথম বল্‌কান, দ্বিতীয় বল্‌কান ও ট্রিপলির যুদ্ধে ইউরোপীয় শক্তিগুলি জোট বেঁধে তার সর্ব্বনাশ করতে উদ্যত হয়। এসময় তুরস্কের উপর ইংরেজের ব্যবহার ভারতীয় মুসলমানের নিকট বড়ই নির্ম্মম ব'লে বোধ হ'ল। কিন্তু এর প্রতীকার-চেষ্টা তাঁদের একার পক্ষে সম্ভব নয়। একারণ কংগ্রেসের সঙ্গে যোগদানের জন্য তাঁরা, বিশেষ ক'রে প্রগতিবাদী মুসলমানগণ উদ্‌গ্রীব হ'য়ে উঠলেন। অবশ্য জিন্না, হাসান ইমাম প্রভৃতি আগেই কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯১২, ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় এ উদ্দেশ্যে আগা খাঁর নেতৃত্বে মুসলমানগণ সম্মিলিত হলেন ও মোস্‌লেম লীগের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে কংগ্রেসের অনুরূপ ব্রিটেনের অধীন স্বায়ত্ত-শাসন প্রাপ্তির আদর্শ গ্রহণ করা সাব্যস্ত করলেন। পরবর্ত্তী ২২শে মার্চ্চ লক্ষ্ণৌ শহরে সার্ ইব্রাহিম রহিমতুল্লার সভাপতিত্বে মোস্‌লেম লীগ পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট আদর্শ গ্রহণ করলেন। কংগ্রেস পরবর্ত্তী করাচী অধিবেশনে (১৯১৩) জাতীয়তামূলক আদর্শ গ্রহণের জন্য মোস্‌লেম লীগকে অভিনন্দিত করেন।

বাঁকীপুরে কংগ্রেসের অধিবেশন হয় ১৯১২ সালে। এ বছর কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা এলান অক্টেভিয়ান হিউম মারা যান। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মজহ্‌রুল হক্ তাঁর অভিভাষণে এজন্য গভীর শোক প্রকাশ করেন। এবিষয়ে

একটি প্রস্তাবও গৃহীত হ'ল। তিনি তুরস্কের প্রতি ব্রিটিশের ব্যবহারের তীব্র সমালোচনা করলেন। সভাপতি আর. এন্ মুধোলকার ভাবী ভারত গবর্ণমেণ্টের আদর্শ ব্যক্ত করেন এইরূপ - ভারতবর্ষ হবে কতকগুলি স্বায়ত্ত-শাসন সম্পন্ন প্রদেশের সমষ্টি। ভারত-সরকার সহজে এদের উপর হস্তক্ষেপ করবেন না। প্রাদেশিক শাসনে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলেই তবে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করার অধিকারী হবেন। আন্তর্জাতিক ব্যাপারসমূহের মধ্যে ভারত-সরকারের কর্ত্তব্য বেশীর ভাগ নিবদ্ধ থাকবে।

এ সময় দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবাসী ভারতীয় সমস্যা অতি মাত্রায় ঘোরাল হ'য়ে উঠে। ১৯০৭ সালে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ভারতীয়দের লাঞ্ছনা নিরাকরণ জন্য পুনরায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করেন। প্রতি ভারতবাসীর মাথাপিছু বার্ষিক তিন পাউণ্ড পোল ট্যাক্সের কথা আমরা আগে বলেছি। ঐ বছরে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীদের ভারতীয়ত্ব প্রতিপন্ন করবার জন্য এমন একটি আইন বিধিবদ্ধ হ'ল, যার ফলে প্রত্যেক ভারতবাসীকেই একটি দলিলে টিপসহি দিতে বাধ্য করান হয়। মহাত্মা গান্ধী এই অপমানকর ব্যবস্থার ও অন্যবিধ লাঞ্ছনার প্রতিকারের উদ্দেশ্যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করেন। প্রবাসী ভারতবাসীরা তাঁর অনুবর্ত্তী হলেন। আরম্ভেই দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধানমন্ত্রী জেনারল স্মাট্‌সের সঙ্গে তাঁর আপোষ রক্ষার কথা হয়। কিন্তু স্মাট্‌স্ আপোষের সর্ত্তে রাজী হ'য়েও শেষ পর্য্যন্ত তা রক্ষা করলেন না। দক্ষিণ আফ্রিকায় মহাত্মা গান্ধীর সহকর্ম্মী ভারতবন্ধু এইচ. এস. এল. পোলক ১৯১১ সালে কলকাতা কংগ্রেসে উপস্থিত হ'য়ে বলেছিলেন যে এই আন্দোলনের সময় মহাত্মা গান্ধী সমেত সাড়ে তিন হাজার সত্যাগ্রহী কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন ও তাদের প্রতি এরূপ কঠোর ব্যবহার করা হয় যে, জেল থেকে বের হবার সময় তাদের মুখ চেনা কঠিন হয়েছিল! ভারতবর্ষে, বিশেষ ক'রে দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে, এজন্য ভীষণ বিক্ষোভ উপস্থিত হয়। গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে সরকারের অনুমতি নিয়ে ১৯১২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় গমন করেন ও গান্ধীজীর সঙ্গে নানাস্থানে ভ্রমণ ক'রে সকল বিষয় প্রত্যক্ষ করেন। গোখ্‌লে মহোদয় ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদে ভারতের বাইরে শ্রমিক প্রেরণের নিষেধাত্মক একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাব গৃহীত না হ'লেও সরকার যত শীঘ্র সম্ভব এ প্রস্তাব

সম্পূর্ণ কার্য্যকর করবার প্রতিশ্রুতি দেন। বস্তুতঃ লর্ড হার্ডিঞ্জ প্রবাসী ভারতীয় সমস্যার সমাধানে খুবই উদ্‌গ্রীব হয়েছিলেন। তিনি মাদ্রাজের মহাজনসভা ও প্রাদেশিক সম্মেলনের অভিনন্দনের উত্তরে প্রবাসী ভারতীয়দের প্রতি প্রকাশ্যে সহানুভূতি প্রকাশ করেন। গোখ্‌লে বাঁকিপুর অধিবেশনে তাঁর অভিজ্ঞতা সবিস্তারে বর্ণনা করলেন।

১৯১৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবাসী ভারতীয়দের আর এক নূতন বিপদ উপস্থিত হ'ল। এ বছর ১৪ই মার্চ্চ তারিখে এখানে এই মর্ম্মে আর একটি আইন পাস করিয়ে নেওয়া হয় যে, খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্মত বিবাহই শুধু বৈধ। এর ফলে হিন্দু বিবাহ ও মুসলমান বিবাহ পরোক্ষে অবৈধই প্রতিপন্ন হ'ল। এ নিয়েও খুব আন্দোলন শুরু হয়। এবারে গান্ধী-সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী কস্তুরবাঈ গান্ধীর নেতৃত্বে নারীগণও সত্যাগ্রহ আরম্ভ করেন। নারীদের উপরও নানারূপ উৎপীড়ন হয় ও কস্তুরবাঈ প্রমুখ অনেকে কারাবরণ করেন। গোখ্‌লের নির্দ্দেশে সেবারত চার্লস্ ফ্রিয়ার এণ্ড্রুজ ও ডব্‌লিউ. ডব্‌লিউ. পীয়ার্সন দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে ভারতীয়দের নানাভাবে সাহায্য করেন। এরূপ আন্দোলনের ফলে সাম্রাজ্যবাদী স্মাট্‌স্‌কেও কতকটা অবনমিত হ'তে হ'ল। পোল ট্যাক্স বা জিজিয়া কর, টিপসহি আইন, বিবাহ আইন প্রধানতঃ এই তিনটি বিষয় নিয়ে গান্ধী ও স্মাট্‌স্-এর মধ্যে আলোচনা আরম্ভ হয়। এই আলোচনার ফলে যে-সব সিদ্ধান্ত হয় তা ১৯১৪ সালের স্মাট্‌স্-গান্ধী চুক্তি নামে পরিচিত। এই চুক্তি অনুযায়ী এ বছর 'ইণ্ডিয়ান রিলিফ এক্ট' নামে একটি আইন বিধিবদ্ধ হয়। এ দ্বারা জিজিয়া কর ও টিপসহি আইন তুলে দেওয়া হ'ল। সরকার প্রত্যেক ভারতীয়ের একটি স্ত্রী ও তার গর্ভজাত সন্তান-সন্ততিকে আইনসঙ্গত ব'লে স্বীকার ক'রে দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসের অনুমতি দিলেন।

মোস্‌লেম লীগের আদর্শ নির্ণয়ের কথা পূর্ব্বে বলেছি। ১৯১৩ সালের কংগ্রেসের অধিবেশন হ'ল করাচীতে। সভাপতি মাননীয় নবাব সৈয়দ মহম্মদ বাহাদুর বলেন যে জাতীয় স্বার্থ সিদ্ধির জন্য হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, খ্রীষ্টান ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায়কেই একযোগে কর্ম্মে লিপ্ত হ'তে হবে। মোস্‌লেম লীগ কংগ্রেস নেতৃবর্গের সঙ্গে সম্মিলিত হবার জন্য যে ইচ্ছা জ্ঞাপন করেছেন এজন্য সভাপতি মহাশয় আনন্দ প্রকাশ করেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে প্রবাসী ভারতীয়দের সংগ্রাম ও সাফল্যের কথা একটু আগেই উল্লেখ করেছি। এ সময় কংগ্রেসের পক্ষে পরবর্ত্তী ঘটনাসমূহের কথা জানা সম্ভব ছিল না, তাই নেতৃবর্গ মহাত্মা গান্ধী ও প্রবাসী ভারতীয়দের কার্য্যের সমর্থন করে ও দক্ষিণ আফ্রিকা গবর্ণমেণ্টের নিন্দা ক'রে এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ফিজি, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা প্রভৃতি উপনিবেশে প্রবাসী ভারতবাসীর দুঃখ দুর্দ্দশার অন্ত ছিল না। এই সময়ে কানাডার প্রিভি কৌন্সিল এক রুল জারি করেন যে, ভারতবর্ষ থেকে একই জাহাজে সোজাসুজি কানাডায় না পৌঁছলে কোন ভারতবাসীকেই সেখানে অবতরণ করতে দেওয়া হবে না! বলা বাহুল্য, ভারতবর্ষ থেকে কানাডায় যাবার কোন জাহাজ লাইন ছিল না, কোন জাহাজ কোম্পানীই ক্ষতি স্বীকার ক'রে সোজাসুজি কানাডায় জাহাজ চালাতে রাজী নয়। কানাডায় চার হাজার শিখ বাসিন্দা ছিল। কানাডা-প্রবাসী শিখগণ সর্দ্দার নন্দ সিংকে প্রতিনিধিরূপে কংগ্রেসে প্রেরণ করে। উক্ত ব্যবস্থার প্রতিবাদে কংগ্রেসে যে প্রস্তাব উত্থাপিত হ'ল তার উপর বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ভারতবাসীদের উপর এরূপ বিধি-নিষেধ প্রবর্ত্তনের কারণ—কর্ত্তৃপক্ষের বিশ্বাস, কানাডার স্বাধীন আবহাওয়ায় বিচরণ করলে ভারতবাসীরা ক্রমে নিজেদের ভেদবুদ্ধি ভুলে যাবে ও স্বাজাত্যবোধে উদ্‌বুদ্ধ হ'য়ে স্বদেশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় যত্নবান হবে! কানাডার নেতৃবর্গ প্রকাশ্যেই এই কথা বলেছেন!

যা হোক্, এই আইনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করার জন্য সিঙ্গাপুর ও মালয়ের বিখ্যাত কন্‌ট্র্যাক্টর বাবা গুরুদিৎ সিং 'কোমাগাটা মারু' নামে একখানা জাপানী জাহাজ ভাড়া ক'রে পঞ্জাবী মুসলমান ও শিখ যাত্রীসহ হংকং থেকে ১৯১৪, ৪ঠা এপ্রিল কানাডায় রওনা হন ও পরবর্ত্তী ২৩শে মে ভাঙ্কুভারে পৌঁছেন। কানাডা-সরকার সেখানে যাত্রীদের অবতরণ করতে না দেওয়ায় ঠিক দু'মাস পরে ২৩শে জুলাই তাঁরা স্বদেশে ফিরতে বাধ্য হলেন। পরবর্ত্তী ১৯শে সেপ্টেম্বর এই জাহাজ বজবজ পৌঁছে। গবর্ণমেণ্ট যাত্রীদলকে বিপ্লবী সন্দেহে পুলিশ হেপাজতে সরাসরি পঞ্জাবে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু যাত্রীরা অনেকে গবর্ণমেণ্টের নজরবন্দী হ'য়ে যেতে অস্বীকার করেন। ফলে পুলিশ ও তাদের মধ্যে ভীষণ দাঙ্গা হয় ও কয়েকজন হতাহত হন। বাবা গুরুদিৎ সিং

ও অন্যান্য আঠাশ জন যাত্রী পুলিশের নজর এড়িয়ে অন্যত্র চলে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। দীর্ঘ সাত বছর গোপন ভাবে থেকে ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় বাবা গুরুদিৎ সিং পুলিশের হস্তে আত্মসমর্পণ করেন।

ইতিমধ্যে জুলাই মাসে (১৯১৪) ইউরোপে মহাসমর ঘোষিত হয়। অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর যুবরাজ ডিউক অফ ফার্ডিনাণ্ড সার্বিয়া ভ্রমণকালে আততায়ীর হস্তে নিহত হন। মহাযুদ্ধ বাধবার উপলক্ষ্য হ'ল এই। একদিকে জার্ম্মানী অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী ও তুরস্ক আর অন্যদিকে ফ্রান্স, ব্রিটেন ও রুশিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হ'ল। শেষোক্ত পক্ষকে এক কথায় বলা হয় মিত্রশক্তি। জাপান মিত্রশক্তিদের পক্ষে থেকে প্রাচীতে খবরদারি করতে লাগল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ বাধবার তিন বছর পরে ১৯১৭ সালে এক সঙ্কট মুহূর্ত্তে মিত্রশক্তির পক্ষে এসে যোগ দেয় ও তাদের জয়লাভ সম্ভব ক'রে তোলে। যা হোক্, ব্রিটেন মহাসমরে পক্ষ গ্রহণ করায় স্বভাবতঃই তার সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলিকে তথা ভারতবর্ষকেও তার পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়াতে হ'ল। ভারতবাসীদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট দল ইংরেজের উপর বিদ্বিষ্ট। তারা এই সুযোগে ব্রিটিশের শক্তি হানি ক'রে ভারতবর্ষের কিছু সুবিধা ক'রে নিতে চাইলে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকে যে নিপীড়ন-নীতি আরম্ভ হয় তার ফলে এক শ্রেণীর ভারতীয় (এদের ভিতর যুবকই বেশী) গোপনে গোপনে বিপ্লবী দল গঠন করে। সমগ্র উত্তর ভারতে, বিশেষ ক'রে বাংলায় ও পঞ্জাবে, এ-দলের কর্ম্ম-ক্ষেত্র ছড়িয়ে পড়ে। বাংলার কথা এর আগে কিছু বলেছি। ১৯১৪ থেকে ১৯১৬ সাল পর্য্যন্ত এখানে নানারকম বিপ্লবাত্মক কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়। ডাকাতি ও পুলিশ কর্ম্মচারী হত্যা বা হত্যার চেষ্টা এদের প্রধান কর্ম্ম হ'য়ে দাঁড়ায়। পঞ্জাবেও এই সময় বিপ্লবাত্মক ব্যাপার ঘটতে থাকে। হিন্দু, মুসলমান ও শিখ তিন সম্প্রদায়ের লোকই এই বিপ্লবাত্মক কর্ম্মে লিপ্ত ছিল। লালা হরদয়াল, সর্দ্দার অজিৎ সিং, বরকতুল্লা, মৌলবী ওবেদুল্লা সিন্ধি, রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ, ভাই পরমানন্দ (পরে হিন্দুমহাসভার অন্যতম নেতা) প্রমুখ মনস্বী ব্যক্তিগণ প্রবাসে থেকে বিপ্লবী দল পরিচালনে সহায়তা করতেন। লালা হরদয়াল ছিলেন 'গদর পার্টির' প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক, আমেরিকার ক্যালিফর্ণিয়ায় ছিল এর কেন্দ্রস্থল। পরে এর শাখা বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। এঁদের উদ্যোগে ও ডক্টর তারকনাথ দাসের

সহযোগিতায় বার্লিনে 'ইণ্ডিয়ান নেশন্যাল পার্টি' নামে এক সঙ্ঘ গঠিত হয়। তুরস্কের উপর অস্ত্রাঘাত করায় ওবেদুল্লা সিন্ধী, বরকতুল্লা প্রভৃতি বিশেষ ব্যথিত হ'য়ে ইসলামের স্বার্থ বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর হলেন। কাবুলে এঁদের কর্ম্মকেন্দ্র স্থাপিত হ'ল।

ইতিমধ্যে বিস্তর বিপ্লবী বিদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র সহ পঞ্জাবে প্রত্যাগমন করে ও বিপ্লবাত্মক কর্ম্মে লিপ্ত হয়। লাহোর ষড়যন্ত্র ও অন্যান্য মামলায় বহু বিপ্লবী প্রাণদণ্ড, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও দীর্ঘকালের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হ'ল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ভাই পরমানন্দ লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন, কিন্তু বড়লাট দয়াপরবশ হ'য়ে মৃত্যু-দণ্ডের বদলে তাঁর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ দেন।

বঙ্গে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) ও নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বিপ্লবী দলের নায়ক। জার্ম্মানীর নেশন্যাল পার্টির সঙ্গে তাঁদের যোগসাধন হয়। সাংহাই-এর জার্ম্মান কন্সাল অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই ক'রে দু'খানা জাহাজ বাংলায় পাঠান। একখানা সুন্দরবনের রাইমঙ্গলে ও অন্যখানা বালেশ্বরে পৌঁছবার কথা ছিল। ভারত-সরকার আগে থাকতেই টের পেয়ে জাহাজগুলি হস্তগত করেন। বালেশ্বরে বিপ্লবী ও পুলিশের মধ্যে ভীষণ সংঘর্ষ হয়। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এ সংঘর্ষে নিহত হন। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য পুলিশের চোখ এড়িয়ে ছদ্মবেশে বিদেশ চলে যান। মানবেন্দ্রনাথ রায় বা এম্. এন্ রায় নামে তিনি পরে সুপরিচিত হন।

সপরিষদ পঞ্জাব লাট ১৯১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে বিপ্লবী ও তার প্রশ্রয়-কারীদের সরাসরি বিচারের জন্য এক আইন প্রণয়নের সুপারিশ ক'রে ভারত-গবর্ণমেণ্টকে লেখেন। সরকার বাংলা ও পঞ্জাবের বিপ্লববাদ দমনের জন্য একটি আইন প্রণয়নের আলোচনা ইতিপূর্ব্বেই শুরু করেন। এখন একটি প্রাদেশিক সরকারেরও সম্মতি পেয়ে দ্রুত আইন প্রণয়নে অগ্রসর হলেন। তাঁহারা ১৯১৫ সালের ১৮ই মার্চ্চ তারিখে একদিনের অধিবেশনেই ডিফেন্স অফ্ ইণ্ডিয়া এক্ট বা ভারত রক্ষা আইন পাস করিয়ে নিলেন! ভারতবর্ষে, বিশেষ ক'রে বঙ্গে ও পঞ্জাবে বহু লোক সন্দেহ বশে কারাবদ্ধ হন। 'কমরেড' সম্পাদক মৌলানা মহম্মদ আলী ও তাঁর জ্যেষ্ঠ 'হামদাদ' সম্পাদক মৌলানা

সৌকৎ আলী, মৌলানা আবুলকালাম আজাদ প্রমুখ বিখ্যাত মুসলমানগণও কারাগারে প্রেরিত হলেন। 'কম্‌রেড' ইতিপূর্ব্বেই প্রেস আইনের কবলে পড়ে বন্ধ হ'য়ে যায়।

ভারতের আকাশ-বাতাস যখন এইরূপে অনুরণিত হ'য়ে উঠল তখন কংগ্রেস কি করেছিলেন আজকের দিনে তা হয়ত অনেকে জিজ্ঞাসা করবেন। পুরাতন কংগ্রেস-নেতৃবর্গ জাতির সম্মুখে এমন কোন চিত্তজয়ী কর্ম্মাদর্শ স্থাপন করতে পারেন নি যাতে মতভেদ ভুলে সকলেই এর পতাকা তলে সম্মিলিত হ'য়ে জাতীয় আন্দোলনকে সার্থক ক'রে তুলতে পারত। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় যে, কংগ্রেসের ভিতরেও আশু স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য একটি মতবাদ প্রবল হ'য়ে উঠে। ১৯১৪ সালে মাদ্রাজ অধিবেশনে কংগ্রেস মঞ্চ থেকে সভাপতি ভূপেন্দ্রনাথ বসু স্বায়ত্ত-শাসনের দাবির কথা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করলেন। কিন্তু এই দাবির পশ্চাতে যে সম্মিলিত জনমত প্রয়োজন তাঁরও সম্ভাবনা তখন ভাল ক'রেই দেখা দেয়। মোস্‌লেম লীগের কর্ণধারগণ এখন কংগ্রেসে যোগদানে ইচ্ছুক। আবার চরমপন্থীদের নিয়ে পূর্ব্বে যে বিরোধ উপস্থিত হয়েছিল তা নিরাকরণের চেষ্টাও এ সময় আরম্ভ হয়। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক দীর্ঘ ছ' বছর কারাদণ্ড ভোগ ক'রে এবার জুন মাসে নিজ কর্ম্মস্থল পুণায় ফিরে এসেছেন। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ব্রিটেনকে সাহায্য করতে সকলকে আহ্বান করলেন ও একটি বিবৃতিতে ভারতবর্ষের পক্ষে ব্রিটেনের অধীন স্বায়ত্ত-শাসন লাভেই সম্মতি জানালেন। মডারেট বা নরমপন্থী দলের অনেকে এরূপ ঘোষণার মধ্যে মিলনের সূত্রই খুঁজে পেলেন। মিসেস্ এনি বেসাণ্ট এ বছরই প্রথম কংগ্রেসে যোগদান করেন ও দু' দলের ভিতর মিলন সাধনের চেষ্টায় রত হন। কিন্তু এই মিলনের পথে প্রধান অন্তরায় ছিলেন সার্ ফিরোজ শা মেহ্‌তা। তাঁরই প্রতিবন্ধকতায় ১৯১৪ ও ১৯১৫ সালে কংগ্রেসে উভয় দলের মিলন সম্ভব হয় নি। কিন্তু সকলেই বুঝতে পারলেন, হাওয়া যেরূপ তাতে উভয়ের মিলন শীঘ্রই সম্ভব হ'য়ে উঠবে।

১৯১৫ সালে কংগ্রেস হ'ল বোম্বাইয়ে। এবারকার সভাপতি হলেন সার্ (তখন লর্ড হন নি) সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ। কংগ্রেসী রাজনীতির সঙ্গে তাঁর বিশেষ কোন যোগ ছিল না। তথাপি সার্ ফিরোজ শার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে

তাঁকে এ পদ গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু ফিরোজ শা কংগ্রেস অধিবেশনের অল্প পূর্ব্বেই মারা গেলেন। গোখ্‌লেও এই বছরের প্রথমে মারা যান। মিসেস্‌ বেসাণ্ট সমস্ত বছর ধরে দু' দলের মিলন সাধনের জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে গমন ক'রে নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও সভাসমিতিতে এর আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেন। কংগ্রেসের এ অধিবেশনেই মিলনের পথ পরিষ্কার করা সম্ভবপর হ'ল। কংগ্রেস গঠনতন্ত্রের বিংশতিতম নিয়ম পরিবর্ত্তন ক'রে স্থির হ'ল—"ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীন থেকে নিয়মানুগ ভাবে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন লাভই ভারতবাসীর কাম্য—এই উদ্দেশ্য সম্বলিত অন্যূন দু' বছর বয়সের যে-কোন প্রতিষ্ঠানের আনুকূল্যে অনুষ্ঠিত জন-সভা কংগ্রেসে প্রতিনিধি প্রেরণ করতে সক্ষম।" সভাপতি সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন তাঁর অভিভাষণে বলেন যে, কংগ্রেস ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থা কিরূপ দেখতে চান তার একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। তিনি আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট আব্রাহাম লিঙ্কনের কথা উল্লেখ করে বললেন, "কংগ্রেসের আদর্শ হওয়া উচিত 'জনগণের জন্য জনগণের দ্বারা জনগণের শাসন' ("government of the people, for the people, and by the people") গবর্ণমেণ্টের সামরিক অসামরিক সকল বিভাগেই কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা স্বায়ত্ত-শাসনের মূলগত অর্থ।

বোম্বাইয়ে এবারে মোস্‌লেম লীগেরও অধিবেশন হ'ল। কংগ্রেস সভাপতি প্রতিনিধিবৃন্দ সহ মোস্‌লেম লীগে উপস্থিত হলেন। মোস্‌লেম লীগও তাঁদের বিশেষ ভাবে সম্বর্দ্ধনা করলেন। এর পর কয়েক বছর যাবৎ কংগ্রেস ও মোস্‌লেম লীগের অধিবেশন একই শহরে সম্পন্ন হয়। এর ফলে উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গের মধ্যে মেলামেশা ও আলাপ আলোচনারও সুযোগ ঘটে।

এবারকার অধিবেশনে কংগ্রেস স্বায়ত্ত-শাসন সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন ও মোস্‌লেম লীগ কর্ত্তৃক স্থাপিত কমিটির সঙ্গে আলোচনা ক'রে একটি শাসন-সংস্কারের খসড়া প্রণয়ন করতে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটিকে নির্দ্দেশ দেন।

স্বায়ত্ত-শাসন প্রচেষ্টায় কংগ্রেস ও মোস্‌লেম লীগ

(১৯১৬-১৯১৯)

ভাবী শাসন-পদ্ধতি সম্পর্কে খসড়া প্রণয়নের জন্য অতঃপর কংগ্রেস ও মোস্‌লেম লীগের মধ্যে অবিলম্বে আলোচনা আরম্ভ হয়। কয়েক অধিবেশনে আলাপ-আলোচনার পর লীগ-কংগ্রেস যুগ্ম কমিটি ১৯১৬, ১৭ই নবেম্বর তারিখে শাসন-সংস্কারের খসড়া প্রণয়ন সমাপ্ত করেন। অক্টোবর মাসে মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, দীনশা এডুলজী ওয়াচা, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, তেজবাহাদুর সাপ্রু, মজহ্‌রুল হক্, মহম্মদ আলী জিন্না, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী প্রমুখ বড়লাটের ব্যবস্থাপরিষদের উনিশ জন নির্ব্বাচিত সদস্য যুদ্ধ-পরবর্ত্তী শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে একটি স্মারকলিপি সরকারে পেশ করলেন।

কিছুকাল পূর্ব্বেই শাসন-সংস্কারের উদ্দেশ্যে জনমত গঠন কল্পে বিশেষ চেষ্টা শুরু হয়। গণতন্ত্র-সম্মত শাসন ব্যবস্থায়-এর আবশ্যকতা খুবই বেশী। মিসেস্ এনি বেসাণ্ট ১৯১৪, ২রা জুন 'কমনউইল' সাপ্তাহিক ও ১৪ই জুলাই 'নিউ ইণ্ডিয়া' দৈনিক এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এ দু-খানিতে ভারত-শাসনের ভাবী রূপ এই প্রকার ব্যক্ত করলেন—"গ্রাম্য পঞ্চায়েত হ'তে শুরু ক'রে মিউনিসিপ্যালিটি, ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, প্রাদেশিক ব্যবস্থাপরিষদ ও নিখিল-ভারতীয় পার্লামেণ্ট সর্ব্বত্র ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার অনুরূপ স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই।" নেতৃবৃন্দ ভারতে জনমত গঠনের আবশ্যকতা উপলব্ধি না করায় তিনি এদিকে তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করলেন। তিনি কংগ্রেসের আদর্শ নিয়েই ১৯১৬, সেপ্টেম্বর মাসে হোমরুল লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। সংবাদপত্রে ও সভা-সমিতিতে পূর্ব্বেই আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল। প্রেস আইন তখনও বলবৎ। যে-কোন ধরনের প্রগতিশীল রাজনৈতিক আন্দোলনের কথা প্রকাশই বে-আইনী ব'লে গণ্য হ'তে পারত। জনমত গঠনমূলক কোন

আন্দোলনই আমলাতন্ত্রের সমর্থনযোগ্য নয়। কাজেই নানা ওজুহাতে হোমরুল বা স্বরাজ আন্দোলন বন্ধ ক'রে দেবার চেষ্টায় তাঁরা রত হ'লেন। ১৯১৬, ২৬শে মে 'নিউ ইণ্ডিয়া' থেকে দু' হাজার টাকা জামিন দাবি করা হ'ল। পরবর্ত্তী ২৮শে আগষ্ট জামিনের টাকা বাজেয়াপ্ত হয়। তাঁরা নূতন ক'রে আবার দশ হাজার টাকা জামিন চাইলেন, টাকাও অবিলম্বে দেওয়া হ'ল। বেসাণ্ট-মহোদয়া এ আদেশের বিরুদ্ধে মাদ্রাজ হাইকোর্টে ও বিলাতের প্রিভিকৌন্সিলে আপীল ক'রে ব্যর্থকাম হন।

এদিকে মহারাষ্ট্রে লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকও তাঁর দৈনিক 'কেশরী' ও সাপ্তাহিক 'মরাঠা' দ্বারা 'হোমরুল' বা ভাবী স্বরাজের বার্ত্তা দিকে দিকে প্রচার করতে লাগলেন। তিনি কারাদণ্ড ভোগের পর মহারাষ্ট্রে ফিরে জাতীয় সংগঠনে মনোনিবেশ করলেন। বেসাণ্ট-মহোদয়ার পূর্ব্বেই ১৯১৬, এপ্রিল মাসে পুণায় তাঁরই চেষ্টায় 'হোমরুল লীগ' স্থাপিত হয়। এর আনুকূল্যে বহু সভ-সমিতি অনুষ্ঠিত হ'ল এবং তিলক ও তাঁর সহকর্ম্মিগণ বক্তৃতা করতে লাগলেন। আমলাতন্ত্র তাঁর প্রভাবে ঈর্ষান্বিত। তাই তাঁরা এক বছর যাবৎ সদাচরণের প্রতিশ্রুতি স্বরূপ একটি কুড়ি হাজার টাকার ও দুটি দশ হাজার টাকার ব্যক্তিগত জামিন দিতে তিলককে আদেশ করলেন। বম্বে হাইকোর্টে আপীলে এই জামিনের আদেশ নাকচ হ'য়ে যায় (১৯১৬, ৯ই নবেম্বর)।

১৯১৫ সালের বোম্বাই অধিবেশনে কংগ্রেসে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের নিয়ম পরিবর্ত্তিত হওয়ায় কংগ্রেসে জাতীয় দলের যোগদানে সুবিধা হ'ল। তাঁরা পরবর্ত্তী লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে সদলবলে যোগ দিবার জন্য তোড়-জোড় আরম্ভ করলেন। তিলক ও বেসাণ্টের উপর সরকারের বিষদৃষ্টি তাঁদের দলকে অধিকতর সঙ্ঘবদ্ধ হ'তে উদ্‌বুদ্ধ করলে। যথাসময়ে লক্ষ্ণৌ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হ'ল। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি পণ্ডিত জগৎ-নারায়ণ লাল ও মূল সভাপতি অম্বিকাচরণ মজুমদার জাতীয় দলকে ও বিশেষ ক'রে লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক ও 'অমৃতবাজার পত্রিকা' সম্পাদক মতিলাল ঘোষকে অভিনন্দন জানালেন। লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে জাতীয় দলের প্রতিনিধিরাই সংখ্যাধিক্য লাভ করলেন।

মোস্‌লেম লীগের অধিবেশনও লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত হ'ল। ভারতের বিশিষ্ট মুসলমানগণ লীগে উপস্থিত হলেন। লীগ-নেতৃবর্গ কংগ্রেসে ও কংগ্রেস-নেতৃবর্গ লীগ-সভায় সাগ্রহে ও সানন্দে যোগদান করেন।

এবারকার লীগ ও কংগ্রেস উভয়েরই প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল তাঁদেরই প্রতিনিধি-সভা-রচিত ভাবী শাসনপ্রণালীর খসড়া। উভয় সম্মেলনেই এই খসড়াটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হ'ল। এই খসড়াখানির মূল বিষয়গুলি মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফার্ড শাসন-সংস্কারে যথাসম্ভব এড়িয়েই চলার চেষ্টা হয়। এর প্রধান কারণ হয়ত এই যে, এর মধ্যে ভারত-শাসনে ভারতবাসীর অধিকার লাভের পরিষ্কার নির্দ্দেশ ছিল। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা, ভারত গবর্ণমেণ্ট, সকৌন্সিল ভারতসচিব, ভারতবর্ষ ও সাম্রাজ্য, সামরিক ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে খসড়ায় সুস্পষ্ট ধারা সন্নিবিষ্ট করা হয়। ভারতসচিবের কৌন্সিলের উচ্ছেদ, বড়লাটের শাসন-পরিষদে অর্দ্ধেক সদস্য পদে ভারতীয় নিয়োগ, দেড় শ' সভ্য নিয়ে ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদ গঠন, তার মধ্যে চার-পঞ্চমাংশ প্রত্যক্ষভাবে নির্ব্বাচন, বজেটে সকলেরই ভোটদানের অধিকার, প্রাদেশিক পরিষদগুলির ঊর্দ্ধতম সোয়া শ' ও নিম্নতম পঞ্চাশ জন সদস্য নিয়ে গঠন ও এর চার-পঞ্চমাংশ প্রত্যক্ষ ভোটে নির্ব্বাচন, প্রাদেশিক শাসন-পরিষদে অর্দ্ধেক সদস্য পদে ভারতীয় গ্রহণ, প্রাদেশিক ও নিখিল-ভারতীয় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ভোটদাতাদের সংখ্যা প্রসার, সকৌন্সিল বড়লাটের অধিকতর স্বাধীনতা, প্রদেশগুলিকে আর্থিক স্বাতন্ত্র্য দান, সৈন্যবিভাগে ভারতীয়দের প্রবেশাধিকার, আইন-প্রণয়ন, রাজস্ব-বণ্টন প্রভৃতি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় খসড়ায় উল্লিখিত হয়। পৃথক্ নির্ব্বাচনের ভিত্তিতেই হিন্দু ও মুসলমান সদস্য নির্ব্বাচন স্থির হয়। পঞ্জাবে শতকরা ৫০ জন, যুক্তপ্রদেশে ৩০, বঙ্গে ৪০, বিহার-উড়িষ্যায় ২৫, মধ্যপ্রদেশে ১৫, মাদ্রাজে ১৫, বোম্বাইয়ে ⅓ অংশ এবং ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদে ⅓ মুসলমান সদস্য নির্ব্বাচিত হবার কথা হয়। এ সব বিষয়ের মধ্যে এই ধারাটিই পরবর্ত্তী শাসন-সংস্কারে হুবহু গৃহীত হয়েছিল।

১৯১৭ সালে কতকগুলি বিষয়ে ভারতবাসীর মনে অসন্তোষ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইস্‌লিংটন কমিশনের কথা আমরা আগে পেয়েছি। এ বছর গোড়ার

দিকে এই কমিশনের রিপোর্ট বার হ'ল। উচ্চ পদে ভারতীয় নিয়োগের ব্যবস্থার জন্য এর সৃষ্টি, কিন্তু কমিশনের অধিকাংশ সদস্য ব্রিটিশের স্থায়ী আধিপত্য বজায় রাখার পক্ষেই মত প্রকাশ করলেন। চৌবল ও আব্দার রহিম এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ ক'রে স্বতন্ত্র মিনিটে তাঁদের মতামত লিপিবদ্ধ করেন। এ সময়কার উচ্চপদগুলিতে ভারতীয়ের অনুপাত ছিল এরূপ—দু'শ থেকে পাঁচ শ' টাকা বেতনের ১১,০৬৪টি পদের মধ্যে শতকরা ৪২, পাঁচ শ' টাকা ও তার উপরের ৪,৯৮৪টি পদের মধ্যে শতকরা ১০, আট শ' টাকা ও তার উপরের পদে ভারতবাসী ছিলেন শতকরা মাত্র ১৯ জন। কমিশন আবার সিবিল সার্বিসের বয়স কমিয়ে ২৪ থেকে ১৯ এ করার প্রস্তাব করেন! সিবিল সার্বিস পদের সংখ্যা ছিল ৭৫৫। এর এক-চতুর্থাংশ মাত্র ভারতীয়ের বরাতে জুটবার কথা হয়! পুলিশ বিভাগে মাত্র শতকরা ১০টি পদ তাদের দেওয়া সাব্যস্ত হ'ল! ইস্‌লিংটন কমিশন ব্রিটিশের চির-প্রভুত্ব ও ভারতবাসীর চির-অধীনতার ব্যবস্থা ক'রে সকলের নিকটই নিন্দিত হলেন।

ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্রিটিশের ঔদাসীন্য ও আমলাতন্ত্রের প্রতিকূল আচরণে ভারতবর্ষে আবার অসন্তোষের সৃষ্টি হ'ল। অথচ ইউরোপে ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ ও আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট উইলসন পরাধীন জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দানের কথা এ সময় ঘোষণা করছিলেন। লোকমান্য তিলক ও মিসেস্ বেসাণ্টের 'হোমরুল' বা স্বরাজ আন্দোলন দেশময় ছড়িয়ে পড়ল ; শিক্ষিত সম্প্রদায় নানাস্থানে শাখা প্রতিষ্ঠা ক'রে জনসাধারণের মধ্যে স্বরাজের বার্ত্তা প্রচার করতে লাগলেন। এরূপ ভাবে স্বরাজের কথা প্রকাশ ও আদর্শ প্রচারেও কিন্তু আমলাতন্ত্রের ঘোরতর আপত্তি। তারা বালগঙ্গাধর তিলক ও বিপিনচন্দ্র পালের দিল্লী ও পঞ্জাব প্রবেশ এবং মিসেস্ এনি বেসাণ্টের মধ্যপ্রদেশ ও বেরার প্রবেশ নিষিদ্ধ ক'রে দিলে! হোমরুল লীগের আনুকূল্যে অনুষ্ঠিত সভা-সমিতি বা জনসভায় স্কুল-কলেজের ছাত্রগণ যাতে যোগদান না করে, একমাত্র বাংলা ছাড়া সকল প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টই এই মর্ম্মে সর্ব্বত্র আদেশপত্র জারি করলেন! ১৯১৭, ২৪শে মে মাদ্রাজ ব্যবস্থাপরিষদে গবর্ণর লর্ড পেণ্টল্যাণ্ড মিসেস্ বেসাণ্টকে আক্রমণ ক'রে এক বক্তৃতা করেন। বেসাণ্ট 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখে তার জবাব দিলেন। পরবর্ত্তী

১৬ই জুন তারিখে সহকর্ম্মী বি. পি. ওয়াদিয়া ও জি. এস্. এরাণ্ডেলের সঙ্গে বেসাণ্ট অন্তরীণ হন। এর ফলে দেশময় আন্দোলন উপস্থিত হ'ল। জনসাধারণ সর্ব্বত্র সভা ক'রে এর প্রতিবাদ জানাতে লাগল। তিলকের আগ্রহাতিশয়ে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি বড়লাট ও ভারতসচিবের নিকট এ ব্যাপারের প্রতিবাদে একটি আবেদন পত্র প্রেরণ করেন। জুলাই মাসে কমিটির অধিবেশনে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলন চালাবারও প্রস্তাব উত্থাপিত হ'ল। আগামী কংগ্রেসে বেসাণ্টকে যাতে একবাক্যে সভাপতি পদে বরণ করা হয় তিলক সেজন্য লেখালেখি শুরু করলেন।

মেসোপটেমিয়ায় ভারতীয় বাহিনীর দুর্দ্দশার চরম হয়েছিল। এ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য যে কমিশন বসে এ বছর জুলাই মাসে তার রিপোর্ট বার হ'লে আমলাতন্ত্রের অকর্ম্মণ্যতা প্রকাশ পায় এবং ইংরেজ ও ভারতীয় উভয় মহলেই তাদের তীব্র সমালোচনা হয়। ভূতপূর্ব্ব সহকারী ভারতসচিব এডুইন মণ্টেগু পার্লামেণ্টে ভারত-শাসন ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা ক'রে বলেন যে, এরূপ লৌহ, কাষ্ঠ বা প্রস্তরবৎ শাসন বর্ত্তমান যুগে একেবারেই অচল। বর্ত্তমানের উপযোগী ক'রে শতাব্দীর পুরাতন এই জটিল শাসন ব্যবস্থার যদি সংস্কার করা না হয় তা হ'লে ভারত-শাসনের সম্পূর্ণ অযোগ্য ব'লেই আমরা বিবেচিত হব। এরূপ সমালোচনা হেতু ভারতসচিব মিঃ অষ্টেন চেম্বারলেন পদত্যাগ করলেন। এ সময় যুদ্ধেরও ভয়ানক সঙ্কটপূর্ণ অবস্থা। রুশিয়ায় বিপ্লব উপস্থিত হওয়ায় সেখান থেকে সাহায্য পাওয়ার আর আশা রইল না। তবে এ সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মিত্রশক্তির পক্ষে যোগদান করে। কিন্তু জার্ম্মানীর সঙ্গে সার্থক ভাবে যুঝ্‌তে হ'লে ভারতবর্ষের ধনবল জনবল ব্রিটিশের একান্ত আবশ্যক। প্রধানমন্ত্রী সুচতুর মিঃ লয়েড জর্জ্জ এই সময় ভারত-শাসনের তীব্র সমালোচক মিঃ মণ্টেগুকেই ভারতসচিব পদে নিযুক্ত করলেন।

মাদ্রাজের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি কংগ্রেসের অন্যতম প্রবীণ নেতা হোমরুল লীগের সভাপতি সার্ এস. সুব্রহ্মণ্য আয়ার কর্ত্তৃপক্ষের দমন-নীতির কথা বিবৃত ক'রে আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট উইলসনের নিকট একখানা পত্র লেখেন (২৪শে জুন, ১৯১৭)। এই পত্র নিয়ে ভারতে ও বিলাতে সরকারী মহলে বেশ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। মণ্টেগু সাহেব তখন ভারতসচিব। পার্লামেণ্টে এ প্রসঙ্গে

বক্তৃতা কালে তিনি বললেন যে, আয়ারের পক্ষে এরূপ পত্র লেখা অসঙ্গত ও অযশস্কর ("Disgraceful and improper")। সুব্রহ্মণ্য আয়ার এরূপ অপমানকর উক্তির প্রতিবাদে 'নাইট' উপাধি বর্জ্জন করেন।

যা হোক্, ভারতসচিব পদে অধিষ্ঠিত হ'য়েই মণ্টেগু সাহেব শাসন-নীতির সংস্কারে কিঞ্চিৎ অবহিত হলেন। সৈন্য-বাহিনীতে 'কিংসকমিশন' নামে দায়িত্বপূর্ণ ন'টি পদে এবারে সর্ব্বপ্রথম ভারতবাসী নিযুক্ত হলেন। মণ্টেগু ১৯১৭, ২০শে আগষ্ট তারিখে একটি ঘোষণায় বলেন যে, শাসন-ব্যবস্থার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ভারতবাসীদের সহযোগিতা করবার সুযোগ দিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে ভারতবর্ষকে ক্রমে দায়িত্বপূর্ণ শাসন দান করা হবে। পুরাতন-পন্থীরা অত্যধিক উৎফুল্ল হ'য়ে এ ঘোষণার নাম দিলেন, ভারত-শাসনের 'ম্যাগ্না কার্টা' বা অধিকার-দানের সনন্দ। জন-সাধারণে যাতে এ ঘোষণার প্রতি অনুকূল মনোভাব পোষণ করে সেজন্য কর্ত্তৃপক্ষ সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমেই বেসাণ্ট ও তাঁর সঙ্গীদ্বয়কে মুক্তিদান করেন।

সাম্রাজ্য সম্মেলন (ইম্পিরিয়াল কনফারেন্স) ও সাম্রাজ্য সমর কেবিনেটেও ভারতবর্ষ থেকে প্রতিনিধি গ্রহণ করা হ'ল এ সময়। কংগ্রেস প্রস্তাব করেছিলেন এসব প্রতিনিধি ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদের বে-সরকারী সদস্যগণ দ্বারা যেন নির্ব্বাচিত করা হয়। ভারত-সরকার তাঁদের এ প্রস্তাব কিন্তু গ্রহণ করেন নি। বড়লাট লর্ড চেম্স্ফোর্ড (১৯১৬-১৯২১) গবর্ণমেণ্ট মনোনীত প্রতিনিধির নাম ব্যবস্থাপরিষদে ১৯১৭, ৭ই ফেব্রুয়ারী প্রকাশ করলেন। এঁরা হলেন বিকানীরের মহারাজা, সার্ (পরে লর্ড) জেম্স্ মেষ্টন ও সার্ (পরে লর্ড) সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ। তাঁরা যথাসময়ে ঐ দুটি সভায়ই যোগদান করেন। ভের্সাই সন্ধি সভায়, রাষ্ট্রসঙ্ঘ বৈঠকে ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধি (অবশ্য সরকার মনোনীত) অতঃপর গৃহীত হ'তে থাকেন। সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সাম্রাজ্য সম্মেলনের সুযোগ নিয়ে প্রবাসী ভারতীয়দের কিঞ্চিৎ মঙ্গল সাধনে সক্ষম হন। ভারতবাসীদের চুক্তিবদ্ধ কুলি বা শ্রমিকরূপে গ্রহণ সাম্রাজ্যের সকল দেশের পক্ষেই নিষিদ্ধ হ'ল। উপনিবেশে ভ্রমণ, শিক্ষালাভ প্রভৃতি উদ্দেশ্যে সাময়িক ভাবে বসবাস করবার তারা অনুমতি পেলে, কিন্তু স্থির হ'ল নূতন ক'রে কেউ স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে পারবে না। আগে যারা

স্থায়ী বাসিন্দা হ'য়ে গেছে তারা অবশ্য থাকতে পারবে। কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি ব্রিটিশ উপনিবেশে ভারতবাসীদের দুর্দশার অন্ত ছিল না, সাম্রাজ্য সম্মেলনের এরূপ নির্দ্দেশের ফলে প্রবাসী ভারতীয়দের দুর্দশা কতকটা লাঘব হয়।

চরমপন্থী রাজনীতিকদের অনেকে নির্ভীকতা, স্বার্থত্যাগ, আদর্শনিষ্ঠা, দুঃখবরণে আগ্রহ প্রভৃতি গুণে স্বদেশবাসীর চিত্ত জয় করেছেন। তিলক, এনি বেসাণ্টও এসব কারণে দিকে দিকে অভিনন্দিত। কাজেই, সরকারের হস্তে নির্যাতিত কারারুদ্ধ বেসাণ্ট-মহোদয়াকে ১৯১৭ সালে কলকাতা অধিবেশনে সভাপতিপদে বরণের জন্য তিলক দেশবাসীর নিকট যে আবেদন জানালেন তাতে সকল দিক থেকেই অদ্ভুত সাড়া পাওয়া গেল। প্রত্যেক প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিই এনি বেসাণ্টকে সভাপতি-বরণে সম্মতি জানালে। বেসাণ্ট শীঘ্রই কারামুক্ত হলেন, সুতরাং তাঁর সভাপতি হওয়ার পক্ষে আর কোন বাধাই রইল না। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ প্রবীণ মডারেট রাজনীতিকগণ বেসাণ্টকে এ পদ দানে প্রথমে অসম্মত ছিলেন। এজন্য কলকাতায় চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যে বিরোধ এতটা ঘনীভূত হ'য়ে উঠে যে, দুটি অভ্যর্থনা-সমিতিও গঠিত হয়েছিল, পরে অবশ্য নরমপন্থীরা জনমতের নিকট মস্তক অবনত করতে বাধ্য হলেন। জনমতের নিকট তাদের এই শেষবার নতি স্বীকার। তাঁরা যদি জনমতকে অগ্রাহ্য ক'রে চলবার এতটা স্পর্দ্ধা না করতেন তা হ'লে দেশ সেবায় তাঁদের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা অধিকতর নিয়োজিত হ'তে পারত, স্বদেশ এবং স্বদেশবাসীও বিশেষ ভাবে উপকৃত হ'ত। কলকাতা কংগ্রেসই চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের শেষ সম্মিলিত কংগ্রেস। এবারের প্রতিনিধি সংখ্যা দাঁড়াল ৪,৯৬৭ জন। কংগ্রেস যে 'জনগণমন অধিনায়ক' হয়েছেন এবারকার এই সংখ্যাধিক্যেই তা সুস্পষ্ট।

এবারে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হলেন বহরমপুরের নেতা বৈকুণ্ঠনাথ সেন ও মূল সভাপতি হলেন সদ্য কারামুক্ত মিসেস্ এনি বেসাণ্ট। বেসাণ্ট মহাশয়া তাঁর সুচিন্তিত অভিভাষণে বললেন, শান্তির সময়ে সমৃদ্ধি ও যুদ্ধকালে নিরাপত্তা উভয়ের জন্যই ব্রিটেন ও ভারতবর্ষ প্রত্যেকে প্রত্যেকের অপেক্ষা রাখে। বিশেষ ভাবে নারীজাগরণের কথা উল্লেখ ক'রে তিনি এই মত প্রকাশ

করেন যে, ভারতে স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠার দাবি কেউই অগ্রাহ্য করতে পারবেন না। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, মৌলবী ফজলুল হক্, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এই অধিবেশন থেকে কংগ্রেসের কার্য্যে বিশেষ ভাবে আত্মনিয়োগ করেন।

ইতিমধ্যে ১৯১৭, ১০ই নবেম্বর ভারতসচিব মিঃ মণ্টেগু দলবল সহ ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য—বড়লাট, প্রাদেশিক লাটগণ, আমলাতন্ত্র ও নেতৃবর্গের সঙ্গে শলাপরামর্শ ক'রে একটি নূতন শাসনতন্ত্র রচনা ও পার্লামেণ্টে পেশ করা। ১৯১৮, ২৩শে এপ্রিল পর্য্যন্ত তিনি ভারতবর্ষে অবস্থান করেন ও বিভিন্ন কেন্দ্রে গমন ক'রে নানা প্রতিষ্ঠান, জননেতা ও অন্যান্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। মিঃ মণ্টেগু শাসন-সংস্কার সম্বলিত প্রস্তাবের রিপোর্ট অতঃপর পার্লামেণ্টে পেশ করলেন। সাধারণে রিপোর্ট প্রকাশিত হ'ল ১৯১৮, ৮ই জুলাই তারিখে। এই রিপোর্ট মিঃ মণ্টেগু ও লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড একযোগে রচনা করেন ও উভয়ের স্বাক্ষরে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। এজন্য এ রিপোর্টকে মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড বা সংক্ষেপে মণ্টফোর্ড রিপোর্ট বলা হয়।

মণ্টেগু সাহেব মাত্র সাড়ে পাঁচ মাস ভারতবর্ষে ছিলেন, কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই অদম্য উৎসাহের সঙ্গে অহোরাত্র পরিশ্রম ক'রে আমলাতন্ত্রের প্রবল বাধা সত্ত্বেও কাজ শেষ করতে পেরেছিলেন। এজন্য তিনি সকলেরই প্রশংসার্হ। কিন্তু ইচ্ছায় হোক্, অনিচ্ছায় হোক্ শেষে আমলাতন্ত্রের নিকটই তাঁকে নতি জানাতে হয়। তখন ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার বিপক্ষতা ক'রে প্রধানতঃ দু'শ্রেণীর ব্যক্তিরা—প্রথম, ভারতে স্থিত উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ কর্ম্মচারী বা এক কথায় ব্রিটিশ আমলাতন্ত্র; দ্বিতীয়, ভারতে স্থিত বে-সরকারী ইউরোপীয় সমাজ। বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ, বিশেষ ভারতসচিব মিঃ মণ্টেগু যখন ভারতবাসীদের শাসনাধিকার আংশিক ভাবেও স্বীকার করতে চাইলেন তখন এরা খুবই বাদ সাধ্‌তে থাকে। ইল্‌বার্ট বিলের সময় আত্মরক্ষার ওজুহাতে প্রতিষ্ঠিত ইউরোপীয় ডিফেন্স এসোশিয়েশন ১৯১৩ সালে ইউরোপীয়ান এসোশিয়েশন নাম গ্রহণ করেছিল। নূতন শাসন-সংস্কারের প্রস্তাবেই ১৯১৭ সালে এ আবার চাঙ্গা হ'য়ে ওঠে। এই সমিতি ইউরোপীয় সমাজের পক্ষ থেকে ভারতবাসীর

দেশ-শাসনে অযোগ্যতা ও নিজেদের স্বার্থরক্ষার আবশ্যকতা প্রতিপাদন ক'রে মণ্টেগু সমীপে স্মারকলিপি পাঠালে।

দক্ষিণ ভারতে 'হোমরুল' আন্দোলন যখন প্রবল হ'য়ে উঠে তখন মাদ্রাজে নন্-ব্রাহ্মণ পার্টি বা অব্রাহ্মণ দল গঠিত হ'ল। দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণেরা জ্ঞানে পাণ্ডিত্যে উন্নত ও সমাজের অধিপতি। সামাজিক রীতি নীতির কড়াকড়ি সেখানে খুব বেশী। মাদ্রাজে 'পঞ্চম' নামে এক অস্পৃশ্য শ্রেণীও বিদ্যমান। এরা ত পতিতই, মাদ্রাজে উচ্চশ্রেণীর অব্রাহ্মণরাও ব্রাহ্মণদের অনুরূপ সম্মান ও মর্য্যাদার অনধিকারী। ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ – এ দু' শ্রেণীর ভিতরকার বিরোধের সুযোগ নিয়েই এই সমিতির সৃষ্টি। এক কথায় এর নাম দেওয়া হ'ল জাষ্টিস্ পার্টি, মুখপত্র হ'ল দৈনিক 'জাষ্টিস্'। মণ্টেগু সাহেবের নিকট তারা অব্রাহ্মণদের জন্য বিশেষ সুবিধা, এমন কি পৃথক্ নির্ব্বাচন পর্য্যন্ত দাবি ক'রে বসল। পঞ্জাবের শিখ সম্প্রদায়ও মণ্টেগু সাহেবকে পৃথক্ নির্ব্বাচনের দাবি জানাল।

কংগ্রেস ও মোস্লেম লীগ এসময় ঐক্যবদ্ধ ভাবে রাষ্ট্রীয় আন্দোলন পরিচালনা করেন। তাঁদের ভারত-শাসনের আদর্শ কংগ্রেস-লীগ পরিকল্পনায় পরিব্যক্ত। ইউরোপীয় মহাসমরে মিত্রশক্তিবর্গ, বিশেষ ক'রে মিঃ লয়েড জর্জ্জ ও প্রেসিডেণ্ট উড্রো উইলসন যুদ্ধের উদ্দেশ্য যেরূপ বর্ণনা করেছেন তাতে হিন্দু-মুসলমান প্রগতিশীল নেতৃবৃন্দের পক্ষে ভারতবর্ষকে অবিলম্বে একটি আত্মনিয়ন্ত্রনক্ষম রাষ্ট্ররূপে দেখবার আকাঙ্ক্ষা হওয়াই স্বাভাবিক। কংগ্রেস-লীগ উভয়ত্রই এই শ্রেণীর লোকেরই প্রাধান্য। তাই মণ্টেগু সাহেব ভারতবর্ষে এসেই তাঁর প্রস্তাবিত শাসন-সংস্কারের সমর্থনে নরমপন্থীদের দিয়ে একটি বিশিষ্ট সঙ্ঘ গঠনে তৎপর হলেন।

ভারতবর্ষের রাজনীতিতে চরম ও নরমপন্থী দু' দলের অস্তিত্ব মণ্টেগু সাহেব সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন। তিনি ভূপেন্দ্রনাথ বসু ও সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের নিকট নরমপন্থীদের একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সঙ্ঘ স্থাপনের কথা উল্লেখ করেন। মণ্টেগু সাহেব তাঁর ১৯১৭, ১২ই ডিসেম্বর তারিখের রোজ-নামচায় এই মর্ম্মে লিখেছেন, "আমরা মডারেট পার্টি গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করলাম। তাঁরা (ভূপেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন) খুবই আগ্রহ দেখালেন,

সংবাদপত্র প্রকাশের কথা ও অন্যান্য বিষয়ও তাঁরা বললেন। আমার বিশ্বাস, কথায় ও কাজে তাঁরা ঠিক থাকবেন।" মডারেটরা কথায় ও কাজে সত্য সত্যই ঠিক রইলেন। শাসন-সংস্কার প্রস্তাব প্রকাশের পুর্ব্বেই ১৯১৮ সালের গোড়ায় কলকাতায় 'নেশনাল লিবার্যাল লীগ' প্রতিষ্ঠিত হ'ল! শাসন-সংস্কার প্রস্তাব প্রকাশের পরই সুরেন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে মডারেটরা সম্মিলিত হ'য়ে মণ্টেগু সাহেবের অজস্র সাধুবাদ করলেন। বোম্বাইয়ের মডারেটরাও এই মর্ম্মে বিবৃতি প্রকাশ করলেন। শাসন-সংস্কার আলোচনার আরম্ভেই বিলাতে লর্ড সিডেনহামের নেতৃত্বে একদল ভারত-শত্রু ইণ্ডো-ব্রিটিশ এসোশিয়েশন প্রতিষ্ঠা ক'রে মণ্টেগুর চেষ্টা পণ্ড করবার জন্য নিরতিশয় তৎপর হয়েছিল। ভারত-বর্ষের মডারেটগণ মণ্টেগুর প্রচেষ্টা সার্থক করবার জন্যই হয়ত তাঁকে অমন-ভাবে সমর্থন করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু স্বদেশবাসী চরমপন্থী নেতাদের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে স্বদেশের মঙ্গলসাধনে তাঁরা বিশেষ সক্ষম হন নি। শাসন-তন্ত্রে ভারতবাসীর অধিকার স্বীকৃত হ'লেও প্রকৃত প্রস্তাবে তাকে এ থেকে শত হস্ত দূরেই রাখা হ'ল। জনমত ক্রমে নরমপন্থীদের উপর বিরূপ হ'য়ে উঠল।

একদিকে নরমপন্থীরা মণ্টেগুর সাধুবাদ করতে লাগলেন, অন্যদিকে চরমপন্থীরা তাঁর প্রস্তাবের তীব্র সমালোচনা শুরু করলেন। বোম্বাইয়ে আগষ্ট মাসে মণ্টেগুর প্রস্তাব আলোচনার জন্য কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশন হ'ল। কংগ্রেসের ইতিহাসে বিশেষ অধিবেশন এই প্রথম। বোম্বাইয়ের চরমপন্থী নেতা বল্লভভাই ঝাভেরী পটেল হলেন অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি, সভাপতিত্ব করলেন পাটনা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি কংগ্রেসের প্রগতিশীল নেতা সৈয়দ হাসান ইমাম। এ অধিবেশনে চার হাজার ন' শ' আটষট্টি জন প্রতিনিধি যোগদান করেন। চরমপন্থী, নরমপন্থী, প্রগতিবাদী বিভিন্ন দলের মতের সামঞ্জস্য বিধান ক'রে কংগ্রেসে মণ্টেগু-প্রস্তাব সম্পর্কে এক প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক প্রস্তাব উত্থাপন ক'রে বলেন, "এক শ্রেণীর লোক বলছেন, কংগ্রেস মণ্টেগু-প্রস্তাব অগ্রাহ্য না ক'রে ছাড়বেন না। তাঁরা এ দ্বারা কি বোঝাতে চান জানি না। সৌভাগ্যের বিষয়, আমরা এমন একটি যুক্তিসিদ্ধ প্রস্তাব তৈরী করতে সক্ষম

হয়েছি যার ভিতর এক দলের অভিজ্ঞতা, অন্য দলের উগ্রতা ও তৃতীয় দলের ক্ষিপ্রকারিতার সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে। আমরা আট আনা স্বায়ত্ত-শাসন চেয়েছিলাম, তার বদলে পেয়েছি মাত্র এক আনা দায়িত্বশীল শাসন!" কংগ্রেস এ প্রস্তাব দ্বারা মণ্টেগু রিপোর্টের কতকগুলি বিষয়ের সমর্থন ও প্রশংসা করেন এবং অন্য বহু বিষয়ের দোষত্রুটি দেখিয়ে সংশোধনের আভাষ দেন। মডারেট দল বিশেষ অধিবেশনে যোগ না দিয়ে নবেম্বর মাসে স্বতন্ত্র সম্মেলন আহ্বান করলেন। অতঃপর প্রতিবছর তাঁরা বিভিন্ন কেন্দ্রে সমবেত হ'য়ে কংগ্রেসের পূর্ব্ব রীতি বজায় রেখে বিভিন্ন বিষয়ে নানা প্রস্তাব গ্রহণ ক'রে চলেছেন। শ্রীনিবাস শাস্ত্রী প্রমুখ দু' চার জন মডারেট প্রথম দিকে কংগ্রেসেও যোগদান করতেন।

এবারকার বিশেষ অধিবেশনে রৌলট কমিটির রিপোর্টের নিন্দা ক'রে প্রস্তাব উত্থাপন করেন চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়। এই রৌলট কমিটির সুপারিশে ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদে পর বছর রৌলট আইন বিধিবদ্ধ হয়। আগেকার ভারত-রক্ষা আইন বলে যোল শ' ভারতবাসীকে অন্তরীণ করা হয়েছিল। জাষ্টিস্ বীচক্রফ্‌ট্ ও জাষ্টিস্ চন্দাবরকার—এ দু' জনের উপর অন্তরীণদের বিষয় পরীক্ষার ভার দেওয়া হয়। তাঁরা আটশ' ছ' জনের বিষয় পরীক্ষা ক'রে মাত্র ছ' জনকে মুক্তি দানের সুপারিশ করেন! ভারত-রক্ষা আইন মাত্র যুদ্ধ কালের জন্যই বলবৎ থাকবে, সকলের এইরূপ ধারণা ছিল। রৌলট কমিটি ১৯১৮, ১৫ই এপ্রিল তাঁদের রিপোর্টে একে স্থায়ী করবারই নির্দ্দেশ দিলেন! এর পূর্ব্বে ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বড়লাট লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনকারীদের কঠোর হস্তে দমন করার জন্য আইন-প্রণয়নের হুমকী দেখান। অথচ এ সময় ভারতবর্ষে—এমন কি বাংলা ও পঞ্জাব বিপ্লবীদের এ দুই পীঠস্থানেও বিপ্লবাত্মক কর্ম্মের প্রায় অবসান হয়েছে। সুতরাং এ সময় ওরূপ আইন প্রণয়নের কোন আবশ্যকতাই ছিল না। তাই রৌলট কমিটির রিপোর্ট প্রকাশেই ভারতের সর্ব্বত্র এর প্রতিবাদ উত্থিত হয় ও ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা দমনই এ আইনের উদ্দেশ্য ব'লে বর্ণিত হয়। কংগ্রেস-প্রস্তাবে জনমতেরই প্রতিধ্বনি করা হ'ল।

একটি গুরুতর প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে সরকার এক প্রস্তাব করলেন।

গ্রাম্য পঞ্চায়েত বা ইউনিয়ন বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি, ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, লোক্যাল বোর্ড প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরকারী পরিভাষায় 'লোকাল সেল্‌ফ্‌ গবর্ণমেণ্ট' বা স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন বলা হয়। পূর্ব্বে লর্ড রিপণ জনসাধারণকে প্রতিনিধিমূলক শাসন-ব্যবস্থায় অভ্যস্থ করাবার জন্য নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তনের ও নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণকে কার্য্য পরিচালনায় অধিকার দানের প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাব অনুযায়ী বিভিন্ন প্রদেশে আইন পাস হ'লেও ঐ সব প্রতিষ্ঠানে জনপ্রতিনিধিদের কর্ত্তৃত্ব স্থাপিত হয় নি। বড়লাট লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডের আমলে ১৯১৮, ১৪ই মে তারিখে সরকার এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে, যাতে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের তিন-চতুর্থাংশ সদস্য নির্ব্বাচিত ও এক-চতুর্থাংশ মনোনীত এবং সভাপতি সদস্যগণ দ্বারা নির্ব্বাচিত ও সদস্যগণ আয়-ব্যয় নির্দ্ধারণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হন সে মর্ম্মে প্রত্যেক প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে আইন প্রণয়নে নির্দ্দেশ দেওয়া হবে। নূতন শাসন-সংস্কার বা ডায়ার্কি প্রবর্ত্তিত হ'লে নানাস্থানে এ উদ্দেশ্যে আইন বিধিবদ্ধ হয়েছে।

কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশন ১৯১৮ সালে দিল্লীতে যথারীতি অনুষ্ঠিত হ'ল। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হলেন হাকিম আজমল খাঁ, আর মূল সভাপতি হলেন পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়। প্রতিনিধি সংখ্যা হ'ল প্রায় পাঁচ হাজার। মডারেটগণ কংগ্রেসে যোগ দিলেন না। মণ্টেগু প্রস্তাবিত শাসন-সংস্কার নৈরাশ্যব্যঞ্জক ও অনাবশ্যক (disappointing and unnecessary') ব'লে একটি প্রস্তাবে উল্লিখিত হ'ল। বা'র থেকে চাপান শাসন-সংস্কারের বদলে ভারতবাসীর আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি জানিয়ে কংগ্রেস এক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। এ প্রস্তাবটিতে বলা হ'ল, "প্রেসিডেণ্ট উইলসন, মিঃ লয়েড জর্জ্জ ও অন্যান্য ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ জগতে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রগতিশীল জাতিসমূহের প্রতি যে আত্ম-নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রয়োগের ঘোষণা করছেন তার নিরিখে কংগ্রেস এই দাবী করেন যে, ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ও শান্তি-সম্মেলন কর্ত্তৃক ভারতবর্ষকে অন্যতম প্রগতিশীল রাষ্ট্র ব'লে স্বীকর করা হোক্‌ ও তার প্রতি আত্ম-নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রয়োগ করা হোক্‌।" ভারতবাসীদের দ্বারা ভারতবর্ষের শাসন প্রণালী নির্দ্ধারণ ও রচনার দাবি সর্ব্বপ্রথম আমরা এই প্রস্তাবের মধ্যেই পাই।

অধিবেশন আরম্ভের কয়েক দিন পূর্ব্বেই ১৯১৮, ১১ই ডিসেম্বর মিত্রশক্তি ও শত্রু পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ-বিরতি ঘোষিত হয় ও শান্তি-সম্মেলন আহ্বানের প্রস্তাব চলে। যুদ্ধকালে ভারতবর্ষ ধন জন ও সম্পদ দিয়ে ব্রিটেনকে সাহায্য করেছিল। এই সময় পনর লক্ষ ভারতবাসী মিত্রশক্তির পক্ষে যুদ্ধ করে ও এক লক্ষের উপর মারা যায়। নগদে ও জিনিসপত্রে হাজার কোটি টাকার উপর আমরা ভারতবাসীরা তখন ব্রিটিশকে দিয়েছি। এ ছাড়া প্রাচ্যে শান্তিরক্ষার জন্য যত সব আয়োজন হয় তার ব্যয়ভারের এক মোটা অংশ ভারত-সরকারকে বহন করতে হয়। সুতরাং শান্তি-সম্মেলনে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি গ্রহণ খুবই বাঞ্ছনীয়। তাই কংগ্রেস ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক, মহাত্মা গান্ধী ও সৈয়দ হাসান ইমামকে প্রতিনিধি প্রেরণের দাবী করেন। ভারত-সরকার কিন্তু মডারেট-প্রবর সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহকেই শান্তি-সম্মেলনে পাঠান।

পর বছর কংগ্রেস অধিবেশন হ'ল পঞ্জাবের অমৃতশহরে। কিন্তু এই এক বছরের মধ্যে ভারতবর্ষের ভিতরে ও বাইরে এমন কতকগুলি ব্যাপার ঘটে গেল যার জের মনুষ্য সমাজ আজও টানতে বাধ্য হয়েছে। মিত্রশক্তি-বর্গ বিজয় মদে মত্ত হ'য়ে ভের্সাই সন্ধিতে বিজিত শক্তিদের দণ্ড দানে খুবই তৎপর হ'ল। তুরস্কের ভাগ্য সম্বন্ধে মুসলমান জগৎ, বিশেষ ক'রে ভারতীয় মুসলমানরা খুবই সন্দিহান ছিল। প্রেসিডেণ্ট উইলসন, মিঃ লয়েড জর্জ্জ প্রভৃতির ঘোষণায়, বক্তৃতায় ও বিবৃতিতে সরল বিশ্বাসী লোকেরা বুঝেছিল, যুদ্ধান্তে এক দিকে পরাধীন রাষ্ট্রগুলি যেমন আত্ম-নিয়ন্ত্রণের তথা স্বদেশে নিজেদের কর্ত্তৃত্ব স্থাপনের অধিকার লাভ করবে অন্য দিকে তেমনি বিজিত রাষ্ট্রগুলির সার্ব্ব-ভৌমতা স্বীকারেও বাধা হবে না। যুদ্ধ শেষে ভের্সাই-এ বসে যেরূপ ভাবে সন্ধিপত্র রচিত হ'ল তাতে বিজিত রাষ্ট্রগুলির প্রতি বিজয়ীদের বিদ্বিষ্ট মনোভাব স্পষ্ট ফুটে উঠল। ইউরোপের 'রুগ্ন মানুষ' তুরস্ককে একেবারে মুছে ফেলার চেষ্টা হ'ল ইউরোপ থেকে। ভারতবর্ষের মুসলমান সমাজ তুর্কির প্রতি মিত্রশক্তি, বিশেষ ক'রে ব্রিটেনের ব্যবহারে যারপরনাই বিক্ষুব্ধ ও চঞ্চল হ'য়ে উঠল।

যুদ্ধকালে ভারতবর্ষের ধন-সম্পদ বিদেশে চলে যাওয়ায় দেশে ভীষণ অর্থাভাব উপস্থিত হয়। খাদ্যশস্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অত্যধিক মূল্য

বৃদ্ধি হেতু লোকের দুঃখ কষ্টের অন্ত অবধি রইল না। এর উপর করভার বৃদ্ধিতে জীবন একেবারে দুর্বিষহ হ'য়ে উঠল। এ সময় মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব ভারতবর্ষের জাতীয় ইতিহাসে একটি অত্যুজ্জ্বল ঘটনা। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় দীর্ঘ কুড়ি বৎসর সত্যাগ্রহ ও নিরুপদ্রব আন্দোলন পরিচালনা ক'রে প্রবাসী ভারতীয় সমস্যা সমাধানে অনেকটা সক্ষম হন ও ১৯১৫ সালে বিলাত হ'য়ে ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। প্রথমে গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লের পরামর্শে কিছুকাল ভারতবর্ষের অবস্থা তিনি নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করলেন। ১৯১৬ সাল থেকে প্রতি বছর কংগ্রেসে উপস্থিত হ'য়ে প্রবাসী ভারতীয়দের সমস্যা সম্বন্ধে নেতৃবর্গকে পরামর্শ দিতেন। যুদ্ধের মধ্যে বিহারের চম্পারন জেলার অবশিষ্ট নীলকরদের (কারণ বৈজ্ঞানিক উপায়ে নীল উৎপাদন আরম্ভ হ'লে নীল চাষ তখন প্রায় উঠে গিয়েছিল) অত্যাচারে নিঃসম্বল কৃষকদের দুর্দশা চরমে উঠে। আবেদন-নিবেদনে ফল না হওয়ায় মহাত্মা গান্ধী ১৯১৭ সালে এর বিরুদ্ধে সত্যাগ্র আন্দোলন আরম্ভ করেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে আন্দোলন আরম্ভ হবার পূর্ব্বেই সরকারের সুবুদ্ধি হ'ল। তাঁরা মহাত্মা গান্ধী ও অন্য দু'জন সদস্য নিয়ে একটি কমিশন বসালেন ও তাঁদের নির্দ্দেশ অনুযায়ী আইন ক'রে নীল-করদের অত্যাচার নিবারিত করলেন। পর বছর গুজরাটের খেড়া জেলায় অজন্মা হেতু দুর্ভিক্ষ হয়। সরকার খাজনা মকুব করতে অস্বীকার করায় প্রজাগণ গান্ধীজীর নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করলে আমলা-তন্ত্র প্রথম একে দমন করতেই চেষ্টা করলে কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই তাদের চৈতন্যের উদয় হ'ল। খাজনা যথাসম্ভব মকুব ক'রে ও আদায় বন্ধ রেখে তারা কৃষকদের দাবির ন্যায্যতা স্বীকার ক'রে নিলেন। আহ্‌মদাবাদের কল-মজুরদের ন্যায্য দাবি-দাওয়ার প্রতি কল-মালিকদের অবহিত করাবার জন্য মহাত্মা গান্ধী এ সময় একবার প্রায়োপবেশন করেন। ফলে মালিকগণ তাঁর প্রস্তাব অনেকাংশে গ্রহণ করেন। মহাত্মা গান্ধী ও শ্রীমতী অনসূয়া বাঈর চেষ্টা-উদ্যোগে আহ্‌মদাবাদে লেবার এসোশিয়েশন বা শ্রমিক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিছু আগে বলেছি, সরকার ভারত-রক্ষা আইন বলে বিপ্লব ও অরাজকতা দমনের জন্য রৌলট কমিটির সুপারিশে একটি স্থায়ী ব্যাপক আইন প্রণয়ন করতে উদ্যত হন। এ আইনটি 'রৌলট আইন' নামে অভিহিত। মুষ্টিমেয় সন্নিহান

বিপ্লবীকে দমন করবার ছলে ভারতবাসীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনার অধিকার খর্ব্ব ও সঙ্কুচিত করার আয়োজন হ'ল এ আইনে। সন্দেহ মাত্রেই গ্রেপ্তার ও নির্ব্বাসন, বিশেষ বিশেষ অঞ্চলকে আইন-শৃঙ্খলা-ভঙ্গকারী ব'লে ঘোষণা ও অধিবাসীদের প্রতি অনুরূপ আচরণ প্রভৃতি এ আইনের বিষয়-বস্তু। আইনের প্রস্তাবেই ভারতময় ভীষণ প্রতিবাদ উত্থিত হ'ল। কিন্তু সব প্রতিবাদ অগ্রাহ্য ক'রে কর্ত্তৃপক্ষ ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদে সরকারী সদস্যদের ভোটাধিক্যের জোরে ১৯১৯ সালের ১৮ই মার্চ্চ সত্য সত্যই এ আইন পাস করিয়ে নিলেন। আইনটির মেয়াদ অবশ্য শেষে করা হ'ল তিন বছর। এ নিয়ে এত বিক্ষোভ উপস্থিত হ'ল যে, ব্যবস্থাপরিষদের সদস্য পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, মিঃ মহম্মদ আলী জিন্না, পণ্ডিত বিষ্ণুদত্ত শুক্ল সদস্য পদে ইস্তফা দিলেন।

এ সময় মহাত্মা গান্ধী আশার বর্ত্তিকা হস্তে আমাদের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। তিনি ১৯১৯, ১লা মার্চ্চ ঘোষণা করলেন, প্রস্তাবিত গর্হিত আইন বিধিবদ্ধ হ'লে সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করবেন। আইন বিধিবদ্ধ হ'ল। গান্ধীজী বোম্বাইয়ে সত্যাগ্র সভা গঠন ক'রে প্রথম ৩০শে মার্চ্চ, পরে তারিখ পরিবর্ত্তন ক'রে ৬ই এপ্রিল সত্যাগ্রহের সূচনা স্বরূপ সর্ব্বত্র 'হরতাল' প্রতিপালনের আবেদন জানান। আসমুদ্র হিমাচল ভারতবাসীরা তাঁর এ আহ্বানে অদ্ভুত সাড়া দিলে। দিল্লীতে ও পঞ্জাবের কোন কোন স্থানে কিন্তু প্রথম দিনেও হরতাল প্রতিপালিত হয়েছিল। দিল্লীতে এই দিন জনতার উপর গুলি চালনা করা হয়। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ক্রুদ্ধ জনতাকে শান্ত করেন। অনুরুদ্ধ হ'য়ে তিনি হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ও সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে দিল্লীর জুম্মা মসজিদে বক্তৃতাও ক'রে ছিলেন। দ্বিতীয় তারিখে পঞ্জাবের সর্ব্বত্র যথারীতি হরতাল প্রতিপালিত হ'ল। পঞ্জাবের জবরদস্ত লাট সার্ মাইকেল ওডাওয়ারের আমলে যুদ্ধের সময় পঞ্জাব থেকে ধন ও জন সংগ্রহে যে সব গর্হিত উপায় অবলম্বিত হয়েছিল সেজন্য জনসাধারণ সরকারের উপর খুবই বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে উঠে। তারা একবাক্যে হরতাল প্রতিপালন ক'রে কর্ত্তৃপক্ষের তাক্ লাগিয়ে দিল। সার্ মাইকেল অতঃপর রৌলট আইনের বিরুদ্ধে সকল আন্দোলনই সমূলে বিনষ্ট করতে বদ্ধপরিকর হলেন।

ডাঃ সত্যপাল ও ডাঃ সফিউদ্দিন কিচ্‌লুকে ৯ই এপ্রিল পুলিশ গ্রেপ্তার করে। পর দিন অমৃতশহরে হরতাল প্রতিপালিত হয়। এই দিন যখন জনগণ সমবেত ভাবে রেল ষ্টেশনের দিকে অগ্রসর হ'তে থাকে তখন পুলিশ তাদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য দু'বার গুলি বর্ষণ করে। জনতা এতক্ষণ শান্তই ছিল। তারা অতঃপর ক্ষিপ্ত হ'য়ে কতকগুলি সরকারী আপিস ও ব্যাঙ্ক পুড়িয়ে দেয় ও ইংরাজদের উপর চড়াও হয়। ফলে কয়েকজন নিহত হয়। কর্তৃপক্ষের নির্দ্দেশে ১১ই এপ্রিল শহরে সৈন্য মোতায়েন হ'ল ও শান্তি রক্ষার ভার জেনারেল ডায়ারের উপর অর্পিত হ'ল। ১২ই তারিখে সভাসমিতি বন্ধ ক'রে এক বিজ্ঞপ্তি ঘোষণা করা হয়। কিন্তু এবিষয় সাধারণে যথাসময়ে অবগত হ'তে পারে নি। পূর্ব্ব নির্দ্দেশ মত জনপ্রিয় নেতৃদ্বয়ের মুক্তি দাবি করার জন্য ১৩ই এপ্রিল বৈকালে অন্যান্য দশ হাজার হিন্দু-মুসলমান ও শিখ জালিয়ানওয়ালাবাগের সভায় সমবেত হ'ল। জেনারেল ডায়ার এই সময়ে সৈন্য ও কামান বন্দুক নিয়ে সভাস্থলে উপনীত হলেন ও বাগের ভিতরকার উচ্চ স্থান থেকে জনতাকে গুলি করতে আদেশ দিলেন। জালিয়ানওয়ালাবাগে আগমন-নির্গমের একটি মাত্র প্রশস্ত ফটক। এর প্রায় চারিপার্শ্বই বড় বড় বাড়ী দ্বারা বেষ্টিত। ডায়ারের আদেশে সৈন্যগণ ফটক লক্ষ্য ক'রেই গুলি ছুড়ল। কিছুক্ষণ ধরে জালিয়ানওয়ালাবাগে রক্তগঙ্গা বয়ে চলল। সরকারী হিসাবে তিনশ' উনআশী জন ও বে-সরকারী হিসাবে প্রায় হাজার জন গুলির মুখে আত্মাহুতি দেয়। গুরুতর রূপে আহত হয়েছিল সরকারী মতে প্রায় দেড় হাজার। হত্যাকাণ্ডের পর হতাহত ব্যক্তিদের তত্ত্বাবধান করাও ডায়ার উচিত ব'লে বিবেচনা করলেন না। তিনি বিজয়ী বীরের মত সদর্পে নিজ ছাউনিতে চলে গেলেন। এখানে বলা আবশ্যক যে, জনতা সকলেই নিরস্ত্র ও শান্ত ছিল। পঞ্জাবের অন্যত্রও দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও ধরপাকড় হ'ল। লাহোর থেকে লালা হরকিষণ লাল ও রামভজ দত্ত চৌধুরী নির্ব্বাসিত হলেন।

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর স্যর্ মাইকেল ওডাওয়ার বড়লাট লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডের অনুমতি নিয়ে ১৮০৪ সালের এক জরাজীর্ণ আইন বলে পঞ্জাবের লাহোর ও অমৃতশহরে ১৫ই এপ্রিল এবং গুজরানওয়ালা ও অন্য কয়েকটি জেলায় ১৬ই, ১৭শে, ও ২০শে এপ্রিল মার্শাল ল' বা

সামরিক আইন জারি করলেন। এ আইন রেলওয়ে জমি ছাড়া অন্যত্র ১১ই জুন ও এখানেও ২৫শে আগষ্ট পর্য্যন্ত বাহাল থাকে। এতদিন সামরিক আইন বাহাল করায় বড়লাটও শাসন-পরিষদের একমাত্র ভারতীয় সদস্য সার্ চিত্তর শঙ্করন নায়ার পদত্যাগ করলেন। সামরিক আইনের সময় বাইরের কোন নেতাকেই পঞ্জাবে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় নি। সি. এফ. এণ্ড্রুজ পঞ্জাবে প্রবেশ করায় ধৃত হন। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ও পঞ্জাব গমনের চেষ্টা ক'রে ব্যর্থকাম হলেন। সংবাদপত্রে তখন কোনও কথা প্রকাশ করা নিষিদ্ধ ছিল। পরে যখন এই সময়কার সরকারী অনাচারের কথা প্রকাশ পেল তখন ভারতবাসী স্তব্ধ হ'য়ে গেল। নেতৃবর্গের নির্ব্বাসন, ছাত্র ও শিক্ষকদের নির্ব্বিচারে কারাগারে প্রেরণ, একটি বিশিষ্ট রাস্তায় লোকজনের হামাগুড়ি দিয়ে যেতে বাধ্য করা, জনগণকে প্রকাশ্য স্থানে বেত্র দ্বারা প্রহার, পাঁচ থেকে সাত বছরের ছেলেদের দিয়ে ব্রিটিশপতাকা অভিবাদন করান, হাতে শিকল ও কোমরে দড়ি দিয়ে বেঁধে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লোকদের দাঁড় করিয়ে রাখা, একটা বড় খোঁয়াড়ে বন্দীদের বদ্ধ করা প্রভৃতি সামরিক আইনের আমলে অনুষ্ঠিত অত্যাচারের কয়েকটি নমুনা মাত্র। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃপক্ষের এই অনাচারের প্রতিবাদ স্বরূপ ভুয়ো রাজ সম্মানের নিদর্শন 'নাইট হুড্' উপাধি বর্জ্জন ক'রে অনাচারে জর্জ্জরিত দেশবাসীদের পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়ালেন। পঞ্জাবের অনাচার নিয়ে ভারতবর্ষে এরূপ ব্যাপক ও তীব্র আন্দোলন সুরু হ'ল যে, গবর্ণমেণ্ট পরবর্ত্তী অক্টোবর মাসে লর্ড হাণ্টারের সভাপতিত্বে একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করলেন। ভারতবাসীরা রয়াল কমিশন চেয়েছিল, কেননা স্বয়ং ভারত গবর্ণমেণ্টও যে এ অনাচারের জন্য দায়ী! কমিটির কার্য্য আরম্ভ হবার পূর্ব্বেই সরকার ব্যবস্থাপরিষদে 'ইণ্ডেম্‌নিটি' বা কসুর মাপ আইন পাস করিয়ে অনাচারে লিপ্ত রাজকর্ম্মচারীদের ক্ষতিপূরণ বা অন্যবিধ দায় থেকে অব্যাহতি দেবার ব্যবস্থা করলেন। এই আইনের আলোচনার সুযোগে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় অনাচার সম্পর্কে এক মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা করেন। বক্তৃতায় সব বিষয় শুনে লোকে শিউরে উঠল। ওদিকে কংগ্রেসও জনমত শিরোধার্য্য ক'রে একটি স্বতন্ত্র অনুসন্ধান কমিটি গঠন করেন।

মহাত্মা গান্ধীর দিল্লী ও পঞ্জাব প্রবেশ নিষিদ্ধ হ'ল। তিনি ইতিপূর্ব্বে

দিল্লী রওনা হ'য়ে পথিমধ্যে সরকার কর্ত্তৃক ধৃত হন। বোম্বাইয়ে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তাঁর গ্রেপ্তারের সংবাদে দিল্লী, আহ্মদাবাদ প্রভৃতি নানাস্থানে দাঙ্গা হাঙ্গামা হ'য়ে লোকক্ষয় হ'ল। গান্ধীজী স্বয়ং আহ্মদাবাদে গমন করেন ও তাঁর নির্দ্দেশে জনতা সর্ব্বত্র আবার শান্তভাব ধারণ করে। তিনি অতঃপর সত্যাগ্রহ আন্দোলন স্থগিত রাখেন। অক্টোবর মাসে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হ'লে গান্ধীজী পঞ্জাব যান ও সব বিষয় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন। কংগ্রেস যে কমিটি বসালেন তার অন্যতম সদস্য হিসাবে তিনি পঞ্জাবের অত্যাচারিত অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেন। অনুসন্ধান কালে কোন মতামত প্রকাশ অবিধেয় ব'লে তিনি ঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

ভারতবর্ষে এইরূপ প্রবল বিক্ষোভের মধ্যে মণ্টেগু-চেম্স্ফোর্ড শাসন-সংস্কার ১৯১৯, ২৩শে ডিসেম্বর ভারত-সংস্কার আইন নামে বিধিবদ্ধ হ'ল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সহকারী ভারতসচিব রূপে লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ হাউস্ অফ্ লর্ডস্‌এ আইন উত্থাপন করেন। সিংহ মহাশয় ইতিপূর্ব্বেই লর্ড উপাধি লাভ করায় লর্ড সভায় আসন গ্রহণ করেছিলেন। এই শাসন-সংস্কারকে এক কথায় নাম দেওয়া হ'ল ডায়ার্কি। লায়নেল কার্টিস ১৯১৫ সালে বিলাতে বসে সার্ উইলিয়ম ডিউকের সহযোগে ভারত-শাসনের একটি পরিকল্পনা স্থির করেন। সার্ উইলিয়ম মেয়ার এই পরিকল্পনাটির নাম দেন ডায়ার্কি। ভারতসচিব মিঃ মণ্টেগু অন্য সব পরিকল্পনা, যায় কংগ্রেস-লীগ স্কীম অগ্রাহ্য ক'রে উক্ত পরিকল্পনা ও নাম পর্য্যন্ত মূলতঃ গ্রহণ করেন। ডায়ার্কির অর্থ—দ্বৈত-শাসন। ভারতবর্ষের প্রদেশগুলিতে এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়। ভারতসচিব, ভারত গবর্ণমেণ্ট ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির কর্ত্তৃত্ব ও দায়িত্ব নির্দ্ধারণ ক'রে দেওয়া হ'ল এ আইনে। ভারতসচিবের কৌন্সিলের সদস্য সংখ্যা অনূর্দ্ধ বার ও অন্যূন আট ধার্য্য করা হ'ল। তাঁর কর্ত্তব্য ভাগ ক'রে বিলাতে ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-সমূহ একজন হাই কমিশনারের উপর প্রদত্ত হ'ল। অর্থ সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্টের স্বাধীন ভাবে কার্য্য পরিচালনার ক্ষমতা স্বীকৃত হ'ল। ব্যবস্থাপরিষদে নির্ব্বাচিত সদস্যরা সংখ্যাধিক্য লাভ করলেও গবর্ণমেণ্টের নীতি নিয়ন্ত্রণে তাঁদের কোন ক্ষমতা বা দায়িত্ব স্বীকৃত হ'ল না। ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদে সদস্যগণ বজেট আলোচনায় যোগ দানের অধিকার

ও বিশেষ বিশেষ দফা (যেমন—সৈন্য ব্যয়, সিবিলিয়ান কর্ম্মচারীদের বেতন, ভাতা ইত্যাদি) ছাড়া অন্য সব বিষয়ে ভোটদানের ক্ষমতা লাভ করলেন। কিন্তু কোন প্রস্তাব অধিকাংশের ভোটে অগ্রাহ্য হ'লেও বড়লাট বিশেষ ক্ষমতা বলে তা বাহাল রাখতে পারবেন স্থির হ'ল। প্রদেশ সম্পর্কেও এই একই ব্যবস্থা। শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ভারতীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপরিষদ-গুলির উপরে বড়লাট ও প্রাদেশিক লাটদের বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হ'ল। তাঁরা নিজ দায়িত্বে ছ' মাসের জন্য অর্ডিনান্স বা জরুরী আইন জারি করতে পারবেন। তবে ছ'মাস পরে ব্যবস্থাপরিষদে তা পেশ করারও কথা হয়। কিন্তু পরিষদ অগ্রাহ্য করলে নিজ দায়িত্বে একে স্থায়ী আইনে পরিণত করার ক্ষমতাও তাঁদের দেওয়া হ'ল। ভারতবাসীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এইরূপে কার্য্যতঃ অস্বীকার করা হয়।

এ আইন দ্বারা প্রদেশসমূহেই ডায়ার্কি শাসন প্রবর্ত্তিত হয়। প্রাদেশিক বিভাগগুলিকে দু'ভাগ ক'রে দেশ-শাসনের পক্ষে অপেক্ষাকৃত অধিক গুরুত্বপূর্ণ (যেমন—রাজস্ব, পুলিশ, আইন-আদালত প্রভৃতি) অংশ সরকার নিজ হস্তে রাখলেন ও এর নাম দিলেন 'রিজার্ভড্' বা 'সংরক্ষিত', আর অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ (যেমন—স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি) অংশ ছেড়ে দিলেন নির্ব্বাচিত সদস্যদের মধ্য থেকে নিযুক্ত মন্ত্রীদের হাতে। এ অংশের নামকরণ হ'ল ট্রান্স্‌ফারড্ বা হস্তান্তরিত। কিন্তু রাজস্ব সচিবের নিকট, তথা প্রত্যক্ষ ভাবে সরকারের নিকট মন্ত্রীদের হাত-পা বাঁধা ; কোন নূতন প্রস্তাব বা পরিকল্পনা রাজস্ব বিভাগ পরীক্ষা ক'রে অনুমতি না দিলে তা ব্যবস্থা-পরিষদে উত্থাপনের ক্ষমতা তাঁদের দেওয়া হ'ল না। নিখিল-ভারতীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির প্রত্যেকের আয়ের পন্থা ধারাক্রমে নির্দ্ধারিত হ'ল। প্রতি বছর প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির পক্ষে ভারতগবর্ণমেণ্টকে দেয় রাজস্ব মেষ্টন কমিটি নির্ণয় ক'রে দিলেন।

দীর্ঘকাল আন্দোলনের ফলে এবারেই ভারতবাসী সাক্ষাৎ ভাবে ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার পেলে। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপরিষদগুলিতে সদস্য-নির্ব্বাচক ভোটদাতাদের সংখ্যা হ'ল ৫৩ লক্ষ। নারীরা এবারেও ভোটদানে অধিকার পেলেন না, তবে এরূপ নির্দ্দেশ দেওয়া হ'ল যে, প্রাদেশিক

ব্যবস্থাপরিষদগুলি গঠিত হবার পর তাঁরা ইচ্ছা করলে নিজ নিজ প্রদেশে নারীর ভোটাধিকার দান করতে পারবেন। পরে কোন কোন ব্যবস্থাপরিষদ নারীদের এ অধিকার দিয়েছিলেন। নিখিল-ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদে ও কৌন্সিল অফ্ ষ্টেটে (এটি এবারে নূতন গঠিত হয়) নির্দ্দিষ্টসংখ্যক সদস্য সাক্ষাৎ ভোটেই নির্ব্বাচিত হতেন। তবে দ্বিতীয়টিতে নির্ব্বাচকমণ্ডলী এমনভাবে গঠিত হয় যে, সরকার অধিকাংশ সদস্যকেই নিজ মতানুবর্ত্তী ক'রে নিতে পারেন।

এখানে বলা আবশ্যক যে, নিখিল-ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদেও নির্ব্বাচিত সদস্যের সংখ্যাধিক্য ছিল। প্রথমটির ভোটদাতাদের সংখ্যা দশ লক্ষ, ও দ্বিতীয়টির সংখ্যা ১৭,৩৬৪। নূতন আইনে গবর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের উচ্চতন পদগুলিতে অধিকসংখ্যায় ভারতীয় নিয়োগের কথা হ'ল। সিবিল সার্বিসের এক তৃতীয়াংশ পদে ভারতবাসী নিয়োগের প্রস্তাব হয় ও প্রতিবছর এ হার বৃদ্ধির নির্দ্দেশ থাকে। বিলাতে ও ভারতবর্ষে একই সময়ে পরীক্ষা গ্রহণের দাবিও অংশতঃ পূরণের ব্যবস্থা হ'ল। এর সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ব্রিটিশ সিবিলিয়ানদের বেতন, পেন্সন, ভাতা, ছুটি প্রভৃতি বাড়াবারও ব্যবস্থা হ'ল। এবার কমিটি সৈন্য বিভাগ ও লী কমিশন সাধারণ শাসন-বিভাগগুলি সম্বন্ধে শীঘ্রই এ বিষয়ে ব্যবস্থা করলেন।

এবারকার শাসন-সংস্কারে কিন্তু পূর্ব্বেকার পৃথক্ নির্ব্বাচন প্রথা আরও ব্যাপকতর হয়। ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌ শহরে কংগ্রেস ও মোস্‌লেম লীগ আত্ম-নিয়ন্ত্রণের আদর্শ সম্মুখে রেখে স্বরাজের প্রথম ধাপ হিসাবে পৃথক্ নির্ব্বাচনের ভিত্তিতে হিন্দু ও মুসলমান সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট ক'রে একটি পরিকল্পনা রচনা করেন। বর্ত্তমান শাসন-সংস্কারে এই পরিকল্পনার আদর্শ ও কর্ম্ম-পদ্ধতি সবই অগ্রাহ্য হ'ল বটে, কিন্তু পৃথক্ নির্ব্বাচন ও মুসলমান সদস্য সংখ্যার ধারা দুইটি কর্ত্তৃপক্ষ গ্রহণ করলেন। এর সাহায্যে পরবর্ত্তীকালে ভারতবর্ষের প্রধান দু'শ্রেণীর মধ্যে বিরোধ পাকিয়ে তোলা স্বার্থান্বেষীদের পক্ষে সম্ভবপর হয়েছে। পঞ্জাবে শিখরা ও ভারতের সর্ব্বত্র ইউরোপীয়, ফিরিঙ্গি ও ভারতীয় খ্রীষ্টানরা পৃথক্ নির্ব্বাচনের অধিকার লাভ করলে। জমিদার, বিশ্ববিদ্যালয়, বণিকসভা প্রভৃতি নিয়ে বিশেষ নির্ব্বাচক-মণ্ডলী গঠিত হ'ল। ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদ ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপরিষদগুলির সভাপতি প্রথম চার বছর সরকার মনোনীত করবেন ও

চার বছর অন্তে প্রত্যেকে নিজ নিজ সভাপতি নির্ব্বাচনের অধিকার পাবেন স্থির হ'ল। ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদ ও কৌন্সিল অফ্ ষ্টেটের সদস্য সংখ্যা যথাক্রমে ঠিক হ'ল ১৪৩ ও ৬০, এর ভিতরে নির্ব্বাচিত সদস্য সংখ্যা যথাক্রমে ১০৩ ও ৩৪ জন। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপরিষদগুলিতে মনোনীত ও নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি-সংখ্যা নির্ণীত হ'ল এইরূপ,

ব্যবস্থাপরিষদ	নির্ব্বাচিত সদস্য			সরকার কর্ত্তৃক	
	সাধারণ	পৃথক্	বিশেষ	মনোনীত	মোট
বাংলা	৪৬	৪৬	২১	২৬	১৩৯
মাদ্রাজ	৬৫	২০	১৩	২৯	১২৭
বোম্বাই	৪৬	২৯	১১	২৫	১১১
যুক্ত-প্রদেশ	৬০	৩০	১০	২৩	১২৩
পঞ্জাব	২০	৪৪	৭	২২	৯৩
বিহার-উড়িষ্যা	৪৮	১৯	৯	২৭	১০৩
মধ্যপ্রদেশ	৪০	৭	৭	১৬	৭০
আসাম	২১	১২	৬	১৭	৫৬

এ পর্য্যন্ত ভারতে শাসন-পদ্ধতির সঙ্গে করদ ও মিত্র রাজাদের জড়িত করার কোন ব্যবস্থা হয় নি। এবারে উক্ত আইনভুক্ত না হ'লেও ভারতীয় রাজন্যবর্গকে একটি নিয়মিত সঙ্ঘের অধীন করবার জন্য 'চেম্বার অফ্ প্রিন্সেস্' গঠনের প্রস্তাব হ'ল। এ সঙ্ঘের অধিবেশন বছরে একবার হবে ও এর কার্য্যক্রম স্বয়ং বড়লাট নির্দ্ধারিত করবেন স্থির হয়। মণ্টফোর্ড রিপোর্টেই ব্রিটিশ-ভারত ও রাজন্য-ভারতে সম্মেলনে একটি নিখিল-ভারত ফেডারেশন প্রতিষ্ঠার আভাস দেওয়া হয়।

শাসন-সংস্কার আইন বিধিবদ্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে একটি রাজকীয় ঘোষণায় রাজবন্দী ও অন্যান্য বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর দণ্ডিত ব্যক্তিদের মুক্তি দেওয়া হ'ল। পঞ্জাবে সামরিক আইনে দণ্ডিত ও ধৃত বন্দীরাও মুক্তি পেলেন। এইরূপ অবস্থার মধ্যে এবারে অমৃতশহরে কংগ্রেসের অধিবেশন হ'ল। মুক্তবন্দীরা

প্রায় সকলেই কংগ্রেসে যোগ দিলেন, আলীভ্রাতৃদ্বয়ও মুক্তি পেয়ে যথাসময়ে কংগ্রেসে উপস্থিত হন। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি স্বামী শ্রদ্ধানন্দ পঞ্জাবের এই দুর্দ্দিনে মতভেদ ভুলে সকলকে কংগ্রেসে যোগদান করতে আবেদন জানিয়েছিলেন। মডারেটরা কিন্তু এতে সাড়া দিলেন না। তাঁরা কংগ্রেস অধিবেশনের অব্যবহিত পরেই কলকাতায় স্বতন্ত্র সম্মেলন করলেন। অবশ্য শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ও নরসিংহ শর্ম্মা এবারেও কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন। মূল সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহ্‌রুর অভিভাষণের প্রতি ছত্র পঞ্জাবের অত্যাচারিতদের প্রতি সমবেদনায় ভরপুর। পঞ্জাবে অনুষ্ঠিত অনাচার তদন্তাধীন বিধায় কংগ্রেস মতামত প্রকাশ না করলেও বড়লাট লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড ও সার্ মাইকেল ওডাওয়ারকেই এসবের জন্য মূলতঃ দায়ী করলেন ও দায়িত্বপূর্ণ পদ থেকে তাঁদের অব্যাহতি দিতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানালেন। রৌলট আইন, কস্টুর মাপ আইন প্রভৃতির জন্যও গবর্ণমেণ্টের নিন্দাবাদ করা হ'ল। কিন্তু গতবারের মত এবারকার অধিবেশনেরও প্রধান প্রস্তাব হ'ল শাসন-সংস্কার সম্পর্কে। কংগ্রেস-লীগ পরিকল্পনার ভিত্তি মণ্টফোর্ড শাসন-সংস্কারে একেবারে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। তাই কংগ্রেস দৃঢ়তার সঙ্গে এই মত প্রকাশ করলেন যে, ভারতবাসীরা পূর্ণ দায়িত্বশীল স্বায়ত্ত-শাসনের সম্পূর্ণ উপযুক্ত, সুতরাং নূতন আইনে যেরূপ শাসন-সংস্কারের প্রস্তাব করা হয়েছে তা অযথেষ্ট, অসন্তোষজনক ও নৈরাশ্যব্যঞ্জক ("inadequate, unsatisfactory and disappointing")। মণ্টেগু সাহেবের চেষ্টা-যত্নের জন্য কংগ্রেস তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে ত্রুটি করেন নি। মোস্‌লেম লীগের অধিবেশনেও অনুরূপ প্রস্তাব গৃহীত হ'ল।

যুগসন্ধিক্ষণে মহাত্মা গান্ধী

অমৃতশহর কংগ্রেসে আসন্ন শাসন-সংস্কার সম্পর্কে সুচিন্তিত প্রস্তাব গৃহীত হ'ল বটে, কিন্তু তুরস্কের ভাবী দুরবস্থার আঁচ পেয়েও কংগ্রেস একটি প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। কিন্তু পঞ্জাবের অনাচার সম্পর্কে তখনও তদন্ত কমিটির রিপোর্ট বার না হওয়ায় ব্যাপক ভাবে কোন প্রস্তাব উত্থাপন করা সম্ভব হয় নি। তবে শীঘ্রই যে ভারতের রাজনৈতিক গগনে এক ভীষণ ঝড় উঠতে পারে তার আভাস পাওয়া গেল।

১৯২০ সালের ১লা জানুয়ারী একটি বিশেষ কারণে স্মরণীয়। প্রায় শত বর্ষ ধরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে মরিসস্‌, দক্ষিণ আফ্রিকা, পূর্ব্ব আফ্রিকা, মালয়, ফিজি দ্বীপপুঞ্জ, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি অঞ্চলে ভারতবর্ষ থেকে ঠিকা মজুর প্রেরণের যে রীতি বলবৎ ছিল ১৯১৯ সালের শেষ ভাগে ভারত-সরকার আইন ক'রে তা বন্ধ ক'রে দিলেন। এজন্য কালবিলম্ব না ক'রে ১লা জানুয়ারী এই উপলক্ষে আনন্দোৎসব করা ধার্য্য হ'ল। আর মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর নেতৃত্বেই এ উৎসব সম্পন্ন হয়। প্রবাসী ভারতীয়দের অকৃত্রিম বন্ধু মহামতি সি. এফ. এণ্ড্রুজের নাম এ প্রসঙ্গে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। তিনি মূলে ছিলেন পাদ্রী, প্রথমে দিল্লীর সেণ্ট ষ্টিফেন্‌স্‌ কলেজে অধ্যাপনা কার্য্যে ব্রতী হন। ক্রমে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতা কার্য্যে যোগদান করেন। এখানে ডব্‌লিউ পীয়ার্সন তাঁর সহকর্ম্মী হন। ভারতবর্ষে ও বহির্ভারতে ভারতবাসীর সেবায় এণ্ড্রুজ সাহেব সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। লোকে তাঁকে আদর ক'রে 'দীনবন্ধু' এণ্ড্রুজ নাম দিয়েছিল। ১৯৪০ সালে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। এণ্ড্রুজ ভারতবর্ষের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে বহু পুস্তক প্রণয়ন করেছেন। তিনি ছিলেন ভারতবাসীর পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষপাতী। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ই স্বাধীনতার আবশ্যকতা প্রতিপাদন ক'রে "*Indian Independence—the*

Immediate Need" শীর্ষক একখানি পুস্তক লেখেন। দক্ষিণ আফ্রিকা প্রবাসী ভারতীয়দের অন্যতম অকৃত্রিম বন্ধু মিঃ এইচ. এস. এল. পোলকের নামও এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

ভারতবাসীর এ আনন্দ কিন্তু অধিক দিন স্থায়ী হ'ল না। শীঘ্রই তুরস্কের প্রতি মিত্রশক্তিদের, বিশেষ ক'রে, ব্রিটিশের কঠোর মনোভাব প্রকটিত হ'য়ে পড়ল। ভারতবর্ষের মুসলমান সমাজে এজন্য ভীষণ বিক্ষোভ উপস্থিত হয়। তুরস্কের সুলতান মুসলমান জগতের খলিফা ও পবিত্র তীর্থস্থানসমূহের রক্ষক। তাঁর রাজ্যচ্যুতি ঘটলে বা তুর্কী সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হ'লে মুসলমান সমাজের ধর্ম্মহানির বিশেষ আশঙ্কা। বড়লাট লর্ড চেমস্‌ফোর্ডের নিকট ও বিলাতে ভারতসচিব মিঃ মণ্টেগু এবং প্রধান মন্ত্রী মিঃ লয়েড জর্জ্জের নিকট প্রতিনিধি দল প্রেরিত হ'ল। কিন্তু কোন ফলই হ'ল না। বড়লাট তো স্পষ্ট ক'রেই বললেন যে, মিত্রশক্তিদের সমবেত সিদ্ধান্ত ব্রিটেনকে মেনেই নিতে হবে। এর প্রতিকারের জন্য মহাত্মা গান্ধী মুসলমান নেতৃবৃন্দকে সম্পূর্ণরূপে আত্ম-শক্তির উপর নির্ভর করতে উপদেশ দিলেন ও তাঁদের নিকট অহিংসা অসহযোগের প্রস্তাব করলেন।

বস্তুতঃ যখন সেভার্স সন্ধির সর্ত্ত (১৪ই মে, ১৯২০) প্রকাশিত হ'ল তখন মিত্রশক্তি তথা ব্রিটেনের মনোভাব বুঝতে কারো বাকী রইল না। কনষ্ট্যান্টিনোপ্‌লে তুর্কী সুলতান মিত্রশক্তিবর্গের নজরবন্দী হ'য়ে রইলেন। তুরস্কের ইউরোপেস্থিত অংশ একটি কমিশনের শাসনাধীন হ'ল, তুর্কী সাম্রাজ্য—আরব, পালেষ্টাইন, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া (বর্ত্তমান নাম ইরাক) ব্রিটিশ ও ফরাসীরা ম্যাণ্ডেটের আবরণে নিজ নিজ সুবিধা মত আয়ত্ত ক'রে নিলে। মাত্র এশিয়া মাইনরে যেখানে খাঁটি তুর্কীদের বাস সেই অঞ্চলটি সুলতানের অধীনে রাখার ব্যবস্থা হ'ল। যে পর্য্যন্ত না তুর্কীরা এ সব সর্ত্তে রাজী হয় ততদিন সুলতানকে মিত্রশক্তি-বাহিনীর সাহায্যে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে। এরূপ হীন সর্ত্তাবলী প্রকাশে ভারতীয় মুসলমানগণ স্বভাবতঃই ব্রিটেনকেই দায়ী করলে। মহাত্মা গান্ধী তাদের এই বিপদে সহায় হলেন। এলাহাবাদে নিখিল-ভারত মোস্‌লেম লীগের কৌন্সিল বা কার্য্যকরী সমিতিতে গান্ধীজী অসহযোগের মর্ম্ম ও গুরুত্ব বুঝিয়ে দিলে নেতৃবর্গ এতে তাঁদের সম্মতি

জানালেন। ২৮শে মে তারিখে বোম্বাই শহরে অনুষ্ঠিত খিলাফৎ সম্মেলনে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়। মুসলমানগণ হিন্দুসমাজের সঙ্গে একযোগে কার্য্য করবার প্রয়োজনীয়তা এবারেও বিশেষ ক'রে অনুভব করলে। বাস্তবিক, তুরস্ক এক হিসাবে ভারতবর্ষের প্রকৃত বন্ধু। স্বদেশী আন্দোলনের সময় ভেদ-নীতির প্রকোপে হিন্দু-মুসলমান যখন পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হবার উপক্রম হয় তখন এল তুরস্কের বিপদ। ১৯১১-১৩ সাল, এই তিন বছর তুর্কীর উপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে যায় তাতে মুসলমানগণ শাসক-জাতির উপর আস্থা রাখতে না পেরে, হিন্দু সমাজের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ ভাবে চলবার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ ভাবে অনুভব করে। ভারতের অসহযোগ আন্দোলন সেভার্স সন্ধি নাকচে এবং মিত্রশক্তি ও তুর্কীর মধ্যে লজান সন্ধি সংশোধনে বিশেষ সহায়তা করেছে। মহাত্মা গান্ধীর নাম তুর্কী সমাজে আজও বিশেষ শ্রদ্ধার উদ্রেক করে।

পঞ্জাবের অনাচারে ভারতবাসী মাত্রেই বিক্ষুব্ধ। কংগ্রেস সাবকমিটির রিপোর্ট বের হ'ল ২৫শে মার্চ্চ। এ রিপোর্টে স্বাক্ষর করেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, চিত্তরঞ্জন দাশ, মুকুন্দ রামরাও জয়াকর, ফজলুল্ হক্ ও আব্বাস তায়েবজী। তাঁদের কার্য্যে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেন দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, জবাহরলাল নেহ্রু, সান্তনম্ ও পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়। স্বাক্ষরকারিগণ পঞ্জাবে কোনরূপ বিদ্রোহের লক্ষণ দেখতে পান নি। এসব অনাচারের জন্য তাঁরা সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ ভাবে বড়লাট লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড, সার্ মাইকেল ওডাওয়ার, জেনারেল ডায়ার থেকে আরম্ভ ক'রে বহু উচ্চ ও নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীকে দায়ী করলেন।

গবর্ণমেণ্ট নিযুক্ত হাণ্টার কমিটির রিপোর্ট বের হয় পরবর্ত্তী ২৮শে মে। সভ্যগণ একমত হ'য়ে রিপোর্ট দিতে পারেন নি। কমিটির সদস্য চিমনলাল শীতলবাদ ও পণ্ডিত জগৎনারায়ণ লাল স্বতন্ত্র রিপোর্ট দেন। তাঁরা পঞ্জাবে সামরিক আইন জারির যুক্তিযুক্ততা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন ও এর উপর ভিত্তি ক'রে তাঁদের সিদ্ধান্ত নির্দ্ধারিত হয়। কংগ্রেস তদন্ত কমিটির রিপোর্টের সঙ্গে তাই মূল বিষয়ে এ দু'জন সভ্য প্রায় একমত ছিলেন। কিন্তু হাণ্টার কমিটির অধিকাংশ সভ্য (ইংরেজ) সামরিক আইনের প্রয়োজনীয়তার সপক্ষে

মত প্রকাশ করলেন ও অত্যাচারী কর্ম্মচারীদের মৃদু ভর্ৎসনা ক'রেই নিরস্ত রইলেন। তবে তাঁরা একথা স্বীকার না ক'রে পারলেন না যে, পঞ্জাবে ব্রিটিশ-রাজের বিরুদ্ধে কোন বিদ্রোহ বা ষড়যন্ত্রের আয়োজন বা আফগান যুদ্ধের সঙ্গে এর কোন সংস্রব ছিল না। তাঁরা আরও বললেন যে, অতক্ষণ গুলি চালাবার অনুমতি দিয়ে ডায়ার ভাল কাজ করেন নি। অন্য কোন কোন বিষয়েরও তাঁরা সমালোচনা করেন।

হাণ্টার কমিটির অধিকাংশ সভ্য ইংরেজ কর্ম্মচারীদের অপরাধ লঘু করারই চেষ্টা করেছিলেন। একারণ সাধারণে রিপোর্টের তেমন মূল্য দিলে না, পরন্তু জনমত ক্রমে অধিকতর তীব্র হ'য়েই উঠল। ভারত ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট হাণ্টার কমিটির অধিকাংশের মতামতই গ্রহণ করলেন। হাউস্ অফ্ কমন্সেও অতঃপর, ৮ই জুলাই তারিখে পঞ্জাবের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা হ'ল। ভারতসচিব মিঃ মণ্টেগু ডায়ারের গুলি-চালনার কথা উল্লেখ ক'রে এইমাত্র বললেন যে, ডায়ারের ভয়ঙ্কর বিচার বিভ্রম হয়েছিল। ("grave error of judgement") ডায়ারকে ভারতগবর্ণমেণ্টের অধীন কোন নূতন পদে নিযুক্ত করা হবে না স্থির হ'ল। হাউস্ অফ্ লর্ডস্ কিন্তু অধিকাংশ ভোটেই (১২৯—৮৬) হাউস্ অফ্ কমন্সের এই সিদ্ধান্তে দুঃখ প্রকাশ ক'রে এক প্রস্তাব গ্রহণ ক'রে ডায়ারের গুণপনায় আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানালেন। এই বার্ত্তা যখন ভারতবর্ষে পৌঁছল তখন ভারতবাসীদের মনোভাব কিরূপ তিক্ত হয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়। ইংরেজ মহিলারা আবার 'বীরত্ব' প্রকাশের জন্য চাঁদা তুলে ডায়ারকে তিন লক্ষ টাকা পুরস্কার দেন।

নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি ইতিপূর্ব্বেই ৩০শে মে তারিখে বারাণসী ধামে সমবেত হন এবং খিলাফৎ ও পঞ্জাবের অনাচার সম্পর্কে ইতিকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করেন। কলকাতায় অধিবেশন স্থল নির্দ্ধারিত হ'ল।

অহিংস-অসহযোগ প্রস্তাব খিলাফৎ সম্মেলন গৃহীত হবার পর মহাত্মা গান্ধী পরবর্ত্তী ১লা আগষ্ট প্রকাশ্যে আন্দোলন সুরু করা সাব্যস্ত করলেন। এইদিন সর্ব্বত্র হরতালও ঘোষিত হয়েছিল। কিন্তু ভারতের ও ভারতবাসীর এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে এর পূর্ব্বদিন ৩১শে জুলাই রাত্রি ১-৪৫ মিনিটের সময় লোকমান্য

বালগঙ্গাধর তিলক মহাপ্রয়াণ করলেন। কর্ত্তব্যবিমূঢ় জাতি তাঁর নিকট কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ লাভ করবেন সকলে এই আশা করেছিল। একারণ এসময় তাঁর প্রয়াণ ভারতবাসীর পক্ষে মর্ম্মান্তিক হ'ল। জাতিধর্ম্ম ও মতবৈষম্য ভুলে ভারতবর্ষের নেতৃবর্গ ও জনসাধারণ তাঁর প্রতি শেষ সম্মান প্রদর্শন করেন। ভারতের সর্ব্বত্র তাঁর শোকে হরতাল ও জনসভা অনুষ্ঠিত হয় এবং স্মৃতি-রক্ষার্থে নানাস্থানে বিভিন্ন প্রকার আয়োজন হয়। কংগ্রেসও তাঁর স্মৃতি-রক্ষার বিশেষ আয়োজন করেন।

মহাত্মা গান্ধী এ পর্য্যন্ত যে-সব আন্দোলন চালিয়েছেন তার নাম কখনো দেওয়া হয়েছে 'প্যাসিভ্ রেজিষ্টান্স' বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ, কখনো বা দেওয়া হয়েছে সত্যাগ্রহ। অহিংসা ও প্রেম এর মূল উপজীব্য। শত্রুর কর্ম্মগুলির প্রতিরোধে যতরকমের দুঃখই আসুক না কেন সবই সহ্য করব, কিন্তু কার্য্যে, বাক্যে এমনকি চিন্তায়ও তার প্রতি হিংসার ভাব পোষণ করব না, বরং তাকে আত্মীয় জ্ঞানে ভালবাসব—স্পষ্ট কথায় সত্যাগ্রহের মানে হ'ল এই। মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, সত্য ও অহিংসা বা প্রেম একটি টাকার এ-পিঠ ও-পিঠ। তিনি একথাও বলেছেন যে, সত্যাগ্রহ কাপুরুষের ধর্ম্ম নয়। কাপুরুষতা ও হিংসা এ দুটির ভিতর তিনি হিংসাকেই উচ্চতর স্থান দেন। তিনি ভারতবর্ষের পক্ষে অহিংস অসহযোগকেই উৎকৃষ্ট পন্থা ব'লে মনে করলেন। তিনি বলেন,

"আমি বিশ্বাস করি অহিংসা হিংসার চেয়ে সহস্র গুণে বড়, দণ্ডের চেয়ে ক্ষমা অধিকতর পুরুষোচিত। ক্ষমা বীরস্য ভূষণম্।

"ক্ষমা সৈনিকেরও ভূষণ। দণ্ডদানে বিরতিকে তখনই ক্ষমা বলি যখন ক্ষমা-প্রদর্শকের দণ্ডদানের ক্ষমতা থাকে। ক্ষমতাহীন লোকের ক্ষমা প্রদর্শন নিরর্থক। ইঁদুর তার ভক্ষক বিড়ালকে কখনই ক্ষমা করতে পারে না। কিন্তু আমি ভারতবর্ষকে তেমন নিঃসহায় বা দুর্ব্বল মনে করি না, আমি নিজেকেও তেমন নিঃসহায় ও দুর্ব্বল মনে করতে অক্ষম।

"আমি কল্পনাবিলাসী নই। আমি নিজেকে আদর্শপ্রিয় কর্ম্মী ব'লে মনে করি। অহিংসা শুধু মুনি-ঋষিরই পালনীয় নয়। সাধারণ লোকেও অহিংস হ'তে পারে। হিংসা যেমন পশুর ধর্ম্ম অহিংসা তেমনি মনুষ্যের ধর্ম্ম। মনুষ্যত্ব ঐশী শক্তির নিকট আমাদের নতি দাবি করে।

"আমি তাই ভারতবাসীর সম্মুখে সনাতন আত্মোৎসর্গ নীতি উপস্থিত করেছি। কারণ সত্যাগ্রহ ও এর সন্তান অসহযোগ এবং নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ দুঃখভোগের নূতন নাম মাত্র। যে-সব ঋষি হিংসার প্রাবল্যের ভিতরেও অহিংসার সন্ধান পেয়েছিলেন তাঁরা নিউটনের চেয়ে বড় আবিষ্কর্ত্তা, তাঁরা এর অনাবশ্যকতা বুঝেছিলেন ও পরিশ্রান্ত বিশ্বজগৎকে এই শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, এর মুক্তি হিংসার পথে নয়, অহিংসারই মধ্যে।

"আমিও সুতরাং ভারতবর্ষ দুর্ব্বল ব'লে তাকে অহিংস-নীতি গ্রহণ করতে বলি না। তার শক্তি-সামর্থ্যের বিষয় জেনেই আমি তাকে অহিংস-নীতি গ্রহণ করতে বলি। আমি চাই যে, ভারতবর্ষ জানুক - তাব আত্মা অমর, দৈহিক দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও সে চিরজয়ী।

"সিন-ফিন নীতি থেকে আমার অসহযোগ-নীতি স্বতন্ত্র, কারণ এ এমনভাবে পরিকল্পিত যে, হিংসার পাশে এর অনুসরণ অসম্ভব। কিন্তু যাঁরা অস্ত্রবলে বিশ্বাসী তাঁদেরও আমি অহিংস অসহযোগ-নীতি পরখ করতে অনুরোধ করি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জগতের প্রতি ভারতবর্ষের সুনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য বা মিশন আছে।"

মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ ও কর্ম্মপ্রণালী সম্পূর্ণ নূতন। নেতৃবর্গ এ সব গ্রহণে স্বভাবতঃই দ্বিধা প্রকাশ করলেন। জনমত কিন্তু এর বিশেষ পক্ষপাতি হ'য়ে উঠল। বস্তুতঃ, ভারতবর্ষের বিরাট জনসমুদ্র এর দ্বারা যেন অকূলে কূল পেল। সকলেই যে গান্ধীজীর মত অহিংসাকে ধর্ম্মের অঙ্গ ব'লে গ্রহণ করলেন তা নয়। তবে জবাহরলাল আত্মজীবনীতে লিখেছেন, তখন অনেকের পক্ষে এমনকি নেশনাল কংগ্রেসের পক্ষেও অহিংস-নীতি আদর্শে পৌঁছবার প্রকৃষ্ট উপায় ব'লেই গণ্য হয়।

মহাত্মা গান্ধী তাঁর কৈশর-ই-হিন্দ্ পদক সরকারকে ফেরত পাঠালেন। বড়লাট চেম্‌স্‌ফোর্ডকে একখানি পত্রে প্রস্তাবিত অহিংস অসহযোগ-নীতি সম্পর্কে জানিয়ে তবে নির্দ্দিষ্ট দিনে তিনি প্রচার কার্য্য আরম্ভ করলেন। প্রথম থেকেই তাঁর কার্য্যে প্রধান সহায় হলেন মৌলানা সৌকৎ আলী ও মহম্মদ আলী। মহাত্মাজী এই উদ্দেশ্যে মাদ্রাজ প্রদেশে প্রথম সফর করেন। তিনি যেখানেই যান সর্ব্বত্র নরনারী তাঁকে অভিনন্দন জানান ও অহিংস-আন্দোলনে যোগ দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি তখন পর্য্যন্ত মাত্র দুটি বিষয়ের প্রতিকারই

উদ্দেশ্য মধ্যে গণ্য করেন—(১) খিলাফৎ ও (২) পঞ্জাবের অনাচার। ওদিকে প্রাদেশিক কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠানগুলিও অসহযোগ-নীতির উপরে তাঁদের নিজ নিজ মতামত নিখিল-ভারতীয় কমিটিতে পেশ করলেন।

৪ঠা থেকে ৯ই সেপ্টেম্বর কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হ'ল। প্রতিদিন বিশ হাজার লোক প্রতিনিধি ও দর্শকরূপে কংগ্রেসে উপস্থিত। সকলের মুখেই অহিংস-অসহযোগের কথা। সকলেরই দৃষ্টি মহাত্মা গান্ধীর দিকে। এবারে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হলেন প্রবীণ চরমপন্থী নেতা ব্যারিষ্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী। সভাপতিত্ব করলেন লালা লজপত রায়। লজপত রায় মহাসমরের আরম্ভে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন। সরকার তাঁকে সুনজরে দেখতেন না, তাই তিনি যুদ্ধের ভিতরে স্বদেশে ফিরবার ছাড়-পত্র পান নি। আমেরিকায় স্থিতিকালেও স্বদেশ-সেবা তাঁর প্রধান কার্য্য ছিল। সেখানে তিনি 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকা প্রতিষ্ঠা ও সম্পাদন করেন। ইণ্ডিয়া বুরো নামে একটি প্রতিষ্ঠানও তিনি স্থাপন করেন। লালাজী এ দুটি প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়ে দীর্ঘ ছ' বছর মার্কিনদের নিকট ভারত-কথা প্রচার করেছিলেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও পঞ্জাবের অনাচার তাঁর চিত্ত ব্যথিত করে ও ফিরবার অনুমতি পেয়েই প্রথম সুযোগে তিনি স্বদেশে রওনা হন। ১৯২০, ২০শে ফেব্রুয়ারী বোম্বাইয়ে পদার্পণ ক'রে সোজা নিজ ভূমি লাহোরে গেলেন। লালাজী তাঁর উর্দ্দু 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় জুন মাসেই ঘোষণা করলেন যে পঞ্জাবের অনাচারের সহিত জড়িত কর্ম্মচারীদের সঙ্গে ব্যবস্থা-পরিষদে এক যোগে কর্ম্ম করা অসম্ভব, সুতরাং তা বর্জ্জনই শ্রেয়। কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে লালা লজপত রায়কে সভাপতি পদে বরণ করা হ'ল।

লালাজী তাঁর অভিভাষণে স্বভাবতঃই পঞ্জাবে সরকারী অনাচার, জালিয়ান-ওয়ালাবাগ, খিলাফৎ সমস্যা প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সার্ মাইকেল ওডাওয়ারের পঞ্জাব শাসনের তীব্র সমালোচনা তাঁর অভিভাষণের একটি প্রধান অঙ্গ। মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত অহিংস-অসহযোগ সম্পর্কে তিনি নিজ অভিমত পূর্ব্বে প্রকাশ না ক'রে এবিষয়ে সিদ্ধান্তের ভার কংগ্রেসের উপরই ছেড়ে দেন। লজপত রায় জাতির এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে মডারেটদের কংগ্রেসে যোগদান করতে আহ্বান করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা এ আহ্বানে সাড়া

দেন নি। তাঁরা এসময় থেকে সদলবলে অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধাচরণই করেছেন। ডায়ার্কির আমলে সরকারের অঙ্গীভূত হ'য়ে আন্দোলন দমনেও তাঁরা কম তৎপর হন নি।

কংগ্রেসের ভিতরকার প্রবীণ চরমপন্থী নেতারাও অহিংস-অসহযোগে সম্পূর্ণ সম্মতি দিতে পারলেন না। এনি বেসাণ্ট এ প্রস্তাবের ঘোর বিরোধিতা করেন। তিনি পূর্ব্বেও মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য করেছিলেন। বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ অসহযোগ প্রস্তাবের মূলনীতি গ্রহণ করলেও এর ধারাগুলিতে সম্মত হ'তে পারলেন না, বিশেষতঃ কৌন্সিল বর্জ্জন করতে তাঁদের খুবই আপত্তি হ'ল। বিষয়-নির্ব্বাচনী সমিতিতে ও প্রকাশ্য কংগ্রেসে গান্ধীজীর অসহযোগ প্রস্তাবের সংশোধনী উত্থাপন করেন বিপিনচন্দ্র পাল ও সমর্থন করেন চিত্তরঞ্জন দাশ। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, মহম্মদ আলী জিন্না, বিজয়রাঘব আচার্য্য প্রভৃতিও উক্ত মতের অনুবর্ত্তী হলেন। কিন্তু চারদিন ধরে আলোচনার পর মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাবই অধিকাংশ ভোটে (১৮৮৬-৮৮৪) গৃহীত হ'ল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, প্রবীণ নেতাদের মধ্যে একমাত্র পণ্ডিত মতিলাল নেহ্‌রু অসহযোগ প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন। আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, বিস্তর মুসলমান প্রতিনিধি এবারে কংগ্রেসে উপস্থিত থেকে মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাব সমর্থন করেন। কংগ্রেসের সঙ্গে নিখিল-ভারত মোস্‌লেম লীগেরও বিশেষ অধিবেশন হ'ল ও সেখানেও অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হ'ল।

অহিংস-অসহযোগ প্রস্তাব কংগ্রেসের তথা ভারতের রাজনৈতিক প্রচেষ্টার ইতিহাসে যুগান্তর আনয়ন করে। সরকারের আশ্রয় অস্বীকার ক'রে সর্ব্বকর্ম্মে ষোল আনা আত্মশক্তির উপর নির্ভর করাই এ প্রস্তাবের মূল কথা। স্বদেশী যুগে বাঙালীরাও এইরূপ ব্রত গ্রহণ করেছিল, কিন্তু তখন একটি বিশেষ অন্যায় প্রতিকার কল্পেই এই ব্রত উদ্‌যাপিত হয়। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ প্রস্তাবও প্রথমে দুটি বিশেষ অন্যায়ের প্রতিকার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত হয়। কিন্তু এই বিশেষ অধিবেশনেই ভারতবাসীর রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা যে স্বরাজ বা দেশ-শাসনে ভারতবাসীর সম্পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠা তা-ও অসহযোগের উদ্দেশ্য মধ্যে গণ্য করা হ'ল। প্রবীণ নেতা বিজয়রাঘব আচার্য্যের নির্দ্দেশেই স্বরাজ

কথাটি এর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। বার বার অনাচার অত্যাচারের সম্মুখীন হ'য়ে ভারতবাসীরা স্বরাজ লাভই এসব নিবারণের একমাত্র উপায় ব'লে ভাবতে শিখেছিল। এই যুগান্তকারী প্রস্তাবটির মর্ম্ম এই,

"যেহেতু ভারত ও ব্রিটিশ সরকার খিলাফৎ সম্পর্কে ভারতীয় মুসলমানদের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করেন নি ও প্রধানমন্ত্রী স্বেচ্ছায় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন, এবং প্রত্যেক অমুসলমান ভারতবাসীরই কর্ত্তব্য মুসলমান ভ্রাতাদের এই ধর্ম্ম-সঙ্কটে সাহায্য করা; যেহেতু ১৯১৯ সালের এপ্রিলের ব্যাপারসমূহে উক্ত উভয় সরকার পঞ্জাবের নিরপরাধ অধিবাসীদের রক্ষা করতে মারাত্মক ভাবে অবহেলা করেছেন, বর্ব্বর ও কাপুরুষোচিত ব্যবহার সত্ত্বেও দোষী কর্ম্মচারীদের দণ্ডদানে অক্ষম হয়েছেন এবং যে সার্ মাইকেল ওডাওয়ার রাজকর্ম্মচারীদের অনাচারের জন্য প্রত্যক্ষ ভাবে দায়ী ও যাঁকে নিজ শাসনাধীন অধিবাসীদের দুঃখ-দুর্দ্দশার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থাকা সত্ত্বেও সকল দোষ ত্রুটি থেকে মুক্তিদান করা হয়েছে, এবং যেহেতু হাউস্ অফ্ কমেন্স ও বিশেষ ক'রে হাউস্ অফ্ লর্ডসের বিতর্কে ভারতবাসীর প্রতি অনুকম্পার পূর্ণ অভাব ও পঞ্জাবে যে নিয়মিত-ভাবে ভীতি প্রদর্শিত ও অনাচার অনুষ্ঠিত হয়েছে তার পূর্ণ সমর্থন প্রকটিত হয়েছে, এবং খিলাফৎ ও পঞ্জাব সম্পর্কে বড়লাটের ঘোষণায় মোটেই অনুশোচনার ভাব পরিলক্ষিত হয় নি সেহেতু এই কংগ্রেস বিবেচনা করেন যে, এ দুটি অন্যায়ের প্রতিকার না হ'লে ভারতবর্ষে শান্তি ফিরে আসবে না, এবং জাতির আত্মমর্য্যাদা প্রতিষ্ঠান ও ভবিষ্যতে অনুরূপ অন্যায়ের পুনরাবৃত্তি অসম্ভব করার একমাত্র কার্য্যকর উপায় স্বরাজের প্রতিষ্ঠা।

"কংগ্রেসের অভিমত এই যে, যতদিনে উক্ত অন্যায় দুটির প্রতিকার ও স্বরাজ প্রতিষ্ঠা না হয় ততদিন ভারতবাসীদের পক্ষে ক্রম বর্দ্ধমান অহিংস-অসহযোগ-নীতি গ্রহণ ও পালন করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

"যাঁরা এতদিন জনমত গঠনে ও জনগণের প্রতিনিধিত্ব করায় ব্রতী রয়েছেন সে-সব শিক্ষিত শ্রেণীর এদিকে কার্য্য আরম্ভ করা উচিত। সরকার লোককে উপাধি ও সম্মান বিতরণ করে এবং বিদ্যালয়, আইন-আদালত ও ব্যবস্থা-পরিষদের মধ্য দিয়ে তাঁদের ক্ষমতার পরিপুষ্টি সাধন করেন। আন্দোলনের বর্ত্তমান অবস্থায় সর্ব্বাপেক্ষা কম দায় গ্রহণ ও ত্যাগ-স্বীকার বাঞ্ছনীয়,

এজন্য কংগ্রেস সাগ্রহে শিক্ষিত শ্রেণী'দের মাত্র এ কয়টি কার্য্য করতে পরামর্শ দিচ্ছেন,—

"(ক) উপাধি বর্জ্জন, অবৈতনিক পদ ও স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠান-গুলির মনোনীত সদস্যগণের সদস্যপদ ত্যাগ,

"(খ) গবর্ণমেণ্ট দরবার, লেভী এবং সরকারী বা আধা-সরকারী সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠান বর্জ্জন,

"(গ) সরকারী বা সরকার অনুমোদিত স্কুল-কলেজ ক্রমিক বর্জ্জন ও বিভিন্ন প্রদেশে জাতীয় স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা,

"(ঘ) উকীল ও মক্কেলগণ কর্ত্তৃক সরকারী আদালত বর্জ্জন এবং পক্ষ-প্রতিপক্ষের মধ্যে মামলা মেটাবার জন্য সালিশী আদালত গঠন,

"(ঙ) সৈন্য, কেরাণী ও জনমজুরদের মেসোপটেমিয়ায় কর্ম্ম গ্রহণ করায় অস্বীকৃতি,

"(চ) ব্যবস্থাপরিষদে সদস্য পদ প্রার্থীদের নির্ব্বাচন-পত্র প্রত্যাহার এবং যাঁরা এই নির্দ্দেশ অমান্য ক'রে প্রার্থী হবেন এমন সব প্রার্থীকে ভোটদাতাদের ভোট না দেওয়া,

"(ছ) বিদেশী দ্রব্য বয়কট।

"নিয়ম-শৃঙ্খলা ও আত্মত্যাগের উপর ভিত্তি ক'রে অসহযোগ-নীতি পরিকল্পিত, কারণ এ দুটি ছাড়া কোন জাতি সত্যকার উন্নতিলাভ করতে পারে না। প্রত্যেক নরনারী ও শিশুকে অসহযোগ-নীতির প্রথম ধাপ অনুসরণের সুযোগ দেওয়া উচিত। এ কারণ কংগ্রেস বস্ত্র সম্পর্কে সর্ব্ব-সাধারণকে স্বদেশী ব্রত গ্রহণে পরামর্শ দেন। ভারতীয় মূলধনে ও ভারতীয় পর্য্যবেক্ষণে পরিচালিত কাপড়ের কলগুলি জাতির প্রয়োজনানুরূপ যথেষ্ট বস্ত্র ও যথেষ্ট সূতা উৎপন্ন করতে বর্ত্তমানে অসমর্থ ও সম্ভবতঃ দীর্ঘকাল অসমর্থ থাকবে, এজন্য কংগ্রেস এই পরামর্শ দেন যে, প্রত্যেক গৃহে চরকায় সূতা কাটা প্রবর্ত্তন ক'রে ও যে সব লক্ষ লক্ষ তাঁতি উৎসাহ অভাবে জাত-ব্যবসা পরিত্যাগ করেছেন তাঁদের বস্ত্র বয়নে উদ্‌বুদ্ধ ক'রে বেশী পরিমাণে বস্ত্র উৎপাদনে সাহায্য করা প্রয়োজন।"

আগে বলেছি, লালা লজপত রায় অভিভাষণে অসহযোগ সম্বন্ধে কোন

মতামত প্রকাশ না ক'রে সিদ্ধান্তের ভার কংগ্রেসের উপর ছেড়ে দেন। তিনি উপসংহার বক্তৃতায় কংগ্রেস কর্তৃক অসহযোগ-নীতি গ্রহণে আনন্দ প্রকাশ করেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দফাওয়ারী ভাবে মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সমালোচনা করতেও ত্রুটি করেন নি। বিশেষ ক'রে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বর্জ্জনের সার্থকতা তিনি মোটেই স্বীকার করলেন না। তাঁর মতে জাতীয় গবমের্ণ্ট ব্যতিরেকে জাতীয় শিক্ষা অসম্ভব। বঙ্গে স্বদেশী যুগের জাতীয় শিক্ষা প্রচেষ্টার ব্যর্থতায় এ বিষয় যথেষ্ট প্রতিপন্ন হয়েছে। লালাজী বিদেশে—বিলাতে, মার্কিনে, ফ্রান্সে, জাপানে স্বাধীন ভাবে ভারতকথা প্রচারের উপর বিশেষ ভাবে জোর দেন।

বিশেষ অধিবেশনের পর কংগ্রেসের নির্দ্দেশ মান্য ক'রে বিভিন্ন প্রদেশে বহুজন সদস্যপদপ্রার্থী পত্র প্রত্যাহার করলেন। উপাধিধারীরাও কেউ কেউ উপাধি বর্জ্জন করলেন। বঙ্গে চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ কংগ্রেস নেতারা কৌন্সিল বর্জ্জনের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁরা এই বিষয়ে কংগ্রেস নির্দ্দেশ অমান্য করবেন কি-না বিবেচনার জন্য পরামর্শ সভাও আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু বরিশালের নায়ক অশ্বিনীকুমার দত্তের পরামর্শে নেশনাল কংগ্রেসের নির্দ্দেশ পালনই যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয়। অতঃপর বাংলায়ও কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সদস্যপদ প্রত্যাহার করা হ'ল। কিন্তু এখন থেকেই বার্ষিক অধিবেশনে অসহযোগ-নীতির বিরোধিতা করবার জন্য সর্ব্বত্র তোড়জোড় সুরু হ'ল।

এবারে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেবেশন হ'ল নাগপুরে। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হলেন শেঠ যমুনালাল বাজাজ। যমুনালাল ক্রোড়পতি মিল-মালিক। তিনি সরকার প্রদত্ত রাও বাহাদুর উপাধি বর্জ্জন ক'রে অসহযোগ-নীতি অবলম্বন করেন। মূল সভাপতি হলেন প্রবীণ কংগ্রেসনেতা বিজয়রাঘব আচার্য্য। দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে এবারকার কংগ্রেস নানাদিক থেকেই অভিনব। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হ'তে অন্যূন চৌদ্দ হাজার প্রতিনিধি ও ততোধিক দর্শক কংগ্রেসে এসে যোগ দিলেন। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ-নীতিতে কতখানি জনমত সায় দিয়েছিল এ তার একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ। কিন্তু প্রতিনিধিদের এত সংখ্যাধিক্য হবার আরও একটি কারণ ছিল। অসহযোগ-

বিরোধীরাও বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ঢের প্রতিনিধি নাগপুরে জড় করিয়েছিলেন। একমাত্র চিত্তরঞ্জন দাশই আড়াই শ' প্রতিনিধি নিয়ে নাগপুরে রওনা হন।

এবারকার অধিবেশনের প্রধান আলোচ্য বিষয় হ'ল দুটি, (১) নূতন নিয়মতন্ত্র গ্রহণ ও (২) পূর্ব্বেকার অসহযোগ প্রস্তাব অনুমোদন। কংগ্রেসের নিয়মতন্ত্র তৈরীর ভার অমৃতশহর কংগ্রেস মহাত্মা গান্ধীর উপর অর্পণ করেছিলেন। নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি ইতিপূর্ব্বে মহাত্মা গান্ধীর খসড়া পরখ ক'রে প্রকাশ্য অধিবেশনে বিবেচনার জন্য পাঠিয়েছেন। পূর্ব্বে কংগ্রেসের তেমন কোন ধরা-বাঁধা নিয়মতন্ত্র ছিল না। কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মতন্ত্র না থাকার দরুণই সুরাট কংগ্রেস ভেঙে যায়, কোন কোন বিশিষ্ট লেখক ও কংগ্রেসের নেতা একথা বলেছেন। ১৯০৮ সালেই প্রথম কংগ্রেসের একটি নিয়মতন্ত্র রচিত হয়। এতদিন এই নিয়মতন্ত্র অনুসারেই কাজ চলেছিল। এখন সময়ের পরিবর্ত্তনে কংগ্রেসের নিয়মতন্ত্রও নূতন ক'রে রচনা করা আবশ্যক বিবেচিত হয়। মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের উদ্দেশ্য স্বল্প কথায় এরূপ ব্যক্ত করলেন, "কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সর্ব্বপ্রকার ন্যায়সঙ্গত ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে ভারতবাসীদের দ্বারা স্বরাজ লাভ।" "(The object of the Congress is the attainment of Swaraj by the people of India by all legitimate and peaceful means.)" নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি নূতন ক'রে গঠনের ব্যবস্থা হ'ল। সারা বছর যাতে নিয়মিত ভাবে কংগ্রেসের কার্য্য চলে সেজন্য এবারেই প্রথম কংগ্রেসের অঙ্গরূপে 'ওয়ার্কিং কমিটি' বা কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয়। প্রত্যেক কংগ্রেস-সদস্যের বার্ষিক চাঁদা ধার্য্য হ'ল চার আনা ও কংগ্রেসে প্রতিনিধি সংখ্যা নির্ণীত হয় ছ' হাজার। নিয়মতন্ত্রে ভাষা হিসাবে প্রদেশ গঠনের মূল-নীতিও গৃহীত হ'ল। অল্প-স্বল্প সংশোধনের পর কংগ্রেস গান্ধীজীর রচিত নিয়মতন্ত্র গ্রহণ করলেন। উদ্দেশ্যের অস্পষ্টতা নিয়ে কিন্তু ঘোর বিতর্ক হয়েছিল, আর এতে যোগ দিয়েছিলেন পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় ও মহম্মদ আলী জিন্না। জিন্না সাহেব এর পর থেকে কংগ্রেস পরিত্যাগ করলেন। মালবীয়জী কিন্তু ১৯২২ সালে উদ্দেশ্য-পত্রে সহি ক'রে পুরাদস্তুর কংগ্রেসের সভ্যই রয়ে গেলেন।

সকলেই আঁচ করেছিল, দ্বিতীয় প্রধান আলোচ্য বিষয় অসহযোগ-নীতি অনুমোদন নিয়ে তুমুল বাদানুবাদ ও বিতর্কের সৃষ্টি হবে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত

তা কিছুই হ'ল না। চিত্তরঞ্জন দাশ, লালা লজপত রায় প্রমুখ বিরুদ্ধবাদীরা মহাত্মা গান্ধীর মতে মত দিলেন। এ ব্যাপারে একদিকে যেমন মহাত্মা গান্ধীর ঐশীশক্তির জয় সর্ব্বত্র ঘোষিত হ'ল অন্যদিকে তেমন চিত্তরঞ্জন ও লজপতের উপরও লোকের শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। পূর্ব্বেকার অসহযোগ প্রস্তাব ব্যাপকতর ক'রে প্রকাশ্য অধিবেশনে উত্থাপন করলেন স্বয়ং চিত্তরঞ্জন দাশ ও সমর্থন করলেন লালা লজপত রায়। অসহযোগ আন্দোলন যে বিপুল শক্তি নিয়ে ভারত-বক্ষ মথিত করবে তা বুঝতে বিলম্ব হ'ল না।

ভারতে জন-জাগরণ

(১৯২১—১৯২৩)

কোন কোন সমালোচক নাগপুর কংগ্রেসকে 'গান্ধী কংগ্রেস' আখ্যা দিয়েছেন। বস্তুতঃ, এই অধিবেশন থেকেই গান্ধীজীর প্রেরণায় কংগ্রেস তথা জাতি এক নূতন আদর্শ ও পথের সন্ধান পায়। এর পরেই ভারত-বাসীদের মধ্যে আশ্চর্য্য আত্ম-ত্যাগ ও দুঃখ সহন-শক্তির বিকাশ দেখতে পাই। নারী-পুরুষ, ধনী-নির্ধন, মোটা মাইনের চাকুরে, সামান্য উপার্জ্জনক্ষম জনমজুর সকলের ভিতরেই এক অভিনব সাড়া এল। বাংলা, পঞ্জাব, বোম্বাই, মাদ্রাজ, বিহার, সিন্ধু, ব্রহ্মদেশ, পেশোয়ার ভাবতেব দিকে দিকে সর্ব্ব শ্রেণীর ও সর্ব্ব স্তরের লোকের মধ্যে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস-অসহযোগের বার্ত্তা অবিলম্বে পৌঁছল। বঙ্গে চিত্তরঞ্জন দাশ, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, সুভাষচন্দ্র বসু, ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, চাঁদ মিঞা, মুজিবর রহমান, মৌলানা আক্রাম খাঁ ও মৌলানা আবুলকালাম আজাদ, বিহারে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, মজহ্‌রুল হক, কাশীতে ডাঃ ভগবান দাস, বাবু শিবপ্রসাদ গুপ্ত, যুক্তপ্রদেশে পণ্ডিত মোতিলাল নেহ্‌রু, পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্‌রু, গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থী, তাসাদ্দক আহ্‌মদ খাঁ সেরওয়ানী, রফি আহ্‌মদ কিদোয়াই, দিল্লীতে হাকিম আজমল খাঁ ও ডাক্তার আন্সারি, পঞ্জাবে লালা লজপত রায়, ডাঃ কিচলু, ডাঃ সত্যপাল, ভাই পরমানন্দ ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, সরলা দেবী চৌধুরাণী, করাচীতে ডাঃ চৈৎরাম গিদ্‌ওয়ানি ও জয়রামদাস দৌলত রাম, বোম্বাইয়ে ওমর শোভানী, শেঠ ছোটানী, গুজরাটে বিঠলভাই ঝাভেরী পটেল, বল্লভভাই ঝাভেরী পটেল, মহারাষ্ট্রে নরসিংহ চিন্তামন কেলকার, শঙ্কররাও দেও, বোপৎকর, বাপাৎ, মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে নারায়ণ ভাস্কর খারে, মাধবশ্রীহরি আনে, অভয়াঙ্কর, মাদ্রাজে রাজা গোপালাচার্য্য, ইয়াকুব হাসান, পট্টভি সীতারামিয়া, উড়িষ্যায় গোপবন্ধু দাশ, গোপবন্ধু চৌধুরী, আসামে নবীনচন্দ্র বরদলুই ও তরুণরাম ফুকন প্রভৃতি শত

শত ভারত-সন্তানের অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগে ভারত ইতিহাস গৌরবোজ্জ্বল। মৌলানা মহম্মদ আলী ও সৌকত আলী এবং তাঁদের বৃদ্ধা মাতা বাঈ আম্মা সর্ব্বস্ব পণ ক'রে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁর বিপুল আইন-ব্যবসা পরিত্যাগ ক'রে দরিদ্রের বেশে সাধারণের পাশে এসে দাঁড়ালেন। জনগণ অমনি তাঁকে 'দেশবন্ধু' উপাধি দিয়ে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানালে। মোটা মাইনের চাক্‌রে ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও সদ্য সিবিলিয়ন চাক্‌রি প্রাপ্ত সুভাষচন্দ্র বসু সর্ব্বরকম সুখ-সুবিধা ও রাজসম্মানের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে কায়মনে দেশসেবায় নিযুক্ত হলেন। মহাত্মা-সহধর্ম্মিনী কস্তুরবাঈ গান্ধী স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে ভারতের নারী-সমাজকেও মুক্তি-সাধনায় যোগ্য স্থান গ্রহণ করতে আহ্বান করলেন। বিদুষীশ্রেষ্ঠা কবি-যশস্বিনী সরোজিনী নাইডু থেকে আরম্ভ ক'রে সামান্য কৃষক বধূ শ্রমিক রমণী পর্য্যন্ত অহিংস-অসহযোগ মন্ত্রে দীক্ষা নিলে।

স্কুল-কলেজ বর্জ্জন নিয়ে প্রথমে অসহযোগ আন্দোলন সুরু হয়। প্রত্যেক প্রগতিমূলক আন্দোলনেই তরুণ মন আগে সাড়া দেয়। সুতরাং বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রে ছাত্রগণ বিদ্যালয় ত্যাগ ক'রে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করতে চাইলে। একদিকে যেমন স্কুল-কলেজ পরিত্যক্ত হ'ল অন্যদিকে তেমনি ছাত্রদের জন্য বিভিন্ন কেন্দ্রে জাতীয় শিক্ষায়তনও প্রতিষ্ঠিত হ'ল। কলকাতায় নেশনাল কলেজ, পাটনায় বিহার বিদ্যাপীঠ, বারাণসী ধামে কাশী বিদ্যাপীঠ, আলীগড়ে নেশনাল মুসলিম ইউনিভার্সিটি, গুজরাটে গুজরাট বিদ্যাপীঠ, মহারাষ্ট্রে তিলক বিদ্যাপীঠ, অন্ধ্রে জাতীয় বিদ্যায়তন প্রভৃতিকে কেন্দ্র ক'রে প্রতি জেলায়, মহকুমায়, এমন কি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে পর্য্যন্ত বিভিন্ন স্তরের জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হ'ল। মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ ক'রে স্বরাজের বার্ত্তা প্রচার করলেন, এবং স্বরাজের প্রধান ধাপ স্বরূপ হিন্দু-মুসলমান ঐক্য, চরকা গ্রহণ, মাদকসেবন নিবারণ ও অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জনে উদ্‌বুদ্ধ করতে লাগলেন। গান্ধীজী এ কথাও বললেন যে, এই সব যথারীতি অনুসৃত হ'লে এক বছরের মধ্যেই স্বরাজ লাভ সম্ভব। ভারতবর্ষ অকস্মাৎ কর্ম্মচঞ্চল হ'য়ে উঠল।

আন্দোলনের মুখে ৩১শে মার্চ্চ ও ১লা এপ্রিল এই দুদিন বেজওয়াড়ায়

ওয়ার্কিং কমিটি ও নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হ'ল। এ অধিবেশনে কার্য্যক্রম স্থির হ'ল এইরূপ (১) তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারে এক কোটি টাকা অর্থসংগ্রহ, (২) জনসাধারণের মধ্য থেকে কংগ্রেস সভ্য গ্রহণ ও (৩) কুড়ি লক্ষ চরকা প্রবর্ত্তন। পঞ্চায়েৎ প্রতিষ্ঠা ও মাদক দ্রব্য বর্জ্জন আন্দোলন চালাবারও কথা হ'ল। ইতিমধ্যে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার ওজুহাতে সরকার নানাস্থানে নেতৃবৃন্দের উপর ফৌজদারী আইনের ১৪৪ ও ১০৮ ধারা জারি করিলেন। এইরূপে ময়মনসিংহে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের, আরায় বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও মজহ্‌রুল হকের, কলকাতায় ইয়াকুব হাসানের ও পেশোয়ারে লালা লজপত রায়ের প্রবেশ নিষিদ্ধ হ'ল। বেজওয়াড়া অধিবেশনে কমিটি স্থির করলেন, এ সব আদেশ আপাততঃ মান্য করা হবে।

এরপর শহর ও পল্লীতে জোর প্রচারকার্য্য সুরু হ'ল। যে সব লোক কংগ্রেসের নির্দ্দেশ মান্য ক'রে সরকারের সঙ্গে সর্ব্বপ্রকার সংস্রব বর্জ্জন করেছেন তাঁরাই প্রচারকার্য্যে নিয়োজিত হবার উপযুক্ত বিবেচিত হলেন। পল্লী এতকাল শিক্ষিত জনের নিকট অবজ্ঞাত ছিল। এবারে অসহযোগী প্রচারকগণ পল্লীকেও আন্দোলনের কেন্দ্র ক'রে শহরের সমান মর্য্যাদা দান করলেন। পল্লীবাসীর মনে উৎসাহ-উদ্দীপনার অন্ত নেই। নারী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ এমন কি কিশোর বালকেরাও স্বরাজের কথা আলোচনা সুরু করলে। চরকার গুঞ্জনে পল্লী মুখর। হৃত সন্তান ফিরে পেলে মায়ের প্রাণে যে অনাবিল আনন্দ জন্মে শতবর্ষ পরে হৃত সম্পদ চরকা পেয়ে পল্লীবাসীর মনে আজ সেই আনন্দ! তারা আবার গান ধরলে,

চরকা আমার সোয়ামি পুত, চরকা আমার নাতী;
চরকার দৌলতে মোর দুয়ারে বাঁধা হাতী।

স্বল্প পূর্ব্বে ইউরোপীয় যুদ্ধের সময় বস্ত্রাভাব পল্লীবাসীরা হাড়ে হাড়ে অনুভব করেছে। প্রতি জোড়া দশ হাতি ধুতির দাম ছ' সাত টাকায় চড়েছিল। তখন কত নারী যে লজ্জা নিবারণে অসমর্থ হ'য়ে আত্মহত্যা করে তার খবর তারা জানত। তাই চরকার ভিতরে হৃত সম্পদের সন্ধান পেলে। কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এ সময় চরকার গুঞ্জন ছন্দোবদ্ধ ক'রে দেশবাসীকে শোনালেন,

ভোমরায় গান গায় চরকায়, শোন, ভাই!
খেই নাও, পাঁজ দাও, আমরাও গান গাই!
ঘর-বার করবার দরকার নেই আর,
মন দাও চরকায় আপনার আপনার!
চরকার ঘর্ঘর পড়শীর ঘর-ঘর!
ঘর-ঘর ক্ষীর-সর,—আপনায় নির্ভর!
পড়শীর কণ্ঠে জাগ্‌ল সাড়া,—
দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া।

* * *

চন্দ্রের চরকায় জ্যোৎস্নার সৃষ্টি
সূর্য্যের কাটনায় কাঞ্চন-বৃষ্টি।
ইন্দ্রের চরকায় মেঘজল থান থান!
হিন্দের চরকায় ইজ্জৎ সম্মান!
ঘর-ঘর দৌলত! ইজ্জৎ ঘর-ঘর!
ঘর-ঘর হিম্মৎ,—আপনায় নির্ভর!
গুজরাট—পাঞ্জাব-বাংলায় সাড়া,—
দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া!

এপ্রিল মাসেই লর্ড রেডিং বড়লাট রূপে ভারতে এলেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের মধ্যস্থতায় গান্ধীজী লর্ড রেডিংয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে তাঁকে আন্দোলনের উদ্দেশ্য বুঝিয়ে দেন। কারণ প্রতিপক্ষের নিকট থেকে কোন কিছু গোপন করা সত্যাগ্রহের রীতিবিরুদ্ধ।

এর ভিতরেই যে ধড়পাকড় না হয়েছিল তা নয়। তাই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ১৫ই জুন বোম্বাই অধিবেশনে স্থির করলেন যে, অসহযোগিগণ ব্রিটিশ আদালতের বিচারে কোনরূপে যোগদান করবেন না, মাত্র নিজ নিজ কথা বলবার জন্য একটি বিবৃতি পেশ করতে পারবেন। এর ফলে অসহযোগীরা আত্মপক্ষ সমর্থন না ক'রে বা জরিমানা না দিয়ে হাজারে হাজারে কারাবরণ করেছিলেন।

বেজওয়াড়া অধিবেশনে কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ যে তিনটি কাজ সংসাধনের জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করেছিলেন তিন মাসের মধ্যেই তাতে আশ্চর্য্য সাড়া পাওয়া গেল। ২৮—৩০শে জুলাই বোম্বাই শহরে অনুষ্ঠিত নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি ঘোষণা করেন যে, তিলক স্বরাজ ভাণ্ডারে এক কোটি পনর লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়েছে, এবং ধনকুবের লক্ষপতি কোটিপতি থেকে আরম্ভ ক'রে দিনমজুর পর্য্যন্ত এতে দান করেছেন! গৃহে গৃহে প্রদত্ত চরকার সংখ্যাও প্রায় কুড়ি লক্ষে পৌঁছেছে। আর সভ্য সংখ্যা হয়েছে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ। এরূপ আশাতীত সাফল্যে স্বভাবতঃই কংগ্রেস নেতৃবর্গ ও জনসাধারণ উৎফুল্ল ও উৎসাহিত হলেন। কংগ্রেস কমিটি এই অধিবেশনেই যুবরাজের অভ্যর্থনার যাবতীয় আয়োজন বর্জ্জন করতে দেশবাসীকে অনুরোধ জানালেন।

ইতিপূর্ব্বেই তুরস্কের মুক্তি-দাতা মুস্তাফা কামাল পাশা আঙ্গোরায় (বর্ত্তমানে, আন্‌কারা) স্বাধীন গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে মিত্রশক্তি সেনাবাহিনী প্রেরণের আয়োজন করতে লাগল। ভারতের আন্দোলনের উপর এর প্রতিক্রিয়া হ'ল খুব। ৮ই জুলাই করাচীতে মৌলানা মহম্মদ আলীর সভাপতিত্বে খিলাফৎ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এখানে এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হ'ল যে, বর্ত্তমান অবস্থায় সরকারী সেনাবাহিনীতে কর্ম্ম করা বা সৈন্য সংগ্রহে সাহায্য করা মুসলমানের পক্ষে ধর্ম্ম বিরুদ্ধ। এই প্রস্তাবের জন্য সম্মেলনের সভাপতি মহম্মদ আলী এবং শৌকৎ আলী, ডাঃ কিচ্‌লু, সারদাপীঠের জগদ্‌গুরু শ্রীশঙ্করাচার্য্য, মৌলানা নিশার আহম্মদ, পীর গোলাম মুজাদ্দিন ও মৌলানা হুসেন আহম্মদ অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হলেন। করাচী আদালতে বিচারে আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের দু' বছর সশ্রম কারাদণ্ড হ'ল। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নির্দ্দেশে পরবর্ত্তী ১৬ই অক্টোবর সহস্র সহস্র জনসভায় উক্ত প্রস্তাব পঠিত ও গৃহীত হ'ল। মহাত্মা গান্ধীও ট্রিচোনোপলির জনসভায় ঐ প্রস্তাব ও মৌলানা মহম্মদ আলীর অভিভাষণ হুবহু পাঠ করলেন।

আন্দোলন যেন সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়ল, অমনি সঙ্গে সঙ্গে নানাস্থানে সরকার ১৪৪ ধারার আশ্রয় নিয়ে পাঁচ জনের অধিক জনতা বে-আইনি ব'লে ঘোষণা করতে লাগলেন। স্থানে স্থানে পুলিশ ও জনতার মধ্যে দাঙ্গাহাঙ্গামাও হ'ল। দূর দূর অঞ্চল থেকে আইন-অমান্যের আবেদন এলেও

ওয়ার্কিং কমিটি বিভিন্ন অধিবেশনে সকলকে ধৈর্য্য ধারণ ক'রে প্রারম্ভিক কার্য্য যথা—সুরাপান বর্জ্জন, স্বদেশী বস্ত্র গ্রহণ ও বিদেশী বস্ত্র ত্যাগ, এবং অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন করতে অনুরোধ জানালেন। ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে যাতে সকলে বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন করে—এই মর্ম্মে একটি নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। অতঃপর বহু স্থলে স্তূপীকৃত বিদেশী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব করা হ'ল।

পরবর্ত্তী ৫ই নবেম্বর নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির দিল্লী অধিবেশনে স্থির হয় যে, যে-সব অঞ্চলে আইন-অমান্য অনুসৃত হবে সেখানকার অধিবাসী-দের হাতে সুতা কাটা, খদ্দর পরিধান করা, হিন্দু-মুসলমানে ঐক্য স্থাপন করা আবশ্যক। তাদের সম্পূর্ণরূপে অহিংসায় বিশ্বাস থাকা চাই। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, গুজরাটের বারডৌলী তালুক ও অন্ধ্রের গুন্টুর জেলা আইন-অমান্যের জন্য খুবই প্রস্তুত হয়েছিল।

যুবরাজের ভারতবর্ষে আগমন কাল ক্রমশঃই নিকটবর্ত্তী হ'ল। কংগ্রেসের নির্দ্দেশে বিভিন্ন প্রদেশে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত হ'তে লাগল। একদিকে যেমন নিজ নিজ অঞ্চলকে সম্পূর্ণ অহিংস রেখে ভাবী দুঃখভোগের জন্য সকলকে প্রস্তুত করা এই বাহিনীর কাজ, অন্যদিকে যুবরাজের বিভিন্ন কেন্দ্রে পদার্পণে হরতালের অনুষ্ঠান করাও তাদের কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য হ'ল।

কিন্তু এর পূর্ব্বে আরও কয়েকটি ব্যাপারের উল্লেখ করা এখানে প্রয়োজন। সম্পূর্ণ অহিংস থেকে অন্যায়, অবিচার, অনাচারের প্রতিবাদে জনসাধারণের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এসময়কার বিশেষ লক্ষণীয় বিষয়। সকল ব্যাপারের সঙ্গেই যে অসহযোগ আন্দোলনের প্রত্যক্ষ যোগ ছিল তা নয়, তবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস ও দুঃখ-সহন-শক্তির শিক্ষা এ থেকেই লোকে লাভ করেছিল। এসময় আসাম চা-বাগানের বহু সহস্র শ্রমিক ধর্ম্মঘট ক'রে একযোগে পদব্রজে দেশের অভিমুখে রওনা হয় ও চাঁদপুরে এসে বাধা পায়। তাদের উপর গুলি-বর্ষণ পর্য্যন্ত হয়েছিল। এর প্রতিবাদ স্বরূপ আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে ধর্ম্মঘট ও ষ্টীমার কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের ধর্ম্মঘট আজও লোকে ভোলে নি। বিনা বাক্য-ব্যয়ে দুঃখ-সহন-শক্তির এমন দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে খুব কমই দেখা গিয়েছে। ধর্ম্মঘটিদের সাহায্যের জন্য দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, দীনবন্ধু সি. এফ. এণ্ড্রুজ ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বিশেষ তৎপর হয়েছিলেন। পণ্ডিত

জবাহরলাল নেহ্রু ও গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থীর নেতৃত্বে আগ্রা-অযোধ্যার কৃষক-আন্দোলন ও স্থানে স্থানে পুলিশের গুলিবর্ষণ, পঞ্জাবে নান্‌কানা হত্যাকাণ্ড, শিখ মহান্তদের দুর্নীতি নিবারণের জন্য শিরোমণি গুরুদ্বার কমিটির চেষ্টা ও অকালী শিখদের দীর্ঘকাল ব্যাপী সত্যাগ্রহ, নাভা-রাজের অপসারণে জাইটোতে শিখ জাঠা প্রেরণ, অন্ধ্র প্রদেশের চিরলা গ্রামে অধিবাসীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মিউনিসিপালিটি স্থাপন ও তাদের গ্রাম ত্যাগ, মেদিনীপুর জেলার কাঁথী অঞ্চলে ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে অসহযোগী ব্যারিষ্টার বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নেতৃত্বে গ্রামবাসীদের আন্দোলন প্রভৃতির কথাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। মালাবারের মুসলমান মোপ্‌লাদের বিদ্রোহ এ সময়কার একটি বিশেষ শোচনীয় ঘটনা। প্রথমে ইংরেজ ও পরে হিন্দুদের উপর তারা অত্যাচার করে। বিদ্রোহ প্রশমনের জন্য হিন্দু-মুসলমান নেতৃবৃন্দকে সেখানে যেতে না দিয়ে সরকার সামরিক আইন প্রয়োগে বিদ্রোহ দমন করলেন। সত্তর জন মোপ্‌লা বিদ্রোহী রেলে চালান দেওয়ার সময় গাড়ীর মধ্যে হাওয়া বন্ধ হ'য়ে মারা যায়!

একটু আগে বলেছি, যুবরাজ প্রিন্স অফ্ ওয়েলসের অভ্যর্থনায় হরতাল অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। যুবরাজ ২১শে নবেম্বর বোম্বাই পদার্পণ করলেন। এ দিন ভারতের সর্ব্বত্র হরতাল প্রতিপালিত হয়। মহাত্মা গান্ধী তখন বোম্বাইয়ে। এখানে হরতালের দিন ভীষণ দাঙ্গা হ'ল। দাঙ্গা পরবর্ত্তী কয়েক দিন পর্য্যন্ত চলে। মহাত্মা গান্ধী শত চেষ্টা ক'রেও দাঙ্গা থামাতে না পেরে উপবাস আরম্ভ করেন। এর ফলে দাঙ্গা থেমে যায় এবং পাঁচ দিন উপবাসের পর গান্ধীজী অন্নজল গ্রহণ করেন।

সরকার এই সুযোগে সর্ব্বত্র অর্ডিনান্স জারি ক'রে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী বে-আইন ঘোষণা করলেন। কলকাতার রাস্তায় খদ্দর ফেরী করার সময় চিত্তরঞ্জনের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী বাসন্তী দেবী, ভগিনী শ্রীমতী উর্ম্মিলা দেবী ও শ্রীমতী সুনীতি দেবী ৭ই ডিসেম্বর ধৃত হলেন। তাঁদের ঐ দিন রাত্রেই আবার ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এ হ'ল ব্যাপক ধরপাকড়ের পূর্ব্বাভাষ। কলকাতায় চিত্তরঞ্জন দাশ, আবুলকালাম আজাদ, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, সুভাষচন্দ্র বসু ও অন্যূন ষোল হাজার স্বেচ্ছাসেবক অবিলম্বে কারারুদ্ধ হলেন। এলাহাবাদে পণ্ডিত মোতিলাল নেহ্রু ও পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্রুও ধৃত হলেন। পঞ্জাবে লালা

লজপত রায় ইতিমধ্যেই কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন।• এত ক'রেও কিন্তু বড়লাট লর্ড রেডিং মনে সোয়াস্তি পেলেন না। কারণ যেখানেই যুবরাজ গমন করেন সেখানেই হরতাল প্রতিপালিত হয়। তিনি প্রকাশ্যে বললেন—এসব দেখে শুনে তিনি বিশেষ উদ্বিগ্ন ও হতভম্ব হয়েছেন (purplexed and puzzled)। কলকাতায়ও যাতে এরূপ হরতাল অনুষ্ঠিত না হয় সেজন্য তিনি সচেষ্ট হলেন। মহম্মদ আলী জিন্না ও পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, লর্ড রেডিং ও দেশবন্ধুর মধ্যে দূতের কার্য্য ক'রে একটা আপোষ-রফার আয়োজন করেন। অর্ডিনান্স তুলে নিয়ে কারাবদ্ধ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে মুক্তি দিলেই আপোষের কথাবার্ত্তা সুরু হ'তে পারে, দেশবন্ধু এ মর্ম্মে কথা দিলেন। কিন্তু সর্ব্বোপরি এ কথাও বললেন যে, পূর্ব্বাহ্নে মহাত্মা গান্ধীর সম্মতি লাভ করা চাই। মহাত্মা গান্ধী আলীভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে করাচী প্রস্তাবে বন্দী নেতাদেরও মুক্তি দাবী করায় এবং বড়লাটের শাসন-পরিষদের সদস্য কলকাতা থেকে চলে যাওয়ায় আপোষ-আলোচনা আর অধিক দূর অগ্রসর হয় নি। দেশবন্ধু পরে বলেছেন, মহাত্মা গান্ধীজী তখন রাজী না হ'য়ে ভুল করেছেন। জবাহরলাল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ কিন্তু বলেন, সমূহ বিপদ থেকে মুক্ত হ'য়ে আমলাতন্ত্র নিশ্চয়ই আবার নিজ মূর্ত্তি ধারণ করতেন। কলকাতায় হরতাল সবচেয়ে বেশী সাফল্যমণ্ডিত হয়। এদিন এখানে ট্রাম চলাচল বন্ধ ছিল, রজনীতে অমানিশার অন্ধকার বিরাজ করে।

আহ্‌মদাবাদ কংগ্রেসের অধিবেশনের প্রাক্কালে অন্যূন ত্রিশ হাজার ভারতবাসী কারাবরণ করে। নির্ব্বাচিত সভাপতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তখন কারারুদ্ধ। তাঁর অনুপস্থিতিতে হাকিম আজমল খাঁ কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করলেন। চিত্তরঞ্জনের লিখিত অভিভাষণ পাঠ করলেন সরোজিনী নাইডু। পূর্ব্ব বছরের নিরিখে আগামী বছরের করণীয়, নির্ণীত ক'রে একটি ব্যাপক প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। বলা বাহুল্য এটিই এবারকার অধিবেশনের প্রধান প্রস্তাব। মহাত্মা গান্ধীজী স্বয়ং এ প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। এতে বলা হ'ল যে, সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপী অপূর্ব্ব নির্ভীকতা, স্বার্থত্যাগ ও অহিংসার সঙ্গে আন্দোলন পরিচালনা করা হয়েছে বটে, কিন্তু এখনও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নি। গবর্ণমেণ্ট খিলাফৎ সমস্যা, পঞ্জাবের অনাচার ও স্বরাজ এ তিনটি বিষয়ে দেশবাসীর মনোভাব ক্রমাগত উপেক্ষা ক'রেই চলেছেন এবং অর্ডিন্যান্স জারি ক'রেও

ফৌজদারী আইনের বিবিধ ধারা প্রয়োগ ক'রে স্বাধীন ভাবে মত প্রকাশে ও সভাসমিতি অনুষ্ঠানে ভয়ানক বিঘ্ন ঘটিয়েছেন—নেতা ও স্বেচ্ছাসেবকগণকে কারারুদ্ধ ক'রে দেশ-সেবায় বাদ সেধেছেন। এজন্য কংগ্রেস আঠার বছরের উর্দ্ধ প্রত্যেক নরনারীকে স্বেচ্ছাসেবক শ্রেণী ভুক্ত হ'তে নির্দ্দেশ দেন। স্বেচ্ছাসেবকের পক্ষে কথায়, কার্য্যে, চিন্তায় অহিংস থাকা ও ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় খিলাফৎ ও পঞ্জাব সমস্যা সমাধান ও স্বরাজ লাভের উপায় স্বরূপ অহিংস-অসহযোগে এবং হিন্দু, মুসলমান, শিখ, পার্শী, খ্রীষ্টান, ইহুদীর মিলনে বিশ্বাসী হওয়া বাঞ্ছনীয়। স্বদেশী গ্রহণ, খদ্দর পরিধান, হিন্দুর পক্ষে অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন, সর্ব্বপ্রকার দুঃখ-ভোগ স্বেচ্ছাসেবকের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। সভাসমিতি অনুষ্ঠান সম্পর্কেও নির্দ্দেশ দেওয়া হ'ল। মহাত্মা গান্ধীজী কংগ্রেসের ডিক্টেটর বা সর্ব্বাধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন।

আর একটি প্রস্তাবে এই অনুরোধ জানান হ'ল যে যাঁরা অসহযোগের মূল নীতিতে বা এর কর্ম্ম পদ্ধতিতে বিশ্বাসী নন্ তাঁরাও যেন দেশের আর্থিক উন্নতির জন্য খদ্দর ব্যবহার করেন ও খদ্দর ও সূতা উৎপাদনে সাহায্য করেন এবং সুরাপান বর্জ্জন আন্দোলন ও হিন্দু হ'লে অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনে অবহিত হন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় অসহযোগী না হ'লেও কংগ্রেসের গঠনমূলক কার্য্য, বিশেষ ক'রে খদ্দর প্রচারে তৎপর হয়েছিলেন। তাঁরই সাহায্যে ও বিখ্যাত অসহযোগী সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের উদ্যোগে খাদি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়।

এবারকার মোস্‌লেম-লীগ অধিবেশনের সভাপতি হলেন মৌলানা হস্‌রৎ মোহানী। অভিভাষণে হিংসার প্ররোচনার ওজুহাতে সরকার তাঁকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। কংগ্রেস ও লীগের আদর্শ ও লক্ষ্য এক, এজন্য লীগ সর্ব্বসম্মতি ক্রমে কংগ্রেসের ভিতরই লীন হলেন।

মৌলানা হস্‌রৎ মোহানী কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে এর 'ক্রীড' বা মূল নীতি পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করলেন। 'স্বরাজ' কথাটির বদলে 'সর্ব্বপ্রকার বিদেশী কর্ত্তৃত্ব বিমুক্ত পূর্ণ স্বাধীনতা' ("Complete Independence free from all foreign control")—মূল নীতি তিনি এইরূপ পরিবর্ত্তিত করতে চেয়েছিলেন। গান্ধীজীর বিরোধিতায় তখন এ প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়।

পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় অতঃপর কংগ্রেসের মূল নীতিতে স্বাক্ষর করেন। এ সময় সরকারী দমন-নীতির প্রতিবাদে মাদ্রাজের শ্রীনিবাস আয়াঙ্গার এড্ভোকেট-জেনারেল পদ ও সি-আই-ই উপাধি ত্যাগ ক'রে কংগ্রেসে যোগ দিলেন। আহ্মদাবাদ অধিবেশনে স্পষ্ট প্রতীত হ'ল, কংগ্রেস শ্রেণীবিশেষ বা দলবিশেষের প্রতিষ্ঠান নয়, ভারতবর্ষের বিশাল জনসমষ্টিরই মুখপাত্র হয়েছে।

অতঃপর ১৪-১৬ই জানুয়ারী বোম্বাইয়ে প্রথমে সার্ শঙ্করণ নায়ার ও পরে সার্ বিশ্বেশ্বরায়ার সভাপতিত্বে কংগ্রেস ও সরকারের মধ্যে আপোষ-নিষ্পত্তির উপায় নির্ণয়ের জন্য একটি সর্ব্বদল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হ'ল। সম্মেলনের আপোষ প্রস্তাবে সরকার কোনরূপ উচ্চবাচ্য করেন নি। গান্ধীজীও ব্যাপক ভাবে কর-বন্ধ আন্দোলন আরম্ভ করবার আয়োজন করলেন। বারডৌলী তালুক এর উপযুক্ত স্থান ব'লে বিবেচিত হ'ল। সত্যাগ্রহীর নিয়ম অনুসারে মহাত্মা গান্ধী বড়লাট লর্ড রেডিংকে ১লা ফেব্রুয়ারী পত্র লিখে নিজ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করলেন।

কিন্তু সত্যাগ্রহে সাফল্য লাভ করার পক্ষে দেশবাসীর যতখানি অহিংস হওয়া প্রয়োজন তা হয় নি। এর প্রমাণ চৌরী-চৌরার হত্যাকাণ্ড। যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত গোরক্ষপুর জেলায় চৌরী-চৌরা থানার একজন দারোগা ও একুশ জন কনেষ্টবলকে ৫ই ফেব্রুয়ারী জনতা ক্ষেপে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ করে। মহাত্মা গান্ধী এই সংবাদ পেয়ে অতিমাত্র বিচলিত হন ও তাঁর আইন-অমান্য আন্দোলন প্রচেষ্টাকে একটি 'হিমালয় প্রমাণ ভুল' ("Himalayan Blunder") ব'লে স্বীকার করেন। পরবর্ত্তী ১২ই ফেব্রুয়ারী বারডৌলীতে ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন আহ্বান ক'রে আইন-অমান্য আন্দোলন অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ ক'রে দিলেন। বোম্বাইয়ের দাঙ্গা ও চৌরী-চৌরায় জনতার অনাচার—আন্দোলন বন্ধের জন্য মহাত্মাজী এ দু'টিকেই যথেষ্ট কারণ ব'লে উল্লেখ করেন। অতঃপর গান্ধীজী জাতির সম্মুখে কতকগুলি গঠন-মূলক কর্ম্মপদ্ধতি উপস্থাপিত করলেন। আইন-অমান্য স্থগিত রেখে গঠনমূলক কর্ম্মতালিকা অনুসরণের প্রস্তাব 'বারডৌলী প্রস্তাব' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এক কোটি কংগ্রেস-সদস্য সংগ্রহ, চরকা প্রচার, জাতীয় বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠা, সুরাপান নিবারণ, পঞ্চায়েৎ প্রবর্ত্তন, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন ও হিন্দু-মুসলমানে ঐক্য প্রতিষ্ঠা এই কর্ম্মপদ্ধতির অঙ্গীভূত হ'ল।

ভারতের সর্ব্বত্র অসহযোগীদের উপর এর প্রতিক্রিয়া হ'ল খুব। গান্ধীজী কিন্তু অটল। পরবর্ত্তী ২৪শে ও ২৫শে ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হ'ল ও ব্যক্তিগত আইন-অমান্যের অনুমতি বাদে মোটামুটি ভাবে বারডৌলী প্রস্তাবই গৃহীত হ'ল।

গবর্ণমেন্ট এতদিনে গান্ধীজীকে গ্রেপ্তারের সুযোগ খুঁজছিলেন। বারডৌলী প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া দেখে তাঁরা ভাবলেন তাঁর জনপ্রিয়তা তখন খুবই হ্রাস পেয়েছে, সুতরাং তাঁকে গ্রেপ্তারের এই উপযুক্ত সময়। ১৩ই মার্চ্চ গান্ধীজী শঙ্করলাল ব্যাঙ্কারের সঙ্গে ধৃত হলেন। ১৮ই মার্চ্চ তারিখে আহ্‌মদাবাদ শহরে গান্ধীজীর বিচার হ'ল। তাঁর বিরুদ্ধে ১২৪ (ক) ধারামতে রাজদ্রোহজনক অপরাধ সাব্যস্ত করার জন্য তাঁরই 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'য় প্রকাশিত তিনটি প্রবন্ধ বাছাই ক'রে নেওয়া হয় ("Tampering with Loyalty", "The Puzzle and its Solution, ও Shaking Manes")। মহাত্মাজী বোম্বাই, মাদ্রাজ ও চৌরী-চৌরার দাঙ্গার সমস্ত দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করেন ও অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্ম্মপ্রণালীর কথা ব্যক্ত ক'রে একটি বিবৃতি দান করেন। তিনি নিজ অপরাধ স্বীকার ক'রে বিচারপতি মহোদয়কে বলেন যে, মুক্ত হ'লে তিনি ঐরূপ অপরাধেই পুনরায় লিপ্ত হবেন, সুতরাং তাঁকে যেন আইনে বিহিত সর্ব্বোচ্চ দণ্ডই দেওয়া হয়। বিচারপতি গান্ধীজীকে তিনটি অপরাধের জন্য দু'বছর ক'রে ছ'বছর বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। মহাত্মাজীর কারাদণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে আবার ধরপাকড়ের হিড়িক পড়ে গেল।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি অতঃপর তিন মাস পর্য্যন্ত শেঠ যমুনালাল বাজাজের নেতৃত্বে কংগ্রেস-কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। জুন মাসের ভিতরেই কংগ্রেসের পদস্থ নেতারা মুক্ত হলেন। এ সময় বঙ্গে ও মহারাষ্ট্রে কৌন্সিলের মধ্যে থেকে অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনার কথা উঠে। চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভানেত্রী শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী কৌন্সিল-প্রবেশ সম্বন্ধে দেশবন্ধুর অনুকূল মত প্রকাশ করলেন। মধ্যপ্রদেশেও অনুরূপ মতবাদ প্রকাশিত হ'ল। অতঃপর ৭—৯ই জুন লক্ষ্ণৌ শহরে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হ'ল। মুক্তিলাভ ক'রেই পণ্ডিত মোতিলাল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ অধিবেশনে যোগদান করলেন। এ অধিবেশনে বর্ত্তমানের নিরিখে কর্ম্মপদ্ধতির

রদ-বদল আবশ্যক কি-না সেজন্য ভারতের সর্ব্বত্র মতামত গ্রহণের উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটির সভ্য হলেন পণ্ডিত মোতিলাল নেহ্‌রু, ডাঃ আন্‌সারী, বিঠলভাই ঝাভেরী পটেল, কস্তুরীরঙ্গ আয়াঙ্গার, শেঠ ছোটানি, রাজাগোপালাচার্য্য ও হাকিম আজমল খাঁ (সভাপতি)।

কমিটি ভারতের প্রধান প্রধান অসহযোগ কেন্দ্রে স্বাক্ষ্য গ্রহণ করেন। তাঁরা যে রিপোর্ট দাখিল করেন তাতে মাত্র দুটি বিষয়ে নূতনত্ব ছিল—(১) নিখিল-ভারতীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপরিষদ ও (২) মিউনিসিপালিটি, লোকালবোর্ড ও ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডে সদস্য প্রেরণ। দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সদস্যপদ গ্রহণে সকলে একমত হলেন, কিন্তু কৌন্সিল-প্রবেশ সম্পর্কে মতানৈক্য দেখা দিল। হাকিম আজমল খাঁ, পণ্ডিত মোতিলাল নেহ্‌রু ও বিঠলভাই ঝাভেরী পটেল কৌন্সিল-প্রবেশের অনুকূলে ও ডাঃ মহম্মদ আলী আন্‌সারী, রাজা-গোপালাচার্য্য ও কস্তুরীরঙ্গ আয়াঙ্গার কৌন্সিল-প্রবেশের প্রতিকূলে মত দিলেন। ২০—২৪শে নবেম্বর কলকাতায় কমিটির অধিবেশন হ'ল। কৌন্সিল-প্রবেশ সম্পর্কে এতই মতানৈক্য প্রকটিত হ'ল যে, তদন্ত কমিটির সকল সিদ্ধান্তই পরবর্ত্তী গয়া কংগ্রেস পর্য্যন্ত স্থগিত রইল। নিখিল-ভারত খিলাফৎ কমিটিও কৌন্সিল-প্রবেশের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন।

এ বছরে ২৩শে মার্চ্চ মিঃ মণ্টেগু পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। তাঁর পদত্যাগের কারণ, ভারতীয় মুসলমানদের সন্তুষ্টির জন্য বড়লাট লর্ড রেডিং ও তাঁর মধ্যে সেভার্স সন্ধির রদ-বদলের প্রস্তাব সম্পৃক্ত পত্রাদি মন্ত্রীসভার অনুমতি না নিয়ে প্রকাশ! গবর্ণমেণ্টের সিবিল-সার্বিসে অধিক সংখ্যায় ভারতীয় নিয়োগ সম্ভব কি-না এ বিষয় বিবেচনার জন্য প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির নিকট ও'ডনল সার্কুলার প্রচারিত হয়। সিবিলিয়ানরা এর বিরুদ্ধে বিলাতে জোর আন্দোলন উপস্থিত করেন। প্রধানমন্ত্রী মিঃ লয়েড জর্জ্জ তাঁদের বিশেষ ভাবে আশ্বাস দেন। তিনি এ প্রসঙ্গে সিবিল-সার্বিসকে ভারত-শাসনের 'ষ্টীল ফ্রেম' বা ইস্পাত কাঠামো আখ্যা দিলেন।

কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশন হ'ল গয়া তীর্থে (১৯২২)। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ সভাপতি পদে বৃত হলেন। তখন কামাল পাশার নেতৃত্বে তুরস্ক মিত্রশক্তিদের অনুচর গ্রীকদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র

প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন। অন্যান্য এশিয়াবাসীর মত সভাপতি চিত্তরঞ্জনও এতে খুবই আশান্বিত ও উৎফুল্ল হন, ও সমগ্র এশিয়ার রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে এক এশিয়াটিক ফেডারেশন প্রতিষ্ঠার অভিলাষ ব্যক্ত করেন। জাতির মুক্তি সংগ্রামে সময়ে সময়ে যে কর্ম্মপদ্ধতির পরিবর্ত্তন আবশ্যক তাও তিনি বুঝিয়ে দিলেন। কিন্তু কৌন্সিল-প্রবেশ সম্পর্কীয় আলোচনায় গোঁড়া গান্ধী-পন্থীরা একথা স্বীকার করলেন না। রাজাগোপালাচার্য্যের নেতৃত্বে তাঁরা এর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ ক'রে পূর্ব্ব অহিংস-অসহযোগই হুবহু বাহাল রাখতে চাইলেন ও সংখ্যাধিক্যের জোরে প্রকাশ্য অধিবেশনে প্রস্তাব পাস করিয়ে নিলেন। চিত্তরঞ্জন গণতন্ত্র রীতি অনুযায়ী পদত্যাগ-পত্র দাখিল করলেন। এ দু'দলের মধ্যে মতবিরোধ ক্রমে খুবই তীব্র হ'য়ে উঠল ও এঁরা 'নো-চেঞ্জার' বা পরিবর্ত্তন-বিরোধী এবং 'প্রো-চেঞ্জার' বা পরিবর্ত্তন-বাদী নামে অতঃপর পরিচিত হলেন।

যা একবার কর্ত্তব্য ব'লে বিবেচনা করেছেন চিত্তরঞ্জন তা ছাড়বার পাত্র নন্। তিনি ঐ তারিখেই কংগ্রেসের নিয়মাধীন থেকে স্বরাজ্য দল নামে এক নূতন দল গঠন করলেন। পণ্ডিত মোতিলাল নেহ্‌রু, বিঠলভাই ঝাভেরী পটেল, হাকিম আজমল খাঁ, নরসিংহ চিন্তামন্ কেলকার, শ্রীনিবাস আয়াঙ্গার প্রমুখ নেতৃবর্গ ছিলেন কৌন্সিল-প্রবেশ প্রস্তাবের প্রধান সমর্থক। তাঁরা স্বরাজ্য দলে অবিলম্বে যোগ দিলেন। চিত্তরঞ্জন ও মোতিলাল স্বরাজ্য দলের প্রধান নেতা ব'লে গণ্য হন।

অতঃপর স্বরাজ্য দলের কার্য্য হ'ল দ্বিবিধ—প্রথম, সমগ্র দেশের পরিবর্ত্তন-বাদীদের সঙ্ঘবদ্ধ করা ও দ্বিতীয় কংগ্রেস কর্তৃক কৌন্সিল-প্রবেশ নীতি স্বীকার করিয়ে নেওয়া। নিখিল-ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির এলাহাবাদ অধিবেশনে (২৭শে ফেব্রুয়ারী) স্থির হ'ল যে, পরিবর্ত্তন-বাদী ও পরিবর্ত্তন-বিরোধী উভয় দলেরই কৌন্সিল-প্রবেশের অনুকূল ও প্রতিকূল প্রচারকার্য্য ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত বন্ধ থাকবে। বোম্বাই অধিবেশনে (২৫-২৭শে মে) কিন্তু কমিটি ভোটদাতাদের মধ্যে নিষেধাত্মক প্রচার স্থগিত রাখাই সাব্যস্ত করলেন।

নাগপুরে ইতিপূর্ব্বে পতাকা সত্যাগ্রহ সুরু হয় ও শেঠ যমুনালাল বাজাজ কারাবরণ করেন। এই নাগপুরেই কমিটির পুনরায় অধিবেশন হ'ল (৮-১০ই জুলাই)। কৌন্সিল-প্রবেশ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করবার জন্য কমিটি

পরবর্ত্তী আগষ্ট মাসে মৌলানা আবুলকালাম আজাদের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন আহ্বানের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। আবুল কালাম কয়েক মাস পূর্ব্বেই কারামুক্ত হন। হঠাৎ এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করায় পরিবর্ত্তন-বিরোধীরা কিন্তু আবার বেঁকে বসলেন। তাঁরা শীঘ্রই নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির আর একটি অধিবেশন আহ্বান করলেন। নাগপুর অধিবেশনের অল্প পরেই লালা লজপত রায়, মৌলানা মহম্মদ আলী, ডক্টর কিচলু, ইয়াকুব হাসান প্রভৃতি বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ কারামুক্ত হন। কৌন্সিল-প্রবেশ নীতির দিকে এঁদের অনেকেই ঝুঁকে পড়লেন। কমিটির পরবর্ত্তী বিশাখাপত্তম্ অধিবেশনে (৩রা আগষ্ট) আহ্বানকারীরা তাঁদের প্রতিকূল প্রস্তাব আর উত্থাপন করলেন না। সভাপতির সুবিধা অনুসারে সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লীতে বিশেষ অধিবেশন করা ঠিক হ'ল। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্‌রু পর পর দু'বার কারাদণ্ড ভোগ ক'রে ১৯২৩ সালের প্রথমে মুক্তিলাভ করেন ও কংগ্রেসের কার্য্যে যোগ দেন।

পরিবর্ত্তন-বাদী ও পরিবর্ত্তন-বিরোধীদের বাদ-প্রতিবাদে ও শক্তি পরীক্ষায় যখন কংগ্রেসের সময় ও শক্তি ব্যয়িত হ'তে থাকে তখন বহির্জগতে এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটল যার প্রতিক্রিয়া ভারতভূমির উপরও কম হ'ল না। কামাল পাশা প্রতিষ্ঠিত তুরস্কের এঙ্গোরা গবর্ণমেণ্টকে মিত্রশক্তিবর্গ স্বীকার ক'রে নিয়ে তার প্রতিনিধিদের সঙ্গে ১৯২২, নবেম্বর লজান শহরে সন্ধির কথাবার্ত্তা সুরু করেন। দীর্ঘকাল আলোচনার পর ১৯২৩, জুলাই মাসে তুরস্কের স্বাধীনতা ষোল আনা স্বীকৃত হয়। কামাল পাশার আধিপত্য ভয়ে পরহস্ত-ক্রীড়নক তুর্কী সুলতান ব্রিটিশ জাহাজে মাল্টায় পালিয়ে যান। তুরস্ক একটি 'রিপাব্লিক' বা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হ'ল। কামাল সুলতানের এক নিকট আত্মীয়কে খলিফা পদ দান করলেন। তিনি পরে এ পদটিও তুলে দেন।

এইরূপে খিলাফৎ সমস্যার সমাধান হওয়ায় স্বার্থপর লোকেরা আবার হিন্দু-মুসলমানে বিচ্ছেদ ঘটাবার চেষ্টা করল। অসহযোগ আন্দোলনের মরশুমে হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম্মের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। স্বার্থপর লোকেরা এর সুযোগ নিয়ে উভয়ের মধ্যে প্রথমে বিরোধ ও পরে দাঙ্গার সৃষ্টি করতে

লাগল। ১৯২২ সালেই মহরমের সময় মুলতানে প্রথম হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা হয়। পর বছর বঙ্গে ও পঞ্জাবে দাঙ্গা সুরু হয় ও উভয় পক্ষের বিস্তর লোকের প্রাণহানি ঘটে।

এ বছর কেনিয়ায় ভারতীয় সমস্যা নিরতিশয় জটিল হয়ে উঠে। তিনটি অর্ডিন্যান্স পাস করিয়ে কেনিয়া সরকার প্রবাসী ভারতীয়দের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার ও রাষ্ট্রীয় অধিকার বিলোপের চেষ্টা করে। প্রবাসী ভারতীয়দের সাহায্যর জন্য কংগ্রেস কর্ত্তৃক এণ্ড্রুজ সাহেব প্রেরিত হন। কংগ্রেসের নির্দ্দেশে ২৬শে আগষ্ট ভারতের সর্ব্বত্র হরতাল প্রতিপালিত হয়। মডারেটরাও এ হরতালে যোগদান করেছিলেন।

কৌন্সিল-প্রবেশ প্রশ্নের মীমাংসার জন্য দিল্লীতে যথারীতি কংগ্রেসের তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হ'ল। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ পাণ্ডিত্যের জন্য ভারতবর্ষে ও ভারতবর্ষের বাইরে সর্ব্বত্র সুপরিচিত ও সম্মানিত। কংগ্রেসের উভয় দলই তাঁর উপর সমান আস্থাবান্। কাজেই তাঁর নেতৃত্বে বিরোধের সমাধান হবে সকলেই এরূপ আশা করেছিলেন। হ'লও তাই। কংগ্রেসে সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই মর্ম্মে প্রস্তাব গৃহীত হ'ল যে, অন্য কোনরূপ আপত্তি না থাকলে কংগ্রেস-সেবীরা ভাবী নির্ব্বাচনে কৌন্সিলে সদস্য পদপ্রার্থী হ'তে পারবেন।

এর পরই স্বরাজ্য দল বিভিন্ন প্রদেশে নির্ব্বাচনের জন্য প্রস্তুত হলেন। বঙ্গে চিত্তরঞ্জন দাশের প্রধান সহযোগী হলেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও সুভাষচন্দ্র বসু। তাঁরা দল সংগঠনে মনপ্রাণ ঢেলে দিলেন। ডিসেম্বর মাসের প্রথমে নির্ব্বাচন পর্ব্ব শেষ হ'ল। সে কি উৎসাহ উদ্দীপনা! অসহযোগ ভারতবর্ষে রাজনৈতিক চেতনার কিরূপ প্লাবন এনেছে এবারে তা সম্যক্ প্রতীত হ'ল। বঙ্গে নির্ব্বাচনে স্বরাজ্য দল সকল দলের মধ্যে সংখ্যা-গরিষ্ঠ হলেন। এবারকার নির্ব্বাচনের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য—ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরাজয়। সুরেন্দ্রনাথ ইতিপূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। চৌষট্টি হাজার টাকা বার্ষিক বেতনে মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত থেকে সরকারী দমন-নীতিতে পূর্ণ সমর্থন দিয়ে দেশবাসীর আস্থা হারিয়েছেন। তিন বছরে তিনি যে সব সৎকার্য্য করেছেন তার প্রতি লোকে

ভ্রূক্ষেপও করলে না। চিত্তরঞ্জন মুসলমান সদস্যের সঙ্গে প্যাক্ট ক'রে কৌন্সিলে সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করলেন। মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে স্বরাজ্য দল অন্য দলের সমবেত শক্তির চেয়েও সংখ্যাধিক্য লাভ করলেন। অন্যান্য প্রদেশে অবশ্য স্বরাজ্য দলের এতটা জয়লাভ ঘটে নি।

কংগ্রেসের সাধারণ বার্ষিক অধিবেশন হ'ল কোকনদে মৌলানা মহম্মদ আলীর সভাপতিত্বে। তিনি কৌন্সিল-প্রবেশে সম্মতি দিলেন। পরিবর্ত্তন-বিরোধী দল কিন্তু কৌন্সিল-প্রবেশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করতে দ্বিধা করেন নি। মূল প্রস্তাব এমনভাবে তৈরী করা হ'ল যে, কৌন্সিল-প্রবেশে সাময়িক ভাবে অনুমতি দেওয়া হ'লেও কংগ্রেস ষোল আনা অসহযোগে তথা কৌন্সিল-বর্জ্জনেও বিশ্বাসী! বঙ্গের অন্যতম কংগ্রেস নেতা, পরিবর্ত্তন-বিরোধীদের অগ্রণী, সর্ব্বত্যাগী শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী প্রকাশ্য অধিবেশনে এই প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। প্রস্তাব গৃহীত হ'ল।

১৯২১—১৯২৩, এই তিন বছর যেমন বাস্তবিক পক্ষে অহিংস-অসহযোগের স্থিতিকাল তেমনি এ সময় ভারতের সর্ব্বত্র ডায়ার্কি চালু হয় ও শাসনকার্য্য নির্ব্বাহিত হ'তে থাকে। মিঃ মণ্টেগু যে উদ্দেশ্যে চরমপন্থী দল থেকে মডারেটদের সম্পূর্ণ আলাদা ক'রে নিয়েছিলেন, অসহযোগের মরশুমে বাস্তবিকই সুফল দান করে। ভারতসচিবের কৌন্সিল থেকে বড়লাট ও প্রাদেশিক লাটদের শাসন-পরিষদের সদস্য ও মন্ত্রীপদ গ্রহণে মডারেটরা বিশেষ অগ্রণী হন। এ সময় বড়লাটের শাসন-পরিষদে সার্ তেজ বাহাদুর সাপ্রু আইন-সদস্য হলেন। অবশ্য কোথাও কোথাও যে এর ব্যতিক্রম না হ'ল তা নয়। পঞ্জাবে সামরিক আইনে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত নেতা লালা হরকিষণ লাল ও মধ্যপ্রদেশের তিলক-সহযোগী খাপার্দ্দে মহাশয় মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেছিলেন। লর্ড সিংহ বিহার-উড়িষ্যার গবর্ণর পদে অধিষ্ঠিত হন। মডারেট মন্ত্রী ও সদস্যগণ দমন-নীতির সমর্থন করলেও কোন কোন দিকে দেশের উপকারও করেছিলেন। স্বদেশী যুগে বিধিবদ্ধ প্রেস আইন ও রাজদ্রোহাত্মক সভাবন্ধ আইন এ সময়ের মধ্যে তুলে দেওয়া হয়। সংশোধিত ফৌজদারী আইন কিন্তু পূর্ব্ববৎই বাহাল রইল। ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে বিচার-বৈষম্য (ইল্‌বার্ট বিলের কথা স্মরণ করুন) এবারে বিদূরিত হ'ল। বিচারে

ইউরোপীয়দের অনুরূপ ভারতীয়দেরও সুবিধা-সুযোগ দেওয়া হ'ল। ভারতীয় বিচারকরা ইউরোপীয় আসামীদেরও বিচার ক্ষমতা লাভ করলেন। ১৯২২ সালে সমগ্র ভারতবর্ষে ও ব্রহ্মদেশে শিক্ষার্থী যুবকদের যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার জন্য বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রে টেরিটোরিয়্যাল কোর্স গঠিত হয়।

প্রদেশসমূহে মডারেট মন্ত্রীরাও প্রথম দিকে কিছু কিছু গঠনমূলক কার্য্য করতে সমর্থ হলেন। বঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা করপোরেশনকে একটি সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগেও গণতন্ত্র নীতি অনুসৃত হ'ল। মিউনিসিপালিটি ও ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডে মনোনীত সদস্য সংখ্যা আইন দ্বারা হ্রাস করা হ'ল। তাঁর সময়ে ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের চেয়ারম্যান বা সভাপতি পদে বে-সরকারী সদস্যরা নির্ব্বাচিত হবার অধিকার লাভ করেন। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও এই মর্ম্মে আইন বিধিবদ্ধ হ'ল।

যখন অসহযোগ আন্দোলন প্রবল ছিল তখনই মডারেটগণ এই সব কার্য্য করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। অসহযোগে ভাটা পড়লে আমলাতন্ত্র আবার মাথা নাড়া দিয়ে উঠে এবং সিবিলিয়ান সেক্রেটারীগণ মন্ত্রীদের অনুমতি না নিয়েই তাঁদের মাথার উপরে গবর্ণরকে সব কথা জানাতে তৎপর হন। সিবিলিয়ান কর্ম্মচারীদের এরূপ করার আইনতঃ কোন বাধা ছিল না। মন্ত্রিগণের কেউ কেউ এজন্য পদত্যাগ করেন। পঞ্জাবের মন্ত্রী লালা হরকিষণ লাল, যুক্তপ্রদেশের মন্ত্রী সি. ওয়াই. চিন্তামণি ও জগৎনারায়ণ লাল প্রভৃতির নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

এ তিন বছরের মধ্যে বিলাতে ১৯২১ সালে ও ১৯২৩ সালে সাম্রাজ্য-সম্মেলন হয়। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে অন্যান্য উপনিবেশবাসীদের মত ভারতবাসীদেরও সমান অধিকার থাকবে—উভয় অধিবেশনেই একথা স্বীকৃত হয়। ভারতগবর্ণমেণ্ট শ্রীনিবাস শাস্ত্রীকে ১৯২২ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে প্রেরণ করেন। ১৯২৩ সালে সাম্রাজ্য-সম্মেলনে ভারতের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন সার্ তেজ বাহাদুর সাপ্রু ও আলোয়ারের মহারাজা। এ সময় রাষ্ট্রসঙ্ঘেও সরকার মনোনীত ভারতীয় প্রতিনিধি প্রেরিত হয়।

স্বরাজ্য দলের কার্য্যক্রম

(১৯২৪-১৯২৬)

কঠিন রোগে আক্রান্ত হওয়ায় ১৯২৪ সালের গোড়াতেই মহাত্মা গান্ধীর দেহে অস্ত্রোপচার হ'ল। ৫ই ফেব্রুয়ারী দু'বছর পূর্ণ না হ'তেই তিনি মুক্তিলাভ করলেন। এরপর সম্পূর্ণ নিরাময় ও বিশ্রাম লাভের জন্য বোম্বাইয়ের সমুদ্রতীরে জুহু স্বাস্থ্য-নিবাসে তিনি কিছুদিন অবস্থান করেন। জুহু শীঘ্রই রাজনীতিকদের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হ'ল। সহযোগী-অসহযোগী পরিবর্ত্তন-বাদী পরিবর্ত্তন-বিরোধী সকলেই, তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য জুহুতে ভিড় করতে লাগলেন। পণ্ডিত মোতিলাল নেহ্‌রু ও পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্‌রু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ নেতৃবৃন্দও সেখানে সত্বর উপনীত হলেন। একদিকে মহাত্মা গান্ধী ও অন্যদিকে চিত্তরঞ্জন ও মোতিলালের মধ্যে কৌন্সিল-প্রবেশ ও স্বরাজ্য দলের কার্য্যক্রম নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্ত্তা চলে। ভারতের পরবর্ত্তী রাজনৈতিক আন্দোলনকে এই আলাপ-আলোচনা খুবই প্রভাবিত করেছে।

জানুয়ারী মাসের মধ্যেই নবগঠিত নিখিল-ভারত ও প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদগুলির অধিবেশন আরম্ভ হ'ল। ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদে স্বরাজ্যদলপতি পণ্ডিত মোতিলাল নেহ্‌রু প্রথমেই ভারতবর্ষের জাতীয় দাবির আকারে একটি প্রস্তাব ব্যবস্থাপরিষদে পেশ করেন। এ দাবির মর্ম্ম হ'ল—অবিলম্বে 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট' দলের সহযোগে—ডোমিনিয়ন ষ্টেটাসের অনুরূপ পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসনমূলক পরিকল্পনা স্থির করার উদ্দেশ্যে গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান। নেশন্যালিষ্ট ও ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট নামে অন্য জাতীয়তাবাদী দলের সহযোগে স্বরাজ্য দল প্রস্তাব পাস করিয়ে নেন। গবর্ণমেণ্ট এ দাবি সম্পূর্ণ নূতন ব'লে গ্রহণে অসম্মত হন। কিন্তু জনমত প্রবল দেখে তাঁরা ডায়ার্কি কতটা কার্য্যকরী হয়েছে ও তার সংস্কার আবশ্যক কি-না এ সব বিষয় বিবেচনার জন্য সার্ আলেকজাণ্ডার মাডিম্যানের সভাপতিত্বে সরকারী ও বে-সরকারী সদস্যদের নিয়ে একটি কমিটি

গঠন করলেন। ব্যবস্থাপরিষদে সরকারের বিরোধিতা সত্ত্বেও রাজনৈতিকবন্দীদের (মায় ১৮১৮ সালের তিন আইনে বন্দী) মুক্তিদান, দক্ষিণ আফ্রিকার কয়লার উপরে শুল্ক স্থাপন, অকালী শিখদের উপর অত্যাচার সম্পর্কে তদন্ত কমিটি গঠন প্রভৃতি বিষয়ে প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব-বিলের প্রথম চার দফাও নাকচ করা হ'ল। মধ্যপ্রদেশের ও বঙ্গের ব্যবস্থাপরিষদ ভোটাধিক্যে মন্ত্রী-নিয়োগ বাতিল ক'রে দিলেন।

আবার বঙ্গে স্বরাজ্য দল করপোরেশন নির্ব্বাচনে আশাতীত জয়লাভ করলেন। পূর্ব্ব বছর বিধিবদ্ধ আইনে কলকাতা করপোরেশন—নির্ব্বাচিত ৭৫, মনোনীত ১০ ও অলডারম্যান ৫—মোট এই নব্বইজন সদস্য নিয়ে গঠিত হওয়ার প্রস্তাব হয়। মুসলমানদের জন্য প্রথম ন' বছর পৃথক্ নির্ব্বাচনের কথা থাকে, কিন্তু পরে আসন সংরক্ষিত রেখে সকলেই জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সাধারণ ভোটে নির্ব্বাচিত হওয়া স্থির হয়। প্রথম বারেই এইসব নির্ব্বাচিত সদস্যের মধ্যে অন্যূন পঞ্চাশ জন স্বরাজ্য দলভুক্ত হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বাচিত হন। কলকাতা করপোরেশনের প্রথম মেয়র নির্ব্বাচিত হলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। দেশবন্ধুর অন্যতম সহকর্ম্মী সুভাষচন্দ্র বসু হলেন চীফ এক্‌সিকিউটিভ অফিসার বা প্রধান কর্ম্মসচিব। করপোরেশনের বিভিন্ন কার্য্য পৃথক্ পৃথক্ কমিটি দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়। এসব কমিটিতেও স্বরাজ্য দল প্রাধান্য লাভ করলেন। সকল কার্য্যই অতঃপর তাঁদের মতানুযায়ী চলতে লাগল। দেশবন্ধু মেয়ররূপে প্রথম বক্তৃতায়েই বললেন, করপোরেশনে স্বরাজ্য দলের আদর্শ দরিদ্র নারায়ণের সেবা। এই উদ্দেশ্যে রচিত একটি কর্ম্মতালিকাও সভায় উপস্থাপিত করা হয়।

কোকনদ কংগ্রেসে পরিবর্ত্তন-বাদী ও পরিবর্ত্তন-বিরোধীদের বিরোধ মেটে নি। মহাত্মা গান্ধীর কারামুক্তির সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তন-বিরোধী গোঁড়া অসহযোগীরা আবার পূর্ণ অহিংস-অসহযোগ-নীতি বাহাল রাখার জন্য উদ্‌গ্রীব হ'য়ে উঠলেন। মহাত্মা গান্ধীও পূর্ণ অসহযোগে বিশ্বাসী। চিত্তরঞ্জন ও মোতিলালের সঙ্গে আলোচনার পরেও তিনি স্বমতেই দৃঢ় রইলেন। পূর্ব্বোক্ত আলাপ-আলোচনার পরে একপক্ষে গান্ধী ও অপর পক্ষে মোতিলাল ও চিত্তরঞ্জন নিজ নিজ মতামত সম্বলিত স্বতন্ত্র বিবৃতি প্রচার করেন। এই আলোচনায়

মত-বৈষম্য প্রকট হ'লেও এ ভবিষ্যতের পক্ষে শুভই হয়েছিল। সরকারের সকল প্রকার কার্য্যে বাধা দানের বাসনা নিয়ে স্বরাজ্য দল ব্যবস্থাপরিষদে প্রবেশ করেন। অতঃপর তাঁরা গান্ধীজীর পরামর্শে সরকারের প্রগতিবিরোধী আইন কানুনের বিপক্ষতা করার সঙ্গে সঙ্গে গঠনমূলক কার্য্যের (যেমন, খদ্দর প্রচলন, বিদেশী কাপড়ের উপর শুল্ক স্থাপন, মাদকদ্রব্য বর্জ্জন, সামরিক ব্যয় হ্রাস প্রভৃতি) প্রস্তাব পাস করিয়ে নিতেও সম্মত হন। ইতিমধ্যে একটি ব্যাপারে কিন্তু উভয় পক্ষের মত-বিরোধ আবার প্রকট হ'য়ে উঠে।

১৯২৪ সালের জানুয়ারী মাসে গোপীনাথ সাহা কলকাতার পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট ভ্রমে মিঃ আর্ণেষ্ট ডে নামে এক ইউরোপীয়কে হত্যা করে। এ বছরে সিরাজগঞ্জে মৌলানা আক্রাম খাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বঙ্গের প্রাদেশিক সম্মেলন উক্ত গর্হিত হত্যা কার্য্যের নিন্দা করলেন ও সঙ্গে সঙ্গে গোপীনাথের উদ্দেশ্যের প্রশংসা করলেন। মহাত্মা গান্ধী এর তীব্র সমালোচনা ক'রে 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'য় নিজ মন্তব্য প্রকাশ করেন। পরবর্ত্তী ২৭-২৯শে জুন আহ্‌মদাবাদে যে নিখিল-ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হ'ল তাতে তিনি একটি প্রস্তাবে গোপীনাথের দেশ-প্রেমের কথা স্বীকার ক'রেও এরূপ হত্যাকার্য্যের তীব্র নিন্দা করেন ও বলেন যে, এরূপ কার্য্য অহিংস-অসহযোগ-নীতির ঘোর বিরোধী এবং দেশকে আইন-অমান্যের জন্য প্রস্তুত করার পক্ষে ভীষণ বিঘ্ন। চিত্তরঞ্জন গান্ধীজীর প্রস্তাবের এক সংশোধনী উত্থাপন করলেন। চিত্তরঞ্জনও অহিংসারই পক্ষপাতী, কিন্তু এসব অকার্য্যের মূলেও যে গভীর দেশ-প্রেম নিহিত তা তিনি স্পষ্ট ক'রে বলতে চাইলেন। মাত্র কয়েক ভোটের আধিক্যে গান্ধীজীর প্রস্তাব গৃহীত হয়। গান্ধীজী এতে মোটেই খুশি হ'তে পারেন নি। তিনি পুনরায় অসহযোগের পাঁচটি ধাপ—বিদেশী বস্ত্র, আইন-আদালত, স্কুল-কলেজ, উপাধি ও ব্যবস্থাপরিষদ বর্জ্জন—কোকনদ প্রস্তাবের প্রতি লক্ষ্য রেখে কমিটি দ্বারা স্বীকার করিয়ে নিলেন। মহাত্মা গান্ধী আর একটি প্রস্তাব এই করলেন যে, যে-কোন কংগ্রেস কমিটির নির্ব্বাচিত সদস্যকে প্রতিমাসে অন্ততঃ দু'হাজার গজ চরকায় কাটা উৎকৃষ্ট সূতা জমা দিতে হবে। এ পরিমাণ সূতা জমা না দিলে সভ্যপদ আপনা আপনিই খারিজ হ'য়ে যাবে। শাস্তি দানের এ ধারাটি শেষ পর্য্যন্ত টেকে নি।

এর পরে এমন একটি ঘটনা ঘটে যার ফলে মহাত্মা গান্ধী স্বরাজ্য দল উপর থেকে সমস্ত বাধা নিষেধ তুলে নিয়ে এক কংগ্রেসের একটি বিশেষ অঙ্গ ব'লে স্বীকার ক'রে নিলেন। কিন্তু এর পূর্ব্বে আর একটি বিষয়ের এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। এ বছরে আবার নানাস্থানে হিন্দু-মুসলমানে মারাত্মক দাঙ্গা উপস্থিত হয়। কিন্তু কোহাটে যে দাঙ্গা হয় তার তুলনা মেলা ভার। প্রত্যেক স্থানেই দাঙ্গার ফলে সেই সেই স্থানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপরই অত্যাচার হ'ল বেশী, কোহাটেও তাই হ'ল। মহাত্মা গান্ধী এরূপ আত্মঘাতী দাঙ্গার অবসান কল্পে দিল্লীতে মৌলানা মহম্মদ আলীর ভবনে একুশ দিন ব্যাপী উপবাস আরম্ভ করেন (২২শে সেপ্টেম্বর)। তাঁর স্বাস্থ্যের জন্য ভারতের সর্ব্বত্র ভীষণ উদ্বেগ দেখা দিল। ২৬শে সেপ্টেম্বর থেকে ২রা অক্টোবর পর্য্যন্ত ভারতের বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী নেতৃবৃন্দ দিল্লীতে ঐক্য সম্মেলনে সমবেত হলেন ও প্রত্যেকের ধর্ম্মকর্ম্ম যাতে নির্বিরোধে প্রতিপালন করতে দেওয়া হয়, সেজন্য সকলকে অনুরোধ জানালেন। এই সম্মেলনে কলকাতার খ্রীষ্টান যাজকশ্রেষ্ঠ মেট্রোপলিটানও যোগ দিয়েছিলেন। দুঃখের বিষয়, মহাত্মা গান্ধীর উপবাস ও সম্মেলনের নির্দ্দেশ সত্ত্বেও পরে বহুবার দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়েছে।

বাংলা সরকার অক্টোবর মাসে অকস্মাৎ এক অর্ডিন্যান্স জারি ক'রে হিংসাত্মক কর্ম্মে লিপ্ত থাকার সন্দেহে বহু বঙ্গ সন্তানকে বন্দী করলেন। সরকার, কলকাতা করপোরেশনের প্রধান কর্ম্মসচিব, চিত্তরঞ্জনের সহযোগী ও স্বরাজ্য দলের অন্যতম উদ্যোক্তা সুভাষচন্দ্র বসু, এবং স্বরাজ্য দলভুক্ত কৌন্সিল সদস্য সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র ও অনিলবরণ রায়কে অক্টোবর মাসে ১৮১৮ সালের তিন আইনে বন্দী ক'রে মান্দালয়ে পাঠালেন। এই নিয়ে ভারতের সর্ব্বত্র আবার তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। অনেকেরই বিশ্বাস হ'ল, স্বরাজ্য দলকে পঙ্গু করার উদ্দেশ্যেই সরকার পুনরায় দমন-নীতির আশ্রয় নিয়েছেন। দমন-নীতির প্রতিবাদ করবার জন্য ২১শে ও ২২শে নবেম্বর বোম্বাইয়ে একটি সর্ব্বদল সম্মেলন হ'ল। সম্মেলন সাম্প্রদায়িক মীমাংসা সমেত স্বরাজের একটি পরিকল্পনা রচনার বিষয় আলোচনা করেন ও এর ভার একটি কমিটির উপর অর্পণ করেন।

সর্ব্বদল সম্মেলনের অব্যবহিত পরেই ২৩শে ও ২৪শে নবেম্বর কলকাতায় নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হ'ল। ইতিপূর্ব্বেই মহাত্মা গান্ধী,

মোতিলাল ও চিত্তরঞ্জনের সহযোগে কৌন্সিল-প্রবেশ সমর্থক এক বিবৃতি প্রচার করেছিলেন। কমিটি বিবৃতির মর্ম্ম সমর্থন ক'রে প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং সর্ব্বদল সম্মেলনের কার্য্য যাতে সুষ্ঠু ভাবে হয় এজন্য অহিংসা অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রাখা সাব্যস্ত করেন। কিন্তু গান্ধীজীর নির্দ্দেশে এই মর্ম্মেও একটি প্রস্তাব গৃহীত হ'ল যে, অতঃপর কংগ্রেসের প্রত্যেক সভ্যকেই বার্ষিক চার আনা চাঁদার পরিবর্ত্তে প্রতি মাসে দু' হাজার গজ চরকায় কাটা সূতা প্রতি অঞ্চলের কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জমা দিতে হবে।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও সরকারের দমন-নীতির ফলে একদিকে মহাত্মা গান্ধী তথা গোঁড়া অসহযোগী ও স্বরাজ্য দল এবং অন্যদিকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে একই উদ্দেশ্য নিয়ে কর্ম্ম-প্রচেষ্টা সুরু হয়। আর এর মূলে ছিল মহাত্মা গান্ধীর মহানুভবতা ও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি। কাজেই কংগ্রেসের বেলগাঁও অধিবেশনের (১৯২৪) জন্য তিনিই সর্ব্বসম্মতি ক্রমে সভাপতি নির্ব্বাচিত হলেন। মিসেস্ এনি বেসাণ্ট অহিংস-অসহযোগ, সত্যাগ্রহ, আইন-অমান্য প্রভৃতির ঘোরতর বিরোধী। এজন্য গত চার বছর তিনি কংগ্রেসে যোগদান করেন নি। অসহযোগ আন্দোলন পরিত্যক্ত হওয়ায় তিনিও পুনরায় এসে কংগ্রেসে যোগ দিলেন।

গান্ধীজী অভিভাষণে সম্পূর্ণরূপে হিংসা-নীতি বর্জ্জনের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করলেন। 'পূর্ণ স্বাধীনতা' প্রস্তাব আহ্‌মদাবাদ অধিবেশন থেকে প্রতিবারেই কংগ্রেসে উথাপিত হ'ত। গান্ধীজী প্রথম বারে এতে বিশেষ আপত্তি জানিয়েছিলেন। এবারে কিন্তু তিনি বললেন, 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে থেকেই স্বরাজ লাভ সম্ভব। তবে যদি ব্রিটেনের সঙ্গে আমাদের সব সম্পর্ক ছিন্ন করা আবশ্যক হয় তবে তা করতেও আমরা দ্বিধাবোধ করব না।' স্বরাজ লাভের জন্য গান্ধীজী তিনটি পন্থার উপর বিশেষ জোর দিলেন —(১) চরকা, (২) হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ও (৩) অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন। তাঁর মতে ভাবী স্বরাজ্যের ভিত্তি হবে এইরূপ, 'যারা হাতে কলমে কাজ করে তাদের ভোট দানের অধিকার, সৈন্য ব্যয় ও বিচার ব্যয় হ্রাস, উত্তেজক মাদক দ্রব্যের ও এ থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের উচ্ছেদ, সামরিক ও বে-সামরিক কর্ম্মচারীদের বেতন কমান, ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন, বিদেশীদের একচেটিয়া ব্যবসাধিকারে সঙ্কোচ, রাজন্যবর্গের

অধিকার স্বীকার, স্বেচ্ছাচারমূলক আইন প্রত্যাহার, সরকারী কর্ম্মে বর্ণ-ভেদ বিলোপ, বিভিন্ন সম্প্রদায়কে ধর্ম্ম বিষয়ে স্বাধীনতা দান, দেশভাষার মারফত শাসন কার্য্য পরিচালনা ও হিন্দিকে জাতীয় ভাষা ব'লে স্বীকার।

মহাত্মা গান্ধী কর্ত্তৃক প্রদত্ত স্বরাজ্যের এই সর্ব্বনিম্ন দাবী নিয়ে আমরা ১৯২৫ সালে উপনীত হলাম। বস্তুতঃ এবছর কংগ্রেসের ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের, এমন কি ব্যবস্থাপরিষদের ভিতরেও এই নিয়ে বিশেষ আলোচনা চলল। এই উদ্দেশ্যে জানুয়ারী মাসে মহাত্মা গান্ধীর সভাপতিত্বে সর্ব্বদল সম্মেলন কমিটির অধিবেশন হয়। মিসেস্ এনি বেসাণ্টকে সভাপতি ক'রে একটি সাব কমিটি গঠিত হ'ল। দু' বছর পূর্ব্বে মিসেস্ বেসাণ্ট ও সার্ তেজ বাহাদুর সাপ্রু স্বরাজ 'স্কীম' বা শাসন-তন্ত্র রচনার জন্য একটি নেশন্যাল কন্‌ভেন্‌শন আহ্বান করেছিলেন। তদবধি এতদিন বেসাণ্ট মহোদয়া শাসন-তন্ত্র রচনায় ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর স্বরাজ স্কীমের নাম হ'ল 'কমন্‌ওয়েল্‌থ অফ্ ইণ্ডিয়া বিল'। তবে সাম্প্রদায়িক সমস্যার মীমাংসা না হওয়ায় সর্ব্বদল সম্মেলনের কার্য্য অধিকদূর অগ্রসর হ'তে পারে নি।

পূর্ব্ব বছরের মত এবারেও স্বরাজ্য দল ভারতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ-গুলিতে কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে লাগলেন। বঙ্গে ও মধ্যপ্রদেশে ডায়ার্কি অচল হ'ল। ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদে স্বরাজ্যদল অন্যান্য দলের সহযোগে ভোটাধিক্যে জাতীয় উন্নতির অনুকূলে নানা প্রস্তাব পাস করিয়ে নিলেন। বিলাতে শ্রমিক মন্ত্রীসভা ন'মাস মাত্র স্থায়ী ছিল। ১৯২৪ সালের শেষেই আবার রক্ষণশীল দল মন্ত্রীসভা গঠন করেন। এবার ভারতসচিব হলেন লর্ড বার্কেনহেড। তিনি পার্লামেণ্টে স্বরাজ্য দলকে একটি সুনিয়ন্ত্রিত ও সঙ্ঘবদ্ধ রাজনৈতিক দল ব'লে আখ্যা দিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে এই অনুরোধ জানালেন, তাঁরা যেন দেশ শাসনের দায়িত্ব ভার গ্রহণ ক'রে ডায়ার্কি সফল করতে সাহায্য করেন ও এর ভিতরকার দোষ-ত্রুটীগুলি দেখাতে সচেষ্ট হন।

মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের সভাপতিরূপে দক্ষিণ ভারতে পরিভ্রমণ ক'রে মে মাসে বঙ্গদেশে আগমন করেন। তিনি পূর্ব্বে ১৯২১ সালে অসহযোগের মরশুমে আলী-ভ্রাতৃদ্বয় ও আলী-জননী বাঈ আম্মা সহ বাংলা প্রদক্ষিণ করেছিলেন। এবারেও তিনি বঙ্গের বিভিন্ন জেলা পরিভ্রমণ করলেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বঙ্গের অবিসংবাদিত নেতা। ১৯২৪ সালের শেষ ভাগে তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি জনসেবার জন্য এক অছিমণ্ডলীর হস্তে অর্পণ করেন। এর ফলে তাঁর উপর সাধারণের শ্রদ্ধাপ্রীতি আরও বেড়ে গেল। ডক্টর পট্টভি সীতারামিয়া তাঁর 'কংগ্রেস ইতিহাস' পুস্তকে এই মর্ম্মে লিখেছেন যে, ১৯২৪ সালে বেলগাঁও কংগ্রেসে চিত্তরঞ্জন সকলের চিত্তই জয় ক'রে ফেলেছিলেন। চিত্তরঞ্জন মে মাসে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে ফরিদপুর অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। অভিভাষণে তিনি যে-সব প্রস্তাব করেন তা ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টার ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। কংগ্রেস তথা স্বরাজ্য দলের রাজনীতিও কিছুকাল এ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। চিত্তরঞ্জন অভিভাষণে স্বরাজের মানে করলেন, ব্রিটিশ কমন্‌ওয়েল্‌থের ভিতরে পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন সম্পন্ন একটি রাষ্ট্র। তিনি লর্ড বার্কেনহেডের আন্তরিকতা মেনে নিয়ে মাত্র দুটি সর্ত্ত সাপক্ষে ডায়ার্কি চালু করতে সম্মতি জানালেন। এ সর্ত্ত দুটি হ'ল—(১) সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দান, (২) ব্রিটিশ কমন্‌ওয়েল্‌থের অঙ্গ হিসাবে ভারতবর্ষের স্বরাজের দাবি সম্পূর্ণ স্বীকার, এবং স্বরাজ প্রাপ্তির পূর্ব্বে এর যথাযোগ্য ভিত্তি অবিলম্বে নিশ্চিত রূপে প্রতিষ্ঠা। তিনি ভারতবাসীদের পক্ষে এই প্রতিশ্রুতি দিতে সম্মত হন যে, তাঁরা বাক্যে, কর্ম্মে বা ইঙ্গিতে কোন প্রকারেই বিপ্লব আন্দোলনের উৎসাহ দিবেন না এবং এরূপ আন্দোলন উচ্ছেদ করতে সকল শক্তি প্রয়োগ করবেন। মহাত্মা গান্ধী এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে এ সময় লর্ড রেডিং আলোচনা করবার জন্য বিলাত যান। কাজেই স্বরাজের দাবি সম্বন্ধে স্পষ্ট কথা বলা চিত্তরঞ্জন আবশ্যক বিবেচনা করেছিলেন।

এর পরেই চিত্তরঞ্জনের শরীর ভেঙ্গে পড়ে। তিনি স্বাস্থ্য লাভের আশায় দার্জ্জিলিং শৈলাবাসে গমন করেন। এখানে অবস্থিতি কালে মহাত্মা গান্ধী ও মিসেস্ এনি বেসাণ্ট তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তিনি আর নিরাময় হলেন না, ১৬ই জুন (১৯২৫) তিনি ইহধাম ত্যাগ করলেন। বালগঙ্গাধর তিলকের মৃত্যুর মত চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুও জাতির পক্ষে এই সময়ে খুবই মর্ম্মান্তিক হয়েছিল। তাঁর প্রয়াণে আসমুদ্র হিমাচল উদ্বেলিত হ'য়ে উঠল।

সকলেই চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুতে মনোবেদনা জ্ঞাপন করতে লাগল। রবীন্দ্রনাথ চিত্তরঞ্জনের অনন্যতুল্য দানের কথা অমর ছন্দে রূপ দিলেন।

'সাথে করে এনেছিলে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।'

মহাত্মা গান্ধী চিত্তরঞ্জনের গুণ-মুগ্ধ। তিনি দীর্ঘ তিন মাস কাল বাংলায় থেকে চিত্তরঞ্জনের স্মৃতি রক্ষার্থ দশ লক্ষ টাকা তুললেন। সমগ্র টাকা চিত্তরঞ্জনের দানের সঙ্গে মিলিত ক'রে তাঁর বিস্তৃত বাস ভবনের উপর তাঁরই ইচ্ছা অনুসারে চিত্তরঞ্জন সেবা সদন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মহাত্মা গান্ধী চিত্তরঞ্জনের কর্ম্মভার তাঁর যোগ্য সহচর ও একনিষ্ঠ ত্যাগী দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের উপর অর্পণ করলেন। যতীন্দ্রমোহন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি, কৌন্সিল স্বরাজ্য দলের নেতা ও করপোরেশনের মেয়র পদে অভিষিক্ত হলেন।

ডায়ার্কির নির্দ্ধারণ অনুসারে প্রথম চার বছর অন্তে এ সময় বিভিন্ন কৌন্সিলে সভাপতি নির্ব্বাচন হয়। মধ্যপ্রদেশ ও বেরার কৌন্সিলে স্বরাজ্য দলভুক্ত শ্রীপদ বলবন্ত তাম্বে ও ভারতীয় এসেম্বলী বা ব্যবস্থাপরিষদে বিঠলভাই ঝাভেরী পটেল (২২শে আগষ্ট) সভাপতি নির্ব্বাচিত হলেন। পূর্ব্ব বছর নিযুক্ত মাডিম্যান কমিটির রিপোর্ট গ্রহণের জন্য স্বরাষ্ট্র-সচিব সার্ আলেকজাণ্ডার মাডিম্যান ৭ই সেপ্টেম্বর ব্যবস্থাপরিষদে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কমিটির সুপারিশ ভারতের স্বরাজ-দাবির কাছ ঘেঁষেও গেল না, বরং মন্ত্রীরা যাতে নিরঙ্কুশ হ'য়ে গদিতে অধিষ্ঠিত থাকতে পারেন সেজন্য এতে বেতন বজেট-ভুক্ত না করারও নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছিল। স্বরাজ্য-দলপতি মোতিলাল সুতরাং মাডিম্যানের প্রস্তাবের এই মর্ম্মে এক সংশোধনী উত্থাপন করলেন যে, ভারত-গবর্ণমেণ্টকে পূর্ণ দায়িত্বশীল করবার জন্য গঠন-তন্ত্রে ও শাসন-বিভাগ গুলিতে মূলগত পরিবর্ত্তনের নির্দ্দেশ দিয়ে পার্লামেণ্টে এক ঘোষণা করা হোক্ এবং ভারতীয় ও ইউরোপীয় প্রতিনিধি নিয়ে সংখ্যা-লঘিষ্ঠদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে উপরোক্ত আদর্শে একটি বিস্তারিত শাসন-তন্ত্র প্রণয়নের জন্য গোলটেবিল বৈঠক বা অনুরূপ কোন বৈঠক আহ্বান করা হোক্। মোতিলালের প্রস্তাব ৭২—৪৫ ভোটে গৃহীত হ'ল।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদে স্বরাজ্য দলের কার্য্য-কলাপ হ'ল গঠন-তন্ত্রমূলক ও পার্লামেন্টের বিরোধী দলেরই মত। যে-সব আইন ভারতের কল্যাণকর তার সমর্থন স্বরাজ্য দল তো করলেনই, এর উপরে সরকারের বিভিন্ন কমিটিতেও তাঁরা সহযোগিতা করতে লাগলেন। এ বছরের বজেটে ভারতবাসীদের সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য ন' লক্ষ টাকা ব্যয় ধার্য্য করা হয়। এ উদ্দেশ্যে সার্ এণ্ড্রু স্কীনের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠিত হ'ল ও স্বরাজ্য দল থেকে মোতিলাল নেহ্রু এর অন্যতম সদস্য নিযুক্ত হ'লেন।

২১শে ও ২২শে সেপ্টেম্বর নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির ও ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন হ'ল। মহাত্মা গান্ধী স্বরাজ্য দলের হস্তেই কংগ্রেসের রাজনৈতিক কার্য্যভার তুলে দিলেন। লর্ড বার্কেনহেড ও লর্ড রেডিং স্বরাজ্যের দাবি অগ্রাহ্য করায়ই গান্ধীজী স্বরাজ্য দলের হস্তে কংগ্রেসের কার্য্যভার সঁপে দিতে বেশী ক'রে উদ্‌বুদ্ধ হন। স্বরাজ্য দল অতঃপর ষোল আনা কংগ্রেস-ভুক্ত হ'য়ে পরিষদে কংগ্রেসী দল ব'লে পরিগণিত হলেন। খদ্দরের প্রাধান্য চলে গেল। মাসে দু'হাজার গজ সূতা বা বছরে চার আনা চাঁদা দিলেই যে কেউ কংগ্রেসের সভ্য হ'তে পারবেন স্থির হ'ল। নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের জন্য প্রদত্ত অর্থ ছাড়া কংগ্রেসের যাবতীয় টাকা-কড়ি স্বরাজ্য দল ব্যবহারের অনুমতি পেলেন। মহাত্মা গান্ধীর সভাপতিত্বে চরকা ও খদ্দর বিভাগ নব-প্রতিষ্ঠিত নিখিল-ভারত চরকা সমিতি গ্রহণ করলেন। গোঁড়া অসহযোগীরা গান্ধীজীর নির্দ্দেশ অনুসারে কংগ্রেসের গঠনমূলক কার্য্যে মন দিলেন।

পরিবর্ত্তন-বাদী, পরিবর্ত্তন-বিরোধী নির্ব্বিশেষে কংগ্রেসের সকল দলই অক্টোবর মাসের মধ্যে বিভিন্ন প্রদেশের প্রধান প্রধান মিউনিসিপালিটির নির্ব্বাচনে যোগ দিয়ে সংখ্যাধিক্য লাভ করলেন। পাটনায় বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, এলাহাবাদে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্রু, আহ্‌মদাবাদে বল্লভ ভাই পটেল, বোম্বাইয়ে বিঠলভাই পটেল ও মাদ্রাজে শ্রীনিবাস আয়াঙ্গার মিউনিসিপাল করপোরেশনগুলির কর্ণধার হলেন। দেশ সেবার নূতন ক্ষেত্র কংগ্রেসীদের সম্মুখে উন্মোচিত হ'ল। কলকাতা করপোরেশনের কথা আগেই আমরা জেনেছি।

এইরূপ প্রতিষ্ঠার মধ্যেই আবার স্বরাজ্য দলে মতানৈক্য উপস্থিত হয়। প্রাদেশিক পরিষদগুলিতে ক্রমাগত বাধা-দান নীতির উপর এক শ্রেণীর সভ্য

বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে উঠলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ফরিদপুর বক্তৃতার মধ্যেও সূক্ষ্মদর্শী লোকেরা এতাদৃশ বীতশ্রদ্ধার আভাস পেয়েছিলেন। মধ্যপ্রদেশের কৌন্সিল সভাপতি শ্রীপদ বলবন্ত তাম্বে দলের অনুমতি না নিয়ে অকস্মাৎ গবর্ণরের শাসন-পরিষদের সদস্য পদ গ্রহণ করলেন। পণ্ডিত মোতিলাল নেহ্‌রু ১লা নবেম্বর এক বিবৃতিতে এর তীব্র সমালোচনা ক'রে বললেন, কিছুদিন পূর্ব্ব থেকেই মন্ত্রিত্ব গ্রহণের জন্য একদল যে পীড়াপীড়ি করছিলেন এ তারই পরিণতি। স্বরাজ্য দলের অন্যতম প্রধান সদস্য কেলকার, জয়াকর ও মুঞ্জে স্বরাজ্য দলের কৌন্সিল থেকে পদত্যাগ করলেন ও বললেন যে, ব্যর্থ বাধা-দান-নীতি বর্জ্জন ক'রে দেশের মঙ্গলার্থ ডায়ার্কি চালু করাই কর্ত্তব্য। তাঁরা পারস্পরিক সহযোগিতারই পক্ষপাতী হলেন।

এই বাদ-বিসম্বাদের মধ্যে কানপুরে মহোদয়া সরোজিনী নাইডুর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের চত্বারিংশৎ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হ'ল। নাইডু মহোদয়া নিজে সুকবি। অসহযোগ আন্দোলনে ও প্রবাসী ভারতীয়দের সেবায় তিনি কায়মনে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি সুললিত ছন্দে স্বদেশবাসীদের সর্ব্বাগ্রে নির্ভীক ও আত্মনির্ভরশীল হ'তে আবেদন জানালেন। তাঁর মতে 'স্বাধীনতা সংগ্রামে ভয় অমার্জ্জনীয়—বিশ্বাসঘাতকতা আর নৈরাশ্য অমার্জ্জনীয় অপরাধ'। কংগ্রেস প্রথমেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন। স্বরাজের দাবি ও স্বরাজ্য দলের কর্ত্তব্য সম্পর্কেও প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। আর একটি প্রস্তাবে নির্দ্দেশ দেওয়া হয় যে, সরকার যদি পরবর্ত্তী ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে ১৯২৪ সালে ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদে গৃহীত স্বরাজের নিম্নতম দাবি স্বীকার না করেন তাহ'লে স্বরাজ্য দল নিখিল-ভারতীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপরিষদগুলি থেকে পদত্যাগ করবেন এবং যে-পর্য্যন্ত না এই দাবি স্বীকৃত হয় সে-পর্য্যন্ত কোনমতেই মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করা চলবে না।

১৯২৬ সালের আরম্ভেই গোঁড়া স্বরাজ্য দল ও পারস্পরিক সহযোগিতা পন্থীদের মধ্যে মতবিরোধ ঘনিয়ে উঠল। বোম্বাই কৌন্সিলের স্বরাজ্য দল শেষোক্ত দলের পূর্ণ সমর্থন করলেন। পরবর্ত্তী ৬ই ও ৭ই মার্চ্চ দিল্লীতে

অনুষ্ঠিত নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে কানপুরের মূল রাজনৈতিক প্রস্তাব সমর্থিত হ'ল ও বজেট আলোচনার প্রাক্কালে স্বরাজ্য দল ভারতীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপরিষদগুলি থেকে বের হ'য়ে আসেন। পারস্পরিক সহযোগিতাবাদীদের এ ব্যাপার মোটেই পছন্দসই ছিল না। তাঁরা পূর্ব্বেই দলের সদস্য পদ ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে কৌন্সিলগুলির সদস্য পদও ত্যাগ করেছিলেন। অতঃপর বোম্বাইয়ের অন্যান্য জাতীয় দলের সঙ্গে তাঁরা একযোগে ৩রা এপ্রিল তারিখে 'ইণ্ডিয়ান নেশন্যাল পার্টি' গঠন করলেন। উভয় দলের মধ্যে বিরোধ যাতে অধিক দূর অগ্রসর না হয় সেজন্য ২১শে (১৯২৬) এপ্রিল সবরমতী আশ্রমে উভয় দলের মিলন-সূত্র উদ্ভাবনের জন্য মহাত্মা গান্ধী এক বৈঠক আহ্বান করেন। মোতিলাল নেহ্রু, সরোজিনী নাইডু, লালা লজপত রায়, নরসিংহ চিন্তামন্ কেলকার, মুকুন্দরাম রাও জয়াকর ও মাধবশ্রীহরি আনে এবং ডক্টর বালকৃষ্ণ শিবরাম মুঞ্জের উপস্থিতিতে এই মর্ম্মে একটি আপোষ-রফা হ'ল যে, ১৯২৪ সালের জাতীয় দাবির প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের মনোভাব তখনই সন্তোষজনক বিবেচিত হবে যখনই তাঁরা মন্ত্রীদের যথাযোগ্য ভাবে কর্ত্তব্য প্রতিপালনের জন্য আবশ্যক দায়িত্ব ও ক্ষমতা স্বীকার ক'রে নেবেন। কর্ত্তৃপক্ষের স্বীকৃতি সন্তোষজনক কি-না প্রত্যেক প্রদেশের কংগ্রেসী কৌন্সিল-সদস্যগণের সিদ্ধান্তই, মোতিলাল ও জয়াকরের সম্মতি সাপক্ষে চূড়ান্ত ব'লে গণ্য হবে। এরূপ রফা হওয়ার পর মাদ্রাজের প্রকাশম্, শ্রীনিবাস আয়াঙ্গার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এর তীব্র সমালোচনা করেন। মোতিলাল নেহ্রু ও জয়াকর পরে আপোষ-রফার যে ব্যাখ্যা করলেন তাতে বিরোধ আরও স্পষ্ট হ'য়ে উঠল। সুতরাং নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির আহ্মদাবাদ অধিবেশনে (৫ই মে, ১৯২৬) আপোষ-রফা গৃহীত না হ'য়ে বাতিলই হ'য়ে গেল।

একদিকে যেমন দু' দলের ভিতর বিচ্ছেদ ঘটল অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক বিরোধ এসময় খুবই প্রকট হ'য়ে উঠল। বঙ্গে পূর্ব্ব বছরই মুসলমান সদস্যগণ স্বরাজ্য দল ত্যাগ করেছেন। এ বছর স্বরাজ্য দলের হিন্দু সদস্যগণের মধ্যেও মতান্তর উপস্থিত হ'ল। এবার এপ্রিল ও মে মাসে কলকাতায় হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে ভীষণ দাঙ্গা হয় তাতে উভয় সম্প্রদায়েরই বহু লোক

প্রাণ বিসর্জ্জন দিলে। এই দাঙ্গার মধ্যেই ৬ই এপ্রিল লর্ড আরুইন বড়লাট হ'য়ে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনিও এই আত্মঘাতী হাঙ্গামায় বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করলেন।

ডায়ার্কিতে প্রতি তিন বছরে সাধারণ নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা। কাজেই এবারে নবেম্বর মাসে আবার সাধারণ নির্ব্বাচন হ'ল। ইতিপূর্ব্বে সেপ্টেম্বর মাসে লালা লজপত রায় ও পণ্ডিত মোতিলাল নেহ্‌রুর মধ্যে মত-বিরোধ দেখা দেয়। লালাজী ব্যবস্থাপরিষদ থেকে বেরিয়ে আসার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর দৃঢ় ধারণা হয়, এরূপ হ'লে ব্যবস্থাপরিষদে জাতীয়তার পরিপোষক কোন কার্য্যই করা সম্ভব হবে না। তিনিও তাই স্বরাজ্য দল ত্যাগ করলেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, লালা লজপত রায় ও পারস্পরিক সহযোগিতা পন্থীরা মিলে 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কংগ্রেস পার্টি' বা স্বতন্ত্র কংগ্রেস দল গঠন করলেন। সাধারণ নির্ব্বাচনে স্বরাজ্য দল মাদ্রাজে সংখ্যাধিক্য লাভ করলেন। অন্যান্য স্থানে, বিশেষতঃ মধ্যপ্রদেশে ও যুক্তপ্রদেশে এবার তেমন সুবিধা ক'রে উঠতে পারলেন না। মধ্যপ্রদেশে পারস্পরিক সহযোগিতা-পন্থীরাই সংখ্যা-গরিষ্ঠ হলেন।

এবারকার কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হ'ল গৌহাটীতে। গোঁড়া স্বরাজ্য দলের নূতন নেতা শ্রীনিবাস আয়াঙ্গার সভাপতি হলেন। কংগ্রেস অধিবেশনের প্রাক্কালে দিল্লীতে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ মুসলমান আততায়ীর হস্তে নিহত হন। শ্রদ্ধানন্দ হিন্দুদের ভিতর শুদ্ধি ও সংগঠন আন্দোলন প্রবর্ত্তন করেন, বহু বিধর্ম্মীকে হিন্দু ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন, হিন্দু ধর্ম্ম বর্জ্জনকারীকে পুনরায় হিন্দু ধর্ম্মে ফিরিয়ে আনেন। এজন্য মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁর উপরে ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠে। উক্ত আন্দোলন পরিচালনাই তাঁর মৃত্যুর কারণ। শ্রদ্ধানন্দ আর্য্যসমাজভুক্ত সন্ন্যাসী। তাঁর পূর্ব্বনাম লালা মুন্সীরাম। তিনি কাংড়া গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। জনসেবা ও আত্মত্যাগের জন্য সাধারণের নিকট পূর্ব্বাশ্রমেই তিনি মহাত্মা মুন্সীরাম নামে পরিচিত হয়েছিলেন। কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী স্বামীজীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ ক'রে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। মৌলানা মহম্মদ আলী এর সমর্থনে প্রাণস্পর্শী ভাষায় একটি বক্তৃতা করেন।

আয়াঙ্গার মহাশয় অভিভাষণে স্বরাজ্য দলের নিয়মানুবর্ত্তিতার প্রশংসা করেন। ভারতসচিব লর্ড বার্কেনহেড জিদ ধরেন, স্বরাজ্য দল ডায়ার্কি চালু করতে অগ্রে সাহায্য করুন, পশ্চাৎ তাঁদের দাবির কথা বিবেচিত হবে। আর স্বরাজ্য দল চান, আগে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করা হোক্, ও এর প্রথম ধাপ স্বরূপ মন্ত্রীদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হোক্। রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তিদানও তাঁদের একটি প্রধান সর্ত্ত। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এই মর্ম্মেই আপোষের কথা বলেছিলেন। আয়াঙ্গার মহাশয় জাতীয় দাবির পূরণ না হ'লে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের কথা মনে আনাও অন্যায় এইরূপ মত ব্যক্ত করলেন। কাজেই এবারেও এই মর্ম্মে প্রস্তাব গৃহীত হ'ল যে, জাতীয় দাবি পূরণ না হ'লে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ বা সরকারের অধীনে কোন চাক্‌রি গ্রহণ অসম্ভব ; অন্যান্য দল মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করলেও কংগ্রেস দল তার বিরোধিতা করবেন। আয়াঙ্গার মহাশয়ের নিজ প্রদেশ মাদ্রাজেই কিন্তু এর ব্যতিক্রম ঘটে। সেখানকার কংগ্রেস দলেরই সাহায্যে 'স্বতন্ত্র দল' মন্ত্রীসভা গঠন করতে সমর্থ হয়েছিলেন!

আমরা এ পর্য্যন্ত কংগ্রেসের রাজনৈতিক কার্য্যের বিষয়ের কথাই বলেছি। এ তিন বছরের মধ্যে তারকেশ্বর, ভাইকম প্রভৃতি ধর্ম্মস্থানে অনাচার নিবারণ ও ধর্ম্মকর্ম্মে সাধারণের সুবিধা দানের ব্যবস্থার জন্য সত্যাগ্রহ অবলম্বিত হয়। প্রবাসী ভারতীয় সমস্যা সমাধানেরও এ সময় চেষ্টা হয়। সরোজিনী নাইডু ১৯২৪ সালে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কেনিয়া গমন করেন। প্রবাসী ভারতীয়-দের সেবা-কার্য্যে পণ্ডিত বেণারসীদাস চতুর্ব্বেদীর নামও স্মরণীয়। ১৯২৬ সালের অক্টোবর মাসে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে এক প্রতিনিধিদল ভারতবর্ষে আগমন করেন ও সরকারের আতিথ্য স্বীকার ক'রে মাদ্রাজ থেকে পেশোয়ার পর্য্যন্ত ভ্রমণ করেন। পর বছর উভয় সরকারের মধ্যে প্রবাসী ভারতীয় সমস্যা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয়।

স্বরাজ্য বনাম পূর্ণ স্বাধীনতা

(১৯২৭—১৯২৯)

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিনিধি দল স্বদেশে ফিরে গবর্ণমেণ্টকে সব বিষয় জানালেন। অতঃপর দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন ও ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিদের নিয়ে ১৯২৬, ১৭ই ডিসেম্বর থেকে ১৯২৭, ১৩ জানুয়ারী পর্য্যন্ত একটি গোল-টেবিল বৈঠক বসে। ভারতীয় প্রতিনিধিদের নেতৃত্ব করেন সার্ মহম্মদ হবিবুল্লা। বৈঠকের আলোচনায় স্থির হ'ল যে, (১) জীবন-যাপনে প্রতীচ্য মান বা ধরণ স্বীকার ক'রে নিলে প্রবাসী ভারতবাসীরা দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নে স্থায়ী বাসিন্দা রূপে বসবাস করতে পারবে, (২) যারা এ ব্যবস্থায় সম্মত নয়, ইউনিয়ন সরকার নিজ খরচায় তাদের ভারতে পাঠিয়ে দেবেন, (৩) একাদিক্রমে ইউনিয়ন থেকে তিন বছর অনুপস্থিত রইলে সেখানে বসবাসের অধিকার লোপ পাবে, (৪) প্রত্যেক ভারতীয় স্থায়ী বাসিন্দাকেই ১৯১৮ সালে সাম্রাজ্য-সম্মেলনের নির্দ্ধারণ মেনে নিতে হবে, অর্থাৎ প্রত্যেকের আইনতঃ এক স্ত্রী ও তাঁর গর্ভজাত সন্তান-সন্ততি ইউনিয়নে বসবাস করার অনুমতি লাভ করবে। দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতবর্ষের মধ্যে সহযোগিতা স্থাপন কল্পে ইউনিয়নে ভারত গবর্ণমেণ্টের তরফে একজন এজেণ্ট বা প্রতিনিধি নিয়োগের বিষয়ও বৈঠকে স্থিরীকৃত হয়। মহাত্মা গান্ধী বৈঠকের সিদ্ধান্ত-গুলিকে সম্মানজনক আপোষ ব'লে মত প্রকাশ করলেন। তিনি প্রথম এজেণ্ট রূপে শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর নাম প্রস্তাব করেন। ভারত-সরকার এ প্রস্তাবে সম্মত হন ও শাস্ত্রী মহাশয়কেই দক্ষিণ আফ্রিকায় পাঠালেন। এতদিন পরে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবাসী ভারতীয় সমস্যার কতকটা সমাধান হ'ল।

সাধারণ নির্ব্বাচনে স্বরাজ্য দল আশানুরূপ সাফল্যলাভ না করায় এবারে সকল প্রদেশেই ডায়ার্কি চালু হয়। ভারতীয় ব্যবস্থাপারিষদে কংগ্রেসভুক্ত স্বরাজ্য দল, স্বরাজ্য দল ত্যাগী, লজপত রায়, মুকুন্দরাম রাও জয়াকর এবং

মদনমোহন মালবীয় প্রভৃতি দ্বারা গঠিত ন্যেশনালিষ্ট বা জাতীয় দল, জিন্নার ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বা স্বতন্ত্র দল একযোগে কার্য্য ক'রে কোন কোন বিষয়ে ভোটে সরকারকে হারিয়ে দিতে সক্ষম হন। তবে একটি গুরুতর বিষয়ে কিন্তু সরকার পক্ষেরই জয় হ'ল। বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যাদি পরিচালনার জন্য প্রত্যেক দেশই নিজের সুবিধামত বিনিময়ের হার নির্ণয় ক'রে থাকে। ভারতবর্ষের বিনিময় হার এতকাল ব্রিটিশের সুবিধানুসারেই নির্ণীত হ'য়ে এসেছে। মণ্টফোর্ড শাসন-সংস্কার আইনে (১৯১৯) ভারতের ফিস্‌ক্যাল অটোনোমি বা অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হয়। তার বিনিময় হারও ভারতবাসীর স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে নির্ণীত হওয়া উচিত। ভারতীয় নেতৃবর্গ আগেকার বিনিময় হার এখন ভারতীয় স্বার্থের অনুকূল দেখে তার সমর্থন করতে লাগলেন। সরকার কিন্তু এ হার পরিবর্ত্তন করতে তৎপর হলেন। ব্রিটেনের পাউণ্ডের নিরিখে ভারতবর্ষের টাকার মূল্য ধার্য্য হয়। টাকার মূল্য ছিল দীর্ঘকাল যাবৎ ১ শিলিং ৪ পেনি, এবারে তা করা হ'ল ১ শিলিং ৬ পেনি! অর্থাৎ পূর্ব্বে এক পাউণ্ড বা ২০ শিলিংয়ের বিনিময়ে পাওয়া যেত ১৫ টাকা পরিমাণ বিদেশী জিনিস। অতঃপর এর বিনিময়ে পাওয়া গেল ১৩-৫-৪ পাই পরিমাণ জিনিস। এর ফলে বিদেশ থেকে ভারতবর্ষে কম মূল্যে বেশী মাল আমদানী, আর ভারতবর্ষ থেকে বিদেশে কম মূল্যে বেশী মাল রপ্তানির ব্যবস্থা হ'ল। ভারতবর্ষের আমদানীর চেয়ে রপ্তানি-বাণিজ্য বেশী। সুতরাং এ ব্যবস্থায় তার লোকসান হ'ল দু'দিক দিয়ে, (১) বিদেশী মাল কম মূল্যে বেশী আমদানী হওয়ায় স্বদেশী-শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল, (২) কাঁচা মাল কম মূল্যে বেশী রপ্তানি হওয়ায় ভারতবাসীরা মূল্য পেল কম। ব্রিটেন ও ভারতবর্ষের মধ্যে বাণিজ্য ও বাণিজ্যাতিরিক্ত নানা ব্যাপারে টাকার আদান-প্রদান হয় বেশী। কাজেই সাধারণের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হ'ল যে, ব্রিটেনের সুবিধার জন্য ভারতবর্ষের এইরূপ অসুবিধা ঘটান হয়েছে। কেন্দ্রীয় পরিষদে অল্প ভোটাধিক্যে সরকার পক্ষের অভিপ্রায় অনুসারেই আইন পাস হ'ল।

ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদে কংগ্রেস তথা জাতির পক্ষ থেকে স্বরাজের যে নিম্নতম দাবি বার বার পেশ করা হয় সে সম্বন্ধে তখনও ব্রিটিশ ও ভারত-সরকার উদাসীন। স্বরাজ্য দলের সংহতি বজায় থাকলেও প্রত্যেকটি কৌন্সিলেই

তাঁরা সংখ্যান্যুন। কাজেই তাঁদের প্রস্তাব এখন আর প্রায়ই কৌন্সিলে গৃহীত হয় না। স্বরাজ্য দল বিচ্ছিন্ন হ'য়ে কেলকার-জয়াকার-মুঞ্জে ও লালা লজপত রায় প্রমুখ বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ ভিন্ন দল গঠন করেছেন। মাদ্রাজে স্বরাজ্য দল সংখ্যা-গরিষ্ঠ দল হ'লেও মন্ত্রীসভা গঠনের বিরোধিতা না ক'রে প্রকারান্তরে সাহায্যই করলেন!

হিন্দু-মুসলমানে প্রীতি স্থাপনের জন্য এ বছর দুটি ঐক্য সম্মেলন বসে। প্রথমটি আহূত হয় সরকারী আনুকূল্যে। কংগ্রেস কমিটির আহ্বানে দ্বিতীয়টি ২৭শে অক্টোবর কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট নেতারা সম্মিলিত হ'য়ে হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম্মে বিঘ্ন জন্মাতে সকলকে অনুরোধ করেন। মস্‌জিদের সম্মুখে গীতবাদ্যসহ শোভাযাত্রা পরিচালনার সময় ও গো-কোরবানির স্থান নির্দ্দিষ্ট ক'রে দেওয়া হ'ল। প্রত্যেক প্রদেশে এই প্রস্তাব যাতে কার্য্যকরী হয় সেজন্য প্রাদেশিক কমিটি গঠনের ভার নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটিকে দেওয়া হ'ল। দুঃখের বিষয়, এতেও বিশেষ ফলোদয় হয় নি।

ঐক্য সম্মেলনের অব্যবহিত পরে ২৮শে থেকে ৩০শে অক্টোবর কলকাতায় কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হয়। কমিটি ঐক্য সম্মেলনের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। সুভাষচন্দ্র বসু স্বাস্থ্যভঙ্গের জন্য ১৭ই মে কারামুক্ত হন। কিন্তু তখনও বিস্তর বাঙালী যুবক বিনা বিচারে বন্দী ছিলেন। তাঁদের মুক্তি দাবি ক'রে কমিটি এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। নাভার গদিচ্যুত রাজার প্রতি সুবিচারের দাবিও একটি প্রস্তাবে করা হ'ল। সভাপতি হঠাৎ অসুস্থ হ'য়ে পড়ায় এ অধিবেশনে আর বিশেষ কিছু করা সম্ভব হয় নি।

ব্রিটেনে সাধারণ নির্ব্বাচন আসন্ন হওয়ায় রক্ষণশীল গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের প্রতি কর্ত্তব্য পালনে এ সময় কিছু তৎপর হ'য়ে উঠেন। কিন্তু তাঁদের কার্য্য ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের মোটেই অনুকূল হ'ল না। যতটুকু স্বায়ত্ত-শাসন ইতিপূর্ব্বে ভারতবাসীকে দেওয়া হয়েছে তার বেশী দেওয়া সম্ভব কি-না অথবা স্বায়ত্ত-শাসনে অযোগ্যতা প্রমাণিত হ'লে কতটুকুই বা খাটো করা যাবে, এই সব বিষয় অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য নিয়েই তাঁরা একটি কমিশন প্রেরণের সিদ্ধান্ত করেন। বড়লাট লর্ড আরুইন বিশিষ্ট নেতাদের দিল্লীতে আহ্বান করেন ও কমিশন প্রেরণের সিদ্ধান্তের কথা তাঁদের জানান। মহাত্মা গান্ধী

ছিলেন এ সময় ম্যাঙ্গালোরে। তিনি কিছুকাল পূর্ব্বেই কংগ্রেসের রাজনৈতিক কার্য্যের ভার স্বরাজ্য দলের উপর অর্পণ ক'রে খদ্দর ও চরকা প্রচারে মন দেন ও ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র এ উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করতে সুরু করেন। তাঁকেও দিল্লীতে ডেকে নিয়ে এই সংবাদ দেওয়া হ'ল। এর পরেই ৮ই নবেম্বর সার্ জন সাইমনের নেতৃত্বে একটি কমিশন প্রেরণের কথা বড়লাট বাহাদুর প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন।

ভারতবাসীদের রাষ্ট্রীয় চেতনা ও শিক্ষা এখন আর অনুসন্ধানের বিষয় নয়। তাদের দেশ-শাসনের আদর্শ যুগধর্ম্মের সঙ্গে তাল রেখে দিন দিনই উচ্চ থেকে উচ্চতর হ'য়ে চলেছে। নিজের ভাগ্য নিজেই নিয়ন্ত্রণ করা তাদের অভিপ্রায়। তবে এ কার্য্য বর্ত্তমানে একেবারেই অসম্ভব বিবেচিত হ'লে ইংরেজের সহযোগেই তারা নিজ ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে প্রস্তুত। কিন্তু সাইমন কমিশন গঠনকালে স্বরাজের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র নির্ণয়ের তো কোন ব্যবস্থাই করা হয় নি, পরন্তু ভারতবাসীদের স্বায়ত্ত-শাসনের যোগ্যতা বিচারের জন্যই সম্পূর্ণ শ্বেতাঙ্গ সদস্য নিয়ে এই কমিশন গঠিত হ'ল! এ নিয়ে ভারতের সর্ব্বত্র তীব্র বিক্ষোভ ও অসন্তোষ প্রকাশ পেল। সার্ দীনশা এদুলজী ওয়াচা প্রমুখ প্রবীণ মডারেট নেতারাও এরূপ কমিশনের সঙ্গে সহযোগিতা করা আত্মমর্য্যাদা হানিকর ব'লে প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন! দিকে দিকে কমিশন বর্জ্জনের প্রস্তাব হ'তে লাগল, আর এতে কংগ্রেস, মোস্‌লেম লীগ ও উদারনৈতিক সঙ্ঘ, নরমপন্থী-চরমপন্থী, হিন্দু-মুসলমান সকল দলই যোগ দিলেন।

এখানে মোস্‌লেম্ লীগ সম্বন্ধে একটি কথা বলা প্রয়োজন। ১৯২১ সালের আহ্‌মদাবাদ অধিবেশনে কংগ্রেস ও লীগ এক হ'য়ে যায়। ১৯২৬ সালে মোস্‌লেম লীগের অধিবেশন আবার রীতিমত আরম্ভ হয়। লীগ অতঃপর দু'ভাগে বিভক্ত হ'ল—এক অংশ মহম্মদ আলী জিন্না ও অন্য অংশ পঞ্জাবের সার্ মহম্মদ সফী পরিচালনা করতে লাগলেন। জিন্নার দলেই অধিকাংশ সদস্য ছিলেন। সফী-দল সাইমন কমিশনের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। আগা খাঁ ও সার্ ফজ্‌লী হোসেনের নেতৃত্বে নিখিল-ভারত মুসলমান সম্মেলন ১৯২৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

এবারে কংগ্রেসের অধিবেশন হ'ল মান্দ্রাজে। সভাপতি হলেন মহম্মদ

আলী আন্সারি। তিনি একজন বিখ্যাত চিকিৎসক। ১৯১২ সালে বল্‌কান ও যুদ্ধের সময় তুরস্কের আহত সৈন্যদের চিকিৎসার জন্য একটি রেড ক্রস নিয়ে তিনি সেখানে যান। অসহযোগ আন্দোলনেও আন্সারি সাহেব মনে প্রাণে যোগ দিয়েছিলেন। এ অধিবেশনে তিনটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করা হ'ল। প্রথম, কংগ্রেস সাইমন কমিশন বর্জ্জনের জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করলেন। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁরা কমিশনের ভারতবর্ষে পদার্পণের দিন সর্ব্ব শ্রেণী ও সকল দলের লোককে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে ও ব্যবস্থাপরিষদে বে-সরকারী সদস্যদের কমিশনের কার্য্যে সহযোগিতা না করতে অনুরোধ জানান। দ্বিতীয়, ওয়ার্কিং কমিটিতে অন্যান্য রাজনৈতিক সঙ্ঘ ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে স্বরাজের ভিত্তিতে একটি গঠন-তন্ত্র প্রণয়নের নির্দ্দেশ দেন। তৃতীয়টি, সকলের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এত দিন কংগ্রেসের মূল লক্ষ্য 'স্বরাজ' কথাটির দ্বারা বুঝান হ'ত। এর অর্থ করা হ'ত, সম্ভব হ'লে সাম্রাজ্যের অধীন ডোমিনিয়নের অনুরূপ স্বায়ত্ত-শাসন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁর ফরিদপুর বক্তৃতায় স্পষ্টই বলেছিলেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠা তাঁর (সুতরাং কংগ্রেসের) কাম্য। এ অধিবেশনে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্‌রু—'পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা' (complete national independence) স্বরাজের এইরূপ ব্যাখ্যা ক'রে এক প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। মিসেস্ এনি বেসাণ্ট এ প্রস্তাব পূর্ণ সমর্থন করেন। কংগ্রেসে এ প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হ'ল।

সাইমন কমিশন ১৯২৮, ৩রা ফেব্রুয়ারী বোম্বাইয়ে পদার্পণ করলেন। এই দিন সর্ব্বত্র হরতাল প্রতিপালিত হ'ল। প্রাথমিক অনুসন্ধান সেরে তাঁরা ৩১শে মার্চ্চ বিলাত চলে যান। কয়েক মাস পরে আবার তাঁরা ভারতবর্ষে আসেন। এবার সর্ব্বত্র গমন ক'রে অনুসন্ধান কার্য্য চালাতে থাকেন। কিন্তু কমিশন যেখানেই গেলেন সেখানেই এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হ'ল। সরকার বিক্ষোভ প্রশমিত করার চেষ্টা না ক'রে এর দমন কার্য্যেই লেগে গেলেন। পুলিশের লাঠির আঘাতে নানাস্থানে বিস্তর লোক—নেতৃবর্গ ও জনসাধারণ জখম হলেন। তাই কেউ কেউ সাইমন কমিশনকে বিদ্রূপ ক'রে 'লাঠি কমিশন' আখ্যা দিয়েছেন। কমিশন লাহোরে পৌঁছেন ৩০শে অক্টোবর। পণ্ডিত

মদনমোহন মালবীয় ও লালা লজপত রায় বিক্ষোভকারীদের নেতৃত্ব করেন। জনতার উপরে লাঠি বর্ষিত হ'তে অধিক বিলম্ব হ'ল না। লালা লজপত রায়ের আঘাত হয়েছিল মর্ম্মান্তিক। লজপতের বক্ষস্থলে বহু বার লাঠির আঘাত পড়ে। বিশেষজ্ঞদের বিশ্বাস এই আঘাত তাঁর মৃত্যু ঘনিয়ে এনেছিল। বস্তুতঃ এর অল্প দিন পরেই ১৭ই নবেম্বর হৃৎপিণ্ডের কার্য্য বন্ধন হ'য়ে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

লালাজীর মৃত্যুতে জনসাধারণ বিশেষ ভাবে বিচলিত ও ব্যথিত হ'ল। একদল লোক তাঁর প্রতি অত্যাচারে উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে হিংসাত্মক কর্ম্মে লিপ্ত হয়। এ বিষয় পরে জানতে পারব। বাস্তবিক লালা লজপত রায় ত্যাগ ও সেবা দ্বারা শত্রু-মিত্র যুবক-বৃদ্ধ সকলের শ্রদ্ধা-প্রীতি আকর্ষণ করেছিলেন। দেশবন্ধুর ন্যায় তিনিও তাঁর সমস্ত সম্পত্তি জনসেবায় দান করেন। লজপত একজন প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থকার ও সাংবাদিক। তিনি বহু পুস্তকের প্রণেতা। তাঁর শেষ পুস্তক ভারতের 'ড্রেন ইন্‌স্পেক্টর' মিস্ মেয়োর 'মাদার ইণ্ডিয়া'র জবাবে লিখিত *Unhappy India* বা 'অসুখী ভারতবর্ষ'। তিনি উর্দ্দু 'বন্দেমাতরম্' ও ইংরেজী 'পিপ্‌ল্' পত্র সম্পাদনা করতেন। তিনি জনসেবার আদর্শে 'সার্ভেণ্ট অফ্ পিপ্‌ল্ সোসাইটি' স্থাপন করেন। তাঁর আগ্রহাতিশয়ে ও আনুকূল্যে লাহোরে যুবকদের রাজনৈতিক শিক্ষা দানের জন্য তিলক রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

সাইমন কমিশনের উপর জনমত বিরূপ দেখে সরকার কমিশনের সাহায্যকারক একটি কেন্দ্রীয় ভারতীয় কমিটি ও বিভিন্ন প্রদেশে প্রাদেশিক কমিটি গঠনে তৎপর হয়েছিলেন। ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদে ১৬ই ফেব্রুয়ারী লালা লজপত রায় কমিশনের সঙ্গে কোনরূপ সহযোগিতা না করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রগতিশীল দলগুলির সমর্থনে ৬৮-৬২ ভোটে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। সরকার অতঃপর তিন জন সদস্যকে কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য মনোনয়ন করতে বাধ্য হন।

মাদ্রাজ কংগ্রেসের প্রস্তাব মত ওয়ার্কিং কমিটি কমিশন বর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের গঠনতন্ত্র রচনার জন্য দিল্লীতে একটি সর্ব্বদল সম্মেলন আহ্বান করলেন। কংগ্রেস ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসনের ভিত্তিতে গঠনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে সম্মিলিত হন। সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধান ও সংখ্যানুপাত নির্দ্ধারণ স্বভাবতঃই আলোচ্য বিষয়ের অঙ্গীভূত হ'ল। ১৯শে

যে তারিখে সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশন হয় ও পণ্ডিত মোতিলাল নেহ্‌রুর সভাপতিত্বে একটি কমিটির উপর শাসনতন্ত্র রচনার ভার অর্পিত হয়। উনত্রিশটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান এ প্রস্তাবের সপক্ষে ছিলেন। এই কমিটি পরে নেহ্‌রু কমিটি নামে পরিচিত হয় ও এর প্রদত্ত রিপোর্টের নাম হয় নেহরু রিপোর্ট। পণ্ডিত মোতিলাল নেহ্‌রু, সার্ তেজবাহাদুর সাপ্রু, সার্ আলী ইমাম, মাধবশ্রীহরি আনে, সৈয়দ কোরেসি, সুভাষচন্দ্র বসু ও জি. আর প্রধান কমিটির সভ্য ছিলেন এবং রিপোর্টে স্বাক্ষর করেন।

লক্ষ্ণৌ শহরে ২৮শে—৩০শে আগষ্ট পুনরায় সর্ব্বদল সম্মেলনের অধিবেশন হ'ল। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও শ্রেণীর বিশেষ বিশেষ প্রতিনিধিগণ এতে উপস্থিত ছিলেন। এঁদের মধ্যে মামুদাবাদের রাজা, রাজা রামপাল সিংহ, সার্ তেজ-বাহাদুর সাপ্রু, সার্ আলী ইমাম, সার্ চিত্তুর শঙ্করণ নায়ার, সার্ সি. পি. রামস্বামী আয়ার, সচ্চিদানন্দ সিংহ প্রভৃতি অভিজ্ঞ রাজনীতিকদের নাম উল্লেখ-যোগ্য। কমিটি ডোমিনিয়ন ষ্টেট্‌সের ভিত্তিতে গঠনতন্ত্র রচনা করেন, কিন্তু সামরিক ব্যবস্থা ও অন্য কোন কোন বিষয়ে প্রকৃত প্রস্তাবে ডোমিনিয়ন ষ্টেট্‌সের নিম্নতর পন্থা অবলম্বনের পক্ষে মত দেন। সম্মেলনে নেহ্‌রু রিপোর্ট গৃহীত হ'ল। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্‌রু, সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ প্রগতিপন্থী কংগ্রেস নেতারা ডোমিনিয়ন ষ্টেট্‌সের ভিত্তিমূলক কোন শাসনতন্ত্র গ্রহণে রাজী হলেন না। মাদ্রাজ কংগ্রেসের গৃহীত পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবেই তাঁরা দৃঢ় রইলেন ও সম্মেলনের অধিবেশন কালেই লক্ষ্ণৌয়ে বসে 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অফ্ ইণ্ডিয়া লীগ' বা ভারতের স্বাধীনতা সঙ্ঘ নামে একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলেন। এর পরেই ৫ই ও ৬ই নবেম্বর দিল্লীতে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হ'ল। কমিটি পূর্ণ স্বাধীনতাকে জাতীয় আদর্শ ব'লে স্বীকার করলেও নেহ্‌রু কমিটির কার্য্যের প্রশংসা করেন ও রিপোর্টখানিকে রাষ্ট্রীয় উন্নতির একটি বড় ধাপ ব'লে গণ্য করলেন। রিপোর্টের সাম্প্রদায়িক সমস্যার সিদ্ধান্ত সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে গৃহীত হয়।

এ বছরে আর কয়েকটি বিষয়ও উল্লেখ করবার মত। বারডোলী কৃষক সত্যাগ্রহ আজ ইতিহাসের কাহিনী। এবারে বারডোলী ও বোরসাদ তালুকের রাজস্বের নূতন বন্দোবস্ত করা হয়। গুজরাটে ভূমির চিরস্থায়ী ব্যবস্থা নেই।

সকল জমি খাস গবর্ণমেণ্টের অধীন ও প্রত্যেক পঁচিশ কি ত্রিশ বছর অন্তর অন্তর রাজস্বের নূতন বন্দোবস্ত হয়। আর প্রতি বারেই অন্যূন এক চতুর্থাংশ খাজনা বেড়ে যায়। পূর্ব্বে কংগ্রেসে এরূপ অত্যধিক খাজনা বৃদ্ধি নিয়ে বিশেষ আলোচনা হ'ত ও বঙ্গের ন্যায় অন্যত্রও যাতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত হয় সেজন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হ'ত। বারডৌলী তালুকের প্রজারা এবারে বললেন যে, জমি থেকে আয় মোটেই বাড়ে নি, কাজেই খাজনা বৃদ্ধি অবৈধ! তাঁরা সরকারের আদেশ অমান্য ক'রে সত্যাগ্রহ করলেন। বল্লভভাই পটেল প্রজাদের দাবি ন্যায্য বিবেচনায় তাঁদের নেতৃত্ব করতে স্বীকৃত হন। প্রথমে তাঁরা সরকারকে নূতন বন্দোবস্ত স্থগিত রাখতে অনুরোধ জানালেন। সরকার অনুরোধ রক্ষায় অসম্মত হ'লে সত্যাগ্রহ আরম্ভ হ'ল। আন্দোলন কয়েক মাস চলবার পর বেগতিক দেখে সরকার বারডৌলীর অধিবাসীদের সঙ্গে আপোষ-রফা করতে সম্মত হন। প্রথমে শতকরা সোয়া ছ' টাকা বৃদ্ধির প্রস্তাব হ'লেও শেষ পর্য্যন্ত জমির খাজনা প্রায় পূর্ব্ববৎই বাহাল রয়ে গেল।

ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদে দুটি বিষয়ও এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার জন্য একটি বিল বা আইনের খসড়া পরিষদে উপস্থিত করেন। বিভিন্ন দলের মতৈক্য হেতু সরকারকে বে-সরকারী সংশোধনী গ্রহণ ক'রে কোন কোন ধারা বর্জ্জন বা সংশোধন করতে হয়। সরকার তাই এ বিল পরিত্যাগ ক'রে আর একটি নূতন খসড়া উপস্থিত করতে চাইলেন। প্রেসিডেণ্ট পটেল তাতে সম্মতি দান করলেন না। তাঁরা অগত্যা পুরাতন বিলেরই আলোচনা চালাতে থাকেন। কিন্তু সরকার শেষ পর্য্যন্ত এ বিল তুলে নেওয়াই সাব্যস্ত করেন।

১৯২৮ সালে কংগ্রেসের অধিবেশন হ'ল কলকাতায়। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হলেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, মূল সভাপতি পণ্ডিত মোতিলাল নেহ্‌রু। মোতিলাল কংগ্রেসের ভিতরে প্রগতিশীল স্বাধীনতা-পন্থীদের বিরোধিতার আঁচ করেছিলেন। আর এই বিরোধিতা যে কংগ্রেসে প্রবল ভাবে দেখা দেবে তা-ও বুঝতে তাঁর বাকী ছিল না, কারণ তাঁর পুত্র পণ্ডিত জবাহরলাল এবং সুভাষচন্দ্রই এই বিরোধী দলের অগ্রণী। তাই

কংগ্রেস তাঁর মতানুবর্ত্তী না হ'লে সভাপতিত্ব করা অসম্ভব তিনি এরূপ ভাব ব্যক্ত করলেন। এই সময় মহাত্মা গান্ধীর ডাক পড়ে। গান্ধীজী গত দু'বছর কংগ্রেসে উপস্থিত রইলেও এর কাজকর্ম্মে তেমন ভাবে যোগদান করেন নি, খদ্দর প্রচারেই নিজের সময় ও শক্তি নিয়োজিত করেছেন। এবারে তিনি কংগ্রেসের পুরোভাগে এসে উপনীত হলেন ও নেহ্‌রু কমিটি সম্পর্কে মূল প্রস্তাব তিনিই উথাপন করলেন।

বিষয়-নির্ব্বাচনী সমিতিতে পণ্ডিত জবাহরলাল ও সুভাষচন্দ্র একই ধরনের সংশোধনী উথাপন করেন। গান্ধীজী ও এ দু'জনের মধ্যে আপোষের ফলে মূল প্রস্তাবের কোন কোন অংশ সংশোধিত ও পরিবর্জ্জিত হয়। কিন্তু পর দিন গান্ধীজী কর্ত্তৃক মূল প্রস্তাব উথাপনের পরই এ আপোষ না মেনে সুভাষচন্দ্র বসু সংশোধনী উথাপন করেন ও পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্‌রু তা সমর্থন করেন। মহাত্মাজী এইরূপ চুক্তিভঙ্গ হেতু তাঁদের ভৎর্সনা করতে ছাড়েন নি। যা হোক্ বিপুল ভোটাধিক্যে গান্ধীজীর প্রস্তাবই গৃহীত হ'ল। এই বিখ্যাত প্রস্তাবটির মর্ম্ম এই,

"সর্ব্বদল কমিটি রিপোর্ট (নেহ্‌রু রিপোর্ট নামে পরিচিত) যেরূপ গঠনতন্ত্র সুপারিশ করেছেন তা বিবেচনা ক'রে এই কংগ্রেস ভারতের রাষ্ট্রীয় ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানে একে একটি উৎকৃষ্ট দান হিসাবে অভিনন্দিত করেন এবং সকল সভ্য একত্র হ'য়ে প্রায় সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় আনন্দ প্রকাশ করেন। মাদ্রাজ অধিবেশনের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রস্তাবে দৃঢ় থেকেও কংগ্রেস কমিটি গঠনতন্ত্র এই ব'লে অনুমোদন করেন যে, রাষ্ট্রনৈতিক অগ্রগতির পথে এ একটি শ্রেষ্ঠ ধাপ, বিশেষতঃ যখন এর মধ্যে ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন মতবাদের বড় রকমের একটা সামঞ্জস্য সাধন করা হয়েছে।

'রাষ্ট্রীক অবস্থার গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে, ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট যদি ১৯২৯, ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে এই গঠন-তন্ত্রে ষোল আনা সম্মতি দান করেন তা হ'লে কংগ্রেস একে গ্রহণযোগ্য মনে করবেন। কিন্তু যদি এই তারিখে বা এর পূর্ব্বে এই গঠনতন্ত্র অগ্রাহ্য করা হয় তা হ'লে কংগ্রেস অহিংস-অসহযোগ আন্দোলন সুরু ক'রে ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করতে বা অন্যান্য উপায় অবলম্বন করতে নির্দ্দেশ দিবেন।'

"উল্লিখিত বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, পূর্ণ স্বাধীনতার প্রচারকার্য্য চালাবার পক্ষে কোন বাধা সৃষ্টি করা হবে না।"

পর বছরের করণীয় কার্য্য আর একটি প্রস্তাবে এইরূপ নির্ণীত হ'ল,—মাদক-দ্রব্য বর্জ্জন, খদ্দর প্রচলন ও বিদেশী বস্ত্র ত্যাগ, পরিষদ-সদস্যদের গঠনমূলক কার্য্যে অধিকতর মনোযোগ, সভ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি ও নিয়মানুবর্ত্তিতা প্রবর্ত্তন, হিন্দুর পক্ষে অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন, কংগ্রেসের কার্য্যে যোগদানে নারীজাতিকে উৎসাহ দান, কার্য্য পরিচালনের জন্য কংগ্রেস-সেবীদের নিকট থেকে বছরে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ প্রভৃতি।

কংগ্রেস এই অধিবেশন থেকে আর একটি বিষয়ে মনোযোগ দিতে আরম্ভ করেন। একটি প্রস্তাবে করদ ও মিত্র রাজন্যদের এই অনুরোধ জানান হ'ল যে, তাঁরা যেন নিজ নিজ রাজ্যে স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে প্রতিনিধিমূলক শাসন প্রবর্ত্তন করেন ও প্রজাদের মৌলিক অধিকারসমূহ (যেমন সভা-সমিতি স্থাপন, বক্তৃতা দান, সংবাদপত্র পরিচালন প্রভৃতি) মেনে নেন।

কংগ্রেস অধিবেশনের প্রাক্কালে কলকাতায় সর্ব্বদল সম্মেলনের শেষ অধিবেশন হয়। অধিবেশনে নেহ্‌রু রিপোর্ট গৃহীত হ'ল বটে, কিন্তু সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিয়ে বিশেষ ক'রে মুসলমান ও শিখদের মধ্যে যেরূপ মতদ্বৈধতা প্রকাশ পায় তাতে এর ফলাফল সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিহান হন।

গত দু' তিন বছরে বিভিন্ন কেন্দ্রে বিস্তর ছাত্র ও যুব-সমিতি গঠিত হয়েছিল। এবারে কংগ্রেসের সময় নিখিল-ভারত যুব-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হ'ল। এর সভাপতিত্ব করেন বোম্বাইয়ের জননেতা কে. এফ্. নরীমান মহাশয়। সুভাষচন্দ্র বসু অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হন। যুব-সম্মেলন পূর্ণ স্বাধীনতাকেই ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শ ব'লে গ্রহণ করেন।

আমরা দেখতে দেখতে ১৯২৯ সালে এসে উপনীত হলাম। বছরের প্রথম দিকে কয়েকটি সরকারী কমিটি ও কমিশন বিশেষ কর্ম্মতৎপরতা দেখায়। সাইমন কমিশন ১৪ই এপ্রিল তারিখে ভারতে অনুসন্ধান কার্য্য শেষ করেন। স্যার্ ফিলিপ হার্টগের সভাপতিত্বে একটি শিক্ষা-কমিটি ভারতের সর্ব্বত্র জনসাধারণের শিক্ষা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য পরিভ্রমণ করেন ও পরবর্ত্তী নবেম্বর মাসে রিপোর্ট দাখিল করেন। ভারতীয় রাজন্যদের সম্পর্কে গঠিত

ইণ্ডিয়ান ষ্টেট্‌স কমিটির রিপোর্ট এপ্রিল মাসেই পার্লামেণ্টে পেশ করা হয়। এই সময়, যে মাসে বিলাতে সাধারণ নির্ব্বাচন হ'ল ও শ্রমিকদল সংখ্যাধিক্য লাভ ক'রে মন্ত্রীসভা গঠন করলেন। মিঃ রাম্‌সে ম্যাকডনাল্ড হলেন প্রধান মন্ত্রী ও মিঃ ওয়েজউড বেন ভারতসচিব। ম্যাকডনাল্ড পূর্ব্বে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন ও *Awakening of India* বা 'ভারতের জাগরণ' সম্পর্কে বই লিখেছিলেন। একবার তাঁকে কংগ্রেসের সভাপতি করাও সাব্যস্ত হয়েছিল। এবারে শ্রমিক মন্ত্রীসভায় তিনিই প্রধান মন্ত্রী। কাজেই, তাঁর মন্ত্রিত্বকালে ভারতবর্ষের কিছু সুবিধা হওয়া সম্ভব—কেউ কেউ এরূপ আশা পোষণ করতে লাগলেন। আবার বড়লাট লর্ড আরুইন ভারতের অবস্থা শ্রমিক মন্ত্রীসভাকে জ্ঞাপন করবার জন্য জুন মাসের শেষেই চার মাসের ছুটি নিয়ে বিলাত যান। এতেও সাধারণের মনে কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হয়েছিল।

জনসাধারণের মধ্যে রাষ্ট্রীয় চেতনা জাগ্রত হ'তে আরম্ভ হয় অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকে। রাষ্ট্রীয় স্বাধিকার লাভের সঙ্গে সঙ্গে কৃষক ও শ্রমিক উভয়েরই বরাত ফিরে যাবে, এ ধারণাও সাধারণে পোষণ করতে লাগল। মহাত্মা গান্ধী ১৯১৭ সালে আহ্‌মদাবাদে শ্রমিক-সঙ্ঘ গঠন করেছিলেন। কিন্তু অসহযোগের সময় থেকেই রাষ্ট্রীয় নেতারা নিজ নিজ অঞ্চলে তাদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে বিশেষ ভাবে চেষ্টিত হন। ভারতের শ্রমিকদের নিয়ে ১৯২১ সালে অল্‌-ইণ্ডিয়া বা নিখিল-ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। বোম্বাইয়ে এর প্রথম অধিবেশন হ'ল। ঝরিয়ায় দ্বিতীয় ও লাহোরে তৃতীয় অধিবেশন হয়। তৃতীয় অধিবেশনে (১৯২৩) সভাপতি হয়েছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। আহ্‌মদাবাদ শ্রমিক সঙ্ঘের মত বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলের শ্রমিক সঙ্ঘ—গিরনাই কামগড় ইউনিয়ান ও জি, আই, পি, রেলওয়ে ইউনিয়ন অতঃপর খুবই প্রবল হ'য়ে উঠে। এবারে বোম্বাইয়ে, জামসেদপুরে ও কলকাতার উপকণ্ঠের কলগুলিতে কয়েকটি শ্রমিক ধর্ম্মঘট হয়। শ্রমিক নেতাদের মধ্যেও নরমপন্থী ও চরমপন্থী—দু' দল দেখা দিল। এক দল শ্রমিকদের আর্থিক ও নৈতিক অবস্থার উন্নতি প্রয়াসী, অন্য দল সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন না হ'লে শ্রমিক সমাজের উন্নতি অসম্ভব এই

নীতিতে আস্থাবান্ ও এই উদ্দেশ্যে কার্য্য করতে চান্। এক কথায় রুশিয়ার কমুনিষ্ট-তন্ত্র তাঁদের আদর্শ। ভারত-ভৃত্য সমিতির নিষ্ঠাবান্ কর্ম্মী শ্রমিক-দরদী এন. এম. জোষী প্রথম এই দলে যোগ দেন। বছরের শেষে উভয় দলে বিরোধ ঘোরাল হ'য়ে উঠে। দ্বিতীয় দল অবিলম্বে সরকারের কুনজরে পড়লেন। পঞ্জাব, বোম্বাই ও যুক্তপ্রদেশে বহু শত গৃহ ১৯২৯, ২০শে মার্চ্চ তারিখে খানাতল্লাসী হয় ও অনেক লোক ধৃত হন। এর ভিতর নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটিরই আট জন সদস্য ছিলেন। এই সব বন্দী নিয়ে বিখ্যাত মীরাট মোকদ্দমা রুজু হয়। আসামীদে বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল—ভারতে কম্যুনিজম প্রচার ও সোভিয়েট রুশিয়ার আদর্শে রাষ্ট্র তন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা। এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। পূর্ব্ব বছর পরিত্যক্ত পাব্‌লিক সেফ্‌টি বিল জানুয়ারী মাসে গবর্ণমেণ্ট আবার ব্যবস্থাপরিষদে পেশ করেন। ১১ই এপ্রিল তারিখে সভাপতি পটেল মীরাট মামলা বিচারাধীন থাকায় বিল সম্পর্কে আলোচনা বে-আইনী—এই অভিমত ব্যক্ত করেন ও এর উত্থাপন অনুমতি দিতে অস্বীকৃত হন। পরদিনই গবর্ণমেণ্ট অর্ডিন্যান্স জারী ক'রে উত্থাপিত বিলের মর্ম্মে একটি আইন প্রবর্ত্তিত করলেন।

এই সময় লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা রুজু হয়। এ মামলা নানা কারণে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। লাহোরের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ সণ্ডার্স ১৯২৮ সালে ১৭ই সেপ্টেম্বর গুলির আঘাতে নিহত হন। তাঁর হত্যাকারী সন্দেহে বহু যুবক ধৃত হয়। ভগৎ সিংহ, বি. কে. দত্ত, শুকদেব, যতীন্দ্রনাথ দাস প্রভৃতি এই মামলায় অভিযুক্ত আসামী। হাজতে ও বিচারালয়ে তাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করা হয়—এই অভিযোগ ক'রে ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত আসামীরা অনশন আরম্ভ করেন। যতীন্দ্রনাথ দাসের অনশনই মারাত্মক হ'ল। একাদিক্রমে চৌষট্টী দিন অনশনের পর ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে যতীন্দ্রনাথ মারা গেলেন। এর মাত্র ছ'দিন পরে ব্রহ্মদেশে ফুঙ্গী বিজয় ১৬৪ দিন অনশন ব্রত ক'রে মারা গিয়েছিলেন। যতীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে ভারতবর্ষে ও বিশেষ ক'রে বাংলাদেশে খুব বিক্ষোভ উপস্থিত হয়। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য শ্রীসাম্বমূর্ত্তি এবং সর্দ্দার মঙ্গল সিং, মৌলানা জাফর আলী খাঁ, মাষ্টার মোতা সিং, ডাক্তার সত্যপাল প্রভৃতিও একে একে নানা কারণে ধৃত ও দণ্ডিত হন।

ঐ বছর এপ্রিল মাসে ভারত-বন্ধু ডক্টর জাবেজ টি সাণ্ডারলণ্ডের 'ইণ্ডিয়া ইন্ বণ্ডেজ' বা 'শৃঙ্খলিত-ভারত' বইখানি সরকার বাজেয়াপ্ত করেন। প্রকাশ 'প্রবাসী' ও মডার্ণ রিভিয়ু'র প্রবীণ সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও মুদ্রাকর কবি ও সুসাহিত্যিক শ্রীযুত সজনীকান্ত দাস বিচারে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন। এর পূর্ব্বে অসহ-যোগ আন্দোলনের মরশুমেও জাতীয় ভাবোদ্দীপক বহু পুস্তক বাজেয়াপ্ত হয়েছিল।

এ সময়ে কংগ্রেসের কার্য্য কিরূপ চলতে থাকে তা একবার দেখা যাক্। কলকাতা কংগ্রেসে কর্ম্মপদ্ধতি যেরূপ নির্ণীত হয়েছিল তদানুসারে বিভিন্ন কমিটির উপর কার্য্যভার অর্পিত হয়। কংগ্রেসের একটি বৈদেশিক বিভাগ খোলা হ'ল। এই বিভাগের কার্য্য হ'ল, বিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগ সাধন। লেবার রিসার্চ্চ ডিপার্টমেণ্ট নামে একটি শ্রমিক বিভাগও এ সময় স্থাপিত হয়। মহাত্মা গান্ধী কলকাতা কংগ্রেসে বিশেষ ভাবে যোগ দিলেও পরে আবার খদ্দর প্রচার কার্য্যেই তাঁর সমস্ত শক্তি ও সময় নিয়োগ করেন। এ বছরেও তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে জনগণের মধ্যে পরিভ্রমণে রত থাকেন।

এবৎসর নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হ'ল দু'বার। মে মাসের অধিবেশনে কমিটি মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা পরিচালনার জন্য দেড় হাজার টাকা মঞ্জুর করেন ও একটি স্বতন্ত্র কমিটির উপর মামলা পরিচালনার ভার দেন। এ অধিবেশনে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। আর এর কৃতিত্ব পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্রুর। তিনি আত্মজীবনীতে লিখেছেন, ভারতে সোশ্যালিজম্ বা সমাজ তন্ত্রবাদ প্রবর্ত্তনে তিনিই অগ্রণী; এ সময় কংগ্রেসকে দিয়ে এর মূল নীতি মানিয়ে নিতে তিনি সক্ষম হন। এ প্রস্তাবে এই সর্ব্বপ্রথম বলা হ'ল যে, বর্ত্তমান আর্থিক ও সামাজিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক এবং দুঃখদৈন্য দূর ক'রে জনগণের অবস্থার উন্নতি সাধন করতে হ'লে বর্ত্তমানে যে-সব ঘোর বৈষম্য তা দূর করা একান্ত প্রয়োজন। নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির দ্বিতীয় অধিবেশন হ'ল ২৮শে সেপ্টেম্বর লক্ষ্ণৌ শহরে। গান্ধীজীর নির্দ্দেশে জবাহরলাল সভাপতিপদে মনোনীত হন। কমিটি যতীন্দ্রনাথ দাস ও ফুঙ্গী বিজয়ের আত্মত্যাগের প্রশংসা করেন, কিন্তু খুব গুরুতর কারণ ব্যতীত অনশন ব্রত অবলম্বনে সকলকে নিষেধ করেন।

পরবর্ত্তী তিন মাস রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বড়লাট লর্ড আরুইন ২৬শে অক্টোবর বিলাত থেকে ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। পাঁচ দিন পরে ৩১শে অক্টোবর তিনি এক বিবৃতি মারফত ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্র গঠন সম্পর্কে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করেন। ভারত-শাসনের আদর্শ ডোমিনিয়ন ষ্টেট্‌স, ভাবী শাসনতন্ত্রে ব্রিটিশ ভারত ও রাজন্য-ভারতের মধ্যে সংযোগ সাধনের আবশ্যকতা এবং এই উদ্দেশ্যে ভারতীয় নেতৃবর্গকে নিয়ে লণ্ডনে একটি সম্মেলন আহ্বান প্রভৃতি বিষয় বিবৃতিতে উল্লিখিত হয়। বিবৃতি প্রকাশের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দিল্লীতে উপস্থিত কংগ্রেসী ও অকংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ বড়লাটের সদিচ্ছায় আনন্দ প্রকাশ ক'রে একটি যুগ্ম বিবৃতি প্রকাশ করলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা একটি বিষয়ের পরিষ্কার ব্যাখ্যা দাবি করেন। ডোমিনিয়ন ষ্টেট্‌স-এর অনুরূপ শাসনতন্ত্র রচনার জন্যই সম্মেলন আহ্বান করা হবে কি-না তাঁরা স্পষ্ট জানতে চান। তবে তাঁরা অবশ্য মনে করেন, বড়লাটের বিবৃতি প্রথমটিরই নির্দ্দেশক। মহাত্মা গান্ধী, মোতিলাল নেহ্‌রু, মদনমোহন মালবীয়, তেজবাহাদুর সাপ্রু, মহম্মদ আলী জিন্না প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন। এর অব্যবহিত পরেই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হয় ও বিবৃতি সমর্থিত হয়। এই সময় সুভাষচন্দ্র বসু আদর্শ-বিচ্যুতির আশঙ্কায় কমিটির সদস্য-পদে ইস্তফা দেন।

যা হোক্‌, বড়লাটের বিবৃতি নিয়ে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে খুবই আন্দোলন উপস্থিত হ'ল। ভারতসচিব ওয়েজউড বেন বললেন যে, ভারত-শাসন নীতির কোনই পরিবর্ত্তন হয় নি। ভারতবর্ষকে ধাপে ধাপে দায়িত্বপূর্ণ শাসন দেওয়া হবে, আর পার্লামেণ্টই নির্ণয় করবেন এই ধাপ। নেতৃবৃন্দ বড়লাটের বিবৃতিতে আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা লাভের আঁচ পেয়েছিলেন। এবারে সে সম্ভাবনা সুদূরে চলে গেল। বেন সাহেব ভারতবাসীদের প্রবোধ দেওয়ার ছলে পুনরায় পার্লামেণ্টে এই মর্ম্মে বললেন,—'ভারতবর্ষ কার্য্যতঃ ডোমিনিয়ন ষ্টেট্‌সই ভোগ করছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ ভারতীয় সদস্য প্রেরণ, সাম্রাজ্য-সম্মেলনে ভারতীয় সদস্যের যোগদান, লণ্ডনে ভারতীয় হাইকমিশনার নিয়োগ—এতেও যদি ডোমিনিয়ন ষ্টেট্‌স না হয় ত কিসে হবে?' ভারতবর্ষের শিক্ষিত-সাধারণ বেনের এবম্বিধ ভাষণে একেবারে হকচকিয়ে গেলেন। তাঁরা বলতে লাগলেন, ভারতবাসীর

বুদ্ধিবৃত্তিকে এরূপ ভাবে অপমানিত করা বেন সাহেবের মোটেই উচিত হয় নি। কংগ্রেস অধিবেশনের পূর্ব্বাহ্নে ২৩শে ডিসেম্বর বড়লাট লর্ড আরুইনের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধী, মোতিলাল নেহ্‌রু, মহম্মদ আলী জিন্না, মদনমোহন মালবীয় ও প্রেসিডেন্ট পটেলের সাক্ষাতের ব্যবস্থা হয়। লর্ড আরুইন ডোমিনিয়ন ষ্টেট্‌সের অনুরূপ শাসনতন্ত্র রচনার জন্যই ভাবী সম্মেলন আহুত হবে এইরূপ কোন কথা দিতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার জন্য তিনি ঐ দিনই দিল্লীতে ফিরে আসেন। দিল্লী থেকে একমাইলের মধ্যে তাঁর ট্রেণে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়, কিন্তু বড়লাট বাহাদুর অক্ষতদেহে অব্যাহতি পান।

দশ বছর পূর্ব্বেকার কলকাতা ও নাগপুর অধিবেশনের মত এবারকার লাহোর অধিবেশনও হ'ল গুরুত্বপূর্ণ। নব্যতন্ত্রের নায়ক পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্‌রু সভাপতির অভিভাষণে ভারতবাসীর শক্তি-সামর্থ্য ও আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করলেন। তিনি নিজে সমাজ-তন্ত্রবাদের ভিত্তিতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী, কিন্তু সে-পথে হিংসার স্থান নেই। ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় হিংসার পথ মোটেই অবলম্বনীয় নয়। ব্যক্তি বিশেষ বা দল বিশেষ হিংসার পথ অবলম্বন করে বটে, কিন্তু তা হতাশারই দ্যোতক। গণ-আন্দোলনে হিংসার কোন স্থান নেই। তাঁর মতে জাতীয় প্রচেষ্টার প্রকৃত লক্ষ্য হ'ল, "সত্যকার ক্ষমতা অধিকার। আমি মনে করি না—ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের মত কোন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হ'লেই আমরা সত্যকার ক্ষমতা লাভ করতে পারব। সত্যকার ক্ষমতা যে পাওয়া গিয়েছে তা পরীক্ষা হবে ঠিক তখনই, যখন ভারতে স্থিত বিদেশী সৈন্য ও ভারতীয় অর্থ-ব্যবস্থায় বিদেশীয় কর্ত্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হবে। সুতরাং আমাদের সকল শক্তি এই দিকেই নিয়োজিত হওয়া আবশ্যক। বাকী সব আপনা হ'তেই আমাদের আয়ত্তে আসবে।"

প্রথমেই বড়লাটের ট্রেণ আক্রমণের অপচেষ্টার নিন্দা ক'রে একটি প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। ডিসেম্বর মাসে অধিবেশন হ'লে শীতাধিক্য বশতঃ সাধারণের বিশেষ কষ্ট হয়, এজন্য একটি প্রস্তাবে অতঃপর ফেব্রুয়ারী কি মার্চ্চ মাসে কংগ্রেস অধিবেশন করা স্থির হয়। মিত্ররাজ্য, সাম্প্রদায়িক সমস্যা, জাতীয় ঋণ প্রভৃতি

সম্পর্কেও কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। কিন্তু এবছরটি আর এক কারণে বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। এবারকার কংগ্রেসের মূল বিষয় হ'ল পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব। প্রস্তাবটির মর্ম্ম এই—

"ডোমিনিয়ন ষ্টেট্স সম্পৃক্ত বড়লাটের ঘোষণার উপর কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন দলের নেতাদের বিবৃতি সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটির কার্য্য কংগ্রেস অনুমোদন করেন এবং স্বরাজমূলক জাতীয় প্রচেষ্টার মীমাংসার জন্য বড়লাটের চেষ্টা-উদ্যোগের তারিফ করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে যে সব ঘটনা ঘটেছে তা, আর মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মোতিলাল নেহ্রু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এবং বড়লাটের মধ্যে সাক্ষাৎকারের ফলাফল বিবেচনা ক'রে কংগ্রেস এই মত প্রকাশ করেন যে, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেস-প্রতিনিধির যোগদানে কোনই ফলোদয় হবে না। সুতরাং গত বছর কলকাতা অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবক্রমে কংগ্রেস ঘোষণা করেন যে, কংগ্রেস গঠনতন্ত্রের প্রথম দফায় 'স্বরাজ' শব্দটি দ্বারা পূর্ণ স্বাধীনতা (Complete Independence) সূচিত হবে এবং আরও ঘোষণা করেন যে, নেহ্রু রিপোর্টের শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে বাতিল ব'লে গণ্য হবে। কংগ্রেস আশা করেন, সকল কংগ্রেস-সেবীই আজ থেকে ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের পক্ষে সর্ব্বপ্রকারে মনঃ-সংযোগ করবেন। স্বাধীনতা প্রচেষ্টার প্রথম ধাপ স্বরূপ এবং এই আদর্শের সঙ্গে কংগ্রেস নীতির সামঞ্জস্য বিধানের জন্য কংগ্রেস সকল কংগ্রেস-সেবী ও জাতীয় প্রচেষ্টায় যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিকে ভাবী নির্ব্বাচনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কোন ভাবেই যোগদান না করতে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন, আর বর্ত্তমানে যাঁরা ব্যবস্থাপরিষদগুলিতে ও ব্যবস্থাপরিষদের কমিটিসমূহে সদস্য রয়েছেন তাঁদের সেগুলি থেকে পদত্যাগ করতে নির্দ্দেশ দেন। কংগ্রেস জাতিকে কংগ্রেসের গঠনমূলক কর্ম্মপদ্ধতি আন্তরিকতার সহিত অনুসরণ করবার আবেদন জানান এবং নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটিকে এরূপ ক্ষমতা অর্পণ করেন যে, তাঁরা যখনই উপযুক্ত মনে করবেন তখনই ট্যাক্স বন্ধ সমেত আইন-অমান্য প্রচেষ্টা নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে বা ব্যাপক ভাবে আরম্ভ করতে পারেন।"

কংগ্রেস ও "গোলটেবিল" বৈঠক

(১৯৩০-১৯৩১)

সমবেত প্রতিনিধিবৃন্দ নববর্ষের আরম্ভেই স্বাধীনতার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন। ২৬শে জানুয়ারী 'স্বাধীনতা দিবস' পালন করা সাব্যস্ত হ'ল। স্থির হয়, ঐ দিন বিশেষ ভাবে রচিত একটি প্রতিজ্ঞা-পত্র সর্ব্বত্র পড়া হবে। তদবধি প্রতি বছর ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস প্রতিপালিত হ'তে থাকে। ১৯৫০ সাল হইতে এই দিনটি ভারতের সর্ব্বত্র এবারে ২৬শে জানুয়ারী এই প্রথম প্রতিজ্ঞা-পত্র পঠিত হ'ল। এতে মূলতঃ বলা হয় যে, যে-কোন জাতির মত ভারতবাসীরও স্বাধীনতা লাভের পরিপূর্ণ অধিকার আছে। ভারতবর্ষের আর্থিক, রাষ্ট্রিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক—এই চতুর্বিধ অধঃপতনের জন্য প্রতিজ্ঞা-পত্রে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকেই দায়ী করা হয়।

মহাত্মা গান্ধী ওয়ার্কিং কমিটিকে জানালেন যে, তিনি সবরমতী আশ্রমের অধিবাসীদের নিয়ে সর্ব্ব প্রথম লবণ আইন ভঙ্গ করবেন। ১৪ই, ১৫ই ও ১৬ই এপ্রিল সবরমতী আশ্রমে কমিটির অধিবেশন হয়। সত্যাগ্রহের উদ্ভাবক গান্ধীজী,—তাই তাঁরা গান্ধীজীর প্রস্তাব অনুমোদন করতে দ্বিধা করলেন না।

ইতিমধ্যে কংগ্রেসের প্রস্তাব অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপরিষদ থেকে ১৭২ জন সদস্য পদত্যাগ করেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় কংগ্রেস দলভুক্ত সদস্য নন্, তথাপি তিনিও এসময় কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য পদে ইস্তফা দেন। ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের শৈশব অবস্থায়ই গবর্ণমেণ্ট এর উপর কর বসান এবং ভূপেন্দ্রনাথ বসু, দীনশা এডুলজী ওয়াচা প্রমুখ নেতৃবর্গ কংগ্রেস মঞ্চ থেকে বহুবার এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন। ১৯২৫ সালে এ বিষম ব্যবস্থার প্রতিকার হয়। তখন দেশী বস্ত্রের উপর ট্যাক্স উঠে যায়, ও বিদেশী বস্ত্রের উপর শুল্ক কিছু বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু ১৯২৭ সালে বাট্টার হার যেভাবে নিয়মিত হয় তার ফলে বিদেশী বস্ত্রের মূল্য শতকরা সাড়ে বার টাকা কমে গেল।

অতঃপর ভারতব্যাপী আন্দোলনের ফলে এর কিছু সুরাহা করা সরকার সমীচীন বিবেচনা করলেন, কিন্তু অন্যান্য দেশের তুলনায় ব্রিটেনের উপর শুল্ক ২০:১৫ এই অনুপাতে কম ক'রে বসান হ'ল। এতে ভারতবাসীর সমূহ ক্ষতি, কারণ বিলাত থেকেই বেশী বস্ত্র ভারতে আমদানী হয়। এসময় মিশর ও মার্কিনী তুলার উপর নূতন ক'রে শুল্ক বসান হয়েছিল। এই তুলার সূতা দ্বারাই বিলাতের লাঙ্কাশায়ারের অনুরূপ বস্ত্র এখানে তৈরী হ'তে পারত। সরকার কংগ্রেস দল পরিত্যক্ত কেন্দ্রীয় পরিষদে অনায়াসেই উক্ত মর্ম্মে একটি প্রস্তাব পাস করিয়ে নিলেন। মালবীয়জী এর প্রতিবাদেই সদস্য পদ ত্যাগ করেন।

মহাত্মা গান্ধী ২রা মার্চ্চ বড়লাট লর্ড আরুইনকে তাঁর সঙ্কল্পের কথা জানিয়ে একখানা পত্র লিখলেন। পরবর্ত্তী ১২ই মার্চ্চ উনআশী জন আশ্রমিকসহ সবরমতী আশ্রম থেকে তিনি পদব্রজে দণ্ডী রওনা হলেন। দণ্ডী সবরমতী থেকে দু' শ' মাইল দূরে সমুদ্রতীরে অবস্থিত। তিনি এই দীর্ঘ পথ বক্তৃতা করতে করতে গেলেন। লবণ নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু। এ জিনিষ উৎপাদনের অধিকার সকলেরই সমান। সমুদ্র জলে লবণ প্রচুর। অথচ এই অতি সাধারণ ও স্বাভাবিক অধিকার থেকে ভারতবাসী দীর্ঘকাল বঞ্চিত। গান্ধীজীর উদ্দেশ্য বুঝতে তাই কারও এতটুকুও কষ্ট হ'ল না। জনগণ মনে-প্রাণে গান্ধীজীর জয় কামনা করতে লাগল।

আহ্‌মদাবাদে ২১শে মার্চ্চ নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হ'ল। গান্ধীজী কর্ত্তৃক লবণ আইন ভঙ্গের পরই যাতে ভারতের সর্ব্বত্র লবণ প্রস্তুতের আয়োজন হয় কমিটি এই মর্ম্মে নির্দ্দেশ দিলেন। মহাত্মা গান্ধী ৫ই এপ্রিল দণ্ডী পৌঁছেন। প্রাতঃকালীন উপাসনার পর সঙ্গিগণসহ তিনি ঐ দিন লবণ আইন ভঙ্গ করেন। গান্ধীজীর যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রদেশে বিপুল সাড়া পড়ে যায়। জনসাধারণ এতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগল। সর্ব্বত্র যাতে লবণ প্রস্তুত করা সম্ভব হয় তার আয়োজন চলল খুবই। ৬ই থেকে ১৩ই এপ্রিল ভারতের জাতীয় সপ্তাহ। জাতীয় সপ্তাহের প্রথম দিনেই সর্ব্বত্র লবণ আইন ভঙ্গের দিন ধার্য্য হয়। ঐ দিনে জনগণ লবণ প্রস্তুত করতে আরম্ভ করলে। বঙ্গে প্রসিদ্ধ অসহযোগী সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত স্বেচ্ছাসেবক দলসহ কলকাতার সন্নিকটে

মহিষবাথানে লবণ তৈরী সুরু করলেন। মহিষবাথান বাঙালীর নিকট তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হ'ল।

গবর্ণমেণ্ট কখনও আইন লঙ্ঘন বরদাস্ত করতে পারেন না তা সে যেরূপ আইনই হোক্ না কেন। সরকারের দমন কার্য্য বহু দিন পূর্ব্ব থেকেই সুরু হয়েছে। মীরাট মামলার আসামীরা (একজন বাদে) দায়রায় সোপর্দ্দ, কলকাতায় সুভাষচন্দ্র বসু এগার জন সঙ্গীসহ ন'মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত (২৩শে জানুয়ারী)। আইন-অমান্য সুরু হ'লে নানাস্থানে নূতন ক'রে ধরপাকড় আরম্ভ হ'ল। কলকাতায় দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও এলাহাবাদে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্রু ধৃত ও দণ্ডিত হলেন। সর্দ্দার বল্লভভাই পটেল গান্ধীজীর দণ্ডী যাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে ধৃত হ'য়ে তিন মাসের জন্য কারারুদ্ধ হন।

মহাত্মা গান্ধী লবণ আইন ভঙ্গ করে ধরশনার লবণের গোলা অধিকার করতে মনস্থ করলেন। কিন্তু সত্যাগ্রহীর রীতি অনুসারে তিনি পূর্ব্বে এক পত্রে বড়লাটকে এ কথাও জ্ঞাপন করেন। তাই সরকার গান্ধীজীকে ধরশনা গোলা অধিকার করতে দিলেন না, ৫ই মে মধ্যরাত্রে গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার ক'রে আটক করলেন। মহাত্মা গান্ধীর গ্রেপ্তারে সর্ব্বত্র জনগণের মধ্যে আবার নূতন উন্মাদনার সৃষ্টি হ'ল। সর্ব্বত্র হরতাল তো প্রতিপালিত হ'লই, আইন-অমান্যেও জনসাধারণ অধিকতর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'ল। গান্ধীজীর পরে ধরশনার ভার বৃদ্ধ নেতা আব্বাস তায়েবজী গ্রহণ করেন। তাঁকেও ১২ই মে আটক করা হয়। তাঁর পরে এলেন সরোজিনী নাইডু। তিনিও অবিলম্বে ধৃত হলেন। প্রতিদিন স্বেচ্ছাসেবকগণ দলে দলে লবণের গোলার দিকে অগ্রসর হ'তে লাগল। সরকার প্রথম প্রথম তাদের গ্রেপ্তার করলেন। পরে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হ'লে 'মৃদু যষ্টি বর্ষণ' (Mild lathi charge) আরম্ভ হ'ল। জনগণের উপর যষ্টির বেদম প্রহারের কাহিনী 'ইণ্ডিয়ান সোশ্যাল রিফর্মার' পত্রের সম্পাদক কে নটরাজন ও ভারত-ভৃত্য সমিতির সভাপতি দেবধর প্রত্যক্ষ ক'রে মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করলেন।

মহাত্মা গান্ধীর গ্রেপ্তারের অব্যবহিত পরেই এলাহাবাদে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন হ'ল। কমিটি আইন-অমান্যের ক্ষেত্র ব্যাপকতর করার

জন্য কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। যে সব স্থলে জমির রায়তওয়ারী ব্যবস্থা অর্থাৎ প্রজা সাক্ষাৎ ভাবে গবর্ণমেণ্টকে ভূমি-কর প্রদান ক'রে (যেমন, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, অন্ধ্র, তামিল নাড়ু ও পঞ্জাব) সেখানে ভূমি-কর দান বন্ধ করতে ও যে সব স্থানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিদ্যমান, (যেমন, বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা) সে সব স্থলে এর বদলে চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ করতে কমিটি দেশবাসীকে নির্দ্দেশ দেন। বন-আইন ভঙ্গও তাঁরা অনুমোদন করেন। মাদক দ্রব্য ও বিদেশী বস্ত্র সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জনের উদ্দেশ্যেও এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। কমিটি একটি প্রস্তাবে প্রেস অর্ডিনান্স বা জরুরী মুদ্রাযন্ত্র আইনের তীব্র নিন্দা করেন। এ বিষয় ও অন্যান্য অর্ডিন্যান্স সম্বন্ধে একটু পরেই বলা হবে।

শুধু বিদেশী বস্ত্র কেন, সিগারেট প্রভৃতি অন্যান্য বিদেশী দ্রব্যও বিক্রয় প্রায় বন্ধ হ'ল। দেখতে দেখতে বিড়ি, সিগারেটের স্থান অধিকার করলে। বিদেশী বস্ত্র সর্ব্বত্র গুদাম জাত হ'য়ে রইল। পণ্ডিত মোতিলাল নেহ্‌রু ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের কেন্দ্রস্থল বোম্বাই ও আহ্‌মদাবাদের দেশী কল-মালিকদের এই মর্ম্মে অঙ্গীকারবদ্ধ করিয়ে নিলেন যে, তাঁদের কলগুলি এরপর নকল খদ্দর উৎপাদনে ও বিদেশী সূতা ব্যবহারে বিরত থেকে স্বদেশ জাত সূতা দ্বারাই বস্ত্র উৎপাদন করবে। অঙ্গীকারবদ্ধ কলগুলিকে তিনি স্বদেশী ছাপ দিলেন। যে সব কাপড়ের কলের মালিক বা অধিকাংশ অংশীদার বিদেশী, কয়েকটি শর্ত্তে তাদের কলগুলিকে স্বদেশী ছাপ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। বিদেশী ও বিলাতী বস্ত্র এসময় কিরূপ বর্জ্জিত হয়—বিনা বাক্যব্যয়ে কল-মালিকদের কংগ্রেসের অঙ্গীকার-পত্র স্বাক্ষরে তা স্পষ্ট বুঝা যায়।

সত্যাগ্রহ আন্দোলনে বিভিন্ন প্রদেশের নারীসমাজ বিশেষ ভাবে যোগদান করলেন। শোভাযাত্রার অনুষ্ঠান, সুরা-বিপণী ও বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করা বা ধর্ণা দেওয়া তাঁদের দৈনন্দিন কার্য্য মধ্যে গণ্য হ'ল। জরুরী আইন ব'লে এসব কাজ যখন বে-আইনী ঘোষিত হ'ল তখন তাঁরা আইন ভঙ্গের অপরাধে দলে দলে কারাগারে গমন করলেন। ব্যাপক ধরপাকড়ের ফলে পুরুষ নেতা যখন প্রায় সব কারাবদ্ধ তখন নারীই এসে সানন্দে ও সাগ্রহে তাঁদের শূন্য স্থান পূরণ করলেন। বিভিন্ন স্থানে নারীরা আলাদা সত্যাগ্রহ সমিতি স্থাপন ক'রেও আন্দোলনে শক্তি ও রসদ জোগালেন।

প্রেস অর্ডিন্যান্স বা মুদ্রাযন্ত্র সম্পৃক্ত জরুরী আইনের উল্লেখ একটু আগে করেছি। ১৯১০ সালের মুদ্রাযন্ত্র আইনকেই বস্তুতঃ এ দ্বারা পুনরুজ্জীবিত করা হ'ল। এ বছর ২৩শে এপ্রিল তারিখে এ অর্ডিন্যান্স জারি হয় ও আইন-অমান্য ঘটিত সংবাদ পত্রস্থ করা নিষিদ্ধ হয়। এ আইনের প্রতিবাদে ভারতের সাংবাদিক মহলে প্রবল অসন্তোষ দেখা দেয় ও সকলে দু'দিন কাগজ প্রকাশ বন্ধ রাখেন। কংগ্রেস কিন্তু সকলকেই জরুরী আইন বলবৎ থাকা কালে কাগজ প্রকাশ বন্ধ করতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু এ অনুরোধ রক্ষা করা অধিকাংশ সংবাদপত্রের পক্ষেই সম্ভব হয় নি। জরুরী আইন অনুসারে ১৩১ খানা সংবাদপত্রের নিকট থেকে ২,৪০,০০০ টাকা জামিন আদায় করা হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সমগ্র ভারত ন'খানি কাগজ জরুরী আইন মেনে নিতে অস্বীকার ক'রে প্রকাশ বন্ধ করেন। মহাত্মা গান্ধীর নির্দ্দেশে নবজীবন প্রেস টাকা জমা না দিয়ে সরকারে বাজেয়াপ্ত হ'ল। 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকা অতঃপর সাইক্লোষ্টাইলে মুদ্রিত হ'য়ে প্রতি সপ্তাহে বের হ'তে থাকে। জরুরী আইনের মেয়াদ ছ'মাস। বঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকা ছ' মাস কাগজ প্রকাশ বন্ধ রাখেন। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনকালে এ পত্রিকাখানি বের হয় এবং নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার সঙ্গে অহিংস অসহযোগ-নীতি সমর্থন করে। সত্যাগ্রহ আন্দোলন কালে পত্রিকাখানির এতাদৃশ ত্যাগ স্বীকারে দেশবাসী আশ্চর্য্য হ'য়ে যায়। এ কারণ আনন্দবাজার পত্রিকা সাধারণের প্রীতিশ্রদ্ধা অর্জ্জন করতে সক্ষম হয়। এর প্রচার-সংখ্যা তখন ভারতে ইংরেজী ও ভারতীয় ভাষার যে কোন সংবাদপত্রের চেয়ে বেশী হয়েছিল।

সরকার বিভিন্ন অর্ডিন্যান্স জারি ক'রে সর্ব্বরকমে আন্দোলন থামিয়ে দিতে প্রয়াস পেলেন। প্রাদেশিক ও জেলা কংগ্রেস কমিটিগুলি এবং সত্যাগ্রহ আন্দোলন উপলক্ষ্যে স্থাপিত অন্যান্য কমিটিও একে একে বে-আইনী ঘোষিত হ'ল। এমন কি, জুন মাসের শেষে ওয়ার্কিং কমিটিও বে-আইনী সাব্যস্ত হ'ল ও পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু কারারুদ্ধ হলেন। ইতিপূর্ব্বেকার একটি অধিবেশনে ওয়ার্কিং কমিটি এই নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন যে, বে-আইনী ঘোষিত হ'লেও কমিটি যথারীতি কার্য্য ক'রে যাবেন। সুতরাং বিভিন্ন স্থানে অধ্যক্ষ (বা ডিক্টেটর) নিযুক্ত ক'রে কংগ্রেসের কার্য্য নির্ব্বাহ করতে হয়। ওয়ার্কিং

কমিটির সদস্যগণ একে একে কারারুদ্ধ হলেন। নূতন নূতন সদস্য নিয়ে কমিটি কিন্তু কার্য্য পরিচালনা করতে লাগলেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের বহু নেতা ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হ'য়ে কারাবরণ করেন।

এপ্রিল, মে ও জুন এই তিন মাসে ভারতবর্ষের বহু স্থানে উত্তেজিত জনতা নিয়ন্ত্রণের জন্য পুলিশ গুলী বর্ষণ করে। এই সম্পর্কে একটি প্রশ্নের উত্তরে সরকার ১৪ই জুলাই তারিখে ব্যবস্থাপরিষদে বিবৃতি প্রদান করেন। তা থেকে জানা যায়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে তেইশ বার গোলাগুলি বর্ষিত হয় এবং এর ফলে ১০৩ জন হত ও ৪০০ জন আহত হয়। পেশোয়ারে দুর্দ্ধর্ষ পাঠানগণ মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা-মন্ত্রে এরূপ উদ্‌বুদ্ধ হয়েছিল যে, তারা ২৩শে এপ্রিল গুলিবর্ষণের সময় সম্পূর্ণ অহিংস থাকে ও ত্রিশ জন নির্ভীকচিত্তে আত্মাহুতি দেয়। বোম্বাই প্রদেশের শোলাপুরে সামরিক আইন জারি হয় ও সবশুদ্ধ ছ'বার গুলি বর্ষণ হয়। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে শান্ত জনতার উপর গুলী বর্ষণে অস্বীকার করায় একদল গাড়োআলী সেনার 'কোর্ট মার্শাল' হয়েছিল।

কর-বন্ধ আন্দোলন সত্যাগ্রহ প্রচেষ্টার একটি বিশেষ অঙ্গ। কিন্তু এ সম্বন্ধে কিছু বলার পূর্ব্বে সাধারণ ভাবে আইন-অমান্যের বিষয় কিছু বলা প্রয়োজন। সত্যাগ্রহ আন্দোলনে ১৪৪ ধারা অমান্য করা একটি বিশেষ কাজ হ'য়ে দাঁড়াল। কলকাতা, এলাহাবাদ ও বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে এ আইন ভঙ্গ ক'রে বহু জনসভা ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় সর্ব্বত্রই পুলিশের লাঠিবর্ষণে বিস্তর লোক জখম হয়। এলাহাবাদে মোতিলাল-গৃহিণী স্বরূপরাণী নেহ্‌রুর উপরও লাঠি বর্ষিত হ'ল। বোম্বাইবাসী নরনারী আন্দোলনে বিশেষ ভাবে যোগদান করেন। সেখানে কত সভা ও শোভাযাত্রা যে ছত্রভঙ্গ ক'রে দেওয়া হয় তার ইয়ত্তা নেই। তিলকের মৃত্যু-দিবস স্মরণে বোম্বাইয়ের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শ্রীমতী হংসা মেহ্‌তার নেতৃত্বে একটি বিরাট শোভাযাত্রা বের হয়। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, বল্লভভাই পটেল, জয়রামদাস দৌলতরাম ও শ্রীমতী কমলা নেহ্‌রু— ওয়ার্কিং কমিটির এই কয়জন সদস্য শোভাযাত্রায় যোগদান করেন। পুলিশ গতিরোধ করায় শোভাযাত্রাকারীরা একরাত্রি পথিমধ্যে যাপন করেন। পরদিন নেতৃবর্গকে ও নেতৃস্থানীয়দের গ্রেপ্তার ক'রে যষ্টির প্রহারে জনতা

ছত্রভঙ্গ ক'রে দেওয়া হ'ল। পেশোয়ারে খাঁ আবদুল গফ্ফর খাঁ ও তাঁর খোদাই খিদমতগার নামীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সর্ব্বত্র অহিংসা-মন্ত্র প্রচার করেন। রণপ্রিয় পাঠানগণ পেশোয়ারে যেভাবে অহিংসার পরাকাষ্ঠা দেখান তার উল্লেখ খানিক আগেই করেছি। খোদাই খিদমতগার বাহিনী কিন্তু তখনও কংগ্রেস-ভুক্ত হয় নি।

কর-বন্ধ আন্দোলন প্রসঙ্গে গুজরাট, কর্ণাটক এবং বঙ্গের কাঁথি ও বিক্রমপুরের কথা সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয়। গুজরাটের হাজার হাজার অধিবাসী মহাত্মা গান্ধীর গ্রেপ্তারের পর কর দান বন্ধ ক'রে নিজ বাসভূমি ত্যাগ ক'রে নিকটবর্ত্তী বরোদা রাজ্যে আশ্রয় নেয় ও অশেষ দুঃখভোগ করে। ইংরেজ সংবাদিক মিঃ এইচ. এন. ব্রেল্স্ফোর্ড গুজরাটের গ্রাম অঞ্চল পরিভ্রমণ ক'রে যে মর্ম্মান্তিক দৃশ্য দেখেন তার বিস্তৃত কাহিনী সংবাদপত্রে ও পুস্তকে বিবৃত করেছেন। বঙ্গে মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার অধিবাসীরা চৌকিদারী ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করে। নানারূপ অত্যাচার-উৎপীড়নে ও অশেষ দুঃখভোগেও তাঁরা সঙ্কল্পচ্যুত হন নি। এ সময় কোথাও কোথাও হিংসাত্মক কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় বটে, কিন্তু মোটের উপর কাঁথিবাসীরা অহিংস থেকে সমস্ত দুঃখকষ্ট সহ্য করেন। আইন-অমান্যের আরম্ভে লবণ প্রস্তুতকালেও তাঁদের উপর কম পীড়ন হয় নি। বহু স্থলে কর আদায়কালে লোকের জিনিষপত্র বিনষ্ট করা হয়। কোথাও কোথাও ধানের গোলাও পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

সত্যাগ্রহের মরশুমে গবর্ণমেণ্ট ও কংগ্রেসের মধ্যে আপোষ-নিষ্পত্তির জন্য প্রথমে লণ্ডন 'ডেলি হেরাল্ড' পত্রের ভারতীয় সংবাদ-দাতা মিঃ স্লোকোম্ব ও পরে সার্ তেজবাহাদুর সাপ্রু ও মুকুন্দ রামরাও জয়াকর চেষ্টা করেন। কিন্তু তাতে কোন ফল হ'ল না। সরকারের দ্বৈতনীতি সুবিদিত। শাসন-সংস্কার কার্য্য ও দমন-নীতির অনুসরণ লর্ড মিণ্টোর সময়েই প্রথম সুরু হয়। এবারেও তার ব্যতিক্রম হ'ল না। কর্ত্তৃপক্ষ একদিকে যেমন সত্যাগ্রহ আন্দোলন বন্ধ করার চেষ্টা করলেন অন্যদিকে তেমনি তাঁদেরই মনোনীত ব্রিটিশ ও ভারতীয় নেতৃবর্গকে নিয়ে ভাবী শাসনতন্ত্র স্থির করার জন্য বিলাতে একটি সম্মেলন আহ্বান করলেন। এই সম্মেলনকে অতিরিক্ত সম্মান দিয়ে গোলটেবিল বৈঠক নাম দেওয়া হয়েছে। ১২ই নবেম্বর তারিখে লণ্ডনে এই তথাকথিত গোল-

টেবিল বৈঠকের অধিবেশন আরম্ভ হয়। রাজন্যবর্গের তরফে ১৬ জন, ব্রিটিশ ভারত থেকে ৫৬ জন ও বিলাতের ১৩ জন প্রতিনিধি নিয়ে এই বৈঠক গঠিত হ'ল। মডারেটগণ ঠিক এক বছর পূর্ব্বে মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মোতিলাল নেহ্‌রু প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সঙ্গে একযোগে এই দাবি জানিয়েছিলেন যে, যদি ডোমিনিয়ন ষ্টেট্‌সের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করার ব্যবস্থা হয় তবেই তাঁদের সমর্থন লাভ সম্ভব। তাঁরা কিন্তু এবার এরূপ কোন প্রতিশ্রুতি না পেয়েই কংগ্রেসী স্বাক্ষরকারীদের পশ্চাতে কারাগারে আবদ্ধ রেখে কর্ত্তৃপক্ষের মনোনীত হ'য়ে বৈঠকে যোগ দিতে মোটেই দ্বিধা করলেন না। সাড়ম্বরে তথাকথিত গোলটেবিল সম্মেলন আরম্ভ হ'ল, কিন্তু একে সাফল্যমণ্ডিত করতে হ'লে কংগ্রেসের সহযোগিতা যে একান্ত আবশ্যক তা কর্ত্তারা অবিলম্বে বুঝতে পারলেন। তাই তাঁরা যে-কোন উপায়ে কংগ্রেসকে বৈঠকে স্থান দিতে তৎপর হলেন। প্রধান মন্ত্রী মিঃ রাম্‌সে ম্যাক্‌ডনাল্ড বৈঠক সমাপ্তির দিনে উপসংহার বক্তৃতায় একদিকে যেমন স্বীকার করলেন যে, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসনে, সাময়িক ভাবে নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি রক্ষাকবচ সাপেক্ষে, ভারতবাসীর দায়িত্ব স্বীকার করা হবে তেমনি অন্যদিকে এ আশাও ব্যক্ত করলেন যে, যাঁরা সত্যাগ্রহ আন্দোলনে লিপ্ত পরবর্ত্তী বৈঠকে তাঁদেরও সহযোগিতা লাভে তাঁরা সমর্থ হবেন।

শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশ অনুসারে বড়লাট লর্ড আরুইন ২৫শে জানুয়ারী তাৎকালিক অবস্থা পর্য্যালোচনার সুযোগ দানের জন্য ১৯৩০, ১লা জানুয়ারী থেকে নিযুক্ত ওয়ার্কিং কমিটির স্থায়ী-অস্থায়ী সকল সদস্যকে মুক্তি দান করলেন। ওদিকে লণ্ডন থেকে শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ও সার্ তেজবাহাদুর সাপ্রু তাঁদের বক্তব্য শোনবার জন্য ওয়ার্কিং কমিটিকে অপেক্ষা করতে অনুরোধ জানালেন। ওয়ার্কিং কমিটির স্থায়ী ও অস্থায়ী সব সদস্য ৩১শে জানুয়ারী ও ১লা ফেব্রুয়ারী এলাহাবাদে আনন্দ-ভবনে মিলিত হন ও আগেকার নির্দ্দেশ স্থগিত রেখে অপেক্ষা করতে থাকেন। আইন-অমান্য ও দমননীতি কিন্তু তখনও পুরা দমে চলে। কলকাতার মেয়র সুভাষচন্দ্র বসু ২৬শে জানুয়ারী শোভাযাত্রা বের ক'রে আহত ও ধৃত হলেন। পণ্ডিত মোতিলাল নেহ্‌রু এই সময় ৬ই ফেব্রুয়ারী দীর্ঘকাল রোগভোগের পর ইহধাম ত্যাগ করেন।

তাঁর মৃত্যুতে ভারতবাসীরা অত্যন্ত শোকমগ্ন হ'লেন দেশ-মাতৃকা—লোকমান্য তিলক এবং দেশবন্ধু দাশের মত তাঁকেও এক সঙ্কটপূর্ণ সময়ে হারালেন।

মোতিলাল প্রথমে নরম পন্থী ছিলেন। কিন্তু অসহযোগের সময় থেকে দীর্ঘকালের মত ও অভ্যাস ত্যাগ ক'রে দেশসেবায় আত্মোৎসর্গ করেন। এজন্য নানারূপ দুঃখভোগেও তিনি পশ্চাৎপদ হন নি। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, জামাতা ও পুত্রবধূ সকলকে নিয়েই তিনি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। স্বরাজ-প্রচেষ্টায় মোতিলালের দান অনন্যতুল্য। প্রাসাদোপম আনন্দ-ভবন এ বৎসর এপ্রিল মাসে তিনি কংগ্রেসে দান করেন ও এর নামকরণ হয় 'স্বরাজ-ভবন'। এলাহাবাদের স্বরাজ-ভবনে এখন থেকেই কংগ্রেসের কর্ম্মকেন্দ্র স্থাপিত হ'ল।

বিলাত-প্রত্যাগত নেতাদের মুখে সব কথা শুনে মহাত্মা গান্ধী বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করলেন। দিল্লীতে গান্ধীজী ও ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণ সমবেত হলেন। প্রথম গান্ধী-আরুইন সাক্ষাৎকার হ'ল ১৭ই ফেব্রুয়ারী। এর পর দীর্ঘ পনর দিন যাবৎ মহাত্মা গান্ধী ও লর্ড আরুইনের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলল। শেষে ৪ঠা মার্চ্চ উভয়ের মধ্যে এক চুক্তি নিষ্পন্ন হয়। কোন কোন সদস্য কোন কোন শর্ত্তে আপত্তি জানালেও ওয়ার্কিং কমিটি চুক্তি গ্রহণ করেন। ৫ই মার্চ্চ একটি বিশেষ বিবৃতিতে সরকার এই চুক্তির কথা প্রকাশিত করেন। চুক্তির শর্ত্ত অনুসারে সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হ'ল ও যারা হিংসাত্মক কর্ম্মের অপরাধে বন্দী নয় এমন সব সত্যাগ্রহী বন্দীদের মুক্তিদানের ব্যবস্থা হ'ল। যে সমস্ত স্থানে লবণ উৎপাদন করা সম্ভব সে সব স্থানের অধিবাসীরা বিনা বাধায় নিজ নিজ প্রয়োজন মত লবণ উৎপাদনের অধিকার পেল, মদের ও বিদেশী বস্ত্রের দোকানে শান্তিপূর্ণ ধর্ণা-দান বা পিকেটিং করাও আইনসঙ্গত ব'লে বিবেচিত হ'ল। কর-বন্ধ আন্দোলন স্থগিত হ'ল, কিন্তু অর্থনৈতিক কারণে কর-বন্ধ করার অধিকার গান্ধীজী প্রতিপাদন করলেন। বাজেয়াপ্ত টাকা বা সম্পত্তি ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা হ'ল না। হিংসাত্মক কর্ম্মে দণ্ডিত ব্যক্তিদের দণ্ড হ্রাসে, বিশেষ ক'রে ভগৎ সিংহ ও তার সঙ্গীদ্বয়ের মৃত্যুদণ্ড হ্রাস করতে গান্ধীজী চেষ্টা করেন, কিন্তু কোনটিতেই সফলকাম হন নি। গান্ধী-আরুইন চুক্তিতে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের পক্ষে সুবিধা ক'রে দেওয়ার কথা হ'ল।

কংগ্রেস ও গবর্ণমেণ্ট উভয় পক্ষ স্বীকার করলেন যে, ফেডারেশন বা রাজন্য-ভারত ও ব্রিটিশ ভারতের সম্মিলিত রাষ্ট্র ভাবী শাসন-সংস্কারের একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ। ভারতীয় স্বার্থের অনুকূল ভারতীয় দায়িত্ব ও অন্য কতক-গুলি বিষয়, যেমন—দেশ-রক্ষা, পররাষ্ট্র-নীতি, সংখ্যা-লঘিষ্ঠ সম্প্রদায় ও জাতীয় ঋণ সম্পর্কে রক্ষাকবচ এর অপরিহার্য্য অঙ্গ। নিরপেক্ষদের মতে, শর্ত্তগুলি বিশেষ ক'রে সরকারেরই অনুকূল ক'রে নিষ্পন্ন হয়। আমলাতন্ত্র কিন্তু এতে মোটেই খুশি হ'তে পারলে না। বে-সরকারী ইউরোপীয় সমাজও কর্ত্তৃপক্ষের উপর গালিবর্ষণ সুরু করলে। তারা গোলটেবিল বৈঠকের মধ্যেই সরকারকে অযাচিত ভাবে কংগ্রেস দমনের নানা ফন্দি-ফিকির বাতলে দিতে লাগল।

মার্চ্চ মাসের শেষে (১৯৩১) করাচীতে সর্দ্দার বল্লভভাই পটেলের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। সরকার সত্যাগ্রহী বন্দীদের অনেককে এই সময়ের মধ্যে মুক্তি দেন। এবারকার অধিবেশনে মুক্ত বন্দীদের ভিতর থেকে অর্দ্ধেক প্রতিনিধি গৃহীত হলেন। সুভাষচন্দ্র বসুও ৮ই মার্চ্চ মুক্তিলাভ ক'রে করাচী কংগ্রেসে যোগদান করেন। নওযোয়ান বা নবযুবক সম্মেলনের তিনি সভাপতি হন। মহাত্মা গান্ধী ও সর্দ্দার বল্লভভাই পটেলও যথাসময়ে করাচীতে উপনীত হলেন। কংগ্রেসের প্রাক্কালে ভগৎ সিংহের ফাঁসি হয়। যুবক সমাজ এজন্য চঞ্চল হ'য়ে উঠে। তাদের একদল এই সর্ব্বপ্রথম গান্ধীজীকে কৃষ্ণপতাকা দ্বারা সম্বর্দ্ধিত করে।

কংগ্রেসের প্রধান আলোচ্য বিষয় হ'ল গান্ধী-আরুইন চুক্তি ও গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান। জবাহরলাল এ বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটির মর্ম্ম এই—

ওয়ার্কিং কমিটির ও গবর্ণমেণ্টের মধ্যে নিষ্পন্ন আপোষের বিষয় বিবেচনা ক'রে কংগ্রেস তা সমর্থন করেন ও পরিষ্কার ক'রে বলতে চান যে, কংগ্রেসের পূর্ণ স্বরাজের (পূর্ণ স্বাধীনতা) আদর্শই বলবৎ আছে। যদি ব্রিটিশ গবর্ণ-মেণ্টের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কোন বৈঠকে কংগ্রেস প্রতিনিধিদের সম্মিলিত হওয়ার সুযোগ ঘটে, তা হ'লে কংগ্রেস প্রতিনিধিগণ ঐ লক্ষ্য সম্মুখে রেখেই কার্য্য করবেন। বিশেষতঃ দেশ-রক্ষা, পররাষ্ট্র-নীতি, রাজস্ব, আর্থিক ও

বাণিজ্য ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ, এবং নিরপেক্ষ বিচারকমণ্ডলী দ্বারা ভারতে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের অর্থনীতি বিষয়ক কার্য্যাকার্য্যের অনুসন্ধান, ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে জাতীয় ঋণ পরীক্ষা ও নির্দ্ধারণ, স্বেচ্ছায় পরস্পরের বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার, ভারতীয় স্বার্থের অনুগ যে সব বিলি-বন্দোবস্ত করা আবশ্যক স্বাধীন-ভাবে তা তাকে করতে দেওয়া—এই সকল ব্যাপারের প্রকৃত ক্ষমতা যাতে জাতির হাতে আসে সে দিকে দৃষ্টি রেখেই আলোচনা চালান আবশ্যক।

"এই কংগ্রেস বৈঠকে কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করার সম্পূর্ণ অধিকার ও ক্ষমতা মহাত্মা গান্ধীকে অর্পণ করেন। আবশ্যক হ'লে, তাঁর নেতৃত্বাধীনে এক প্রতিনিধি-মণ্ডলীও কংগ্রেস নিয়োগ করতে পারেন।"

এবারকার অধিবেশনের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব—জনগণের মৌলিক অধিকারের বিবৃতি। স্বরাজ বলতে সাধারণের মনে কি ধারণা হওয়া উচিত তার স্পষ্ট রূপ দেওয়ার জন্য একটি ব্যাপক প্রস্তাব রচিত ও গৃহীত হ'ল। পরে এ প্রস্তাবটি কিঞ্চিৎ সংশোধিত হয়। পরবর্ত্তীকালে কংগ্রেসের কর্ম্ম প্রণালী এর দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত ও নিয়মিত হ'ত। সংশোধিত প্রস্তাবটি সংক্ষেপে এই—

মৌলিক অধিকার

১। (ক) প্রত্যেক ভারতবাসীর স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের, সমিতি বা সঙ্ঘে যোগদানের এবং নিরস্ত্র ও শান্তিপূর্ণ ভাবে সম্মিলিত হওয়ার অধিকার। (খ) সমাজে শান্তি ও নীতি বজায় রেখে প্রত্যেকেরই নিজ নিজ ধর্ম্ম পালনের বা মত অনুসারে চলার স্বাধীনতা। (গ) সংখ্যা-গরিষ্ঠদের এবং পৃথক ভাষা ভাষী অঞ্চলের সংস্কৃতি, ভাষা ও হরফ সংরক্ষণ। (ঘ) বর্ণ, ধর্ম্ম ও নর-নারী নির্ব্বিশেষে আইনের চক্ষে সকলেই সমান। (ঙ) সরকারী কর্ম্মে নিয়োগে, দায়িত্বপূর্ণ ও সম্মানজনক পদ লাভে বা কোন ব্যবসা বা জীবিকা অবলম্বনে ধর্ম্ম, বর্ণ বা নর-নারী ভেদে তারতম্য না করা। (চ) সরকারের ব্যক্তি-বিশেষের বা সঙ্ঘ-বিশেষের অর্থে সৃষ্ট বা প্রদত্ত দীঘিকা, জলাশয়, রাস্তা, স্কুল বা সাধারণগম্য স্থানের উপর সকলেরই সমান কর্ত্তব্য ও অধিকার। (ছ) নিয়মাধীন থেকে প্রত্যেকেরই অস্ত্রশস্ত্র বহনে ও রক্ষণে সমান অধিকার। (জ) আইনসঙ্গত উপায় ব্যতিরেকে কোন লোকেরই স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত

না হওয়া ও তার বাসস্থানে বা সম্পত্তিতে প্রবেশ করতে, তা দখল করতে বা বাজেয়াপ্ত করতে না দেওয়া। (ঝ) ধর্ম্ম সম্পর্কে রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা। (ঞ) সর্ব্বত্র সাবালকদের ভোটদানের অধিকার। (ট) রাষ্ট্র কর্ত্তৃক অবৈতনিক ও আবশ্যিক শিক্ষা দান। (ঠ) রাষ্ট্রের তরফে উপাধি দান না করা। (ড) মৃত্যুদণ্ডের উচ্ছেদ। (ঢ) ভারতের সর্ব্বত্র বসবাসে, গমনাগমনে সম্পত্তি ক্রয়ে, ব্যবসা-পরিচালনায় সকল ভারতবাসীর সমান অধিকার।

শিল্প-কারখানার শ্রমিক

২। (১) জীবন-যাপনের চলনসই মান নিরূপণ। (২) শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণে রাষ্ট্রের ব্যবস্থা। উপযুক্ত আইন ক'রে ও অন্যান্য উপায়ে শ্রমিকদের জীবন-ধারণোপযোগী মজুরী, স্বাস্থ্যপ্রদ স্থানে নির্দ্দিষ্ট সময়ে কাজ, মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে বিরোধ মীমাংসার উপায়, বার্দ্ধক্য, ব্যাধি বা বেকারের সময় তাদের রক্ষা—এ সব বিষয়ের ব্যবস্থা। (৩) দাসত্ব বা দাসত্বের কাছাকাছি অবস্থা থেকে শ্রমিকদের মুক্তিদান। (৪) নারী শ্রমিকদের রক্ষা, বিশেষতঃ মাতৃত্বকালে তাদের জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা। (৫) স্কুলে-পড়া বয়সের বালক-বালিকাকে খনিতে বা কারখানায় শ্রমিকরূপে না গ্রহণ। (৬) কৃষক ও শ্রমিকদের নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্য সঙ্ঘ গঠনের অধিকার।

রাষ্ট্রের আয়-ব্যয়

(৭) ভূমি-স্বত্ব, ভূমি-কর ও রাজস্বের সংস্কার ও নির্দ্ধারণ। কৃষকদের দেয় খাজনা যেখানে অত্যধিক সেখানে তা বহুলাংশে হ্রাস করা। একটি নির্দ্দিষ্ট নিম্নতম মান থেকে জমির আয়ের উপর কর স্থাপন। (৮) মৃত্যু-কর নির্দ্ধারণ। (৯) অর্দ্ধেকের মত সৈন্য-ব্যয় হ্রাস। (১০) সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতনের, বিশেষজ্ঞদের বেতন বাদে, উচ্চতম হার মাসে পাঁচ শ' টাকা। (১১) ভারতবর্ষে উৎপন্ন লবণের উপর কোনরূপ কর স্থাপন না করা।

আর্থিক ও সামাজিক কর্ম্ম-ব্যবস্থা

(১২) রাষ্ট্র কর্ত্তৃক স্বদেশী বস্ত্র রক্ষা; এজন্য দেশে বিদেশী বস্ত্র ও বিদেশী সূতা আমদানীর পথ বন্ধ করা। প্রয়োজন হ'লেই, রাষ্ট্র কর্ত্তৃক বিদেশীদের প্রতি-

যোগিতার হাত থেকে দেশী শিল্প রক্ষার ব্যবস্থা। (১৩) ঔষধ ছাড়া উত্তেজক পানীয় ও ভেষজ দ্রব্যের ব্যবহার সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা। (১৪) জাতীয় স্বার্থের অনুকূল বাট্টা ও বিনিময় হার নির্ণয়। (১৫) খনিজ সম্পদ, রেলপথ, জলপথ, জাহাজ প্রভৃতি পরিচালনার ভার রাষ্ট্র কর্তৃক গ্রহণ। (১৬) কৃষকদের ঋণ মুক্তি। (১৭) ভারতবাসীদের যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা। সরকারী দেশরক্ষা-বাহিনীর সঙ্গে তারাও দেশরক্ষায় সাহায্য করবে।

করাচী অধিবেশনের পর সকলে নিজ নিজ অঞ্চলে গমন করলেন ও কংগ্রেস কমিটি গঠন ক'রে সংগঠন কার্য্যে মন দিলেন। বিদেশী বস্ত্র ও মদের দোকানে পিকেটিং করা গঠনমূলক কার্য্যের অঙ্গ। যে সব স্থলে কর-বন্ধ আন্দোলনের জন্য সরকারে কর দেওয়া বন্ধ ছিল, সে সব স্থলে যথারীতি কর দেওয়া আরম্ভ হ'ল। কংগ্রেস এই মর্ম্মে নির্দ্দেশ দিলেন যে, প্রজারা সাধ্যমত কর দানে যেন কোনরূপ ত্রুটি না করে। অনেক স্থলে যেমন—গুজরাটে ও যুক্তপ্রদেশে, কংগ্রেস কর্ম্মীরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে কর আদায়ে আমলাতন্ত্রকে সাহায্য করলেন। কিন্তু এ সব কার্য্য আমলাতন্ত্র ভাল চোখে দেখে নি। কংগ্রেসের কর্ত্তৃত্ব ও মর্য্যাদা বাড়ে, তাদের তা মোটেই কাম্য নয়। তাই যে সব প্রজা অভাব ও অক্ষমতা হেতু খাজনার বক্রী টাকা কিয়দংশ মাত্রও দিতে অসমর্থ হ'ল তাদের উপর জোরজুলুম সুরু হ'ল। বোম্বাই, বাংলা, দিল্লী, আজমীর-মারওয়াড় ও মাদ্রাজে পিকেটিং করার উপরও সরকার কড়া নজর দিলেন। ১৮ই এপ্রিল (১৯৩১) লর্ড আরুইন ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন। এর পূর্ব্বদিন লর্ড উইলিংডন কর্ম্মভার গ্রহণ করেন। লর্ড উইলিংডন একজন জবরদস্ত শাসক। আমলাতন্ত্র তাঁকে পেয়ে যেন খুবই আশ্বস্ত হ'ল। বিলাতেও একদল লোক গান্ধী-আরুইন চুক্তির নিন্দায় পঞ্চমুখ হ'ল। যখন নানাস্থানে চুক্তি ভঙ্গ হ'তে থাকে এবং ১০৭ ও ১৪৪ ধারা মতে স্বাধীনতা সঙ্কোচ ও ধরপাকড় সুরু হয়, তখন মহাত্মা গান্ধী এ সব বিষয়ে উল্লেখ ক'রে সরকারে পত্র লেখেন। সরকার সমস্ত অভিযোগ খণ্ডন ক'রে পাল্টা অভিযোগের ফিরিস্তি দেন। গান্ধীজী অতঃপর চুক্তির শর্ত্ত ব্যাখ্যার জন্য একটি সালিশী আদালত গঠনের প্রস্তাব করেন। কর্ত্তৃপক্ষ এতেও অসম্মত হন। বারডোলীতে অক্ষম লোকদের নিকট থেকে কর আদায়ের জন্য খুবই জোরজুলুম হয়। মহাত্মাজী প্রতিকারের উপায় না

দেখে তথাকথিত গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের আশা ছেড়ে দিলেন। ১৩ই আগষ্ট ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন হ'ল। কমিটির মত নিয়ে তিনি বৈঠকে যোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত বড়লাট লর্ড উইলিংডনকে জ্ঞাপন করেন। আবার আপোষ-রফার কথা হয়। মহাত্মা গান্ধী শিমলায় বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বড়লাট বারডৌলী ব্যাপারের তদন্তে সম্মত হলেন। এরপর গান্ধীজী বৈঠকে যোগদান করা যুক্তিযুক্ত ভেবে কাল বিলম্ব না ক'রে ২৯শে আগষ্ট লণ্ডন রওনা হলেন।

কংগ্রেস তরফে একমাত্র মহাত্মা গান্ধী বৈঠকে যোগদান করেন। সরোজিনী নাইডু ও পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ও বৈঠকে যোগ দিলেন। ভারতীয় নারী সমাজের মুখপাত্র হলেন নাইডু মহোদয়া, মালবীয়জী হিন্দু স্বার্থের উপর লক্ষ্য রাখবার জন্যই বিশেষ ক'রে নিযুক্ত হলেন। যথারীতি বৈঠক আরম্ভ হ'ল। এবারে কংগ্রেস যোগদান করায় এর মর্য্যাদাও ঢের বেড়ে যায়। পূর্ব্ব বৈঠকে সাধারণ আলোচনা হ'য়ে গেছে। এবারকার বৈঠক পৃথক পৃথক কমিটিতে বিভক্ত হ'য়ে শাসন-বিষয়ক আলোচনায় ব্যাপৃত হলেন। গান্ধীজী প্রত্যেক কমিটিতেই ভারতের শাসন-সমস্যা সম্পর্কে কংগ্রেসের অভিমত সুন্দর ও সহজ ভাষায় ব্যক্ত করলেন। কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি, দেশ-রক্ষা, পররাষ্ট্র-নীতি, রাজস্ব, বাণিজ্য, জাতীয় ঋণ প্রভৃতি নানা বিষয় তাঁর বক্তৃতার বিষয়ীভূত হ'ল। তাঁর বক্তৃতা ইউরোপ ও আমেরিকায় সর্ব্বত্র সবিস্তারে প্রকাশিত হয়।

কিন্তু তথাকথিত গোলটেবিল বৈঠকের আবহাওয়া অন্যরূপ। বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কংগ্রেস তথা ভারতবর্ষের মূল দাবি সম্পর্কে কোন মত প্রকাশ করলেন না। সব বিষয় বিবেচনা ক'রে দেখবেন—এইরূপ আশ্বাস দিলেন মাত্র। যে সব ভারতবাসী বৈঠকে যোগদান করেছিলেন তাঁরাও একমত হ'য়ে কাজ করতে পারলেন না। পূর্ব্বেই বলেছি, সরকার বিভিন্ন শ্রেণী ও ধর্ম্ম সম্প্রদায় থেকে তাঁদের মনমত এমন সব লোক বাছাই করেন যাঁরা নিজ স্বার্থ, শ্রেণী বা সম্প্রদায় স্বার্থ ছাড়া জাতীয় স্বার্থের কথা কখন চিন্তাও করেন নি। তাই তাঁরা গান্ধীজীর শর্ত্তে (তিনি বলেছিলেন, সংখ্যা-লঘিষ্ঠদের, বিশেষতঃ মুসলমানদের তিনি সব দাবি মেনে নেবেন যদি তাঁরা ভারতের স্বাধীনতা প্রচেষ্টায় কংগ্রেসের সঙ্গে একমত হ'য়ে কাজ করেন) রাজী না

হ'য়ে ইউরোপীয় ও অন্যান্যদের সঙ্গে মিলে 'মাইনারটিজ্ প্যাক্ট' বা সংখ্যা-লঘিষ্ঠদের চুক্তি ক'রে বসলেন। ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষও মূল দাবির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না ক'রে সংখ্যা-লঘিষ্ঠদের সমস্যাটাকেই বড় ক'রে দেখলেন।

ওদিকে বিলাতে এ সময় শাসন-সঙ্কট উপস্থিত হয়। স্বর্ণাভাব হেতু ব্রিটিশ সরকার স্বর্ণমান পরিত্যাগ করেন। এই সময় শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের পতন হ'ল ও সাধারণ নির্ব্বাচনে রক্ষণশীল দল সংখ্যাধিক্য লাভ করলে। কিন্তু সঙ্কট-কালে সকল দল নিয়ে নেশন্যাল বা জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হ'ল। শ্রমিক দলের মুষ্টিমেয় লোকই এতে যোগ দিলেন। উদারনীতিকদেরও অধিকাংশ রইলেন বাইরে। মিঃ রাম্‌সে ম্যাক্‌ডনাল্ড এবারেও প্রধানমন্ত্রী রইলেন বটে, কিন্তু পার্লমেণ্টে রক্ষণশীল দলের প্রাধান্য হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট প্রকৃত প্রস্তাবে রক্ষণশীলই হ'ল। অন্যতম রক্ষণশীল সার্ স্যামুয়েল হোর ভারতসচিব নিযুক্ত হন। গবর্ণমেণ্ট বদল হওয়াতে গোলটেবিল বৈঠকের উপরও প্রতিক্রিয়া হ'ল খুবই। ১৮ই নবেম্বর (১৯৩১) নূতন ভারতসচিব সার্ স্যামুয়েল হোর জানান যে, সাধারণ বৈঠকের আর প্রয়োজন নেই। বৈঠকের শেষ অধিবেশন হ'ল ১লা ডিসেম্বর। এদিন প্রত্যেকে প্রত্যেককে শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় নিলেন। গান্ধীজীর মিলন চেষ্টা ব্যর্থ ক'রে কিঞ্চিৎ শাসন কর্ত্তৃত্বের আশ্বাস দিয়েই কৌশল ক'রে কিরূপে সংখ্যা-লঘিষ্ঠদের সপক্ষে টেনে নেওয়া হয় এবং বাণিজ্য সম্পর্কে কংগ্রেস, হিন্দুসভা ও ভারতীয় বণিক্ সমাজের বিরোধিতা সত্ত্বেও নিজ নিজ মন মত সব ব্যবস্থা করা হয়—এ সব কথা কলকাতার ইউরোপীয় বণিক সমাজের প্রতিভূ সার্ এডওয়ার্ড বেন্থল একটি গোপন সার্কুলার বা প্রচার-পত্রে সবিশেষ ব্যক্ত করেন। বেন্থল সাহেব একথাও স্পষ্ট ক'রে বলেন যে, সাপ্রু, জয়াকর, পাত্র প্রমুখ হিন্দুরা অতঃপর কংগ্রেসকে যে কোনরূপ সাহায্য করবেন না এরূপ প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে। বৈঠকের শতকরা নিরানব্বই জন প্রতিনিধিকেই গান্ধী তথা কংগ্রেস-বিরোধী করা হয়। সাধারণ নির্ব্বাচনের পরই ব্রিটিশ গবর্ণ-মেণ্টের দক্ষিণপন্থীরা বৈঠক ভেঙ্গে দিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে লড়তে মনস্থ করেন।

বাস্তবিক, গোলটেবিল বৈঠক শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতে দমন-নীতি পুনরায় ব্যাপকভাবে সুরু হ'ল। বাংলা, যুক্তপ্রদেশ ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের উপরই সরকারের নজর পড়ল বেশী ক'রে। বঙ্গে বিপ্লবী দল ১৯৩০

সালেই কর্ম্ম শুরু করে; চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন থেকে তাদের কার্য্য আরম্ভ হয়। এজন্য এখানে এক অর্ডিন্যান্সও পাস হয় ও বিস্তর লোক বিপ্লবী বা বিপ্লবীদের সাহায্যকারী ব'লে কারাবদ্ধ হন। মহাত্মা গান্ধীর বিলাত রওনা হবার পরদিনই চট্টগ্রামে ভীষণ দাঙ্গা উপস্থিত হয়েছিল। এর পূর্ব্ব দিন পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টর মিঃ আসাহুল্লা জনৈক বিপ্লবীর গুলিতে নিহত হওয়াই এই দাঙ্গার সূত্রপাত। কর্ত্তৃপক্ষের ব্যবহারে লোকের মনে এই সন্দেহ জন্মে যে, সরকারী কর্ম্মচারীরা এরূপ দাঙ্গায় ইন্ধন জুগিয়েছেন। পরবর্ত্তী ১৬ই সেপ্টেম্বর হিজলী বন্দী-শালায় সরকার গুলিবর্ষণের ফলে দু'জন রাজবন্দী নিহত হন। সন্ত্রাসবাদ দমনের জন্য বঙ্গে ২৯শে অক্টোবর একটি ও ৩০শে নবেম্বর আর একটি অর্ডিন্যান্স জারি করেন।

কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য হ্রাস পাওয়ায় যুক্তপ্রদেশের কৃষকদের অবস্থা ক্রমেই সঙ্গীন হ'য়ে উঠে। তথাপি গান্ধী-আরুইন চুক্তি সম্পাদনের পর সাধ্যমত তাঁরা খাজনা দিয়েছিলেন। শেষ সম্বলটি পর্য্যন্ত দেওয়া হ'লে অবশিষ্ট খাজনা মকুবের জন্য নেতৃবৃন্দ সরকারের সঙ্গে আলোচনা চালাতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। কর্ত্তৃপক্ষ নেতৃবর্গের প্রস্তাবে সম্মত হন নি। কর বন্ধ হবার আশঙ্কা ক'রে গবর্ণমেণ্ট কৃষক সমিতি ও কৃষক সম্মেলন দমনে বদ্ধপরিকর হলেন এবং পণ্ডিত জবাহরলাল ও মিঃ সেরওয়ানীকে এলাহাবাদের ভিতরে আবদ্ধ থাকতে হুকুম দিলেন। ১৪ই ডিসেম্বর এক অর্ডিন্যান্স জারি ক'রে কৃষক আন্দোলন ও করবন্ধ প্রচেষ্টা বে-আইনী ঘোষণা করা হ'ল। জবাহরলাল ও সেরওয়ানী গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য বোম্বাই রওনা হলে পথিমধ্যে ধৃত হন এবং যথাক্রমে দু'বছর ও ছ'মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

আবদুল গফ্‌ফর খাঁর খোদাই খিদমতগার বাহিনীকে (লাল জামা পরিধান করায় লাল-কোর্ত্তা ব'লেও পরিচিত) ওয়ার্কিং কমিটি ১৩ই আগষ্টের অধিবেশনে কংগ্রেসের অঙ্গীভূত ব'লে গণ্য করেন। রাজনৈতিক প্রচার কার্য্যের জন্য উভয়ের উপরই সীমান্তের কর্ত্তৃপক্ষ বিরূপ। আবদুল গফ্‌ফর খাঁ ভ্রাতা ডাঃ খাঁ সাহেবের সঙ্গে শীঘ্রই কারারুদ্ধ হলেন। একটি অর্ডিন্যান্স দ্বারা খোদাই খিদমতগার বাহিনীও বে-আইনী ঘোষিত হ'ল। এই অবস্থার মধ্যে ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৩১ তারিখে গান্ধীজী বোম্বাইয়ে ফিরে এলেন।

সত্যাগ্রহ ও দৈত নীতি

(১৯৩২—১৯৩৫)

গান্ধীজীকে নিজ নিজ প্রদেশের অবস্থা জানাবার জন্য নেতৃবর্গ একে একে বোম্বাইতে উপনীত হলেন। ওয়ার্কিং কমিটিও ২৯শে ডিসেম্বর বোম্বাইয়ে অধিবেশন দিন ধার্য্য করেন। ওয়ার্কিং কমিটি ও নেতৃবর্গের মুখে সব কথা অবগত হ'য়ে মহাত্মা গান্ধী কাল বিলম্ব না ক'রে ২৯শে ডিসেম্বর তারিখেই বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তারে আবেদন জানালেন। উত্তর যা এল তা মোটেই আশাপ্রদ নয়। বাংলা, যুক্তপ্রদেশ ও সীমান্তে যে সব অর্ডিন্যান্স জারি হয়েছে সে সব সম্বন্ধে গান্ধীজীর সঙ্গে কোন আলোচনা করতে বড়লাট রাজী নন্। এ ছাড়া অন্য যে কোন উদ্দেশ্যে তিনি বড়লাটের সঙ্গে দেখা করতে পারেন। বলা বাহুল্য, গান্ধীজীর সাক্ষাৎ-প্রার্থনার উদ্দেশ্য ছিল ঐ তিনটি প্রদেশের সম্বন্ধেই বিশেষ ভাবে আলোচনা করা। সুতরাং যাতে বিনা সর্ত্তে তাঁকে সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া হয় সেজন্য আবার ১লা জানুয়ারী (১৯৩২) গান্ধীজী তার করেন। ইতিমধ্যে ওয়ার্কিং কমিটিও সিদ্ধান্ত ক'রে নিয়েছেন। বড়লাট যদি গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে সব বিষয় আলোচনা করতে অস্বীকার করেন তবে তাঁরা মনে করবেন গান্ধী-আরুইন চুক্তির অবসান হয়েছে। তাঁরা আবার সত্যাগ্রহ প্রচেষ্টা পুনরুজ্জীবিত করতে বাধ্য হবেন। কি কি ভাবে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করা হবে প্রস্তাবে তারও একটা নির্দ্দেশ দেওয়া হ'ল। এ প্রস্তাবও গান্ধীজী ঐ দিন তারে বড়লাটকে জানান। ২রা তারিখ জবাব এল, গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করা হবে না। তিনি ৩রা শেষ বার বড়লাটকে তার ক'রেও কোন সন্তোষজনক উত্তর পেলেন না।

কর্ত্তৃপক্ষের কার্য্যক্রম চলল ঠিক ঘড়ির কাঁটার মত। মহাত্মা গান্ধী ও সর্দ্দার বল্লভভাই পটেল ৪ঠা জানুয়ারী কারারুদ্ধ হলেন। সুভাষচন্দ্র বসু বাংলায় ফিরবার পথে বোম্বাইয়ের ত্রিশ মাইল দূরে কল্যাণ ষ্টেশনে ধৃত হন। দেখতে

দেখতে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা অতি দ্রুত কারাবদ্ধ হলেন। দেশপ্রিয় যতীন্দ্র-মোহন সেনগুপ্ত ১৯৩১, অক্টোবর মাসে শারীরিক অসুস্থতা হেতু ডাক্তারদের পরামর্শে বিলাত গমন করেন। পরবর্ত্তী ২০শে জানুয়ারী বোম্বাইয়ে পৌঁছবা মাত্র ১৮১৮ সালের তিন আইনে বন্দী হলেন। তাঁর স্বাস্থ্য তখনও ভাল হয় নি। বন্দীবাস তাঁর পক্ষে কাল হ'ল ও তিনি ২২শে জুলাই (১৯৩২) পরলোক গমন করলেন।

১৯৩২, ৪ঠা জানুয়ারী কর্ত্তৃপক্ষ নূতন ক'রে এই চারটি অর্ডিন্যান্স জারি করলেন,—(১) ইমার্জেন্সি পাওয়ার্স অর্ডিন্যান্স বা হঠাৎ বিপদ উপস্থিত হ'লে তার সম্মুখীন হওয়ার জন্য অতিরিক্ত ক্ষমতা মূলক জরুরী আইন, (২) আন্‌ল-ফুল ইন্‌ষ্টিগেশন অর্ডিন্যান্স বা বে-আইনী কর্ম্মে প্ররোচনা-দানের বিরুদ্ধে জরুরী আইন, (৩) আন্‌লফুল এসোসিয়েশন অর্ডিন্যান্স বা বে-আইনী সভাসমিতি বিষয়ক জরুরী আইন ও (৪) প্রিভেন্‌শন অফ মলেষ্টেশন এণ্ড বয়কট অর্ডিন্যান্স বা লোককে উত্ত্যক্ত করা ও বর্জ্জন কার্য্য বন্ধ করার জন্য জরুরী আইন। এ ছাড়া প্রেস আইন কর্ত্তৃপক্ষের হাতে এক মোক্ষম অস্ত্র। ১৯৩০ সালে যে প্রেস অর্ডিন্যান্স জারি হয়; ১৯৩১ সালে তা আইনে পরিণত করা হয়। এবারে ফৌজদারী আইন সংশোধন ক'রে প্রেস আইনকে এব অঙ্গীভূত করা হ'ল। কর-বন্ধ আন্দোলন ব্যাহত করার জন্য বোম্বাই সরকার একটি অর্ডিন্যান্স জারি করলেন। সব অর্ডিন্যান্সই পরে আইনে পরিণত হয়।

আগেকার এবং বর্ত্তমান অর্ডিন্যান্স দ্বারা প্রকাশ্য আন্দোলন সর্ব্বরকমে বন্ধ করার আয়োজন হ'ল। কংগ্রেসের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ওয়ার্কিং কমিটি, প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি, জেলা, মহকুমা, তালুক, থানা ও গ্রামের কংগ্রেস কমিটি, জাতীয় বিদ্যালয়, কংগ্রেসের অন্তর্গত অন্য সমুদয় প্রতিষ্ঠান বে-আইনী ঘোষিত হ'ল। যে সব গৃহে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপিত, সে সবই সরকার অধিকার করলেন। কংগ্রেস ফণ্ড ও সমুদয় টাকাকড়ি সরকারের হস্তগত হ'ল। পাইকারী জরিমানা, পিটুনি পুলিশ ও সৈন্য স্থাপনের ব্যয় প্রজার কাছ থেকে আদায়ের ব্যবস্থা হ'ল। কর-বন্ধের প্ররোচনা দান দণ্ডনীয়। প্ররোচক নাবালক হ'লে পিতামাতা বা অভিভাবককেই শাস্তি দেওয়ার কথা হয়। সরকার যে-কোন লোককে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দায়ী করার ক্ষমতা লাভ করলেন।

কোন কোন স্থানে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে গৃহের বাইরে বের হ'তে হ'লে বিভিন্ন রঙের আইডেন্টিফিকেশন কার্ড বা পরিচয় পত্রের ব্যবস্থা হ'ল। যেখানে সন্ত্রাসবাদ প্রবল সেখানেই বিশেষ ক'রে এইরূপ করা হয়। এ সময়কার সন্ত্রাসবাদ ও সত্যাগ্রহ বা আইন-লঙ্ঘন প্রচেষ্টা এ দুয়ের মধ্যে বিশেষ কোন তারতম্য করা হ'ল না। উভয়ই সমানে দমন করার চেষ্টা চলল। ২৬শে মার্চ্চ (১৯৩২) তারিখে সার্ স্যামুয়েল হোর পার্লামেণ্টে স্বীকার করেন যে, অর্ডিন্যান্সগুলি বাস্তবিকই ভীষণ। মানুষের সর্ব্বরকম দৈনন্দিন কর্ম্মের উপরই এ প্রযুজ্য। কিন্তু যেখানে গবর্ণমেণ্টের ভিত্তিই বিপন্ন সেখানে এরূপ পন্থা অবলম্বন ছাড়া উপায় নেই। অর্ডিন্যান্স শাসনের প্রকোপ দু'বছর পর্য্যন্ত খুবই ছিল। এর জের ১৯৩৫ সালের পরেও চলেছিল। এই সময়ের মধ্যে সন্ত্রাসবাদের সন্দেহে অন্তরীণ হয় দুই হাজার সাতশ' বাঙালী যুবক। সন্ত্রাসবাদীরা লাট সাহেব থেকে আরম্ভ ক'রে মেজিষ্ট্রেট ও অন্যান্য পদস্থ কর্ম্মচারীদের উপর গুলি চালায় ও কাউকে কাউকে হত্যাও করে। অন্যান্য প্রদেশেও সন্ত্রাসবাদীদের আবির্ভাব হয়, কিন্তু বঙ্গের তুলনায় তা খুবই কম।

অর্ডিন্যান্স শাসনের ফলে ভারতের সর্ব্বত্র সত্যাগ্রহীরাও প্রকাশ্য পথ ছেড়ে গোপনে কর্ম্ম চালাতে থাকেন। সত্যাগ্রহ আন্দোলন এ সময় কিরূপ বহু বিস্তৃত ও বহু ব্যাপক হয়েছিল তা কারাদণ্ড-ভোগীদের সংখ্যা দৃষ্টেই বুঝা যায়। ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনে ত্রিশ হাজার, ১৯৩০-৩১ সালে প্রথম সত্যাগ্রহের সময় নব্বুই হাজার এবং ১৯৩২-৩৪ সালের মধ্যে দ্বিতীয় বারে প্রায় দু'লক্ষ অহিংস কংগ্রেসকর্ম্মী কারাবরণ করেন। সত্যাগ্রহ কালে সকল কর্ম্মই ছিল বে-আইনী। বুলেটিন, পত্রী, পুস্তিকা ও রিপোর্ট টাইপ ক'রে সাইক্লোষ্টাইলে ছেপে কখনও বা মুদ্রিত ক'রে সর্ব্বত্র প্রচার করা হ'ত। এজন্য কত লোক যে কারাবরণ করেন তার ইয়ত্তা নেই। ডাক ও তার বিভাগের বিভিন্ন কেন্দ্রে সরকার সেন্সর বসালেন। ডাকে ঐ সব চলাচল নিষিদ্ধ। ডাক ও তার বিভাগেরও সুবিধা থেকে কংগ্রেস কর্ম্মীরা এইরূপে বঞ্চিত হলেন। লবণ আইন ও বন আইন ভঙ্গ, চৌকিদারী টেক্স ও ভূমি-কর দান বন্ধ করা বা তার প্ররোচনার অপরাধে বিভিন্ন প্রদেশে হাজার হাজার লোক কারাবরণ করেন। ১৯৩৩, এপ্রিল মাসে দিল্লীতে কংগ্রেস হবার কথা;

ছিল। অধিবেশনের জন্ম গঠিত অভ্যর্থনা-সমিতিওবে-আইনী ঘোষিত হয়। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রতিনিধিগণ দিল্লী রওনা হন। কিন্তু পথিমধ্যে তাঁদের প্রায় সবাইকে আটক করা হ'ল। নির্ব্বাচিত সভাপতি পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ও দিল্লীর পথে গ্রেপ্তার হলেন। দিল্লীর ক্লক টাওয়ারে পুলিশের চোখ এড়িয়ে শেঠ রণছোড়লালের সভাপতিত্বে এবারে কোন রকমে কংগ্রেসের অধিবেশন হ'ল।

এইরূপে কয়েক মাস অতীত হয়। ইতিমধ্যে লোকচক্ষুর অন্তরালে এমন কত ঘটনা ঘটতে লাগল যা নিয়ে শীঘ্রই চার দিকে তোলপাড় উপস্থিত হ'ল। তথাকথিত গোলটেবিল বৈঠকের অধিবেশনেই মহাত্মা গান্ধী এ সবের আঁচ পেয়েছিলেন। তিনি বৈঠকেই বলেছিলেন যে, সংখ্যা-লঘিষ্ঠদের স্বার্থরক্ষার অছিলায় হিন্দুদের মধ্যে পৃথক্ নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তিত হ'লে জীবন দিয়েও তা প্রতিকারের জন্ম চেষ্টা করবেন। প্রধানমন্ত্রী মিঃ রাম্‌সে ম্যাক্‌ডনাল্ড ১৯৩২, ১৭ই আগষ্ট ভাবী ব্যবস্থাপরিষদগুলিতে ভারতবাসীদের নির্ব্বাচন প্রথা ও সদস্য-সংখ্যার একটি ফিরিস্তি প্রকাশ করেন। অ-বর্ণ ও স-বর্ণ হিন্দুদের মধ্যেও পৃথক্ নির্ব্বাচনেরই ব্যবস্থা হ'ল! মহাত্মা গান্ধী ১৮ই আগষ্ট তারিখে এ ব্যবস্থার প্রতিকার না হ'লে অনশন ব্রত অবলম্বনের সঙ্কল্প করলেন। এই সঙ্কল্পের কথা তিনি অবিলম্বে বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট মারফত প্রধানমন্ত্রী ও ভারত-সচিবকে জ্ঞাপন করেন। প্রধানমন্ত্রী গান্ধীজীর পত্রের জবাব দিলেন বটে, কিন্তু তাঁর দৃঢ়তা তখনও তিনি উপলব্ধি করতে পারেন নি।

মহাত্মা গান্ধী পরবর্ত্তী ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে অনশন ব্রত আরম্ভ করলেন। ইতিপূর্ব্বে ১২ই সেপ্টেম্বর ভারতসচিব, প্রধানমন্ত্রী ও গান্ধীজীর মধ্যে লিখিত পত্রাদি প্রকাশিত হ'ল। এসব পাঠে সাধারণে তাঁর সঙ্কল্পের কথা জানতে পারেন। ভারতময় চাঞ্চল্য উপস্থিত হ'ল। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় অনশন ব্রত আরম্ভের দিন বোম্বাইয়ে একটি হিন্দু-নেতৃবর্গ সম্মেলন আহ্বান করেন। পরে এই বৈঠক পুণায় স্থানান্তরিত হয়। কারণ মহাত্মা গান্ধী পুণার যারবেদা জেলে বন্দী অবস্থায়ই অনশন ব্রত আরম্ভ করেছিলেন। এম. সি. রাজা. বি. আর. আম্বেদকার, শ্রীনিবাসন্, বি. এল্. রাজভোজ প্রমুখ অ-বর্ণ হিন্দু নেতা ও মালবীয়, সাপ্রু, জয়াকর, রাজেন্দ্র-

প্রসাদ প্রমুখ স-বর্ণ হিন্দু নেতা মিলিত হ'য়ে ২৪শে তারিখে নির্ব্বাচন প্রথা ও সদস্য সংখ্যার একটি সর্ব্বসম্মত মীমাংসা করেন। পৃথক্ নির্ব্বাচনের প্রথা রদ হ'ল ও অ-বর্ণদের জন্য আসন সংরক্ষিত ক'রে যুক্ত নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করা হ'ল। গান্ধীজী এ মীমাংসায় সম্মতি দিলেন। এর নিরিখে ম্যাক্‌ডনাল্ড সাহেব তাঁর সিদ্ধান্ত সংশোধন ক'রে নিলে ২৬শে সেপ্টেম্বর গান্ধীজী গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্মুখে অনশন-ব্রত উদ্‌যাপন করেন।

গান্ধীজী অ-বর্ণ হিন্দুদের নূতন নাম দিলেন 'হরিজন'। হরিজন উন্নয়ন কার্য্যে সর্ব্বত্র বিশেষ সাড়া পড়ে গেল। প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীঘনশ্যাম দাস বিরলার সভাপতিত্বে হরিজন সেবক সঙ্ঘ গঠিত হ'ল। গান্ধীজীর নির্দ্দেশে ভারত-ভৃত্য সমিতির একনিষ্ঠ কর্ম্মী অমৃতলাল ঠক্কর ঐ সঙ্ঘের সম্পাদক পদ গ্রহণ করেন। সংশোধিত সিদ্ধান্তে ব্যবস্থা হ'ল এইরূপ—ভাবী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে হিন্দু সদস্যদের মধ্যে শতকরা আঠারটি আসন হরিজন বা অ-বর্ণ হিন্দুর জন্য সংরক্ষিত থাকবে। নির্ব্বাচিত হিন্দু সদস্যদের মধ্যে মাদ্রাজে ৩০ জন, হিন্দুসহ বোম্বাইয়ে ১৫, পঞ্জাবে ৮, বিহার-উড়িষ্যায় ১৮, মধ্যপ্রদেশে ২০, আসামে ৭, বঙ্গে ৩০, ও যুক্তপ্রদেশে ২০, মোট ১৪৮ জন অ-বর্ণ হিন্দু হবেন। নির্ব্বাচন ব্যবস্থা হ'ল এরূপ—প্রথমে অ-বর্ণ হিন্দুরা প্রতিটি সদস্য পদের জন্য চার জন নির্ব্বাচন করবেন, পরে স-বর্ণ ও অ-বর্ণ হিন্দুদের যুগ্ম ভোটে চার জনের ভিতর একজন নির্ব্বাচিত হবেন। মহাত্মাজী জেলের ভিতর থেকে হরিজন কাজ চালাবার জন্য সরকারের নিকট কতকগুলি সুবিধা বাঞ্ছা করেন। বহু লেখালেখির পর ৭ই নবেম্বর গবর্ণমেণ্ট এই সব সুবিধা দিলেন। এই সময় পুণা থেকে 'হরিজন' পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

অর্ডিন্যান্স শাসনের প্রথম বছর এইরূপে অতিবাহিত হ'ল। ১৯৩২ সালের মধ্যে রাজেন্দ্রপ্রসাদ, আন্‌সারী, গঙ্গাধর রাও দেশপাণ্ডে, কিচলু, রাজা-গোপালাচার্য্য একে একে কংগ্রেসের সভাপতি হ'য়ে কারারুদ্ধ হন। রাজেন্দ্র-প্রসাদ কারামুক্ত হ'য়ে আবার কংগ্রেসের সভাপতি হলেন। তাঁর নির্দ্দেশে ১৯৩৩, ৪ঠা জানুয়ারী নানাস্থানে সভাসমিতি অনুষ্ঠিত হয়। ফলে বিস্তর ধরপাকড় হ'ল। রাজেন্দ্রপ্রসাদ নিজেও কারারুদ্ধ হলেন। তাঁর স্থলে মাধব শ্রীহরি আনে অস্থায়ী সভাপতি নিযুক্ত হন।

অতঃপর এপ্রিল মাসে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন করার আয়োজন হয়। সরকার এবারেও অভ্যর্থনা-সমিতি বে-আইনী ঘোষণা করলেন। মালবীয়জী কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। নানা দিকে নূতন ক'রে উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা দিল ও ভারতের দিগ্‌দিগন্ত থেকে অন্যূন বাইশ শ' প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হ'য়ে অধিকাংশই নির্দ্দিষ্ট দিনে কংগ্রেসে যোগদানের জন্য রওনা হলেন। পথিমধ্যে অনেকে গ্রেপ্তার হন। নির্ব্বাচিত সভাপতি মালবীয়জী, স্বরূপরাণী নেহ্‌রু, দেবীদাস গান্ধী, আনে সকলকেই পথিমধ্যে আটক করা হ'ল। কলকাতার সকল পার্ক পুলিশ অধিকার ক'রে বসল। চৌরঙ্গীতে ও ধর্ম্মতলার মোড়ে উন্মুক্ত স্থানে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তার সভাপতিত্বে কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশন হ'ল ও দ্রুত কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। একটি প্রস্তাবে হোয়াইট পেপারের তীব্র নিন্দাবাদ করা হয়।

এখানে সরকারের শাসন-সংস্কার প্রচেষ্টা সম্বন্ধে একটু বলা প্রয়োজন। গোলটেবিল বৈঠক থেকে এসেই মহাত্মা গান্ধী কারাবরণ করেন। এর অত্যল্প কাল মধ্যে অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃবর্গও একে একে ধৃত ও কারারুদ্ধ হলেন। কর্ত্তৃপক্ষ অতঃপর কংগ্রেসকে বাদ দিয়েই শাসন-সংস্কার কার্য্যে অগ্রসর হন। বিলাতে ১৯৩২ সালে তৃতীয়বার কয়েকজন বিশিষ্ট ভারতবাসীকে নিয়ে ঘরোয়া বৈঠক করা হয়। এইরূপ তিন বারে যে-সব আলাপ-আলোচনা হ'ল তার দৃষ্টে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ভাবী শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কতকগুলি প্রস্তাব রচনা ক'রে ১৯৩৩, ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে একটি 'হোয়াইট পেপার' (বা শ্বেতপত্র) প্রকাশ করেন। এ প্রস্তাব সমূহের খুবই বিরুদ্ধ সমালোচনা হ'ল। হিন্দু-মুসলমান, নরমপন্থী-চরমপন্থী নির্ব্বিশেষে সকলেই এতে তীব্র অসন্তোষ জ্ঞাপন করলেন। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ, কাজেই তাঁদের মতামত পাওয়া সম্ভব হয় নি। তবে তাঁরা যে এসব প্রস্তাব সমর্থন করতেন না তা বলাই বাহুল্য।

অতঃপর ১লা মে (১৯৩৩) মহাত্মা গান্ধী যারবেদা জেল থেকে ঘোষণা করলেন যে, তিনি 'হরিজন' উন্নয়ন সম্পর্কে একুশ দিন উপবাস করবেন। ৮ই মে (১৯৩৩) তিনি উপবাস আরম্ভ করেন। ঐ দিনই কর্ত্তৃপক্ষ তাঁকে মুক্তি দেন। পরবর্তী ২৯শে মে তিনি যথারীতি ব্রত উদ্‌যাপন করেন। এই একুশ

দিনের ভিতর ভারতের দিকে দিকে হরিজন উন্নয়ন কার্য্যে খুবই সাড়া পড়ে যায়। প্রসিদ্ধ দেব-মন্দিরসমূহ হরিজনদের নিকট উন্মুক্ত হয়। স-বর্ণ ও অ-বর্ণ হিন্দুদের ভিতর পঙ্‌ক্তি ভোজনও নানাস্থানে অনুষ্ঠিত হ'ল।

গান্ধীজী কারামুক্ত হ'য়েই সত্যাগ্রহ আন্দোলন ছ' সপ্তাহের জন্য বন্ধ করেন। তাঁর এ কার্য্যে কোন কোন নেতা মোটেই খুশি হন নি। অসুস্থতা নিবন্ধন বিঠলভাই ঝাভেরী পটেল ও সুভাষচন্দ্র বসু তখন ভিয়েনায় অবস্থিতি করছিলেন। সেখান থেকে তাঁরা উভয়েই রয়টারের নিকট গান্ধীজীর এ কার্য্যের তীব্র নিন্দা ক'রে এক বিবৃতি প্রদান করেন। বিবৃতিতে তাঁরা একথাও বলেন যে, গান্ধীজী সঙ্কটকালে দেশকে পরিচালিত করতে অক্ষম, এখন নূতন ক'রে কারো নেতৃত্ব গ্রহণ করা আবশ্যক। কর্ত্তৃপক্ষও কিন্তু গান্ধীজীর উদ্দেশ্য ভিন্ন রূপ ভাবলেন।

যা হোক্, গান্ধীজীর উপবাস কাল অন্তে কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি আনে মহাশয় আবও ছ' সপ্তাহের জন্য আইন-অমান্য স্থগিত রাখেন। এই সময়ের মধ্যে ১২ই জুলাই থেকে আনে মহোদয় পুণায় কারাগারের বাইরে স্থিত নেতাদের এক সম্মেলনে আহ্বান করেন। পুণার তিলক মন্দিরে ১২ই-১৪ই জুলাই এই সম্মেলনের অধিবেশন হয় ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে দেড় শ' নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এতে যোগদান করেন। মহাত্মা গান্ধী, সভাপতি আনে ও উপস্থিত নেতৃবর্গ আলোচনা ক'রে এই সিদ্ধান্ত করেন যে, গণ-সত্যাগ্রহ বা আইন-লঙ্ঘন প্রচেষ্টা অতঃপর বন্ধ থাকবে, তবে যোগ্য লোক নিজ দায়িত্বে ব্যক্তিগত ভাবে আইন অমান্য করতে পারবেন। কংগ্রেসের কার্য্যে গোপন রীতি পরিত্যাগের নির্দ্দেশ দেওয়া হ'ল।

সম্মেলনের পর মহাত্মা গান্ধী বড়লাট লর্ড উইলিংডনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য আবেদন করেন, কিন্তু আইন-লঙ্ঘন প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত না হওয়ায় এবারেও বড়লাট দেখা করতে সম্মত হলেন না। গান্ধীজীও অতঃপর ব্যক্তিগত আইন অমান্যের জন্য প্রস্তুত হলেন। তিনি বড় সাধের সবরমতী আশ্রম ভেঙ্গে দিয়ে গ্রন্থাগার, আসবাবপত্র সকলই হরিজন সেবক সঙ্ঘকে দান করলেন। মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতবর্ষে ফিরে এসে আহ্‌মদাবাদের উপকণ্ঠে সবরমতীতে এই আশ্রমটি গড়েছিলেন। তিনি

গ্রামবাসীদের ভিতর নির্ভীকতার বাণী প্রচারের জন্য বারডোলী তালুকের অন্তর্গত রাসগ্রাম অভিমুখে ১লা আগষ্ট রওনা হন। কস্তুরবাঈ ও বত্রিশ জন আশ্রমিক তাঁর সঙ্গী হলেন। মহাত্মাজী ৪ঠা আগষ্ট তারিখে ধৃত হ'য়ে এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ৭ই আগষ্ট তারিখে মাদ্রাজে যোল জন সঙ্গীসহ রাজাগোপালাচার্য্য ব্যক্তিগত আইন-অমান্যের দায়ে ধৃত হ'য়ে প্রত্যেকে ছ' বছর কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হলেন। বন আইন ভঙ্গ করতে গিয়ে অস্থায়ী সভাপতি আনে মহাশয় তের জন সঙ্গীসহ কারাবরণ করেন। এবারে পঞ্জাবের সর্দ্দার শার্দ্দুল সিং কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি হন। তাঁর পরে আর কেউ অস্থায়ী সভাপতি বা সর্ব্বাধ্যক্ষ হন নি। ব্যক্তিগত আইন-অমান্য সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধরপাকড়েরও হিড়িক পড়ে গেল।

কারাগারের ভিতর থেকে 'হরিজন' কার্য্য চালাবার জন্য গান্ধীজীকে গবর্ণমেন্ট পূর্ব্বে যেরূপ সুবিধা দিয়েছিলেন এবারে তা দিতে অস্বীকার করেন। গান্ধীজী এর প্রতিবাদে পুনরায় ২০শে আগষ্ট (১৯৩৩) অনশন আরম্ভ করলেন। সরকার বেগতিক দেখে ২৩শে তারিখে তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন। এরপর গান্ধীজী সঙ্কল্প করলেন যে, এই মুক্ত অবস্থায় এক বছরকাল তিনি 'হরিজন' কার্য্যেই ব্যাপৃত করবেন। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্রুকেও ৩০শে আগষ্ট তারিখে মুক্তি দেওয়া হয়। জবাহরলাল অবিলম্বে গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। দীর্ঘ তিন বছর পরে তাঁদের এই প্রথম সাক্ষাৎকার। গান্ধীজী হরিজন কার্য্যের জন্য ৭ই নবেম্বর ভারত-সফর সুরু করেন। ইতিপূর্ব্বে ১২ই অক্টোবর পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন আহ্বানের প্রস্তাব করেন, কারণ এ কমিটি তখনও বে-আইনী ঘোষিত হয় নি। ওদিকে মাদ্রাজে আবার নূতন ক'রে স্বরাজ্য-দল গঠনের কথা উঠল।

কিন্তু কংগ্রেস নেতৃবর্গ ইতিকর্ত্তব্য স্থির করবার পূর্ব্বেই বিহারে ১৯৩৪, ১৫ই জানুয়ারী প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়। পৃথিবীতে যত বড় বড় ভূমিকম্প হয়েছে, বিহার ভূমিকম্প তন্মধ্যে অন্যতম। এ ভূমিকম্পে ত্রিশ হাজার লোকের প্রাণহানি ঘটে। আর্থিক ক্ষতিও হ'ল অফুরন্ত। ভূমিকম্পের সময় মহাত্মা গান্ধী ছিলেন দক্ষিণ ভারতে। ভূমিকম্পের অব্যবহিত পরেই তিনি বিহারের ভূমিকম্প বিধ্বস্ত অঞ্চলে গমন করেন। পণ্ডিত জবাহরলালও এখানে এসে

অবিলম্বে উপস্থিত হন। বিহারের জননেতা বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ সত্বর কারামুক্ত হ'য়ে বিপন্ন দেশবাসীদের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন দলের বিশিষ্ট নেতৃবর্গ সম্মিলিতভাবে একটি কেন্দ্রীয় সাহায্য-বোর্ড গঠন করেন। রাজেন্দ্রপ্রসাদের নেতৃত্বে বোর্ড সাতাশ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেন ও পর্য্যুদস্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের সেবায় ব্যয় করতে থাকেন। রামকৃষ্ণ মিশন প্রমুখ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দুর্গতদের দুঃখ বিদূরণের জন্য বিশেষ তৎপর হন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কলকাতা করপোরেশনের তদানীন্তন মেয়র অন্যতম কংগ্রেস-সেবী শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু অন্যান্য কর্ম্মীদের সহযোগে 'মেয়রস্ ভাণ্ড' খুলে প্রায় পাঁচলক্ষ টাকা তুলেন ও সব টাকাই বিপন্নদের সাহায্যার্থে ব্যয় করেন। বড়লাটের ভূমিকম্প ফণ্ডেও এক কোটি টাকার মত সংগৃহীত হয় ও বিহারবাসীদের জন্য ব্যয় করা হয়।

বিহার ভূমিকম্পের কিছু পূর্ব্বে পণ্ডিত জবাহরলাল একবার কলকাতায় আসেন ও কয়েকটি বক্তৃতা করেন। দুটি বক্তৃতায় তিনি মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের ব্যাপার সমূহের উপর মন্তব্য করলেন। তিনি বক্তৃতায় সন্ত্রাসবাদের নিন্দা করেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সরকারী নীতিরও সমালোচনা করতে ছাড়েন নি। বাংলা সরকার বক্তৃতা দুটি রাজদ্রোহকর ব'লে গণ্য ক'রে তাঁকে আদালতে অভিযুক্ত করেন। বিচারে তাঁর দু'বছর কারাদণ্ড হ'ল। জবাহরলাল আবার কারাগারে আশ্রয় নিলেন।

মাদ্রাজে যখন স্বরাজ্য-দল পুনরুজ্জীবিত করার কথা উঠে, তার কিছু পরে অন্যান্য প্রদেশেও এ সম্পর্কে আলোচনা সুরু হয়। কতিপয় বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা ও কর্ম্মী পরবর্ত্তী ৩১শে মার্চ্চ (১৯৩৪) দিল্লীতে একটি বৈঠকে সমবেত হন। বৈঠকের সভাপতিত্ব করেন ডাঃ মহম্মদ আলী আন্সারী। এখানে স্মরণীয় যে, ডাঃ আন্সারী পূর্ব্বে 'নো-চেঞ্জার' বা পরিবর্ত্তন-বিরোধীদের অন্যতম নেতা ছিলেন ও পরিষদে সদস্য প্রেরণের বিরোধী ছিলেন। বৈঠক প্রথমেই এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গ্রহণ করলেন যে, যে সকল কংগ্রেসসেবী ব্যক্তিগত আইন-লঙ্ঘনে অপারগ তাঁরা যাতে নির্ব্বাচকমণ্ডলীতে প্রচারকার্য্য চালাতে সক্ষম হন ও গঠনমূলক কার্য্যে সাহায্য করতে পারেন এজন্য নিখিল-ভারত স্বরাজ্য-দল পুনরুজ্জীবিত করা হোক্। বৈঠকে আরও স্থির হ'ল, ভারতীয় ব্যবস্থা-

পরিষদের ভাবী নির্ব্বাচনে সদস্য পদ প্রার্থী হওয়া তাঁদের কর্ত্তব্য ও দুটি বিষয় নির্ব্বাচনের অন্যতম উদ্দেশ্য রূপে গণ্য হওয়া বিধেয়—(১) সকল প্রকার দমন-নীতি মূলক আইন প্রত্যাহার ও (২) হোয়াইট পেপারের প্রস্তাবসমূহ প্রত্যাখ্যান ক'রে তথাকথিত গোলটেবিল বৈঠকে মহাত্মা গান্ধী যে জাতীয় দাবি উত্থাপন করেছেন তা গ্রহণ। দিল্লী-বৈঠকের তরফে অবিলম্বে ডাঃ আন্সারী, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই বিহারে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও তাঁকে সিদ্ধান্তগুলি জানান। মহাত্মা গান্ধীও আইন-অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখার বিষয় ইতিপূর্ব্বেই আলোচনা করেছিলেন। দিল্লী-বৈঠকের সিদ্ধান্ত জেনে ৭ই এপ্রিল তারিখে তিনি এক দীর্ঘ বিবৃতি প্রকাশ করলেন। এর ভিতরে তিনি এই মর্ম্মে লিখলেন, 'স্বরাজ লাভের জন্য (কোন নির্দ্দিষ্ট অভিযোগের প্রতিকারের জন্য নয়) আরব্ধ আইন-অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখাই এখন কর্ত্তব্য। কংগ্রেসসেবিগণ যেন শুধু আমার উপরই এর ভার ছেড়ে দেন।' গান্ধীজী বিবৃতিতে জাতিগঠনমূলক কর্ম্মপদ্ধতির অনুসরণের উপর বিশেষ জোর দেন।

পরবর্ত্তী ২রা ও ৩রা মে (১৯৩৪) রাঁচিতে কংগ্রেসসেবীদের একটি বড় বৈঠক হয়। বৈঠকে দিল্লীর প্রস্তাবগুলি গৃহীত হ'ল ও ভারতীয় শাসনতন্ত্র রচনার জন্য কন্‌ষ্টিটিউয়েণ্ট এসেম্ব্‌লী বা গণপরিষদ আহ্বানের কথা হ'ল। গণপরিষদের সভ্যগণ পৃথক নির্ব্বাচনের ভিত্তিতে সাবালক নর-নারীর ভোটে নির্ব্বাচিত হবেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় স্বতন্ত্র স্বরাজ্য-দল গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বলেন, কংগ্রেসই উক্ত প্রস্তাব অনুযায়ী কার্য্য পরিচালনা করলে অধিকতর সুফল পাওয়া যাবে।

পাটনায় পরবর্ত্তী ১৮ই ও ১৯শে মে মালবীয়জীর সভাপতিত্বে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হ'ল। আইন-অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখা সম্পর্কে মহাত্মাজীর অনুরোধ সমর্থন ক'রে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। গান্ধীজী স্বয়ং প্রস্তাব করেন যে, যাঁরা কৌন্সিল-প্রবেশে বিশ্বাসী তাঁদের বিষয় বিবেচনা করে, আপাততঃ কৌন্সিল প্রোগ্রাম (নির্ব্বাচন ব্যবস্থাপরিষদে অবলম্বনীয় নীতি-নির্ণয় প্রভৃতি) পরিচালনার জন্য পঁচিশ জন সদস্য নিয়ে ডাঃ আন্সারীর সভাপতিত্বে একটি পার্লামেণ্টারী বোর্ড গঠন করা হোক্। তিনি ও পণ্ডিত

মালবীয়জী মিলে এই বোর্ড গঠন করবেন। আনে মহাশয়ের সমর্থনে প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। পৃথক স্বরাজ্য-দলের পরিবর্ত্তে, কংগ্রেস পক্ষ থেকে কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ড গঠিত হ'ল।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, একদল কংগ্রেসসেবী—যাঁদের ভিতর যুবকেরাই সংখ্যাধিক্য—গান্ধীবাদের বা গান্ধীজী পরিচালিত কার্য্যে ক্রমে ক্রমে আস্থা হারাতে থাকেন। তাঁদের মুখপাত্রগণ কমিটিতে আইন-অমান্য স্থগিত রাখার ও কৌন্সিল প্রবেশ-নীতির প্রবল বিরোধিতা করেন। গান্ধীবাদ বিরোধীরা কংগ্রেসের ভিতর থেকেই একটি নিজস্ব দল বা সঙ্ঘ গঠনের জন্য ১৭ই মে পাটনায় একটি বৈঠকে সম্মিলিত হন। প্রসিদ্ধ কংগ্রেসসেবী আচার্য্য নরেন্দ্র দেব বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। বৈঠকে এ দল নিজেদের সোশ্যালিষ্ট বা সমাজতন্ত্রী ব'লে আখ্যা দিলেন। দলের নিয়মতন্ত্র গঠনের ভার একটি কমিটির উপর দেওয়া হ'ল। পরবর্ত্তী অক্টোবর মাসে বোম্বাই কংগ্রেসের সময় সমাজ-তন্ত্রীদের এক সম্মেলন হয় ও সমাজতন্ত্রমূলক একটি কর্ম্মনীতি তাঁরা গ্রহণ করেন। তদবধি তাঁরা এই নীতি অনুসারেই কার্য্য পরিচালনা করেন।

নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটিতে যখন আইন-অমান্য স্থগিত রাখার প্রস্তাব গৃহীত হ'ল তখন সরকারের পক্ষে দমন-নীতি অনুসরণের বিশেষ কোন হেতু রইল না। তাঁরা ১২ই জুন তারিখে অধিকাংশ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের উপর থেকেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করলেন। কিন্তু উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান এবং বাংলা ও গুজরাটেরও বহু প্রতিষ্ঠান এ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হ'ল। হিন্দুস্থানী সেবাদলের উপর থেকেও নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হ'ল না। যে সব ব্রিটিশ প্রজা আইন-অমান্যের সময় মিত্ররাজ্যে আশ্রয় নিয়েছিল তাদের অনেককে নিজ বাসস্থানে ফিরে আসতেও দেওয়া হ'ল না। তবে রাজবন্দীদের অধিকাংশই মুক্ত হলেন। সর্দার বল্লভভাই পটেল মুক্তিলাভ করেন ১৪ই জুলাই তারিখে। আবদুল গফ্ফর খাঁ আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহে কারামুক্ত হন।

বিভিন্ন প্রদেশে নূতন ক'রে কংগ্রেস কমিটি গঠিত হ'তে লাগল। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনও আবার সুরু হ'ল। ১২ই, ১৩ই জুন ওয়ার্ধায় ও ১৭ই, ১৮ই জুন বোম্বাইয়ে কমিটির অধিবেশন হয়। কমিটি জাতিগঠন-মূলক

কার্য্যে মন দিলেন বেশী ক'রে। শেষোক্ত অধিবেশনে হোয়াইট পেপার ও কম্যুন্যাল এওয়ার্ড বা সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গৃহীত হ'ল। কর্তৃপক্ষের প্রস্তাবিত ভাবী শাসন-নীতির বিরুদ্ধে সকলেই একমত। তাঁরা এর পরিবর্ত্তে গণপরিষদের দ্বারাই শাসনতন্ত্র রচনা করিয়ে নিতে চান, কিন্তু সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে একদিকে মালবীয়জী ও আনে মহাশয় এবং অন্যদিকে ওয়ার্কিং কমিটির মধ্যে মতান্তর দেখা দিল। পৃথক নির্ব্বাচনের ভিত্তিতে রচিত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা (অবশ্য পুণা চুক্তিতে আংশিক সংশোধিত) জাতির সংহতির পক্ষে নিতান্তই ক্ষতিকর। ওয়ার্কিং কমিটি একথা স্বীকার করলেও যেহেতু বিভিন্ন সম্প্রদায় একে বর্ত্তমানে মেনে নিয়েছে; সেজন্য 'না গ্রহণ না বর্জ্জন' ("neither accept nor reject") নীতি অনুসরণ করাই সমীচীন—এরূপ মত ব্যক্ত করলেন। মালবীয়জী ও আনে মহাশয় সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাকে চিরতরে বর্জ্জনেরই পক্ষপাতী। পরবর্ত্তী অধিবেশনে (২৭শে জুলাই) মত-বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা হ'ল, কিন্তু তাতে কোন ফল হ'ল না। আনে মহাশয় ওয়ার্কিং কমিটি ও মালবীয়জী কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ডের সদস্য পদ ত্যাগ করলেন। তাঁরা অতঃপর ১৮ই ও ১৯শে আগষ্ট (১৯৩৪) তাঁদের মতানুবর্ত্তীদের নিয়ে কলকাতায় একটি বৈঠকের অনুষ্ঠান করেন। বৈঠক কংগ্রেসকে ঐ মত বর্জ্জনের জন্য অনুরোধ জানান। তবে ইতিমধ্যেই উক্ত মত প্রচারের জন্য ও ব্যবস্থাপরিষদে সদস্য নির্ব্বাচন কল্পে কংগ্রেস নেশনালিষ্ট পার্টি বা কংগ্রেস জাতীয় দল নামে এক সঙ্ঘ গঠিত হ'ল। তাঁরা দেশময় সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাতে থাকেন। ওয়ার্ধায় ২৫শে সেপ্টেম্বর ওয়ার্কিং কমিটির আর এক অধিবেশন হয়। কমিটি বিভিন্ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে এই অনুরোধ জানান, তাঁরা যেন কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ডের মনোনীত প্রার্থীদেরই সমর্থন করেন। তাঁরা এরূপ মতও ব্যক্ত করেন যে, পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় ও মাধব শ্রীহরি আনে যে যে কেন্দ্রে সদস্য প্রার্থী হবেন সেখানে প্রতিযোগী সদস্য দাঁড় করাতে তাঁরা অনিচ্ছুক।

কংগ্রেস এখন আর বে-আইনী নয়। কাজেই এবারে নির্ব্বিঘ্নে ২৬শে—২৮শে অক্টোবর (১৯৩৪) তারিখে বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশন হ'ল। বোম্বাইয়ের জনপ্রিয় নেতা পার্শী সম্প্রদায়ভুক্ত কে. এফ্. নরীম্যান

অভ্যার্থনা-সমিতির সভাপতি ও বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ মূল সভাপতি হলেন। এবারকার কংগ্রেসের প্রধান আলোচ্য বিষয় হ'ল—কর্ত্তৃপক্ষের শাসনসংস্কারমূলক প্রস্তাব ও সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে। মালবীয়জী, আনে প্রমুখ নেতৃবৃন্দের বিপক্ষতা সত্ত্বেও ওয়ার্কিং কমিটির পূর্ব্ব ধরণের প্রস্তাবই কংগ্রেসে গৃহীত হ'ল। এবারকার অধিবেশনে আরও কয়েকটি প্রধান প্রস্তাব গৃহীত হয়। পল্লীর কুটীর শিল্প-মৃত বা মরণোন্মুখ। এর উন্নতির জন্য ও রক্ষা কল্পে কংগ্রেস 'নিখিল-ভারত গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘ' গঠনের প্রস্তাব করেন। আর একটি প্রস্তাবে কংগ্রেসের নিয়মতন্ত্র বহুলাংশে পরিবর্ত্তিত হয়। গান্ধীজী যে বিবৃতিতে আইন-অমান্য স্থগিত রাখার প্রস্তাব করেন তাতে কংগ্রেসের দুর্নীতি দূর করাবও কতকগুলি নির্দ্দেশ দেন। তিনি এই নূতন নিয়মতন্ত্র রচনা ক'রে প্রকাশ্য অধিবেশনে স্বয়ং তা উত্থাপন করেন। এই নিয়মতন্ত্রে কংগ্রেসের প্রতিনিধি সংখ্যা গ্রাম পক্ষে ১, ৪৮৯ ও শহর পক্ষে ৫১১, একুনে ২,০০০ নির্দ্ধারিত হয়। প্রত্যেক প্রদেশের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়েই প্রত্যেক প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি গঠিত হবে, তারা নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটিতে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক প্রতিনিধি নির্ব্বাচন ক'রে পাঠাবেন। কংগ্রেসের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ অধিবেশনের পূর্ব্বেই ভোট দিয়ে কংগ্রেস সভাপতি নির্ব্বাচন করবেন। ওয়ার্কিং কমিটি, নিখিল-ভারত ও প্রাদেশিক কমিটিগুলির আয়ুষ্কাল এক বছর। সভাপতি স্বয়ং ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মনোনয়নের ক্ষমতা লাভ করেন। মহাত্মা গান্ধীর নির্দ্দেশে আইন-কানুন পরিবর্ত্তিত হ'ল বটে, কিন্তু এ সময় হ'তে তিনি স্বয়ং কংগ্রেস থেকে অবসর গ্রহণ করলেন। তিনি অতঃপর কংগ্রেসের সাধারণ চার আনার সদস্যও রইলেন না!

অধিবেশনের পরেই সর্ব্বত্র নির্ব্বাচনী প্রচার কার্য্য আরম্ভ হ'ল। বলা বাহুল্য, নির্ব্বাচনে কংগ্রেসই অধিকাংশ কেন্দ্রে জয়লাভ করলেন ও পরিষদে সংখ্যাধিক্য দল ব'লে পরিগণিত হলেন। কংগ্রেস জাতীয় দলেরও কয়েকজন সদস্য নির্ব্বাচিত হন। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায় বাংলা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত, পুণা চুক্তিতেও স-বর্ণ হিন্দুদের প্রতি সুবিচার করা হয় নি। এজন্য এখানে কংগ্রেস বোর্ডের বিরুদ্ধে জনমত খুবই তীব্র হ'য়ে উঠে। সুতরাং বাংলা থেকে নেশন্যালিষ্ট বা জাতীয় দলের মনোনীত প্রার্থীরা সকলেই কেন্দ্রীয় পরিষদে

সদস্য নির্ব্বাচিত হলেন। শরৎচন্দ্র বসু কলকাতা কেন্দ্র থেকে অন্তরিত অবস্থায় বিনা বাধায় নির্ব্বাচিত হন। দুঃখের বিষয়, একনিষ্ঠ দেশসেবক বীরেন্দ্রনাথ শাসমল মহাশয় নির্ব্বাচনের অব্যবহিত পরেই মারা যান। তিনিও কংগ্রেস জাতীয় দলের মনোনীত প্রার্থী ছিলেন ও বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করেন। কংগ্রেস পক্ষে মনোনীত যুক্তপ্রদেশের সেরওয়ানী ও মধ্যপ্রদেশের অভয়ঙ্করও নির্ব্বাচনের অল্পকাল পরে দেহান্তরিত হন।

পূর্ব্বেকার স্বরাজ্য দলের মত এবারেও কংগ্রেস দল অন্যান্য প্রগতিশীল দলের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে নানা প্রস্তাবে সরকারকে হারিয়ে দেন। শরৎচন্দ্র বসুকে মুক্তিদান, সীমান্তের খোদাই খিদমতগার বাহিনীর উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্য চুক্তি নাকচ প্রভৃতি বিষয়ে কংগ্রেস ও অন্যান্য বে-সরকারী দলগুলি জয়লাভ করেন। ইতিমধ্যে আর একটি প্রস্তাবেও কংগ্রেসের জিত না হ'লেও গবর্ণমেণ্টের হার হ'ল। হোয়াইট পেপারের প্রস্তাবগুলি বিবেচনার জন্য হাউস্ অফ্ লর্ডস্ ও হাউস্ অফ্ কমন্সের যুগ্ম কমিটি বসে। এই কমিটির রিপোর্ট জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারী কমিটি রিপোর্ট নামে পরিচিত। এই সময় কমিটির রিপোর্ট বের হয়। মিঃ জিন্না রিপোর্টে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার সমর্থনে, প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় (ফেডার‍্যাল) শাসন-সংস্কার ব্যবস্থার প্রতিবাদে তিন অংশে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কংগ্রেস ও জাতীয় দলের বিরোধিতা সত্ত্বেও গবর্ণমেণ্টের সমর্থন লাভে প্রথম অংশ এবং উক্ত উভয় দলের সমর্থনে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশ পরিষদে গৃহীত হ'ল।

কংগ্রেস সত্যাগ্রহ প্রচেষ্টা স্থগিত রাখলেন, ব্যবস্থাপরিষদেও দমন-নীতির নিন্দামূলক একাধিক প্রস্তাব গৃহীত হ'ল, জনমতও এর ঘোরতর বিরোধী, কিন্তু সরকার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করলেন না। বাংলা ও সীমান্তের বহু কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান বে-আইনীই রয়ে গেল, নেতৃবর্গও স্থানে স্থানে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হ'তে লাগলেন। খাঁ আব্দুল গফ্ফর খাঁ বোম্বাই শহরে একটি খ্রীষ্টান সভায় সীমান্তের কংগ্রেস আন্দোলন সম্বন্ধে বক্তৃতা করায় দু' বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। পঞ্জাবেও ডাঃ সত্যপালের এক বছরের কারাদণ্ড হ'ল। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্রু তখন জেলে। সুভাষচন্দ্র বসু ১৯৩৪, ডিসেম্বর মাসে পিতার অসুখ দেখতে এসে তাঁর শ্রাদ্ধ কাল পর্য্যন্তই মাত্র ভারতবর্ষে থাকবার

অনুমতি পান। তাঁকে আবার ইউরোপে যেতে হয়। ১৯৩৫, ২১শে মে কোয়েটায় ভীষণ ভূমিকম্প হ'ল ও বিস্তর ধন-প্রাণ বিনষ্ট হ'ল। তখনও কংগ্রেসকে সেবার সুযোগ দেওয়া হ'ল না। কংগ্রেস সভাপতি বাবু রাজেন্দ্র-প্রসাদ, এমন কি মহাত্মা গান্ধী পর্য্যন্ত কোয়েটা গমনের অনুমতি পান নি। তাঁরা কংগ্রেস তরফে দূরে থেকেই দুর্গতদের জন্য সাহায্যের ব্যবস্থা করতে লাগলেন। ব্যাপক আইন-অমান্য স্থগিতের এক বছর পরেও কংগ্রেসের উপর গবর্ণমেণ্টের মনোভাব যে মোটেই অনুকূল হয় নি এসব ব্যাপারে তাই সকলে বুঝলে।

জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারী কমিটি রিপোর্টের কথা আগে উল্লেখ করেছি। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এর বিরুদ্ধে ৭ই ফেব্রুয়ারী নিখিল-ভারত প্রতিবাদ দিবসের অনুষ্ঠান করেন বিরুদ্ধ প্রতিবাদ সত্ত্বেও রিপোর্টের ভিত্তিতে আইনের খসড়া রচিত হয় এবং পার্লামেণ্টে যথারীতি আইনরূপে বিধিবদ্ধ হ'যে পরবর্ত্তী ২রা আগষ্ট রাজ-স্বাক্ষর লাভ করে। এ আইনটি 'গবর্ণমেণ্ট অফ্ ইণ্ডিয়া এক্ট, ১৯৩৫' বা 'ভারত-শাসন আইন, ১৯৩৫' নামে পরিচিত। এ আইন অনুসারেই ১৯৩৭, ১লা এপ্রিল প্রদেশসমূহে নূতন শাসন-বিধি প্রবর্ত্তিত হয়।

ভারত-শাসন আইন স্থূলতঃ দু' ভাগে বিভক্ত—(১) নিখিল-ভারতীয় বা ফেডারাল, (২) প্রাদেশিক। প্রথম অংশে এই সর্ব্বপ্রথম ব্রিটিশ ভারত ও রাজন্য ভারত এই দু' খণ্ড জোড়া দিয়ে একটি ফেডারেশন বা অখণ্ড সম্মিলিত রাষ্ট্র গঠনের আয়োজন হয়। এই অংশ সম্বন্ধে বিস্তর বাদানুবাদ হয়েছে। ভারতবাসী জনসাধারণ ও ভারতীয় নেতৃবর্গ একটি অখণ্ড ভারত-গবর্ণমেণ্ট গঠনের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু যেভাবে ফেডারেশন গঠনের ব্যবস্থা হয়েছিল তাতে প্রায় সকলেরই ঘোরতর আপত্তি। আপত্তির একটি প্রধান কারণ—ব্রিটিশ ভারতের অধিবাসীদের মত রাজন্য-ভারতের অধিবাসীদের মৌলিক রাষ্ট্রীয় অধিকার ও দেশ শাসনে দায়িত্ব স্বীকৃত হয় নি। কংগ্রেস প্রথমে রাজন্য-ভারতের প্রতি বিশেষ কোন দৃষ্টি দেন নি। ১৯৩৫ সালে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি রাজন্য-ভারতে জনগণের মৌলিক অধিকার স্বীকৃত ও দায়িত্বপূর্ণ শাসন প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা না হ'লে আন্দোলন চালান আবশ্যক এরূপ মন্তব্য ক'রে এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তদবধি বিভিন্ন মিত্ররাজ্যে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত

হয়েছিল। জনগণ দায়িত্বপূর্ণ শাসনলাভের জন্য আন্দোলন চালাতে তৎপর হয়। ঐ অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদে রাজন্যবর্গ বা তাঁদের প্রতিনিধিরাই সভ্য হ'তে পারবেন, জণগণের প্রতিনিধিরা সভ্য হ'তে পারবেন না! অধিকন্তু, রাজন্য-বর্গের প্রতিনিধি সংখ্যাও হ'ল অতিরিক্ত। এরূপ প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থায় কংগ্রেস কোন মতেই সায় দিতে পারেন না ব'লে মত প্রকাশ করেন।

ফেডারেশন অংশে পার্লামেণ্ট দু' ভাগে বিভক্ত—কৌন্সিল অফ্ ষ্টেট বা রাষ্ট্রীয় পরিষদ ও ফেডার‍্যাল এসেম্ব্লী বা সম্মিলিত ব্যবস্থাপরিষদ। প্রথমটিতে ব্রিটিশ ভারতের পক্ষে সদস্য ১৫৬, রাজন্য-ভারতের পক্ষে ১০৪। কৌন্সিল স্থায়ী সভা, তবে প্রতি তিন বছর অন্তর এক-তৃতীয়াংশ সভ্য নূতন ক'রে নির্ব্বাচিত হবেন। দ্বিতীয়টিতে ব্রিটিশ ভারতের পক্ষে সদস্য থাকবেন ২৫০ জন ও রাজন্য-ভারতের পক্ষে ১২৫ জন। এর আয়ুষ্কাল হবে পাঁচ বছর। পৃথক নির্ব্বাচনের ভিত্তিতেই ব্রিটিশ ভারতীয় প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হবেন, আর মোটের উপর এক-তৃতীয়াংশ হবেন মুসলমান। রাজস্বের আশী ভাগ সংরক্ষিত থাকবে। বড়লাট তাঁর পরামর্শদাতাদের মত নিয়ে নিজ দায়িত্বে এই অংশ ব্যয় করবেন। দেশ-রক্ষা, পররাষ্ট্র-নীতি, খ্রীষ্টান যাজকবিভাগ প্রভৃতি তিনি নিজ হস্তে রাখবেন। এসবের ব্যয়, সিবিল সার্বিসের বেতন, রেলওয়ের ব্যয় সবই সংরক্ষিত বিষয়-সমূহের অঙ্গীভূত। স্বতন্ত্র রেলওয়ে বোর্ডের উপর রেলওয়ে সংক্রান্ত সব বিষয় ছেড়ে দেওয়া হ'ল। এর উপর ব্যবস্থাপরিষদের কোন হাত থাকবে না। বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানেরও বিশেষ সুবিধা ক'রে দেওয়া হয়। কয়েক বছরের মধ্যে ভারতবর্ষে 'ইণ্ডিয়া লিমিটেড' নামক বহুসংখ্যক ব্যবসায় ও শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। ভারত-শাসন আইনে এসব নিরঙ্কুশ। কেন্দ্রীয় রাজস্বের বাকী কুড়ি ভাগ মাত্র মন্ত্রীদের হস্তে অর্পিত হয়েছিল।

প্রাদেশিক অংশে ব্রিটিশ ভারতবর্ষকে এগারটি গবর্ণর শাসিত প্রদেশে বিভক্ত করা হয়—মাদ্রাজ, বোম্বাই, বাংলা, যুক্তপ্রদেশ, পঞ্জাব, বিহার, মধ্য-প্রদেশ ও বেরার, আসাম, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, উড়িষ্যা, সিন্ধু। এডেন ও ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ থেকে স্বতন্ত্র করা হ'ল। উক্ত প্রদেশগুলির মধ্যে মাদ্রাজ, বোম্বাই, বাংলা, যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও আসামে দুটি ক'রে ব্যবস্থাপক সভা। প্রাদেশিক লেজিস্‌লেটিভ এসেম্ব্লী বা ব্যবস্থাপরিষদের আয়ুষ্কাল পাঁচ বছর;

লেজিস্লেটিভ কৌন্সিল বা ব্যবস্থাপক সভা স্থায়ী সভা, মাত্র এক-তৃতীয়াংশ সদস্য প্রতি তিন বছর অন্তর নূতন ক'রে নির্ব্বাচিত হবেন। এবারে নিম্ন পরিষদে গবর্ণমেন্টের সদস্য মনোনয়ন প্রথা রহিত হ'ল। গণতন্ত্র রীতি অনুযায়ী সংখ্যা-গরিষ্ঠ দল থেকে মন্ত্রীসভা গঠনের কথা হয়। মন্ত্রীসভা প্রাদেশিক রাজস্বের অধিকাংশই ব্যয় করার ক্ষমতা পান। ব্যবস্থপরিষদের নিকট মন্ত্রীসভাকে সম্পূর্ণরূপে দায়ী করা হ'ল। আয়-ব্যয়, কর-স্থাপন ও কর-বিলোপ এসবের ক্ষমতা ব্যবস্থাপরিষদ লাভ করলেন। তবে সকল বিষয়েই গবর্ণরের ক্ষমতা হ'ল অপরিসীম। আপৎকালে মন্ত্রীসভা ব্যতিরেকেও তিনি শাসন কার্য্য পরিচালনার ক্ষমতা লাভ করলেন। বড়লাট ও প্রাদেশিক লাটদের পূর্ব্বের ন্যায় অর্ডিন্যান্স জারী করারও সুবিধা দেওয়া হ'ল। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টে কর্ম্মচারী নিয়োগের জন্য পাবলিক সার্বিস কমিশন স্থাপনেরও ব্যবস্থা হয়। ডায়ার্কির আমলের অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা এবারেও স্বীকৃত হ'ল। বিভিন্ন শ্রেণী ও ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের পৃথক নির্ব্বাচন ব্যবস্থা পরপৃষ্ঠার তালিকা দৃষ্টে বুঝা যাবে।

উচ্চতন পরিষদে সদস্য সংখ্যা ধার্য্য হ'ল—মাদ্রাজে অন্যূন ৫৪ ও অনধিক ৫৬, বোম্বাইয়ে—অন্যূন ২৯ ও অনধিক ৩০, বাংলায়—অন্যূন ৬৩ ও অনধিক ৬৫, যুক্তপ্রদেশে—অন্যূন ৫৮ ও অনধিক ৬০, বিহারে—অন্যূন ২৯ ও অনধিক ৩০, আসামে—অন্যূন ২১ ও অনধিক ২২। প্রত্যেক প্রদেশে গবর্ণরগণের হস্তে কয়েকটি সদস্য পদ পূরণের ক্ষমতা রইল। এবার নির্ব্বাচক সংখ্যা হ'ল প্রায় তিন কোটি বা মোট লোকসংখ্যার শতকরা চৌদ্দ জন। ছ' আনা চৌকিদারী টেক্স দিলেই ভোটাধিকারের ক্ষমতা জন্মে। প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তি মাত্রেই ভোটাধিকার লাভ করলে।

১। প্রদেশ	২। মোট	৩। মোট (সাধারণ)	৪। সংরক্ষিত (সাধারণ)	৫। পার্ব্বত্য	৬। শিখ	৭। মুসলমান	৮। এংলো-ইণ্ডিয়ান	৯। ইউরোপীয়	১০। ভাঃ খ্রীষ্টান	১১। ব্যবসা, শিল্প ইত্যাদি	১২। জমিদার	১৩। বিশ্ব-বিদ্যালয়	১৪। শ্রমিক	১৫। সাধারণ (নারী)	১৬। শিখ (নারী)	১৭। মুসলমান (নারী)	১৮। এংলো-ইণ্ডিয়ান (নারী)	১৯। ভারতীয় খ্রীষ্টান (নারী)
মাদ্রাজ	২১৫	১৩৬	৩০	১	—	২৮	২	৩	৮	৬	৬	১	৬	৬	—	১	—	১
বোম্বাই	১৭৫	১১৪	১৫	১	—	২৯	২	৩	৩	৭	২	১	৭	৫	—	১	—	—
বাংলা	২৫০	৭৮	৩০	—	—	১১৭	৩	১১	২	১৯	৫	২	৮	২	—	২	১	—
যুক্তপ্রদেশ	২২৮	১৪০	২০	—	—	৬৪	১	২	২	৩	৬	১	৩	৪	—	২	—	—
পাঞ্জাব	১৭৫	৪২	৮	—	৩১	৮৪	১	১	২	১	৫	১	৩	১	১	২	—	—
বিহার	১৫২	৮৬	১৫	৭	—	৩৯	১	২	১	৪	৪	১	৬	৩	—	১	—	—
মধ্যপ্রদেশ বেরার	১১২	৮৪	২০	১	—	১৪	১	১	—	২	৩	১	২	৩	—	—	—	—
আসাম	১০৮	৪৭	৭	৯	—	৩৪	—	১	১	১১	—	—	৪	১	—	—	—	—
উঃ-পঃ সীমান্ত প্রদেশ	৫০	৯	—	—	৩	৩৬	—	—	—	—	২	—	—	—	—	—	—	—
উড়িষ্যা	৬০	৪৪	৬	৫	—	৪	—	—	১	১	২	—	১	২	—	—	—	—
সিন্ধু	৬০	১৮	—	—	—	৩৩	—	২	—	২	২	—	১	১	—	১	—	—

নূতন পথে

(১৯৩৬—১৯৩৯)

সরকারী দমন-নীতি, বিশ্বব্যাপী মন্দা, কৃষি দ্রব্যের মূল্য হ্রাস ও সাধারণের অর্থকষ্ট প্রভৃতি নানা কারণে দেশবাসীর মনে অবসাদের ছায়া এসে পড়ে। এ সময় নূতন কিছু অবলম্বন জাতির পক্ষে একান্ত আবশ্যক। শাসন-তন্ত্রের সমালোচনা ও নিন্দায় ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান মুখর। কংগ্রেস, মোস্‌লেম লীগ, উদারনৈতিক সঙ্ঘ প্রভৃতি সকলেই এর উপর বিরূপ। তথাপি এর দ্বারা জাতির ভাগ্য বদল হ'তে পারে কি না তার পরীক্ষার জন্য সকলেই যেন খানিকটা উদ্‌গ্রীব। এই অবস্থার মধ্যে আমরা এখন ১৯৩৬ সালে উপনীত হলাম।

কিন্তু আর একটি বিষয়ও এসময় ভারতবাসীকে অতিমাত্রায় সজাগ ক'রে তোলে। ইটালীর আবিসিনিয়া অভিযান তখনও শেষ হয় নি। দুর্ব্বল ও পরাধীন জাতিগুলি ডিক্টেটর মুসোলিনীর সাম্রাজ্য স্পৃহা দেখে হতভম্ব হ'ল। ইটালীর এই অভিযান ইউরোপীয় রাজনীতিরও পট পরিবর্ত্তন ক'রে দেয় সম্পূর্ণ ভাবে। ভেের্সাই সন্ধির পর ফ্রান্স ইটালীর প্রতি ও ব্রিটেন জার্ম্মাণীর প্রতি সুপ্রসন্ন হয়। মুসোলিনীর ফাসিষ্ট নীতি ইটালীতে সুপ্রতিষ্ঠ হবার পরই এরই অনুকরণে হিটলার জার্ম্মাণীতে নাৎসীবাদ চালু করেন ও নিজ ইচ্ছামত গবর্ণমেণ্ট পরিচালনা করতে থাকেন। কিন্তু ব্রিটেন ও ফ্রান্সের স্বার্থের খাতিরে জার্ম্মাণী ও ইটালীর মধ্যে ঈর্ষা-দ্বন্দ্ব এতকাল জীইয়ে রাখা হয়। মুসোলিনীর সাম্রাজ্য-স্পৃহা যখন প্রকাশ পেল তার পর থেকে ব্রিটেন, ফ্রান্স উভয়ই তার বিরোধিতা করতে সুরু করে। তারা মুসোলিনীকে রাষ্ট্রসঙ্ঘ মারফত আর্থিক অবরোধের হুমকি দেখায়, কিন্তু কার্য্যতঃ বিশেষ কিছু করে নি; মুসোলিনী আবিসিনিয়া অধিকারই করলেন শেষ পর্য্যন্ত। তবে এতে ফল হ'ল এই যে, মুসোলিনী অতঃপর এদের উপরে আর নির্ভর না ক'রে হিটলারের দিকেই মুখ ফেরালেন।

হিটলারেরও উদ্দেশ্য মুসোলিনীর মত, তাই নূতন অবস্থার সুযোগ নিয়ে তিনি কালবিলম্ব না ক'রে মুসোলিনীর সঙ্গে সন্ধি করলেন। নূতন রাষ্ট্র অষ্ট্রিয়ায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে হিটলার ও মুসোলিনীর মধ্যে পূর্ব্বে মনান্তর ঘটে। এবার মুসোলিনীরই আগ্রহাতিশয়ে অষ্ট্রিয়া ও জার্ম্মাণীর মধ্যে সন্ধি নিষ্পন্ন হ'ল। অষ্ট্রিয়ার পক্ষে এই সন্ধি কিরূপ কাল হয়েছে তা সকলেই জানেন। অতঃপর মুসোলিনী ও হিটলারের মধ্যে আঁতাত ক্রমেই ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠে। সুতরাং বলা যায়, পরবর্ত্তী ইউরোপীয় প্রলয় কাণ্ডের সূত্রপাত প্রকৃত প্রস্তাবে ইটালীর আবিসিনিয়া অভিযানের মধ্যেই নিহিত ছিল।

মুসোলিনীর আবিসিনিয়া অভিযানে ভারতবাসীর উপরও তার প্রতিক্রিয়া হ'ল খুব। উচ্চ রাজনৈতিক আদর্শ ও নীতির দিক দিয়ে ভারতবাসীর পক্ষে এর প্রতিবাদ করা ত নিতান্তই স্বাভাবিক, কিন্তু ইটালীর আবিসিনিয়া বিজয়ের ফলে তাকে ক্ষতিগ্রস্তও হ'তে হয়। আবিসিনিয়ায় যেসব ভারতবাসী ব্যবসায় ও শিল্প কর্ম্মে লিপ্ত ছিল এর ফলে তাদের অবস্থা বিপর্য্যয় ঘটল। যুদ্ধ শেষে তাদের আবিসিনিয়া থেকে একরূপ রিক্ত হস্তেই স্বদেশে ফিরে আসতে হয়। কংগ্রেস তাই জনমতের প্রতিভূস্বরূপ উচ্চ আদর্শ এবং স্বার্থ উভয় দিক দিয়েই ইটালীর আবিসিনিয়া অভিযানের প্রতিবাদ করতে বাধ্য হন।

১৯৩৫ সালে কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশন হয় নি। ১৯৩৬, ১২ই থেকে ১৪ই এপ্রিল লক্ষ্ণৌয়ে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হলেন ডক্টর ভগবান দাসের পুত্র শ্রীপ্রকাশ। সভাপতি নির্ব্বাচনের মধ্যে কিঞ্চিৎ নূতনত্ব ছিল। এ পর্য্যন্ত যে প্রদেশে কংগ্রেসের অধিবেশন হ'ত, সে প্রদেশ থেকে কাউকে সভাপতি পদে বরণ করা হ'ত না। এবারেই প্রথম এ নিয়মের ব্যতিক্রম ক'রে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্‌রুকে সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হয়।

জবাহরলাল স্বভাবতঃই তাঁর অভিভাষণে সাম্রাজ্যবাদের কঠোর সমালোচনা করলেন। ভারতবর্ষের দারিদ্র্য ও পরাধীনতা, অন্যান্য দরিদ্র ও পরাধীন দেশের মতই, সাম্রাজ্যবাদেরই কুফল। 'সোশ্যালিজ্‌ম্' বা সমাজতন্ত্রবাদই এর একমাত্র প্রতিষেধক ব'লে জবাহরলাল মত প্রকাশ করেন। তবে কংগ্রেস সর্ব্বসাধারণের—বিভিন্ন শ্রেণীর ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, একারণ কারও ক্ষতির কারণ না হ'য়ে দরিদ্র জনসাধারণের উন্নতি বিধানই এর মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত।

তিনি কৃষক ও শ্রমিকদের উন্নতিকল্পে কংগ্রেসের সঙ্গে তাদের যোগ সাধনের কতকগুলি উপায়ও বাৎলে দিলেন। সমসাময়িক বৈদেশিক ঘটনাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখতেও তিনি ভারতবাসীকে অনুরোধ জানালেন। কংগ্রেস মঞ্চ থেকে ভারতবাসীর তরফে ভারতবর্ষের পররাষ্ট্র-নীতি নিদ্ধারণের তাগিদ এল এই প্রথম। ভারতবর্ষ কোন সাম্রাজ্যবাদী সংগ্রামে যোগ দিতে পারে না পণ্ডিত জবাহরলাল সর্ব্বপ্রথম এই ঘোষণা করলেন। তিনি শাসন-সংস্কার আইনেরও তীব্র নিন্দা করলেন।

এবারকার প্রধান প্রস্তাব শাসন-সংস্কার সম্পর্কে। শাসন-সংস্কারের বদলে ভারতবাসীদের ভিতর থেকে প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত গণ-পরিষদ বা কন্‌ষ্টিটিউয়েণ্ট এসেম্বলী গণতন্ত্রমূলক শাসন-কাঠামো রচনা করবে মূল প্রস্তাবে এই অভিমত জ্ঞাপন করা হ'ল। তবে নূতন শাসন-সংস্কার আইনানুসারে শীঘ্রই যে সাধারণ নির্ব্বাচন হবে তাতেও যোগদানের ব্যবস্থা হ'ল। এইজন্য একটি পার্লামেণ্টারী বোর্ডও গঠন করা হয়। নূতন আইনের আমলে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ সম্পর্কে মতদ্বৈধতা প্রকাশ পাওয়ায় এ বিষয়ের মীমাংসা স্থগিত থাকে। সাধারণ দেশবাসীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন হেতু গণ-সংযোগকমিটি এবারে প্রথম গঠিত হ'ল। বিভিন্ন বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগ স্থাপনের জন্য একটি পররাষ্ট্র বিভাগও এবারে খোলা হয়। পণ্ডিত জবাহরলালের নেতৃত্বে ও প্রেরণায় এ বিভাগগুলি সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত হ'তে থাকে। কংগ্রেস আবিসিনিয়ার বিপদে সহানুভূতি প্রকাশ করলেন। সুভাষচন্দ্র বসু দীর্ঘকাল প্রবাস জীবনের পর ৮ই এপ্রিল স্বদেশে ফিরে আসেন, কিন্তু বোম্বাইয়ে পদার্পণ করা মাত্রই ১৮১৮ সালের তিন আইনে আবার বন্দী হন। এর প্রতিবাদেও প্রস্তাব গৃহীত হ'ল।

জবাহরলাল সভাপতির অভিভাষণে 'সিবিল লিবার্টিজ্' বা 'ব্যক্তি স্বাধীনতা' সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, নানা আইনের বেড়াজালে, বিশেষতঃ গত কয় বছরের অর্ডিন্যান্সী শাসনের ফলে সংবাদপত্র প্রকাশ ও প্রচার, সভাসমিতির প্রতিষ্ঠা, স্বাধীন মতামত প্রকাশ প্রভৃতি আধুনিক সভ্য মানুষের অত্যাবশ্যক কর্ম্মে ভীষণ বিঘ্ন ঘটান হয়েছে। এ অধিকারগুলি ফিরিয়ে আনবার জন্য তিনি 'সিবিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন' বা 'ব্যক্তি স্বাধীনতা সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। তাঁর চেষ্টায় পরে এ সঙ্ঘ

প্রতিষ্ঠিত হয় ও বিভিন্ন প্রদেশের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এতে যোগদান করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ সঙ্ঘের সম্মানিত সভাপতি ও সরোজিনী নাইডু কর্ম্মী-সভানেত্রী হন।

এই সময়, অল্প কয়েক দিনের ব্যবধানে, দিল্লীতে নিখিল-ভারত মোস্‌লেম সম্মেলনের ষষ্ঠ অধিবেশন হয় ২৯শে মার্চ্চ তারিখে, (১৯৩৬) আর বোম্বাইয়ে নিখিল-ভারত মোস্‌লেম লীগের চতুর্বিংশ অধিবেশন হয় ১১ই ও ১২ই এপ্রিল (১৯৩৬) তারিখে। কংগ্রেসের মত উভয় সম্মেলনেই কৃষক সমাজের দুর্দশার কথা বর্ণিত হয় ও তাদের দুর্গতি দূর করার জন্য আবেদন জানান হয়। উভয় সম্মেলনই কিন্তু শাসন-সংস্কারের সুযোগ নিতে বদ্ধপরিকর। এদের ভিতরে মোস্‌লেম লীগ চরমপন্থী, কাজেই এখানে শাসন-তন্ত্রের তীব্র নিন্দা ক'রে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হ'ল। মোস্‌লেম লীগের সভাপতিত্ব করেন লক্ষ্ণৌ চীফকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি সার্ ওয়াজির হাসান। তিনি একজন প্রগতিশীল রাজনীতিক। অভিভাষণে তিনি বলেন যে, লীগের কর্ম্মাদর্শ হবে (১) সাবালক ভোটদাতাদের দ্বারা নির্ব্বাচিত সদস্যদের নিয়ে খাঁটি গণতন্ত্র-মূলক গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা, (২) দমন-নীতিমূলক আইনসমূহ প্রত্যাহার ও সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠা, সংবাদপত্র পরিচালন ও স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার দান, (৩) সত্বর কৃষক সমাজকে আর্থিক সাহায্য প্রদান, শিক্ষিত-অশিক্ষিত বেকারদের আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা ও নির্দ্দিষ্ট ন্যূনতম মজুরীতে শ্রমিকদের প্রত্যহ আট ঘণ্টা কার্য্যকাল নির্দ্ধারণ এবং (৪) অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রদান। এবারে লীগের আদর্শ স্থিরীকৃত হয় ভারতে পূর্ণ দায়িত্বশীল শাসন-তন্ত্র প্রতিষ্ঠা। লক্ষ্য কববার বিষয় যে, কর্ম্মাদর্শে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে এ সময়েও বিশেষ পার্থক্য ছিল না।

ভারতের অন্যতম জবরদস্ত বড়লাট লর্ড উইলিংডনের কার্য্যকাল এপ্রিল মাসে শেষ হয়। লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো তাঁর স্থলে অভিষিক্ত হন। লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর নিকট অপরিচিত নন। তিনি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রয়্যাল কৃষি কমিশনের সভাপতিরূপে ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেন। নূতন শাসন-তন্ত্র আইন রচনায়ও তাঁর হাত অনেকখানি, কারণ যে জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারী কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে আইনের খসড়া রচিত, তিনি ছিলেন

তার সভাপতি। নূতন আইন চালু করবার পক্ষে তিনিই যোগ্য ব্যক্তি—এই বিবেচনায় ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ তাঁকে ভারতবর্ষে পাঠান। উপযুক্ত পাত্রেই যে এ দায়িত্ব ভার অর্পিত হয়েছিল তা লর্ড লিন্‌লিথ্‌গোর পরবর্ত্তী কার্য্যকলাপে বুঝা যায়। ভারতবর্ষে পদার্পণ ক'রেই তিনি তাঁর কর্ম্মপ্রণালী সম্পর্কে এক বিবৃতি প্রদান করেন।

এর পরেই বিভিন্ন সম্প্রদায় ও শ্রেণীর মধ্যে নির্ব্বাচনের জন্য তোড়জোড় সুরু হয়। ২২শে ও ২৩শে আগষ্ট বোম্বাই শহরে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হ'ল। এ অধিবেশনের প্রধান কার্য্য হ'ল নির্ব্বাচন-পত্র (Election manifests) রচনা। যেসব উদ্দেশ্য সাধনে কংগ্রেস এযাবৎ সর্ব্বস্ব পণ করেছেন তার প্রতি দৃষ্টি রেখেই এই নির্ব্বাচন-পত্র রচিত হ'ল। দরিদ্রের দারিদ্র্য মোচনের জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন, কৃষকদের ভূমিস্বত্ব নির্ণয়, শ্রমিকদের মজুরীর নিম্নতম হার নির্দ্ধারণ, মাদক দ্রব্য নিবারণ, হরিজনদের সর্ব্বপ্রকার অসুবিধার বিলোপ সাধন প্রভৃতি কর্ম্মতালিকার অন্তর্নিহিত বিষয়। এ অধিবেশনেও মন্ত্রিত্ব গ্রহণ প্রস্তাবের আলোচনা স্থগিত রহিল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় ও জবাহরলাল নেহ্‌রুর চেষ্টায় কংগ্রেস ও কংগ্রেস জাতীয় দলের মধ্যে আপোষ-রফা হ'ল ও উভয় দলই একযোগে নির্ব্বাচন কার্য্য চালাতে অঙ্গীকৃত হলেন। কংগ্রেস কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পার্লামেণ্টারী বোর্ড গঠন ক'রে নির্ব্বাচন পরিচালনার ব্যবস্থা করেন। মোস্‌লেম লীগ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তরফেও একই ধরণের ব্যবস্থা হয়।

মহাত্মা গান্ধী অতঃপর কংগ্রেসের একজন প্রধান পরামর্শদাতারূপে কাজ করতে থাকেন। তাঁরই নির্দ্দেশে কংগ্রেসের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন শহরে না ক'রে গ্রাম অঞ্চলে করা সাব্যস্ত হয়। সাধারণ দেশবাসীদের সঙ্গে কংগ্রেসের আত্মিক যোগসাধনই তাঁর এরূপ নির্দ্দেশের মূল কারণ।

প্রথমবার এই কংগ্রেস হ'ল ১৯৩৬, ২৭শে ও ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত ফৈজপুর নামক গ্রামে। লক্ষাধিক গ্রামবাসী মাটিতে বসে নীরবে কংগ্রেসের কর্ম্মপ্রণালী অনুধাবন করছেন,—ঘণ্টার পর ঘণ্টা নেতাদের বিতর্ক ও বক্তৃতা মন দিয়ে শুনছেন—এ দৃশ্য কংগ্রেসের ইতিহাসেও সত্য-

সত্যই অভিনব! এবারেও কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করলেন পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্‌রু। ইতিপূর্ব্বে পর পর দু'বছর কেউ কংগ্রেসের সভাপতি পদে বৃত হন নি।

পণ্ডিত জবাহরলাল পূর্ব্ববারের মত এবারেও জগতে দুই বিপরীত শক্তি, সাম্রাজ্যবাদ ও ধনিকবাদ এবং গণতান্ত্রিকতা ও সমাজতান্ত্রিকতার সংঘর্ষের কথা উল্লেখ করেন ও বলেন যে, ভারতবর্ষেও এই দুই বিপরীত শক্তির ঘাত-প্রতিঘাত চলেছে। ভারতবর্ষের দুঃখ-দারিদ্র্যের সমাধানের পক্ষে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে রাষ্ট্র গঠন আবশ্যক। কিন্তু স্বাধীনতা বা দেশ শাসনে পূর্ণ আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত না হ'লে এ দু-ই অসম্ভব। কাজেই প্রথমে আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার দিকেই অবহিত হ'তে তিনি সকলকে অনুরোধ জানান। বৈদেশিক রাজনীতি তাঁর অভিভাষণের একটি প্রধান অঙ্গ। মে মাসের আরম্ভে আবিসিনিয়া ইটালীর নিকট স্বাধীন অস্তিত্ব বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হয়। এর কিছু পরে জুলাই মাসে স্পেনে অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হয় এবং ফাসিষ্ট ও সমাজতান্ত্রিক দু' দলে গলা কাটাকাটি সুরু করে। জবাহরলাল এসব বিষয় উল্লেখ ক'রে সত্যকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করেন। সীমান্ত সমস্যা, সমর আশঙ্কা, গণ-সংযোগ, কৃষকদের দুরবস্থার প্রতিকার, নির্ব্বাচন ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কে বহু প্রস্তাব কংগ্রেসে গৃহীত হ'ল। নির্ব্বাচনের পর সদস্যদের নিয়ে দিল্লীতে একটি কন্‌ভেনশন বা সম্মেলন আহ্বানেরও প্রস্তাব হয়। মন্ত্রিত্ব গ্রহণ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত এবারেও স্থগিত থাকে।

১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসেই এগারটি প্রদেশে নূতন নিয়মে নির্ব্বাচন সম্পন্ন হয়। সাধারণ লোকের উৎসাহ-উদ্দীপনার অন্ত নেই। দীর্ঘকাল পরে আবার তারা নিজ নিজ মনোভাব প্রকাশের নির্দ্দিষ্ট পথ খুঁজে পেলে। কংগ্রেস নির্ব্বাচনে যোগ দেওয়ায় তাদের উৎসাহ যেন চতুর্গুণ বেড়ে গেল। নির্ব্বাচনের শেষে সকলেই বুঝলে, জনগণের চিত্তে কংগ্রেসের আসন অটল। নির্ব্বাচনের ফলাফল কংগ্রেস তরফে হ'ল মাদ্রাজে ১৫৯, শতকরা ৭৪; বিহারে ৯৮, শতকরা ৬৫; বঙ্গে ৫৬, শতকরা ২২; মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে ৭০, শতকরা ৬২.৫; বোম্বাইয়ে ৮৬, শতকরা ৪৯; যুক্তপ্রদেশে ১৩৪, শতকরা ৫৯; পঞ্জাবে ১৮, শতকরা ১০.৫; উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ১৯, শতকরা ৩৮;

সিন্ধুতে ৭, শতকরা ১১৫; আসামে ৩৩, শতকরা ৩১; উড়িষ্যায় ৩৬, শতকরা ৬০। এগারটি প্রদেশের মধ্যে ছ'টি প্রদেশেই কংগ্রেসী সদস্তরা সংখ্যাধিক্য লাভ করলেন।

পরবর্ত্তী ১৭ই ও ১৮ই মার্চ্চ দিল্লীতে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হ'ল। মন্ত্রিত্ব গ্রহণ সম্পর্কে এবারে নির্দ্দেশ দেওয়া হ'ল যে, প্রাদেশিক লাটগণ যদি এই মর্ম্মে প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন যে তাঁরা তাঁদের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন না বা আইনানুগ শাসন সম্পর্কে মন্ত্রীদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করবেন না তা হ'লে কংগ্রেস সদস্যদের পক্ষে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ সম্ভব। প্রত্যেক প্রদেশের কংগ্রেসী দলের নেতাকে লাটসাহেবের প্রদত্ত এই প্রতিশ্রুতির কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে হবে।

ইতিমধ্যে প্রাদেশিক লাটগণ সংখ্যা-গরিষ্ঠ দলের নেতৃবৃন্দকে আহ্বান করলেন। কংগ্রেসী দলের শর্ত্ত পূরণে লাট সাহেবরা অসম্মত হওয়ায় ছ'টি প্রদেশে সংখ্যালঘু দল থেকে 'ঠিকা' মন্ত্রীসভা ১লা এপ্রিল তারিখেই গঠন করা হ'ল। আইন অনুযায়ী প্রথম ছ'মাসের আয়-ব্যয়ের ব্যবস্থার ভার প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের উপর ন্যস্ত ছিল। তাঁরা আইন অনুসারে সব ব্যবস্থা করলেন। এখানে বাংলার কথা একটু বিশেষ ভাবে বলি। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায় আড়াই শ' সদস্য পদের মধ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ব'লে হিন্দুদের দেওয়া হ'ল মাত্র আশীটি। আবার পুণা চুক্তি দ্বারা এই আশীটির মধ্যে ত্রিশটিই অনুন্নতদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। কাজেই বঙ্গের স-বর্ণ হিন্দুরা—যাঁরা এতকাল ভারতবর্ষে রাজনীতি চর্চ্চা অবিরাম ভাবে চালিয়েছেন ও যাঁদের ঐকান্তিক দুঃখভোগ ভারতের উন্নতির মূলে—এইরূপ কোণঠাসা হ'য়ে রইলেন। তথাপি কংগ্রেসী সদস্যরা (অধিকাংশই স-বর্ণ হিন্দু) নির্ব্বাচনে দল হিসাবে প্রত্যেক দলের চেয়েই সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করলেন। অন্যান্য প্রদেশের মত বঙ্গেও মুসলমানদের মধ্যে একাধিক দল। এখানে মোস্‌লেম লীগ ও কৃষক-প্রজা দলই মুসলমানের পক্ষে নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। শেষোক্ত দলের নেতা মিঃ ফজলুল হক দরিদ্র কৃষক সমাজের প্রতিভূরূপে বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে গমন ক'রে কৃষকদের সঙ্ঘবদ্ধ করেন। নানা বাধা সত্ত্বেও কৃষক-প্রজা দলের প্রায় পঞ্চাশ জন সদস্য নির্ব্বাচিত হ'তে সমর্থ হন।

নির্ব্বাচনের পর মোস্‌লেম লীগ ও কৃষক-প্রজা দলে আপোষ হয় ও পরিষদে একটি সংখ্যা-গরিষ্ঠ দল ব'লে গণ্য হয়। মিঃ ফজলুল হকের নেতৃত্বে অতঃপর মন্ত্রীসভাও গঠিত হ'ল। পরে কৃষক-প্রজা দলের কতিপয় সদস্য আলাদা হ'য়ে এর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রেখেছেন। পঞ্জাবে মুসলমান, শিখ ও হিন্দু সদস্য নিয়ে ইউনিয়নিষ্ট বা সম্মিলিত দল গঠিত হয়। কিন্তু এ দলের প্রায় সবই মুসলমান, এজন্য একে মুসলমান দলও বলা চলে। পঞ্জাবেও এই দল থেকেই মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছে। আসাম, সিন্ধু ও সীমান্ত প্রদেশেও যথারীতি মন্ত্রীসভা গঠিত হ'ল।

এগারটি প্রদেশের ভিতরে ছ'টিতেই কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণে অসম্মত হওয়ায় শাসন-তান্ত্রিক সঙ্কট উপস্থিত হ'ল। এ নিয়ে কিছুকাল আলোচনা ও বিতর্ক চলল খুব। আর এতে যোগ দিয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধী, লর্ড লোথিয়ান, ভারতসচিব লর্ড বোনাল্‌ড্‌সে, বড়লাট লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো ও প্রাদেশিক লাটগণ। বড়লাট ২১শে জুন তারিখের শেষ বিবৃতিতে এই মর্ম্মে বলেন যে, শাসন-ব্যাপারে প্রাদেশিক লাটগণ মন্ত্রীদের পরামর্শ গ্রহণ করতে আইনতঃ বাধ্য। বিশেষ দায়িত্ব সম্পর্কেও মন্ত্রীদের পরামর্শ গ্রহণ বাঞ্ছনীয়। লাট সাহেবরা যদি একান্তই কোন বিষয়ে পবামর্শ গ্রহণ না ক'রে কার্য্য করেন তা হ'লে সে দায়িত্ব তাঁদেরই। মন্ত্রীসভা যে এজন্য দায়ী নন্ তা তাঁরা প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে পারবেন। ওয়ার্কিং কমিটি বড়লাটের ব্যাখ্যা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা ক'রে ৭ই জুলাই তারিখে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের সপক্ষে মত প্রকাশ করেন। অতঃপর মাদ্রাজ, বোম্বাই, বিহার, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার এবং উড়িষ্যায় কংগ্রেসী দল মন্ত্রীসভা গঠন করলেন। সীমান্ত প্রদেশের ব্যবস্থাপরিষদে পরবর্ত্তী ৩রা সেপ্টেম্বর মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেখানেও খাঁ আবদুল গফ্‌ফর খাঁর ভ্রাতা ডাক্তার খাঁ সাহেবের নেতৃত্বে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা গঠিত হ'ল। কংগ্রেস দীর্ঘকাল গবর্ণমেণ্টের বিরোধী বা বিপক্ষ দল হিসাবে কার্য্য করেছেন। এবারে দেশ-সেবায় নূতন পথ গ্রহণ করলেন।

মুক্তিলাভের পরও আবদুল গফ্‌ফর খাঁর পঞ্জাবে ও সীমান্ত প্রদেশে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। নির্ব্বাচন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর উপরকার

সকল রকম বিধি নিষেধ তুলে নেওয়া হ'ল। বঙ্গে সুভাষচন্দ্র বসুও ১৭ই মার্চ্চ কারামুক্ত হলেন। কংগ্রেসী মন্ত্রীসভাগুলির প্রথম কার্য্য হ'ল নির্যাতিত দেশকর্ম্মীদের মুক্তিদান। তাঁরা অহিংস ও হিংসাত্মক কর্ম্মে লিপ্ত অপরাধীদের মধ্যে তারতম্য না ক'রে, নূতন ব্যবস্থা অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য, একে একে সকলকে মুক্তি দিতে লাগলেন। যুক্তপ্রদেশে কাকোরী বন্দীদেরও মুক্তি দেওয়া হ'ল। কিন্তু এর পরেই এক সঙ্কট উপস্থিত হয়। নানাস্থানে মুক্তিপ্রাপ্ত কাকোরী বন্দীরা বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হওয়ায় আমলাতন্ত্র মন্ত্রীসভার উপর বিরূপ হ'য়ে উঠল এবং হিংসাত্মক কর্ম্মে লিপ্ত অবশিষ্ট বন্দীদের মুক্তি দানে সম্মতি দিতে বিহার ও যুক্তপ্রদেশের লাটগণ অস্বীকার করলেন (ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮)। উভয় প্রদেশের মন্ত্রীসভাই এজন্য পদত্যাগ-পত্র পেশ করেন। শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু প্রাদেশিক লাটদ্বয় ও মন্ত্রীসভার মধ্যে আপোষ-রফা হয় ও বন্দীগণ একে একে কারামুক্ত হন। অন্যান্য কংগ্রেসী প্রদেশেও রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়। বোম্বাইয়ে ও গুজরাটে অসহযোগ ও আইন-লঙ্ঘন প্রচেষ্টার সময় যে সব জমি হস্তান্তরিত হয়েছিল প্রথমে আপোষে পূর্ব্ব মালিকদের তা ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়। যে সব জমি আপোষে ফিরিয়ে দেওয়া হয় নি আইন ক'রে তা প্রত্যর্পণ করার ব্যবস্থা হ'ল। বঙ্গে কংগ্রেসী প্রতিষ্ঠানগুলির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হ'ল। কিন্তু এখানকার অবস্থা অন্যান্য প্রদেশ হ'তে অনেকাংশে স্বতন্ত্র। বঙ্গে তখন অন্যূন দু' হাজার রাজবন্দী ও বহুশত রাজনৈতিক বন্দী ছিলেন। এখানে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় তাদের সত্বর মুক্তিদান আশা করা যায় না। সুতরাং মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং তাদের সম্পর্কে অনুকূল ব্যবস্থা করার ভার গ্রহণ করলেন। তিনি এ বছর অক্টোবর ও নবেম্বর মাসে, অসুস্থতা সত্ত্বেও, তিন সপ্তাহ বঙ্গে অবস্থিতি করেন ও হক-মন্ত্রীসভার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ক'রে সকল রাজবন্দী ও অধিকাংশ রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির পথ সহজ ক'রে দেন। রাজবন্দী ও রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে বিলম্ব হওয়ায় বঙ্গে খুবই বিক্ষোভ উপস্থিত হয়েছিল।

কংগ্রেসীদলের মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পর নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রথম অধিবেশন হ'ল কলকাতায় ২৯-৩১শে অক্টোবর। কমিটি মন্ত্রিত্ব

গ্রহণ সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুমোদন করলেন। ইউরোপে যেমন জার্ম্মাণী ও ইটালী, এশিয়ায় তেমনি জাপান খুবই সাম্রাজ্যলোভী হ'য়ে উঠে। এ বছর জুলাই মাসে জাপান চীন অভিযান সুরু করে, এবং ভবিষ্যতে এ কিরূপ নৃশংস ও মারাত্মক হ'য়ে উঠবে, আরম্ভেই তা সূচিত হয়। কমিটি জাপানের এই আত্মঘাতী সাম্রাজ্য-বিস্তার কার্য্যের তীব্র নিন্দা ক'রে এক প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। একটি কারণে এই অধিবেশন বাঙালীর পক্ষে বিশেষ মর্ম্মান্তিক হয়েছে। জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দেমাতরম্'-এর অঙ্গচ্ছেদের ব্যবস্থা হ'ল এ সময়। প্রকাশ, মুসলমান সমাজের মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য রেখেই কংগ্রেস এরূপ করতে বাধ্য হন।

নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের কয়েক দিন পূর্ব্বে লক্ষ্ণৌয়ে ১৫-১৮ই অক্টোবর তারিখে মোস্‌লেম লীগের পঞ্চবিংশ অধিবেশন হয়। লীগের স্থায়ী সভাপতি মিঃ মহম্মদ আলী জিন্না এবাবে সভাপতিত্ব করেন। কংগ্রেস-সভাপতি পণ্ডিত জবাহরলালের সঙ্গে মিঃ জিন্নার হিন্দু-মুসলমান মিলন সম্পর্কে আলোচনা পরিত্যক্ত হয়। সাতটি প্রদেশে কংগ্রেসী দল মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করায় লীগ নেতৃবর্গ ভীষণ অশ্বস্তি অনুভব করেন, ও বিভিন্ন প্রস্তাবে ও বক্তৃতায় তা ব্যক্ত হয়। মুসলমান নেতাদের মনোভাব পরে কিরূপ পরিবর্ত্তিত হয়েছে সে সম্বন্ধে এখানেই কিছু ব'লে রাখি।

দীর্ঘকালের সাধনায় ও সকল ধর্ম্ম, বর্ণ ও শ্রেণীর লোকের আন্তরিক সহযোগিতায় কংগ্রেস ভারতবর্ষে একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান ব'লে গণ্য হয়েছে। মিঃ জিন্না এ মতবাদ গ্রহণে রাজী নন্। তিনি কংগ্রেসকে একটি হিন্দু প্রতিষ্ঠান ব'লেই গণ্য করেন ও অহরহ এই দাবি জানান যে, মোস্‌লেম লীগই সমগ্র ভারতের মুসলমান সমাজের একমাত্র মুখপাত্র ও প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান। কংগ্রেস লীগকে এরূপ সম্মান দিতে অসম্মত হওয়ায় উভয়ের মধ্যে সমস্ত আপোষ-রফা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়েছে। অতঃপর ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে 'পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠায় লীগ বদ্ধপরিকর হ'ল। যে সব অঞ্চলে মুসলমানেরা জনসংখ্যায় অধিক সে সব অঞ্চলে স্থায়ী প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা লীগের লক্ষ্য হয়। দ্বিতীয় মহাসমরকালে লীগও অসহযোগের মনোভাব অবলম্বন করে। তবে তাঁর ছিল উদ্দেশ্য অন্যবিধ। তার মতে ভারতবর্ষে কংগ্রেস তথা হিন্দু প্রাধান্য

নিরাকৃত না হ'লে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করা অসম্ভব। তাঁদের প্রধান অভিযোগ—কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলি নাকি মুসলমানদের ওপর অযথা অত্যাচার করছেন। কংগ্রেস মন্ত্রীসভাসমূহ ও প্রাদেশিক লাটগণ একযোগে ও বিভিন্ন ভাবে এর প্রতিবাদ করলেও লীগ নেতারা অভিযোগ করা থেকে নিরস্ত হন নি।

নিখিল-ভারত হিন্দু মহাসভা কয়েক বছর যাবৎ হিন্দু স্বার্থ রক্ষা কল্পে আন্দোলন চালিয়েছেন। এবারে এর বার্ষিক অধিবেশন হ'ল ৩০শে ডিসেম্বর (১৯৩৭) থেকে ১লা জানুয়ারী (১৯৩৮) তারিখে আহ্‌মদাবাদ শহরে। বীর বিনায়ক দামোদর সভারকর হলেন এবারকার সভাপতি। সভাবকর মহাশয়ের কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে কিছু জেনেছি। তিনি আটাশ বছর নির্ব্বাসন ও অন্তরীণ জীবনযাপন ক'রে নূতন শাসন-তন্ত্রের আমলে সদ্য মুক্তিলাভ করেছেন। অখণ্ড স্বাধীন-ভারত প্রতিষ্ঠা তাঁর আদর্শ। ভারত-মাতার সেবায় জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলেরই সমান অধিকার—তিনি অভিভাষণে এই মত ব্যক্ত করেন। মোস্‌লেম লীগের মত হিন্দু মহাসভাও সক্রিয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত।

কংগ্রেসের পরবর্ত্তী অধিবেশন হ'ল ১৯শে ফেব্রুয়ারী (১৯৩৮) তারিখে গুজরাটে প্রসিদ্ধ বারডৌলী তালুকের অন্তর্গত হরিপুরা গ্রামে। এতে সভাপতিত্ব করলেন সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয়। সুভাষচন্দ্র দীর্ঘকাল ইউরোপে প্রবাস জীবন-যাপন করতে বাধ্য হন। কাজেই ইউরোপীয় রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ। ইউরোপের সঙ্কটের কথা তিনি অভিভাষণে বিশেষভাবে ব্যক্ত করেন। ফেডারেশন বা সম্মিলিত রাষ্ট্র পরিকল্পনার প্রতি প্রগতিশীল ভারতীয়দের মনোভাব এতটা বিরূপ কেন সে সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র বলেন, 'বাণিজ্য ও অর্থবিষয়ক রক্ষাকবচগুলিই এই পরিকল্পনার প্রতি আমাদের বেশী ক'রে বিদ্বিষ্ট করেছে। কেবলমাত্র দেশরক্ষা বিভাগে ও পররাষ্ট্র-নীতিতেই যে জনগণের অধিকার থাকবে না তা নয়, রাজস্বের অধিকাংশ ব্যয়ের উপর জনপ্রতিনিধির বিন্দুমাত্র কর্ত্তৃত্ব থাকবে না। যুক্তরাষ্ট্রের আমলে বড়লাট কর্ত্তৃক সংরক্ষিত অংশের জন্য রাজস্বের শতকরা আশী ভাগই ব্যয়িত হবে! এ ছাড়া, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, রেলওয়ে বোর্ড আগেই গঠিত হয়েছে। এগুলি যুক্তরাষ্ট্রের নামমাত্র অধীনে নিয়ন্ত্রিত হবে। রেল বিভাগের উপর আইন-সভার কোন কর্ত্তৃত্ব

থাকবে না। দেশের আর্থিক উন্নতির মূলকথা যে মুদ্রানীতি ও বাট্টার হার সে সব নিয়ন্ত্রণেও আইন-সভার হাত নেই। অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত বাণিজ্য-চুক্তি করার স্বাধীনতাটুকুও ভারতীয় আইন-সভাকে দেওয়া হয় নি। ভারত-শাসন আইনে বাণিজ্য সংক্রান্ত যে সব রক্ষাকবচ আছে তাতে ভারতের শিল্প-বাণিজ্য যখন ব্রিটিশ স্বার্থের প্রতিকূল হবে তখন কোনরূপ ব্যবস্থা দ্বারা ঐগুলিকে রক্ষা করা সম্ভব হবে না। যদি কখন কোন ব্রিটিশ পণ্যের উপর অতিরিক্ত আমদানী শুল্ক ধার্য্য করার বা আমদানী সম্পর্কে কড়াকড়ি ব্যবস্থা করার প্রস্তাব হয় তা হ'লে বড়লাট তা অগ্রাহ্য করতে পারবেন!"

কংগ্রেসে ফেডারেশন বা ভাবী যুক্তরাষ্ট্র বর্জ্জন সম্পর্কে প্রস্তাব গৃহীত হয়। রাষ্টপতি পরে স্বয়ং এর বিরুদ্ধে জোর আন্দোলন চালান।

সুভাষচন্দ্রের রাষ্ট্রপতি থাকা কালে একটি অত্যাবশ্যক বিষয়ে কার্য্য আরম্ভ হয়। আধুনিকতম বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্‌রু ও সুভাষচন্দ্র বসু সম্পূর্ণ একমত। তাঁরা মনে করেন, গান্ধীজী পরিকল্পিত কুটীর-শিল্প দ্বারা সমাজের উপকার হ'লেও সমগ্র জাতির ধনসম্পদ, শক্তি ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে কলকারখানার প্রতিষ্ঠা ও শিল্পদ্রব্য উৎপাদন একান্ত আবশ্যক। ইতিপূর্ব্বে ভারতের অন্যতম প্রধান বৈজ্ঞানিক ডক্টর মেঘনাদ সাহা এই বিষয়ে আলোচনা সুরু করেন। জবাহরলাল ও সুভাষচন্দ্র ইহার যুক্তিযুক্ততা স্বীকার ক'রে ১৯৩৮ সালে কংগ্রেসের আনুকূল্যে একটি নেশন্যাল প্ল্যানিং কমিটি বা জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি স্থাপন করেন। নেশন্যাল প্ল্যানিং কমিটি কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়সমূহে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ ও কয়েকটি মিত্ররাজ্যের প্রতিনিধিও কমিটিতে যোগদান করেন। কমিটির প্রথম অধিবেশন হয় ১৯৩৮, ডিসেম্বর মাসে। এর দ্বিতীয় অধিবেশন হয় ১৯৩৯ সালের ৪ঠা থেকে ১৭ই জুলাই। পরিকল্পনা কমিটির কার্য্য সাতটি প্রধান ভাগে বিভক্ত—(১) কৃষি, (২) শিল্প, (৩) বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংখ্যা ও কার্য্যক্ষমতার পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়, (৪) রাস্তাঘাট ও জিনিস-পত্র চলাচলের ব্যবস্থা, (৫) বাণিজ্য ও রাজস্ব, (৬) জনকল্যাণ, (৭) শিক্ষা। সাতটি সাব-কমিটির উপর এসব

বিষয়ের কার্য্যভার ন্যস্ত। জাতীয় জীবনের প্রত্যেকটি বিভাগ সম্বন্ধেই অনুসন্ধান ও আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ ও অধ্যাপক কে টি. শা. পরিকল্পনা কমিটির অবৈতনিক সম্পাদক ও পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্রু সভাপতি। বলা বাহুল্য, কংগ্রেসের আনুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত হ'লেও কমিটি কোন দল বিশেষের প্রতিষ্ঠান নয়। সর্ব্ব শ্রেণীর ও সর্ব্ব দলের বিশেষজ্ঞগণ নিয়েই এ গঠিত।

প্রদেশসমূহে আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় প্রতিবেশী করদ ও মিত্র রাজ্যের প্রজাদের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার উন্মেষ হয়। তালচর, ঢেনকানাল, রাজকোট, মহীশূর, হিন্দোল, জয়পুর, রণপুর, ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যসমূহে জনগণ স্বায়ত্ত-শাসনের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করে ও সর্ব্ব-প্রকার দুঃখ বরণের জন্য প্রস্তুত হয়। দেশীয় প্রজা-সম্মেলনের অধিবেশনে সমষ্টিগতভাবে স্বায়ত্ত-শাসন ও মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি হ'তে থাকে।

সম্মিলিত যুক্তরাষ্ট্র ও প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব একই সময় প্রবর্ত্তিত না হওয়ায় এর একটি কুফল অবিলম্বে সকলের দৃষ্টিগোচর হ'ল। আমরা সমগ্র ভারতের অধিবাসী—এ বোধের পরিবর্ত্তে প্রাদেশিকতাই বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিহারে বিহারী ও প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে এই সমস্যা এসময় প্রবল হ'য়ে উঠে। কংগ্রেস এ বছর এ সমস্যার এইরূপ মীমাংসা করেন—(১) ভারতের যে-কোন প্রদেশে যে-কোন ভারতীয় চাকরি পাওয়ার অধিকারী, (২) বিহারী ও বিহার-প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে কোনরূপ বৈষম্য করা হবে না, (৩) ডোমিসাইল্ড্ সার্টিফিকেট্ (বিহার-প্রবাসী প্রমাণ করার জন্য নেওয়া হ'ত) প্রথা লোপ, (৪) চাকরি প্রার্থীকে আবেদনে বিহারী বা ডোমিসাইল্ড্ উল্লেখ, (৫) কোন প্রদেশে কোন ব্যক্তি দশ বছর বাস করলেই ঐ প্রদেশে ডোমিসাইল্ড্ ব'লে গণ্য।

বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেস গবর্ণমেণ্টের সুকৃতি দেখে আসামেও জনমত কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা প্রতিষ্ঠার অনুকূল হয় ও এ বছর কংগ্রেস দলের নেতা গোপীনাথ বরদলুই অন্যান্য দলের সহযোগে কংগ্রেস কোয়ালিশন বা সম্মিলিত মন্ত্রীসভা গঠন করেন। কংগ্রেসের কার্য্যতালিকা এক ও অভিন্ন। কাজেই কংগ্রেস মন্ত্রীসভাসমূহের কার্য্যপ্রণালী সর্ব্বত্র প্রায় একই ধাঁচের হ'ল। তবে

তাঁরা প্রধানতঃ এই চারিটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে কার্য্য আরম্ভ করেন—(১) ভূমিকর ও রাজস্ব হ্রাস, (২) প্রজাকে ভূমিস্বত্ব দান, (৩) ঋণ ও বাকী খাজনার দায় থেকে প্রজাদের মুক্তি, (৪) কলকারখানার শ্রমিকদের দৈনিক আট ঘণ্টা কার্য্যকাল ও মজুরির নিম্নতম মান নির্দ্ধারণ। কংগ্রেসী প্রদেশসমূহে, এই উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে নানা আইন বিধিবদ্ধ করার চেষ্টা হয়। মাদক দ্রব্য নিবারণ কংগ্রেসের একটি প্রধান কার্য্য। এ বছর মাদ্রাজের সালেম জেলায় মাদকদ্রব্য বিক্রয় ও সেবন নিষিদ্ধ হয়। স-বর্ণ অ-বর্ণ নির্ব্বিশেষে হিন্দুদের মন্দিরে প্রবেশাধিকার দানের জন্য মাদ্রাজ মন্ত্রীসভা বিশেষ অবহিত হন। বিহার ও যুক্তপ্রদেশে মন্ত্রীসভার আনুকূল্যে প্রাপ্তবয়স্ক নিরক্ষর লোকদের শিক্ষাদান প্রচেষ্টার সূত্রপাত হয়। এই উপলক্ষ্যে বিহারের শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর সৈয়দ মাহ্‌মুদের কার্য্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গবর্ণমেণ্ট ও শিক্ষিত সাধারণ উভয়েই এ বিষয়ে অবহিত হন ও নানাস্থানে শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন ক'রে নিরক্ষরদের অক্ষর জ্ঞানদানের চেষ্টা চলে। মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং অবৈতনিক ও আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা ভারতের সর্ব্বত্র প্রবর্ত্তনের জন্য 'ওয়ার্ধা স্কীম' নামে একটি শিক্ষা-পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। এ পরিকল্পনা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ মহলে বিস্তর আলোচনা ও বিতর্ক হয়। শেষে ভারত-গবর্ণমেণ্ট পরিকল্পনার মূলনীতি গ্রহণ ক'রে এ সম্বন্ধে ইতি-কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য বোম্বাইয়ের প্রধান মন্ত্রী বালগঙ্গাধর খেরের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করেন। যুক্তপ্রদেশের মন্ত্রীসভা গ্রাম-উন্নয়ন কার্য্যে বিশেষভাবে মন দেন ও একটি বিভাগ খুলেন। এই বিভাগের অধীন প্রচারকগণ দূর-দূরান্তের গ্রামে ও পল্লীতে জনসেবায় নিয়োজিত হন।

এ বছর হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়ার সুদেতেন জার্ম্মান অংশ দাবি করায় সেপ্টেম্বর মাসে ইউরোপে মহাসমর আসন্ন হ'য়ে পড়ে। সোভিয়েট রুশিয়াকে বাদ দিয়ে ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইটালী ও জার্ম্মানী এই চতুঃশক্তির প্রতিনিধিবর্গ মিউনিকে এক বৈঠকে সম্মিলিত হন ও একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হ'য়ে হিটলার কর্ত্তৃক চেকোশ্লোভাকিয়ার অঙ্গচ্ছেদ প্রস্তাবে সম্মতি দান করেন। চেকোশ্লোভাকিয়ার সুরক্ষিত সীমান্ত এইরূপে অবিলম্বে হিটলারের করতলগত হয়। তখনই অনেকে অনুমান করেছিলেন, মিউনিক চুক্তি

অদূর ভবিষ্যতে শুধু চেকোশ্লোভাকিয়া বিনাশেরই কারণ হবে না, যে মহা-সমরকে ঠেকিয়ে রাখবার জন্য এরূপ করা হ'ল তা-ও অতি শীঘ্র আরম্ভ হবে! আর এর ঠিক এক বছর পরেই ইউরোপে দ্বিতীয় মহাসমর বেধে যায়।

কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে ভারতবর্ষে ফেডারেশন প্রবর্ত্তনের জন্য চেষ্টিত হন। বড়লাট লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো এ উদ্দেশ্যে প্রচার কার্য্যও আরম্ভ করেন। সুভাষচন্দ্র বসু ফেডারেশন বা যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পাল্টা আন্দোলন সুরু করলেন। তিনি এ কার্য্যে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদের পূর্ণ সমর্থন পেলেন। সুভাষচন্দ্রের সহযোগী ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণও প্রস্তাবিত ফেডারেশনের সম্পূর্ণ বিরোধী। তবে তাঁরা প্রদেশসমূহের মত কেন্দ্রেও যে বড়লাটের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ সম্পর্কে সীমা নির্দ্দেশের আশ্বাস পেলে একে একেবারে অগ্রাহ্য করবেন না, এমনও কিন্তু বুঝা যায় নি। তাই সুভাষচন্দ্র নিজ মত চালু কববার জন্য সহযোগীদের সঙ্গে পরামর্শ না ক'রেই পর বছরের সভাপতি পদের জন্য নির্ব্বাচনপ্রার্থী হলেন। পরে তিনি ও তাঁর সহযোগীদের মধ্যে যে বাদ-প্রতিবাদ হয় তাতে স্পষ্ট বুঝা যায়, সুভাষচন্দ্র ঐরূপ সন্দেহ বশেই স্বাধীনভাবে নির্ব্বাচন-প্রার্থী হন। প্রস্তাবিত ফেডারেশনের বিরুদ্ধে জনমত প্রবল। সুতরাং সুভাষচন্দ্র বসু ও ডাঃ পট্টভি সীতারামায়ার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সুভাষচন্দ্রেরই জয় হ'ল। মহাত্মা গান্ধী নির্ব্বাচনের পরে একটি বিবৃতি প্রদান করেন। তাতে তিনি বলেন যে, নির্ব্বাচনে সুভাষচন্দ্রের জয় তাঁরই পরাজয়!

অতঃপর ওয়ার্কিং কমিটির বার জন সদস্য পদত্যাগ করেন। কংগ্রেসের যাবতীয় কার্য্যভার সুভাষচন্দ্রের উপর পড়ে। এবারে ১৯৩৯ সালে মধ্যপ্রদেশের ত্রিপুরী গ্রামে কংগ্রেস হওয়ার কথা। কংগ্রেস অধিবেশনের অল্প কয়েকদিন পূর্ব্বে মহাত্মা গান্ধী কাথিয়াবাড়ের রাজকোট নামক একটি ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্যে অনশনব্রত আরম্ভ করেন। রাজকোটে স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তন কল্পে সর্দ্দার বল্লভভাই পটেল ও রাজা ঠাকুর সাহেবের মধ্যে যে চুক্তি হয়, ঠাকুর সাহেবের তরফে তা ভঙ্গ করাই গান্ধীজীর অনশনের কারণ। আবার ভারতময় বিক্ষোভ ও চাঞ্চল্য উপস্থিত হ'ল। বড়লাট লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো সফর বাতিল ক'রে দিল্লীতে ফিরে এলেন ও এ বিষয়ের মীমাংসার জন্য নিজে হস্তক্ষেপ করলেন। তাঁরই চেষ্টায় ফেডারাল কোর্টের প্রধান বিচারপতি সার্ মরিস্ গাওয়ার মধ্যস্থ হ'তে

স্বীকৃত হন। কয়েক দিনের মধ্যেই কাগজপত্র পরীক্ষা ক'রে তিনি ঠাকুর সাহেবের প্রতিশ্রুতি রক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন ক'রে রায় দেন।

এরই মধ্যে ত্রিপুরীতে কংগ্রেসের অধিবেশন হ'ল, ১০ই—১২ই মার্চ্চ। তখন মহাত্মাজী অনশনব্রত ভঙ্গ করলেও কংগ্রেসে যোগদান সমীচীন বিবেচনা করলেন না। কংগ্রেসের উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দ, মায় সমাজতন্ত্রীরা, গান্ধীজীর নেতৃত্বে আস্থা জ্ঞাপন ক'রে তাঁর ইচ্ছামত ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য মনোনয়ন করার নির্দ্দেশ দিয়ে এক প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। সুভাষচন্দ্র ত্রিপুরীতে উপস্থিত হ'লেও অসুস্থতা নিবন্ধন কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করতে পারেন নি, তাঁর স্থলে মৌলানা আবুলকালাম আজাদ সভাপতির কার্য্য করেন।

কংগ্রেস যখন উক্তরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন তখন সুভাষচন্দ্রের পক্ষে গান্ধীজীর পরামর্শ ব্যতিরেকে কার্য্য করা অসম্ভব হ'ল। উভয়ের মধ্যে মত সাম্য ঘটাবার চেষ্টা হ'ল। কিন্তু এ চেষ্টা ফলবতী হ'ল না। কাজেই, পরবর্ত্তী ৩০শে এপ্রিল ও ১লা মে তারিখে কলকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে, শেষ চেষ্টা হবার পর, সুভাষচন্দ্র পদত্যাগ করলেন। তখন রাজেন্দ্রপ্রসাদ অস্থায়ী সভাপতি নিযুক্ত হন। এ ব্যাপার নিয়ে বঙ্গদেশে তীব্র বিক্ষোভ উপস্থিত হয়। সুভাষচন্দ্র 'ফরওয়ার্ড ব্লক' বা 'অগ্রগামী দল' গঠন করেন। এর উদ্দেশ্য কংগ্রেসের ভিতরে থেকে বামপন্থীদের সংহত করা ও ফেডারেশন প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে আন্দোলন চালান। কিন্তু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে জন আন্দোলন উপস্থিত করায় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধে সুভাষচন্দ্র তিন বছরের জন্য কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হন।

কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলি কংগ্রেসের আদর্শ সম্মুখে রেখে কাজ ক'রে চললেন। বোম্বাই শহরে মাদকদ্রব্য ব্যবহার ১লা আগষ্ট (১৯৩৯) বে-আইনী ঘোষিত হ'ল। এখানে বলা আবশ্যক যে, সিন্ধু মন্ত্রীসভা কংগ্রেসী না হ'য়েও খাঁ বাহাদুর আল্লাবক্সের নেতৃত্বে কংগ্রেসের কর্ম্ম-ধারা অনেকক্ষেত্রে অনুসরণ করেন। জনসাধারণের কল্যাণার্থ বাংলার অ-কংগ্রেসী হক-মন্ত্রীমণ্ডলও প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধন করান ও প্রজাকে ভূমিস্বত্ব দান করেন। ওদিকে ফেডারেশন প্রতিষ্ঠারও নানা আয়োজন চলতে লাগল। কিন্তু এর মধ্যে আর একটি বিপদ এসে শাসনতান্ত্রিক কার্য্যে ভীষণ বিঘ্ন ঘটাল।

কিছু আগে মিউনিক চুক্তির কথা বলেছি। এর পর ছ'মাস যেতে না যেতেই হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়া ছত্রভঙ্গ করেন ও অধিকাংশই নিজ করায়ত্ত করেন। হিটলারের প্রধান সহায়ক মুসোলিনী। ব্রিটেন ও ফ্রান্স এঁদের উদ্দেশ্য ব্যাহত করবার জন্য অগত্যা সোভিয়েট রুশিয়ার শরণাপন্ন হ'ল। দীর্ঘ তিন মাসকাল কথাবার্ত্তা ও আলোচনা চালিয়েও পরস্পরের মধ্যে সাহায্যমূলক কোন চুক্তি নিষ্পন্ন হ'ল না। ওদিকে হিটলারের দাবি খুবই বেড়ে যায়। তিনি তখন পোলণ্ডেরও খানিকটা দাবি ক'রে বসলেন। ব্রিটেন ও ফ্রান্স পোলণ্ড রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিল। পরে অকস্মাৎ ২৩শে আগষ্ট (১৯৩৯) তারিখে জার্ম্মানী ও সোভিয়েট রুশিয়ার মধ্যে বিধিবদ্ধ অনাক্রমণাত্মক চুক্তির কথা প্রকাশিত হ'ল! পরবর্ত্তী ১লা সেপ্টেম্বর হিটলার পোলণ্ড আক্রমণ করেন। এর দু'দিন পরেই, ৩রা সেপ্টেম্বর ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে।

এইরূপে ব্রিটেন যুদ্ধরত হওয়ায় সাম্রাজ্যের উপর খুব প্রতিক্রিয়া হ'ল। বিভিন্ন ডোমিনিয়ন একে একে ব্রিটেনের পক্ষে লড়বার প্রতিশ্রুতি দিলে।

গ্রেট ব্রিটেন মহাসমরে লিপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষকেও সমররত দেশ বা রাষ্ট্র ব'লে ভারত-সরকার ঘোষণা করেন। এ ব্যাপারে কর্ত্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপরিষদের মতামত গ্রহণ আবশ্যক বিবেচনা করলেন না, উপরন্তু সামরিক অবস্থা বিবেচনা ক'রে বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন ও এ উদ্দেশ্যে অর্ডিন্যান্স জারী হয়। ফেডারেশন প্রতিষ্ঠাও অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখা হ'ল। কংগ্রেস বরাবরই ফাসিষ্ট ও নাৎসী-নীতির বিরোধী। হিটলার মুসোলিনী যখনই বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বাধীনতা হরণে উদ্যত হয়েছেন তখনই তাঁরা এ কার্য্যের যথাসাধ্য প্রতিবাদ করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে বিপন্ন রাষ্ট্রদের সাহায্য দানেও তৎপর হয়েছেন। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি তাঁদের কার্য্যে এ যাবৎ তেমন প্রতিবন্ধকতা করেন নি। বর্ত্তমানে তাঁরা গণতন্ত্রনীতির দোহাই দিয়েই সমরে অবতীর্ণ। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এ সময় একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন। তাতে এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, কংগ্রেস গণতন্ত্রনীতির পক্ষপাতী ও নাৎসী-তন্ত্রের ঘোরতর বিরোধী। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টও গণতন্ত্র বজায় রাখার জন্য যুদ্ধরত। কাজেই ভারতবর্ষে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করা

ব্রিটেনের অবশ্য কর্ত্তব্য। তা হ'লেই কংগ্রেস তাকে স্বচ্ছন্দচিত্তে সাহায্য করতে পারবেন। কমিটি ব্রিটেনের নিকট থেকে এ উদ্দেশ্যে স্পষ্ট বিবৃতি দাবি করেন। বড়লাট লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো কংগ্রেস, মোস্‌লেম লীগ, হিন্দু মহাসভা, উদারনৈতিক সঙ্ঘ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের তরফে ও স্বতন্ত্রভাবে অন্যূন বাহান্ন জন প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি অতঃপর একটি বিবৃতি দান ক'রে বলেন যে, বিভিন্ন দলের প্রতিনিধি নিয়ে একটি পরামর্শ সভা গঠন করবেন। আসল উদ্দেশ্যের বিষয় কিন্তু তাতে বিশেষ পরিস্ফুট হয় নি। তিনি পরে অবশ্য তাঁর শাসন-পরিষদ বর্দ্ধিত ক'রে জন-প্রতিনিধি গ্রহণের প্রস্তাব করেন, কিন্তু এর সঙ্গে এই শর্ত্ত জুড়ে দেন যে, কংগ্রেসকে এই সদস্য-সংখ্যা ও প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে পূর্ব্বাহ্নেই মিঃ জিন্নার সঙ্গে একমত হ'য়ে কাজ করতে হবে। ইতিমধ্যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ২২শে অক্টোবর (১৯৩৯) কর্ত্তৃপক্ষকে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য জানিয়ে মন্ত্রীসভাগুলিকে পদত্যাগ করতে নির্দ্দেশ দেন। নবেম্বর মাসের মধ্যেই একে একে তাঁরা পদত্যাগ করেন। অতঃপর মাত্র আসামেই মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। অন্য সাতটি প্রদেশে গবর্ণরগণ বিশেষ ক্ষমতা বলে শাসনভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন।

মহাত্মা গান্ধী পোলণ্ডের এই আকস্মিক বিপদে বিশেষ দুঃখ প্রকাশ ক'রে এই বিবৃতি দেন। ব্রিটেন ও ফ্রান্স গণতন্ত্র নীতির প্রতিষ্ঠা কল্পে যে আসরে অবতীর্ণ হয়েছে তাতেও তিনি আনন্দ জ্ঞাপন করেন। তবে তিনি একথাও সঙ্গে সঙ্গে জানান যে, জগতে হিংসার পথ মুক্তির পথ নয়, হিংসার প্রতিক্রিয়ায় হিংসাই প্রযুক্ত হ'য়ে থাকে, অহিংসাই জগতকে আসন্ন ধ্বংসের পথ থেকে রক্ষা করতে পারে। গান্ধীজী অবশ্য স্বীকার করেন, জগতে এরকম অবস্থা এখনও উপনীত হয় নি। সুতরাং প্রত্যেককেই দেশ-রক্ষার দিকে অবহিত হ'তে হবে।

আধুনিকতম অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে পোলণ্ড জয় করতে হিটলারের পক্ষকালও লাগে নি। বর্ত্তমান যন্ত্র-চালিত বাহিনী ও বিমানপোত কিরূপ সর্ব্বধ্বংসী ও স্বল্পকালে বিজয়ী হ'তে পারে, আবিসিনিয়া যুদ্ধে তা প্রমাণিত হয়েছে। চীন এবং স্পেনেও তার মহড়া দেখা গিয়েছে। জার্ম্মানীর অগ্রগতির মধ্যেই রুশিয়া পোলণ্ডের সীমা অতিক্রম ক'রে এর মধ্যে প্রবেশ করে এবং ব্রেষ্টলিটভ্‌স্ক্‌ শহরে জার্ম্মানী ও রুশিয়ার মধ্যে পোলণ্ড ভাগবাঁটোয়ারা মূলক একটি চুক্তি

নিষ্পন্ন হয়। অনেকের বিশ্বাস, পূর্ব্ববর্ত্তী জার্ম্মান-সোভিয়েট সন্ধির মধ্যে পোলণ্ডের ভাগবাঁটোয়ারার কথাও ছিল। উত্তর-পশ্চিম ইউরোপে ব্রিটিশ প্রাধান্য বিনষ্ট করবার উদ্দেশ্যে হিটলার ওখানে সোভিয়েট রুশিয়ার প্রতিপত্তি বৃদ্ধির পক্ষপাতী হয়। রুশিয়াও উভয়ের মধ্যবর্ত্তী লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া ও এস্তোনিয়ায় নিজ প্রভাব বিস্তার ক'রে ফিন্ল্যাণ্ডের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। ফিন্ল্যাণ্ড কয়েকমাস যাবৎ রুশিয়াকে প্রতিরোধ করলেও শেষ পর্য্যন্ত তাকে রুশ-প্রভাব স্বীকার ক'রে নিতে হয়। এ রকম অবস্থায় ব্রিটেন ও ফ্রান্সের পক্ষে হিটলারের বিরুদ্ধে কোন দৃঢ় পন্থা অবলম্বন আবশ্যক হ'য়ে পড়ে। জার্ম্মানী ম্যাগ্নেটিক মাইন বসিয়ে বহু ব্রিটিশ ও নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের বাণিজ্যপোত বিনষ্ট করে। ব্রিটেন ও ফ্রান্স উভয়েই আর্থিক অবরোধ দ্বারা জার্ম্মানীকে বাগ মানাতে ব্যস্ত থাকে। ইউরোপের প্রতিটি ঘটনায়ই ভারতবর্ষের উপর প্রতিক্রিয়া হ'তে লাগল।

সঙ্কটের মুখে

(১৯৪০—১৯৪১)

ইউরোপে সংগ্রাম ক্রমশঃ ব্যাপক হ'য়ে পড়ল। ভারতবর্ষে প্রাদেশিক লাটগণ কংগ্রেসী মন্ত্রীসভার পদত্যাগের পর শাসনভার নিজ নিজ হস্তে গ্রহণ করলেন। বড়লাট লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নেতৃবর্গের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ক'রে যে বিবৃতি দান করেন তার কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হয়েছে। এর পর পুনরায় ১৯৪০ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে বড়লাটের সাক্ষাৎকার ঘটে, কিন্তু এতেও কোন ফলোদয় হয় নি। গান্ধীজী এর পর একটি বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে, কংগ্রেসের দাবি এবং বড়লাটের প্রস্তাব উভয়ের মধ্যে মূলগত পার্থক্য রয়েছে। কংগ্রেস চান—বাইরের কারো অপেক্ষা না রেখে সমগ্র জাতির প্রতিভূস্বরূপ নিজের ভাগ্য নিজেই নিমন্ত্রণ করতে, আব ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট চান—ভারতের শাসনতন্ত্র নিয়ন্ত্রণে তাঁদের চরম অধিকার। কাজেই উভয়ের মধ্যে যখন এতই মূলগত বা নীতিগত মতানৈক্য বিদ্যমান তখন আর আপোষ-রফার সম্ভাবনাই রইল না। এই ব্যর্থতার মধ্যে বিহারের রামগড়ে ১৯শে ও ২০শে মার্চ্চ (১৯৪০) তারিখে মৌলানা আবুলকালাম আজাদের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের ত্রিপঞ্চাশৎ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হ'ল।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ অভিভাষণে বিহার তথা রামগড়ের ঐতিহাসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাষ্ট্রিক গুরুত্ব বর্ণনা করেন। ভারতবর্ষের অন্যতম আদিম অধিবাসী বা আদিবাসী অধ্যুষিত এই রামগড় আর্য্য ও আর্য্যপূর্ব্ব সভ্যতা-সংস্কৃতির মিলন-ক্ষেত্র। অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে বাঙালীদের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হয়। গত শতাব্দীর প্রথম পাদে জেলার প্রধান শহর ছিল রামগড়। এখানে কিছুকাল রাজা রামমোহন রায় মেজিষ্ট্রেট জন ডিগবির দেওয়ানের কার্য্য করেছিলেন।

মূল সভাপতি মৌলানা আজাদ তাঁর অভিভাষণে ভারতের রাষ্ট্রীয় দাবির কথা উল্লেখ করেন। মহাসমরে কংগ্রেসের যোগদানে বিরতির কারণসমূহ

বিশদভাবে ব্যক্ত ক'রে বলেন যে, ভারতীয় মহাজাতির আত্মকর্ত্তৃত্ব লাভ হ'লে তাঁরা জগৎ থেকে সাম্রাজ্যবাদী তথা নাৎসী অত্যাচার ও সংঘর্ষের বিলোপসাধনে ধন জন দিয়ে প্রাণপণে সানন্দে যোগদান করবে। ভারতবর্ষ আত্মকর্ত্তৃত্ব লাভ করলে সংখ্যা-গরিষ্ঠদের হাত থেকে সংখ্যা-লঘিষ্ঠদের কোনরূপ নির্যাতন বা অপমানের আশঙ্কা আদবে নেই, তাঁর স্বসম্প্রদায় মুসলমানদের ত নেই-ই। তিনি অভিভাষণের উপসংহারে যা বলেন তা সত্যসত্যই প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে—

"গত এগার শ' বৎসরের ভারতবর্ষের ইতিহাস আমাদের (হিন্দু ও মুসলমান) উভয়েরই কীর্ত্তিগৌরবে সমুজ্জ্বল। আমাদের ভাষা, কাব্য, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্প, পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, দৈনন্দিন জীবনের অসংখ্য ঘটনা—এর সপক্ষে উভয়েরই প্রচেষ্টার সাক্ষ্য দেয়। জাতীয় জীবনের এমন কোন দিকই নেই যার উপর এই সম্মিলিত প্রচেষ্টার ছাপ না পড়েছে। আমাদের ভাষা পৃথক্ ছিল, কিন্তু কালে আমরা এক ভাষাতেই কথা বলতে শিখেছি। আমাদের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি স্বতন্ত্র ছিল, কিন্তু পরস্পরের উপরে পরস্পরের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হওয়ায় শেষে উভয়ের সংমিশ্রণে এসবই অভিন্ন আকারে দেখা দিয়েছে। আমাদের আগেকার পোষাক পুরাতন চিত্রে দৃষ্ট হয়, আজকাল কাউকে আর এরূপ পোষাকে দেখা যায় না। এই সম্মিলিত সম্পদ আমাদের একজাতীয়তারই প্রতীক। আমরা এটি পরিত্যাগ ক'বে সে যুগে ফিরে যাব না যেখানে আমরা স্বতন্ত্র ছিলাম। যদি কোন হিন্দু মনে করেন যে, হাজার বছর পূর্ব্বেকার হিন্দুর জীবন-যাপন প্রণালী আবার ফিরিয়ে আনবেন তবে বলতে হবে এ তাঁর দিবাস্বপ্ন। আবার যদি কোন মুসলমান মনে করেন যে, হাজার বছর পূর্ব্বে ইরাণ ও মধ্য-এশিয়ার যে সভ্যতা ও সংস্কৃতি সঙ্গে ক'রে এনেছিলেন তা সবই তিনি জাগিয়ে তুলবেন তবে তিনিও সমান ভ্রান্ত, তাঁর এই ভ্রান্তি যত শীঘ্র দূর হয় ততই মঙ্গল। এই দুইটি চিন্তাই অস্বাভাবিক, বাস্তবের সঙ্গে এর কোন যোগ নেই। আমার দৃঢ় মত এই, ধর্ম্মে এরূপ পুনরুজ্জীবনের অবকাশ আছে, কিন্তু সামাজিক ব্যাপারে এর কোনই স্থান নেই।"

এই সময়ের কিছুকাল পূর্ব্ব থেকেই শুধু ধর্ম্মে নহে, আচার-ব্যবহারে, পোষাক-পরিচ্ছদে, ভাষায়-সাহিত্যে, সভ্যতায়-সংস্কৃতিতে হিন্দু এবং মুসলমান

দুই স্বতন্ত্র জাতি ব'লে যে প্রচারকার্য্য চলেছে, আর মিঃ জিন্নার মত একজন প্রগতি-অভিমানী নেতা যে এর সমধিক প্রশ্রয় দিচ্ছেন, সভাপতির মঞ্চ থেকে মৌলানা আবুলকালাম আজাদ তার সমুচিত জবাব দিলেন। কংগ্রেস অধিবেশন কালে রামগড়ে ভীষণ বারিপাত হয়, কিন্তু উপস্থিত প্রতিনিধিমণ্ডলী অবিচলিত চিত্তে নিষ্ঠার সঙ্গে এক হাঁটু জলের ভিতর দাঁড়িয়ে অধিবেশনের কার্য্য সমাধা করেন। এবারকার কংগ্রেসের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল "ভারতবর্ষ এবং যুদ্ধ-সমস্যা"। এ সম্পর্কে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তার আলোচনায় পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্‌রু, বল্লভভাই পটেল, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ যোগদান করেন। প্রস্তাবটি দীর্ঘ হ'লেও এর মূল অংশের মর্ম্ম এখানে দিলাম—

"ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসীদের কোনরূপ জিজ্ঞাসাবাদ না ক'রে ভারতবর্ষকে যুদ্ধরত দেশ ব'লে ঘোষণা এবং সমরকালে ভারতবর্ষের ধন জন ব্যবহার করায় জাতির প্রতি ভীষণ অবমাননা প্রদর্শন করেছেন ব'লে কংগ্রেস মনে করেন। কোন আত্মসম্মানবিশিষ্ট স্বাধীনতাপ্রিয় জাতি এরূপ অবমাননা সহ্য করতে পারে না। সম্প্রতি ভারতবর্ষ সম্পর্কে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট পক্ষে যে-সব ঘোষণা করা হয়েছে তাতে স্পষ্ট বুঝা যায় গ্রেট ব্রিটেন আদতে তার সাম্রাজ্যবাদী মতলব হাসিল করবার জন্য এবং তার সাম্রাজ্য-সংরক্ষণ শক্তি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করবার জন্যই এ যুদ্ধ পরিচালনা করছেন। ভারতবর্ষ এবং আফ্রিকা ও এশিয়ার অন্যান্য দেশের সম্পদ-শোষণের উপরই এই সাম্রাজ্যের ভিত্তি।

"এরূপ ক্ষেত্রে কংগ্রেস প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুদ্ধে সাহায্য করতে পারেন না, কারণ যুদ্ধের সাহায্য মানে শোষণ-কার্য্যেরই অপ্রতিহত স্থায়িত্ব রক্ষা। সুতরাং কংগ্রেস ভারতীয় সৈন্যদের দিয়ে গ্রেট ব্রিটেনের পক্ষে যুদ্ধ করানো এবং ভারত হ'তে যুদ্ধের জন্য ধন জন নেওয়া সমর্থন করেন না। এখানে যে-সব সৈন্য সংগৃহীত হবে বা টাকাকড়ি সংগ্রহের ব্যবস্থা হবে তা ভারতের স্বেচ্ছাকৃত সাহায্য ব'লে গণ্য হবে না; কংগ্রেস সমর্থিত কোন প্রতিষ্ঠানই ধন জন বা জিনিসপত্র দিয়ে সাহায্য করতে পারেন না।

"কংগ্রেস ঘোষণা করছেন যে, পূর্ণ স্বাধীনতা ভিন্ন ভারতবাসীর নিকট কিছুই গ্রাহ্য হবে না। সাম্রাজ্য বাদের কক্ষের মধ্যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা

অসম্ভব। সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থেকে ডোমিনিয়ন ষ্টেটস বা অনুরূপ শাসনতন্ত্র ভারতবর্ষের পক্ষে সম্পূর্ণ অপ্রযোজ্য, একটি বিরাট জাতির পক্ষে মর্য্যাদাহানিকর। অনুরূপ ব্যবস্থা ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ কর্ম্মপদ্ধতি ও আর্থিক সংস্থার সঙ্গে বেঁধে রাখতে চাইবে। ভারতের অধিবাসীরাই ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্র নিরূপণ এবং জগতের অন্যান্য দেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের একমাত্র অধিকারী। সাবালক মাত্রেরই ভোটে নির্ব্বাচিত গণ-পরিষদ দ্বারা এ কার্য্য সম্ভব।

"কংগ্রেসের আরও অভিমত এই যে, সাম্প্রদায়িক মিলনের সব রকম চেষ্টা করতে প্রস্তুত থাকলেও তাঁরা মনে করেন গণ-পরিষদের মারফতই সত্যকার মিলন স্থাপন সহজসাধ্য। কারণ এই গণ-পরিষদে সংখ্যা-গরিষ্ঠ এবং সংখ্যা-লঘিষ্ঠ দল বা সম্প্রদায়গুলির প্রতিনিধিরা পরস্পর সম্মত হ'যেই সংখ্যা-লঘিষ্ঠদের স্বার্থরক্ষায় তৎপর হবেন। আর যদি কোন বিষয়ে তাঁরা একমত না হ'তে পারেন তবে 'ট্রাইব্যুনাল' বা সালিশী দ্বারা যথাযোগ্য মীমাংসা করা চলবে। গণ-পরিষদ ব্যতিরেকে কোন ব্যবস্থাই চরম ব'লে গণ্য হবে না। স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং জাতীয় ঐক্যই হ'ল ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্রের ভিত্তি। কংগ্রেস ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করা এবং জাতি হিসাবে ভাগ করার সম্পূর্ণ বিরোধী। কংগ্রেসের এমন শাসনতন্ত্রই সর্ব্বদা লক্ষ্য যেখানে ব্যষ্টি এবং সমষ্টি উভয়েরই পূর্ণ স্বাধীনতা এবং উন্নতির সর্ব্বপ্রকার সুযোগ দেওয়া হবে এবং যার দ্বারা সামাজিক অন্যায় দূরীভূত হ'য়ে ন্যায়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত নূতন সমাজ গঠিত হবে।

"ভারতের স্বাধীনতার পথে ভারতীয় রাজন্যবর্গের বা স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিদেশীর বিঘ্ন ঘটাবার কোনরূপ অধিকার আছে ব'লে কংগ্রেস স্বীকার করেন না। সামন্ত রাজ্যেই হোক বা প্রদেশেই হোক, ভারত শাসনের কর্ত্তৃত্ব জনসাধারণের হস্তেই ন্যস্ত থাকবে এবং তাদের স্বার্থের নিকট অন্য সব স্বার্থ অবনমিত থাকবে। কংগ্রেস বিশ্বাস করেন, সামন্ত রাজাদের নিয়ে যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছে তা ব্রিটিশেরই সৃষ্টি এবং এর কোন সন্তোষজনক মীমাংসা হ'তে পারে না যতদিন ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ বিদেশী শাসনমুক্ত ব'লে ঘোষিত না হবে। ভারতবাসীর স্বার্থের সঙ্গে বিদেশী স্বার্থের সংঘাত না ঘটলেই এ সমস্যার শীঘ্র মীমাংসা হবে।

"কংগ্রেস প্রদেশসমূহ হ'তে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা সরিয়ে এনেছেন। যুদ্ধে কোনরূপ সহযোগিতা না করা আর বিদেশীর শাসন-বিমুক্ত হবার জন্য কংগ্রেসের

সঙ্কল্প কার্য্যকরী করার জন্যই তাঁরা এ পন্থা অবলম্বন করেছেন। এই প্রারম্ভিক কার্য্যের স্বাভাবিক পরিণতি হ'ল আইন-অমান্য; সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিকে এ কার্য্যের উপযুক্ত ক'রে তোলা হ'লেই বা কোন সঙ্কট সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেই কংগ্রেস নিঃসন্দেহচিত্তে এ কার্য্যে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। কংগ্রেস গান্ধীজীর ঘোষণার প্রতি কংগ্রেস-সেবীদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বলেন যে, তিনি যদি নিয়ম-শৃঙ্খলা ঠিক ঠিক অনুবর্ত্তিত হচ্ছে এবং স্বাধীনতা সঙ্কল্পের গঠন-মূলক কার্য্যাবলী অনুসৃত হচ্ছে ব'লে বুঝতে পারেন তবেই আইন-অমান্য পরিচালনার গুরুভার গ্রহণ করবেন।

"কংগ্রেস জাতি, বর্ণ ও ধর্ম্ম নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়েরই সেবা ও প্রতি-নিধিত্বের অভিলাষী, কেননা কংগ্রেসের স্বাধীনতা-সংগ্রাম সমগ্র জাতিরই জন্য। সুতরাং কংগ্রেস এই আশা পোষণ করেন যে, এই আন্দোলন সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায়ই যোগদান করবে। আইন-অমান্য বা সত্যাগ্রহের উদ্দেশ্য সমগ্র জাতির মধ্যেই ত্যাগের ভাব উদ্রিক্ত করা।"

রামগড় অধিবেশন দ্বিতীয় দিনেই পরিসমাপ্ত হ'ল। এখানে আর একটি সভার কথাও উল্লেখযোগ্য। সুভাষচন্দ্র ফরওয়ার্ড ব্লকের পক্ষে কংগ্রেস-নিরপেক্ষভাবে রামগড়েই একটি সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন। সর্ব্বপ্রকারে যুদ্ধকার্য্যে বাধাদানই ছিল এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য।

প্রতিনিধিবর্গ নূতন সঙ্কল্প নিয়ে স্ব স্ব স্থানে ফিরে গেলেন। সত্যাগ্রহের প্রতিজ্ঞাপত্র রচিত হ'ল। বিভিন্ন প্রদেশে এসব বিতারিত হ'ল। মহাত্মা গান্ধী নাৎসী-অত্যাচার বিরোধী, অথচ এই সময়কার যুদ্ধে ব্রিটেনকে সাহায্য করতে পারলেন না। কারণ সুস্পষ্ট। ভারতবর্ষের শাসন-কর্তৃত্ব ভারতবাসীর হাতে অর্পণ করতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণ নারাজ। গান্ধীজী এবারে কংগ্রেস-প্রস্তাব অনুযায়ী আইন-অমান্য আরম্ভ করলেন বটে, কিন্তু এবারকার আন্দোলন নিবদ্ধ রাখলেন নির্দ্দিষ্ট লোকের মধ্যে। তবে এত ক'রেও বিস্তর লোক কারারুদ্ধ হলেন। বিভিন্ন স্থলে বহু কংগ্রেস-সেবী কারাবরণ করলেন। ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যগণ এবং প্রাক্তন প্রাদেশিক মন্ত্রীসভার মন্ত্রীগণও এ থেকে বাদ পড়েন নি। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ও আদেশে সর্ব্বত্রই শান্তিপূর্ণভাবে এই ব্যক্তিগত আইন-অমান্য চলতে লাগল। বর্ষশেষে দেখা গেল, একত্রিশ জন

প্রাক্তন মন্ত্রী, তিন শত কুড়ি জন আইন-সভার সদস্য, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এগার জন সদস্য ও নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির একশত চুয়াত্তর জন সভ্য কারাবদ্ধ হয়েছেন। কংগ্রেস ১৯৪১ সালের প্রথমে আন্দোলন স্থগিত করলেন। কিন্তু কংগ্রেস-সভাপতি মৌলানা আজাদ ৩রা জানুয়ারী গ্রেপ্তার হন এবং আঠার মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। এই বৎসরের নবেম্বর মাসে সত্যাগ্রহ বন্দী-সংখ্যা দাঁড়াল সাত হাজার।

ওদিকে ইউরোপে জার্ম্মানী কর্ত্তৃক একদিকে বৃটেনের উপর যেমন বোমা বর্ষিত হ'তে লাগল, অন্যদিকে ফ্রান্স জার্ম্মানীর কবলিত হ'ল। ব্রিটেন কিন্তু এই বিপদের মধ্যেও ভারতবর্ষ সম্পর্কে কোন নূতন কার্য্যকরী পন্থা অবলম্বন করলে না। এই সময় ভারতবর্ষে উদারনৈতিক মতাবলম্বী একদল নেতা সার্ তেজ-বাহাদুর সাপ্রুর নেতৃত্বে ১৯৪১ সালের ১৩ই ও ১৪ই মার্চ্চ বোম্বাইয়ে একটি অ-দলীয় সম্মেলন আহ্বান ক'রে গবর্ণমেণ্টকে এই মর্ম্মে আবেদন জানালেন যে, ভারতবর্ষ ও বৃটেন উভয়ের স্বার্থের জন্যই নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়ন ষ্টেটুস দিবার কথা ঘোষণা করা হোক্ এবং অবিলম্বে কেন্দ্রীয় শাসন-ভার সম্পূর্ণ দেশীয় সদস্যের উপর অর্পণ করা হোক্। তাঁরা এই উদ্দেশ্যে সরকারে এক স্মারকলিপিও প্রেরণ করেন। এতে বিশেষ কোন ফল হয় নি। তবে এই বৎসর ২১শে জুলাই বড়লাট এই মর্ম্মে ঘোষণা করলেন যে, কেন্দ্রীয় শাসন-পরিষদে পাঁচ জন নূতন সদস্য গৃহীত হবেন এবং সার্থকভাবে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে ত্রিশ জন সদস্য নিয়ে একটি সমর-পরিষদ গঠিত করা হবে। বিশ্বব্যাপী মারাত্মক সংগ্রামের মধ্যেও বৃটেন ভারতবাসীকে এতটুকু ক্ষমতা হস্তান্তর না ক'রে তাদের বুকের উপর জগদ্দল পাথরের মতই চেপে বসল। এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথও যে অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়েছিলেন তা তাঁর একাশীতিতম জন্মতিথি উপলক্ষে প্রদত্ত 'সভ্যতার সঙ্কট' বক্তৃতায় (বৈশাখ ১৩৪৮) সম্যক প্রকটিত হয়েছে। এই বিখ্যাত বক্তৃতাটির শেষে তিনি বলেন—

"ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারত-সাম্রাজ্য ত্যাগ ক'রে যেতে হবে, ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ ক'রে যাবে, কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জ্জনাকে।"

"একাধিক শতাব্দীর শাসন-ধারা যখন শুষ্ক হ'য়ে যাবে তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিবহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে। জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম ইউরোপের সম্পদ অন্তরের এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হ'য়ে গেল। আজ আশা ক'রে আছি পরিত্রাণকর্ত্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে, অপেক্ষা ক'রে থাকব সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্ব্ব দিগন্ত থেকে। আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি—পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্ন স্তূপ। কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্ম্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্ব্বাচলের সূর্য্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম ক'রে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্য্যাদা ফিরে পাবার পথে।...

ঐ মহামানব আসে
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্ত্ত্য ধূলির ঘাসে ঘাসে।
সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ
নরলোকে বেজে ওঠে ডঙ্ক,
এল মহাজন্মের লগ্ন।
আজি অমারাত্রির দুর্গতোরণ যত
ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন।
উদয় শিখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈঃ রব
নবজীবনের আশ্বাসে।
জয় জয় জয়রে মানব অভ্যুদয়
মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে॥"

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশ শাসনের গুরুভারে ভারতবাসীদের অবিরাম নিষ্পেষণে যে মর্ম্মপীড়া অনুভব করছিলেন তারই শেষ অভিব্যক্তি পাই 'সভ্যতার সঙ্কটে'। এই বৎসরই ২২শে শ্রাবণ তারিখে (৭ই আগষ্ট ১৯৪১) তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। বঙ্গ-সন্তানদের মনে তাঁর স্থান কত দৃঢ় ও গভীর তা প্রকাশ পেল কবি-প্রয়াণকালে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত্ত শোকোচ্ছ্বাসে। রবীন্দ্রনাথ ভারতের নব জাতীয়তার অন্যতম প্রধান উদ্গাতা, কাব্যলক্ষ্মীর আরাধনায় তদগতপ্রাণ। নোবেল-পুরস্কার প্রাপ্ত, বিশ্বসভায় সম্মানিত তিনি। শান্তি-নিকেতনে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা ক'রে জগতের সভ্যতা-সংস্কৃতির সার সংগ্রহে পণ্ডিতগণকে নিয়োজিত করেছেন। ভারত-গৌরব-রবি বিশ্বসভ্যতার সঙ্কট-মুহূর্ত্তে অস্তমিত হলেন। কিন্তু মৃত্যুকালে তিনি যে আশার বাণী শুনিয়ে গেলেন, অতি দুর্দ্দিনেও তা ভারতবাসীর পাথেয় হ'য়ে রইল।

এই বৎসরে দ্বিতীয় মহাসমরের দ্বিতীয় পর্য্যায় আরম্ভ হ'ল। প্রাচ্যে প্রতীচ্যে উভয়ত্র সমরাঙ্গণ ছড়িয়ে পড়ল। জার্ম্মানী সোভিয়েট রুশিয়াকে আক্রমণ করলে। এদিকে পূর্ব্ব এশিয়ায় জাপান ৭ই ডিসেম্বর (১৯৪১) তারিখে অকস্মাৎ আমেরিকার অধীনস্থ পার্ল বন্দর আক্রমণ ক'রে ধ্বস্তবিধ্বস্ত করলে। ক্রমে ফিলিপাইন, যবদ্বীপ, সুমাত্রা, সিঙ্গাপুর অধিকার ক'রে জাপানীরা অপ্রতিহত গতিতে ব্রহ্মদেশের দিকে ধাবিত হ'ল। ভারতবর্ষের রাজনীতির উপর এর প্রতিক্রিয়া হ'ল খুব। কংগ্রেস নেতৃবর্গ তখন অনেকেই একে একে মুক্তি পেয়েছেন। তাঁরা জাপানের নবতন কার্য্যকলাপের নিরিখে সমগ্র ব্যাপার নূতন ক'রে পর্য্যালোচনা করতে আরম্ভ করলেন। কংগ্রেসের অহিংস-নীতির প্রয়োগ সম্বন্ধে গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁদের অনেকেরই মতানৈক্য উপস্থিত হ'ল। গান্ধীজী চান ভারতবর্ষে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে যেমন, আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রেও তেমনি সমানে অহিংস-নীতির প্রয়োগ। কংগ্রেস-সভাপতি ও অন্যান্য নেতা তাঁর এ আদর্শ মেনে নিতে রাজী হলেন না। তাই ১৯৪১ সালের ৩০শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সভায় ওয়ার্কিং কমিটি কংগ্রেসের নেতৃত্ব-ভার হ'তে গান্ধীজীকে অব্যাহতি দিলেন। তাঁরা এই দিবসের অধিবেশনে এই মর্ম্মে প্রস্তাব গ্রহণ করলেন যে ভারতবর্ষের প্রতি বৃটিশ নীতির কোনরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত না হ'লেও, যুদ্ধের তখন যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে এবং এ যেমন ক'রে ভারত-

বর্ষের সীমায় এসে পৌঁছে গেছে তাতে তাঁরা এ বিষয়ে চিন্তান্বিত হ'য়ে পড়েছেন। ভারতবর্ষের সহানুভূতি স্বতঃই তাদের দিকে প্রধাবিত হচ্ছে যারা আক্রমণ-কারীর অত্যাচারে জর্জ্জরিত হ'য়েও প্রাণপণে স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছেন। তবে নেতৃবর্গ সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলেন যে, বিদেশীর শাসনমুক্ত একমাত্র স্বাধীন ভারতবর্ষই স্বদেশরক্ষার জন্য ব্যাপকভাবে উদ্যোগ আয়োজন করতে সক্ষম এবং সমর-ঝটিকা থেকে যে-সব সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে তার সমাধান-কল্পে সহায়তা করতে পারত। ওয়ার্কিং কমিটি পরবর্ত্তী ১৪ই জানুয়ারীর (১৯৪২) বৈঠকে ধার্য্য করেন যে, এ বৎসর এইরূপ জটিল অবস্থার মধ্যে কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশন সম্ভবপর হবে না।

এই সময়কার বাংলার অবস্থা একটু বিশেষ ক'রে আলোচনা করা দরকার। নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তন অবধি বাংলার রাজনীতি অদ্ভুত রূপ ধারণ করে। বাংলার কংগ্রেস-সেবীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব চরমে ওঠে। ওয়ার্কিং কমিটির অনুমোদিত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে অমান্য ক'রে আর একটি কমিটি গঠিত হয় এবং বঙ্গের আইন-সভায়ও এদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়। সুভাষচন্দ্র বসু, শরৎচন্দ্র বসু প্রমুখ নেতৃবর্গ ওয়ার্কিং কমিটির সমর্থন পেলেন না। সুভাষচন্দ্র রামগড় সম্মেলনের পর কলিকাতাস্থ সন্দেহজনক অন্ধকূপ-হত্যার স্মৃতিস্তম্ভ প্রকাশ্য রাজবর্ত্ম হ'তে যাতে সরিয়ে দেওয়া হয় সেজন্য আন্দোলন চালালেন। বহু স্বেচ্ছাসেবক এজন্য নির্য্যাতিত হয় এবং তিনিও স্বগৃহে অন্তরীণ হন। তবে সুখের বিষয় ঐ স্মৃতিস্তম্ভটি এর পরে প্রকাশ্য রাজবর্ত্ম থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। অন্তরীণ থাকাকালে ২৬শে জানুয়ারী (১৯৪১) তারিখে সুভাষচন্দ্র স্বগৃহ থেকে নিখোঁজ হলেন। তাঁর অন্তর্দ্ধান উপলক্ষ্য ক'রে অনেকে অনেক রকম জল্পনা করতে থাকেন; কিন্তু পরে সরকার ঘোষণা করেন যে, সুভাষচন্দ্র শত্রুপক্ষে যোগ দিয়েছেন ও জার্ম্মানীতে চলে গেছেন। এদিকে মোস্‌লেম লীগ শাসনাধীন বাংলার আকাশ-বাতাস সাম্প্রদায়িকতায় বিষিয়ে উঠল। ঢাকা শহরে ও মফঃস্বলে নিরীহ অধিবাসীদের উপর অত্যাচার-নিপীড়ন একেবারে চরমে উঠে। এতে হিন্দু সদস্যদের মত একদল মুসলমান সদস্যও তখনকার মন্ত্রীসভার বিরোধী হন এবং একে ভেঙে দিয়ে নূতন মন্ত্রীসভা গঠনে সাহায্য করেন। ১৯৪১ সালের ১৮ই ডিসেম্বর নূতন মন্ত্রীসভা গঠিত হ'ল।

এবারেও প্রধানমন্ত্রী হলেন মিঃ ফজলুল হক্। এই মন্ত্রীসভা গঠনে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর খুবই হাত ছিল। কিন্তু তাঁকে অকস্মাৎ ১১ই ডিসেম্বর ভারত-রক্ষা আইনের বলে আটক করা হ'ল। সরকার পক্ষে কারণ দেখানো হ'ল যে, সুভাষচন্দ্রের নিখোঁজ হওয়া সম্পর্কে তথ্য গোপন করার অপরাধেই তাঁকে আটক করা হয়। একথা কিন্তু সাধারণে তখন বিশ্বাস করলে না। তাদের ধারণা হ'ল—পুরনো মন্ত্রীসভার বদলে নূতন মন্ত্রীসভা গঠনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করার জন্যই গবর্ণমেণ্টের এই চাল। শরৎচন্দ্রকে অল্পদিন পরেই দক্ষিণ-ভারতে ত্রিচিনপল্লীতে প্রেরণ করা হয়।

১৯৪২ সালের প্রথম হ'তেই জাপান ক্রমশঃ পশ্চিম দিকে অগ্রসর হ'তে থাকে। এই সময় ৯ই ফেব্রুয়ারি মার্শাল ও মাদাম চিয়াং কাই-শেক কয়েকজন পরামর্শদাতা সঙ্গে নিয়ে ভারতবর্ষে উপনীত হন। তিনি বড়লাট, জঙ্গীলাট প্রভৃতির সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনা সম্পর্কে আলাপাদি করেন। ভারতীয় নেতৃবর্গের সঙ্গেও তাঁরা দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা করেন। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্‌রু তাঁদের পূর্ব্ববন্ধু। নিজের জীবন বিপন্ন ক'রেও চীনের যুদ্ধকালীন রাজধানী চুংকিঙে গিয়ে তিনি তাঁদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেন এবং নির্যাতিত চীনাদের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন। তাঁর সঙ্গে মার্শাল ও মাদাম উভয়েরই বিশেষ প্রীতিপূর্ণ আলাপ-আলোচনা হ'ল। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে তাঁরা কলকাতায় সাক্ষাৎ করেন। শান্তিনিকেতনেও তাঁরা যান ও সেখানকার কার্য্যপ্রণালীতে সন্তুষ্ট হ'য়ে চীনাভবনের জন্য আশি হাজার টাকা দান করেন। তাঁরা ২১শে ফেব্রুয়ারি ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন। ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা, বিশেষ ক'রে যুদ্ধে তারা কিরূপে সহায়তা করতে পারে তাও তাঁরা জেনে গেলেন।

মার্শাল ও মাদাম চিয়াং কাই-শেকের ভারতবর্ষ ত্যাগের মাত্র একমাস পরে ২৩শে মার্চ্চ (১৯৪২) সার্ ষ্টাফোর্ড ক্রিপ্‌স ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ভারত-শাসনমূলক কতকগুলি প্রস্তাব নিয়ে নিউ দিল্লীতে উপস্থিত হন। চিয়াং কাই-শেকের ভারত আগমন ও নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা তখন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে ভারতবর্ষ সম্পর্কে কতখানি সতর্ক বা সজাগ করেছিল প্রকাশ নেই। তবে মনে হয়, জাপানের অগ্রগতি যেমন এর জন্য দায়ী, চিয়াং

দম্পতির নির্বন্ধাতিশয়তা তেমনি এর মূলে কম ছিল না। ক্রিপ্‌স সাহেব যে প্রস্তাবগুলি নিয়ে আসেন এক কথায় তার নাম দেওয়া হয় 'ক্রিপ্‌স প্রস্তাব'।

কিন্তু ক্রিপ্‌স প্রস্তাব আলোচনার পূর্ব্বে এর মূল কথাটি অনুধাবন করবার পক্ষে আরও কোন কোন বিষয় জেনে রাখা আবশ্যক। কংগ্রেস রামগড় অধিবেশনে এবং ওয়ার্কিং কমিটির পরবর্ত্তী বৈঠকসমূহে স্বদেশের শাসন-তন্ত্র গঠন সম্পর্কে নিজ অভিমত ব্যক্ত করেছেন আর বলেছেন যুদ্ধকার্য্যে ব্রিটেন তথা মিত্রপক্ষকে সার্থকভাবে সাহায্য করতে হ'লে স্বদেশে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। মিঃ জিন্নার নেতৃত্বে নিখিল-ভারত মোসলেম লীগও ব্রিটেনকে সাহায্য করতে অসম্মত হন, কিন্তু তা অন্য কারণে। কিছুকাল পূর্ব্বে হায়দ্রাবাদের অধ্যাপক আব্দুল লতিফ ভারতবর্ষকে হিন্দু ও মুসলমান প্রধান অঞ্চলে ভাগ ক'রে একটি ভাবী শাসন-তন্ত্রের পরিকল্পনা করেন এবং মুসলমান-প্রধান অংশের নাম দেন পাকিস্থান। জিন্না সাহেব অনবরত প্রচার করতে থাকেন যে, বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রীগণ মুসলমানদের উপর অত্যাচার-অনাচার করেছেন, এজন্য ভারতবর্ষকে বিভক্ত ক'রে মুসলমান-প্রধান অংশকে সর্ব্ববিষয়ে সম্পূর্ণ আত্মকর্ত্তৃত্ব দিতে হবে। এই ব্যাপারটিকেই মোটামুটি তাঁর অধীনস্থ লীগ পাকিস্থান ব'লে প্রচার করেছেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, পাকিস্থান কথাটির প্রবর্ত্তক অধ্যাপক আব্দুল লতিফ কিন্তু পরে লীগ-মার্কা পাকিস্থান ব্যাখ্যার তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। কংগ্রেস হিন্দু প্রতিষ্ঠান, লীগ একমাত্র মুসলমান প্রতিষ্ঠান, আর পাকিস্থানের ভিত্তিতে আলোচনা চালাতে হবে, অগ্রে পাকিস্থান স্বীকার ক'রে না নিলে হিন্দুদের সঙ্গে চরম আপোষ-রফা হ'তে পারে না—মিঃ জিন্না এই কথাই প্রচার করতে লাগলেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এতদিন হিন্দু-মুসলমানের বিভেদের সুযোগ নিয়ে কংগ্রেসের কথায় কর্ণপাত করেন নি, বরং তাঁদের মুখপাত্র ভারত-সচিব লিওপোল্ড আমেরি কংগ্রেসী আন্দোলন ও প্রস্তাবকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ নিন্দা ক'রেই চলেছেন। এখন জাপানের আকস্মিক অভ্যুদয়ে এবং কতকটা চিয়াং কাই-শেকের মধ্যস্থতায়ই হয়ত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের উন্নত শির কতকটা অবনমিত হ'ল। এর ফলেই ক্রিপ্‌স প্রস্তাবের উদ্ভব। কিন্তু এর ভিতরে কংগ্রেস এবং লীগ উভয় মতের সামঞ্জস্য করতে গিয়ে সবই বানচাল হ'য়ে গেল। ক্রিপ্‌স প্রস্তাবের সারমর্ম্ম এই :

"প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ভারতবর্ষে একটি নূতন 'ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন' বা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র স্বজন যা সম্রাটের নিকট বাধ্যতাহেতু গ্রেট ব্রিটেন ও অন্যান্য ডোমিনিয়নের সঙ্গে এক সূত্রে গাঁথা থাকবে, কিন্তু যা হবে এদের সঙ্গে সর্ব্বপ্রকারে সমান, আভ্যন্তরিক বা পররাষ্ট্রিক কোন ব্যাপারেই একে অন্যের অধীন থাকবে না। গ্রেট ব্রিটেন এই কার্য্য সংসাধনকল্পে ঘোষণা করেন—

(ক) যুদ্ধবিরতির অব্যবহিত পরেই ভারতবর্ষে নিম্নের বর্ণিত পদ্ধতিতে নির্ব্বাচিত একটি প্রতিনিধি সভা গঠিত হবে, তার উপরে ভারতবর্ষের জন্য একটি নূতন শাসন-তন্ত্র রচনার ভার দেওয়া হবে।

(খ) শাসন-তন্ত্র রচনা পরিষদে ভারতীয় সামন্ত রাজ্যগুলিরও নিম্নবর্ণিত উপায়ে যোগদানের সুযোগ ক'রে দেওয়া হবে।

(গ) নিম্নলিখিত বিষয় সাপক্ষে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এইরূপে রচিত শাসন-তন্ত্র সত্বর কার্য্যকরী করতে বাধ্য থাকবেন—

(১) ইচ্ছা করলে ব্রিটিশ ভারতের যে-কোন প্রদেশের এরূপ শাসন-তন্ত্রের অধীন না হওয়ার অধিকার থাকবে, তবে যদি কখন সে এর অধীনে আসতে চায় তারও ব্যবস্থা করা হবে।

এইরূপ অসম্মত প্রদেশসমূহকে যদি তারা ইচ্ছা করে তবে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নের সম-মর্য্যাদাসম্পন্ন শাসন-তন্ত্র দানে প্রস্তুত থাকবেন।

(২) ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এবং শাসন-তন্ত্র-রচনা পরিষদের মধ্যে একটা সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হবে। ইংরেজের হস্ত হ'তে ভারতবাসীর হস্তে সব দায়িত্ব প্রত্যর্পণকালে যে-সব ব্যাপারের উদ্ভব হবে তাই নিয়েই এ সন্ধিপত্র। জাতিগত এবং ধর্ম্মগত সংখ্যা-লঘিষ্ঠদের রক্ষার জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ব্যবস্থা থাকবে। তবে ব্রিটিশ কমনওয়েল্‌থের অন্যান্য সদস্যদের প্রতি সম্পর্ক নির্দ্ধারণ সম্পর্কে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কোনরূপ হস্তক্ষেপ করবেন না।

কোন সামন্তরাষ্ট্র শাসন-তন্ত্রের আওতায় আসতে ইচ্ছুক হোক বা না হোক, নূতন অবস্থায় তাদের সঙ্গে পূর্ব্বে যে-সব সন্ধি করা হয়েছিল সবই পুনরায় নূতন ক'রে করে নিতে হবে।

(ঘ) যুদ্ধ-বিরতির পূর্ব্বে প্রধান প্রধান সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনে রাজী না হ'লে, নিম্নপ্রকারেই শাসন-তন্ত্র-রচনা পরিষদ গঠিত হবে—

যুদ্ধের অব্যবহিত পরে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্ব্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হ'লেই প্রাদেশিক আইন-সভাগুলির নিম্নতন পরিষদের সদস্যগণ এক-একটি স্বতন্ত্র ইলেক্টর‍্যাল কলেজ বা নির্ব্বাচক-মণ্ডলীতে পরিণত হবেন এবং আনুপাতিক প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা অনুযায়ী শাসন-তন্ত্র-রচনা পরিষদ গঠন করবেন। এইপরিষদ হবে ইলেক্টর‍্যাল কলেজের সংখ্যার দশ ভাগের এক ভাগ।

সামন্তরাষ্ট্র থেকেও মোট জনসংখ্যার সমান অনুপাতে ব্রিটিশ ভারতের ন্যায় প্রতিনিধি প্রেরিত হবেন। ব্রিটিশ ভারতের সদস্যের মত তাদের সমান অধিকার থাকবে।

(ঙ) বর্ত্তমানে ভারতবর্ষ যে সঙ্কটসঙ্কুল অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে তার ভিতরে এবং যতদিন পর্য্যন্ত না নূতন শাসন-তন্ত্র রচিত হয় ততদিন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সমগ্র যুদ্ধ-প্রচেষ্টার অঙ্গ হিসাবে ভারতবর্ষ রক্ষার সব রকম ব্যবস্থা ও দায়িত্ব নিজেদের হস্তেই রাখবেন। কিন্তু ভারতবর্ষের ধন জন ও অন্যান্য সর্ব্ববিধ সম্পদ সংহত ক'রে যুদ্ধে প্রয়োগ করবার দায়িত্ব বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের সহযোগে ভারত-সরকার ষোল আনা গ্রহণ করবেন। ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ স্বদেশ, কমনওয়েল্‌থ এবং মিত্রশক্তিবর্গের পরামর্শ সভায় যোগদান করবার বাসনা জ্ঞাপন করলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁদের এ-সব কার্য্যে আহ্বান করবেন। তাঁরা এরূপে এমন একটি বিষয়ে সার্থক ও সক্রিয়ভাবে সহায়তা করতে সক্ষম হবেন, ভারতবর্ষের ভাবী স্বাধীনতার পক্ষে যা অত্যাবশ্যক।"

ক্রিপ্‌স সাহেব বেতারে প্রস্তাব ঘোষণা করলেন। কংগ্রেস, মোসলেম লীগ, হিন্দু মহাসভার নেতৃবৃন্দের সঙ্গেও পূর্ব্ব ব্যবস্থামত স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা চলল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এ প্রস্তাব কেউই গ্রহণযোগ্য মনে করেন নি। কংগ্রেসের প্রধান আপত্তি হ'ল দুটি বিষয়ে—(১) ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করবার প্রচেষ্টা এবং (২) সামরিক নীতির পরিচালনায় ভারতবাসীর কর্ত্তৃত্ব অস্বীকার। ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে তাঁরা একটি প্রস্তাবের মধ্যে এই মূল বিষয় দুটির কথা উল্লেখ ক'রে ক্রিপ্‌স প্রস্তাব নাকচ করলেন। মোসলেম লীগের নাকচ করার কারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। মিঃ জিন্না এর ভিতরে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার

কোন স্পষ্ট উক্তি না পাওয়ায় লীগকে দিয়ে অগ্রাহ্য করিয়ে নিলেন। হিন্দু মহাসভা যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সরকারের নেতৃত্বে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে বরাবর সাহায্য করতে রাজী, কিন্তু ক্রিপ্‌স প্রস্তাবের রকম দেখে তাঁরাও বিস্মিত হলেন। ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করার প্রস্তাবে তাঁরা কোনমতেই রাজী হ'তে পারলেন না। মহাত্মা গান্ধী এ প্রস্তাবকে দেউলিয়া ব্যাঙ্কের উপরে চেক ব'লে উল্লেখ করেছেন! একটি পত্রিকা তখন বলেছিলেন—ষ্টাফোর্ড ক্রিপ্‌স এলেন ও চলে গেলেন। ভারতের আকাশে ক্ষণস্থায়ী ধূমকেতুর মত তাঁর আবির্ভাব। নীরবে তাঁকে অভ্যর্থনা করা হয়, কিন্তু যাবার বেলা সহস্র কণ্ঠ উচ্চরোলে তাঁকে বিদায় দিলে!

ক্রমে ক্রমে মালয় ও ব্রহ্মদেশ জাপানী বাহিনী কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও অধিকৃত হওয়ায় বহু ভারতবাসী দুর্গম পাহাড়-পর্ব্বত ও অরণ্যানীর ভিতর দিয়ে পদব্রজে স্বদেশ অভিমুখে রওনা হ'ল। পথিমধ্যে তাদের দুঃখ-কষ্টের অবধি রইল না। বিস্তর লোক অসুখে মারা যায়, আর অনেকে অনাহারে অনিদ্রায় জীবন্মৃত অবস্থায় ফিরে আসে। গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসীদের স্বদেশে ফিরিয়ে আনবার বিশেষ কোন ব্যবস্থাই করেন নি, আর এই বিপদের মধ্যেও শ্বেতকায়দের জন্য ফিরবার সুবন্দোবস্ত ক'রে বৈষম্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন। আইন-অমান্যের চৌদ্দমাস পরে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রথম অধিবেশন হয় ওয়ার্ধায় ১৯৪২ সালের ১৫ই ও ১৬ই জানুয়ারী। এর দ্বিতীয় অধিবেশন হ'ল এলাহাবাদে ৩০শে এপ্রিল থেকে ২রা মে পর্য্যন্ত। এই অধিবেশনে কমিটি ক্রীপ্‌স প্রস্তাব সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন এবং ব্রহ্ম ও মালয় প্রত্যাগত ভারতবাসীদের দুঃখ-কষ্টের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ ক'রে তাদের দুঃখ লাঘবের জন্য জাতির নিকট প্রার্থনা জানালেন। ভারতবাসীদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষের অবহেলার নিন্দা ক'রে গোবিন্দবল্লভ পন্থ আবার অহিংস অসহযোগ বিষয়ক একটি প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। এই প্রস্তাবই পরবর্ত্তী আগষ্ট প্রস্তাবের দ্যোতক। এই প্রস্তাবে বলা হ'ল যে, ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের সাহায্য বাঞ্ছা করেন সত্য, কিন্তু তা ক্রীতদাসের সাহায্য—এ অবস্থা আমরা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারি না। এর পর বোম্বাইয়ে ৭ই ও ৮ই আগষ্ট তারিখে

নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির পুনরায় অধিবেশন হ'ল। অহিংস অসহযোগের সূচনাকল্পে ইতিমধ্যেই উদ্যোগ-আয়োজন চলে। মহাত্মা গান্ধী এবারে ব্যাপক সত্যাগ্রহ আন্দোলনের নেতৃত্ব করতে সম্মত হলেন। যে প্রস্তাবে এই সত্যাগ্রহের সঙ্কল্প গ্রথিত তাই পরে আগষ্ট প্রস্তাব নামে বিখ্যাত হয়েছে। প্রস্তাবটির সারমর্ম্ম এখানে দিলাম:

"নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি ওয়ার্কিং কমিটির ১৪ই জুলাই (১৯৪২) তারিখের প্রস্তাবে উল্লিখিত বিষয়ের প্রতি এবং যুদ্ধের বর্ত্তমান অবস্থায় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের উক্তিতে আর ভারতবর্ষ ও তার বাইরে নানা মন্তব্য ও সমালোচনার সৃষ্টি হওয়ায় যে অবস্থার উদ্ভব হয়েছে তার প্রতি গভীর মনঃসংযোগ করেছেন। কমিটির মতে প্রস্তাব গৃহীত হবার পর যে-সব ব্যাপার সংঘটিত হয়েছে তাতে এর যুক্তিযুক্ততা প্রমাণিত হয়েছে। কমিটি একথাও পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, ভারতবর্ষের জন্য এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্যের সফলতার জন্য ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অবসান অবিলম্বে প্রয়োজন। ব্রিটিশ শাসনের অস্তিত্ব ভারতবর্ষকে পঙ্গু করছে ও তার অবনতি ঘটাচ্ছে। এর ফলে ভারতবর্ষ ক্রমশঃই আত্মরক্ষা করবার এবং বিশ্বের মুক্তিসংগ্রামে যোগ দেবার ক্ষমতা হারাচ্ছে।

"একদিকে স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য চীন এবং রুশিয়ার বীরত্ব প্রদর্শনে কমিটি যেমন বিস্মিত হয়েছেন, অন্যদিকে তেমনি কমিটি ঐ সকল দেশের অবস্থার ক্রমাবনতি হেতু উৎকণ্ঠাও প্রকাশ করছেন। যারা স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত আর যারা এদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন তারা এ দুটি দেশের বিপদে মিত্রপক্ষীয়দের অনুসৃত নীতির যুক্তিযুক্ততা যাচাই না ক'রে পারে না। কারণ মিত্রপক্ষীয়দের কার্য্য বার বার সাংঘাতিক ব্যর্থতায়ই পর্য্যবসিত হয়েছে। স্বাধীনতা অপেক্ষা পরাধীন দেশগুলির উপর আধিপত্য স্থাপন এবং ধনতান্ত্রিক প্রথা কায়েম করার চেষ্টার উপরই ঐ সকল নীতি প্রতিষ্ঠিত। সাম্রাজ্য শাসক জাতিকে শক্তি দান করে নাই, পরন্তু উহা বোঝা এবং অভিশাপস্বরূপ হয়েছে। ভারতবর্ষ সকল প্রশ্নের জটিল গ্রন্থিস্বরূপ, কারণ ভারতের স্বাধীনতার মাপ-কাঠিতেই ব্রিটেন এবং মিত্রজাতিগুলিকে পরিমাপ করতে হবে, ভারতের স্বাধীনতায়ই এশিয়া ও আফ্রিকায় জনগণের মন আশা ও উৎসাহে পূর্ণ হবে।

"এই দেশে ব্রিটিশ রাজত্বের অবসান একারণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। ইহারই উপর যুদ্ধের ভবিষ্যৎ এবং স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করছে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হ'লে এই সাফল্য সুনিশ্চিত। কারণ সে ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ মুক্তিসংগ্রামে এবং নাৎসীবাদ, ফাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদকল্পে তার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করবে। এর দ্বারা যে শুধু যুদ্ধের জয়-পরাজয় প্রভাবিত হবে তা নয়, পরন্তু সমুদয় পরাধীন ও নিপীড়িত মানব-সমাজকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পক্ষে টেনে আনা সম্ভব হবে, এবং সেই সঙ্গে ভারতের বন্ধুরূপে এই জাতিপুঞ্জ তাদের নৈতিক ও আত্মিক নেতৃত্ব গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। শৃঙ্খলিত ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নিদর্শন হিসাবে থেকে গেলে সাম্রাজ্যবাদের কলঙ্ক সমস্ত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভবিষ্যৎকে আচ্ছন্ন করবে।

"বর্ত্তমান বিপদের হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য ভারতের স্বাধীনতা এবং ব্রিটিশ শাসনের অবসান অবশ্য প্রয়োজনীয়। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন প্রতিশ্রুতি বা অঙ্গীকার বর্ত্তমান অবস্থা পরিবর্ত্তিত করতে অথবা বর্ত্তমান সঙ্কটের সম্মুখীন হ'তে পারে না। এই সকল অঙ্গীকার জনগণের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। একমাত্র স্বাধীনতার আগুনই লক্ষ লক্ষ লোকের মনে সেই পরিমাণ শক্তি ও উৎসাহ উদ্দীপিত করতে পারে যাতে ক'রে যুদ্ধের প্রকৃতি অবিলম্বে বদলে যাবে।

"সুতরাং নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি পুনর্ব্বার ভারত থেকে ব্রিটিশ শক্তির অপসারণের দাবি দৃঢ়ভাবে জানাচ্ছেন। স্বাধীনতা ঘোষণার পর একটি অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট গঠিত এবং স্বাধীন ভারত মিত্রজাতিপুঞ্জের সহিত বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হবে। এই স্বাধীন ভারতবর্ষ মুক্তিসংগ্রামের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সকলরকম দুঃখ-কষ্টের ভাগ নেবে। এই অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট একমাত্র এ দেশেরই প্রধান প্রধান দল বা গোষ্ঠীর সহযোগিতায় গঠিত হ'তে পারে। সুতরাং এ হবে ভারতের প্রধান দলগুলির প্রতিনিধিদের একটি সম্মিলিত গবর্ণমেণ্ট। এর প্রাথমিক কর্ত্তব্য হবে ভারতকে রক্ষা করা আর এর অধীনস্থ সশস্ত্র ও অহিংস শক্তির দ্বারা মিত্রজাতিদের সহযোগিতায় আক্রমণ প্রতিরোধ করা। শ্রমরত কর্ম্মী—জমিতে, কারখানায় ও অন্যত্র যারা কাজ করে, তাদের

সর্ব্বপ্রকার সুবিধা ক'রে দিতে হবে, কারণ বাস্তবপক্ষে তাদের কর্ম্মপ্রচেষ্টার উপরই দেশরক্ষা নির্ভর করে। এই অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট একটি গণ-পরিষদের খসড়া প্রস্তুত করবে। এই গণ-পরিষদ ভারতবর্ষের জন্য একটি শাসন-তন্ত্র রচনা করবে। শাসন-তন্ত্র সকল শ্রেণীর লোকের গ্রাহ্য হওয়া চাই। কংগ্রেসের মত এই যে, এই শাসন-তন্ত্র ফেডার‍্যাল বা সংযুক্ত গবর্ণমেণ্টের রীতি অনুযায়ী হবে। এই শাসন-তন্ত্রের অধীনে বিভিন্ন অঞ্চলের যতদূর সম্ভব স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার থাকবে এবং সংযুক্ত গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দিষ্ট ক্ষমতা ব্যতীত ঐ সব অঞ্চলের অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতা থাকবে। বিদেশী শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করা প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য; তাতে সহযোগিতাকারী ভারতবর্ষ ও মিত্রজাতিপুঞ্জের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক ঐ সকল জাতির প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচিত হবে। স্বাধীনতা লাভ করলে ভারতবর্ষ জনগণের একতাবদ্ধ চেষ্টা ও শক্তির সাহায্যে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে।

"ভারতের স্বাধীনতা অবশ্যই এশিয়ার অন্যান্য পরাধীন জাতির মুক্তির প্রতীক। ব্রহ্ম, মালয়, ইন্দোচীন, ইষ্ট ইণ্ডিজ, ইরাণ এবং ইরাকও অবশ্যই পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করবে। যে সকল দেশ আজ জাপানের পদানত তারা পরে অন্য কোন সাম্রাজবাদী জাতির অধীনে অথবা শাসনে থাকবে না।

"বর্ত্তমান সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে কমিটি ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জন ও রক্ষার আলাচনায় নিযুক্ত থাকলেও, এটাও তাঁদের অভিমত যে, পৃথিবীর ভবিষ্যৎ শান্তি সংরক্ষণ ও সুনিয়ন্ত্রিত উন্নতির জন্য স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ নিয়ে একটি সম্মিলিত রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠিত হওয়া প্রয়োজন। অন্য কোনও ভিত্তিতে আধুনিক বিশ্ব-সমস্যার সমাধান করা যাবে না। এরূপ একটি বিশ্বরাষ্ট্র তার অন্তর্গত রাষ্ট্রসমূহের স্বাধীনতা সংরক্ষণ করবে, এবং এক জাতি কর্ত্তৃক অপর জাতির আক্রমণ ও শোষণ প্রতিরোধ করবে, সংখ্যা-লঘিষ্ঠদের স্বার্থরক্ষা করবে, অনুন্নত জাতি ও অঞ্চলসমূহে উন্নতির ব্যবস্থা করবে এবং সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য আহরণ করবে। বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হ'লে সকল দেশেই নিরস্ত্রীকরণ সম্ভব হবে, জাতীয় সৈন্যবাহিনী, নৌ-বহর এবং বিমানবাহিনীর আর প্রয়োজন থাকবে না এবং একটি বিশ্বরাষ্ট্ররক্ষী-বাহিনী সৃষ্ট হবে। এই বাহিনী জগতের শান্তিরক্ষা এবং আক্রমণ প্রতিরোধ করবে। স্বাধীন ভারত আনন্দের সঙ্গেই এই বিশ্বরাষ্ট্রে

যোগ দিবে এবং আন্তর্জ্জাতিক সমস্যার সমাধানে অন্যান্য জাতির সহিত সাম্যের ভিত্তিতে সহযোগিতা করবে।

"কমিটি দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করছেন যে, যুদ্ধের মর্ম্মান্তিক ও চরম শিক্ষা এবং পৃথিবীর সঙ্কট সত্ত্বেও অতি অল্পসংখ্যক দেশই এই বিশ্বরাষ্ট্রে যোগ দিতে রাজী। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সঙ্কটময় অবস্থার অবসানের জন্য কমিটি স্বাধীনতার দাবি করছেন যাতে সে স্বাধীন হ'য়ে আত্মরক্ষা করতে পারে এবং চীন ও রুশিয়াকে তাদের বর্ত্তমান বিপদের সময় সাহায্য করতে পারে। রুশিয়া কিংবা চীনের আত্মরক্ষায় অথবা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আত্মরক্ষার শক্তিতে কোনরূপ বাধার সৃষ্টি হয় সে বিষয়ে কমিটি বিশেষ উদ্বিগ্ন। বিশেষ ক'রে চীন ও রুশিয়ার স্বাধীনতা মূল্যবান, এ দুটিকে অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। কিন্তু ভারতের এবং ঐ দুটি জাতির বিপদ ক্রমশঃ ঘনীভূত হচ্ছে। বর্ত্তমান অবস্থায় বিদেশী শাসনের আনুগত্য স্বীকারে ভারত যে কেবল অধঃপতিত হচ্ছে তা নয়, পরন্তু তার আত্মরক্ষা এবং আক্রমণ-প্রতিরোধ ক্ষমতাও খর্ব্ব হচ্ছে। শুধু তাই নয়, এই ব্যবহার দ্বারা ব্রিটেন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ক্রমবর্দ্ধমান বিপদের কিছুই প্রতিবিধান করতে পারছে না বরং তাদের প্রতি কর্ত্তব্য হ'তেই বিচ্যুত হচ্ছে। আজ পর্য্যন্ত ওয়ার্কিং কমিটি ব্রিটেন এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিকট যে সকল অনুরোধ জানিয়েছেন তার কোন উত্তর পান নি, বরং তাদের বিভিন্ন উক্তিতে ভারত এবং বিশ্বের প্রয়োজন সম্বন্ধে অজ্ঞতাই প্রকাশ পাচ্ছে। এমন কি তাঁরা ভারতের স্বাধীনতা-বিরোধী এমন সব ভাব ব্যক্ত করছেন যাতে প্রভুত্বপ্রিয়তা এবং জাতীয় শ্রেষ্ঠতার হীন মনোবৃত্তিই প্রকট। যে জাতি নিজ শক্তি সম্বন্ধে সজাগ ও গর্ব্বিত সে কখনই এরূপ মনোভাব সহ্য করবে না।

"বিশ্বের মুক্তির জন্য কমিটি পুনরায় ব্রিটেন এবং মিত্রশক্তিবর্গের নিকট তাঁদের মনোভাব জানাচ্ছেন। কমিটি মনে করেন যে, যে সাম্রাজ্যবাদী এবং প্রভুত্বপ্রিয় গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষকে দাবিয়ে রেখেছে এবং তাকে স্বীয় স্বার্থ এবং মানবতার আদর্শ অনুযায়ী কার্য্য করতে বাধা দিচ্ছে সে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে জাতি যদি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তাহ'লে কমিটি তা থেকে জাতিকে বিরত করা সমীচীন মনে করেন না। সেই কারণে ভারতবর্ষের অবিচ্ছেদ্য দাবি প্রতিষ্ঠার এবং অহিংস উপায়ে যতদূর সম্ভব ব্যাপকভাবে জাতি যাতে দীর্ঘ

বাইশ বৎসরের শান্তিপূর্ণ সংগ্রামে অর্জ্জিত অহিংস-শক্তি নিয়োজিত করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে কমিটি গণ-আন্দোলনের অনুমতি দানের সিদ্ধান্ত করছেন। এইরূপ একটি সংগ্রামের নেতৃত্ব মহাত্মা গান্ধীর উপরই ন্যস্ত থাকবে। কমিটি তাঁকে অনুরোধ জানাচ্ছেন তিনি যেন জাতিকে উপযুক্ত পথে পরিচালিত করেন।

"কমিটি জনসাধারণের নিকট এই আবেদন জানাচ্ছেন যে, তারা যেন ধৈর্য্য ও সাহসের সহিত সকল বিপদ ও কষ্টের সম্মুখীন হয় এবং গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে অনুগত সৈন্য হিসাবে তাঁর আদেশ মেনে চলে। তারা যেন মনে রাখে যে, অহিংসাই এ আন্দোলনের ভিত্তি। এমন সময় আসবে যখন হয়ত বিভিন্ন আদেশ জনসাধারণের নিকট গিয়ে পৌঁছবে না, কোন কংগ্রেস কমিটিরই অস্তিত্ব থাকবে না। যখন এরূপ ঘটবে তখন প্রত্যেক নর-নারী প্রচারিত আদেশের সীমা লঙ্ঘন না ক'রে নিজেরাই কার্য্য করবেন। মুক্তিকামী প্রত্যেক ভারতবাসী যখন স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত হবেন তখন নিজেই নিজের পথপ্রদর্শক হবেন এবং নিজেকে সেই বন্ধুর পথে চালিত করবেন যে পথে বিশ্রামের স্থান নেই, কিন্তু সে পথ শেষে স্বাধীনতা এবং ভারতের মুক্তিতে মিশে গেছে।"

এই গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্‌রু এবং সমর্থন করেন সর্দ্দার বল্লভভাই পটেল। সভাপতি মৌলানা আবুলকালাম আজাদ এবং মহাত্মা গান্ধী প্রস্তাবের গুরুত্ব সকল সভ্যকে বুঝিয়ে দিলেন। গান্ধীজী ক্রিপ্‌স প্রস্তাব বর্জ্জনের পর থেকেই 'হরিজন' পত্রিকায় ব্রিটিশ নীতি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রবন্ধে আলোচনা ক'রে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, যে পর্য্যন্ত ইংরেজ ভারতবর্ষ ত্যাগ না করবে ততদিন দেশের মঙ্গল নেই। তাই তিনি "Quit India" বা 'ভারত ত্যাগ কর' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছিলেন :

"ইংরেজদের যেমন সিঙ্গাপুর ছেড়ে দিতে হয়েছে তেমনি ক'রে তারা যদি ভারতবর্ষ ত্যাগ ক'রে চলে যায় তাহ'লে অহিংসা-মন্ত্রে দীক্ষিত ভারতের কোন ক্ষতিই হবে না। হয়ত বা তেমন অবস্থায় জাপানীরা ভারতভূমি স্পর্শও করবে না। ভারতের বিভিন্ন দল পরস্পরের বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে পারলে ভারতবর্ষ শান্তি স্থাপনে চীনকেও সার্থকভাবে সাহায্য করতে সক্ষম হবে এবং ভবিষ্যতে জগতের শান্তি স্থাপনে নিজ শক্তি প্রয়োগ করতে পারবে। পশ্চিমে যুদ্ধরত

থেকে প্রাচ্যকে নিজের অবস্থার সামঞ্জস্য বিধানের সুযোগ দিলে ব্রিটেনের পক্ষে তা কতই না গৌরবের এবং সাহসের কাজ হ'ত।"

স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে এবং বিপন্ন রাষ্ট্রসমূহের সাহায্যের জন্যও ভারতবাসী বিশেষ উৎসুক ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ নীতি তার প্রতিবন্ধক হওয়ায় ভারতবাসী জনসাধারণ অত্যন্ত অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠে। মহাত্মা গান্ধীর উক্তি এবং কংগ্রেস কমিটির প্রস্তাব তারই প্রতিধ্বনি মাত্র। ভারত-সরকার যুদ্ধের ভিতরে কোন ব্যাপক আন্দোলন ঘটতে দিতে রাজী নন। ৮ই আগষ্ট এই প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। ঐ দিনই শেষ রাত্রে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য বৃন্দ সরকার কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হলেন। এবারে সরকার আন্দোলন অঙ্কুরেই বিনাশ করতে বদ্ধ-পরিকর। সুতরাং নারী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে যেখানে যত নেতৃস্থানীয় বা প্রতিপত্তিশালী কংগ্রেস-সেবী ছিলেন সকলকেই আটক করা হ'ল। ওয়ার্কিং কমিটি, বিভিন্ন প্রাদেশিক কমিটি এবং কংগ্রেস-সংশ্লিষ্ট যাবতীয় প্রতিষ্ঠান একে একে বে-আইনী ঘোষিত হ'ল। জনসাধারণ সরকারের এরূপ সরাসরি দমন-নীতির জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। তারা গত কয়েক মাস যাবৎ কংগ্রেসের উদ্দেশ্য শুনে আসছে, যুদ্ধে আত্মসম্মান রক্ষা ক'রে সাহায্য করতে পারছে না ব'লে নিজের মধ্যে নিজে গুমরে মরছে। অকস্মাৎ মহাত্মা গান্ধী ও পত্নী কস্তুরবাঈ গান্ধী সমেত সমুদয় কংগ্রেস-সেবী ধৃত হওয়ায় জনতা যেন একেবারে ক্ষেপে উঠল। কেউ কেউ স্থানে স্থানে মাত্রা ছাড়িয়ে হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করলে। অধুনা বিখ্যাত অস্তি ও চিমুর থানাদ্বয়ে সরকারী কর্ম্ম-চারীদের উপরে অত্যাচার করা হয়। অন্যান্য স্থানেও নানারকম অনাচার ঘটে।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও জনগণের মনের মধ্যে কংগ্রেস কতখানি গভীর ও সুদৃঢ় স্থান লাভ করেছিল তা তাদের নেতৃবিহীন হ'য়েও অহিংসভাবে ব্যাপক আন্দোলন পরিচালনার সার্থক প্রচেষ্টা থেকে বুঝা যায়। তাদের প্রতিটি কার্য্যে সর্ব্বত্র একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ পরিদৃষ্ট হ'ল। স্বাধীনতা আন্দোলনে অগ্রণী মেদিনীপুরের কাঁথি ও তমলুক অঞ্চলে সরকারেরই মতে স্বতন্ত্র গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত হয়েছিল! জামসেদপুরের বিখ্যাত টাটার কারখানায়, বোম্বাই ও আমেদাবাদের কাপড়ের কলে জোর ধর্ম্মঘট সুরু হয়। বিহার, যুক্তপ্রদেশ, অন্ধ্র, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট ও অন্যান্য প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলেও কাঁথির মত স্বতন্ত্র গবর্ণমেণ্ট

স্থাপিত হয়েছিল। স্বার্থপর বিদেশীরা, বিশেষতঃ ব্রিটিশ ও মার্কিন সংবাদপত্র প্রতিনিধিরা অধিকাংশই এই স্বাধীনতা আন্দোলনকে মিত্রপক্ষের যুদ্ধপ্রচেষ্টা ব্যাহত করার একটা ছল ব'লেই চিত্রিত করতে প্রয়াস পান। এই সময় ভারত-বন্ধু লুই ফিশার ভারতবর্ষে এবং আমেরিকায় এই আন্দোলনের প্রকৃত রূপ ব্যাখ্যা ক'রে প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। এ আন্দোলন মিত্রপক্ষের যুদ্ধকার্য্য সাফল্যমণ্ডিত ও জয়লাভ সুনিশ্চিত করার জন্যই যে আরব্ধ হয় তাও তিনি প্রকাশ করেন। দেশের নেতৃবৃন্দ যখন কারারুদ্ধ, সরকারী মুখপাত্রগণ এবং বিদেশী সংবাদপত্র প্রতিনিধিগণ যখন ভারতবাসীর বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারে লিপ্ত তখন লুই ফিশার আগষ্ট আন্দোলনের মূলগত অভিপ্রায় ব্যক্ত ক'রে ভারতবাসীর প্রকৃত বন্ধুর কার্য্যই করেছিলেন।

বিরুদ্ধবাদীরা যাই বলুন, এই আন্দোলন সম্পর্কে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্‌রু কারামুক্ত হ'য়ে যা বলেছেন তা সত্যই প্রণিধান করার মত। তিনি বলেন, "১৯৪২ সালের বিরাট ঘটনাবলীর সঙ্গে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিরাট জাতীয় অভ্যুত্থানেরই তুলনা চলে। ১৯৪২ সালের ঘটনাবলী সম্পর্কে আমি গর্ব্ব অনুভব করি। জনসাধারণ যদি বিনা প্রতিবাদে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট নতি স্বীকার করত তা, হ'লে সত্যই আমি দুঃখিত হতাম। কেননা তা দ্বারা কাপুরুষতারই পরিচয় দেওয়া হ'ত এবং আমাদের যুগ-যুগান্তের সাধনা ব্যর্থ হ'য়ে যেত। নেতা নেই, সংগঠন নেই, উদ্যোগ-আয়োজন নেই, নেই কোন মন্ত্রবল – অথচ একটা অসহায় জাতি স্বতঃস্ফূর্ত্ত কর্ম্মপ্রচেষ্টার অন্য কোন পন্থা না দেখে বিদ্রোহ করলে—এ দৃশ্য প্রকৃতই বিপুল বিস্ময়ের বস্তু। তারা বীরের মত দুর্গতি বরণ করেছে, নির্যাতন সহ্য করেছে এবং বিপুল আত্মত্যাগে মহীয়ান্ হয়েছে। রাজশক্তি তাদের শিরোপরি যে অবমাননা ও হীনতার বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিল তা তাদের অসহ্য হ'য়ে উঠে।"

সরকার যেরূপ তৎপরতার সহিত নেতৃবৃন্দকে কারাবদ্ধ করেন সেইরূপ তৎপরতার সহিতই মেদিনীপুরে, বিহারে, যুক্তপ্রদেশে ও মধ্যপ্রদেশে দমনকার্য্য চালান। নানাবিধ অত্যাচার, গৃহদাহ, জিনিসপত্র নষ্ট করা প্রভৃতি এই দমন-নীতির অতি সামান্য অংশ। বঙ্গের তৎকালীন অর্থসচিব ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মেদিনীপুরে পুলিশের অত্যাচারের প্রতিবাদে এই বৎসর নবেম্বর

মাসে মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করেন। এখানে বলা আবশ্যক, মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতার গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে বড়লাটের শাসন-পরিষদের সদস্য নলিনীরঞ্জন সরকার, মাধবশ্রীহরি আনে এবং সার্ হরমাশজী ফিরোজশা মোদী পদত্যাগ করেন। তাঁরা এর কয়েক মাস পূর্ব্বে মাত্র শাসন-পরিষদের সদস্য নিয়োজিত হয়েছিলেন। নিতান্তই পরিতাপের বিষয়, চারিদিকে আন্দোলন দমনের জন্য যখন সরকার ব্যস্ত সেই সময়ে দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টি কংগ্রেস-সেবীদের নামে অযথা অপবাদ দিয়ে সরকারের সাহায্য করতে থাকেন! শিবহীন যজ্ঞের মত গান্ধীবিহীন আন্দোলনে স্থানে স্থানে যে-সব অনাচার অনুষ্ঠিত হয় তার জন্য সরকার কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ মায় মহাত্মা গান্ধীকে পর্য্যন্ত দোষারোপ ক'রে প্রচার কার্য্য সুরু করলেন। অহিংসার মুখোস নিয়ে নেতৃবৃন্দ বিদ্রোহের সূচনা করতে চেয়েছিলেন এরূপ অভিযোগও সরকার পক্ষে করা হ'ল। এর প্রতিবাদে মহাত্মা গান্ধী ১৯৪৩ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি অসুস্থ অবস্থাতেই একুশ দিনের উপবাস আরম্ভ করেন। পরদিন গবর্ণমেণ্ট একটি প্রচার পত্র দ্বারা এবিষয় সাধারণ্যে প্রকাশ করলেন। গান্ধীজী ও বড়লাট লর্ড লিন্‌লিথ্‌গোর মধ্যে আগষ্ট আন্দোলন সম্পর্কে যে-সব পত্রের আদান-প্রদান হয় তাও এই সঙ্গে প্রকাশিত হ'ল। মহাত্মা গান্ধী সঙ্কল্পে অটল, তাঁর উপবাস আরম্ভে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র চাঞ্চল্য উপস্থিত হ'ল। ভারত-সরকার উপবাসের মধ্যেও তাঁকে মুক্তি দিতে নারাজ। দেশের নেতৃবৃন্দ নিউ দিল্লীতে সমবেত হ'য়ে গান্ধীজীর মুক্তি-দানের অনুকূলে প্রস্তাব গ্রহণ ক'রে প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল, বড়লাট লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো এবং নিউ দিল্লীতে যুক্তরাষ্ট্র প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের নিজস্ব প্রতিনিধি মিঃ ফিলিপ্‌সকে তা প্রেরণ করেন। কিন্তু এতে কোন ফল হ'ল না। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই ফিলিপ্‌সের সঙ্গে গান্ধীজীর সাক্ষাৎকার হ'তে ভারত-সরকার দেন নি।

মহাত্মা গান্ধী অসুস্থতা এবং বার্দ্ধক্য সত্ত্বেও ব্রত উদ্‌যাপন করতে সমর্থ হলেন। গান্ধীজীর এই জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে ভারত-সরকারের পক্ষে এবং স্বরাষ্ট্র-বিভাগের অতিরিক্ত সেক্রেটারী সার্ রিচার্ড টোটেনহামের ভূমিকা-সম্বলিত ছিয়াশী পৃষ্ঠাব্যাপী একখানা পুস্তিকা প্রচারিত হ'ল। 'আগষ্ট আন্দোলনে জনগণের পক্ষ থেকে যে-সব অনাচার অনুষ্ঠিত হয় তারই একটা ফিরিস্তি এতে

বেশী ক'রে দেওয়া হয়, অবশ্য এর ভিতরে কংগ্রেস কমিটির প্রস্তাবাবলীও সন্নিবিষ্ট করা হয়েছিল। এই পুস্তিকাখানাকে ভিত্তি ক'রে হাউস অফ্ কমন্সে ৩০ শে মার্চ (১৯৪৩) তারিখে একখানি শ্বেতপত্রও প্রচারিত হ'ল! এর উপরে আলোচনায় ভারত-সচিব আমেরি সাহেব ভারতবাসীদের নিন্দায় আবার পঞ্চমুখ হলেন।

অ-দল সম্মেলনের বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি। সার্ তেজবাহাদুর সাপ্রু প্রমুখ এর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ কংগ্রেস ও ভারত-সরকারের মধ্যে আপোষ-রফার উদ্দেশ্যে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তেজবাহাদুর বড়লাটের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎও করেন। কিন্তু কোন মতেই অনুমতি মিলল না। মহাযুদ্ধের ওজুহাতে ভারতবর্ষের শাসন-সংস্কার সম্পর্কে কোনরূপ উচ্চবাচ্য করাও নীতি-বিগর্হিত—স্থানীয় ও বিলাতী কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন ভাষণে এ-ই বেশী ক'রে প্রকাশ পেতে লাগল। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশে ভারত-সরকার শত্রু বিতাড়নে যথোপযুক্ত শক্তি অর্জ্জনের উদ্দেশ্যে নিজ খেয়াল খুশীমত পন্থা অবলম্বন করতে লাগলেন, ভারতীয় জনমত তাতে সায় দিলে কিনা সেদিকে তারা ভ্রূক্ষেপও করলেন না। এর ফল কি ভীষণ হ'ল তাই এখন বলব।

শত্রু যাতে জয়লাভ ক'রে রাজ্য মধ্যে আশ্রয় নিতে না পারে এই উদ্দেশ্যে কোন কোন দেশে বিজিত লোকসমূহ পশ্চাদপসরণের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের ঘর-বাড়ী, কলকারখানা, খাদ্য-শস্য প্রভৃতি পুড়িয়ে নষ্ট ক'রে দিয়ে যায়। এই পদ্ধতিকে 'scorched earth policy' বা পোড়া-নীতি বলা হয়। রাণা প্রতাপ সিংহ এই নীতি অনুসরণ করেন, রুশিয়াবাসী এই পদ্ধতি অবলম্বন ক'রে নেপোলিয়নকে বিষম বিপাকে ফেলে। দ্বিতীয় মহাসমরেও রুশিয়া ও চীন এই নীতি অনুসরণ করেছে। জাপান যখন খাস ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হবার উপক্রম করে তখন এখানেও এই নীতি অনুসরণের কথা উঠে। ভারতবর্ষে এর খুবই প্রতিবাদ হয়। সুচতুর সার্ ষ্টাফোর্ড ক্রিপ্‌স এখানে এই পদ্ধতির প্রতি লোকের গভীর বিরাগ দেখে আর একটি নীতি বাৎলে দিয়ে যান। ইংরেজীতে কিঞ্চিৎ মোলায়েম ক'রে এর নাম দেওয়া হয়েছে 'denial policy'! এ-ও কিন্তু প্রায় ঐ পোড়া-নীতিরই সামিল। তবে এ নীতির এইটুকু বিশেষত্ব যে, অদূর ভবিষ্যতে বিজিত হ'তে পারি এই আশঙ্কায় সরকার কর্তৃক শত্রুর

ব্যবহারযোগ্য যানবাহন থেকে আরম্ভ ক'রে যায় খাদ্য-শস্য, আক্রান্ত অঞ্চল থেকে পূর্ব্বাহ্নেই সরিয়ে নেওয়া হয়, কখনও কখনও বা ধ্বংসও করা হয়। ইতিপূর্ব্বে বঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে অল্প সময়ের ব্যবধানে সামরিক কার্য্যের সুবিধার জন্য লোকজনকে ঘর-বাড়ী ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চলে যেতে হয়; এতে তাদের কষ্টের অবধি ছিল না। এখন এই পদ্ধতি অবলম্বনে তাদের চরম দুঃখের দিকে অতিদ্রুত টেনে আনলে। ১৯৪২ সালের ১৬ই অক্টোবরের নিদারুণ ঘূর্ণীবাত্যায় মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগণা জেলার বিস্তর ক্ষতি সাধিত হয়। এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক যে, এই প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের মধ্যেও আগষ্ট আন্দোলনে মেদিনীপুরবাসীর উপর যে দমন-নীতি প্রযুক্ত হ'তে আরম্ভ হয়েছিল তা এতটুকুও হ্রাস পায় নি! প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার লোক এই ঘূর্ণীবাত্যায় মারা যায়। লক্ষ লক্ষ লোক গৃহহীন হয় এবং শস্যাদি নষ্ট হ'য়ে অন্নাভাবে কষ্ট পায়। এর উপরে উক্ত সরকারী নীতি বঙ্গের পূর্ব্বাঞ্চলে জাপানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অতিমাত্রায় অনুসৃত হ'তে থাকে। রেল, ষ্টীমার, নৌকা, গরুর গাড়ী প্রভৃতি যানবাহনের নিরতিশয় সঙ্কোচ সাধিত হ'ল। শস্যপূর্ণ জেলাগুলি থেকে গবর্ণমেণ্ট উচ্চ দর দিয়ে চাল ও অন্যান্য খাদ্য-শস্য ক্রয়ের ব্যবস্থা করলেন। এর ফলে ক্রমে খাদ্য-শস্যের দর চড়তে থাকে। ১৯৪৩ সালের মার্চ্চ মাসে বঙ্গে ফজলুল হক্ মন্ত্রীসভা মেদিনীপুরে সরকারী অনাচারের রাশ টানতে গিয়ে লাট সাহেবের তথা ইংরেজ বণিক ও স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের বিরাগভাজন হন। নৈসর্গিক বিপর্য্যয়ে এবং সরকারী নীতির ফলে জনগণের জীবনধারণোপযোগী দ্রব্যাদির ভীষণ অভাব অনুভূত হ'তে লাগল। সে সময়ে ঐরূপ একটি জনপ্রিয় মন্ত্রীসভার হস্তে কর্ত্তৃত্বভার থাকলে দেশবাসীর হয়ত কতকটা সুবিধা হ'তে পারত, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের চক্রান্তের ফলে তারও পতন ঘটে (২৯শে মার্চ্চ)। এর এক মাস পরে সার্ নাজিমুদ্দীনের প্রধান মন্ত্রীত্বে বঙ্গে পুনরায় মন্ত্রীসভা গঠিত হ'ল। এঁরা মুস্লিম লীগপন্থী ও সাম্প্রদায়িকতাবাদী; জনসাধারণের সুখ-সুবিধার প্রতি এঁদের ভ্রূক্ষেপ নেই। এঁদের কার্য্যাবলী দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, জনসেবার চেয়ে নিজের সেবাতেই এঁরা অধিকতর তৎপর।

এই সব ঘটনার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হ'ল বাংলায় পঞ্চাশের মন্বন্তর। কুখ্যাত ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বঙ্গের এক-তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এবার

আত্মাহুতি দিয়েছে পঞ্চাশ লক্ষ বাঙালী। কিন্তু দুর্ভিক্ষের ব্যাপকতা ও তীব্রতায় এ বোধ হয় ছিয়াত্তরের মন্বন্তরকেও হার মানিয়েছে! অজন্মা সত্ত্বেও সৈন্যদের জন্য প্রচুর খাদ্য সংগ্রহ ক'রে রাখার ফলে সাধারণের খাদ্যাভাব ঘটে ও ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হয়। এবারে কিন্তু প্রাচুর্য্যের মধ্যেই অন্নাভাব ঘটল! সরকারী নীতিই এজন্য ষোল আনা দায়ী। এ কারণ এবারকার দুর্ভিক্ষকে যে বলা হয়েছে মনুষ্যকৃত দুর্ভিক্ষ তা এতটুকুও অতিরঞ্জিত নয়। কর্ত্তৃপক্ষ লোকজনের খাদ্যা-ভাবের কথা জেনেও তা নিরাকরণ করেন নি, অভাবগ্রস্ত অঞ্চলে খাদ্য সরবরাহে সময়ে তৎপর হন নি। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' খাদ্যসম্পর্কে সরকারী নীতির তীব্র সমালোচনা ক'রে সরকারের কু-নজরে পতিত হন। সরকারী আদেশ মেনে নিতে না পেরে প্রায় দু'মাস কাল সম্পাদকীয় মন্তব্য ব্যতিরেকেই পত্রিকা বের হয়। দুর্ভিক্ষের সময় 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান' সরকারী নীতির তীব্র সমালোচনা এবং নগ্ন বুভুক্ষু কঙ্কালসার নর-নারী-শিশুর চিত্র প্রথম প্রকাশ ক'রে এর তীব্রতা ও ব্যাপকতা সাধারণের গোচরে আনেন। দুর্গতদের মর্ম্মব্যথা ভাষায় রূপ দেবার জন্য এই দু'খানি সংবাদপত্র বিশেষভাবে বাঙালীর কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করেছেন। এর কিছুকাল পূর্ব্বে 'যুগান্তর' পত্রিকাও মেদিনীপুরের অত্যাচার কাহিনী প্রকাশ ক'রে একদিকে যেমন সাধারণের উপকার করেন অন্যদিকে তেমনি সরকারেরও কোপে পড়ে নিজেদের প্রকাশ কিছুকাল বন্ধ রাখতে বাধ্য হন। দুর্ভিক্ষকালে বিপন্ন দুর্গত বাঙালীর সাহায্যার্থে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশবাসীগণ অগ্রসর হন। ডক্টর বি. এস্. মুঞ্জে, পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু, শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত মেদিনীপুর, চব্বিশ-পরগণা, নোয়াখালী, কুমিল্লা, ঢাকা, বাখরগঞ্জ প্রভৃতি বিভিন্ন জেলায় পরিভ্রমণ কালে দুর্ভিক্ষগ্রস্ত লোকদের চরম দুর্গতি লক্ষ্য ক'রে দুর্ভিক্ষের তীব্রতা ও ব্যাপকতা প্রকাশ করেন। ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বাঙালীর মুখপাত্র রূপে দুর্গতদের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। সরকার স্থানে স্থানে দাতব্য কেন্দ্র খুললেন বটে, কিন্তু তা অতি বিলম্বে ও প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য। কলকাতার রাস্তা বুভুক্ষু কঙ্কালসার লোকে ভর্ত্তি হ'য়ে গেল। শহরের অতি প্রাচুর্য্যের মধ্যেও রাস্তায় ফুটপাথে কত শিশু ও নারী খাদ্যাভাবে মারা গেল তার ইয়ত্তা নেই। শহরে ও মফঃস্বলে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ বাঙালী নীরবে পঞ্চাশের মন্বন্তরে আত্মাহুতি দিলে।

শ্রীযুক্ত কালীচরণ ঘোষ *Famines in Bengal* ('বঙ্গে দুর্ভিক্ষ') নামক পুস্তকে পঞ্চাশের মন্বন্তরের কার্য্যকারণ সম্বলিত একটি বিশদ চিত্র প্রদান করেছেন। পুস্তকে সন্নিবেশিত বিষয়গুলির অধিকাংশই বিখ্যাত সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ইংরেজী 'মডার্ণ রিভিউ' মাসিকে দুর্ভিক্ষের মধ্যেই প্রকাশিত হ'তে আরম্ভ হয়। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কংগ্রেসের প্রথম যুগে ইহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। পরবর্ত্তীকালে কার্য্যকরভাবে যুক্ত না থাকলেও এর আদর্শ প্রচারে কখনও পশ্চাৎপদ হন নি। যখন ডোমিনিয়ন ষ্টেট্‌সের আদর্শে স্বায়ত্তশাসন মাত্র ছিল কংগ্রেসের দাবি তখন থেকেই তিনি ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য যে পূর্ণ স্বাধীনতা, স্ব-সম্পাদিত 'মডার্ণ রিভিউ' ও 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রতিমাসে তা ব্যক্ত করতে থাকেন। তাঁর মত নির্ভীক মননশীল সদাজাগ্রত সাংবাদিক বিরল। এই দুর্ভিক্ষের মধ্যে ১৯৪৩ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন।

ইংরেজী ১৯৪৩ ও বাংলা ১৩৫০ সাল ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ন্যায় কুখ্যাতই হ'য়ে থাকবে। এত দুঃখ-দৈন্যের মধ্যেও সরকারী নীতির কোনরূপ পরিবর্ত্তন হ'ল না। বড়লাট লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো দুর্ভিক্ষকালে বঙ্গদেশে একটিবারও আগমন করেন নি, কারণ সময়াভাব। লক্ষ লক্ষ লোকের দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে অক্টোবর মাসে তিনি স্বদেশে চলে গেলেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন ২০শে অক্টোবর তারিখে তাঁর সময়েই জঙ্গীলাট আর্চিবল্ড পার্সিভ্যাল ওয়াভেল। তিনি এর পূর্ব্বে বিলাতে গমন করেছিলেন। সেখানে থেকে তিনি যে বিবৃতি দেন তাতে ভারতবর্ষের রাজনীতিক অচল অবস্থা এবং অন্নসমস্যা দুয়েরই সমাধানের আভাস ছিল। তিনি দিল্লীতে কার্য্যভার গ্রহণ করার অল্পদিন পরেই বঙ্গদেশে আসেন এবং কলকাতায় ও উপকণ্ঠে যে-সব অবস্থা দেখেন ও দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে যে-সব তথ্য আহরণ করেন তার ফলেই বঙ্গবাসীর খাদ্য-সমস্যা সমাধানের ভার নিজেই গ্রহণ ক'রে স্বতন্ত্র দপ্তরের উপর অর্পণ করেন। এর কিছুকাল পরে বর্ষ শেষের সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভিক্ষেরও কতকটা অবসান হ'ল। কিন্তু দুর্ভিক্ষের শেষ পর্ব্বে এর চির-সহচর আধিব্যাধি মার মূর্ত্তিতে দেখা দিলে। বঙ্গের দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত অঞ্চলসমূহে কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়ায় লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হ'ল। বাখরগঞ্জ জেলায় ম্যালেরিয়ার নামমাত্রও

ছিল না। এই সময় এ জেলাটিও ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হ'ল। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও আমাদের স্মরণীয়। বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হ'তেই শুধু সাহায্য আসে নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত সাহিত্যিক নোবেল-পুরস্কার প্রাপ্তা শ্রীমতী পার্ল বাকের নেতৃত্বে দুর্গত বঙ্গবাসীদের সাহায্যকল্পে একটি ধনভাণ্ডার খোলা হয়। আয়ার্ল্যাণ্ড সরকারের পক্ষ থেকে ডি ভ্যালেরা এই দুর্ভিক্ষে এক লক্ষ পাউণ্ড বা তের লক্ষ টাকা দান করেন। বাঙালীরা সকলের কথাই আজ সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছে।

এ বৎসর কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ থাকায় রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক কোন কার্য্যেই যোগদান করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। তাঁদের অনুপস্থিতির সুযোগে মোস্‌লেম লীগ বিভিন্ন প্রদেশে নিজ প্রভাব বিস্তার করবার চেষ্টা করে এবং আসাম, বাংলা, পঞ্জাব, সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে অন্যান্য দলের সাহায্যে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠনে সক্ষম হয়। বাংলাদেশে লীগ-প্রধান মন্ত্রীসভা কিরূপ দুর্গতির কারণ হয়েছে তা এইমাত্র বলা হ'ল। লীগ-সভাপতি মিঃ জিন্না লীগের প্রকাশ্য অধিবেশনে এবং ব্যক্তিগতভাবে অন্যত্রও জাতির এই দুর্দ্দিনেও কংগ্রেস এবং কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের উপরে গালিবর্ষণ করতে ক্ষান্ত হন নি। কংগ্রেস একটি হিন্দু প্রতিষ্ঠান আর ভারতবর্ষে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা কংগ্রেসের উদ্দেশ্য—একদিকে যেমন এইরূপ মিথ্যা প্রচার সুরু হ'ল, অন্যদিকে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা ছাড়া মুসলমানদের গত্যন্তর নাই এ কথাও নিরীহ মুসলমান জনগণের কর্ণকুহরে অবিরত প্রচার করা হ'ল।

এই সময় হিন্দু মহাসভা কিন্তু তার কর্ম্মপন্থা অনেকটা কংগ্রেসের অনুগ ক'রে নিলে। ১৯৪৩ সালের ১লা আগষ্ট বিনায়ক দামোদর সাবারকর হিন্দু মহাসভার সভাপতিত্ব থেকে অবসর গ্রহণ করলে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এর সভাপতি হলেন। অমৃতশহর অধিবেশনে অখণ্ড স্বাধীন ভারতের আদর্শ সম্মুখে রেখে তিনি হিন্দু মহাসভার যাবতীয় কর্ম্ম পরিচালনা করলেন। পাকি-স্থানের বিরোধিতা যেমন দৃঢ়ভাবে করা হ'ল তেমনি বলা হ'ল যে, তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতিতেই ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে। তৃতীয় পক্ষ সরে দাঁড়ালেই তারা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে সঙ্গত আপোষ-রফা ক'রে নিয়ে এক অখণ্ড ভারতে ভ্রাতৃভাবে বাস করতে পারবে।

কংগ্রেসের অনুপস্থিতিতে শ্যামাপ্রসাদই প্রগতিশীল ভারতবাসীর মর্ম্মকথা ব্যক্ত করলেন।

এই বৎসরের (১৯৪৩) শেষ দিকে ইউরোপে যুদ্ধের গতিও অনেকটা মোড় ফিরল। ইটালীর পতন ঘটে; জার্ম্মানীও আক্রমণের পরিবর্ত্তে আত্মরক্ষাতেই অধিকতর মনোনিবেশ করে। প্রাচ্যে জাপানের প্রভাব-প্রতিপত্তি কিন্তু অটুটই থাকে। যুদ্ধের মধ্যে চার্চ্চিল ও রুজভেল্ট অতলান্তিক মহাসাগরের কোন স্থলে জাহাজে বসে 'আটলান্টিক চার্টার' নামে একটি স্বাধীনতার সনন্দ রচনা করেন। এর মধ্যে যুদ্ধশেষে নিপীড়িত জাতিদের স্বাধীনতা দানের কথা ছিল। পরাধীন নিপীড়িত জাতিরা স্বভাবতঃই এতে আনন্দ প্রকাশ করে। কিন্তু অল্পকাল পরেই প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল এর ব্যাখ্যা এইরূপ করলেন যে, অতলান্তিক মহাসাগরের তীরবর্ত্তী নির্য্যাতিত রাষ্ট্রসমূহের বেলায়ই এই সনন্দ প্রযোজ্য হবে। এইরূপ ব্যাখ্যায় ভারতবাসীরা স্বভাবতঃই মর্ম্মাহত হয়। ওদিকে ভারত-সচিব মিঃ আমেরি অহরহ ঘোষণা করতে থাকেন, যে, ভারতবাসীদের নিজেদের মধ্যে মিলন না হ'লে তাদের কোনরূপ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে না। কংগ্রেসের কথা বলতে গিয়ে তিনি এবং তাঁর অধস্তন অন্য অনেকেই এই কথাই বলেন যে, আগষ্ট প্রস্তাব প্রত্যাহৃত না হ'লে বন্দী-নেতাদের মুক্তির বিষয় কিছুই বিবেচনা করা হবে না। তবে লর্ড ওয়াভেল বড়লাট হ'য়ে আগমন করায় লোকের মনে কতকটা আশার সঞ্চার হ'ল।

যা হোক, এই অবস্থার মধ্যে আমরা ১৯৪৪ সালে উপনীত হলাম। এই বৎসর ২২শে ফেব্রুয়ারি মহাত্মা গান্ধীর সহধর্ম্মিণী কস্তুরবাঈ গান্ধী কারাগারেই হৃদ্‌রোগে দেহত্যাগ করলেন। তাঁকে মুক্তিদানের কথা উঠলে এই সাধ্বী রমণী বলেছিলেন—কারাগারে পতি-পার্শ্বে থেকেই তিনি মৃত্যু অত্যধিক শ্রেয় জ্ঞান করেন। পতির ক্রোড়ে তাঁর শেষ নিঃশ্বাস নির্গত হ'ল। এর পর ১৭ই ফেব্রুয়ারি থেকে কিছুকাল পর্য্যন্ত মহাত্মা গান্ধী ও বড়লাট ওয়াভেলের মধ্যে পত্র-ব্যবহার হয়। ওয়াভেলও পত্রে উক্ত আগষ্ট প্রস্তাব প্রত্যাহারেরই কথা বললেন। মহাত্মা গান্ধী এরূপ প্রস্তাবে সম্মত হ'তে না পারায় কোন ফল হয় নি বটে, কিন্তু পত্রাবলী প্রকাশিত হ'লে বুঝা গেল লর্ড ওয়াভেল নেতৃবৃন্দের বা কংগ্রেসের বিষয় সহানুভূতির সঙ্গেই বিবেচনা করছেন। পরে প্রকাশ

পেয়েছে, কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আজাদের সহধর্ম্মিণী অসুস্থ হ'লে তিনি (ওয়াভেল) বিমানযোগে মৌলানা সাহেবকে তাঁর নিকট নিয়ে যাবার আদেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু কি এক অজ্ঞাত কারণে তাঁর আদেশও কার্য্যকরী হয় নি। আজাদও কারাগারে অবস্থানকালে তাঁর পত্নীকে হারালেন। এখানে আরও একটি কথা উল্লেখযোগ্য। মহাত্মা গান্ধীর সুযোগ্য সেক্রেটারী মহাদেব দেশাইও মহাত্মার সঙ্গে ধৃত হয়েছিলেন, কিন্তু সপ্তাহকাল কারাবাসের পরই ১৫ই আগষ্ট (১৯৪১) তাঁর দেহান্ত ঘটে।

জ্বর রোগে আক্রান্ত হওয়ায় মহাত্মা গান্ধী ৬ই মে (১৯৪৪) তারিখে কারামুক্ত হলেন। অসুস্থতার জন্য ইতিপূর্ব্বে সরোজিনী নাইডু প্রমুখ অন্য কোন কোন নেতাও মুক্তি পেয়েছিলেন। মহাত্মাজী কিঞ্চিৎ সুস্থ হ'য়েই আবার কর্ম্মতৎপর হ'য়ে উঠলেন। জেলে থেকেই তিনি মিঃ জিন্নাকে পত্র লিখেছিলেন, কিন্তু তা তাঁকে দেওয়া হয় নি। এই সময় রাজাগোপালাচারী জিন্নাব সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। সাম্প্রদায়িক সমস্যা মীমাংসার সূত্র অনুসন্ধান করাই ছিল এই আলাপ-আলোচনার উদ্দেশ্য। বোম্বাইয়ে জিন্না-ভবনে ৯ই সেপ্টেম্বর থেকে ২৭শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত জিন্না ও গান্ধীর মধ্যে আলোচনা চলে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মীমাংসার কোনই সূত্র পাওয়া গেল না।

এই সময় মহাত্মা গান্ধী দুইটি কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। কস্তুরবাঈ স্মৃতি-ভাণ্ডার স্থাপনের কথা উঠলে দেশবাসীর নিকট থেকে আশ্চর্য্য সাড়া পাওয়া গেল। অল্প সময়ের মধ্যে প্রায় সওয়া কোটি টাকা চাঁদা সংগৃহীত হ'ল। মহাত্মা গান্ধী এই টাকা একটি ট্রাষ্টী বা ন্যায়রক্ষক কমিটির উপরে অর্পণ করেন। এই অর্থ ভারতবর্ষের বিভিন্ন পল্লীগ্রামে নারীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির উন্নতিকল্পে ব্যয়িত হবে। দ্বিতীয় কার্য্য—যুদ্ধোত্তরকালে ভারতবর্ষের জন্য একটি পরিকল্পনা রচনা। 'গান্ধী-প্ল্যান' নামে এ এখন পরিচিত। গ্রামকে কেন্দ্র ক'রে ভারত-বাসীর কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য যাবতীয় বিষয়ের উন্নতি সাধনই এর লক্ষ্য। বিশেষ বিশেষ শিল্প—যার সঙ্গে আপামর সাধারণের ঘনিষ্ঠ যোগতা নিয়ন্ত্রণ করবে রাষ্ট্র। বোম্বাইয়ের শিল্পপতিরা আর একটি পরিকল্পনা প্রচার করেছিলেন। গান্ধী-প্ল্যানের সঙ্গে এর মূলগত পার্থক্য ছিল, কারণ এ প্ল্যান বা পরিকল্পনা নগর-কেন্দ্রিক, আর এতে সর্ব্বসাধারণের উপকারের চেয়ে ধনিক গোষ্ঠীরই বেশী

উপকার হবার কথা। এই সময়ে ভারত গবর্ণমেণ্টের তরফে শাসন-পরিষদের অন্যতম সদস্য সার্ আর্দেশীর দালাল একটি তৃতীয় পরিকল্পনাও প্রচার করেন। বলা বাহুল্য, তাতে সরকারেরই সুযোগ-সুবিধা বেশী ক'রে দেখা হয়েছে। ভারতবর্ষের শিল্পোন্নতিমূলক পরিকল্পনার কথা আলোচনাকালে স্বতঃই এক-জনের কথা মনে হয়। তিনি হলেন আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তিনি আজীবন ভারতবর্ষের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। স্বদেশবাসী জনগণের দুঃখ-দৈন্য তাঁর মর্ম্মে বড়ই আঘাত দিত। তিনি বৈজ্ঞানিক হ'য়েও বেঙ্গল কেমিক্যাল ও অন্য বিবিধ শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনে তৎপর হয়েছিলেন। তিনি এই বৎসর ১৯৪৪ সালের ১৬ই জুন ইহধাম ত্যাগ করেন।

১৯৪২ সালে কংগ্রেস বে-আইনী ঘোষিত হওয়ায় রাষ্ট্রীয় আন্দোলন পরিচালনার ভার মোস্‌লেম লীগ এবং হিন্দু মহাসভার উপরেই পতিত হয়। কিন্তু এরা পরস্পর-বিরোধী প্রতিষ্ঠান। একে অন্যকে বরাবর সন্দেহের চক্ষেই দেখেন। ১৯৪৪ সালে মোস্‌লেম লীগের প্রতিপত্তি লীগ-প্রস্তাবিত অঞ্চলেও যেন কতকটা হ্রাস পেতে থাকে। পঞ্জাবে ইউনিয়নিষ্ট দল লীগের সঙ্গ ছেড়ে স্বয়ংপূর্ণ ভাবেই মন্ত্রীসভা গঠন করেন। এই বৎসর কংগ্রেস সদস্যগণ পুনরায় কেন্দ্রীয় ও অন্যান্য ব্যবস্থা-পরিষদে যোগদান করতে আরম্ভ করলেন। কেন্দ্রে এবং বিভিন্ন প্রদেশে এর প্রতিক্রিয়া হ'ল খুব। আসাম ও সিন্ধু প্রদেশে কংগ্রেসীদের প্রভাব অনুভূত হ'ল এবং মন্ত্রীসভা অনেকটা কংগ্রেসের সঙ্গে আপোষ-রফা ক'রেই জীইয়ে রাখা হ'ল। কেন্দ্রীয় পরিষদের কংগ্রেস দলের নেতা ভুলাভাই দেশাই এবং মোস্‌লেম লীগ দলের সহ-নেতা নবাবজাদা লিয়াকত আলী একযোগে কেন্দ্রীয় শাসন-পরিষদ জাতীয়ভাবে গঠন করার ভিত্তিতে একটি প্রস্তাব রচনা করেন। এ কথা প্রকাশিত হ'লে এর অনুকূলে ও প্রতিকূলে নানারূপ আলোচনা হয়। তবে মূল প্রস্তাবটি সাধারণের নিকট থেকে গোপন রেখেই বড়লাটের হস্তে প্রদান করা হয়েছিল। বড়লাট এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসন-পরিষদ সংস্কার করার জন্য উদ্যোগী হলেন।

১৯৪৫ সালের আরম্ভাবধি আন্তর্জ্জাতিক এবং ভারতের আভ্যন্তরিক দুই দিকেই আশার আলো দেখা যাচ্ছিল। জার্ম্মান বাহিনী সকল রণক্ষেত্র থেকেই ক্রমে ক্রমে হটে গিয়ে এ বৎসরের প্রথম দিকে নিজ দেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য

হয়। প্রাচ্যে জাপান নিজ শক্তি কতকটা অব্যাহত রাখলেও মিত্রশক্তি কর্ত্তৃক নানা দিক থেকেই আক্রান্ত হবার উপক্রম হয়। মিত্রবাহিনীর উদ্দেশ্য ছিল প্রথমে জার্ম্মানীকে ঘায়েল করা, আর এইজন্য তারা সেখানে সর্ব্বশক্তি নিয়োজিত করলে। তবে এক্ষেত্রে সোভিয়েট রুশিয়ার কৃতিত্বই সকলের চেয়ে বেশী। দীর্ঘ আঠার শ' মাইল ব্যাপী রণাঙ্গণে জার্ম্মানীর সঙ্গে লড়াই ক'রে যাকে অতি দ্রুত পিছিয়ে যেতে হয়েছিল, প্রায় দেড় বৎসরের মধ্যে সে এত শক্তি অর্জ্জন করলে যে, এককালের অপরাজেয় জার্ম্মান বাহিনীকে শুধু রুশভূমি থেকে বিতাড়িত নয়, একেবারে জার্ম্মানীর সীমান্তে হটিয়ে নিয়ে গেল। এ মোটেই সামান্য কথা নয়। রুশিয়া নিজ কৃতি গুণেই বিশ্ববাসীর শ্রদ্ধা অর্জ্জন করলে।

আন্তর্জ্জাতিক অবস্থা যখন এইরূপ, তার মধ্যে লর্ড ওয়াভেল দেশাই-লিয়াকত আলি প্রস্তাব নিয়ে এই বৎসরের (১৯৪৫) মার্চ্চ মাসে লণ্ডন যাত্রা করেন। ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ক'রে পক্ষকালের মধ্যেই তাঁর ভারতবর্ষে ফিরে আসার কথা ছিল, কিন্তু তাঁকে সেখানে প্রায় আড়াই মাস এইজন্য অবস্থান করতে হয়। আন্তর্জ্জাতিক অবস্থা এই সময় খুবই জটিল হ'য়ে উঠে, তবে এপ্রিল মাসের শেষে জার্ম্মানীর পতন ঘটায় এ অবস্থার শীঘ্রই রেখাপাত হ'ল। বড়লাট মিঃ চার্চ্চিল, মিঃ আমেরি প্রমুখ মন্ত্রীসভার সদস্যদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শেষ ক'রে একটি সর্ব্বসম্মত পরিকল্পনা নিয়ে (১৯৪৫) ১২ই জুন তারিখে ভারতবর্ষে ফিরে এলেন। এর দু'দিন পরে ১৪ই জুন তিনি বেতারে ঘোষণা করলেন যে, কেন্দ্রীয় আইন-সভাদ্বয়ের দলপতিগণ, প্রাক্তন ও বর্ত্তমান প্রাদেশিক মন্ত্রিগণ, মহাত্মা গান্ধী ও মহম্মদ আলী জিন্না এই কয়জন সদস্য নিয়ে পরবর্ত্তী ২৫শে জুন শিমলায় একটি বৈঠক আহূত হবে, উদ্দেশ্য বড়লাট ও জঙ্গীলাট বাদে বর্ণহিন্দু ও মুসলমান সমানসংখ্যক সদস্যের (৫ : ৫) ভিত্তিতে দশ জন এবং আরও পাঁচ জন—মোট পনর জন সদস্য নিয়ে একটি সাময়িক শাসন-পরিষদ গঠন। এই পরিষদের কাজ হবে প্রধানতঃ দুটি—(১) জাপানী বিতাড়নে ভারতবাসীর সর্ব্বপ্রকার সহযোগিতা এবং (২) ভাবী শাসন-তন্ত্র রচনার জন্য ব্যবস্থা। মহাত্মা গান্ধী বৈঠকে উপস্থিত হ'তে অসম্মত হওয়ায় তাঁর স্থলে কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ আহূত হলেন। এখানে এ কথা বলা আবশ্যক

যে, ইতিপূর্ব্বেই কোন কোন নেতা অসুস্থতা নিবন্ধন কারামুক্ত হ'লেও, ওয়ার্কিং কমিটির সকল সদস্যকেই এই সময় মুক্তি দেওয়া হয়। দেশের তখনকার অবস্থা বিবেচনায় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বড়লাটের কোন কোন কথা পরিষ্কার বুঝে নিয়ে বৈঠকে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। বৈঠক ২৫শে জুন আরম্ভ এবং পরবর্ত্তী ১৪ই জুলাই পরিসমাপ্ত হয়। বৈঠকের প্রারম্ভিক আলোচনায় ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র আশার সঞ্চার হয়েছিল, কারণ ওয়াভেল বলেছিলেন কোন একটি সম্প্রদায়ের বিরোধিতায়ই বৈঠক ভেঙ্গে দেওয়া হবে না। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁর কথা টিকল না। কেন্দ্রীয় শাসন-পরিষদের সকল মুসলমান সদস্যই মোস্‌লেম লীগের মনোনীত সদস্য হওয়া চাই—জিন্না এই জিদ ধরলেন। বড়লাট স্বতঃই এই জিদ মেনে নিতে পারলেন না। এ কারণ শেষ পর্য্যন্ত কোন সিদ্ধান্তে উপনীত না হ'য়েই শিমলা সম্মেলন বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'ল। লর্ড ওয়াভেল ব্যর্থতার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ ক'রে নেতৃবৃন্দকে এই আশ্বাস দিলেন যে, তিনি যে কার্য্য আরম্ভ করেছেন তা থেকে আপাততঃ বিরত হ'লেও পুনরায় আলাপ-আলোচনা সুরু করা হবে।

মহাসমরের মধ্যে কংগ্রেসকে দাবিয়ে রেখে ভারতবর্ষের ধন জন নিজ প্রয়োজনে স্বেচ্ছামত ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ ব্যবহার করতে থাকেন। বাইরে, বিশেষতঃ আমেরিকায় কিন্তু প্রচারিত হ'ল যে, এসবই ভারতবর্ষের স্বেচ্ছাকৃত দান। তাদের একথা স্পষ্ট ক'রে বুঝাবার জন্যই বোধ হয় সেখানে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলনে ভারতবর্ষ থেকে বেসরকারী প্রতিনিধি প্রেরিত হলেন। এইসব প্রতিনিধির মধ্যে পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু, গগনবিহারীলাল মেহ্‌টা ও আবদুর রহমান সিদ্দিকী কিন্তু সেখানে গিয়ে ভারতবাসীর দুঃখ-দৈন্য ও শাসন-তান্ত্রিক বিষম অবস্থার কথাও প্রকাশ ক'রে দিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে ব্রিটিশ পক্ষ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গত পাঁচ বৎসরব্যাপী যে প্রচারকার্য্য চলেছিল তার ব্যাপকতা ও কার্য্যকারিতা দেখে তাঁরা বিস্মিত হ'য়ে যান।

এই বৎসরের প্রথমে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আহ্বানে ভারতবর্ষ থেকে এক বৈজ্ঞানিক মণ্ডলী বিলাতের ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমরশিল্প কেন্দ্রসমূহে আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি কিরূপে কাজে লাগানো হচ্ছিল তা

প্রত্যক্ষ করবার জন্য উভয় দেশেই বিমানযোগে গমন করেন। এই মণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন ডক্টর মেঘনাদ সাহা, সার্ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ডক্টর শিশিরকুমার মিত্র, সার্ শান্তিস্বরূপ ভাটনগর প্রভৃতি। তাঁরা উভয় দেশেরই কার্য্যকলাপ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা একথাও বুঝেছেন যে, দেশের শাসনভার দেশবাসীর হস্তে না এলে কোন-রূপ উন্নতিরই আশা নেই। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বঙ্গের দুর্দ্দশা ও মন্বন্তরের কথাও ব্রিটিশ সুধীমণ্ডলীর নিকট ব্যক্ত করেছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান কালেও তাঁরা অনুরূপ কথা ব্যক্ত করেন। কিন্তু সেখানে গমন ও প্রস্থান ব্যতীত তাঁদের সম্বন্ধে অন্য কোন সংবাদই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় নি। তাঁদের কোন বক্তৃতা যাতে সংবাদপত্রে প্রকাশিত না হয়, সে সম্বন্ধে ভারতের প্রাক্তন বড়লাট ও যুক্তরাষ্ট্রের বর্ত্তমান ব্রিটিশ রাজদূত লর্ড হালিফাক্সের (আগেকার লর্ড আরুইন) নির্দ্দেশ ছিল। বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীর স্বদেশ প্রত্যাগমনের পরে ভারতবর্ষের কয়েকজন শিল্পপতি এবং অর্থনীতিবিদ্‌ও উভয় স্থলে গমন করেছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন সার্ আর্দেশীর দালাল, ঘনশ্যামদাস বিরলা ও নলিনীরঞ্জন সরকার। যুদ্ধোত্তর ভারতের পুনর্গঠনে ঐ দুটি দেশ থেকে বিশেষ কোন সাহায্য পাওয়ার আশা নেই—ফিরে এসে তাঁরা এই কথাই ব্যক্ত করেন।

এখানে আর একটি কথা বলে নি। ইতিপূর্ব্বে ক্রিমিয়ার ইয়াল্টা সম্মেলনে চার্চ্চিল রুজভেল্ট ষ্টালিন ত্রয়ী সম্মিলিত হয়ে জার্ম্মানীর আশু পতনের ব্যবস্থা করার সঙ্গে সঙ্গে এ বিষয়ও স্থির করেন যে, ক্যালিফর্ণিয়ার প্রধান শহর সান্‌ফ্রান্সিস্কোতে ১৯৪৫ সালের ২৫শে এপ্রিল সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনমূলক সমস্যাগুলির সমাধান সম্পর্কে আলোচনার জন্য এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। যথাসময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে মহাসমারোহে বৈঠক আরম্ভ হয়। পঞ্চাশটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি এতে যোগদান করেন। ভারত-সরকার প্রতিনিধি পাঠালেন সার্ রামস্বামী মুদোলিয়ার ও সার্ ফিরোজ খাঁ নূনকে। উভয়েই সরকারের পরম ভক্ত, অগণিত ভারতবাসীদের মুখপাত্র রূপে তাঁদের মুখ থেকে কোন কথা বের হওয়া একেবারেই অসম্ভব। সৌভাগ্য-ক্রমে এই ভার নিলেন শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত মহোদয়া। তিনি ইতিপূর্ব্বেই

আমেরিকায় গমন করেন। বৈঠক-গৃহে তাঁর স্থান হয় নি বটে, কিন্তু বৈঠকের বাইরে সাধারণ সভায় এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের নিকট ভারতবাসীর মর্ম্মবাণী অনবদ্য ভাষায় ব্যক্ত করলেন। ভারতবাসী স্বাধীনতা-কামী হ'য়েও ফাসিষ্ট-নাৎসী-বিরোধী গণতন্ত্রমূলক রাষ্ট্রেরই পক্ষপাতী—এই কথা তিনি ভারতবাসীর হ'য়ে সকলকে জানিয়ে দিলেন। বৈঠকের মধ্যেও পরাধীন ভারতবাসীদের বিষয় রুশ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ মলোটোভ পোলণ্ড প্রসঙ্গে উত্থাপন করেছিলেন।

সানফ্রান্সিস্কো বৈঠক আরম্ভ হ'তেই জার্ম্মানীর পরাজয় ঘটে। এর পর ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রুশিয়ার নেতৃবৃন্দ বার্লিনের পট্সডামে বসে তার বিধিলিপি রচনা করেন। জার্ম্মানীকে চার ভাগে ভাগ ক'রে ফ্রান্স, ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রুশিয়া এই চারিটি রাষ্ট্র তাদের উপর খবরদারি করার ভার গ্রহণ করে। এই চারিটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের নিয়ে সর্ব্বোপরি একটি কমিশন গঠিত হ'ল। এই কমিশন পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা ও সমগ্র জার্ম্মানী সম্পর্কে যে-সব ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার তা সবই করবেন। সামরিক শক্তি ও শিল্প বাণিজ্য বিনষ্ট ক'রে জার্ম্মানদের একটি কৃষিজীবী জাতিতে পরিণত করারই চেষ্টা সেখানে চলে।

জার্ম্মানীর এই বিধিলিপি রচনায় ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল যোগ দিয়েছিলেন কিন্তু এতে তিনি স্বাক্ষর করতে পারেন নি; এ অধিকার লাভ করেন মিঃ ক্লেমেণ্ট এট্লি। কারণ ইতিমধ্যেই গত জুলাই মাসে (১৯৪৫) ব্রিটেনে যে সাধারণ নির্ব্বাচন হয় তাতে শ্রমিক দলের সম্পূর্ণ জয়লাভ ঘটে এবং মিঃ এট্লির নেতৃত্বে শ্রমিক মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। যুদ্ধকালে মিঃ চার্চ্চিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে বিপদ থেকে বাঁচালেও তাঁর হঠকারিতায় এবং রক্ষণশীল দলের ধনিক মনোবৃত্তিসুলভ ব্যবস্থায় ব্রিটিশ জনসাধারণ বিদ্বিষ্ট হ'য়ে উঠেছিল। এর ফল সাধারণ নির্ব্বাচনে রক্ষণশীল দল হাতে হাতেই পেল। মিঃ চার্চ্চিল নির্ব্বাচনে জয়লাভ করলেন বটে, কিন্তু রক্ষণশীল দলের বহু সদস্য হেরে গেলেন। এর ফলে পার্লামেণ্টে তাঁদের সংখ্যাধিক্য আর রইল না। ভারত-সচিব কুখ্যাত আমেরিও নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে পরাজিত হলেন। এ সময় ভারত-সচিব হলেন প্রায় পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধ লর্ড পেথিক লরেন্স।

জার্ম্মানীর পরাজয়ের পর শীঘ্র শীঘ্র জাপানের পতন ঘটাবার জন্তই ভারতবাসীর সহযোগিতা বিশেষ প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছিল। কিন্তু এ কার্য্য অন্য উপায়ে অতি দ্রুত সংসাধিত হয়। ব্রিটেন ও আমেরিকার তুষ্টি সাধনের জন্য আন্তর্জ্জাতিক নীতি পরিহার ক'রে (১৯৪৫) ৮ই আগষ্ট সোভিয়েট রুশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ও ক্রমে মাঞ্চুরিয়ার দিকে অগ্রসর হ'তে থাকে। আর এই দিনেই যুক্তরাষ্ট্র বিমানবাহিনী নবাবিষ্কৃত এটম বম্ব্ বা আণবিক বোমা বর্ষণ ক'রে হিরোশিমা শহরটি একেবারে নিশ্চিহ্ন ক'রে দেয়। এর দু'দিন পরে নাগাসাকির উপরেও তারা এইরূপ একটি বোমা ফেলে। এই দুই স্থানে বোমা বর্ষণে দুই লক্ষ লোক নিহত হয়েছে! ঘর-বাড়ী পশুপক্ষী তো নেই-ই। জাপান-কর্ত্তৃপক্ষ আণবিক বোমার ধ্বংসকারিতা দেখে জাতিকে নিছক প্রাণে বাঁচাবার জন্যই ১৫ই আগষ্ট তারিখে আত্মসমর্পণ করলেন। কয়েকদিনের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলের জাপান-বাহিনীও অস্ত্র ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। মিত্রশক্তির পক্ষে মার্কিন জেনারেল ম্যাক আর্থার যথোপযুক্ত নৌবাহিনী, স্থলবাহিনী ও বিমানবাহিনী সঙ্গে নিয়ে জাপানে উপস্থিত হন। পরবর্ত্তী ২রা সেপ্টেম্বর জাপানের পরাজয়-স্বীকার মূলক শর্ত্তাবলী স্বাক্ষরিত হয়। জাপান নিরস্ত্র ও শিল্প বাণিজ্যাদি বিচ্যুত হ'য়ে একটি তৃতীয় শ্রেণীর রাষ্ট্রে পরিণত হবার উপক্রম হ'ল।

'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্ম্মি' নামে একটি বাহিনী সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে জাপানীর সপক্ষে যুদ্ধ করেছিল। সুভাষচন্দ্র ব্যাঙ্কক থেকে বিমানযোগে জাপান যাবার পথে বিমান-সংঘর্ষে আঘাতপ্রাপ্ত হন এবং হাসপাতালে মারা যান, জাপানী পক্ষে এইরূপ ঘোষণা করা হয়েছিল। অনেকেই এ সংবাদে আস্থা স্থাপন করতে পারেন নি। তবে সুভাষচন্দ্রের যদি সত্যই মৃত্যু ঘটে থাকে, তাহ'লে ভারতমাতা তাঁর একজন বীর সন্তান অকালে হারালেন ব'লে সকলেরই যথেষ্ট আক্ষেপের কারণ হবে। জাপানের পতনের পর, ভারত-সরকার সুভাষচন্দ্রের মধ্যমাগ্রজ শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়কে ১৪ই সেপ্টেম্বর মুক্তি দেন। সুভাষচন্দ্রের নিখোঁজ হওয়ার পর বসু-পরিবারের উপর অকথ্য নির্য্যাতন উৎপীড়ন হয়েছে। তাঁরা এ সকল নীরবে সহ্য ক'রে অদ্ভুত ধৈর্য্য ও মহত্ত্বেরই পরিচয় দিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে তখনকার কংগ্রেস-নীতিরই পূর্ণ সমর্থক ছিলেন।

শ্রমিক দল পার্লামেণ্টে অন্যনিরপেক্ষ সংখ্যাধিক্য লাভ করায় অনেকের মনে কতকটা আশার সঞ্চার হয়। শ্রমিক মন্ত্রীসভার আহ্বানে বড়লাট লর্ড ওয়াভেল আগষ্ট মাসের শেষে পুনরায় বিলাত গমন করেন। সেখানে তিন সপ্তাহ থেকে কর্ত্তাব্যক্তিদের সঙ্গে ভারত-শাসন সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা সেরে ১৫ই সেপ্টেম্বর ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। ১৯শে সেপ্টেম্বর একটি বেতার বক্তৃতায় তিনি শ্রমিক মন্ত্রীসভার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। তিনি বলেন যে, পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থানুসারে আগামী শীতকালে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন-সভার নির্ব্বাচন হবে এবং নির্ব্বাচন হ'য়ে গেলে তিনি নির্ব্বাচিত সদস্যদের প্রতিনিধিবর্গকে নিয়ে একটি বৈঠক আহ্বান করবেন। এই বৈঠকে ধার্য্য হবে—ক্রিপ্‌স প্রস্তাব অনুসারে বা অন্য কোন উপায়ে শাসন-তন্ত্র-রচনা পরিষদ গঠিত হ'য়ে শাসন-তন্ত্র রচনা করা হবে কিনা। তবে ইতিমধ্যে সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য্য পরিচালনাকল্পে প্রধান দলগুলির সম্মতি নিয়ে একটি প্রতিনিধিমূলক শাসন-পরিষদ গঠনের জন্য তিনি চেষ্টা করবেন। এই সময়ে আবার অনেক কারারুদ্ধ রাজনৈতিক বন্দীদেরও মুক্তি দেওয়া হয়।

লর্ড ওয়াভেলের ঘোষণায় ভারতবাসীদের মধ্যে আবার নানারূপ আলোচনা আরম্ভ হয়। ১২ই সেপ্টেম্বর পুণায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসে এবং পরবর্ত্তী কয়েকদিন পর্য্যন্ত অধিবেশন চলে। আলোচনাদির পর নানা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়। দীর্ঘ তিন বৎসর পরে ২১ শে, ২২শে ও ২৩শে সেপ্টেম্বব বোম্বাইয়ে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হ'ল। পুণায় যে-সব প্রস্তাব কমিটির বিবেচনার জন্য সুপারিশ করা হয়, কমিটি তা সবই গ্রহণ করেন। একটি প্রস্তাবে বিখ্যাত আগষ্ট প্রস্তাবের প্রতি জাতির পূর্ণ আস্থা বিঘোষিত হয়। লর্ড ওয়াভেলের ঘোষণায় নূতন কিছু পাওয়া না গেলেও নেতৃবর্গ আলাপ-আলোচনায় যোগ দিতে সম্মত হলেন। আসন্ন নির্ব্বাচনে যোগদানের অনুকূলেও তাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সুভাষচন্দ্র পরিচালিত 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্ম্মি'র লোকেদের প্রতি দুর্ব্যবহারে এবং ভারত-সরকার কর্ত্তৃক তাদের 'কোর্ট মার্শাল' বা সরাসরি সামরিক বিচারে যে ভারতময় বিক্ষোভ উপস্থিত—সে সম্বন্ধেও এই অধিবেশনে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে পরিচালিত এই বাহিনীরও লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষের

অন্যনিরপেক্ষ পূর্ণ স্বাধীনতা। পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জ্জনে কংগ্রেস তাঁর সমস্ত শক্তি পূর্ব্বাপর নিয়োগ করেছেন। বোম্বাইয়ের নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে খুবই উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। ভারতবর্ষকে স্বাধীন হ'তে হ'লে সমগ্র এশিয়া থেকেই সাম্রাজ্যবাদ উচ্ছিন্ন হওয়া প্রয়োজন।

বোম্বাইয়ে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের পর ভারতবর্ষের আকাশে বাতাসে নূতন আশার আলো দেখা দিলে। অন্যদিকে তেমনি ভাবী অমঙ্গলের প্রতিরোধকল্পে জাতির দৃঢ়সঙ্কল্পের কথাও বিঘোষিত হ'ল। মিত্র-শক্তি পূর্ব্ব-পশ্চিমে সর্ব্বত্রই বিজয়লাভ করেছে, কিন্তু মিত্রশক্তির অন্যতম প্রধান কর্ণধার ব্রিটেন মহাসমরে বিধ্বস্ত ও বিপর্য্যস্ত। মহাসমরের ভিতরে ভারত-শাসনে সে যে কঠোরতা অবলম্বন করেছিল তা অব্যাহত রাখা এর এই বিপর্য্যস্ত অবস্থায় আদৌ সম্ভব ছিল না। ওয়াভেল কর্ত্তৃক আহূত শিমলা সম্মেলনের মধ্যে ব্রিটেনের নূতন নীতি অবলম্বনের প্রথম নির্দ্দেশ পাওয়া গেল। কিন্তু বিলাতে রক্ষণশীল দলের পরাজয় এবং বিপুল সংখ্যাধিক্যে শ্রমিকদলের জয়লাভ ও মন্ত্রীসভা গঠনের দরুণ শিমলা সম্মেলনে যার সূচনা হয়েছিল তাকে পুরাপুরিভাবে ত্বরান্বিত করার আগ্রহ এসময়কার অনুসৃত নীতিতে লক্ষিত হ'তে লাগল। সকলেই বুঝলে ভারতবর্ষ সম্পর্কে পূর্ব্বযুগের নীতি একেবারে বর্জ্জিত হবে— ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের আশু সম্ভাবনা। পূর্ণ স্বাধীনতালাভ ভারতবাসী মাত্রেরই যে মনোগত অভিপ্রায়—শ্রমিক সরকার এটি লক্ষ্য না ক'রে পারেন নি।

বস্তুতঃ মহাসমরের মধ্যে এবং বিশেষ ক'রে মহাসমর শেষ হবার মুখে মিত্রশক্তিবর্গের নেতৃস্থানীয়েরা পরাধীন ও বিধ্বস্ত দেশসমূহের রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের সম্পূর্ণ অধিকার যে ঐ ঐ অঞ্চলকে দেওয়া হবে, বিভিন্ন সনন্দে তাদের এই ঘোষণা নূতন আশার সঞ্চার করে খুবই। মহাসমরে ভারতবাসীদের পূর্ণ সহযোগিতা লাভের উদ্দেশ্যে ব্রিটেন মাঝে মাঝে ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের বাণী ঘোষণা করে সত্য, কিন্তু ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতাকামী কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান এবং কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের উপর যে কঠোর নীতি অবলম্বন করা হয়, তাতে তার সদিচ্ছায় জনসাধারণ তেমন আস্থা স্থাপন করতে পারে নি। তথাপি মিত্রশক্তির কর্ণধারগণের বিধ্বস্ত,

বিজিত এবং পরাধীন দেশসমূহকে স্বাধীনতা দানের সঙ্কল্প বার বার ঘোষণা করায় ভারতবাসীরাও কতকটা আশ্বস্ত হয় এবং স্থানীয় স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমানবাহিনীতে ভারতীয় যুবকেরা দলে দলে যোগদান করে। একদিকে কংগ্রেসের স্বাধীনতালাভের সঙ্কল্পে বহু বৎসর ব্যাপী নির্য্যাতন-নিপীড়ন সহ্য করায় এবং অন্যদিকে মিত্রশক্তিবর্গের স্বাধীনতা দানের ঘোষণায় ভারতবাসী জনসাধারণ, বিশেষ ক'রে ভারত-সরকারের পুলিস বিভাগ, বে-সামরিক বিভাগ এবং সামরিক বিভাগের কর্ম্মিবৃন্দ এই স্বাধীনতা-মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়েছিল। শ্রমিকদলের নেতৃবৃন্দ বিলাতের মন্ত্রীসভা গঠনের পর এই বিষয়টিও বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য করেছিলেন। ব্রিটেনের তখন এমন শক্তি ছিল না, যাতে ভারত-বাসীর প্রাণের অন্তঃস্থলে এই নব-উদ্ভাসিত স্বাধীনতা স্পৃহাকে দমিত বা স্তিমিত ক'রে রাখে। তারা অগত্যা ভারতবাসীকে যত শীঘ্র সম্ভব আপোষ-রফার ভিত্তিতে স্বাধীনতা দানের মনস্থ করলেন।

এদিকে ১৯৪৫ সালের অক্টোবর থেকে পরবর্ত্তী ছ'মাস ধ'রে এমন সব ঘটনা ঘটতে আরম্ভ হ'ল, যাতে ভারতবাসীর ভেতরে অন্তর্দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও স্বাধীনতা স্পৃহা অতিমাত্রায় বেড়েই চলল। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই আমাদের মনে আসে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্ম্মি বা 'আজাদ হিন্দ ফৌজের' বিচারের কথা। আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্ব্বেই কিছু উল্লেখ পেয়েছি। এতদিন মাত্র আভাস ইঙ্গিতে এই ফৌজের বীরত্বপূর্ণ কার্য্যকলাপের কথা কিছু কিছু জানা সম্ভব হয়। শত্রু-পক্ষের বেতার-বক্তৃতা শোনা যুদ্ধকালে ছিল মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডার্হ। নেতাজী সুভাষচন্দ্র জাপানী দলে যোগ দিয়েছেন ব'লে মিত্রশক্তিবর্গ এবং বিশেষ ক'রে ব্রিটেন তাঁকে শত্রু ব'লে ঘোষণা করে। তাঁর বেতার-বক্তৃতা শোনা বা তাঁর কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ আলোচনা তখন শত্রুর কার্য্য ব'লেই গণ্য হ'ত। এতদিন ব্রিটিশ-সরকার সুভাষচন্দ্রের বা তাঁর পরিচালনাধীন আজাদ হিন্দ ফৌজের কথা আমাদের কিছুই জানতে দেন নি। জাপানের পতন আসন্ন বুঝে সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ ফৌজকে মিত্রশক্তিপুঞ্জের নিকট আত্মসমর্পণ করতে নির্দ্দেশ দিয়ে বিমান যোগে জাপান যাত্রা করেন। পথিমধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়েছে ব'লে যে সংবাদ প্রচারিত হয়, তার বিষয় আগেই বলেছি। এখন এই

আত্মসমর্পণকৃত আজাদ হিন্দ ফৌজের সামরিক বিচার প্রহসনের সুরু হ'ল দিল্লীর রেড ফোর্টে (১৯৪৫), ৫ই নবেম্বর তারিখে।

নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির পুনা অধিবেশনের মূল প্রস্তাবে যেরূপ আশঙ্কা করা হয়েছিল, তাই যেন ঘটে চলল অবিরাম গতিতে। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের মনোভাব আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্পর্কে যে বিন্দুমাত্র বদলেছে এরূপ মনে হ'ল না। তাঁরা সামরিক আদালত বসিয়ে এই বাহিনীর তিনজন প্রধান নেতাকে সরাসরি বিচারে সাজা দেবার ব্যবস্থা করলেন। এই নেতৃত্রয় ছিলেন— কর্ণেল পি. কে. সায়গল (হিন্দু), মেজর জেনারেল শা নওয়াজ খান (মুসলমান) এবং কর্ণেল জি. এস. ধিলন (শিখ)। ইতিপূর্ব্বে সুভাষচন্দ্রের প্রতি কংগ্রেসের উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের বিরূপ মনোভাব আমরা বার বার লক্ষ্য করেছি। সুভাষচন্দ্রের ভারত ত্যাগ, শত্রুপক্ষে যোগদান ইত্যাদি নিয়ে সমালোচনাও যে না হয়েছিল তা নয়। কিন্তু ১৯৪২ সালের প্রথমেই সুভাষচন্দ্রের প্রতি মহাত্মা গান্ধীর মনোভাব সম্পূর্ণ বদলে যায়। সুভাষচন্দ্র যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জ্জনে জীবনপণ ক'রে বিবিধ আয়োজনে লিপ্ত এ বিশ্বাসও তাঁর মনে উদিত হয়। তাঁর এই দৃঢ় বিশ্বাসের কথা উল্লেখ ক'রে সার্ ষ্টাফোর্ড ক্রিপস্ কোন কোন কংগ্রেস নেতার নিকট অনুযোগও করেছিলেন। কিন্তু মিত্রশক্তিপুঞ্জের বিরুদ্ধ প্রচার সত্ত্বেও মহাত্মা গান্ধীর এই অনুকুল ধারণা ক্রমে অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের মনেও অনুক্রামিত হয় এবং এই কারণেই সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ বাহিনী সম্বন্ধে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির বোম্বাই অধিবেশনে তাঁরা উপরি-উক্ত মর্ম্মে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন।

দিল্লীর রেড ফোর্টে সামরিক আদালতে আজাদ হিন্দ বাহিনীর নেতৃবৃন্দের বিচারের আয়োজনে দেশব্যাপী গণবিক্ষোভ উপস্থিত হ'ল। বাহিনীর পক্ষে কংগ্রেস মোকদ্দমা পরিচালনার ভার গ্রহণ করলেন বোম্বাইয়ের এককালের এড্ভোকেট জেনারেল এবং তৎকালীন কেন্দ্রীয় আইন-সভার কংগ্রেস দলের অধিনায়ক ভুলাভাই দেশাই এই মোকদ্দমায় আসামী পক্ষে প্রধানতম উকিল রূপে অংশগ্রহণ করেন। আশ্চর্য্যের বিষয় পণ্ডিত জবাহর লাল নেহ্রু দীর্ঘকাল পরে পুনরায় ব্যবহারজীবীর শামলা পরে ভুলাভাইয়ের সহকারীরূপে আদালতে মামলা পরিচালনা করতে লাগলেন। মামলায় অন্যতম

প্রধান কৌসুঁলীরূপে যোগ দিলেন বিখ্যাত উদারনৈতিক নেতা ও বিচক্ষণ ব্যবহারজীবী সার্ তেজবাহাদুর সাপ্রু। লীগপক্ষে কোন কোন মুসলমান নেতাও কৌঁসুলী হ'য়ে মোকদ্দমায় অংশ গ্রহণ করেন। দেশব্যাপী যেমন বিক্ষোভ উপস্থিত হয়েছিল তেমনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পতাকাবাহীদের মুক্তিদানের জন্যে সর্ব্বত্র উৎসাহ-উদ্দীপনারও অন্ত ছিল না। প্রত্যেকের মনেই দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছিল যে, সামরিক আদালতের বিচার প্রহসনে যদি বা কারও দণ্ড হয়, তবে তা সাময়িক মাত্র। তা আজ হোক কাল হোক মকুব হবেই।

বিচার আরম্ভেই সুভাষচন্দ্র পরিচালিত আজাদ হিন্দ বাহিনীর সাহসিকতাপূর্ণ কার্য্যকলাপের বিষয় আমরা কতকটা জানতে পেলাম সরকার পক্ষের উকিল প্রমুখাৎ। পক্ষ প্রতিপক্ষের সওয়াল জবাবে এই বাহিনীর উদ্দেশ্য, কার্য্যপ্রণালী এবং জীবনপণ সংগ্রামের কথাও অতি সত্বর জানা গেল। সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনে অভিনব প্রণালী অবলম্বন করেছিলেন। ফৌজের এক-একটি বাহিনীর নামকরণ হয় ভারতের স্বাধীনতা যোদ্ধাদের নামে। গান্ধী ব্রিগেড, আজাদ ব্রিগেড, নেহরু ব্রিগেড ত গঠিত হয়েছিলই, ঝাঁসী রাণী ব্রিগেড নামে একটি নারী সৈনিক বাহিনীও তিনি গঠন করেন। শত্রুপক্ষকে দ্রুত ঘায়েল করার জন্য সুভাষ ব্রিগেড নামে একটি গরিলা বাহিনী পরিচালনা করেন মেজর জেনারেল শা নওয়াজ খান।

কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ও আজাদ হিন্দ সরকার তথা আজাদ হিন্দ ফৌজের উদ্দেশ্য একই—ভারতবর্ষের অন্যনিরপেক্ষ অখণ্ড স্বাধীনতা। আজাদ হিন্দ সরকারের পক্ষে সুভাষচন্দ্র জাপানের সঙ্গে ভারতবর্ষের অন্যনিরপেক্ষ স্বাধীনতার ভিত্তিতেই চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন। তাদের কাছ থেকে প্রচুর সাহায্য নিলেও ভারতবর্ষের শাসনভার ভারতবাসীরাই গ্রহণ ও পরিচালনা করবে এই ছিল জাপানীদের সঙ্গে যোগদানের মূল উদ্দেশ্য। আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পদ্ধতি, অধিকৃত অঞ্চলে ভারতবাসীদের দ্বারা শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন, আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে স্বাধীন ভারত-সরকার প্রতিষ্ঠা, ভারত সীমান্ত পার হ'য়ে আজাদ হিন্দ বাহিনীর মণিপুর রাজ্যে প্রবেশ ও ইম্ফলের সন্নিকট পর্য্যন্ত অগ্রগতি, বাহিনীর সমর সঙ্গীত—"কদম্ কদম্ বাড়ায়ে যাও·········দিল্লী চলো, দিল্লী চলো।"—ইত্যাদি বিচিত্র বিষয় এবং

বহু বীরত্বপূর্ণ ঘটনা এই বিচারকালে আমরা সর্ব্বপ্রথম জানতে পেলাম। সুভাষচন্দ্রের সমরনীতির আরেকটি বৈশিষ্ট্য—যারা বিজিত, তাঁদের প্রতি সদয় ও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার। তিনি আজাদ হিন্দ বাহিনী এবং বহির্ভারতের সকল ভারতবাসীর দ্বারাই 'নেতাজী' এই নামে আখ্যাত হয়েছিলেন; একথাও বিচারকালে জানা গেল। আজাদ হিন্দ ফৌজ যে সত্য সত্যই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ফৌজ, একথাটিও ভারতবাসী মাত্রেরই হৃদয়ে গেথে রইল। এখানে আরও বলা আবশ্যক যে ফৌজ পক্ষে প্রধানতম কৌসুঁলী ভুলাভাই দেশাই যে দীর্ঘ বক্তৃতা করেছিলেন তা আন্তর্জ্জাতিক আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যান ব'লে বিবেচিত হবে। এই বক্তৃতাটি শুধু তথ্যপূর্ণ ব্যাখ্যান মাত্রই নয়, এটি ছিল একান্তই প্রাণস্পর্শী। বিচারে অভিযুক্ত তিনজন নেতার উপরই কঠোর কারাদণ্ডের আদেশ হ'ল বটে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এত আড়ম্বর সত্ত্বেও, তাদের প্রত্যেককেই মুক্তি দিতে সরকার বাধ্য হলেন। বুঝতে বাকী রইল না যে সরকার কর্ত্তৃক এরূপ নীতিগ্রহণের মূলে জন-বিক্ষোভ অনেকখানি কার্য্য করেছে। ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে একথাও অবশ্য আজ স্বীকার করতে হবে যে ব্রিটেনের শ্রমিক মন্ত্রীসভা ভারতবাসীর অনুকূলে তাঁদের নীতি পরিচালনা করতে সুরু করেছিলেন এইসময়।

আগেই, সেপ্টেম্বর মাসে সরকার পক্ষে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, শীতকালে ভারতবর্ষের সাধারণ নির্ব্বাচন হবে। ১৯৩৫ সালের ভারত সংস্কার আইন অনুযায়ী প্রথম সাধারণ নির্ব্বাচন হয় ১৯৩৭ সালে। এর দু'বৎসরের মধ্যেই এল দ্বিতীয় মহাসমর। তখন আর সাধারণ নির্ব্বাচনের কথা সরকারের মনেই আসে নি। ১৯৪৫ সালের শেষার্দ্ধে বিশ্ব-রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে অভিনব পট পরিবর্ত্তন হ'ল। বিপর্য্যস্ত ভারতবাসীর প্রাণেও নবীন আশার ছোঁয়াচ লাগে। সুভাষচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত বহির্ভারতে স্বাধীন ভারত সরকার প্রতিষ্ঠা এবং স্বাধীন ভারত সেনাবাহিনী গঠনের কথা প্রচারিত হওয়ায় এবং শেষ পর্য্যন্ত সামরিক আদালতের বিচারে অপরাধী সাব্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও সরকার কর্ত্তৃক বাহিনীর নেতৃবৃন্দের মুক্তিদানে সকলেরই হৃদয়ে একটি নূতন বলেরও আবির্ভাব হ'ল। এই সময়ে নূতন নির্ব্বাচনের আয়োজনে যে স্বাধীনতা আন্দোলনে লিপ্ত নিপীড়িত ব্যক্তিদের অনেকেই জনসাধারণের দ্বারা

প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হবেন সেরূপ ধারণাও আমাদের মনে দানা বাঁধল কংগ্রেস জনসাধারণের মুখপাত্র—স্বাধীনতা আন্দোলনে তার কৃতিত্ব অনন্যতুল্য আরও যখন জনসাধারণ দেখলে, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রতি কংগ্রেসের পূর্ব্ব মনোভাব একেবারে বদলে গিয়ে তাঁর আদর্শেরই তারা একান্ত অনুগামী এবং তাঁর মতই তারা ভারতবর্ষের সর্ব্বাত্মক স্বাধীনতা প্রয়াসী, তখন তারা যে নির্ব্বাচনে জনসাধারণের আন্তরিক সহানুভূতি ও সমর্থন লাভ করবে তাতে আর কারও সন্দেহের অবকাশ রইল না। মুসলীম লীগ জিন্নার নেতৃত্বে মহাসমরকালে কতকটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল বটে, কিন্তু মহাসমর অন্তে এর কর্ম্মপদ্ধতি দেশবাসীর, এমন কি মুসলমান জনসাধারণের মনেও যেন তেমন আশার সঞ্চার করতে পারলে না। শিমলা সম্মেলনের ব্যর্থতার মূলে জিন্নার অবাঞ্ছিত জিদ্ যে কার্য্য করেছে, তা বুঝতেও তাদের তেমন বেগ পেতে হয় নি। বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি সাধারণভাবে বেড়েই চলেছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারের ব্যাপার নিয়ে হিন্দু-মুসলমান এক যোগেই, কি বিক্ষোভ প্রদর্শনে, কি তাঁদের মুক্তির প্রয়াসে সমান তৎপর হয়েছিল। কিন্তু মুসলীম লীগ নেতাদের অপপ্রচারের ফলে কোথাও কোথাও যে ভেদবুদ্ধি নূতন ক'রে জাগিয়ে তোলা হয়েছিল তাও আমাদের ভুললে চলবে না। তবে আসন্ন সাধারণ নির্ব্বাচনে দেশব্যাপী যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা বিভিন্ন সম্প্রদায় ও শ্রেণীর মধ্যে দেখা গেল এবং তাদের আদর্শ সাম্য যেরূপ বিঘোষিত হ'ল তাতে আমাদের মনে হ'তে লাগল যে কংগ্রেস প্রতিনিধিদেরই প্রায় সর্ব্বত্র জয়লাভ ঘটবে। এর পরে, সাধারণ নির্ব্বাচনের ফলাফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা আন্দোলনের এক নূতন পর্ব্ব সুরু হ'ল।

জীবন—আহবে

(১৯৪৬-৪৭ ফেব্রুয়ারি)

এখানে একটু আগের কথা বলি। আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারকালে যে দেশব্যাপী বিরাট আন্দোলন উপস্থিত হয় তাতেই বুঝা যায়, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন আর বেশীদিন চলবে না। ডিসেম্বরের প্রথমে কেন্দ্রীয় আইন-পরিষদের নির্ব্বাচন সুরু হ'ল। এর ফলাফল ঘোষিত হয় ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে। এই নির্ব্বাচনে একটি বিষয় অত্যন্ত প্রকট হ'য়ে উঠল। মুসলীম লীগের দাবি—ভারতবর্ষের সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের একমাত্র মুখপাত্র সে। আর এর লক্ষ্য ভারতবর্ষে পাকিস্তান নামে একটি স্বতন্ত্র মুসলমান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। মুসলীম লীগের নেতা মহম্মদ আলি জিন্না যুদ্ধের ভিতরে কংগ্রেসের অসহযোগ নীতির সম্পূর্ণ সুযোগ নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানটিকে সুগঠিত ক'রে নিলেন। আর এতে তিনি পূর্ণ সমর্থন পেলেন স্থানীয় ও বিলাতের ব্রিটিশ শাসকবর্গের নিকট থেকে। তিনি অহরহ প্রচার করতে থাকলেন যে, মুসলমান সম্প্রদায় একটি 'সম্প্রদায়' মাত্র নয়, এ একটি স্বতন্ত্র 'জাতি'ও বটে। হিন্দু এবং মুসলমান দুই স্বতন্ত্র জাতি এবং ভারতবর্ষে দুই জাতির পক্ষে একই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত থাকা সম্ভব নয়, সমীচীনও নয়—জিন্না তথা মুসলীম লীগের এই মতবাদ দেশ-মধ্যে মুসলমান সমাজে যে গভীর শিকড় গেড়েছিল তাই প্রকাশ পায় এই সাধারণ নির্ব্বাচনে। অবশ্য লীগপন্থী মুসলমানদের পক্ষে বিভিন্ন স্থলে নির্ব্বাচনের সময় জুলুমও চলেছিল খুব। কিন্তু নির্ব্বাচনের ফল দেখে মনে হয় এই জোর-জুলুম ব্যতিরেক মাত্র।

কেন্দ্রীয় আইন-পরিষদে মুসলীম লীগ সকল মুসলীম আসন দখল করে এবং ৩০ জন মুসলীম লীগ প্রার্থীই সদস্য নির্ব্বাচিত হলেন। মোট মুসলমান ভোটদাতাদের ভিতরে শতকরা ৮৬ জনের উপর তাদের ভোট দিয়ে নির্ব্বাচন করেন। কাজেই মুসলীম লীগ ও জিন্না সমগ্র মুসলমান সমাজের

পক্ষে যে একটি স্বতন্ত্র পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবিতে স্বাধীনতা বিষয়ক আলাপ-আলোচনায় যোগদান করতে চাইবেন, একথা সহজেই অনুমেয়। ভাবী অখণ্ড স্বাধীন ভারতরাষ্ট্রের পরিকল্পনায় যে ভীষণ ব্যাঘাত ঘটবে, সাধারণ নির্ব্বাচনে মুসলীম লীগ-পক্ষীয়দের পুরাপুরি জয়লাভে তাই-ই সূচিত হ'ল। এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, পৃথক নির্ব্বাচনের ভিত্তিতেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মত এ সময়েও নির্ব্বাচন-পর্ব্ব উদ্‌যাপিত হয়।

তবে কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচনে কংগ্রেস-পক্ষীয়েরাও সাফল্য লাভ করলেন আশাতীতরূপে। তারা ভোট দাতাদের শতকরা ৯১ জনেরও উপরে ভোট পেলেন। কিন্তু মোট সদস্য সংখ্যা বিচার করলে বলতে হয় মুসলীম লীগ পন্থীদের মত তারা একক জয়লাভ করেন নি। কংগ্রেস অখণ্ড ভারত-বর্ষের বিদেশী নিরপেক্ষ পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। দীর্ঘকাল ধরে নেতৃবৃন্দ এই লক্ষ্য সম্মুখে রেখে অশেষ প্রকারে দুঃখবরণ ও ত্যাগ স্বীকার ক'রে এসেছেন। শুধু তাই নয়, যুগে যুগে যখনই স্বাধীনতা আন্দোলন সুরু হয়েছে তখনই বর্ণ-ধর্ম-শ্রেণী নির্ব্বিশেষে জনসাধারণ এতে কায়মনে যোগ দিয়ে নিরতিশয় লাঞ্ছনা ও উৎপীড়ন সহ্য করেছেন। কাজেই পৃথক নির্ব্বাচন প্রথা চালু থাকা সত্ত্বেও এই আদর্শ যে ভারতের জনচিত্তে স্থায়ী আসন লাভ করবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি! ভারতবর্ষ ব্রিটিশ আমলে ব্রিটিশ ভারত এবং ভারতীয় ভারত (করদ বা মিত্ররাজ্য) মোটামুটি এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। ব্রিটিশের শাসন একের উন্নতিকে অন্যের মধ্যযুগীয় ধরণ-ধারণের চাপে ও নানা অছিলায় ব্যাহত করতে প্রয়াস পেয়েছে অবিরত। তথাপি ভারতীয় ভারতের জনগণের চিত্তেও এই স্বাধীনতা আন্দোলনের দোলা লাগে বিভিন্ন সময়ে করদ বা মিত্র রাজ্য সমূহের লৌহ-শাসন ভেদ ক'রে। কাশ্মীরের প্রজা আন্দোলনের কথা এর দৃষ্টান্ত-স্বরূপ উল্লেখ করতে পারি। আবার কোন কোন করদ-রাজ্য যে উদার ও প্রগতিশীল ছিল না; তাও নয়। এক্ষেত্রে প্রগতিশীল রাজ্যগুলির মধ্যে বরদা ছিল শীর্ষস্থানে। কিন্তু কংগ্রেসের এই সর্ব্বব্যাপী এবং জনচিত্তজয়ী স্বাধীনতা আন্দোলনকে মহম্মদ আলি জিন্নার নেতৃত্বে মুসলীম লীগ কংগ্রেসের যুদ্ধ-কালীন অন্তরীণ অবস্থার সুযোগ নিয়ে, মুসলমান সমাজে ভিন্ন খাতে পরিচালনা করতে থাকে অবিরত। এর ফলে তথাকথিত 'শিক্ষিত'

মুসলমানেরা লীগের স্বতন্ত্র জাতি-ভিত্তিক পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দিকেই বিশেষ-ভাবে ঝুঁকে পড়লেন। সাধারণ মুসলমান সমাজ এই পাকিস্তানের মর্ম্মোদ্ঘাটন করতে অসমর্থ হ'য়েও স্বতন্ত্র জাতি ব'লে প্রচারের ফলে বেশ খানিকটা আত্মপ্রসাদ লাভ করতে লাগল।

প্রাদেশিক নির্ব্বাচন-পর্ব্বও এই শীত ঋতুতেই আরম্ভ হ'ল। ১৯৪৬ সালের জানুয়ারী মাসের মধ্যেই এ পর্ব্ব প্রায় সমাপ্ত হয়। দেখা গেল হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলিতে মুসলীম লীগ পৃথক নির্ব্বাচনের ভিত্তিতে প্রায় সকল মুসলীম আসনই অধিকার করেছে। কেন্দ্রীয় আইন-পরিষদে লীগ-পন্থী বাদে অন্য কোন মুসলমান সদস্যই সাফল্য লাভ করেন নি বটে, কিন্তু মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলির কোন কোনটিতে এর বিষম ব্যাঘাত ঘটল। দৃষ্টান্তস্বরূপ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা চলে। পঞ্জাবের সার্ খিজির হায়াৎ খানের লীগ বিরোধী ইউনিয়নিষ্ট পার্টি অনেক মুসলমান আসন দখল করে। সিন্ধুপ্রদেশেও মুসলমান স্বতন্ত্র দল হ'তে কম সদস্য এই নির্ব্বাচনে সাফল্য লাভ করেন নি। বাংলাদেশে কিন্তু লীগপন্থীরাই প্রাধান্য লাভ করেন। প্রাদেশিক নির্ব্বাচনের পর মন্ত্রীসভা গঠনের পালা। প্রথমে আসামে মন্ত্রীসভা গঠন আরম্ভ হয়। সমস্ত প্রদেশে এ শেষ হ'তে প্রায় ফেব্রুয়ারি মাস কেটে গেল। মুসলমানগরিষ্ঠ প্রদেশগুলির মধ্যে প্রথমে একমাত্র বাংলাই নিরঙ্কুশ মুসলীম লীগ মন্ত্রীসভা গঠিত হল। সিন্ধুপ্রদেশে প্রথমে কোয়ালিশন বা সম্মিলিত মন্ত্রীসভা গঠিত হ'লেও অল্পদিনের মধ্যে লীগপন্থী সদস্যরা এককভাবে লীগ মন্ত্রীসভা গঠনে সমর্থ হন।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসীরা শতকরা ৯৫ জন মুসলমান। খাঁন আব্দুল গফুর খাঁন এবং তাঁর ভ্রাতা ডাঃ খাঁন সাহেবের নেতৃত্বে এই অঞ্চলের মুসলমানেরা কংগ্রেসের দিকেই একান্তভাবে ঝুঁকে পড়েন। এই প্রসঙ্গে খাঁন আব্দুল গফুর খাঁনের ("সীমান্ত গান্ধী") দ্বারা পরিচালিত খোদাই "খিদ্‌মদ্‌গারদের" (স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী) কৃতিত্ব স্মরণীয়। ফলে সাধারণ নির্ব্বাচনে কংগ্রেস পন্থীদেরই জয়লাভ ঘটে। বলা বাহুল্য, অবিলম্বে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, মুসলমান অধ্যুষিত হ'য়েও, একেবারে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা

গঠন করে। পঞ্জাবে লীগপন্থী মুসলমানেরা নির্ব্বাচিত মুসলমান সদস্যদের মধ্যে সংখ্যাধিক্য লাভ করলেন বটে, কিন্তু মোট সদস্য সংখ্যার তুলনায় তারা সংখ্যালঘু বৈ ত নয়! কাজেই তাদের পক্ষে এখানে কোনরূপ আপোষ-রফার ভিত্তিতে লীগ মন্ত্রীসভা গঠন করা সম্ভব হ'ল না। অপরপক্ষে সার্ খিজির হায়াৎ খাঁনের নেতৃত্বে ইউনিয়নিষ্ট পার্টিভুক্ত নির্ব্বাচিত মুসলমান সদস্যগণ কংগ্রেসী সদস্য তথা হিন্দু ও শিখ সদস্যদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে 'কোয়ালিশন' বা সম্মিলিত মন্ত্রীসভা গঠনে সমর্থ হলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই সময় কংগ্রেসের সভাপতিরূপে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ লাহোরে গিয়ে লীগপন্থীদের বিপুল বাধা দান সত্ত্বেও এতাদৃশ একটি শক্তিমান যুক্ত মন্ত্রীসভা গঠন-প্রয়াসে বিশেষভাবে সাফল্য লাভ করেন। এইরূপে দেখা গেল বাংলা ও কিছু পরে সিন্ধু ব্যতীত আর কোথাও লীগ মন্ত্রীসভা গঠিত হ'ল না। তবে কি পূর্ব্বে যেরূপ বলেছি পাকিস্তান মনোবৃত্তি সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে এ সময়েও কি তেমন ক'রে আসন গাড়তে পারে নি? পরবর্ত্তী আলোচনার ক্রমের মধ্যেই এর জবাব মিলবে।

এখন এ সময়কার অন্য কতকগুলি বিষয়ের দিকে আসা যাক। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা কি ধরণের রূপ পরিগ্রহ করবে—কি জনসাধারণ, কি নেতৃবৃন্দ কারও মনে তা এ সময় স্পষ্টভাবে উদয় হয় নি। জিন্নার পাকিস্তানের দাবী তখন কারও কারও নিকট গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হ'লেও সাধারণত লোকে তখন একে একটি "বুলি" বা "চাল" মাত্র বলেই ধারণা ক'রে নিয়েছিল। সাধারণ মুসলমানদের পক্ষেও এ দাবীর সার্থকতা তেমন প্রতিভাত হ'তে পারে নি। তবে একথা সত্য যে ভারতবাসী মাত্রেই তখন স্বাধীনতা লাভের জন্য উন্মুখ হ'য়ে ওঠে। বিধ্বস্ত ব্রিটেনে শ্রমিক মন্ত্রীসভা গঠনের পর এই দলের নেতৃস্থানীয়েরা—যাঁরা এতদিন ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ ক'রে এসেছিলেন—এই সময়ে ভারতবাসীর স্বতঃপ্রণোদিত মুক্তিলাভের বাসনাকে স্পষ্ট রূপ দিতে তৎপর হলেন। তাঁদের মনোগত অভিপ্রায় এই ছিল যে, ভারতবর্ষের অধিবাসীরা দেশ-শাসনে আত্মকর্তৃত্ব লাভ করলে বিধ্বস্ত ব্রিটেনের পুনর্গঠনে তাদের সহায়তা বিশেষ করে পাওয়া যাবে। শুধু শ্রমিক মন্ত্রীসভা, শ্রমিকদল কেন, অন্যান্য

রাজনৈতিক দল তথা ব্রিটেনের সাধারণ অধিবাসীদেরও মনে তখন এই ধারণা বলবৎ হয়েছিল। ১৯৪৬ সালের প্রথমাবধি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ প্রযত্নগুলি এরই সাক্ষ্য দিচ্ছে।

এই বৎসরের ৫ই জানুয়ারী অধ্যাপক রবার্ট রিচার্ডের অধিনায়কত্বে পার্লামেণ্টের সর্ব্বদলীয় প্রতিনিধিমণ্ডলী ভারতবর্ষে এসে পৌঁছলেন—এখানকার অবস্থা স্বচক্ষে দেখবার জন্যে। অধ্যাপক রিচার্ড ১৯২৪ সালে শ্রমিক মন্ত্রীসভায় সহকারী ভারত সচিবের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি বরাবর যে সহানুভূতিশীল ছিলেন তা বলাই বাহুল্য। তিনি ও অন্যান্য প্রতিনিধিরা ভারতবর্ষে মাসখানেক অবস্থান করে কংগ্রেস, মুসলীম লীগ, হিন্দু মহাসভা, অন্যান্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও দলগুলির মুখপাত্রদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। তাঁরা ভারতবাসী মাত্রেরই রাষ্ট্রীয় মুক্তি-সঙ্কল্পের বিষয় অবগত হলেন। জিন্না কিন্তু এই প্রতিনিধি-মণ্ডলীর নিকটও তাঁর পাকিস্তানের অর্থাৎ মুসলীম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলির এক সার্ব্বভৌম রাষ্ট্র-ভুক্তির কথা পাড়তে ভোলেন নি। এই দল বিলাতে ফিরে গিয়ে তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে এবং নিজ নিজ দলকে জানালেন।

এই জানুয়ারী মাসেরই ২৮শে তারিখে কেন্দ্রীয় আইনসভার প্রথম অধিবেশনে নব নির্ব্বাচিত সদস্যগণের সম্মুখে বড়লাট লর্ড ওয়াভেল একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। ভারতবাসীর আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ যে নিতান্তই আগ্রহশীল, একথা তিনি সরকারীভাবে ঘোষণা করলেন। তবে আকাঙ্ক্ষা পূরণের পক্ষে সাম্প্রদায়িক ঐক্য স্থাপন এবং শৃঙ্খলা রক্ষা একান্ত আবশ্যক—এর উপরও তিনি বিশেষ জোর দেন। এরপর থেকে এক মাসের মধ্যে ভারতবর্ষে এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটে গেল, যার ফলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ একটি কার্য্যকর উপায় গ্রহণে ত্বরায় বাধ্য হলেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে মন্ত্রীসভা গঠনের কথা একটু আগে বলা হয়েছে। এর দ্বারা রাজনৈতিক আবহাওয়া তখন কোন্ পথে চলছিল, তার আভাসও আমরা পেয়েছি। নবজাত স্বাধীনতা স্পৃহা আপামর সকল নির্ব্বিশেষে সকল ভারতবাসীর মনেই প্রবলভাবে দেখা দিয়েছিল। যুদ্ধ-পরবর্ত্তী কতকগুলি

ঘটনায় স্পষ্ট বুঝা গেল, সরকারী কর্ম্মচারীদের বিভিন্ন শ্রেণী ও স্তরের মধ্যেও এই স্বাধীনতার স্পৃহা অনুক্রামিত হয়েছে। আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার-প্রহসনের ভিতরে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ স্বাধীনতা প্রচেষ্টার কথা সর্ব্বত্র জানাজানি হ'য়ে গেছে। সরকারী দেশরক্ষা বাহিনীর বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে এই স্পৃহা যে অতিমাত্রায় ছড়িয়েছিল তার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া গেল ১৯৪৬, ১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আরব্ধ বোম্বাইয়ের "নৌ-বিদ্রোহের" মধ্যে। নৌ-বিভাগে ব্রিটিশ অধিনায়কদের পক্ষপাত ব্যবহারে ভারতীয় যুবক কর্ম্মীদের আত্মসম্মানবোধে ভীষণ আঘাত লাগে। কিন্তু এ ছিল আশু কারণ। তবে এরূপ সমবেত ও সার্থক "বিদ্রোহের" মূলেও প্রধানত কার্য্য করেছিল প্রবল স্বাধীনতা স্পৃহা। 'নৌ-বিদ্রোহ' উপলক্ষে বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ ও করাচীতে ভীষণ হাঙ্গামার উদ্ভব হয়। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এ সময় এরূপ হাঙ্গামা বা শান্তিভঙ্গের আদৌ পক্ষপাতী ছিলেন না। তৎকালীন পারি-পার্শ্বিক অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক অবস্থা বিবেচনায় শান্তিপূর্ণভাবে যত শীঘ্র সম্ভব লক্ষ্য পথে পৌঁছতে অভিলাষী ছিলেন তাঁরা। যা হোক্ অল্প-কালের মধ্যেই "নৌ-বিদ্রোহ" ও বিভিন্ন স্থলের হাঙ্গামা, ধর্ম্মঘট প্রভৃতির অবসান হ'ল। এই হাঙ্গামার মধ্যে কলিকাতায় বিদেশী সৈন্যদের বাঁচাতে গিযে ত্যাগব্রতী কংগ্রেসসেবী জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় একটি আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। "নৌ-বিদ্রোহ" তথা হাঙ্গামা, ধর্ম্মঘট প্রভৃতির মধ্যেও একটি বিষয় কিন্তু স্পষ্টই প্রতিভাত হ'ল—ভারতবর্ষের যুবশক্তি আর এক মুহূর্ত্তের তরেও বিদেশী শাসন সহ্য করতে রাজী নয়। এ সময় অনেকেই প্রত্যক্ষ করেছেন—যুবকগণের ভিতরে কে আগে ব্রিটিশ সেনার গুলিতে আত্মাহুতি দেবে, সেজন্যে পরস্পরের ভিতরে কি প্রতিযোগিতাই না লেগে গিয়েছিল। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ এই মনোভাবের তাৎপর্য্য বিশেষভাবে অনুধাবন না ক'রে পারেন নি।

পূর্ব্বেই বলেছি শ্রমিক মন্ত্রীসভা ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রয়াসের প্রতি তখন আত্যন্তিক সহানুভূতি প্রকাশ করছিলেন। গত কয়েকমাসে ভারতবর্ষে আইনানুগ ও আইন-অতিরিক্ত যে সব আয়োজন এবং আন্দোলন পরিচালিত হয়, তাতে তাঁরা একটি কার্য্যকর পন্থা গ্রহণের আশু আবশ্যকতা অনুভব

করলেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার ও মুক্তিদান, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন-পরিষদ সমূহে স্বাধীনতাকামীদের বিপুল জয়লাভ, ভারতবাসী সরকারী, বে-সরকারী আপামর সাধারণের মধ্যে স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা বিবিধ-রূপে প্রকাশ—এ সকল শুধু শ্রমিক মন্ত্রীসভা কেন, জগতের বিভিন্ন দেশে বিশেষতঃ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃস্থানীয়দের মনেও ভারতবাসীর প্রতি আন্তরিক সহানুভূতির উদ্রেক করে। এখানে স্মরণীয় যে কলকাতার হাঙ্গামার সময় এবং পূর্ব্বেও দেখা গেছে যে মার্কিণ সেনারা ভারতবাসীর স্বাধীনতা প্রচেষ্টায় নানাভাবে সহানুভূতি প্রকাশ করেছিল। বোম্বাইয়ের "নৌ-বিদ্রোহ" ভারতবাসীর স্বাধীনতা-সঙ্কল্পের একটি সামান্য বহিঃপ্রকাশ মাত্র। ব্রিটিশ মন্ত্রীসভা এই অবস্থার মধ্যে ১৯৪৬, ১৯শে ফেব্রুয়ারি পার্লামেণ্টের উভয় সভায় 'এম্পায়ার পার্লামেণ্টারী এসোসিয়েশনের' আনুকূল্যে ভারতবর্ষে একটি কেবিনেট মিশন প্রেরণের কথা ঘোষণা করলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষে কিছুকাল অবস্থান ক'রে বিভিন্ন মত ও দলের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে এসে সত্বর একটি আত্মকর্তৃত্ব-ভিত্তিক শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তনের নিমিত্ত নিয়মতন্ত্র রচনার উপায় নির্দ্দেশ। তিনজন মন্ত্রী নিয়ে এই কেবিনেট মিশন গঠিত হ'ল। এর নেতৃপদে সমাসীন হলেন ভারতসচিব প্রবীণ শ্রমিকনেতা লর্ড পেথিক লরেন্স। অন্য দুইজন সদস্য যথাক্রমে সার্ ষ্ট্যাফর্ড ক্রিপস্ এবং এ. ভি. আলেক্জাণ্ডার। এরা দু'জনও ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার দুইটি দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত সদস্য। সার্ ষ্ট্যাফর্ড ক্রিপসের পরিচয় আমরা আগে বহুবার পেয়েছি।

কেবিনেট মিশন ভারতবর্ষে পদার্পণ করলেন ১৯৪৬ সালের ২৪শে মার্চ্চ। এদেশ থেকে তাঁরা চলে যান পরবর্ত্তী ২৯শে জুন। দীর্ঘ তিন মাস কাল তাঁরা এদেশে অবস্থান করেন। ভারতবর্ষের বিবিধ জাতীয় সভা-সমিতির নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে এসে একদিকে যেমন এখানকার আভ্যন্তরিক অবস্থার সঙ্গে নিজেদের পরিচিত ক'রে নিলেন, তেমনি অন্যদিকে বিভিন্ন দল ও মতের সামঞ্জস্য ক'রে তাদের বিচার-বুদ্ধিমত একটি স্বাধীনতা-ভিত্তিক প্রস্তাব উপস্থাপিত করলেন। এই প্রস্তাব ঘোষণা করার পরেও তারা এখানে প্রায় দেড়মাসকাল অবস্থান করেন। এ সময়ে তাঁরা একটি বিষয়ে খুবই

যত্ন নিয়েছিলেন যাতে ক'রে বিভিন্ন দলের নেতাদের দ্বারা ঐক্যবদ্ধভাবে শীঘ্র একটি অস্থায়ী অথচ দায়িত্বপূর্ণ শাসন-পরিষদ গঠিত হয়। এর ফলে এদেশীয়দের দ্বারা তখনই ব্রিটিশ-ভারতের শাসনভার গ্রহণ সম্ভাবনা দেখা দেয়।

কেবিনেট মিশনের প্রস্তাব আজ ইতিহাসের বস্তু। এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে ভারতবাসীর স্বাধীনতা আসে নি, স্বাধীনতা এসেছে অখণ্ড ভারতের পরিবর্ত্তে খণ্ডিত ভারতের ভিত্তিতে। তথাপি ভারতবর্ষকে অখণ্ড তথা সম্মিলিত স্বাধীন সার্ব্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের প্রযত্ন কেবিনেট মিশন কিরূপে করেছিলেন তার সম্বন্ধে ঐতিহাসিক পৌর্ব্বাপর্য্য রক্ষার নিমিত্ত এখানে কিছু বলা প্রয়োজন। তখন ভারতের ন্যাশনাল কংগ্রেস সমগ্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সঙ্কল্পের একটি মূর্ত্ত প্রতীক ব'লে সর্ব্বসাধারণের মনে প্রতীতি জন্মেছিল। কিন্তু মহম্মদ আলি জিন্নার মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ-পঞ্চক নিয়ে স্বাধীন ও সার্ব্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্র গড়ার প্রস্তাব তখন ভারতের রাজনৈতিক আকাশে একটি ঘনকৃষ্ণ মেঘের সঞ্চার করে। মুসলীম লীগের মুখপাত্র তিনি। মুসলমান সংখ্যালঘিষ্ঠ প্রদেশগুলিতে মুসলীম লীগেরই প্রাধান্য। মুসলমান-গরিষ্ঠ প্রদেশসমূহের আইন-সভার কোন কোনটিতে লীগ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত না হ'লেও ক্রমশঃ মুসলীম স্বার্থ রক্ষার এই দাবী জনসাধারণের মনে একটি অভিনব বিচ্ছেদ-স্পৃহার উদ্রেক করছিল। কিন্তু মুসলমানেরাও তো স্বাধীনতা চান। কাজেই একটি সার্ব্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনকল্পে নিয়মতন্ত্র রচনার উপায় নির্দ্দেশও ছিল কেবিনেট মিশন প্রস্তাবের মূল কথা। এখানে উল্লেখযোগ্য যে কেবিনেট মিশন সকল ক্ষেত্রেই বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করেন। এই প্রস্তাবের প্রতিটি বিষয়েই তার পূর্ণ সমর্থন ছিল নিঃসন্দেহ।

কেবিনেট মিশন প্রস্তাবের মূল কথাগুলি ছিল এই : ভারতবর্ষে ভারতীয় ভারত ও ব্রিটিশ-ভারত নিয়ে একটি সম্মিলিত রাষ্ট্র ("Union of India") গঠন। (২) কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের হাতে সর্ব্ব-ভারতীয় তিনটি বিষয়ের পরিচালনার ভার দেওয়ার কথা হয় ; এ তিনটি হ'ল :—পররাষ্ট্র বিভাগ, প্রতিরক্ষা বিভাগ এবং যানবাহন ও সংবাদ আদান-প্রদান বিভাগ। (৩) কেন্দ্রীয় আইন-পরিষদ এবং মন্ত্রীসভা গঠিত হবে ব্রিটিশ-ভারত ও ভারতীয় ভারতের

অধিবাসীদের ভিতর হতে সদস্য বা প্রতিনিধি নির্ব্বাচন দ্বারা। কোন বিশেষ সম্প্রদায়-ঘটিত ব্যাপার সংখ্যাগরিষ্ঠ দুইটি সম্প্রদায়ের (হিন্দু ও মুসলমান) এবং অন্যান্য নির্ব্বাচিত সদস্যদের অধিকাংশের ভোটে স্থিরীকৃত হবে। (৪) সম্মিলিত রাষ্ট্রের উপরে ন্যস্ত বিষয় তিনটি ছাড়া আর সকল ব্যাপারেই প্রদেশগুলির আত্মকর্তৃত্ব থাকবে; ভারতীয় ভারতের (মিত্র বা করদ রাজ্যগুলির) বেলায়ও ঐ একই ব্যবস্থা। (৫) ব্রিটিশ-ভারতের প্রদেশগুলি তিনটি 'গ্রুপ' বা মণ্ডলীতে বিভক্ত হবে; প্রত্যেক মণ্ডলীতে স্বতন্ত্র আইন-পরিষদ এবং মন্ত্রীসভা গঠনের ব্যবস্থা থাকবে; গ্রুপ তিনটি প্রাদেশিক বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নিজেদের মধ্যেই করবে। (৬) নিখিল ভারতীয় নিয়মতন্ত্র গঠিত হবে গণ-পরিষদ বা নিয়মতন্ত্র-রচনা সভা দ্বারা; গ্রুপ বা প্রদেশ-সমষ্টি স্বতন্ত্র নিয়মতন্ত্র রচনা করবার অধিকারী; নিখিল ভারতীয় বিষয়ত্রয় বাদে তারা অন্যান্য সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা পাবে। (৭) নিয়মতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হবার দশ বৎসর পরে গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত কোন প্রদেশ আইন-পরিষদের অধিকাংশের ভোটে আলাদা হ'য়ে যেতে পারবে; প্রতি দশ বৎসর অন্তর নিয়মতন্ত্র রদ-বদল করা চলবে। মিশন প্রদেশগুলিকে তিনটি গ্রুপ বা মণ্ডলীতে এইরূপে ভাগ করলেন:—(ক) মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ (বর্ত্তমান উত্তর প্রদেশ), বিহার, মধ্যপ্রদেশ এবং উড়িষ্যা (অর্থাৎ হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহ); (খ) পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধু। (গ) বঙ্গদেশ ও আসাম। এখানে একটি কথা ব'লে রাখি। 'খ' গ্রুপের অন্তর্গত পঞ্জাব প্রদেশে শিখগণ বরাবর স্বাতন্ত্র্য দাবী ক'রে এসেছেন। আবার 'গ' গ্রুপে আসাম একটি হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ।

কেবিনেট মিশন এই প্রস্তাব ঘোষণা করলেন ১৯৪৬ সালের ১৬ই মে। ঐ দিন পার্লামেণ্টেও এটি ঘোষিত হ'ল। মিশন তাঁদের প্রস্তাবের অন্তর্গত ধারা-গুলির ব্যাখ্যা করে বলেন যে, ঐ সময়কার ভারতবর্ষে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও মত-বাদের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য বিধান কল্পেই তাঁরা এইরূপ ধারা সম্বলিত প্রস্তাব রচনা করতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ভারতবর্ষে একটি সম্মিলিত সার্ব্বভৌম রাষ্ট্র গঠনে সাহায্য করা। যে গণ-পরিষদ ভারতবর্ষের সম্মিলিত শাসন বা নিয়মতন্ত্র গঠন করবেন, তাঁরা ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের

অন্তর্ভুক্ত করা বা না-করার সম্পূর্ণ অধিকার লাভ করবেন। তবে কেবিনেট মিশনের বিশ্বাস পারস্পরিক স্বার্থ-সংরক্ষণের নিমিত্তই ভাবী ভারতবর্ষ গ্রেট ব্রিটেন তথা কমনওয়েল্‌থের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষায় যত্নবান হবেন। প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্য এবং আনুষঙ্গিক বিষয়গুলি ব্যাখ্যানের পর মিশন এই কথাটির উপর বিশেষ জোর দেন যে, প্রস্তাবটি বিভিন্ন পক্ষ বা দল যদি সমগ্রভাবে গ্রহণ করেন তা হ'লেই এটি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের গ্রাহ্য হবে এবং তারা অতি সত্বর একে কার্য্যকরী করবার ব্যবস্থাদিও অবলম্বনে যথাসাধ্য সহায়তা করবেন কেবিনেট মিশন এই প্রস্তাবটির মধ্যে এই মর্ম্মে আরও বলেন যে, যতদিন না নিখিল-ভারতীয় নিয়মতন্ত্র গঠিত হয় (যা শীঘ্রই সম্ভবপর হবে ব'লে তারা আশা করেন) ততদিন একটি 'ইনটেরিম' বা অন্তর্ব্বর্ত্তীকালীন কেন্দ্রীয় শাসন-পরিষদ ভারতীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিয়ে চালু করতে হবে। এ বিষয়ে বড়লাট ওয়াভেলের প্রযত্ন তাঁরা সম্যক সমর্থন করলেন। শাসন-পরিষদের সদস্যগণ সকলেই হবেন ভারতীয় এবং সকল বিভাগগুলি এমন কি প্রতিরক্ষা বিভাগও তাঁদের দ্বারাই পরিচালিত হবে। যুদ্ধ-পরবর্ত্তীকালে ভারতবর্ষের পুনর্গঠন এবং সম্যক উন্নয়নের পক্ষে এটি অত্যাবশ্যক। আবার বিদেশে যে সব আন্তর্জ্জাতিক সভা-সমিতি গঠিত হচ্ছে, তাতেও সার্থকভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে হবে ভারতীয়গণকে। এ সকল কারণে একটি কেন্দ্রীয় প্রতিপত্তিশালী ঐক্যবোধসম্পন্ন শাসন-পরিষদ আশু স্থাপন করা আবশ্যক হ'য়ে পড়েছে—এখানে ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়গত ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ সম্মিলিতভাবে কাজ করবেন—কেবিনেট মিশন এ আশাও পোষণ করছেন ব'লে ঘোষণা করেন।

কেবিনেট মিশন প্রস্তাব ঘোষণার পর মহাত্মা গান্ধী সর্ব্বপ্রথম একে অভিনন্দন জানালেন এর সার্থক সম্ভাবনা লক্ষ্য ক'রে। এ প্রস্তাব নিয়ে ভারতবর্ষে আলোচনা, বিতর্ক ও আন্দোলন চলল খুব। বিভিন্ন সংবাদপত্রে, সাময়িকপত্রে এবং সভা-সমিতিতে এ প্রস্তাবের ভাবী সম্ভাবনা এবং অন্তর্নিহিত ত্রুটি-বিচ্যুতির বিষয় বিশদভাবে আলোচিত হ'তে থাকে। নিখিল-ভারতীয় কংগ্রেস, মুসলীম লীগ, হিন্দু মহাসভা, শিখ-গুরুদ্বার-কমিটি, সকলেই এর উপরে মতামত প্রকাশ করবার নিমিত্ত নিজ নিজ সভা আহ্বান করেন। কংগ্রেসের

নিকট থেকে প্রস্তাবটি সমগ্রভাবে সমর্থন পেলে। আগের মত এবারেও দেখা গেল লীগ নানারূপ বিরুদ্ধ মতামত প্রকাশ করা সত্বেও কংগ্রেসের অকুণ্ঠ সমর্থনের পরেও এই প্রস্তাবটি হুবহু মেনে নিলে। জিন্না লীগ সভায় বললেন যে, প্রস্তাবটির দ্বারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা সরাসরি হবে না বটে, তবে তাঁদের উদ্দেশ্য-পথ এর দ্বারা অনেকটা পরিষ্কৃত হ'য়ে গেছে। অন্যান্য দল বা সভার মধ্যে শিখ সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়ার কথাই এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাদের স্বার্থ এ প্রস্তাবের দ্বারা শুধু অবহেলিত নয়, একেবারে পদদলিত হয়েছে ব'লে শিখ-নেতা মাষ্টার তারা সিং দৃঢ় মত প্রকাশ করলেন। ভারত-বর্ষের মধ্যে একমাত্র শিখ সম্প্রদায় বলতে গেলে প্রথম থেকেই কেবিনেট মিশন প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য করেছিলেন। প্রস্তাব ঘোষণার পরেও কেবিনেট মিশন প্রায় দেড় মাস কাল এদেশে অবস্থান করেন, বলেছি। প্রস্তাব-প্রসূত প্রতি-ক্রিয়াদি তাঁরা সম্যক্ লক্ষ্য করলেন। তাঁদের এতদিন অবস্থানের আরও একটু উদ্দেশ্য ছিল—বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান ক'রে একটি কেন্দ্রীয় 'ইনটেরিম' বা অন্তর্ব্বর্ত্তীকালীন শাসন-পরিষদ গঠন করতে সহায়তা করা। এখানে এই কথাটি আমাদের মনে রাখা দরকার যে, এদেশীয়দের দ্বারা বড়লাটের নেতৃত্বে একটি অস্থায়ী দায়িত্বপূর্ণ শাসন-পরিষদ গঠনও ছিল কেবিনেট মিশন প্রস্তাবের অঙ্গ। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রধান দুইটি দল কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে শাসন-পরিষদের সদস্য সংখ্যা কোন্ দলের কত হবে, এ নিয়ে বাদ-বিতণ্ডা চলতেই লাগল। মিশন অগত্যা বড়লাটের সঙ্গে একযোগে এইরূপ ঘোষণা করতে বাধ্য হন যে, শাসন-পরিষদে কোন পক্ষ যোগদানে অসম্মত হ'লেও প্রস্তাব গ্রহণকারী অন্যান্য পক্ষের দ্বারা এরূপ পরিষদ অবশ্যই গঠিত হবে, কোন এক পক্ষের বাধাদানে অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হবে না। যা হোক অবশেষে এদেশবাসীর শুভবুদ্ধি এবং বড়লাট ওয়াভেলের প্রযত্নের উপর এ ভার ছেড়ে দিয়ে ২৯শে জুন (১৯৪৬) কেবিনেট মিশন ভারতবর্ষ থেকে বিদায় নিলেন।

পরবর্ত্তী জুলাই মাস ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করেছে। এ শুধু অভিনব নয়, মুক্তি-সাধনা ক্ষেত্রে অতীব তাৎপর্য্যপূর্ণও বটে। নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি ডাকা হ'ল ৬ই জুলাই (১৯৪৬) তারিখে। রামগড় অধিবেশনে (১৯৪০) থেকে মৌলানা আবুল কালাম

আজাদ দীর্ঘ ছয় বৎসর কাল কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেছেন বিবিধ রকমের দুর্যোগ ও দুর্ব্বিপাকের মধ্যে। ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এ যাবৎ যত আলাপ-আলোচনা চলেছে, তাতে তিনি কারাবাসকাল বাদে কংগ্রেস তথা জাতির মুখপাত্ররূপে প্রায় সবটাতেই যোগ দিয়েছেন। ৬ই জুলাইয়ে অনুষ্ঠিত নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে মৌলানা আজাদ পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর হস্তে সভাপতিত্ব ছেড়ে দিয়ে বিদায় নিলেন। স্বভাবতঃই কমিটির সভায় কেবিনেট মিশন-প্রস্তাব নিয়ে বিশদ আলোচনা ও তুমুল বিতর্ক হয়। এই বিতর্কে সমাজতন্ত্রী দল উক্ত প্রস্তাবের দোষ ত্রুটি বিশ্লেষণ ক'রে একে অগ্রাহ্য করবার জন্য আবেদন জানান। কিন্তু কেবিনেট মিশন-প্রস্তাব সমগ্রভাবে গ্রহণ ক'রে ওয়ার্কিং কমিটি পূর্ব্বে যে ব্যাপক প্রস্তাব গ্রহণ করে-ছিলেন, সেই প্রস্তাবই বিপুলসংখ্যাধিক্যে পাস হ'য়ে গেল। তবে বিপদ এল এর পরে। কমিটির অধিবেশনের উপসংহার বক্তৃতায় পণ্ডিত নেহরু যে অভিমত প্রকাশ করেন এবং ১০ই জুলাই (১৯৪৬) প্রেস্ কন্‌ফারেন্সে মিশন প্রস্তাবের কোন কোন ধারার যেরূপ ব্যাখ্যা করেন, তাতে এই নূতন বিপদের সূচনা হ'ল। ভারতের মেঘাচ্ছন্ন রাজনৈতিক আকাশে যে আশার আলো উঁকি-ঝুঁকি মারছিল তাও যেন মুহূর্ত্ত মধ্যে বিলুপ্ত হ'য়ে গেল। মিশন-প্রস্তাবটি সামগ্রিকভাবেই গ্রহণীয় বা বর্জ্জনীয়—এই ছিল এ প্রস্তাবের মূল সর্ত্ত। পণ্ডিত নেহরু উভয় সভায় বক্তৃতাকালে বললেন যে উক্ত প্রস্তাবের গ্রুপ সংক্রান্ত ধারাগুলি তারা গ্রহণ না ক'রে সংশোধন ক'রে নিতেও পারেন। এইরূপ উক্তিতে মহম্মদ আলি জিন্না নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হলেন এবং একটি বিবৃতিতে কংগ্রেস পক্ষীয়দের সততার অভাব এবং মিশন-প্রস্তাব গ্রহণ বিষয়ে কাপট্যের কথা ব্যক্ত করলেন। তিনি আরও বললেন যে, এরূপ ক্ষেত্রে কেবিনেট মিশন-প্রস্তাব সরাসরি অগ্রাহ্য করবার জন্যে তিনি অবিলম্বে লীগ কাউন্সিলে একটি প্রস্তাবও পেশ করবেন। কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা কেহ কেহ জিন্নার বিবৃতির উত্তরে বললেন যে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এবং নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির কেবিনেট মিশন সম্পর্কিত প্রস্তাব একে সমগ্রভাবে গ্রহণেরই নির্দ্দেশ দিয়েছেন। এই নির্দ্দেশের কোন ক্রমেই অন্যথা হবে না। এতেও কিন্তু জিন্না সাহেব নিরস্ত হলেন না। তিনি পণ্ডিত

নেহরুর উক্ত বিশ্লেষণকেই কংগ্রেসের মনোগত অভিপ্রায় ব'লেই স্থির-প্রত্যয় হ'লেন।

নিখিল-ভারত মুসলীম লীগ কাউন্সিলের অধিবেশন হ'ল বোম্বাইয়ে ১৯৪৬, ২৭শে জুলাই তারিখে। লীগ ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক রচিত প্রস্তাব এখানে উত্থাপিত ও গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবের দুইটি অংশ। একটি হ'ল— অন্তর্ব্বর্ত্তী শাসন-পরিষদ গঠনে কেবিনেট মিশনের কর্ত্তব্যে অবহেলা। জিন্নার মতে কেবিনেট মিশন পূর্ব্বাহ্নেই বড়লাটের শাসন-পরিষদ হিন্দু ৫ জন, মুসলমান ৫জন এবং অন্যান্য ২ জন (৫ : ৫ : ২) মোট এই ১২ জন সদস্য নিয়ে গঠন করবার সিদ্ধান্ত করেছিলেন। কাউন্সিল প্রস্তাবের প্রথমাংশে বলা হয় যে, এই ব্যবস্থা অনুযায়ী কার্য্য না করায় ব্রিটিশ সরকার বিশ্বাসভঙ্গ করেছেন। কংগ্রেসও কেবিনেট মিশনের প্রস্তাব সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করে নি। প্রথম অংশ দ্বিতীয় অংশেরই হেতুবাদ মাত্র। দ্বিতীয় অংশেই লীগের প্রতিরোধ ব্যবস্থার উল্লেখ আমরা পাই। সরকারের সঙ্গে সম্পূর্ণ অসহযোগের ভিত্তিতে অধুনা কুখ্যাত "Direct Action" বা প্রত্যক্ষ-সংগ্রামের হুমকি এতে দেওয়া হ'ল। পূর্ব্ব যুগের মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত অসহযোগ প্রচেষ্টার ধারাগুলির কিছু কিছু এতে হুবহু অনুসরণের কথা থাকে। অসহযোগ, কিন্তু অহিংসার বালাই এতে মোটেই রইল না। পরবর্ত্তী ১৬ই আগষ্ট (১৯৪৬) প্রত্যক্ষ-সংগ্রাম দিবস ব'লে ধার্য্য হ'ল। এবম্বিধ প্রত্যক্ষ-সংগ্রামের কুফল যে কতখানি সুদূরপ্রসারী, আত্মঘাতী ও মর্ম্মান্তিক হ'তে পারে, লীগ কর্তৃপক্ষ তথা মহম্মদ আলি জিন্না তখনও হয়ত তা ভাবতে পারেন নি। এ সম্বন্ধে একটু পরে আরও বলছি।

এখন অন্তর্ব্বর্ত্তীকালীন শাসন-পরিষদ গঠন সম্পর্কে দু'চার কথা বলা আবশ্যক। পূর্ব্বেই বলেছি কেবিনেট মিশন বড়লাট ও ভারতীয় নেতাদের উপরে অন্তর্ব্বর্ত্তীকালীন শাসন-পরিষদ গঠনের ভার অর্পণ ক'রে বিদায় নিয়েছিলেন। লীগ কাউন্সিলের উক্ত প্রস্তাবে যে আনুপাতিক সদস্য সংখ্যার কথা বলা হয়েছে, তা মাঝে মাঝে আলোচনার মধ্যে উঁকি-ঝুঁকি মারলেও বাস্তবে সরকার কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে উত্থাপিত হয় নি। বড়লাট ওয়াভেল কেবিনেট মিশনের পরামর্শ নিয়ে ১৯৪৬, ১৬ই জুন যে বিবৃতিতে অন্তর্ব্বর্ত্তী

সরকার গঠনের প্রস্তাব করেন তাতে দেখা যায় মোট ১৪ জন সদস্য নিয়ে এই অস্থায়ী পরিষদ গঠিত হবে। এই বিবৃতিতেই তিনি ভাবী পরিষদ-সদস্যদের নামও উল্লেখ করেছিলেন। এতে দেখা যায় কংগ্রেস পক্ষে হিন্দু ছয়জন, লীগ পক্ষে মুসলমান পাঁচজন এবং পার্শী, শিখ ও দেশীয় খ্রীষ্টান পক্ষে তিন জন—মোট এই চৌদ্দজন সদস্য ছিলেন। ২৫শে জুন লীগ ওয়ার্কিং কমিটি বহু তর্ক-বিতর্কের পর বড়লাটের বিবৃতিতে ঘোষিত প্রস্তাব গ্রহণ করেন। কিন্তু ঐ তারিখেই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি একটি প্রস্তাবে উক্ত ব্যবস্থার ঘোরতর প্রতিবাদ করলেন। তাঁরা বললেন যে বড়লাটের ব্যবস্থায় কংগ্রেসের "জাতীয়রূপ" অস্বীকার করা হয়েছে এবং এতে এমন কাউকে কাউকে নেবার প্রস্তাব হয়েছে যারা সরকারের বেতনভুক্ কর্ম্মচারী। কংগ্রেস এ ব্যবস্থাতে সম্মতি দিতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। এরপর কত দ্রুত পট পরিবর্ত্তন হয়েছে তা আমরা লক্ষ্য করেছি। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ যখন সরকার পক্ষ থেকে ভরসা পেলেন যে, কোন এক পক্ষের অসম্মতিতে ভারতবর্ষের শাসন-পরিষদ গঠন বা গণ-পরিষদ আহ্বান স্থগিত থাকবে না, তখন তারা অন্তর্ব্বর্ত্তী-কালীন শাসন-পরিষদ গঠনেও ক্রমে সম্মত হলেন। লীগ কাউন্সিলের কেবিনেট মিশন-প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা এবং পরবর্ত্তী ১৬ই আগষ্ট প্রত্যক্ষ-সংগ্রামের হুম্‌কি সত্ত্বেও ব্রিটিশ সরকার এবং কংগ্রেস, উভয়েই মিশন প্রস্তাবিত কার্য্যক্রম দ্রুত অনুসরণে অগ্রসর হলেন। একদিকে যেমন অন্তর্ব্বর্ত্তীকালীন শাসন-পরিষদ গঠন সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা চলে, অন্যদিকে তেমনি কেবিনেট মিশন-প্রস্তাবের নির্দ্দেশক্রমে নিয়মতন্ত্র রচনা কমিটি তথা গণ-পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচনেরও আয়োজন হয়। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে নিজ নিজ আইন-পরিষদের সদস্যগণ আনুপাতিক নির্ব্বাচনের ব্যবস্থানুযায়ী ভোট প্রদান ক'রে বিভিন্ন দল থেকে গণ-পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচন করলেন। নির্ব্বাচনের মূলধারা ছিল—গণ-পরিষদে প্রতি দশ লক্ষ ভারতবাসী পিছু একজন ক'রে সদস্য প্রেরণ। এই নির্ব্বাচন-পর্ব্ব শেষ হয় জুলাই মাসের ভিতরেই। নির্ব্বাচনে কিন্তু লীগ পুরাপুরি যোগ দিয়েছিল।

লীগ কাউন্সিল কর্ত্তৃক অসহযোগ তথা প্রত্যক্ষ-সংগ্রামের প্রস্তাব গ্রহণের পর থেকে কংগ্রেস এবং ভারত সরকার উভয়ের সঙ্গেই লীগের অধিনায়ক

মহম্মদ আলি জিন্নার আলাপ-আলোচনা যেন আরও ক্ষিপ্রবেগে চলছিল। কিন্তু জিন্না সাহেব প্রতিজ্ঞায় অটল। তিনি প্রত্যক্ষ-সংগ্রাম করবেনই। লীগ কাউন্সিলে প্রস্তাব গ্রহণের পর থেকে ভারতবর্ষের দিকে দিকে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে কি তীব্র প্রচার কার্য্যই না চলতে থাকে। মুসলমান সম্প্রদায় অধিকাংশই নিরক্ষর ও দরিদ্র। জাতীয়তাবোধেও তারা হিন্দুর মত অতখানি উদ্বুদ্ধ হ'তে পারে নি। তবে প্রতিবেশী হিন্দুর প্রতি তারা যে বিদ্বেষ বা হিংসার ভাব পোষণ করত এমন কথাও বলা যায় না। ক্রমে দীর্ঘকালব্যাপী সরকারী অপপ্রচারে এবং স্বার্থান্ধ মুসলমান ধর্ম্ম ও রাজনৈতিক নেতাদের প্ররোচনায় প্রতিবেশী হিন্দুদের উপরও বিদ্বিষ্টভাব পোষণ করতে সুরু করে। সাধারণভাবে একথা বলা হয়ত সমীচীন নয়, কিন্তু পরবর্ত্তী অনাচার উৎপীড়নের রকম দেখে একথা মনে না হয়েই পারে নি যে, সাময়িকভাবেও অনেকে উত্তেজিত হ'য়ে বীভৎসকাণ্ড ঘটাতে অগ্রসর হয়েছিল।

১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট ভারতবাসীর জাতীয় ইতিহাসে একটি কালিমাময় অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে। কি মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি সুরু হয়েছিল ঐ দিনটিতে ভারতের সর্ব্বত্র। ঐদিন বাংলা সরকার ছুটি ব'লে ঘোষণা করে, এই হানাহানিতে ইন্ধন জুগিয়েছিলেন কল্পনাতীতরূপে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান অঞ্চলে হিন্দুর ধন-মান-প্রাণ সবই বিপন্ন হ'ল। এর প্রতিক্রিয়ায় হিন্দু সংখ্যা-গরিষ্ঠ অঞ্চলে মুসলমানদের জীবনও অনুরূপ বিপন্ন হয়। এই সংগ্রাম যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁরা আজ এই ভেবে আশ্চর্য্য হন যে, ঐ সময় মানুষ মনুষ্যত্ব হারিয়ে পশুত্বের কতটা নিম্নস্তরেই না নেমেছিল! এই পশুত্বের গতি জলের মত সর্ব্বদাই নিম্নদিকে মানুষকে এই সময়ে যে নীচতার দিকে নিয়ে যায় তা মনে হয় এখনও রুদ্ধ হয় নি। সমাজ-জীবনে কি বৈলক্ষণ্যই না দেখা দিল এই সময় থেকে! নোয়াখালিতে ও বিহারে "প্রত্যক্ষ-সংগ্রামের" জের চলে বহুদিন ধরে। কোথাও হিন্দু, কোথাও মুসলমান বিপন্ন হ'ল সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়ে। প্রাণহানিও হ'ল বিস্তর। আজ মনে হয় স্বাধীনতা লক্ষ্মীর শুভাগমন প্রত্যেক দেশেই যেমন রক্তগঙ্গার মধ্যে হয়ে থাকে, মহাত্মা গান্ধীর অশেষপ্রকার অহিংস প্রযত্ন সত্ত্বেও সেই চিরন্তন নিয়মেরই এখানেও যেন

পুনরাভিনয় হয়েছিল। কিন্তু এ আত্মঘাতী সংগ্রামে স্বাধীনতা লক্ষ্মীর পূর্ণরূপ যে আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে থেকে যাবে তাও যেন এর দ্বারা কতকটা সূচিত হ'ল। দিকে দিকে হিন্দু-মুসলমানের ভিতরে ভেদবুদ্ধি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। যে সকল মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে লীগের প্রচার এতদিন তেমন সুফলপ্রসূ হয় নি সে সব স্থলেও "প্রত্যক্ষ-সংগ্রাম" হিন্দু-মুসলমানে ভেদ-বৈষম্যের বিষ সমাজ-দেহে ছড়িয়ে দিতে ক্রমে সক্ষম হয়।

লীগের "প্রত্যক্ষ-সংগ্রাম" শুরু হওয়ায় বড়লাট ওয়াভেলের পক্ষে একে বাদ দিয়েই অন্তর্ব্বর্তীকালীন শাসন-পরিষদ গঠন করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। ১৯৪৬ সালের ২৪শে আগষ্ট তারিখে নিম্নলিখিত সদস্যদের নিয়ে এই অস্থায়ী শাসন-পরিষদ গঠনের কথা ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ ঘোষণা করেন। ঘোষণায় বলা হয় যে, পরবর্ত্তী ২রা সেপ্টেম্বর থেকে এই শাসন-পরিষদ কার্য্যভার গ্রহণ করবেন। উল্লেখযোগ্য সে শাসন-পরিষদ গঠনে কংগ্রেসের সভাপতি রূপে পণ্ডিত জবাহরলালের পরামর্শ নেওয়া হয়েছিল। মুসলীম লীগ পরে পরিষদে যোগদান করবেন এই আশায় দুটি পদ শূন্য রাখা হয়। পরিষদের সদস্যগণের নাম ঘোষিত হয় যথাক্রমে :—পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্রু, সর্দ্দার বল্লভভাই পটেল, রাজেন্দ্র প্রসাদ, আসফ আলি, সি. রাজাগোপালাচারী, শরৎচন্দ্র বসু, জন মাথাই, সর্দ্দার বলদেব সিং, স্যার শাফাত আহ্মেদ খাঁ, জগজ্জীবন রাম, সৈয়দ আলি জাহির এবং কুভেরজী হরমাসজি ভাবা। পরিষদের ভাইস-প্রেসিডেন্ট বা সহকারী সভাপতি হন পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্রু (বড়লাট ওয়াভেল অন্তর্ব্বর্তীকালীন) শাসন-পরিষদের সদস্যদের নাম বেতারে ঘোষণা কালে বলেন যে, মুসলীম লীগ যখনই পরিষদে যোগ দানে ইচ্ছুক হবেন তখনই তাদের গ্রহণ করতে যথাসাধ্য যত্ন নেবেন। অবশ্য একথা উহ্য থাকে—লীগ কেবিনেট প্রস্তাব অগ্রাহ্য ক'রে যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে তা তাকে পূর্ব্বাহ্নেই প্রত্যাহার করতে হবে। তার প্রত্যক্ষ-সংগ্রামও বন্ধ হওয়া চাই এ বিষয়গুলি উহ্য রাখায় কূটবুদ্ধি জিন্না সাহেবের পক্ষে পরে খুবই সুবিধা হয়েছিল।

১৬ই আগষ্টের প্রত্যক্ষ-সংগ্রামের প্রতিক্রিয়া কি ভীষণভাবে দেখা দেয় তার কথা ইতিপূর্ব্বে বলেছি। জিন্নার অন্তর্ব্বর্তীকালীন শাসন-পরিষদে লীগ

সদস্যদের যোগদানের পক্ষে এ-ও কম রসদ যোগায় নি। একপক্ষে বড়লাট এবং অপর পক্ষে জিন্নার মধ্যে কয়েক সপ্তাহ যাবৎ আলাপ-আলোচনা ও পত্র ব্যবহার চলে। এর ফলে ওয়াভেল স্থির নিশ্চয় হয়েছিলেন যে জিন্নার নেতৃত্বে মুসলীম লীগ শুধু অন্তর্ব্বর্তীকালীন শাসন-পরিষদেই নয় গঠনতন্ত্র-পরিষদ অর্থাৎ গণপরিষদে লীগপক্ষীয় নির্ব্বাচিত মুসলমান সদস্যরাও যোগ দিবেন। বড়লাট ওয়াভেল শুধু নিজেই স্থিরনিশ্চয় হন নি। নবগঠিত শাসন-পরিষদের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট পণ্ডিত নেহরুকে এই স্থির নিশ্চয়তার বিষয় অবগত করান। জিন্না সাহেব তথা মুসলিম লীগ লিখিতভাবে গণপরিষদে যোগদানের কথা কিছুই জানান নি। পণ্ডিত নেহরু ওয়াভেলের কথার উপরে বিশ্বাস করেই উভয় ব্যাপারে মুসলীম লীগের যোগদান-সম্পর্কে স্থির নিশ্চয় হন। তিনিও লিখিতভাবে বডলাট ওয়াভেলের নিকট থেকে জিন্না তথা মুসলীম লীগের গণপরিষদে যোগদান-সম্পর্কে কোন লিখিত সিদ্ধান্ত চান নি। জিন্নার কুটবুদ্ধি দেখে "এক ঢিলে দুই পাখী মারার" কথা স্বতই আমাদের মনে পড়ে। অন্তর্ব্বর্তীকালীন শাসন-পরিষদের উপরে ব্রিটিশ ভারতের শাসনভার পুরাপুরি অর্পিত হ'ল। সরকার ঘোষণা করেন যে দৈনন্দিন শাসন-পরিচালনায় সদস্যগণই সম্পূর্ণ ক্ষমতাবান, বড়লাট এতে হস্তক্ষেপ করবেন না। কংগ্রেস শাসন-পরিষদকে একটি দায়িত্বশীল অস্থায়ী মন্ত্রিসভা ব'লে অভিমত প্রকাশ করলে পরে জিন্না বিদ্রূপ ক'রে বলেছিলেন "গাধাকে (Donkey) হাতী ব'লে বিশ্বাস করা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়!" যিনি মনে মনে এইরূপ ধারণা পোষণ করেছিলেন, মাসাধিক কাল আলোচনার ফলে তিনি হঠাৎ কেন মত পরিবর্ত্তন করলেন তাও একটু তলিয়ে দেখা দরকার। বস্তুতঃ লীগ তথা জিন্না সাহেব অন্তর্ব্বর্তীকালীন শাসন-পরিষদ এবং গণপরিষদ উভয়েই যে যোগদান করবেন এমন কথা লিখিতভাবে তখনও বলেন নি। পরবর্ত্তী ১৩ই অক্টোবর তারিখে অনুষ্ঠিত লীগ কৌন্সিল সভায় যে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়, তাতে শুধু অন্তর্ব্বর্তীকালীন শাসন-পরিষদে যোগদানের কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে। গঠনতন্ত্র-পরিষদ তথা গণপরিষদে যোগদানের বিষয় বা প্রত্যক্ষ-সংগ্রাম বন্ধ করার কথাসম্পর্কে এতে কোনরূপ উচ্চ-বাচ্য করা হয় নি। বড়লাট ওয়াভেল এই প্রস্তাব এবং জিন্নার সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ-

আলোচনার উপর নির্ভর করেই অন্তর্ব্বর্তীকালীন শাসন-পরিষদে লীগের যোগদানের প্রস্তাবকে ভাবী গণপরিষদে যোগদানে সম্মতিরও সামিল বলেই গণ্য করেছিলেন। এর ফলে পরে ভীষণ বাদ-বিতণ্ডা ও অনর্থের সৃষ্টি হয়। যা হোক, বড়লাট ওয়াভেল ১৯৪৬, ১৫ই অক্টোবর এক ঘোষণায় শাসন-পরিষদে মুসলীম লীগের যোগদানের কথা ব্যক্ত করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জিন্নার নির্দ্দেশিত নিম্নের পাঁচজন সদস্যের নামও প্রকাশ করলেন : লিয়াকৎ আলি খাঁ, আই. আই. চুন্দ্রিগড, আব্দুর রব নিস্তার, গজনফর আলি খাঁ এবং যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। নাম প্রকাশের পরেই মহাত্মা গান্ধী এই সম্পর্কে তাঁর অভিমত একটি সুন্দর কথায় ব্যক্ত করেন। তিনি বললেন : লীগ সদস্যদের মধ্যে একজন 'হরিজন' হিন্দুকে গ্রহণ করায় এই বিশ্বাস হচ্ছে যে, শাসন-পরিষদের মধ্যেও বুঝি বা মুসলীম লীগ "প্রত্যক্ষ-সংগ্রাম" চালাতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। জিন্না সাহেব মুসলমানদের বরাবর একটি স্বতন্ত্র "জাতি" ব'লে উল্লেখ করেছেন। তাদের দলে একজন হিন্দুকে গ্রহণ করায় একটি স্বতন্ত্র পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সার্থকতা প্রমাণেও অগ্রসর হলেন! মুসলীম লীগ সদস্যদের স্থান করতে গিয়ে কংগ্রেস মনোনীত তিনজন সদস্যকে (শরৎ চন্দ্র বসু, স্যার শাফাত আহ্‌মেদ খাঁ ও সৈয়দ আলি জাহীর) পদত্যাগ করতে হয়। মুসলীম লীগের সদস্যগণ পরবর্ত্তী ২৬শে অক্টোবর শাসন-পরিষদে আসন গ্রহণ করেন। শাসনসংক্রান্ত বিভাগগুলিরও পুর্নর্বণ্টন হ'ল। অর্থ-বিভাগের ভার গ্রহণ করেন নবাব লিয়াকৎ আলি খাঁ। মুসলীম লীগে জিন্নার পরেই তাঁর স্থান। মহাত্মা গান্ধীর সংশয় লিয়াকৎ আলি খাঁন এবং তার পক্ষীয় সদস্যগণ দ্বারা কিরূপে বাস্তবে পরিণত হয়, পরবর্ত্তী আলোচনায় তা সুপ্রকট হবে।

এখন আমরা আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কথা বলব। একটু পূর্ব্বেই জিন্না সাহেবের 'এক ঢিলে দুই পাখী মারার' উল্লেখ করেছি। অন্তর্ব্বর্তীকালীন শাসন-পরিষদে মুসলীম লীগের যোগদানের পর একমাসের মধ্যেই এই উক্তির যথার্থ্য বোঝা গেল। কেবিনেট মিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী গণপরিষদের সদস্য নির্ব্বাচন শেষ হয় অন্তর্ব্বর্তীকালীন শাসন-পরিষদ পুরাপুরি গঠনের কিছুকাল পূর্ব্বে। নিয়মতন্ত্র রচনাকল্পে গণপরিষদ সত্বর আহ্বান করার

প্রয়োজন অনুভূত হ'ল। কিন্তু ১৪ই নবেম্বর (১৯৪৬) তারিখে মুসলীম লীগ গণপরিষদে যোগদানে অসম্মতি জানিয়ে প্রকাশ্যে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে। বড়লাট ওয়াভেল এবং জিন্নার মধ্যে আলাপ-আলোচনা এবং পত্রের আদান-প্রদান নূতন ক'রে আরম্ভ হয়। গণপরিষদ তখনই যাতে আহ্বান না করা হয়, সেজন্যে জিন্না জিদ্ ধরলেন। ওয়াভেল এতে রাজী হ'তে পারেন নি, অগত্যা ২০শে নবেম্বর তারিখে (১৯৪৬) উভয়ের ভিতরকার চিঠিপত্র সংবাদপত্রে প্রকাশিত করা হ'ল। জিন্না এর পরেই এক বিবৃতিতে ভাবী গণপরিষদে লীগের যোগদানে অসম্মতির কারণগুলি ব্যাখ্যা করলেন। পণ্ডিত নেহ্রু এবং বড়লাট ওয়াভেলের মধ্যে এ সম্পর্কে যেসব পত্রের আদান-প্রদান হয় নেহ্রু তাও সংবাদপত্রে প্রকাশ ক'রে দিলেন পরবর্ত্তী ২২শে নবেম্বর তারিখে। গণপরিষদে জিন্না তথা মুসলীম লীগের যোগদানের আশ্বাস-প্রদানকেই বড়লাট ওয়াভেল সম্মতি ব'লে মেনে নিয়েছিলেন। আবার বড়লাট ওয়াভেলের কথার উপর নির্ভর করেই পণ্ডিত নেহ্রু ধরে নিয়েছিলেন যে, লীগপক্ষীয় সদস্যগণ গণপরিষদে যোগ দিবেন, এই সর্ত্তেই অন্তর্ব্বর্তীকালীন শাসন-পরিষদে লীগ সদস্যদের নেওয়া হয়েছে।

গণপরিষদে যোগদানে মুসলীম লীগের অসম্মতির কথা জানাজানি হ'লে ভারতবর্ষে ও ব্রিটেনের রাজনৈতিক মহলে আবার খানিকটা চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। মুসলীম লীগ যাতে গণপরিষদেও যোগ দেয় সে উদ্দেশ্যে উভয়ত্রই নানারূপ চেষ্টা চলেছিল। ভারত-সচিব তথা বিলাতের মন্ত্রিসভা এ বিষয়ে সাক্ষাৎ আলাপ-আলোচনার নিমিত্ত কংগ্রেস, লীগ এবং শিখ সম্প্রদায়ের পক্ষে কয়েকজন নেতৃস্থানীয়কে লণ্ডনে আহ্বান করেন। লীগপক্ষে জিন্না ও লিয়াকৎ আলি খাঁ, কংগ্রেস-পক্ষে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্রু এবং শিখ সম্প্রদায়ের পক্ষে বলদেব সিং ও বড়লাট ওয়াভেল ২রা ডিসেম্বর (১৯৪৬) লণ্ডনে পৌঁছেন। চার দিন ধরে ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ এবং ভারতীয় নেতাদের মধ্যে আলোচনা চলল। কোন সিদ্ধান্তে না পৌঁছেই আলোচনা বন্ধ করতে হয়। নেহ্রু ও বলদেব সিং, ভারতবর্ষে অবিলম্বে ফিরে এলেন। কেননা গণপরিষদ আহ্বানের দিন পূর্ব্বেই ধার্য্য হয়েছিল ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৪৬ সালে। জিন্না ও লিয়াকৎ আলি খাঁ আরও কিছুকাল

বিলাতে থেকে ভারতবর্ষে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবী তথাকার নেতৃবৃন্দ এবং জনসাধারণের নিকট প্রচার করতে থাকেন। ব্রিটিশ সরকার এক বিবৃতিতে আলোচনার ব্যর্থতার কারণ নির্দ্দেশ ক'রে বলেন যে কেবিনেট মিসন প্রস্তাবের 'গ্রুপ'-সংক্রান্ত ধারাগুলির মূলগত তাৎপর্য্য নিয়ে ভারতীয় নেতাদের মধ্যে গুরুতর মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে। তবে তাঁরা এই আশা পোষণ করেন যে, বিভিন্ন দলের ভিতরে ভাববিনিময়ের কালে পরে একটি সার্থক কর্ম্মপন্থার উদ্ভব হ'তে পারে। এই বিবৃতিটিও ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটু পরে এ বিষয়টি আরও বিশদ ক'রে বলব।

এখন, গণপরিষদের অধিবেশনের কথা বলার পূর্ব্বেই বড়লাটের শাসন-পরিষদে লীগ পক্ষীয় সদস্যদের আচরণ ও কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। সাময়িক বা অস্থায়ী হওয়া সত্ত্বেও এই শাসন-পরিষদকে একটি দায়িত্বপূর্ণ মন্ত্রিসভার মর্য্যাদা দেওয়া হয়েছিল ব'লে ভারতের জাতীয়তাবাদী মাত্রই তখন মনে করেছিলেন। এই পরিষদের নিয়মানুগ মন্ত্রিসভার মতই—একথা কংগ্রেসপক্ষীয় ছ'জন ও অন্য তিন জন সদস্য স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন। কিন্তু এই মূলগত নীতিতে লীগ সদস্যগণ বাদ সাধলেন। তাঁরা পরিষদের সম্মিলিত দায়িত্ব একেবারেই অস্বীকার করলেন। পণ্ডিত নেহ্রু শাসন-পরিষদের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট। লীগ সদস্যগণ বললেন এ পদের কোন রকমই বিশেষ মর্য্যাদা নেই। বড়লাটের অনুপস্থিতিতে তিনি পরিষদের সভাপতিত্ব করবেন এইমাত্র। পণ্ডিত নেহ্রু ভাইস-প্রেসিডেণ্টরূপে লীগ-মনোনীত সদস্যগণ ও অন্যান্য সদস্যগণের সহিত পরিষদের পূর্ণ অধিবেশনের পূর্ব্বে শাসনসংক্রান্ত বিভিন্ন বিভাগীয় বিষয়সমূহের আলোচনার জন্য যুক্ত-সভার প্রস্তাব করেছিলেন। লীগপন্থী সদস্যগণ এতে রাজী হলেন না। তাঁরা যে পণ্ডিত নেহ্রুর এরূপ সভা আহ্বানের ক্ষমতা সম্বন্ধেই ভিন্ন মত পোষণ করছিলেন। অবশ্য ক্রমে দেখা গেল লীগপন্থী সদস্যগণ নিজেরা বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনায় যোগ দিয়েছেন, তাঁদের নেতা লিয়াকৎ আলি খাঁ-এর আহ্বানে। এতে ক'রে শাসন-পরিষদের সম্মিলিত দায়িত্বের মূলেই কুঠারাঘাত করা হ'ল। আবার লিয়াকৎ আলি খাঁ অর্থ (finance) বিভাগের সদস্য বা অর্থমন্ত্রী। যে সব বিষয়ে অর্থব্যয়ের বা কোনরূপ ব্যয়বরাদ্দের প্রয়োজন

তা মঞ্জুরীর জন্য তার-বিভাগের নিকট উপস্থাপিত করাই বিধি। কিন্তু সামান্য সামান্য বিষয়েও (যেমন আরদালী বা পিয়ন নিয়োগ সম্পৃক্ত) কংগ্রেসী তথা অ-লীগ সদস্যদের প্রস্তাব না-মঞ্জুর করার পূর্ণ ক্ষমতা যুক্তিবিচার বিসর্জ্জন দিয়ে প্রয়োগ করা হ'ত অর্থমন্ত্রীর নির্দ্দেশে। এর ফলে লীগ সদস্য মাত্র পাঁচ জন হ'লেও অন্তর্ব্বর্তীকালীন শাসন-পরিষদে তাদেরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দৈনন্দিন বিভাগীয় কার্য্যে বিষম প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হ'তে থাকে। পরিষদের ভিতরকার লীগ ও অ-লীগ সদস্যদের এইরূপ গুরুতর মত-ভেদ এবং পরস্পর-বিরোধী কর্ম্মপদ্ধতির ফলে শাসনবিভাগের বিভিন্ন স্তরের বিশেষতঃ উচ্চতন স্তরগুলির কর্ম্মচারীদের মধ্যে অত্যন্ত প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

কংগ্রেস ভারতবর্ষের সর্ব্ববন্ধনমুক্ত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়-সংকল্প। কাজেই ব্রিটিশ কর্ম্মচারিগণ যে গোড়া থেকেই এর উপর বিদ্বেষ ভাব পোষণ করছিল তা তো জানা কথা। বিভিন্ন বিভাগের পদস্থ মুসলমান কর্ম্মচারীরাও লীগ-পোষিত এবং প্রচারিত ভেদবুদ্ধির দ্বারা অবিরত প্ররোচিত হ'তে থাকে। ব্রিটিশ এবং মুসলমান পদস্থ কর্ম্মচারীরা হাতে হাত মিলিয়ে কংগ্রেসের সর্ব্বাঙ্গীণ স্বাধীনতার সংকল্প ব্যাহত করতে সকল রকম উপায় অবলম্বনেই চেষ্টিত হ'ল। ইংরেজরা অবশ্য একথা জানত যে স্বদেশের বিপর্যয়হেতু শীঘ্রই এদেশের শাসন কর্ত্তৃত্ব তাদের ছেড়ে দিয়ে বিদায় নিতে হবে। তথাপি 'শেষ কামড়ের' মত তারা এই ভেদবৈষম্যকে যথাসাধ্য আস্কারা ও উস্কানী দিতে প্রয়াস পেল। এর প্রমাণও ভারতবর্ষের দিকে দিকে যথেষ্ট পাওয়া যেতে লাগলো। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা সত্ত্বেও সফরকালে শাসন-পরিষদের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্রুকে নানারূপ হিংসাত্মক আচরণের সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল। এখানে স্পষ্টই দেখা গেল ব্রিটিশ পদস্থ কর্ম্মচারিগণ নেহ্রু তথা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সীমান্তের পাঠানগণকে অবিরত প্ররোচনা দিচ্ছেন। অবশ্য মুসলীম লীগের কংগ্রেস-বিরোধী এবং পাকিস্তানের আদর্শভিত্তিক প্রচার কার্য্যও চলেছিল খুব। অন্তর্ব্বর্তীকালীন শাসন-পরিষদে লীগের যোগদানের পরই বিহারে ভীষণ দাঙ্গার সুরু হয়। ভাইস-প্রেসিডেণ্ট নেহ্রু সদস্য ও সহকর্ম্মী আবদুর রব

নিস্তারকে সঙ্গে নিয়ে বিমানযোগে বিহারের উপদ্রুত অঞ্চল পরিক্রমা করেন তিনি ঐ সময় এমন কথাও বলেছিলেন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা যদি সংখ্যা-লঘিষ্ঠ মুসলমানদের উপর সামান্য মাত্রও উৎপীড়ন করছে এমন সংবাদ তিনি পান, তাহ'লে বিমান থেকে বোমা বর্ষণ ক'রে তাদের শায়েস্তা করবেন। বিহারের দাঙ্গা বন্ধ হ'ল, কিন্তু লীগের মন ভিজল না। তাদের কংগ্রেস-বিরোধী দ্বি-জাতিতত্ত্বমূলক পাকিস্তানী প্রচারকার্য্য শাসন কাঠামোর ভিতরে ও বাহিরে অবিরাম চলতে লাগলো।

এহেন দ্বন্দ্বের মধ্যে কেবিনেট মিসন প্রস্তাবিত নিয়মতন্ত্র রচনাসভা তথা গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন হ'ল দিল্লীতে ১৯৪৬, ৯ই ডিসেম্বর তারিখে। গণপরিষদের সূচনায় এর প্রথম সভাপতি হলেন সদস্যদের ভিতরে সকলেরই বয়োজ্যেষ্ঠ ডঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ। লীগপন্থী সদস্যগণ বর্জ্জন করলেও গণ-পরিষদ সাধারণ ভারতবাসীর মনে এক নূতন আশার সঞ্চার করতে সক্ষম হয়। অধিবেশনের প্রারম্ভেই বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে যে সব শুভেচ্ছার বাণী আসে তা পঠিত হ'ল। সভাপতি বর্ষীয়ান ডঃ সিংহ একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতায় গণপরিষদের উদ্বোধন করলেন। ভাষণে তিনি বলেন, অর্দ্ধ-শতাব্দীর অভিজ্ঞতা থেকে তিনি এই কথাই বুঝেছেন যে, কোন স্বাধীন দেশের নিয়মতন্ত্র একবারেই সম্পূর্ণ গঠিত হ'তে পারে না। যুগে যুগে যে সব সমস্যা দেখা দেয়, যে সকল প্রয়োজনের উদ্ভব হয়, তার নিরিখে একে সংশোধন ও পরিবর্ত্তন ক'রে নিতে হয়। এক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গঠনতন্ত্রই তাদের আদর্শ হওয়া উচিত। স্বাধীন দেশসমূহে এমন কি ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্গত কানাডা এবং অষ্ট্রেলিয়ায়ও একে অনুসরণ করা হয়েছে। তিনি ভারতবর্ষের গঠনতন্ত্র রচনায় কারও অন্ধ অনুকরণের পক্ষপাতী না হ'য়েও একথা অতি জোরের সঙ্গে বলেন যে, নিয়মতন্ত্র গঠনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের আদর্শ হওয়ার যোগ্য। তিনি এই দিনটিকে ভারতবর্ষের পক্ষে একটি অতীব শুভদিন ব'লে অভিহিত করলেন। গণপরিষদের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে (১১ই ডিসেম্বর) বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থায়ী সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। তিনিও তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতায় গণপরিষদের আবির্ভাবে আন্তরিক আনন্দ প্রকাশ করেন। তবে একথা সদস্যগণকে স্মরণ রাখতে অনুরোধ জানান যে কতকগুলি

প্রাথমিক বাধানিষেধ মেনে নিয়েই তাদের নিয়মতন্ত্র রচনায় অগ্রসর হ'তে হবে। পরবর্ত্তী ১৩ই ডিসেম্বর পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্‌রু একটি প্রস্তাবে গণপরিষরের মূল লক্ষ্যের কথা এরূপ ব্যক্ত করেন: "একটি স্বাধীন সার্ব্বভৌম রিপাবলিক বা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র—এর সর্ব্ববিধ ক্ষমতা গণ তথা জনসাধারণ হ'তে উদ্ভূত।" এই প্রস্তাবটি ব্যাপক আকারে গৃহীত হয় গণপরিষদের ২২শে জানুয়ারী, ১৯৪৭ সালের অধিবেশনে। ১৩ই তারিখের অধিবেশনেই ডঃ মুকুন্দরাম রাও জয়াকরের প্রস্তাবে পরবর্ত্তী ২০শে জানুয়ারী (১৯৪৭) পর্য্যন্ত গণপরিষদের অধিবেশন স্থগিত থাকে। লীগপন্থীদের গণপরিষদে যোগদানসম্পর্কে পুনঃবিবেচনার নিমিত্ত সময় ও সুযোগ দেওয়াই এরূপ স্থগিত রাখার কারণ ব'লে ডঃ জয়াকর উল্লেখ করেছিলেন।

অন্তর্ব্বর্তীকালীন শাসন-পরিষদে লীগ ও অ-লীগ তথা কংগ্রেসপন্থী সদস্যগণের মধ্যে বিরোধ কিরকম ঘোরালো হ'য়ে ওঠে, তার কতকটা আমরা পূর্ব্বেই জেনে নিয়েছি। ন্যাশনাল কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন হ'ল ২৩শে ও ২৪শে (১৯৪৬) নবেম্বর। অধিবেশনে প্রকাশ্যভাবেই এই বিরোধের কথা বিশেষভাবে প্রকাশ হ'য়ে পড়ল। এবারকার সভাপতি হলেন আচার্য্য জে. বি. কৃপালনী। তিনি প্রথমে ছিলেন একজন বিচক্ষণ শিক্ষাব্রতী। মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে তিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্য্যায়ে কায়মনে যোগ দেন। ১৯৩৪—৪৬, এই বারো বৎসর একাদিক্রমে তিনি কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারীর পদে অধিষ্ঠিত থেকে এর সেবায় সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন ও স্বদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি অশেষ দুঃখবরণ করেছিলেন। তাঁর সভাপতিত্বে এবারকার অধিবেশন মীরাটে বিপুল সমারোহে সম্পন্ন হ'ল। মীরাটেও কিন্তু কংগ্রেস অধিবেশনকে ব্যর্থ করার জন্যে লীগপন্থীদের অপচেষ্টার অন্ত ছিল না। এই অধিবেশনেই পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্‌রু ভারতবর্ষের মূল লক্ষ্য সর্ব্ববন্ধনমুক্ত স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন ক'রে যে বক্তৃতা দেন, তাতে শাসন-পরিষদের লীগপন্থী সদস্যদের বিরোধিতার কথা প্রকাশ্যে ব্যক্ত করেন এবং এ সম্বন্ধে তীব্র মতামত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, পরিষদের ভিতরে এই বিরোধ এতই ঘোরালো হ'য়ে উঠেছে যে তাঁরা দু' দু' বার পদত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বড়লাট ওয়াভেলের

সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তাঁরা এ থেকে নিরস্ত হন। তিনি আরও বলেন যে, লীগ সদস্যগণ শাসন-পরিষদে সেকালের ইংলণ্ডের 'কিংস পার্টি' বা 'রাজার দল' রূপে কার্য্য ক'রে চলেছেন। তারা প্রতিটি কাজে বড়লাটের হস্তক্ষেপের সুযোগ দিচ্ছেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ব্রিটিশ সরকারের নিকট এই দলের কার্য্য-কলাপ বিশেষভাবে সমর্থন পাচ্ছে।" পণ্ডিত নেহ্‌রুর এই বক্তৃতার পর লীগ-নেতা মহম্মদ আলি জিন্না এবং শাসন-পরিষদের লীগ-অধিনায়ক লিয়াকৎ আলি খাঁ উভয়েই এর প্রতিবাদ করেন। কিন্তু লীগপন্থী সদস্যদের পূর্ব্বেকার এবং পরবর্ত্তী কার্য্যকলাপে পণ্ডিত নেহ্‌রুর উক্তির যথার্থ্য প্রমাণিত হয়। শাসন-পরিষদে লীগপন্থী সদস্যগণের মতবিরোধ বাহিরের মুসলমান সাধারণের মধ্যে একটি সংঘর্ষের মনোভাবই জিইয়ে রাখতে সাহায্য করে। এক কথায় মুসলীম লীগ পরিচালিত ১৬ই আগষ্টের প্রত্যক্ষ-সংগ্রাম শাসন-পরিষদের ভিতরে, এবং বাহিরে জনসাধারণের মধ্যে যুগপৎ অনুসৃত হয়। এতে ব্রিটিশ সরকারের নীতি যে অনেকটা ইন্ধন জোগায়, তা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

ইতিপূর্ব্বে বিলাতে শ্রমিক মন্ত্রিসভা এবং ভারতীয় নেতাদের স্বল্পকাল-স্থায়ী বৈঠকের আলোচনার কথা উল্লেখ করেছি। এই আলোচনায় যে কোন ফলোদয় হয় নি সে সম্পর্কে সরকারপক্ষীয় বিবৃতির কথাও ঐ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। আগেই বলেছি, এই বিবৃতিটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিবৃতিতে আলোচনার ব্যর্থতাপ্রসঙ্গে বলা হয় যে, কেবিনেট মিসন প্রস্তাব ভারতবর্ষের প্রধান দুইটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল প্রথমে সমগ্রভাবে মেনে নিয়েছিলেন বটে, কিন্তু ক্রমে গ্রুপ খ ও গ্রুপ গ সংক্রান্ত বিষয়ে গুরুতর মতভেদ দেখা দিয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মুখপাত্র স্বরূপ কংগ্রেস তথা পণ্ডিত নেহ্‌রু এর ব্যাখ্যা এইরূপ করছেন যে 'গ্রুপ' গঠনের পূর্ব্বাহ্লেই এর অন্তর্গত যে-কোন প্রদেশ ইচ্ছা করলে গ্রুপ থেকে আলাদা হ'য়ে যেতে সক্ষম। প্রধানতম সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের মুখপাত্র স্বরূপ মুসলীম লীগের পক্ষে মহম্মদ আলি জিন্না এ ব্যাখ্যা মানতে চান না। মিসন প্রস্তাবের উক্ত দুইটি গ্রুপসম্পর্কে পণ্ডিত নেহ্‌রু-কৃত এরূপ ব্যাখ্যার অবকাশ আছে কিনা সে বিষয়ে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা সরকারী আইন বিশারদের মত খণ্ডনা করেছেন। আইন বিশারদের মতে গ্রুপ

সম্পর্কে এরূপ ব্যাখ্যা সম্পূর্ণই ভ্রমাত্মক। মন্ত্রিসভাও মনে করেন উক্ত প্রস্তাবের এরূপ ব্যাখ্যার কোন অবকাশ নেই। প্রস্তাব যেমনটি আছে ঠিক তেমনিভাবেই একে গ্রহণ করতে হবে। এর অন্তর্নিহিত ভাব সম্বন্ধে কোনরূপ ভিন্ন মত প্রকাশ বা ব্যাখ্যা চলবে না। তবে ব্রিটিশ সরকার পক্ষে বলা হয় যে এই মৌলিক বিষয়টি মেনে নিয়ে অন্য কোন বিষয়ে যদি মতভেদ উপস্থিত হয় তাহ'লে উভয় দলের সম্মতিক্রমে তা দিল্লীর ফেডারেল কোর্টে (বর্ত্তমানে সুপ্রীমকোর্টে রূপান্তিত) বিচারের নিমিত্ত প্রেরণ করা যেতে পারে। ৬ই ডিসেম্বরের বিবৃতিতে, এবং কয়েকদিন পরে ভারত-সচিব লর্ড পেথিক লরেন্স হাউস অব লর্ডসে এ সম্পর্কে যে ভাষণ দেন, তাতে ব্রিটিশ সরকারের অভিমত অতি স্পষ্ট হ'য়ে যায়। এর ফলে মুসলীম লীগের তথা জিন্না সাহেবের বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত অভিমতই পুরাপুরি সমর্থিত হ'ল।

এর পর ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত এ নিয়ে খুবই বাদ-বিতণ্ডা চলে। বলা বাহুল্য লীগ ওয়ার্কিং কমিটি এবং লীগ কৌন্সিল মন্ত্রিসভার পক্ষে এইরূপ মতামত প্রকাশে একেবারে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠল। জিন্না সাহেব যে নিরতিশয় আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলেন তা কি আর বলতে। কংগ্রেস খুবই ফাঁপরে পড়ল। মন্ত্রিসভার পক্ষে ৬ই ডিসেম্বর (১৯৪৬) যে বিবৃতি দেওয়া হয়, সে সম্বন্ধে বিবেচনার জন্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির পরবর্ত্তী ২২শে ডিসেম্বর এবং নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির পরবর্ত্তী ৫ই জানুয়ারী, ১৯৪৭ সালে অধিবেশন হয়। পণ্ডিত জবাহর লাল নেহ্রু শেষোক্ত কমিটির অধিবেশনে ওয়ার্কিং কমিটির মতামত সম্পূর্ণ গ্রহণ ক'রে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এতে কয়েকটি বিষয়ের উপরে বিশেষ জোর দেওযা হয়। ভারতবর্ষে একটি সার্ব্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হবে, এর কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা গ্রাহ্য করা চলবে না। কোন বিশেষ অঞ্চল বা প্রদেশের স্বার্থরক্ষা করতে গিয়ে যদি দেখা যায় যে, এর পথে বিঘ্ন ঘটান হচ্ছে তাহ'লে এ হ'তেও দেওয়া হবে না। ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ আত্মকর্ত্তৃত্ব লাভ করুক, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যে এরূপ অভিপ্রায় পোষণ করেন সে সম্বন্ধে তারা নিঃসন্দেহ। তবে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় যেমন কোন পক্ষের প্রতিবন্ধকতা তারা গ্রাহ্য করতে অপারগ, তেমনি কোন কোন

অঞ্চলে আত্মকর্ত্তৃত্ব ব্যাহত হয় এ-ও তাঁদের কাম্য নয়। প্রস্তাবে আরও বলা হয় যে, ব্রিটিশ সরকারের সাম্প্রতিক বিবৃতি অনুযায়ীই গণপরিষদের কার্য্যক্রম নির্দ্ধারিত হবে বটে, কিন্তু কোন প্রদেশ বা প্রদেশের অন্তর্গত কোন বিশেষ অংশের অধিবাসীদের, যেমন পঞ্জাবী শিখদের, আত্মকর্ত্তৃত্ব যাতে ব্যাহত না হয় সেদিকেও তারা লক্ষ্য রাখতে বাধ্য। পণ্ডিত নেহ্রু বক্তৃতাকালে বলেন যে, কেবিনেট মিসন প্রস্তাবের গ্রুপসংক্রান্ত ধারাগুলি সম্পর্কে ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ যেরূপ অনমনীয় মনোভাব ব্যক্ত করেছেন, তাতে ফেডারেল কোর্টের উপর প্রদত্ত মতবিরোধের মীমাংসার ভার নিরর্থক বলেই প্রতিপন্ন হবে। এর পরে ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে দ্রুত পট পরিবর্ত্তন হ'তে থাকে। এইরূপ মীমাংসার ভার-অর্পণের কোন প্রয়োজনই অনুভূত হয় নি।

বুঝতে বাকী রইল না যে, ভারতবর্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ দুই দলের মধ্যে মতৈক্যের আশা ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে। গবর্ণমেণ্টের ভিতরে ও বাহিরে নিয়ত সংঘর্ষ চলতে লাগলো। শাসন-পরিষদের ভিতরে বিরোধ তথা সংঘর্ষ এত বেড়ে চলে যে, ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৭ সালে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্রুর নেতৃত্বে পরিষদের কংগ্রেসপন্থী এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সদস্যগণ একযোগে লীগ সদস্যদের পদত্যাগ দাবী ক'রে বড়লাটকে পত্র লিখলেন। বড়লাট ওয়াভেল পত্রোক্ত দাবী সম্বন্ধে নবাব লিয়াকৎ আলি খাঁ-এর মতামত যথারীতি চাইলেন। লিয়াকৎ আলি এক দীর্ঘ পত্রে বড়লাটকে জানালেন যে, কংগ্রেসপন্থীরা যদি কেবিনেট মিসন প্রস্তাব পুরাপুরি গ্রহণ না ক'রেও অন্তর্ব্বর্তীকালীন শাসন-পরিষদে স্থান পেতে পারেন, তাহ'লে তাঁরা গণপরিষদ বর্জ্জন ক'রেই বা কেন শাসন-পরিষদে স্থান পাবেন না! তাঁরা তখনই শাসন-পরিষদ বর্জ্জন করবেন, যখন কংগ্রেসীরা ঐ একই কারণে পরিষদ থেকে বহিষ্কৃত হবেন। ওয়াভেল এর জবাবে কিছুই বলতে পারলেন না। কংগ্রেসীরা কেবিনেট মিসন প্রস্তাবের অন্তর্গত 'গ্রুপ'-সংক্রান্ত ধারাগুলি মেনে না নিয়েও যখন পরিষদে স্থান পাচ্ছেন তখন লীগ সদস্যরাই বা কি দোষ করলেন! বস্তুত বড়লাট ওয়াভেল পূর্ব্বেই কংগ্রেসের মিসন প্রস্তাবসংক্রান্ত ব্যাখ্যা জানতেন;

তথাপি তাঁদের নিয়ে অন্তর্ব্বর্তীকালীন শাসন-পরিষদ গঠনে প্রথম দফায় ভুল করেছেন। এখানে অবশ্য ভুল হওয়া সম্পর্কেও তার পক্ষে একটা কৈফিয়ৎ আছে। তখন 'গ্রুপ'-সংক্রান্ত কংগ্রেসী মতামত এতটা দানা বাঁধে নি। উপরন্তু কংগ্রেস-পক্ষে প্রথমদিকে বরাবর বলা হয়েছে, কেবিনেট মিসন প্রস্তাব তাঁরা পুরাপুরি গ্রহণ করেছেন। দ্বিতীয় দফায় ওয়াভেল ভুল করেছেন জিন্না তথা মুসলীম লীগের নিকট থেকে গণপরিষদে যোগদানের লিখিত প্রতিশ্রুতি না নিয়ে অন্তর্ব্বর্তীকালীন শাসন-পরিষদে লীগ সদস্যদের ডেকে আনায়। আবার পণ্ডিত জবাহরলালও ভুল করেছেন উক্তরূপ লিখিত প্রতিশ্রুতি না দেখে বড়লাট ওয়াভেলের কথায় আস্থা স্থাপন ক'রে। ১৯৪৭, ফেব্রুয়ারীর প্রথম নাগাদ দেখা গেল, ওয়াভেলের সদিচ্ছা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দল নিয়ে শাসনতন্ত্র পরিচালনা মোটেই সম্ভব নয়। তথাপি ওয়াভেল চেয়েছিলেন যদি কিছু সময় পাওয়া যায়, তবে এই দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মধ্যে যে উগ্রতা ও উত্তেজনা নানাভাবে প্রকটিত হ'য়ে পড়ছে, তার নিশ্চয়ই অবসান হবে—এক মায়ের সন্তান ব'লে হিন্দু-মুসলমান আবার হাতে হাত মিলিয়ে ভারতমাতার উন্নয়নে বদ্ধপরিকর হবে। তখন কিন্তু মুসলীম লীগের প্রতি ওয়াভেলের পক্ষপাতিত্বের কথা উল্লেখ ক'রে তাঁর কার্য্যক্রমের তীব্র আলোচনা হয়, এবং তার সদিচ্ছার উপরও বিশেষভাবে কটাক্ষ করা হয়। তবে বড়লাট ওয়াভেলের আন্তরিকতার বিষয় মৌলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর আত্মজীবনীতে সুন্দরভাবে লিখেছেন।

আগেকার নির্ধারণ অনুযায়ী ১৯৪৭ সালের ২০শে জানুয়ারী গণপরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হ'ল। পণ্ডিত নেহ্‌রু পরবর্ত্তী ২২শে জানুয়ারী পূর্ব্ব-উত্থাপিত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ভিত্তিক Objective বা লক্ষ্য একটি ব্যাপক প্রস্তাবের আকারে গণপরিষদে পেশ করলেন—সদস্যগণের বিশদ আলোচনার নিমিত্ত। এই অবজেক্‌টিভ্ বা লক্ষ্যের আভাস আমরা আগেই কতকটা পেয়েছি। ভারতবর্ষের সর্ব্বাত্মক স্বাধীনতা ভারতবাসী মাত্রেরই কাম্য। তবে বিভিন্ন প্রদেশের এবং করদ বা মিত্র রাজ্যসমূহের অন্তর্ব্বর্তী শাসনে তাদের আত্মকর্ত্তৃত্ব রক্ষিত হবে; যদিও সকলেই গণতন্ত্রের ভিত্তিতে শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনে বাধ্য থাকবে। ভারতবর্ষের স্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন

অংশের বা অঞ্চলের এরূপ আত্মনিয়ন্ত্রণে হস্তক্ষেপ করবেন না, প্রস্তাবে এ ধরণের প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়। পূর্ব্বের মত এবারেও গণপরিষদের অধিবেশনে জনসাধারণের মনে বেশ সাড়া জাগে। কিন্তু মুসলীম লীগের আত্মঘাতী এবং আত্মবিচ্ছেদ-মূলক সহিংস কার্য্যকলাপে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই আতঙ্কিত হ'য়ে ওঠেন। গণপরিষদ সর্ব্বসম্মতিক্রমে উক্ত "অবজেক্টিভ্" প্রস্তাব সোল্লাসে গ্রহণ করেন। কিন্তু এর অল্প কয়েক দিন পরেই বড়লাট ওয়াভেলের নিকটে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্রুর নেতৃত্বে শাসন-পরিষদের কংগ্রেসপক্ষীয় এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ সদস্যগণ কর্ত্তৃক লীগপন্থী সদস্যদের পদত্যাগ দাবী যখন অগ্রাহ্য হ'ল, তখন ভারতবর্ষের আকাশে-বাতাসে আবার ঘনান্ধকারের সূচনা দেখা গেল। শুধু কংগ্রেস পক্ষই নয়, জাতীয়তাপন্থী মাত্রেই বড়লাট ওয়াভেলের সদিচ্ছায় সন্দেহ প্রকাশ করতে লাগলেন। আবার বিগত ৬ই ডিসেম্বরের ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার ঘোষণায় ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি ইংরেজ জাতির প্রীতি ও সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাব-সম্পর্কেও নানা প্রশ্নের উদয় হ'ল। এইরূপ অবস্থার সুযোগ নিয়ে দিকে দিকে মুসলীম লীগের প্ররোচনায় মুসলমানেরা দাঙ্গাহাঙ্গামাও পুরাদমে চালাতে থাকে। এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ অন্যান্যেরাও এতে লিপ্ত হ'য়ে পড়ে। ইতিমধ্যে শাসন-পরিষদে এক গুরুতর অবস্থার উদ্ভব হয়—বাজেট প্রস্তুত নিয়ে। অর্থমন্ত্রী লিয়াকৎ আলি খাঁ বাজেট প্রণয়নে কংগ্রেসপক্ষীয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের কথায় বা প্রস্তাবে কোনই আমল দিলেন না। নিজের ইচ্ছামতই বাজেট তৈরি করলেন। অবশ্য লীগপন্থী পাঁচ জন সদস্যই বরাবর তাঁর সপক্ষে ছিলেন। বাজেটে লিয়াকৎ আলি নূতন কর স্থাপন বিষয়ে একটি অদ্ভুত প্রস্তাব করেন। শিল্পপতি ও ব্যবসায়িগণের পক্ষে তাদের শিল্প ব্যবসায় থেকে প্রাপ্ত, লাভের শতকরা পঁচিশ ভাগ অর্থাৎ একশত টাকার মধ্যে পঁচিশ টাকা সরকারকে কর স্বরূপ দিতে হবে। এর ব্যাখ্যা ক'রে তখনই বলা হয়েছিল যে কংগ্রেসের সমর্থক ধনিক শ্রেণীকে লক্ষ্য ক'রেই বাজেটে এরূপ কর ধার্য্য করার প্রস্তাব হয়। লীগবর্জ্জিত গণপরিষদের ব্যয় মঞ্জুরিতেও লিয়াকৎ আলি জোর আপত্তি করলেন। কিন্তু বড়লাট ওয়াভেলের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে তিনি শেষ পর্য্যন্ত ব্যয় মঞ্জুরিতে তার আপত্তি তুলে নেন। যখন চারিদিকে একটা অস্বস্তি এবং

অবিশ্বাসের হাওয়া বইছে সেই সময় এল ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রি-প্রদত্ত ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭ তারিখের যুগান্তকারী বিবৃতি। এ সম্বন্ধে এখন বলছি।

শ্রমিক মন্ত্রিসভা তথা প্রধানমন্ত্রি এট্‌লি ভারতবর্ষের অন্তর্বিরোধ এবং জনমত বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছেন—কেবিনেট মিসন প্রস্তাবের পর থেকে এত দিন পর্য্যন্ত। এই প্রস্তাব কার্য্যকরী করার নিমিত্ত বড়লাট ওয়াভেল সবিশেষ যত্ন নিয়েছেন বটে, তবে তাঁর কার্য্যক্রম বা কর্ম্মপদ্ধতি সাফল্যের দিকে মোটেই অগ্রসর হ'তে পারে নি। এর ফলে ব্রিটিশ সরকারের মতিগতির বিরূপ ও বিরুদ্ধ সমালোচনারও প্রচুর অবকাশ ঘটে। উপরন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ দলগুলির ভিতরে মতৈক্য স্থাপনের কোন লক্ষণই দেখা গেল না। এরূপ অবস্থায় মন্ত্রি-সভার পক্ষে প্রধানমন্ত্রি এট্‌লি পার্লামেণ্টে যে গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি দিলেন, তা একটি নূতন যুগেরই সূচনা করলে। তিনি বিবৃতির আরম্ভেই বলেন যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যেই ভারতবর্ষ থেকে বিদায় নেবেন। এই সময়ের ভিতরে ভারত শাসনের ভার ভারতবাসীর হস্তে নিশ্চয়ই অর্পণ করা হবে। ভারতবর্ষের একটিমাত্র সম্মিলিত গণপরিষদের উপরেই তাঁরা এ ভার অর্পণ করতে চান। তবে যদি দেখা যায়, ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে একটিমাত্র গণপরিষদ বা শাসনভার গ্রহণ করতে পারেন এমন একটি শক্তিমান ও সম্মিলিত পরিষদের অভাব ঘটছে, তাহ'লে একাধিক গণপরিষদ। অঞ্চল বা প্রদেশের কর্ত্তৃপক্ষের উপরে শাসন ভার ছেড়ে দিয়ে তাঁরা চলে আসবেন। রাজন্য-ভারত তথা ভারতবর্ষের করদ বা মিত্র রাজ্যগুলির সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রি বলেন যে, এতদিন পর্য্যন্ত ব্রিটেনের সঙ্গে তাদের যে সব চুক্তি হয়েছে সবই আপাতত বহাল থাকবে। এ বিষয়ে কেবিনেট মিসন প্রস্তাব অনুসারে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ও রাজন্যবর্গের প্রতিনিধিদের মধ্যে পূর্ণ শাসন কর্ত্তৃত্ব বা সার্ব্বভৌমত্ব বিষয়ে অন্তর্ব্বর্তী কালে আলোচনা চলবে। বিবৃতির আরেকটি অংশে প্রধানমন্ত্রি বলেন যে, বড়লাট ওয়াভেলের কার্য্যকাল পরবর্ত্তী মার্চ্চ মাসে শেষ হবে। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন ভাইকাউণ্ট মাউণ্টব্যাটেন। তিনিই হবেন ভারতের শেষ বড়লাট বা ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি। ওয়াভেলকে অবসর প্রদানসম্পর্কে প্রধানমন্ত্রি আরও বলেন যে, যুদ্ধকালীন সঙ্কটপূর্ণ অবস্থায় লর্ড ওয়াভেলকে বড়লাট নিযুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু নূতন অবস্থায়

এ পদে তাঁকে নিযুক্ত রাখা আর সমীচীন নয়। এট্‌লি বিবৃতিতে ওয়াভেলের সুষ্ঠু শাসনকার্য্যের প্রশংসা করলেন বটে, কিন্তু এই একটিমাত্র কথার মধ্যে ওয়াভেলের কার্য্যক্রমের প্রতি মন্ত্রিসভার গভীর অসন্তোষও প্রকাশ পেল। এই বিবৃতির ফলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে প্রতিক্রিয়া লক্ষণীয়। পণ্ডিত জবাহরলাল ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজদের চিরতরে বিদায় গ্রহণ যে আসন্ন তার জন্যে আনন্দ প্রকাশ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ কথাও বলেন যে, বিভিন্ন প্রদেশের আত্মকর্ত্তৃত্বের ভিত্তিতেই গণপরিষদ নিয়মতন্ত্র রচনায় অভিলাসী। কোন অনিচ্ছুক অঞ্চলের উপরে তারা কোনরূপ শাসনতন্ত্রই চাপাবেন না। বড়লাট ওয়াভেলের সঙ্গে তার পরবর্ত্তী আলাপ-আলোচনায় এ কথাটি আরও পরিষ্কার হ'য়ে গেল। জিন্না সাহেব কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতির উপরে কোন মন্তব্য করলেন না। শুধু এইমাত্র ব'লে ক্ষান্ত হলেন যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্য্যন্ত তারা কোনমতেই নিরস্ত হবেন না। হয়ত তিনি এট্‌লির বিবৃতির মধ্যেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আশু সম্ভাবনা লক্ষ্য করেছিলেন।

উপরের সমালোচনা হ'তে আমাদের মনে কয়েকটি কথা স্বতঃই উদয় হয়। মহম্মদ আলি জিন্না কূট রাজনীতিজ্ঞ। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্‌রু ঐকান্তিক জাতীয়তাবাদী এবং বড়লাট লর্ড ওয়াভেল ভারতবর্ষের একটি হিন্দু-মুসলমান দ্বারা সম্মিলিত শক্তিমান সরকার গঠনে একান্ত আগ্রহশীল। শ্রমিক মন্ত্রিসভা যে সত্য সত্যই ভারতবাসীর হস্তে শাসনভার প্রদানে ইচ্ছুক তা ত বুঝতে বাকী রইল না। তবে এই শাসনকর্ত্তৃত্ব তথা স্বাধীনতা কিভাবে আসবে তা নিয়ে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই মনে বেশ একটা সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছিল। মহাত্মা গান্ধী ১৯২১ সালে ভারতবর্ষের রাজনীতি ক্ষেত্রে নেতৃত্ব গ্রহণ ক'রে বরাবর হিন্দু-মুসলমানে ঐক্যপ্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হয়েছিলেন। এজন্য তাঁকে জীবনপণ ক'রে কায়িক ক্লেশও সহ্য করতে হয়। তিনি কিছুকাল পূর্ব্ব থেকে কংগ্রেসপক্ষীয় রাজনীতি পরিচালনার ভার যোগ্য শিষ্য পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্‌রুর উপরে সমর্পণ ক'রে অবসর গ্রহণের আয়োজন করেন। এ সময়কার রাজনৈতিক কার্য্যাকার্য্য সম্বন্ধে তিনি সময়ে সময়ে নিজ অভিমত প্রকাশ করেই নিরস্ত থাকেন। কিন্তু মুসলীম লীগের 'প্রত্যক্ষ-সংগ্রাম' এবং

তজ্জনিত ব্যাপক ও বিস্তৃত অঞ্চলে মারামারি, হানাহানি তাঁর প্রাণে ভীষণ ব্যথা দেয়। এর নিরসনকল্পে এত বৃদ্ধ বয়সেও তিনি অশেষ কৃচ্ছ্রসাধন আরম্ভ করেন। নোয়াখালিতে হিন্দু জনসাধারণের উপর সংখ্যাধিক্য মুসলমান প্রতিবেশীদের অকথ্য অনাচার ও অত্যাচার নিপীড়নে তিনি স্থির থাকতে পারেন নি। নোয়াখালিতে দাঙ্গাবিধ্বস্ত গ্রামে গ্রামে জল-কাদার ভিতর দিয়ে তাঁর পদব্রজে পরিক্রমায় প্রার্থনাসভার অনুষ্ঠান, মানুষের প্রতি মানুষের এবং ঈশ্বরের প্রতি মনুষ্যসমাজের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ভাষণদান প্রভৃতির দ্বারা হিন্দুদের ভিতরে আত্মপ্রত্যয় ফিরিয়ে আনেন এবং হিন্দু-মুসলমানে সম্প্রীতিস্থাপনে সাময়িক হ'লেও সফল প্রযত্ন হন।

কিন্তু ভারতের আকাশ-বাতাস সাম্প্রদায়িকতা বিষে দূষিত হ'য়ে গেছে। বিহারের দাঙ্গায়, হিন্দুরা প্রতিশোধ নিতে আরম্ভ করলে। মুসলীম লীগের 'প্রত্যক্ষ-সংগ্রাম' সঞ্জাত বিষাক্ত মনোভাব যেন সমগ্র সমাজদেহকে আবিষ্ট ক'রে ফেললে। এই সময় মহাত্মা গান্ধীর একক প্রযত্ন একে রোধ করতে না পারলেও হিন্দু-মুসলমান যে একত্র অবস্থানহেতু ভাই ভাই, এ বোধ অন্ততঃ একশ্রেণীর লোকের মনে খানিকটা দানা বেঁধেছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী কয়েক মাসের ঘটনা পরম্পর ভারতবর্ষের দুই প্রধান ধর্ম্মাক্রান্ত জনসমষ্টিকে যেন পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করেই তুলেছিল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আসন্ন, কিন্তু পূর্ব্বেই বলেছি এ কি রূপ নিয়ে আসবে সে সম্বন্ধে কেউই স্থির নিশ্চয় হ'তে পারলে না। ক্রমে ক্রমে কংগ্রেস তথা কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ মুসলীম লীগের কার্য্যকলাপে একেবারে অতিষ্ঠ হ'য়ে ধৈর্য্যের সীমায় গিয়ে পৌঁছলেন। উপরোক্ত আলোচনায় বুঝা যাচ্ছে, কংগ্রেস মুসলীম লীগের বিচ্ছেদপ্রয়াসে যেন নিজেকেও জড়িয়ে ফেলতে চলেছে। মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষের সার্ব্বভৌম স্বাধীনতা চান, কিন্তু এ খণ্ডিত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করুক এরূপ মনোবৃত্তি তাঁর মনে আদৌ স্থান পায় নি। জিন্নার দ্বি-জাতিতত্ত্ব একেবারে ভূয়া, পাকিস্থানের দাবী অসার সুযোগ পেলেই তিনি এ মত ব্যক্ত করেছেন। প্রধানমন্ত্রি এট্লির ২০শে ফেব্রুয়ারীর যুগান্তকারী বিবৃতিতে তিনি শঙ্কিত হয়েছিলেন নিশ্চয়।

খণ্ডিত ভারত কথা

মার্চ্চ, ১৯৪৭—......

ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার পক্ষে প্রধানমন্ত্রী এটলি ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৭ যে বিবৃতি দেন তাতে স্পষ্টই বলা হয় যে ১৯৪৮ সনের জুন মাসের মধ্যে তাঁরা ভারতবর্ষ থেকে বিদায় নেবেন। যদি সম্ভব হয় তাহলে সমগ্র ব্রিটিশ ভারতবর্ষের একটি সম্মিলিত গণপরিষদের উপর আর তা যদি সম্ভব না হয় তা'হলে বিভিন্ন অঞ্চল নিয়ে গঠিত একাধিক গণপরিষদ বা শাসন কর্তৃপক্ষের উপর শাসন ভার অর্পণ করবেন। রাজন্যভারত সম্পর্কে ইতিকর্ত্তব্য তাঁরা এই সময়ের মধ্যেই স্থির করবেন। পূর্ব্ব অধ্যায়ে এই বিবৃতিকে "যুগান্তকারী" বলেছি। "যুগান্তকারী" এইজন্য যে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এবারই প্রথম সরকারী ভাবে ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করে একাধিক রাজ্য বা রাষ্ট্র গঠনের পরিষ্কার ইঙ্গিত দিলেন। মহম্মদ আলি জিন্নার দ্বি-জাতি তত্ত্ব (*Two-Nation Theory*) অহরহ প্রচারের ফলে কি এদেশে কি বিদেশে জনসাধারণের মনে শুধু নয় কর্তৃপক্ষ তথা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মনেও এর প্রতি কেমন একটা বিশ্বাসের ভাব উদ্রেক করেছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ দুই প্রধান দলের ভিতরে ভেদ ও বৈষম্য এত গভীর শিকড় গাড়ে যে ভারতবাসী জনসাধারণের মনে পরস্পরের প্রতি হিংসা-দ্বেষ প্রধূমিত হয় এবং জিন্না-প্রচারিত দ্বি-জাতি তত্ত্বের মূলে প্রচুর রসদ জোগায়। অথচ এই দ্বি-জাতি-তত্ত্ব যে ভূয়া ও অসার, মহাত্মা গান্ধী মাঝে মাঝে এর অনুকূলে মত প্রকাশ করলেও তখন শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্ব্বিশেষে কেউই এদিকে কর্ণপাত করলেন না। ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান কি সহরে কি পল্লীতে বরাবর পাশাপাশি বাস করে এসেছে। ধর্ম্মে মুসলমান হলেও ইসলাম্ ধর্ম্মাবলম্বীরা শতকরা প্রায় পঁচানব্বই জনই জাত্যংশে ভারতীয় তথা বর্ত্তমান হিন্দুগণেরই পূর্ব্ব পুরুষ অর্থাৎ সেকালের হিন্দু। বাংলাদেশ সম্বন্ধে একথা তো পুরাপুরিই প্রযোজ্য। শুধু জাতিতত্ত্বের দিক দিয়েই নয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ভাষা-সাহিত্য

আর্থিক কাঠামো, লৌকিক ব্যবহার, সামাজিক আমোদ-উৎসব সকল দিক থেকেই এই দ্বি-জাতি-তত্ত্ব মতবাদ ভিত্তিহীন। হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মধ্যে এই মূলগত ঐক্যের দিকে তখন যেন আমাদের দৃষ্টিই পড়েনি। আশ্চর্য্যের বিষয় ভারতবর্ষের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এই মৌলিক ঐক্যের বিষয়ে বক্তৃতা বা রচনার মাধ্যমে জনসাধারণের নিকট পরিবেশন করাও যুক্তিযুক্ত বা সময়োপযোগী বোধ করলেন না। পরন্তু যারা ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করার জন্য প্রাণ পণ করেছিলেন তাঁরা এ সময়কার পারস্পরিক মতবিরোধ জনিত দর কষাকষিতেই অতিমাত্র ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। হিন্দু-মুসলমানের মূলগত ঐক্যের প্রতি ভারতবর্ষের সামগ্রিক সার্ব্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন সম্ভাবনায় কংগ্রেসী নেতৃবর্গও সন্দিহান হয়ে উঠলেন। হয়ত তখন রাজনীতি-ক্ষেত্রে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়ে মুসলীম লীগ নেতারা শাসন-কাঠামোর ভিতরে ও বাহিরে যেরূপ অন্তর্বিরোধ শুরু করে দিয়েছিলেন তাতে কংগ্রেসপন্থী ব্যক্তিগণও উদ্ব্যস্ত হয়ে ওরূপ সম্ভাবনায় কতকটা আস্থাশীল হয়ে পড়েন। এ কারণ এ সময়কার রাজনীতিতে মহম্মদ আলি জিন্না তথা মুসলীম লীগ প্রচারিত হিন্দু-মুসলমানের দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতেই সমগ্র আলাপ-আলোচনা কার্য্যাকার্য্য একটি অভাবনীয় মীমাংসা বা সিদ্ধান্তের দিকে আমাদের টেনে নিয়ে যায়। পরবর্তী ঘটনাগুলির বিশ্লেষণে এবই কথার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হবে।

বড়লাট পদে নিযুক্ত হবার পর ভাইকাউণ্ট মাউণ্টব্যাটেন প্রায় চার সপ্তাহকাল স্বদেশে অবস্থান করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি মন্ত্রিসভার নিকট হতে ২০শে ফেব্রুয়ারীর বিবৃতির বিষয়বস্তু-সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য বিস্তারিতভাবে জেনে নেন। ভারতবর্ষের ভিতরকার হিন্দু ও মুসলমানের পারস্পরিক মূলগত মতবিরোধ সম্পর্কেও তিনি নিশ্চয়ই অবগত হলেন। কেবিনেট মিসন প্রস্তাব কার্য্যকরী না হলে ভারত শাসন ব্যাপারে কি কি পন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন হবে, মাউণ্টব্যাটেনের পরবর্ত্তী কার্য্যকলাপ থেকে বুঝা যায়, সে সম্বন্ধেও তিনি স্বাধীনভাবে সময়োপযোগী পন্থা অনুসরণের নির্দ্দেশ পেয়েছিলেন। ভাইকাউণ্ট মাউণ্টব্যাটেন শ্রমিক মন্ত্রিসভা কর্ত্তৃক নিযুক্ত হন বটে, কিন্তু রক্ষণশীল দলের নিকটও তিনি বিশ্বাসভাজন ছিলেন।

এই সময়ে এই দলের মুখপাত্রগণের সঙ্গেও তিনি আলাপ আলোচনায় রত হন। তিনি ব্রিটিশ রাজের নিকট-আত্মীয়। রাজার নিকট থেকেও ভারতবর্ষ সম্পর্কে যে কিছু নির্দেশ পেয়েছিলেন তাও মনে করা অসঙ্গত নয়। এদিকে ভারতবর্ষে বড়লাট ওয়াভেল আরও একমাস কাল অবস্থান করেন। বড়লাটের দৈনন্দিন কার্য্যনির্ব্বাহ এবং নিতান্ত প্রয়োজন হলে শাসন পরিষদের ভিতরকার দ্বন্দ্ববিরোধ প্রশমন ব্যতিরেকে অন্য কোন প্রযত্নেই তিনি হস্তক্ষেপ করেন নি। বস্তুত নূতন কিছু করার ক্ষমতাও তখন তার ছিল না। বড়লাট ওয়াভেল ভারতবর্ষে অবস্থিতির শেষ দিকে ভারতীয়দের মধ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে শাসনতন্ত্র পরিচালনা সম্পর্কে অত্যন্ত আগ্রহশীল ছিলেন। এতদিন পরেও যখন তাঁর কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করি তখন এ বিষয়টি আমাদের মনে স্বতঃই উদয় হয়। তিনি চেয়েছিলেন এবং এ বিষয়ে তিনি কেবিনেট মিসন প্রস্তাবের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমতও হন যে, ভারতবর্ষে একটি অখণ্ড শক্তিশালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হোক। এরূপ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে শুধু ভারতবর্ষের এবং ব্রিটিশ কমনওয়েল্থেরই নয় সমগ্র জগতের শান্তি সংরক্ষণে বিশেষ সহায়তা লাভ করা যাবে। কিন্তু বিধি বাম, এরূপ একটি সম্মিলিত ভারত রাষ্ট্র গঠনের সম্ভাবনা অতি দ্রুত সুদূরে তলিয়ে যেতে লাগল।

ভাইকাউণ্ট মাউণ্টব্যাটেন ১৯৪৭, ২২শে মার্চ্চ দিল্লীতে পৌঁছলেন। তাঁর হস্তে শাসনভার অর্পণ করে বড়লাট ওয়াভেল পরদিন ২৩শে মার্চ্চ স্বদেশযাত্রা করেন। ঐ দিনেই নূতন এবং শেষ বড়লাট মাউণ্টব্যাটেন শপথ গ্রহণ করলেন। শপথ গ্রহণকালে তিনি যে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন তাতে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্কল্পের কথা নূতন করে ব্যক্ত হ'ল। তিনি বলেন, ভারতবাসীর হস্তে ভারতবর্ষের শাসনভার অর্পণ করে পূর্ব্বোল্লিখিত সময়ের মধ্যেই তাঁরা ভারত থেকে বিদায় নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ভাইকাউণ্ট মাউণ্টব্যাটেন শাসনভার গ্রহণ করেই ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কার্য্যে অগ্রসর হলেন। তিনি অন্তর্ব্বর্তী শাসন পরিষদের লীগ ও অ-লীগ সদস্যদের মতবিরোধের বিষয় আগেই অবগত হয়েছিলেন। পূর্ব্বোক্ত বাজেটের প্রস্তাব শতকরা এক-চতুর্থাংশ লভ্যাংশের বিষয়েই তিনি উভয় পক্ষকে একটি মীমাংসায় পৌঁছতে

রাজী করালেন। প্রতি শত টাকা লাভের উপর পাঁচ টাকা কর ধার্য্য করা হ'ল সর্ব্বসম্মতিক্রমে। প্রথম কার্য্যেই এইরূপ সাফল্য লাভ করে তিনি দ্রুত শাসন পরিষদের ভিতরকার ও বাইরের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় লিপ্ত হন। শুধু জিন্না সাহেবের সঙ্গেই নয়, মহাত্মা গান্ধীকেও তিনি সুযোগ পেলেই সকল বিষয় জানাতে লাগলেন। অল্পকাল আলাপ-আলোচনার পর যখনই তিনি বুঝলেন যে, লীগ ও কংগ্রেস তথা অন্য সকল ভারতীয়দের মধ্যে মিসন প্রস্তাবের ভিত্তিতে আপোষ রফার সম্ভাবনা আর নেই, তখন কাল বিলম্ব না করে খণ্ডিত ভারতের ভিত্তিতেই কথাবার্ত্তা শুরু করে দিলেন। বড়লাটের কার্য্যভার গ্রহণের পূর্ব্বেই এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটে যাতে করে এর পক্ষে কতকটা সুযোগই হ'ল। দ্বি-জাতি-তত্ত্ব তথা পাকিস্তানের দাবীতে সিন্ধু প্রদেশে নূতন করে যে সাধারণ নির্ব্বাচন হ'ল তাতে মুসলীম লীগ পক্ষীয় সদস্যগণই সংখ্যাধিক্য লাভ করে বিজয়ী হলেন। আর তাঁরাই মন্ত্রিসভা গঠন করলেন অবিলম্বে।

পাকিস্তান দাবীর ভিত্তিতে যে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' পূর্ব্ব বৎসরে শুরু হয় তা এযাবৎ জিইয়ে রাখা হয়েছিল বটে, কিন্তু এই সময় আবার 'সংগ্রাম' আরম্ভ হ'ল ভীষণভাবে। প্রথমে বঙ্গে ও পরে পঞ্জাবে এর প্রকোপ অত্যন্ত বেড়ে চলে। ফেব্রুয়ারী-মার্চ্চ নাগাদ পঞ্জাবের লাহোর ও অন্যান্য শহরে এবং বিভিন্ন জেলার পল্লী অঞ্চলেও এ ছড়িয়ে পড়ে। শিখ, হিন্দু এবং মুসলমান—এই তিন সম্প্রদায়ই এতে লিপ্ত হয়। এ সময় যে হিন্দু, শিখ ও মুসলমানের মধ্যে মারামারি হানাহানি গৃহদাহ সম্পত্তিনাশ প্রভৃতি ঘটে তার তুলনা মেলা ভার। প্রাদেশিক মন্ত্রিসভায় লীগ যুক্ত না থাকলেও বাহিরে তাদেরই প্রাধান্য। প্রধান-মন্ত্রী এটলির বিবৃতির ফলে সন্দেহ মাত্র রইল না যে মুসলমানদের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা হেতু লীগ পঞ্জাবে প্রাধান্য লাভ করবে। প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার প্রধান-মন্ত্রী সার খিজির হায়াৎ খান নিশ্চয়ই এই সব কারণে পদত্যাগ করতে প্ররোচিত হন ২রা মার্চ্চ, ১৯৪৭ তারিখে। তবে তাঁর এই পদত্যাগের কথা সহকর্মী হিন্দু ও শিখ মন্ত্রিগণকে আগে না জানানোয় সাধারণের মনে তখন যেমন বিস্ময়ের উদ্রেক হয়েছিল তেমনি তার সমালোচনাও হয় বিস্তর। আর ও একটি ব্যাপারে নব নিযুক্ত বড়লাটের পক্ষে বিশেষ সুবিধা করে দেয়

জাতীয় কংগ্রেস। ৫ই জানুয়ারী তারিখ অনুষ্ঠিত নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি পরবর্ত্তী জরুরী বিষয়সমূহ-সম্বন্ধে ইতিকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের ভার কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির উপর অর্পণ করেছিলেন। ১৯৪৭, ৫ই মার্চ্চ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এক বৈঠকে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। নিশ্চয়ই তাঁরা পঞ্জাবের একপক্ষে মুসলমান এবং অন্য পক্ষে হিন্দু ও শিখদের মধ্যে যে আত্মঘাতী দাঙ্গাহাঙ্গামার উদ্ভব হয়েছিল তার দ্বারা এরূপ সিদ্ধান্ত-গ্রহণে বাধ্য হন। পূর্ব্বেকার কংগ্রেসী নীতির উল্লেখ করে ওয়ার্কিং কমিটি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, ওরূপ ক্ষেত্রে পঞ্জাব বিভাগ হওয়াই সমীচীন। প্রেসিডেন্ট কৃপালনী এর ভাষ্যস্বরূপ বললেন ঐ একই কারণে বাঙ্গালা বিভাগও শ্রেয় বলে বিবেচিত হবে। পূর্ব্বে সংঘটিত এই সকল ব্যাপার, বিশেষ করে কংগ্রেস-গৃহীত উক্ত প্রস্তাব ভাইকাউন্ট মাউণ্টব্যাটেনকে নেতৃবৃন্দের সঙ্গে নূতন করে আলাপ-আলোচনার এবং খণ্ডিত ভারতের ভিত্তিতে একটি নূতন শাসন-পরিকল্পনা রচনার সুবিধা করে দিয়েছিল আশাতীতরূপে।

শপথ গ্রহণের পর থেকেই প্রায় ছয় সপ্তাহ যাবৎ বড়লাট মাউণ্টব্যাটেন কংগ্রেস, মুসলীম লীগ, হিন্দু মহাসভা, আকালী শিখ এবং অন্যান্য সংখ্যা-লঘিষ্ঠ সব দলগুলির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ব্রিটিশের শাসনভার প্রত্যর্পণ সম্পর্কে আলোচনায় রত হলেন। অন্তর্ব্বর্তীকালীন শাসন পরিষদের সদস্যগণও এবম্বিধ আলোচনায় অংশ গ্রহণ থেকে বাদ যাননি। যে অন্তর্বিরোধের জন্য এই ক'মাস একরূপ শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল নূতন বড়লাটের কার্য্যভার গ্রহণের পর থেকে তা জটিলতর আকার ধারণ করার যেন সুযোগই পেলে না। খণ্ডিত ভারতের ভিত্তিতে আলাপ-আলোচনা আরম্ভ হওয়ায় পরিষদের সদস্যগণ কতকটা যেন সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচলেন। ভাইকাউণ্ট মাউণ্টব্যাটেন এই সময়কার ভাববিনিময়ের ফলে একটি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। তিনি ১৫ই ও ১৬ই এপ্রিল ১৯৪৭ তারিখে প্রাদেশিক গবর্ণরদের একটি বৈঠক আহ্বান করেন। এই বৈঠকে বাংলা ও পঞ্জাব বিভাগের প্রস্তাব সর্ব্বপ্রথম উত্থাপিত হ'ল। তিনি বলেন যে, ভারতবর্ষে যে বিরোধ দেখা দিয়েছে এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভারতবাসীর হস্তে শাসনভার ছেড়ে দেওয়ার যে সঙ্কল্প গ্রহণ করেছেন তাতে

কেবিনেট মিসন প্রস্তাবের পরিবর্ত্তে একটি নূতন পরিকল্পনা গ্রহণ অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। পঞ্জাব ও বাঙ্গালার আইন পরিষদকে দুইটি ভাগে ভাগ করতে হবে। পঞ্জাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সদস্যেরা থাকবেন একভাগে এবং হিন্দু ও শিখ প্রধান অঞ্চলগুলির প্রতিনিধিরা থাকবেন অন্য ভাগে। বাংলার আইন পরিষদকেও অনুরূপ দুই ভাগে ভাগ করতে হবে। এই প্রকারে বিভক্ত আইন পরিষদের সদস্যগণ প্রদেশ বিভাগ বাঞ্ছনীয় কি না নিজ নিজ ভোটে তা প্রকাশ করবেন। এই ভোটদান ব্যাপারে বিদেশী সদস্যেরা অংশ গ্রহণ থেকে বিরত থাকবেন। উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশেও নূতন নির্ব্বাচন দ্বারা সেখানকার অধিবাসীদের মত নিতে হবে—তাঁরা কোন পক্ষে থাকতে চান। বাংলা ও পঞ্জাবের গবর্ণরদের পক্ষে এরূপ প্রস্তাবে সমর্থন না মিললেও মাউণ্টব্যাটেন এতদানুযায়ী নূতন পরিকল্পনা রচনায় অগ্রসর হলেন। ২০শে এপ্রিল তারিখে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু একটি ভাষণে দৃঢভাবে বলেন যে মুসলীম লীগ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করতে পারে কিন্তু যাঁরা এর সঙ্গে যোগদানে অনিচ্ছুক তাদের টেনে নিতে পারে না। পরবর্ত্তী ২৮শে এপ্রিল গণপরিষদের অধিবেশনে সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ এই মর্ম্মে ঘোষণা করলেন যে, কেবিনেট মিসন প্রস্তাব অনুযায়ী তাঁরা একটি সম্মিলিত ভারত রাষ্ট্রগঠনে উৎসুক। কিন্তু যদি এরকম দুঃখকর অবস্থা দেখা দেয় যে, কোন বিশেষ অঞ্চল বা অংশ এর সঙ্গে যুক্ত থাকতে নারাজ তবে তাদের বাদ দিয়েই সম্মিলিত ভারত রাষ্ট্র গঠনকল্পে নিয়মতন্ত্র রচিত হবে। এরূপ পরিস্থিতি উদ্ভব হলে শুধু ভারত বিভাগই নয় বিভিন্ন অঞ্চল বা প্রদেশকেও সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রতি লক্ষ্য রেখে ভাগ করে নিতে হবে। জিন্না কিন্তু বড়লাট মাউণ্টব্যাটেনের প্রদেশ বিভাগের সিদ্ধান্তের কথা জেনে প্রথমে খুবই ক্রুদ্ধ হন। তিনি একটি বিবৃতিতে বলেন যে, মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দুইটি প্রদেশ নিয়েই (পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু, ব্রিটিশ বেলুচিস্থান, বাংলা ও আসাম) একটি সার্ব্বভৌম পাকিস্থান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চান, এই সকল প্রদেশের কোন অংশকে বাদ দিয়ে নয়। যদি তা-ই হয় তবে লোক বিনিময় ছাড়া গত্যন্তর নাই। তিনি এই বিবৃতিতে অবশ্য যথার্থতঃ এই কথা বলেছিলেন যে, প্রস্তাবিত রূপে প্রদেশ বিভাগ হলে এদের অর্থনৈতিক

কাঠামো সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে পড়বে। কিন্তু তিনিও শেষ পর্য্যন্ত ঘটনাচক্রে বিরোধী মনোভাব ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

প্রদেশবিভাগের প্রস্তাব উত্থাপিত হলে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে পঞ্জাব হতে আগত হিন্দু ও শিখ প্রতিনিধিগণ একযোগে পঞ্জাব বিভাগের প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। শিখ সম্প্রদায়ের উগ্রপন্থী নেতারা 'খালসিস্থান' স্থাপনের কথাও পাড়লেন। বাংলা দেশে পূর্ব্বেকার বঙ্গবিভাগ-জনিত দুঃখ ও ক্লেশকর অবস্থার কথা প্রবীণ বাঙ্গালীরা তখনও ভুলতে পারেন নি। এই মনোভাবের সুযোগ নিয়ে বঙ্গের লীগপন্থী প্রধানমন্ত্রী শহীদ সুরাবর্দ্দী এবং কংগ্রেসনেতা শরৎচন্দ্র বসু বিভক্ত বঙ্গের পরিবর্ত্তে একটি সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন অর্থাৎ সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রগঠনের প্রস্তাব করেন। কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষে এবং বিশেষতঃ বঙ্গে ও পঞ্জাবে পাকিস্থানী প্রচারকার্য্য ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা এমনভাবে বিস্তার লাভ করে যে, বসু-সুরাবর্দ্দীর সার্ব্বভৌম বঙ্গ রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার প্রস্তাবকে কেউই আমল দিলেন না। জনমত তখন সর্ব্বপ্রকারে এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ব্রিটিশ ভারতের যে সব অঞ্চলে বা প্রদেশে মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ তাদের নিয়ে স্বতন্ত্র অঞ্চল বা প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব করে একটি পরিকল্পনা রচনা করেন। মুসলমান-অধ্যুসিত এই সব স্বতন্ত্র অঞ্চলকে ভারতবর্ষ হতে বিচ্ছিন্ন করে তাদের উপর আলাদাভাবে শাসনভার প্রত্যর্পণের ব্যবস্থা করতে হবে। উক্ত বিভক্ত প্রদেশগুলির অ-মুসলমান অংশ ভারত রাষ্ট্রের সঙ্গেই যুক্ত থাকবে। রাজন্য ভারতের সঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে আলাপ-আলোচনা চালানোর নিমিত্ত তাদের ভিতর থেকে কয়েকজন প্রতিনিধি নিয়ে 'ষ্টেট্‌স নেগোসিয়েটিং কমিটি' স্থাপিত হ'ল। এই কমিটি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে আলোচনায় রত হন।

বড়লাট মাউণ্টব্যাটেন মন্ত্রিসভাকে এ সম্পর্কে সাক্ষাৎভাবে বুঝিয়ে তাঁদের সুবিবেচিত মতামত জানবার জন্যে, ২রা মে, ১৯৪৭ তারিখে তাঁর অন্যতম প্রধান সহকারী উপদেষ্টা লর্ড ইজমেকে প্রদেশ বিভাগভিত্তিক প্রস্তাবটি নিয়ে বিলাতে পাঠালেন। মন্ত্রিসভা মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনার অনেকটা সংশোধন ও রদবদল করলেন। তাঁরা আশু ক্ষমতা হস্তান্তরের নিমিত্ত বিভাগ তো সমর্থন করলেনই, তদুপরি আরও বললেন যে, ভারতবর্ষের যে যে অংশ

একটি সম্মিলিত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হতে না চাইবে সে সব অঞ্চলেও স্বতন্ত্র-ভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যবস্থা করতে হবে। মন্ত্রিসভা কর্তৃক সংশোধিত মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনায় ভারতবর্ষকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে বহু স্বতন্ত্র ও সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রের সৃষ্টি করা হবে বলে পরে নেতৃবৃন্দ অনেকে মত প্রকাশ করেন। এরূপ ভাবী ভারতের ছিন্নভিন্ন অবস্থাকে তাঁরা "Balkanization of India" বলে আখ্যা দেন। অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপকে খণ্ডিত-বিখণ্ডিত করে যে, কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছিল এবং যাদের বলা হয়, "বলকান ষ্টেটস্" তারই সম্ভাবনা—তাঁরা এতে পেলেন। এই সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত পরিকল্পনা ১৯৪৭, ৯ই মে তারিখে বড়লাট মাউণ্টব্যাটেনের হস্তগত হ'ল। তিনি এটির মর্ম্ম উপলব্ধি করে যে বিশেষ অস্বস্তি বোধ করেছিলেন তার প্রমাণ আছে। তিনি এবিষয়ে নেতৃ-বৃন্দের মতামত গ্রহণের নিমিত্ত কংগ্রেস পক্ষে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু ও বল্লভভাই প্যাটেল, লীগ পক্ষে মহম্মদ আলি জিন্না ও লিয়াকৎ আলি খান এবং শিখদের পক্ষে বলদেব সিংকে নিয়ে পরবর্ত্তী ১৭ই মে তারিখে একটি ক্ষুদ্র বৈঠক দিল্লীতে আহ্বান করলেন। উক্ত প্রস্তাব-সম্পর্কে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু বিশদভাবে আলোচনা করে এর সুদূরপ্রসারী এবং আত্মঘাতী কুফল সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য করেন। অন্যদের পক্ষেও সভায় ও সংবাদপত্রে ঘোরতর প্রতিবাদ চলে। লর্ড মাউণ্টব্যাটেনও যে এই সংশোধিত পরিকল্পনায় আশ্বস্ত হতে পারেন নি একটু আগেই তার উল্লেখ করেছি। তিনি অগত্যা এই বৈঠক আহ্বান স্থগিত রাখলেন। এর মূলে শুধু তাঁর ব্যক্তিগত অশান্তি এবং নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধ এবং তীব্র সমালোচনাই নয় অন্য কারণও ছিল। এই কথাই এখন ব'লব।

লর্ড ইজমের ২রা মে তারিখের ভারত ত্যাগের পর থেকে পরবর্ত্তী ৯ই মে এই সাত দিনের মধ্যে আরেকটি পরিকল্পনা সম্পর্কে বিশেষভাবে বড়লাট ও কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের মধ্যে আলাপ-আলোচনা হয়। এই পরিকল্পনা রচনায় বড়লাটের অন্যতম প্রধান সহকারী উপদেষ্টা ভি. পি. মেননের অনেকখানি হাত ছিল। বস্তুত মেনন মহোদয় The Transfer of Power in India (ভারতবর্ষের শাসনক্ষমতা হস্তান্তরীকরণ) শীর্ষক পুস্তকে এই মর্মে লিখেছেন

যে, তিনিই এই পরিকল্পনার বিষয় সর্ব্বপ্রথম ১৯৪৬-এর ডিসেম্বর মাসে বল্লভভাই প্যাটেলের গোচরে আনেন। কংগ্রেসের সঙ্কল্প অখণ্ড ভারতবর্ষে সার্ব্বভৌম স্বাধীনতা-প্রতিষ্ঠা। কংগ্রেস ইতিমধ্যেই বিভিন্ন প্রস্তাবে এই মর্মে সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করে যে, সম্মিলিত ভারতরাষ্ট্রে যে সকল প্রদেশ, অঞ্চল বা এর অংশ যোগদানে অনিচ্ছুক, কংগ্রেস-সমর্থিত ও প্রচারিত আত্মনিয়ন্ত্রণ-নীতি অনুসারে তাদের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করে নিতে তাঁরা দ্বিধা করবেন না। ১৯৪৭ সনের মার্চ্চ-এপ্রিল নাগাদ কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্ত একটি স্পষ্ট আকার ধারণ করে। মেনন-পরিকল্পিত প্রস্তাবের দুইটি অংশ: (১) এতাবৎ কালের কংগ্রেসপোষিত সর্ব্বাত্মক স্বাধীনতার পরিবর্ত্তে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত ডোমিনিয়ান ষ্টাটাসের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র গঠন ও নিয়ন্ত্রণ। এর ফলে ভারতবর্ষ সর্ব্বাত্মক স্বাধীনতার সার-বস্তু পুরাপুরি লাভ করবে। অথচ ডোমিনিয়ন ষ্টাটাস্ গ্রহণ দ্বারা শাসন-ক্ষমতা আশু হস্তান্তরীকরণের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হবে। এতে একদিকে যেমন ব্রিটিশ জাতি তথা ব্রিটিশ সরকারের সদিচ্ছা পূর্ণমাত্রায় পাওয়া যাবে অন্য দিকে শাসন-কাঠামোয় উচ্চতন পদস্থ ব্রিটিশ কর্মচারীদের স্বতঃপ্রণোদিত সহযোগিতা এই ক্ষমতা হস্তান্তরীকরণ-কালে যা বিশেষভাবে প্রয়োজন তা থেকেও আমরা বঞ্চিত হব না। দেশরক্ষায় ব্রিটিশ বাহিনীর উপরও আমরা নিশ্চিত-ভাবে নির্ভর করতে সক্ষম হব। অন্তর্ব্বর্তী অবস্থায় ভারতবর্ষের শাসন-কাঠামোয় তখন যে বিষম বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হচ্ছিল, এই নীতি গ্রহণ করলে তা থেকেও রেহাই পাওয়া যাবে। (২) আবার কংগ্রেস তো ভারতবর্ষের কোন কোন অঞ্চলকে স্বাতন্ত্র্য দিতেই ইচ্ছুক। এই অঞ্চলগুলিকে ভারতবর্ষ থেকে আলাদা করে দেওয়া চলবে। এক্ষেত্রে ডোমিনিয়ান ষ্টাটাসের ভিত্তিতে যাবতীয় ব্যবস্থা অবলম্বিত হলে আশু এবং ভাবী নানা দিক থেকেই আমরা উপকৃত হব। তখনই খণ্ডিত ভারতের পরিকল্পনা অবশ্য পরিষ্কাররূপে আমাদের চোখে ধরা দেয় নি। মেনন বলেন প্রথমেই বল্লভভাই প্যাটেল কতকটা অনুকূল মত প্রকাশ করায় তিনি এই পরিকল্পনাটিকে সুষ্টুরূপ দিতে অধিকতর আগ্রহশীল হন। তিনি ভারত সচিবকেও নিজ প্রস্তাবের একটি নকল আগেই প্রেরণ করেছিলেন। বড়লাট মাউণ্টব্যাটেন ভারতবর্ষে

রওনা হবার পূর্ব্বেই বিলাতে বসে এ প্রস্তাবটি দেখেছিলেন। সমসাময়িক অবস্থার নিরিখে এই পরিকল্পনাটিকে ক্রমে কতকটা সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত করা হতে থাকে। উপরি-উক্ত এক সপ্তাহের মধ্যে বড়লাটের অনুমোদনক্রমে মেনন পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুকে এই নূতন আকারের পরিকল্পনাটি দেখান।

বড়লাট মাউণ্টব্যাটেনের আহ্বানে পণ্ডিত নেহেরু ও বলদেব সিং মে মাসের প্রথম সপ্তাহে সিমলায় অবস্থান করেন। তখন বড়লাট এবং এই দুই নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মেননের মাধ্যমে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ভাবে এই পরিকল্পনাটি নিয়ে মত-বিনিময় হয় এবং তাতে বুঝা গেল নেহেরু এবং বলদেব সিং-এর নিকট থেকে এ পরিকল্পনার অনুকুলে সমর্থন লাভ করা সম্ভব হবে। এর পরেই এল ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষের প্রস্তাব। এই প্রস্তাবের উপরে ভারতবর্ষে কিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় তার আভাস আমরা পেয়েছি। নূতন পরিকল্পনায় নেতৃবৃন্দের অনুকূল মনোভাব জেনে বড়লাট মাউণ্টব্যাটেন ১৭ই মে তারিখের বৈঠক আহ্বান স্থগিত রাখেন, পূর্ব্বেই বলেছি। তিনি ঐ তারিখে একটি বিবৃতিতে বলেন যে, আশু ক্ষমতা হস্তান্তরীকরণ-সম্পর্কে যে একটি নূতন পরিকল্পনা উপস্থাপিত করা হয়েছে তাতে বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দের সমর্থন পেলে (সম্ভব হলে লিখিতভাবে) তিনি অবিলম্বে এ নিয়ে বিলাত যাত্রা করবেন। নূতন খসড়া পরিকল্পনাটির মূল ধারাগুলি এইরূপ :

(১) ভারতবর্ষ বিভক্ত বা খণ্ডিত হবে কিনা সে জন্যে জনমত গ্রহণের যে পদ্ধতি অবলম্বিত হবে সে সম্বন্ধে পূর্ব্বেই নেতৃবৃন্দের সম্মতিদান ;

(২) একটি সম্মিলিত ভারতরাষ্ট্র চালু থাকবে—যদি এইরূপ মত হয় তা হলে ডোমিনিয়ান ষ্টাটাসের ভিত্তিতে বর্ত্তমান গণপরিষদের হস্তেই ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে ;

(৩) অথবা, যদি এরূপ মত হয় যে ভারতবর্ষে দুইটি আত্মকর্ত্তৃত্বসম্পন্ন রাষ্ট্র গঠিত হবে ঐ ডোমিনিয়ন ষ্টাটাসের ভিত্তিতেই, তা'হলে এদের দুইটি কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট বা শাসন কর্ত্তৃপক্ষ এই ভার গ্রহণ করবেন এবং গ্রহণ করে নিজ নিজ গণপরিষদের উপর এ ভার ছেড়ে দেবেন ;

(৪) উল্লিখিত দুইটি ক্ষেত্রের যে-কোনটিই কার্য্যে রূপায়ণকালে

১৯৩৫ সনের ভারতীয় আইন ডোমিনিয়ান ষ্টাটাসের অনুকূলে যথাবিহিত সংশোধননান্তর কার্য্যকরী হবে ;

(৫) দুইটি ডোমিনিয়নেরই একই বড়লাট হবেন এবং বর্ত্তমান বড়লাটকে এই পদে পুণনিয়োগ করা হবে ;

(৬) 'পার্টিশান' বা ভাবত বিভাগে সম্মতি পেলে সীমানা স্থিরীকরণ উদ্দেশ্যে একটি কমিশন গঠিত হবে ;

(৭) কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট দুটির প্রত্যেকটির দ্বারাই নিজ নিজ এলাকাভুক্ত প্রদেশসমূহের গবর্ণর নিযুক্ত হবেন ;

(৮) দুইটি ডোমিনিয়ন স্থাপনের অনুকূলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে দেশরক্ষা বাহিনীও দুটি ভাগে বিভক্ত হবে। বিভাগের সময় লক্ষ্য রাখা হবে যাতে একটি ডোমিনিয়নের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলের মধ্য হতে সংগৃহীত নিজ নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত সেনাদল সেই সেই ডোমিনিয়নেই থাকে। যে সব অঞ্চল হইতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সেনাদল সংগৃহীত হযেছে সেইসব সেনাদল বিভাগসম্পর্কে কিন্তু মার্শাল সার্ ক্লড্ অচিনলেকের সভাপতিত্বে প্রত্যেকটি ডোমিনিয়নের সেনাবাহিনীর অধিকর্ত্তাদ্বয়সহ একটি কৌউন্সিল বা সভা গঠিত হবে। বিভাগকার্য্য সমাপনান্তে কৌউন্সিল স্বতঃই রহিত হবে।

এই খসড়া পরিকল্পনা বড়লাট মাউণ্টব্যাটেনের পূর্ণ অনুমোদন পেলে। তারই পক্ষ থেকে দু'জন প্রধান সহকারী উপদেষ্টাকে যথাক্রমে কংগ্রেস ও শিখ পক্ষে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু, বল্লভভাই প্যাটেল ও বলদেব সিং এবং লীগপক্ষে মহম্মদ আলি জিন্না ও লিয়াকৎ আলি খাঁনের নিকট বড়লাট মাউণ্টব্যাটেন ১৭ই মে তারিখেই এই খসড়া পরিকল্পনাসম্পর্কে মতামত গ্রহণের জন্য পাঠালেন। তিনি এই দিনই সম্ভব হলে তাঁদের লিখিত মতামত পেতে চান। কংগ্রেস এবং শিখ পক্ষ গত কয়েক মাসের মধ্যে যে সঙ্কটময় অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে এবং বিভিন্ন সভাসমিতিতে ভারতবর্ষে একক বা সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রগঠনে যেরূপ মতামত প্রকাশ করেছে, তাতে এই খসড়া— পরিকল্পনার মূল ধারাগুলি সম্বন্ধে তারা অনুকূল অভিমতই প্রকাশ করলে। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু একপত্রে লিখিতভাবেই বড়লাটকে তাঁদের অনুকূল অভিমত জানালেন। মহম্মদ আলি জিন্না ও লিয়াকৎ আলি খাঁন খসড়া।

প্রস্তাব সম্পর্কে নিজেদের সমর্থন জ্ঞাপন করিলেন বটে, কিন্তু লীগপক্ষে লিখিতভাবে তাঁরা একথা বড়লাটকে জানাতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। যাবতীয় বিষয়ে বড়লাট মাউণ্টব্যাটেনের ক্ষিপ্রকারিতা ইতিমধ্যেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তিনি পরদিন ১৮ই মে তারিখে এই অনুমোদিত খসড়া পরিকল্পনাসহ বিলাতে রওনা হলেন তথাকার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে আলাপ-আলোচনার নিমিত্ত। এখন স্পষ্টই বুঝা গেল কেবিনেট মিসন প্রস্তাবের মূল লক্ষ্য-সম্মিলিত সার্ব্বভৌম ভারতরাষ্ট্র গঠন পুরাপুরিই বর্জিত হয়েছে, এমন কি লর্ড ইজমে বড়লাটের নিকট থেকে যে পরিকল্পনা নিয়ে বিলাতে গিয়েছিলেন এবং শ্রমিক মন্ত্রিসভা যার অনেকখানি মৌলিক রদবদল করতে চেয়েছিলেন তাও ঢের পশ্চাতে পড়ে রইল।

মাউণ্টব্যাটেন বিমানযোগে ১৮ই মে রওনা হয়ে পরদিনই বিলাতে পৌঁছেন। তিনি সরাসরি প্রধানমন্ত্রী এটলি এবং মন্ত্রীসভার পক্ষে ইণ্ডিয়া ও বার্ম্মা কমিটির সঙ্গে আলোচনায় লিপ্ত হলেন। এই সময়ে তিনি পার্লামেণ্টে বিরোধী দল তথা মিঃ চার্চ্চিলের সঙ্গেও এ সম্পর্কে মতবিনিময় করেন। তিনি মোটামুটি এ দলের নিকট থেকেও মূল প্রস্তাবে সমর্থন ও সহানুভূতি লাভ করলেন। দেড় সপ্তাহকাল ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে খসড়া পরিকল্পনার ভিত্তিতে কথাবার্ত্তা চালিয়ে পরবর্ত্তী ৩১শে মে তারিখেই ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। এই সময়ের মধ্যে উক্ত পরিকল্পনা নিয়ে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যেসব কথা হয় তিনি প্রতিনিয়ত এখানকার কংগ্রেস, শিখ ও লীগ নেতৃবৃন্দকে তা প্রতিটি স্তরে সহকারী উপদেষ্টাদের মারফত জানিয়েছিলেন। আর এতে তাঁদের অনুকূল মতামতও জেনে নিলেন। ভারতীয় নেতৃবৃন্দের এইরূপ মৌখিক সমর্থন জেনে মন্ত্রিসভা ভারতবর্ষের ক্ষমতাহস্তান্তর সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ নূতন পরিকল্পনা রচনা করেন। প্রকাশ্যে ঘোষণার পূর্ব্বে এই সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটিতে যাতে ভারতীয় বিভিন্ন দলের আন্তরিক পুরাপুরি সমর্থন পাওয়া যায় তার জন্যে তাঁরা সাক্ষাৎভাবে আলাপ-আলোচনা করার ভার দিলেন বড়লাট মাউণ্টব্যাটেনের উপর। পরবর্ত্তী ২রা জুনের ভিতরেই ভারতীয় নেতাদের অভিমত মন্ত্রিসভাকে জানাতে পারবেন, বড়লাট মাউণ্টব্যাটেন তাঁদের এইরূপ কথা দিয়ে এলেন।

দিল্লীতে ফিরেই মাউণ্টব্যাটেন নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নূতন প্রস্তাবসম্বলিত ঘোষণা সম্পর্কে আলোচনায় ব্যাপৃত হন। বিলাত প্রবাসকালে ভারতবর্ষে দুটি নূতন সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল। জিন্না সাহেব নূতন করে প্রস্তাব করলেন পাকিস্থান ও ভারতের মধ্যে একটি 'করিডর' বা সীমান্ত রেখা প্রথমেই টেনে দিতে হবে। আবার মহাত্মা গান্ধী প্রার্থনা-সভাকালীন বক্তৃতায় প্রকাশ করলেন ভারতবর্ষ দ্বি-খণ্ডিত করে পাকিস্থান গঠন ব্যাপারে তিনি কোনমতেই সায় দিতে পারেন না। এর ভিতরে স্বাধীনতা অর্জন না করে বরং 'সিবিল ওয়ার' বা অন্তর্বিপ্লবের আশ্রয় নেওয়াও বাঞ্ছনীয়। বড়লাট ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের পর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনায় রত হবার পূর্ব্বেই এ দুটি নূতন সমস্যার সম্মুখীন হলেন। মহাত্মা গান্ধীর অভিমত বস্তুত কি ধরণের তা তিনি অনুপস্থিতিকালে সহকারী উপদেষ্টার মাধ্যমে জেনে নিয়েছিলেন। তিনি সাক্ষাৎভাবে গান্ধীজির সঙ্গে আলোচনা করে এ কথাই বুঝলেন যে, নূতন অবস্থায় তিনি বড়লাটের প্রযত্নে বাদ সাধবেন না। ক্রমে মহাত্মা গান্ধী তাঁর পূর্ব্বমত বর্জন করে ভারত বিভাগ এবং ডোমিনিয়ান ষ্টাটাসের ভিত্তিতে রচিত নূতন পরিকল্পনা-গ্রহণের পক্ষেই মত দেন। একটু পরে তা আমরা বুঝতে পারবো। বড়লাট মাউণ্টব্যাটেনের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে জিন্না সাহেবও তাঁর 'করিডর' প্রস্তাব আর উত্থাপন করেন নি। অবশ্য প্রদেশবিভাগে সীমানির্দ্দেশের মধ্যেই তাঁর এ প্রস্তাব কতকটা রূপ পরিগ্রহ করে।

লর্ড মাউণ্টব্যাটেন অবিলম্বে নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা তথা নূতন প্রস্তাবের অনুমোদনকল্পে বৈঠক আহ্বান করলেন ২রা জুন, ১৯৪৭ তারিখে। এই বৈঠক পরদিন সকালেও বসেছিল। কংগ্রেস পক্ষে সভাপতি আচার্য্য কৃপালনী, পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু ও বল্লভভাই প্যাটেল, লীগপক্ষে মহম্মদ আলি জিন্না, লিয়াকৎ আলি খাঁন ও আব্দুর রব্ নিস্তার এবং শিখ-পক্ষে বলদেব সিং যোগ দেন। বৈঠকের দু'দিনের অধিবেশনেই সংযত ও শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ায় বুঝা গেল প্রত্যেক পক্ষই নিজ নিজ অভিপ্রায় বা সঙ্কল্প সম্বন্ধে কতকটা আশ্বস্ত এবং স্থির নিশ্চয় হয়েছেন। কংগ্রেস ও শিখ পক্ষ থেকে লিখিতভাবে অনুমোদন পাওয়া গেল। জিন্না সাহেব কিন্তু

যথাপূর্ব্বম্ মৌখিকভাবেই সমর্থন জানালেন। তিনি বললেন যে, লীগ কৌউন্সিলের অভিমত পাওয়ার পূর্ব্বে নিয়মানুগভাবে লিখিত জবাব দিতে তিনি অক্ষম। তবে বড়লাট তাঁর নিকট থেকে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করলেন যে তিনি লীগ তথা মুসলমান-সম্প্রদায়কে প্রস্তাবের পক্ষে আনয়ন করতে যথাসাধ্য যত্ন নেবেন। প্রথম দিনের বৈঠকেই বৃটিশ মন্ত্রিসভার ঘোষণার নকল অগ্রিম নেতৃবৃন্দকে দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয় দিনের বৈঠকে আরও স্থির হয় যে, ঐ দিন (৩রা জুন) মন্ত্রিসভা কর্ত্তৃক পার্লামেণ্টে ঘোষণার পর সন্ধ্যায় বেতারে বড়লাট মাউণ্টব্যাটেন এ সম্বন্ধে বক্তৃতা করবেন। তাঁর বক্তৃতার অন্তে এর অনুকূলে কংগ্রেসপক্ষে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু, লীগপক্ষে মহম্মদ আলি জিন্না এবং শিখপক্ষে বলদেব সিং ক্রমান্বয়ে বক্তৃতা দেবেন। এতে সকলেই রাজী হলেন এবং এই কর্ম্মসূচী অনুসারেই কাজ হয়েছিল। পার্লামেণ্টে ঘোষণার পর এদেশে এই ঘোষণাটি বেতারকেন্দ্র থেকে সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়। এই ঘোষণার দ্বারাই সর্ব্বসাধারণকে সরকারী-ভাবে জানানো হলো যে অতি শীঘ্র খণ্ডিত ভারত এবং ডোমিনিয়ন ষ্টাটাসের ভিত্তিতে এদেশের শাসনসংক্রান্ত সর্ব্ববিষয়ে আত্মকর্ত্তৃত্ব লাভ আসন্ন।

ঘোষণায় পরিব্যক্ত বিষয়গুলির আভাস ইতিপূর্ব্বেই আমরা খসড়া পরিকল্পনার মূল ধারাগুলির মধ্যে পেয়েছি। এই খসড়ার ভিত্তিতেই উক্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা তৈরী হয়েছিল। ঘোষণার হেতুবাদে বলা হয় যে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দলগুলি একমত না হওয়ায় সম্মিলিত ভারতরাষ্ট্রের ভিত্তিতে রচিত কেবিনেট মিসন প্রস্তাব পরিত্যাগ করতে ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ বাধ্য হয়েছেন। তাঁরা প্রথমেই বলেন, যে মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার, আসাম, উড়িষ্যা, এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অধিকাংশ লোকের প্রতিনিধি, দিল্লী, আজমীড় মারোয়াড় ও কুর্গের প্রতিনিধিদের সহ বর্ত্তমান গণপরিষদে যোগ দিয়েছেন। এই গণপরিষদের কার্য্য অব্যাহতভাবে চলুক এই তাদের বাসনা। কিন্তু বাংলা, পঞ্জাব, সিন্ধু ও ব্রিটিশ বেলুচিস্থানের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ মুসলমান সংখ্যা-লঘিষ্ঠ প্রদেশসমূহের মুসলমান প্রতিনিধিবৃন্দ বর্ত্তমান গণপরিষদ বর্জন

করেছেন। প্রদেশ বিভাগ দ্বারা মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি স্বতন্ত্র গণপরিষদ অবিলম্বে গঠনের নির্দ্দেশ দেওয়া হচ্ছে। এই গণপরিষদ গঠিত হলে মুসলমান সংখ্যালঘিষ্ঠ অঞ্চল থেকে প্রেরিত মুসলমান প্রতিনিধিদের বর্ত্তমান গণপরিষদে যোগদানে কোনই বাধা থাকবে না।

এর পরে প্রদেশবিভাগ-সম্পর্কে ঘোষণায় যে সব নির্দ্দেশ দেওয়া হয় তার কথা এখন বলি। পঞ্জাব ও বাংলার আইনসভা প্রথমে অধিকাংশের ভোটে স্থির করবেন তারা বর্ত্তমান সম্মিলিত ভারতের ভিত্তিতে গণপরিষদে নিয়মতন্ত্র রচনায় যোগদান করবেন কি না। যদি অধিকাংশের ভোটে স্থির হয় যে তারা এর অন্তর্ভুক্ত থাকবেন না তাহলে প্রত্যেকটি আইনসভাকে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং অ-মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের প্রতিনিধিদের নিয়ে দুই ভাগে ভাগ করতে হবে। প্রত্যেক ভাগের অধিকাংশের ভোটে স্থির হবে তারা ভারতবর্ষের কোন্ গণপরিষদে যোগ দিতে চান। হিন্দুর বেলায় আইন-সভার অধিকাংশের ভোটেই এ বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণের ব্যবস্থা হয়। গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক অবস্থানহেতু ব্রিটিশ বেলুচিস্থানের মতামত নির্দ্ধারণের ভার বড়-লাটের উপর ছেড়ে দেওয়া হ'ল। ঘোষণায় ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ বলেন, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে তথাকার আইনসভার নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা নূতন করে ভোট গ্রহণ করতে হবে—উক্ত প্রদেশ সংলগ্ন মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ বিভক্ত পঞ্জাবের সঙ্গে তাঁরা মিলিত হতে চান কিনা। এই নির্ব্বাচন কার্য্য সম্পন্ন করা হবে বড়লাটের সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে সামরিক বিভাগের পদস্থ কর্ম্মীদের দ্বারা। আসাম প্রদেশের অন্তর্ব্বর্ত্তী শ্রীহট্ট জেলা মুসলমান প্রধান। এখানেও নির্ব্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা নূতন করে ভোট গ্রহণ করা হবে। এ থেকে নিশ্চয় করা যাবে মুসলমান গরিষ্ঠ পূর্ব্ববঙ্গের সঙ্গে এখানকার অধিবাসীরা মিলিত হতে চান কিনা। পঞ্জাব ও বাংলা বিভাগ সাব্যস্ত হলে উভয় প্রদেশের বিভক্ত অংশগুলির মধ্যে সীমানা নির্দ্ধাধণকল্পে বড়লাট কর্তৃক অবিলম্বে একটি "বাউণ্ডারী কমিশন" গঠিত হবে। এই কমিশনের সীমানা নির্দ্ধারণকল্পে অনুসরণীয় কার্য্যপদ্ধতি তিনিই স্থির করে দেবেন। এই কমিশনের উপর শ্রীহট্টের মুসলমান সংখ্যা গরিষ্ঠ অঞ্চলের মধ্যেও সীমানা-নির্দ্ধারণের ভার পড়ল।

প্রদেশবিভাগ সাব্যস্ত হলে পঞ্জাব, বাংলা ও আসামের বিভক্ত অংশগুলি থেকে বর্ত্তমান ও ভাবী গণপরিষদে দশ লক্ষে একজন প্রতিনিধি প্রেরণের ভিত্তিতে কত জন সদস্য নির্ব্বাচিত করা হবে ঘোষণায় তাও স্থির করে দেওয়া হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে বলা হল—বিভক্ত অংশগুলির শাসনগত ব্যাপারসম্পর্কেও বড়লাট অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। সরকারী বিভিন্ন শাসন-বিভাগের তথা সম্পত্তি দলিল দস্তাবেজ, আসবাব পত্র ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় বিভাগেরও ব্যবস্থা চলবে। প্রদেশে যেমন, কেন্দ্রেও ভারতবিভাগ জনিত ঐ একই ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে। প্রতিরক্ষা, অর্থ ও যানবাহন প্রভৃতি বিভাগগুলি এবং সরকারী সমুদয় সম্পত্তির ভাগাভাগি করে দিতে হবে দুটি অংশের ভাবী দাবীদার কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে। ঘোষণায় আরও বলা হল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের উপজাতিগুলির সঙ্গে সন্নিকটস্থ মুসলমান-গরিষ্ঠ অঞ্চলকে সমস্ত ব্যবস্থাই করতে হবে। ভারতীয় তথা রাজন্যভারত সম্পর্কে বলা হয় যে পূর্ব্বেকার কেবিনেট মিশনের এ বিষয়ক স্মারকলিপি অনুযায়ী শাসনভার হস্তান্তরের পূর্ব্বে ব্রিটিশ রাজের সার্ব্বভৌম ক্ষমতার অপহ্নব ঘটবে না। ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির আন্তরিক ইচ্ছা যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট অতি সত্বর ভারতবর্ষের শাসনভার ছেড়ে আসেন। এর প্রতি ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষের সম্পূর্ণ সহানুভূতি রয়েছে। তাঁরা পূর্ব্বকথিত ১৯৪৮ সনের জুন মাসের পূর্ব্বেই এমন কি ১৯৪৭ সনের মধ্যেই যথাসম্ভব শীঘ্র ভারতবর্ষের শাসনভার পরিত্যাগ করতে কৃতসঙ্কল্প। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা পার্লামেণ্টের চলমান অধিবেশনেই একটি বিল আনয়নের মনস্থ করেছেন। অব্যবহিত উপায়াদি অবলম্বনের ভার ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা বড়লাট মাউণ্টব্যাটেনের উপর ছেড়ে দিলেন। ঘোষণার পরদিন ৪ঠা জুন বড়লাট একটি সাংবাদিক সম্মেলনে এর তাৎপর্য্য বিশদভাবে বুঝিয়ে দিলেন। এই সভায়ই তিনি বলেন যে যদি সম্ভব হয় তা হলে ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্ট তারিখেই ক্ষমতা হস্তান্তর-পর্ব্ব সম্পন্ন করা হবে।

এরপর থেকে মাসাধিক কাল যাবৎ কংগ্রেস, মুসলীম লীগ, হিন্দু মহাসভা, আকালী শিখ তথা শিখসভা প্রভৃতির কার্য্যনির্ব্বাহক ও সাধারণ সংসদের বৈঠক আহূত হয়। ঘোষণায় পরিব্যক্ত ভারত ডোমিনিয়ন ষ্টাটাসের ভিত্তিতে

ভারতবিভাগ এবং শাসনভার হস্তান্তর করা নিয়ে বিশেষ বিতর্ক চলে। কিন্তু সর্ব্বত্রই এর অনুকূলে একটি সুষ্ঠু পরিবেশের সৃষ্টি হয়। মহাত্মা গান্ধী নিজেই নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে উত্থাপিত এর অনুমোদনসূচক প্রস্তাবটিকে একটি ভাষণে সমর্থন করলেন। প্রকাশ পেলে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ পূর্ব্বাপর কেবিনেট মিসন প্রস্তাবেরই সমর্থক ছিলেন, কিন্তু অবস্থার গতিকে তিনি বর্ত্তমান পরিকল্পনা গ্রহণে বাধ্য হয়েছেন। মুসলীম লীগপন্থীরা সাধারণভাবে এই নূতন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, যদিও উগ্রপন্থী খাকসার দল এর তীব্র প্রতিবাদ করতে ক্ষান্ত হয় নি। শিখেরাও উৎকৃষ্টতর পরিকল্পনার অভাবে এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। হিন্দু মহাসভা কিন্তু পূর্ব্ব আদর্শানুযায়ী অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতালাভই কাম্য বলে ঘোষণা করলে। এরপর অতি দ্রুত ক্ষমতা হস্তান্তরকল্পে বিবিধ কার্য্য শুরু করলেন বড়লাট মাউণ্টব্যাটেন অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে।

৩রা জুন ১৯৪৭ তারিখে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার ঘোষণা এবং এদেশে বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ও কংগ্রেস, মুসলীম লীগ ও শিখ পক্ষে প্রদত্ত বিবৃতির ফলে ভারতীয় জনচিত্তে এক অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখা দিল। দীর্ঘ নয় মাস ব্যাপী দাঙ্গাহাঙ্গামার অবসান ঘটে প্রায় সর্ব্বত্র, একমাত্র পঞ্জাব ছাড়া। আমরা এই সময়কার হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা ও তীব্র বিদ্বেষমূলক আচার-আচরণ প্রত্যক্ষ করেছি। ৩রা জুনের ঘোষণা ও বিবৃতির ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই দাঙ্গা-হাঙ্গামা প্রশমিত হতে দেখে তখন আমরা কম আশ্চর্য্য বোধ করিনি। বস্তুত ভারতবাসী যেন একটি নূতন আশাব্যঞ্জক সম্ভাবনারই সন্ধান পেলে। কংগ্রেস ও মুসলীম লীগ নেতৃবৃন্দের মধ্যে এতকাল অখণ্ড ভারত এবং সার্ব্বভৌম স্বাধীনতার আদর্শহেতু যে দ্বন্দ্ব ও মন-কষাকষির উদ্ভব হয়েছিল তারও যেন অকস্মাৎ অনেকটা অবসান ঘটল। প্রকৃতপক্ষে এই তারিখের পর থেকে আড়াই মাসের মধ্যে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন অতি সত্বর ভারতবিভাগ-ব্যবস্থার আয়োজন করেন। এই আয়োজনে বিভিন্ন পক্ষের নেতৃবৃন্দ একান্ত-ভাবে যোগ দিলেন। এর দরুণ কারও মনে বিবাদ-বিসম্বাদের সূত্রগুলি দানা বাঁধবার আর অবকাশই যেন পেল না। ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার ঘোষণা অনুযায়ী জুন মাসের মধ্যেই ভারতবিভাগের আনুষ্ঠানিক আয়োজন চলে

বা ভিন্ন প্রদেশে। বঙ্গের ও পঞ্জাবের আইনসভা দুইটি ভাগে বিভক্ত হয়ে বর্ত্তমান ও ভাবী (পাকিস্তান) গণপরিষদে যোগদানে সম্মতি জানালেন। ব্রিটিশ বেলুচিস্থানের মতামত জানবার উপায়স্বরূপ বড়লাট যে ব্যবস্থা করেন তাতে বুঝা গেল সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানেরা পাকিস্থানই চান। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ইতিপূর্ব্বে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে মুসলীম লীগ "সিবিল-ডিসওবিডিয়েন্স" বা 'নিরুপদ্রব প্রতিরোধ' আন্দোলন শুরু করেছিল সহিংসভাবে। তাদের অনেককে জেলেও পোরা হয়েছিল। বড়লাট মাউণ্টব্যাটেনের পরামর্শে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা কারারুদ্ধ আন্দোলন-কারীদের মুক্তি দেন এ সত্ত্বেও কিন্তু নিরুপদ্রব আন্দোলন চলে অবিরাম গতিতে। তবে ৩রা জুনের ঘোষণার পরে মুসলীম লীগ এই আন্দোলন প্রকাশ্যভাবে প্রত্যাহার করলে। উক্ত ঘোষণানির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থানুযায়ী নির্ব্বাচকমণ্ডলীর ভোট লওয়া হ'ল বিভক্ত পঞ্জাবের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের সঙ্গে তারা যোগ দিবেন কিনা এই উদ্দেশ্যে। এখানকার অধিবাসীরা প্রায় সবই মুসলমান। স্থানীয় কংগ্রেস তাঁদের ভাবগতিক দেখে নির্ব্বাচন থেকে সরে দাঁড়ায়। নির্ব্বাচনপর্ব্ব পরিচালনা করা হয় ব্রিটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে। সিন্ধুর বেলায় নূতন নির্ব্বাচন আর আবশ্যক হ'ল না। আসামের অন্তর্ভুক্ত শ্রীহট্ট জিলাও গণভোটের দোলতে বিভক্ত বঙ্গে মুসলমান গরিষ্ঠ অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত হ'ল। এর পরে বিভক্ত বাংলা ও পঞ্জাবে মায় সিলেটসহ বর্ত্তমান এবং ভাবী (পাকিস্তান) গণপরিষদে নূতন করে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন। সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলুচিস্তান থেকে যে সব প্রতিনিধি গণপরিষদে নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন তাঁরাই নূতন গণপরিষদের সদস্য বহাল থাকবেন এইরূপ স্থির হল।

ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার ৩রা জুনের ঘোষণা অনুযায়ী মাউণ্টব্যাটেন ভারত-বিভাগ-সম্পর্কিত আরও কয়েকটি কার্য্যে দ্রুত হস্তক্ষেপ করলেন। প্রথমেই সার্থকভাবে ভারতবিভাগ-কার্য্য সম্পূর্ণ করার এই উপায়টি অবলম্বিত হ'ল। অন্তর্ব্বর্তী শাসনপরিষদে লীগ অ-লীগ সদস্যদের মধ্যে দীর্ঘকাল আত্মঘাতী দ্বন্দ্ব চলছিল। এর ফলে শাসনে ভীষণ বৈকল্য ঘটে। কংগ্রেস তথা অ-লীগ পক্ষে মুসলীম লীগের পদত্যাগ দাবী তখনও বলবৎ

ছিল। মাউণ্টব্যাটেন এ বিষয়ে মীমাংসার জন্য একটি অভিনব পন্থা প্রয়োগ করলেন। ভারতবিভাগ আসন্ন, কাজেই শাসন-কাঠামোকেও বিভক্ত করা অত্যাবশ্যক। তিনি শাসন বিভাগগুলির প্রত্যেকটি নিয়েই লীগ ও অ-লীগ পক্ষের স্বতন্ত্র দুই দল সদস্যের উপর ভার দিলেন, যেমন দেশরক্ষামন্ত্রি দুই পক্ষের দুই জন, অর্থমন্ত্রি দুই পক্ষের দুই জন ইত্যাদি। এইরূপ পন্থা অবলম্বন করায় দুইটি সুফল পাওয়া গেল—লীগ ও অ-লীগ সদস্যদের মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণ আর রইল না। আবার ভারতবিভাগ-জনিত শাসনকাঠামো বিভাগেরও সুবিধা হ'ল। এই সময় থেকেই বড়লাটের প্রত্যক্ষ কর্ত্তৃত্বে পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট তারিখের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তরকল্পে ভারত গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগ, যেমন প্রতিরক্ষা বিভাগ, (স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী) রাজস্ববিভাগ, স্বরাষ্ট্রবিভাগ, পূর্ত্তবিভাগ, যানবাহন-বিভাগ, অর্থবিভাগ প্রভৃতি কেন্দ্রে ও প্রদেশে ভাগাভাগি করে নেবার জন্যে বহু কমিটি ও কমিশন নিযুক্ত হ'ল। বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে এ সম্বন্ধে সার্থকভাবে আলাপ-আলোচনার পর দ্রুত বিভাগকার্য্য সম্পন্ন হতে লাগল। কোন কোন বিভাগের কার্য্য অবশ্য ভারতবিভাগের পরেও চলেছিল। এইরূপে ভারতবর্ষে দুইটি স্বতন্ত্র ডোমিনিয়ন প্রতিষ্ঠার আয়োজন চললো এখানে অতি দ্রুত।

পূর্ব্বোল্লিখিত মূল খসড়ার নিরীখে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা ৩রা জুন শাসন হস্তান্তর সম্পর্কে যে ঘোষণা করেন তার একটি ধারা এই মর্ম্মে ছিল যে, ভারতবর্ষ এবং ভাবী (পাকিস্তান) ডোমিনিয়নের বড়লাট—ইনি শেষ বড়লাটও বটেন—একজন মাত্র অর্থাৎ লর্ড মাউণ্টব্যাটেন হবেন। সকলেই ভেবেছিল যখন এ ধারাসম্বন্ধে কারও আপত্তি হচ্ছে না তখন মাউণ্টব্যাটেনই উভয় ডোমিনিয়নের বড়লাট থেকে যাবেন। আমরা দেখেছি জিন্না সাহেব বিভিন্ন বিষয়ে মৌখিক সম্মতি জানালেও লিখিতভাবে কখনও কিছু জানাতেন না। এ'কারণে ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড ওয়াভেল একাধিকবার বিপাকে পড়েছিলেন। এবারেও জিন্না তাঁর পূর্ব্বাচরিত প্রথার সুযোগ নিয়ে এই একটি মাত্র ব্যাপারে অর্থাৎ লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের বড়লাট নিয়োগ-সম্বন্ধে তাঁকে বেটক্করে ফেললেন। প্রথমে বার বার অনুরোধ সত্ত্বেও জিন্না

মাউণ্টব্যাটেনকে তাঁর মনের কথা ব্যক্ত করেন নি। অবশেষে আর সময় নেই দেখে তিনি মাউণ্টব্যাটেনকে ২রা জুলাই তারিখে জানান যে তিনি নিজেই আসন্ন পাকিস্তান ডোমিনিয়নের প্রথম গভর্ণর জেনারেল বা বড়লাট হবেন। লিয়াকৎ আলি খাঁন পরবর্ত্তী ৫ই জুলাই লিখিতভাবে তাঁকে একথা জানালেন। সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলেন যে, ভারত ডোমিনিয়নের বড়লাটপদে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন স্থিত থাকবেন জানায় তাঁরা আনন্দিত ও আশ্বস্ত হয়েছেন ঢের। ব্যাপারটি সামান্য হলেও জিন্নার তথা মুসলীম লীগের আচরণে সকলেই এই সময় বিস্ময় প্রকাশ করেন। নেতৃবৃন্দ অনেকেই ভেবেছিলেন ভারতবিভাগ-জনিত জটিল সমস্যাগুলির সুষ্ঠু সমাধান আশু সম্ভব হবে যদি উভয় ডোমিনিয়নের একই গবর্ণর জেনারেল অন্তত কিছুকালের জন্যও নিযুক্ত হন। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ আত্ম-জীবনীতে এ বিষয়টি বিশদভাবে বিবৃত করেছেন। তিনি বলেন, একই বড়লাট নিযুক্ত হলে ভারতবিভাগ-কার্য্য শুধু সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন হত না, স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পরে উভয় ডোমিনিয়নের বিশেষতঃ পঞ্জাবে ও দিল্লীতে যে রক্তগঙ্গা বয়েছিল তাঁর স্রোত প্রতিরোধ করাও সম্ভব হত! তিনি আরও বলেন যে, স্বাধীনতালাভের পূর্ব্বেই সামরিক বিভাগকে ভাগ করে নেওয়ায় জনসাধারণের সহজাত সংযম ও শৃঙ্খলাবোধ এবং আত্মরক্ষার ক্ষমতাও বিশেষ হ্রাস পেয়েছিল।

উভয় ডোমিনিয়ন সৃজনের পক্ষে ৩রা জুনের ঘোষণা অনুযায়ী পার্লামেণ্টে ৪ঠা জুলাই, ১৯৪৭ তারিখে "ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেস বিল" উত্থাপিত হ'ল। এই বিলের ধারা ছিল মাত্র কুড়িটি এবং শিডিউল বা ব্যাখ্যানপত্র ছিল তিনটি। আকারে এত ছোট হলেও এর গুরুত্ব কোন অংশে সামান্য নয়। বিল রচনাকালে এবং বিলের খসড়া প্রস্তুত হলে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে বড়লাট মাউণ্টব্যাটেন বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দকে এটি দেখান এবং এ সম্বন্ধে তাঁদের নিকট থেকে সুচিন্তিত অভিমত জেনে নেন। বিলের মূল ধারাগুলি সম্বন্ধে সকলেই একমত হন। অবশ্য ভাষাগত সংস্কার ও সংশোধনে কেউ কেউ সাহায্য করলেন। পার্লামেণ্টারী বিল সম্পর্কে এরূপ পদ্ধতি অবলম্বন ছিল অত্যন্ত অভিনব

এবং প্রচলিত রীতিবিরুদ্ধ। তথাপি নূতন যুগের সম্ভাবনায় নূতন পদ্ধতি অবলম্বনে সকল পক্ষই আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন। পূর্ব্ব আলোচনায় যেমন বুঝা গিয়েছে, বিলের মূল কথা ছিল ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত ডোমিনিয়ন ষ্টাটাসের ভিত্তিতে দুটি স্বতন্ত্র ডোমিনিয়ন সৃষ্টি করা। কেবিনেট মিসন প্রস্তাবে এবং পরবর্ত্তী কোন কোন সরকারী ঘোষণায় বলা হয়েছিল যে, সম্মিলিত ভারতবর্ষের নিয়মতন্ত্র রচনা নিরত একটি গণপরিষদের উপর শাসনভার ছেড়ে দেওয়া হবে। তা যখন সম্ভব হল না এবং নিয়মতন্ত্র গঠন করতে বর্ত্তমান ও ভাবী গণপরিষদের বিশেষ সময় লাগবে সে জন্য ১৯৩৫ সনের ভারতীয় আইন সময়োপযোগী করে বিভক্ত ও নবগঠিত দুইটি কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের উপরে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। নূতন ডোমিনিয়ন সৃজনে যে অবস্থার উদ্ভব হবে তাতে ব্রিটিশ সরকার এবং ভারতীয় ডোমিনিয়নদ্বয়ের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ের কথাও বিলের কোন কোন ধারায় উল্লিখিত হয়। সামরিক ও বেসামরিক ব্রিটিশ কর্ম্মচারীদের সম্বন্ধেও ইতি-কর্ত্তব্য স্থির করার কথা থাকে এই বিলে। বিলে আরও উল্লিখিত হয় যে প্রথম প্রথম ভারতবিভাগের কার্য্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নিমিত্ত উভয় ডেমিনিয়নের নেতৃবৃন্দ সম্মত হলে দুইয়ের উপরই একজন গবর্ণর জেনারেল বা বড়লাট নিযুক্ত হবেন। বিলের আরেকটি বিষয়ও বিশেষ লক্ষণীয় এবং উভয় ডোমিনিয়ন এবং ব্রিটেনের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয়ের দ্যোতক। একটি ধারায় বলা হয় যে নবগঠিত যে-কোন ডোমিনিয়ন নিয়মতন্ত্র রচনান্তে গণপরিষদের নির্দ্দেশে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের বাইরে গিয়ে একটি স্বাধীন সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হবার সম্পূর্ণ অধিকারী হবে। রাজন্য ভারতের উপর ব্রিটেনের সার্ব্ব-ভৌম ক্ষমতার বিলুপ্তি ঘটবে নবসৃষ্ট দুটি ডোমিনিয়নের হস্তে ক্ষমতা-প্রত্যর্পণের সঙ্গে সঙ্গে।

পার্লামেণ্টে বিল পেশ করার দিনই বিশ্ব-সাংবাদিকদের এক বৈঠকে ভারতসচিব লর্ড লিষ্টওয়েল (এর কিছুকাল পূর্ব্বে লর্ড পেথিক লরেন্স অবসর গ্রহণ করেছিলেন) বলেন যে, আইন দ্বারা জগতের এক বিপুল-সংখ্যক অধিবাসী অধ্যুসিত দেশে স্বাধীনতা অর্পিত হতে যাচ্ছে। জগতের ইতিহাসে এটি বাস্তবিকই একক দৃষ্টান্ত। ভারতবর্ষ দুইটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ

ডোমিনিয়ন রাষ্ট্রে বিভক্ত হতে চলেছে। উভয়েই ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্গত থাকবে বটে, কিন্তু বহির্জগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে এদের প্রত্যেকেরই স্বাধীন পন্থা অনুসরণে, অধিকার থাকবে। ১৯৪৭, ১৫ই আগষ্টে ভারতবর্ষ দুইটি ডোমিনিয়নে বিভক্ত হয়ে স্বাতন্ত্র্য লাভ করবে। ভারতসচিবের পদ এবং সঙ্গে সঙ্গে ইণ্ডিয়া কৌন্সিলও উঠে যাবে। ব্রিটিশ কমনওয়েলথ-বিভাগীয়মন্ত্রি এই নবগঠিত ডোমিনিয়নদ্বয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে চলবেন।

এই বিলটি হাউস অব কমন্সে এবং হাউস অব লর্ডসে পাশ হয়ে গেল যথাক্রমে ১৯৪৭, ১৫ই ও ১৬ই জুলাই তারিখে। এতে রাজকীয় সম্মতি পাওয়া যায় পরবর্ত্তী ১৮ই জুলাই। বিলটি রচনায় যেমন ক্ষিপ্রতা ও অভিনবত্ব ছিল তেমনি পার্লামেণ্টের উভয় স্থলে এ নিয়ে আলোচনায় পক্ষ প্রতিপক্ষের মধ্যে আশ্চর্য্য সম্মতিও একটি লক্ষণীয় বিষয় হয়ে উঠেছিল। ডোমিনিয়নের ভিত্তিতে ভারত বিভাগ সাব্যস্ত হওয়ায় ব্রিটিশ মাত্রেই আশ্বস্ত হয়েছিল। রক্ষণশীল দল হয়ত ভেবেছিলেন কংগ্রেসশাসিত ভারত ডোমিনিয়ন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাইরে গেলেও এর একটি অংশ হয়ত ব্রিটেনের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলবে। পরবর্ত্তী কয়েক বৎসরের পাকিস্তানী ও ব্রিটিশ রক্ষণশীলদের মধ্যে অতিমাত্র আঁতাত এরই পক্ষে প্রমাণ যোগাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী এট্‌লি পার্লামেণ্টে ঘোষণা করলেন যে, ভারত বিভাগের পর নূতন ডোমিনিয়নে প্রথম বড়লাট হবেন মিঃ মহম্মদ আলি জিন্না, ভারত ডোমিনিয়নে লর্ড মাউণ্টব্যাটন আরও কিছুকাল বড়লাটপদে অধিষ্ঠিত থাকবেন। আর এতে শুধু কংগ্রেস শিখ প্রভৃতিই নয় মুসলীম লীগও সম্মতি জানিয়েছেন।

বিল পাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একদিকে পূর্ব্বারব্ধ শাসন বিভাগগুলির ভাগ করার কার্য্য আরও দ্রুত চলল, অন্য দিকে কয়েকটি নূতন বিষয়েও হস্তক্ষেপ করতে হল। ভারত বিভাগ মানে প্রদেশ বিভাগ। এর জন্য সীমানা-নির্দ্ধারণ কমিশন গঠিত হল সার্ সিরিল র‍্যাডক্লিফের অধিনায়কত্বে বিভিন্ন পক্ষের কয়েকজন সদস্য নিয়ে। এই কমিশনের উপর ভার পড়লো বিভক্ত দুটি পঞ্জাব, দুটি বাংলা ও শ্রীহট্টের সীমানা নির্ণয় করার। কমিশন

পঞ্জাবে ও বাংলায় গিয়ে পক্ষাপক্ষের লিখিত মতামত গ্রহণ করলেন। আগষ্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের প্রথমেই তারা সীমানা নির্দ্ধারণ কার্য্য সমাধা করে রিপোর্ট রচনায় প্রবৃত্ত হলেন। ১৫ই আগষ্ট তারিখের পূর্ব্বে কমিশনের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে এমন কি বড়লাট মাউণ্টব্যাটেনও পর্য্যন্ত কিছু জানতে পারেন নি বলে প্রকাশ পেয়েছে। স্বাধীনতালাভের দু-তিন দিনের মধ্যেই কমিশনের সিদ্ধান্ত প্রচারিত হল। এতে দেখা গেল, অবিভক্ত পঞ্জাবের আটত্রিশ শতাংশ (৩৮%) ভূমি এবং অধিবাসীদের শতকরা পয়তাল্লিশ জন (৪৫%) পূর্ব্ব পঞ্জাবে ভারত ডোমিনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অবিভক্ত বাংলার (৩৬%) শতাংশ ভূমি এবং অধিবাসীদের শতকরা পঁয়ত্রিশ জন (৩৫%) নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ গঠিত হল। আর এই অংশ পড়লো ভারত ডোমিনিয়নের ভাগে। শ্রীহট্ট জিলারও কিয়দংশ আসাম তথা ভারত ডোমিনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হয়। বাকী সমুদয় অংশই পাকিস্তানের ভিতরে পড়ে গেল—বিভক্ত পশ্চিম পঞ্জাব পূর্ব্ববঙ্গ, শ্রীহট্টের বিপুল অংশ এবং সমগ্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু প্রদেশ, এবং ব্রিটিশ বেলুচিস্থান নিয়ে গঠিত হল পাকিস্তান ডোমিনিযন। অবশ্য বিধিবদ্ধভাবে এর জন্ম হল ১৪ই আগষ্ট তারিখে। এবিষয়ে একটু পরে বলছি।

আর একটি কথাও এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা আরম্ভেই ব্রিটিশ সরকার সরাসরি-নিযুক্ত ভারতবর্ষের ইংরেজ ও ভারতীয় পদস্থ কর্ম্মচারীদের সম্পর্কে কি উপায় অবলম্বন করা হবে সে বিষয়ে ভাবতে লাগলেন। উক্ত বিল পাশ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা এ বিষয়েও স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। ইচ্ছা করলে ব্রিটিশ কর্মীগণ উক্ত আইন কার্য্যকরী হবার দিন থেকে অবসর গ্রহণ করতে পারবেন তবে ভারত সরকারকে তাদের পেন্সন ভাতা ইত্যাদি একই কালে দিয়ে দিতে হবে। ভারতীয় কর্মীরা ভারতবর্ষের সেবায়ই নিযুক্ত থাকবেন। তবে যদি কেউ কর্ম্মে লিপ্ত থাকতে আর রাজী না হন তাঁদের প্রতিও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা হয়। সামরিক বিভাগের ব্রিটিশ কর্ম্মচারীদের বেলায়ও বেসামরিক ব্রিটিশ কর্ম্মচারীদের মত প্রায় একই ব্যবস্থা হল। ভারতীয় কর্ম্মীদের প্রসঙ্গে এখানে আর একটি কথাও বলে রাখি। পূর্ব্বেই বলেছি শাসনকাঠামো বিভাগের কার্য্য শুরু হয়েছিল বিভিন্ন অঞ্চলের কর্মীদের বাসস্থান অনুযায়ী।

যেমন সামরিক তেমনি বেসামরিক সকলকেই, নিজ নিজ ডোমিনিয়নে চলে যাওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয়শাসন বিভাগগুলিতে ডোমিনিয়নের বিস্তর পদস্থ মুসলমান কর্মী ছিলেন। এরা কিন্তু অনেকেই নবগঠিত পাকিস্তান ডোমিনিয়নে চলে যেতে অনিচ্ছুক ছিলেন। বাসস্থান অনুযায়ী কর্ম্মে নিযুক্ত থাকার কথা হলে এরূপ ভাবে চলে যাওয়ার কোন প্রয়োজনই ঘটে না। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ আত্মজীবনীতে লিখেছেন, লীগপন্থীদের প্ররোচনায় ও হুমকিতে এরূপ অনেক পদস্থ কর্ম্মীই নিজ বাসভূমি ভারত ডোমিনিয়ন ছেড়ে পাকিস্তানে যেতে বাধ্য হন। অপরপক্ষে হিন্দুদের বেলায়ও একথা খানিকটা প্রযোজ্য। লোক বিনিময় না করে সরকারী কর্ম্মচারী বিনিময়ের সুযোগ দিয়ে উভয় ডোমিনিয়নের কর্তৃপক্ষ স্বাধীনতা-লাভের অব্যবহিত পরে গুরুতর অনর্থ সৃষ্টির দায়ে পড়েছিলেন। পরবর্তী অনাচার অত্যাচার নিপীড়নের মধ্যে এ-কথার যাথার্থ্য বুঝা গিয়াছে।

ভারত বিভাগ যতই আসন্ন হতে লাগল ততই নানা সমস্যার উদ্ভব হতে থাকে। পূর্ব্বে বলেছি পঞ্জাব ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা প্রশমিত হয়। পঞ্জাবেও ক্রমে কতকটা শান্তি দেখা দেয়। কিন্তু জুলাই মাসের মাঝামাঝি মুসলীম লীগের একটি বিবৃতির ফলে দাঙ্গাহাঙ্গামা নূতন করে গুরুতরভাবে শুরু হ'ল। বিবৃতিতে বলা হয়েছিল পঞ্জাবের যে যে অঞ্চলের প্রতিনিধি নিয়ে দুটি গণপরিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়েছেন সেই সব অঞ্চলের বিভাগ ঐ সময়েই সাব্যস্ত হয়ে গেছে। এর ফলে শিখ-সম্প্রদায় খুবই অশ্বস্তি বোধ করে এবং মুসলমান ও শিখদের মধ্যে প্রবল দাঙ্গা আরম্ভ হয়। তখন বড়লাট মাউণ্টব্যাটেনের অনুরোধে, পার্টিশন কৌন্সিল বা ভারত বিভাগ কৌন্সিলের সভাপতি মাউণ্টব্যাটেন স্বয়ং, কংগ্রেস সদস্য বল্লভভাই প্যাটেল ও রাজেন্দ্র প্রসাদ, লীগসদস্য মহম্মদ আলি জিন্না ও লিয়াকৎ আলি খাঁন এবং শিখসদস্য বলদেব সিংএর যুক্ত স্বাক্ষরে শান্তি স্থাপনকল্পে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি প্রচারিত হয়। স্বাক্ষরকারিগণ বিবৃতিতে বলেন যে পঞ্জাবের বিভাজ্য জেলাগুলির সীমানা নির্দ্ধারণের ভার বাউণ্ডারী কমিশনের উপর প্রদত্ত হয়েছে। তাদের সিদ্ধান্ত সকল পক্ষই মেনে নিতে বাধ্য। এই সিদ্ধান্তের কথা একটু আগেই

বলে নিয়েছি। বিবৃতিতে আরও বলা হয় যে, ভারত এবং পাকিস্তান ডোমিনিয়নে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রতি কোন রকম ব্যবহারে তারতম্য বা কঠোরতা অবলম্বন করা হবে না। ধর্ম্ম, সমাজ, সংস্কৃতি, ভাষা, শিল্প, ব্যবসায় সব বিষয়েই সংখ্যালঘিষ্ঠদের ব্যক্তিস্বাধীনতা থাকবে। যখন দেখা গেল এরূপ যুগ্ম এবং গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতির ফলেও পঞ্জাবে শান্তি স্থাপিত হচ্ছে না, তখন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থনে বড়লাট মাউণ্টব্যাটেন বিভাজ্য অঞ্চলগুলির শান্তিরক্ষার নিমিত্ত বহু সৈন্যসামন্ত নিয়ে একটি সামরিক বাহিনী স্থাপন করলেন। এই বাহিনীর অধিনায়ক ও সহকারী অধিনায়ক হলেন যথাক্রমে মেজর জেনারেল রীজ্ এবং ব্রিগেডিয়ার দিগম্বর সিং (ভারত) এবং কর্ণেল আয়ুব খাঁন (পাকিস্তান)। ১লা আগষ্ট হতে এই বিশিষ্ট সামরিক বাহিনী ঐ ঐ অঞ্চলের শান্তিরক্ষার ভার গ্রহণ করলে।

আর একটি বিষয়েও জটিল সমস্যার উদ্ভব হ'ল। ভারতবর্ষ সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সদস্য। জিন্না জিদ ধরলেন ভারতবর্ষ দুটি ডোমিনিয়নে বিভক্ত হলে হয় প্রত্যেকেই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সদস্য হবে নচেৎ পূর্ব্ববর্ত্তী সদস্য ক্ষমতা বাতিল হবে। এর ঘোরতর প্রতিবাদ এল কংগ্রেস পক্ষ থেকে। এটি প্রচলিত আন্তর্জাতিক রীতি যে, একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রাষ্ট্রের কোন অংশ একে ছেড়ে গেলে বা এ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে মূল রাষ্ট্রের তৎকালীন আন্তর্জাতিক অধিকারগুলি অব্যাহত থাকে। কংগ্রেস পক্ষ জিন্নার প্রস্তাবে কোন মতেই রাজী হতে পারলেন না। বড়লাট মাউণ্টব্যাটেন দুই পক্ষের মতভেদকে বেশী দূর অগ্রসর হতে না দিয়ে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের অভিমত যাচ্ঞা করলেন এ বিষয় সম্পর্কে। সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের পক্ষে সহকারী সম্পাদক বেলজিয়ম, আইরিশ ফ্রী ষ্টেট্ প্রভৃতির নজীর দেখিয়ে লিখলেন যে, ভারত ডোমিনিয়ন পূর্ব্বেকার সব রকম আন্তর্জাতিক ক্ষমতারই অধিকারী থাকবে। পাকিস্তান ডোমিনিয়ন সৃষ্ট হলে তাকে এর সদস্য করে নেওয়া হবে কিনা তা পরে বিবেচ্য। এই নবগঠিত ডোমিনিয়ন একটি "নন-মেম্বার ষ্টেট্" বা 'অ-সদস্য রাষ্ট্র' বৈ আর কিছুই নয়। এই ধরণের আইনগত বাধার বিপক্ষে ব্যবহার-

শাস্ত্রে সুপণ্ডিত জিন্না সাহেবের আর কিছু বলার অবকাশ রইল না। তবে এক্ষেত্রেও পক্ষাপক্ষের ভিতরে যাতে মনোমালিন্যের সৃষ্টি না হয় সে উদ্দেশ্যে বড়লাট মাউণ্টব্যাটেন লীগ নেতৃবৃন্দকে এই আশ্বাস দিলেন যে, নূতন ডোমিনিয়ন সৃষ্টি হবার পরই ভারত ডোমিনিয়ন অবিলম্বে একে সর্ব্বরকম আন্তর্জাতিক মর্য্যাদালাভে যথোচিৎ সাহায্য করবে। এখানে বলা আবশ্যক যে, পাকিস্তান ডোমিনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হবার অব্যবহিত পরই ১৮ই আগষ্ট, ১৯৪৭ তারিখে একে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্য করে নেওয়া হয়। এর পক্ষে যে ভারত ডোমিনিয়নের আন্তরিক সমর্থন ও সহায়তা ছিল তা বলাই বাহুল্য।

আরও কতকগুলি ব্যাপারে আশু মীমাংসার প্রয়োজন হয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তান ডোমিনিয়ন সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের সমান মর্য্যাদা লাভ না করলেও কিন্তু তাকে আন্তর্জাতিক অর্থঘটিত সব দায়-দায়িত্বের অংশ গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে লীগ নেতাদের কোনওরূপ ওজর আপত্তি টেকে নি। ভারতবর্ষ থেকে বৃটিশ শাসন বিলুপ্ত হলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবর্ত্তী উপজাতিগুলি, মিত্র ও বেলুচিস্তান রাজ্য প্রভৃতির সঙ্গে যে সব চুক্তি পূর্ব্বে করা হয়েছিল এবং ফলে যে সব দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়, স্থির হ'ল সংলগ্ন পাকিস্তান ডোমিনিয়নকেই সে ভার নিতে হবে। উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তে কারও সঙ্গে এরূপ কোন চুক্তি বা দায়-দায়িত্বে আবদ্ধ না থাকায় ভারত ডোমিনিয়নের উপরে কোন ভার পড়লে না। রাজন্যভারতসম্পর্কেও একটি সুনির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন অনুভূত হ'ল বিশেষ করে। পূর্ব্বেকার যাবতীয় প্রস্তাব ও ঘোষণার সমাহার করে পূর্ব্বোক্ত আইনে এই মাত্র বলা হয়েছিল যে ক্ষমতা হস্তান্তরের দিন থেকে ব্রিটিশের সার্ব্বভৌম ক্ষমতাও রাজন্যভারত থেকে বিলুপ্ত হবে। এর আভাস আমরা পূর্ব্বে পেয়েছি। ১৯৪৭, জুলাই মাস থেকে রাজন্যভারতসম্পর্কে ভারত সরকার একটি কার্য্যকর ব্যবস্থা অবলম্বনে যত্নপর হন। ৫ই জুলাই তারিখে রাজন্যভারত তথা ভারতবর্ষের সাড়ে ছয় শত করদ বা মিত্র রাজ্যসম্পর্কে একটি কেন্দ্রীয় শাসনবিভাগ গঠিত হল "রাজন্য বিভাগ" নামে। এর ভারপ্রাপ্ত সদস্য বা মন্ত্রী হলেন বল্লভভাই প্যাটেল। একদিকে রাজন্যবর্গ ও তাঁদের মন্ত্রিগণ এবং অন্যদিকে বল্লভভাই

প্যাটেল ও বড়লাটের মধ্যে আলাপ-আলোচনা দ্রুত শুরু হল। এই সকল রাজ্যেও গণতন্ত্রের ভিত্তিতে শাসনব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করা হবে। সংলগ্ন ডোমিনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গণপরিষদে দশ লক্ষে একজন সদস্যের ভিত্তিতে প্রতিনিধি পাঠিয়ে এরা সকল কার্য্যে যোগ দেবেন, এইরূপ নানা কথাই হতে থাকে। ২৫শে জুলাই রাজন্যভারতের চেম্বার বা প্রতিনিধি সভায় বড়লাট মাউণ্টব্যাটেন জোরের সঙ্গেই এই কথা বলেন যে, তাঁরা স্বাধীন ভারতের ডোমিনিয়নগুলির সঙ্গে যুক্ত না হয়ে আলাদা থাকতে পারবেন না, তাঁদের এর কোনটি না কোনটির মধ্যে আসতেই হবে। আর ক্ষমতা হস্তান্তর দিনের পূর্ব্বেই এ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হলে তাঁদের পক্ষে অমঙ্গলের কোন কারণ থাকবে না। প্রায় মাসাধিককাল যাবৎ পরিচালিত উভয় পক্ষের আলোচনায় সুফল ফলল। ভারত ডোমিনিয়নে হায়দ্রাবাদ, জুনাগড় ও গুজরাটের দুই-একটি মুসলমান করদ রাজ্য বাদে সকলেই এর অন্তর্ভুক্ত হবার সম্মতি দিলে। এ রাজ্যগুলি অবশ্য পরে ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

পাকিস্তান ডোমিনিয়নের সঙ্গে কাশ্মীরের একটি স্থিতিস্থাপক ("Standstill") চুক্তি হয় বটে, কিন্তু এর অল্পকাল পরেই পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত মুসলমান উপজাতিগুলি কাশ্মীরে অবৈধ অভিযান আরম্ভ করায় নিছক আত্মরক্ষার নিমিত্ত পরবর্ত্তী ২৬শে অক্টোবর কাশ্মীর ভারত ডোমিনিয়ন ভুক্তির যাবতীয় নির্দ্দেশ মানিয়া লয়।

একটি স্বতন্ত্র ডোমিনিয়ন বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রারম্ভিক আয়োজন করতে হয় অনেক কিছু। ভারত সরকারের শাসনযন্ত্র দ্রুত বিভাগের আয়োজনের কথা পূর্ব্বে বলেছি। অবিলম্বে করাচীতে নূতন রাষ্ট্রভবন গঠনের কার্য্য শুরু হল। দিল্লী থেকে পাকিস্তানের ভাগে যে সব আসবাবপত্র, সাজসরঞ্জাম, দলিল-দস্তাবেজ পড়েছিল সকলই অতি দ্রুত করাচীতে পৌঁছানর ব্যবস্থা করা হয়। ভারত সরকার ভারত বিভাগ কার্য্যকরী হবার পূর্ব্বেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয়কল্পে সাময়িক ব্যয় মেটাবার জন্যে কুড়ি কোটি টাকা দিয়ে দিলেন। বিভক্ত প্রদেশ দুটিতেও অর্থাৎ বঙ্গে ও পঞ্জাবে এই ভাগাভাগির কার্য্য আরম্ভ হয়েছিল আগে থেকেই। পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকায় পাকিস্তান অংশের যাবতীয় জিনিসপত্র সত্বর প্রেরিত হ'ল। এই

ভাগাভাগির সময়ে ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে বিভিন্ন শাসনবিভাগের কার্য্য তথা এই ভাগাভাগির ব্যাপারে ভারত ডোমিনিয়ন তথা নবগঠিত পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের স্বীয় অংশ বুঝে নেবার জন্য একটি 'স্যাডো কেবিনেট' বা 'ছায়া মন্ত্রিসভা' গঠিত হয়েছিল। পঞ্জাবের ব্যাপারে লাহোর রাজধানী সাব্যস্ত থাকায় ভাগাভাগি বিষয়ে পাকিস্তানের পক্ষে খুবই সুবিধা হয়েছিল। পূর্ব্ব পঞ্জাবের অংশ ছেড়ে দিলেও রাজধানী কোথায় হবে স্থির না থাকায় ভারতকে অনেকটা ক্ষতি স্বীকার করতে হয়।

ভারত বিভাগ তথা দুইটি ডোমিনিয়ন প্রতিষ্ঠার দিন ক্রমে ঘনিয়ে এল। মহম্মদ আলি জিন্না ৭ই আগষ্ট, ১৯৪৭ তারিখে দলবলসহ ভারতবর্ষ থেকে চিরবিদায় নিয়ে করাচীতে উপনীত হলেন। বিদায়কালে তিনি বলে গেলেন ভারত ডোমিনিয়নভুক্ত মুসলমানগণ যেন ভারতের সকল কার্য্যে সানন্দে যোগদান করে। ভারত বিভাগ সাব্যস্ত হয়ে গেলে, এর পূর্ব্বেই ১৪ই জুলাই ১৯৪৭ তারিখে জিন্নার নির্দ্দেশে মুসলমান সংখ্যালঘিষ্ঠ প্রদেশগুলি থেকে গণপরিষদে নির্ব্বাচিত মুসলমান তথা লীগপন্থী সদস্যেরা যোগ দিয়ে এর প্রতি সর্ব্বপ্রকারে আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন। পরবর্ত্তী ১১ই আগষ্ট (১৯৪৭) করাচীতে পাকিস্তান গণপরিষদ সর্ব্বপ্রথম আহুত হ'ল। এর প্রেসিডেণ্ট বা সভাপতি নির্ব্বাচিত হলেন মহম্মদ আলি জিন্না। পাকিস্তান গণপরিষদ এই দিনের অধিবেশনেই জিন্নাকে "কায়েদী আজম" বা "মহান নেতা" উপাধিদ্বারা সম্মানিত করে। জিন্না সভাপতিরূপে একটি মর্ম্মস্পর্শী গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা দিলেন। তিনি বক্তৃতায় এই মর্ম্মে বলেন যে, দীর্ঘকাল চেষ্টার ফলে মুসলমানগণ ভারতবর্ষে একটি নিজস্ব 'হোমল্যাণ্ড' বা 'বাসভূমি' স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। এখন তাঁরা একটি সার্ব্বভৌম রাজ্যের অধিবাসী। অতঃপর তাঁরা নিজেদিগকে হিন্দু বা মুসলমান রূপে গণ্য করবেন না, একই রাষ্ট্রের নাগরিক এই বোধে তাঁরা উদ্বুদ্ধ হবেন। ধর্ম্ম নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। সর্ব্বপ্রকারে নিজ নিজ ধর্ম্ম ও সংস্কার রক্ষায় তাঁরা অধিকারী থেকেও সাধারণ নাগরিক হিসাবে পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃভাব পোষণ করবেন। পাকিস্তানের সংখ্যালঘিষ্ঠদের উদ্দেশ করে তিনি এই আশ্বাস দেন যে তাদের ধর্ম্ম, সংস্কৃতি, ভাষা; সমাজজীবন সকল বিষয়সম্পর্কেই তারা

ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষা করে চলতে পারবেন, এতে কারওই বাধ সাধবার কোন অধিকার নেই।

১৩ই আগষ্ট বড়লাট মাউণ্টব্যাটেন করাচীতে পৌঁছান এবং পরদিবস ১৪ই আগষ্ট আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তান ডোমিনিয়ন প্রতিষ্ঠার আয়োজনে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি এই মর্ম্মে বলেন যে, ঐ দিন পর্য্যন্ত তিনি ভারতের উভয় অংশেরই বড়লাট. পরদিন পাকিস্তানের বড়লাটপদে অভিষিক্ত হবেন মিঃ মহম্মদ আলি জিন্না। তিনি এই নূতন ডোমিনিয়নের সর্ব্বান্তকরণে কল্যাণ কামনা করেন। তিনি বলেন যে, সংখ্যালঘিষ্ঠদের প্রতি মিঃ জিন্নার শান্তির বাণী প্রকাশে তিনি খুবই আশ্বস্ত হয়েছেন। নূতন ডোমিনিয়নের সকল ব্যাপারে যে ভারতবর্ষ তথা নূতন ভারত ডোমিনিয়ন সহায়তা করবে এ বিষয়েও তিনি নিশ্চিন্ত। তিনি এই বক্তৃতায় ব্রিটিশ রাজের আশীর্ব্বাণী পাঠ করেন।

এই দিনই বড়লাট মাউণ্টব্যাটেন দিল্লীতে ফিরে আসেন। ১৪ই আগষ্ট ভারতীয় গণপরিষদ আহুত হ'ল পূর্ণাঙ্গভাবে (মুসলমান প্রতিনিধিরাও যোগ দিয়েছিলেন) নূতন ডোমিনিয়নকে স্বাগত করার জন্যে। এ গণপরিষদ অতঃপর আর কেবিনেট মিসন প্রস্তাবিত গণপরিষদ নয়। এর ক্ষমতা সমগ্র ভারতবর্ষ তথা প্রদেশসমূহ এবং রাজন্য ভারতের উপরে সর্ব্বপ্রকারে ক্ষমতাবান, বিকেন্দ্রীক প্রদেশ শাসনের পরিবর্ত্তে এ একটি জোরালো কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্র রচনায় উদ্বুদ্ধ। এহেন গণপরিষদের অধিবেশন চললো অবিরাম এই দিনটিতে। রাত্রি ১২টা অতীত হলেই গণপরিষদ আনুষ্ঠানিকভাবে নূতন ডোমিনিয়ন বা আত্মকর্তৃত্বসম্পন্ন ভারতরাষ্ট্রকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করলে। পণ্ডিত জবাহর লাল নেহরু একটি মর্ম্মস্পর্শী ভাষণে বললেন যে, এই সময় থেকে সকলেই ভারতবর্ষের সেবায় ও কল্যাণে আত্মনিবেদনের সঙ্কল্প গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। ভারতবর্ষের সংহতিরক্ষায়ও প্রত্যেকেই যেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। এর পর গণপরিষদের প্রতিনিধিবর্গের অনুরোধে সভাপতি বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ, পণ্ডিত জবাহরলালকে সঙ্গে নিয়ে বড়লাট মাউণ্টব্যাটেনের ভবনে গমন করেন, উদ্দেশ্য গণপরিষদের পক্ষে তাঁকে নবগঠিত ভারত ডোমিনিয়নের প্রথম নিয়মানুগ গবর্ণর জেনারেল বা বড়লাট পদে নিয়োগের অনুরোধ

জানালো। লর্ড মাউণ্টব্যাটেন সানন্দে এই পদগ্রহণে সম্মতি দিলেন।

পরদিন সকালে ভারতীয় ফেডারেল কোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় কেনায়ার নিকটে মাউণ্টব্যাটেন বড়লাটের শপথ গ্রহণ করেন। প্রধানমন্ত্রী জবাহরলালের নেতৃত্বে নবগঠিত মন্ত্রিসভার সদস্যগণও একে একে শপথগ্রহণ করলেন। শপথ গ্রহণ পর্ব্ব শেষ হলে বড়লাট মাউণ্টব্যাটেন তদীয় পত্নীসহ মন্ত্রিবর্গ সমভিব্যাহারে সাড়ম্বরে শোভাযাত্রা করে গণপরিষদে উপনীত হলেন। সভাপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ কর্তৃক স্বাগত জানাবার পরে বড়লাট গণপরিষদ এবং এর মাধ্যমে সমগ্রভারত ডোমিনিয়নের অধিবাসীদের উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ দেন। তিনি এই মর্মে বলেন যে, অশান্তি, অসংযম এবং উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যেও বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দের শুভেচ্ছা নিয়ে এবং কার্য্যকরী সহযোগিতায় একটি লক্ষ্যে অল্পকালের মধ্যে পৌঁছান সম্ভবপর হ'ল। ভারত ডোমিনিয়ন যে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হবে—ভারতীয় নেতাদের সংস্পর্শে এসে এবং একযোগে কার্য্য করে তার এ বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়েছে। তিনি নূতন রাষ্ট্রকে অভিনন্দন জানিয়ে এবং এর সৃজনে যাদের আন্তরিক সার্থক সাহায্য লাভ ঘটেছে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে একথা বলেন যে, পরবর্ত্তী ১৯৪৮ সনের এপ্রিল মাসের পর তিনি আর এ পদে থাকা বাঞ্ছনীয় মনে করেন না। গণপরিষদের সভাপতি বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ বড়লাট মাউণ্টব্যাটেনকে ধন্যবাদ দান প্রসঙ্গে বলেন দীর্ঘকাল অবিরাম ত্যাগ-স্বীকার ও দুঃখবরণের ফলেই যে তারা একটি নূতন রাষ্ট্র গঠনে সমর্থ হয়েছেন একথা কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না। তবে এ বিষয়টিও অবশ্য স্বীকার্য্য যে অন্তর্জগতের বর্ত্তমান অবস্থাও তাঁদের এবম্বিধ রাষ্ট্রগঠনে বিশেষ সহায়তা করেছে। এই দিন সন্ধ্যায় বড়লাট মাউণ্টব্যাটেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে একটি বেতার বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতাটিতেও তিনি নূতন ভারত রাষ্ট্রগঠনের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, এই দিনটি শুধু ভারতের নয় জগতের ইতিহাসেও যুগান্তর আনয়ন করবে। যুদ্ধজয় সহজ, কিন্তু বিজয়লাভের পর শান্তিপ্রতিষ্ঠা তথা যুদ্ধের লক্ষ্য কার্য্যে পরিণত করা সহজ নয়। ব্রিটিশ ও যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধজয়ের পর বিভিন্ন দেশের আত্মকর্তৃত্ব- প্রতিষ্ঠার

যে সঙ্কল্প গ্রহণ করেছিলেন নবভারতে তার রূপায়ণ আজ সম্ভব হ'ল।

১৪ই আগষ্ট রাত্রি ১২টার পর থেকে শুধু দিল্লীতে নয় পাকিস্তান-বহির্ভূত সমগ্র ভারতে কি আনন্দোল্লাস! চারদিনব্যাপী এই আনন্দ চলেছিল। এ যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁরাই এই স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দোল্লাসের গভীরতা উপলব্ধি করেছেন। ভারত ডোমিনিয়নে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রীষ্টান নানা জাতি উপজাতি সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকলেই সর্ব্বান্তকরণে যোগ দিয়েছিল। ভারতবর্ষের যে সব অংশ পাকিস্তান ডোমিনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল সেখানেও আনন্দোল্লাস চলে। কিন্তু তা বেশির ভাগই মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। সেখানকার সংখ্যালঘিষ্ঠ সমাজ যে খুব আশান্বিত হতে পেরেছিল তা বলা যায় না। পূর্ব্বেকার অন্তর্দ্বন্দ্ব, মারামারি, হানাহানি, লুঠতরাজ, গৃহদাহ, সম্পত্তিনাশ প্রভৃতি হেতু সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেদের অধিকতর উল্লাসে যেন তাদের মনে আনন্দ আর ফিরে এল না। পঞ্জাবের দৃষ্টান্ত সকলের সম্মুখে। নিতান্ত সাময়িক ব্যবস্থায়ই বাউণ্ডারী কমিশনের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়া পর্য্যন্ত জোর করে শান্তিরক্ষা হয়েছিল। ১৭ই ও ১৮আগষ্ট তারিখে সীমানা-নির্ধারণ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত প্রচারিত হলে এবং নিজ নিজ ডোমিনিয়ানভুক্ত সেনাদল নিজ নিজ অঞ্চলে অপসারিত হবার কথা হলে অন্তর্দ্বন্দ্ব আবার মারমুখী হয়ে উঠলো। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের আনন্দোল্লাস এই মারমূর্ত্তির আবির্ভাবে কোথায় যেন উবে গেল। যা হোক, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯৪৭, ১৫ই আগষ্ট একটি অতীব স্মরণীয়-দিন বলে গণ্য হবে।

ভারতবর্ষ তথা ভারত ডোমিনিয়ন বা রাষ্ট্র এবং পাকিস্তানের সকল সম্প্রদায়ের লোকেদের এই স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দোল্লাস অচীরে আলেয়ার মত যেন মিলিয়ে গেল। স্বাধীনতা প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই পঞ্জাবের দুই অংশের শিখ, মুসলমান ও হিন্দু অধিবাসীদের মধ্যে ভয়ানক আত্মঘাতী হাঙ্গামা শুরু হয়। এতে প্রাণহানি ও সম্পত্তি নাশ হল অভাবনীয় রকমে। পরস্পরের মধ্যে অবিশ্বাস এত বেড়ে চলল যে উভয় অংশেরই অধিবাসীরা বড় সাধের পিতৃভূমি এবং ধনসম্পদ পরিত্যাগ করে ভারতরাষ্ট্র ও পাকিস্তানে

স্ব স্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে এসে আশ্রয় নিলে। এই আশ্রয় গ্রহণপর্ব্ব যা এক হিসাবে জিন্না সাহেবের লোক বিনিময়েরই রূপান্তর শেষ হতে পশ্চিম ভারতে কিছু সময় লাগে। পঞ্জাবের এতাদৃশ আত্মঘাতী হানাহানির ছোঁয়া লাগে দিল্লীতে, উত্তর-প্রদেশের পশ্চিম জিলাগুলিতে এবং রাজপুতনার পশ্চিমাংশে। এর ফলে হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ই ক্ষতিগ্রস্ত হল। পঞ্জাবে যেমন পশ্চিম পঞ্জাব ও পূর্ব্ব পঞ্জাবের মধ্যে যথাক্রমে হিন্দু, শিখ এবং মুসলমান সম্প্রদায় নিশ্চিহ্ন হ'ল, এসব অঞ্চলে ঠিক তেমনিটি না ঘটলেও মুসলমানেরা আত্মরক্ষার তাগিদে পাকিস্তানের দিকে অবিরাম গতিতে ছুটল। এর ফলে নবগঠিত ভারত রাষ্ট্রের উপর যে কতখানি দায় ও দায়িত্ব পড়ল তা অনুমান করাও দুঃসাধ্য। পূর্ব্ব ভারতেও পাকিস্তান থেকে হিন্দুরা ধন-প্রাণ-মান-মর্য্যাদা রক্ষার তাগিদে ভারত রাষ্ট্রে পশ্চিমবঙ্গে এসে আশ্রয় খুঁজতে লাগল। এতেও ভারত রাষ্ট্রের উপরে কম চাপ পড়ে নি। রাজন্য ভারতের দুইটি বৃহত্তম অঞ্চল হায়দ্রাবাদ এবং কাশ্মীর নিয়েও ভারত-ডোমিনিয়নকে বিব্রত হতে হয়। হায়দ্রাবাদের ভারতীয়করণ ব্যাপারটা সম্মিলিত শক্তিপুঞ্জের অন্তর্গত নিরাপত্তা পরিষদ পর্য্যন্ত গড়ায়। কিন্তু শেষে এ রাজ্য ভারত ডোমিনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হতে বাধ্য হয়। কাশ্মীর নিয়ে গণ্ডগোল শুরু হয় ভীষণতর আকারে। উগ্রপন্থী মুসলমানেরা পাকিস্তানের প্রকাশ্য সহায়তায় কাশ্মীরের এক অংশ দখল করে "আজাদ কাশ্মীর" গঠন করে। নিরাপত্তা পরিষদে পাকিস্তান কাশ্মীরের ভারতভুক্তি বে-আইনী বলে ভারত ডোমিনিয়নের বিরুদ্ধে নালিশ করলে। এরও জের চলে বহুদিন পর্য্যন্ত। ১৯৪৮ সনের ৩০শে জানুয়ারী তারিখে আততায়ীর গুলিতে মহাত্মা গান্ধীর প্রাণ বিয়োগে বুঝা গেল হিন্দু-মুসলমানের ভিতরকার বিদ্বেষ ও হিংসার ভাব জাতির অন্তঃস্থলে কতখানি শিকড় গেঁড়ে ছিল। এই সকল নিদারুণ অবস্থার মধ্যেই ভারত ডোমিনিয়নকে মুক্তির পথে অগ্রসর হতে হয়েছিল।

কেউ কেউ বলেন ভারতবাসী সস্তায় স্বাধীনতা পেয়েছে এজন্য তার মনে দায়িত্ববোধ জাগ্রত হতে পারে নি। কিন্তু আমরা যে সস্তায় স্বাধীনতা পাই নি ১৫ই আগষ্টের (১৯৪৭) পূর্ব্বেকার এবং পরবর্ত্তী রক্তগঙ্গার প্লাবনে একথার অ-যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়ে গেছে। হয়ত স্বাধীনতা দেবীর ধর্ম্মই এই যে রক্ত-

পাত বিনা একে আয়ত্ত করা যায় না। তবে ভারতবর্ষে রক্তপাত অন্তর্দ্বন্দ্বের-অন্তর্বিপ্লবের দরুণই হয়েছে। এরও অবশ্য লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতা লাভ, এই অন্তর্দ্বন্দ্ব বা অন্তর্বিপ্লবের জের চলে বহুদিন। এখনও 'কি ভারত রাষ্ট্র' কি পাকিস্তান উভয়ের অধিবাসীরাই এই মর্ম্মান্তিক বেদনা অনুভব করছে। তাঁদের স্মৃতি থেকে এই বেদনা বিদূরিত হ'তে কতদিন লাগবে তা কে বলতে পারে! তবে একটি আশার কথা এই যে, পূর্ব্বে ভারত-বিভাগের যে সব কারণ বর্ত্তমান ছিল কালে হয়ত তা অনেকটা নিরাকৃত হবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতরাষ্ট্র এবং পাকিস্তান নিজেদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব বা মতবৈষম্যের স্বরূপ প্রকাশ করলেও এমনদিন আসা অসম্ভব নয়, যখন উভয়েই হাতে হাত মিলিয়ে স্বদেশের উন্নয়ন এবং শক্তিবৃদ্ধিতে অগ্রসর হবে। ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অবস্থান, অর্থনৈতিক কাঠামো ও জাতিগত ঐক্য বর্ত্তমান এবং বহুলাংশে কৃত্রিম ভেদবৈষম্যকে বহুদূরে সরিয়ে দিতে সক্ষম হবে। সর্ব্বোপরি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-রক্ষায় যে শক্তির প্রয়োজন তাতে দুইটি রাষ্ট্রের বিভেদ-নীতি অনুসরণ করা আত্মহত্যারই সামিল। পরবর্ত্তী কালের আন্তর্জাতিক পরিবেশে উভয় রাষ্ট্রের মিলিত প্রতিরক্ষা প্রচেষ্টার কতকটা সম্ভাবনাও হয়ত দেখা দিবে।

গ্রন্থ-পঞ্জী

বাংলা ও ইংরেজী গ্রন্থের কয়েকখানির মাত্র উল্লেখ এখানে করা হ'ল। বর্ত্তমান ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণে এ-সমুদয় থেকে সাহায্য পেয়েছি। পুস্তকগুলির অধিকাংশই আকর-গ্রন্থের মর্য্যাদা পাবার যোগ্য। আমি এখানে সমসাময়িক ইংরেজী-বাংলা পত্র-পত্রিকার উল্লেখ করি নি। পাদটীকার অভাবের প্রতিও আমার দৃষ্টি কেউ কেউ আকর্ষণ করেছেন। কংগ্রেস পূর্ব্ব-যুগের ইতিবৃত্ত-রচনায় এই সকল পত্র-পত্রিকার সাহায্য আমাকে বিশেষভাবে নিতে হয়েছে—'সমাচার দর্পণ' (সংবাদপত্রে সেকালের কথায় সঙ্কলিত); "Calcutta Journal", "Calcutta Monthly Journal", "Asiatic Journal", 'The English Man', 'The Bengal Hurkara', 'The Bengal Spectator', 'The Hindu Patriot', "Mookherjee's Magazine", 'The National Paper', 'অমৃতবাজার পত্রিকা', (তখনও বেশীর ভাগ বাংলায় লিখিত), 'The Bengalee', (গিরিশ ঘোষ সম্পাদিত), 'The Brahmo Public Opinion', 'The Indian Messenger', 'বঙ্গদর্শন', 'আর্য্যদর্শন', 'মধ্যস্থ', 'সাধারণী' প্রভৃতি এবং কোন কোন ইংরেজী পত্রিকার সংকলন-গ্রন্থ।

কংগ্রেস যুগের ইতিহাস রচনায় ও বিস্তর পত্র-পত্রিকা এবং আকর-গ্রন্থ থেকে সহায়তা লাভ করেছি। এ যুগের পত্র-পত্রিকা বিপুল। সংবাদপত্রের ভিতরে 'The Amrita Bazar Patrika' (ইংরেজী), 'The Bengalee' (সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত), "The Indian Daily News", 'The Indian Nation', 'The Indian Mirror', 'The New India', 'The Bandemataram', 'সন্ধ্যা,' 'যুগান্তর,' 'The Servant', 'Forward', 'Liberty,' 'বঙ্গবাণী', 'সঞ্জীবনী', 'বঙ্গবাসী', 'হিতবাদী', 'বসুমতী', 'আনন্দবাজার পত্রিকা' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাময়িক পত্রের মধ্যে 'ভারতী', 'নব্য-ভারত', 'নবজীবন', 'সাধনা', 'বঙ্গদর্শন' (নবপর্য্যায়), 'ভাণ্ডার' (১৩১২, ১৩১৩), 'প্রবাসী' ও 'The Modern Review'-এর নামও বিশেষ ক'রে উল্লেখ

করতে হয়। সংবাদপত্রগুলির কোন কোনটির ফাইল এখন দুষ্প্রাপ্য। দুষ্প্রাপ্য সংবাদপত্র সমূহের "Cuttings" কোথাও কোথাও দেখবার সুযোগ আমার হয়েছে ; বিশেষ বিশেষ বাংলা ও ইংরেজী গ্রন্থের তালিকা নিম্নে দিলাম :

বাংলা

১। সংবাদপত্রে সেকালের কথা (১ম ও ২য় খণ্ড) ৩য় সং—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত

২। বাংলা সাময়িক পত্র (১৮১৮-১৮৬৭)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৩। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৪। রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত

৫। হিন্দুমেলার কার্য্যবিবরণ ও বক্তৃতা

৬। মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ—অনাথনাথ বসু

৭। মহাত্মা অশ্বিনীকুমার

৮। কৃষ্ণকুমার মিত্রের আত্মচরিত

৯। তিলকের মকর্দ্দমা ও সংক্ষিপ্ত জীবনী—সখারাম গণেশ দেউস্কর

১০। কংগ্রেস—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

১১। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন

১২। জাতীয় উচ্ছ্বাস—রায় বাহাদুর জলধর সেন সঙ্কলিত

১৩। হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী

১৪। কবি হেমচন্দ্র—অক্ষয়চন্দ্র সরকার

১৫। বঙ্গদর্শন (১১৭৯-১২৮৩)

১৬। আনন্দমঠ—সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ

১৭। দেশবন্ধু স্মৃতি—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

১৮। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক—বসুমতী সাহিত্য-মন্দির

১৯। লালা লজপৎ রায়—শ্রীহেমচন্দ্র বক্সী

২০। রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র—শ্রীবিশ্বেশ্বর দাশ

২১। বন্দেমাতরম্—যোগীন্দ্রনাথ সরকার সঙ্কলিত

২২। আনন্দমোহন বসু
২৩। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
২৪। ভারতে জাতীয় আন্দোলন—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
২৫। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী
২৬। শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিত
২৭। হরিশ্চন্দ্র—রামগোপাল সান্যাল
২৮। আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
২৯। আনন্দবাজার পত্রিকা—কংগ্রেস-জয়ন্তী সংখ্যা
৩০। কংগ্রেস ও বাংলা—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
৩১। জীবনস্মৃতি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩২। চরিতকথা—বিপিনচন্দ্র পাল
৩৩। প্যারীচরণ সরকার—নবকৃষ্ণ ঘোষ
৩৪। ভোলানাথ চন্দ্র—মন্মথনাথ ঘোষ
৩৫। সেকালের লোক—মন্মথনাথ ঘোষ
৩৬। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের আত্মচরিত
৩৭। অরবিন্দ প্রসঙ্গ—দীনেন্দ্রকুমার রায়
৩৮। অশ্বিনীকুমার দত্ত—সুরেশচন্দ্র গুপ্ত
৩৯। রবীন্দ্র জীবনী—চার খণ্ড—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।
৪০। জাতিবৈর বা আমাদের দেশাত্মবোধ—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল
৪১। জাতীয়তার নবমন্ত্র বা হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল
৪২। বিদ্রোহ ও বৈরিতা ঐ
৪৩। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ ঐ
৪৪। ভারতের মুক্তি সন্ধানী— ঐ
৪৫। রামমোহন রায় (সাহিত্য সাধক চরিতমালা)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৪৬। রাধাকান্ত দেব (ঐ) —শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল
৪৭। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (ঐ) ঐ
৪৮। রাজনারায়ণ বসু (ঐ) ঐ
৪৯। কেশবচন্দ্র সেন (ঐ) ঐ

ইংরেজী

1. **Bengal Under Lieutenant-Governors** (Vols. I & II)—by *C. E. Buckland.*
2. **History of Political Thought from Rammohan to Dayanand.** (1821-84)—by *Biman Behari Majumder.*
3. **Rise and Fulfilment of British Rule in India**—by *Thompson & Garrat.*
4. **The Life and Work of Sir Sayed Ahmed Khan**—by *Lt. Col. Graham.*
5. **Landmarks in Indian Constitutional History and National Development**—by *Gurmukh Nihal Singh.*
6. **A Nation in Making**—by *Surendra Nath Banerjee.*
7. **New India** (1st & 2nd Edition)—by *Henry Cotton.*
8. **Life and Times of Lokamanya Tilak**—Vol. I by *N. C. Kelkar.*
9. **How India Wrought for her Freedom**—by *Annie Besant.*
10. **Indian National Evolution**—by *Ambika Charan Majumder.*
11. **The History of Congress** (Vols. I & 2.)—by *Dr. Pattabhi Sitaramaya.*
12. **Congress in Evolution.**—Compiled by *D. Chakravarty & C. Bhattacharya.*
13. **Congress Presidential Speeches** (Vols. I & II)—by *Natesan.*
14. **Young India**—Vol. I—8 (*Ganeshan*)
15. **The Life of C. R. Das**—by *Prithwis Chandra Roy.*
16. **Memories of my Life and Times**—by *Bepin Chandra Pal.*
17. **Rise of the British Power in India**—by *B. D. Basu.*
18. **India Under the British Crown**—by *B. D. Basu.*
19. **Jawaharlal Nehru : an Autobiography.**
20. **Indian Civil Service**—by *Naresh Chandra Roy.*
21. **The Separation of Executive and Judicial Powers in British India**—by *Naresh Chandra Roy.*
22. **Rural Self-Government in Bengal**—by *Naresh Chandra Roy.*
23. **Life and Works of R. C. Dutt**—by *J. N. Gupta*, I.C.S.

24. **The Rise and Growth of the Congress in India**—by *C. F. Andrews & Girija Mukherjee.*
25. **Independence—The Immediate Need**—by *C.F. Andrews.*
26. **India and the Simon Commission**—by *C. F. Andrews.*
27. **Defence of India**—by *Nirad C. Chaudhuri.*
28. **The Congress and the National Movement**—*Published by the Reception Committee, Calcutta Congress,* 1928.
29. **History of British India**—by *Roberts.*
30. **My Experiments with Truth** (Vols. I & II)—by *M. K. Gandhi.*
31. **The Indian National Congress and the Revival of India**—by *Nanda Lal Sarkar.*
32. **Allan Octavian Hume, C. B. "Father of Indian National Congress**—by *Sir William Wedderburn.*
33. **India Wins Freedom**—*Abul Kalam Azad.*
34. **Indian Annual Register, 1936-1942.**
35. **Brahmo Samaj and the Battle of Swaraj in India**—by *Bepin Chandra Paul.*
36. **Recollections** (Vol. II)—by *John Morley.*
37. **History and Constitutions of Courts etc.**—by *Herbert Cowell.*
38. **An Indian Journalist**—by *F. H. B. Skrine.*
39. **I. N. A & Its NETAJI**—by *Maj. Gen Shah Nawaz Khan.*
40. **India Divided**—by *Rajendra Prasad.*
41. **Netaji His Life and Work—Edited** by *Shri Ram Sharma.*
42. **The Transfer of Power in India**—by *V. P. Menon.*
43. **Integration of Indian States**—by *V. P. Menon.*
44. **Hindusthan year Book (1946—1960)**
45. **India Through the Ages**—by *Sir Jadunath Sarker.*
46. **History of the Indian Association**—by *Shri Jogesh Chandra Bagal.*
47. **Peasant Revolution in Bengal**—by *Shri Jogesh Chandra Bagal.*
48. **Studies in Renaissance in Bengal** (*B. C. Pal Centenary Commemoration Volume*).
49. **National Education—by** *Sister Nivedita.*

নির্ঘণ্ট

নির্ঘণ্ট